সূচী-পত্র

তফসীরে

মা'আরেফুল কোরআন

পঞ্চম খণ্ড

[সূরা ইউসুফ, সূরা রা'দ, সূরা ইবরাহীম, সূরা হিজর, সূরা নাহল, সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা কাহফ]

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' (র)

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (পঞ্চম খণ্ড)
হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' (র)
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৯৮

ইফা প্রকাশনা : ৬৮৯/৯
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0177-6

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৮০

দশম সংস্করণ (রাজস্ব)
মার্চ ২০১২
চৈত্র ১৪১৮
রবিউস সানি ১৪৩৩

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৮

প্রচ্ছদ শিল্পী : জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ আইউব আলী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ৩৮০.০০ (তিনশত আশি) টাকা মাত্র

TAFSIR-E-MA'REFUL-QURAN (5th Vol.) : Bangla version by Maulana Muhiuddin Khan of Tafsir-e-Ma'reful Quran, an Urdu Commentary of Al-Quran by Hazrat Maulana Mufti Muhammad Shafi (R) and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Director, Publication Department, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181538

E-mail : directorpubif@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation.org.bd

Price : Tk 380.00 ; US Dollar : 16.00

সূচীপত্র

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের সু-বিশাল ভাণ্ডার এ গ্রন্থের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত, বিশুদ্ধতম ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশনাগ্রন্থ, ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যকভাবে অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোন বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্য-বিন্যাস হলো চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও-এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে হিমসিম খেয়ে যান। বস্তুত এই প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে পবিত্র কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ-দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্‌সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফাস্‌সিরে কুরআন, লেখক, গ্রন্থকার। ইসলাম সম্পর্কে, বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে, তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য উপমহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে তাঁকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও খ্যাতিমান করেছে। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন' একটি অনন্য ও অসাধারণ গ্রন্থ। উর্দু ভাষায় লেখা প্রায় সাড়ে সাত হাজার পৃষ্ঠার বিশ্বনন্দিত এই তফসীর গ্রন্থটি পাঠ করে যাতে বাংলাভাষী পাঠকগণ পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি অনুপ্রাণিত হয় এবং পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী ও শিক্ষা অনুধাবন করে নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পারে, এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮০ সাল থেকে এর তরজমার কাজ শুরু করে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের আওতায় এ গ্রন্থটি তরজমার জন্য দেশের খ্যাতনামা আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি ৮ খণ্ডে তফসীরটির তরজমার কাজ সম্পন্ন করেন। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) বিরচিত এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পরই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। পাঠক-চাহিদার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে এ গ্রন্থের নয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর দশম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ গ্রন্থের অনুবাদ-কর্ম থেকে শুরু করে পরিমার্জন ও মুদ্রণের সকল পর্যায়ে যাঁরা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন। বাংলাভাষী পাঠকগণ গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি মনোযোগী ও উৎসাহী হবেন বলে আশা করি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ হলো 'তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন'। উপমহাদেশের বিদগ্ধ ও শীর্ষস্থানীয় আলিম আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) এই তাফসীর রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের সরল তাফসীর এবং তাফসীর বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্যকে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে ব্যাখ্যা করেন।

তিনি এই গ্রন্থের তাফসীর বিষয়ে ইতিপূর্বে রচিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সার-নির্যাস আলোচনা, কালপরিক্রমায় উপস্থাপিত নতুন নতুন জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নতুন মাসআলা-মাসাইলের বর্ণনা, বিশেষত মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং এ অগ্রগতিকে কাজে লাগানোর বিষয়ে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিদগ্ধতার সাথে পেশ করেছেন। মূল গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত। গ্রন্থটির অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এটি মূল উর্দু থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করে। এটি অনুবাদ করেন বিশিষ্ট আলিমে দীন ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

বর্তমান সংস্করণ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেসের প্রিন্টার মাওলানা মোঃ ওসমান গণী (ফারুক) নির্ভুলভাবে প্রকাশ করতে সহযোগিতা করেন। এরপরও এত বড় তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এগুলো নিরসনের জন্য সহৃদয় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠক-চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবার এর দশম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি এর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং সুধীমহলে সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে কুরআন বোঝার ও তদনুযায়ী আমল করার তওফীক দিন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

অনুবাদকের আরয

সমসাময়িক কালে প্রকাশিত সর্ববৃহৎ এবং সর্বাধুনিক তফসীর গ্রন্থ 'মা'আরেফুল কোরআন' যুগশ্রেষ্ঠ সাধক আলেম হযরত মওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' সাহেবের এক অসাধারণ কীর্তি। এতে পবিত্র কুরআনের প্রথম ব্যাখ্যাতা খোদ রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের তফসীর সম্পর্কিত বাণীগুলোর উদ্ধৃতি, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন ও তৎপরবর্তী সাধক মনীষিগণের ব্যাখ্যা বর্ণনার সাথে সাথে আধুনিক জিজ্ঞাসা ও তৎসম্পর্কিত পাক কালামের যুক্তিপূর্ণ জবাবও অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে প্রদান করা হয়েছে। এ কারণেই এ তফসীর গ্রন্থটি পাঠক সমাজে বিপুলভাবে সমাদৃত। বাংলা ভাষায় এ মহান গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে সুধী পাঠকগণের তরফ থেকে যে সাড়া লক্ষ্য করা গেছে, তাতে আমরা উৎসাহিত হয়েছি। পাঠকগণের তাকীদেই যেমন এ মহাগ্রন্থের আটটি খণ্ডই দ্রুত অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি পাঠকগণের উৎসাহ লক্ষ্য করেই এ গ্রন্থের প্রায় সবগুলো খণ্ডেরই চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েও সেগুলি পাঠকগণের হাতে চলে গেছে।

'মা'আরেফুল–কোরআন'–এর বঙ্গানুবাদ পাঠ করে বহু বিজ্ঞ পাঠক পত্রযোগে এবং অনেকেই ব্যক্তিগতভাবেও আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন। অনেকেই কিছু কিছু ত্রুটি–বিচ্যুতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ফলে পরবর্তী সংস্করণগুলো অধিকতর ত্রুটিমুক্ত করে প্রকাশ করার ব্যাপারে বিস্তর সহযোগিতা লাভ করেছি। আমরা তাঁদের সকলের প্রতিই কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সে সহৃদয়তার যোগ্য ফল দান করবেন বলে আশা করি।

'মা'আরেফুল–কোরআন–এর অনুবাদ ও মুদ্রণ এবং একাদিক্রমে সবগুলো খণ্ডের পুনঃ নিরীক্ষণ আপাতত আমার সর্বাপেক্ষা বড় সাধনা। এ মহৎ গ্রন্থটির আরো সংশোধন ও পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আমি মনে করি। তাই আমি সুধী পাঠকগণের খেদমতে অব্যাহত সহযোগিতা প্রার্থী।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলের শ্রম কবূল করুন। আমীন।

বিনয়াবনত

মুহিউদ্দীন খান

ঢাকা, ১৪১০ হিঃ — সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা

سورة يوسف

সূরা ইউসুফ

মক্কায় অবতীর্ণ, ১১ রুকূ, ১১১ আয়াত

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿١﴾ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ﴿٣﴾ اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ﴿٤﴾ قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ۖ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٥﴾ وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ۗ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦﴾

অসীম মেহেরবান ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু।

(১) আলিফ-লা-ম-রা; এগুলো সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত। (২) আমি একে আরবী ভাষায় কোরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (৩) আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি, যেমতে আমি এ কোরআন তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি। তুমি এর আগে অবশ্যই এ ব্যাপারে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (৪) যখন ইউসুফ পিতাকে বলল: পিতা, আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্রকে, সূর্যকে এবং চন্দ্রকে। আমি তাদেরকে আমার উদ্দেশে সিজদা করতে দেখেছি! (৫) তিনি বললেন: বৎস, তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে

চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (৬) এমনিভাবে তোমার পালনকর্তা তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে বাণীসমূহের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দেবেন এবং পূর্ণ করবেন স্বীয় অনুগ্রহ তোমার প্রতি ও ইয়াকুব পরিবার-পরিজনের প্রতি; যেমন ইতিপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি পূর্ণ করেছেন। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলিফ-লা-ম-রা (এর তাৎপর্য আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন)। এগুলো একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত, (যার ভাষা ও বাহ্যিক মর্ম খুবই পরিষ্কার)। আমি একে আরবী ভাষায়, কোরআন (হিসাবে) অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা (এ ভাষাভাষী হওয়ার কারণে) অন্যদের আগেই বুঝ (অতঃপর তোমাদের মাধ্যমে অন্যেরাও বোঝে)। আমি যে এ কোরআন আপনার কাছে পাঠিয়েছি, এর মাধ্যমে আমি আপনার কাছে একটি উৎকৃষ্ট কাহিনী বর্ণনা করব। ইতিপূর্বে আপনি (এ কাহিনী সম্পর্কে) সম্পূর্ণ অনবগত ছিলেন, (কারণ না আপনি কোন গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন, না কোন শিক্ষকের কাছ থেকে কিছু শিখেছিলেন এবং এ কাহিনীটি এমন সুবিদিতও ছিল না যে, সর্বস্তরের জনগণের তা জানা থাকবে। কাহিনীর সূচনাঃ সে সময়টি স্মরণযোগ্য) যখন ইউসুফ (আ) স্বীয় পিতা ইয়াকুব (আ)-কে বললেনঃ পিতা আমি (স্বপ্নে) এগারটি নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্র দেখেছি—তাদেরকে আমার সামনে সিজদা করতে দেখেছি। (উত্তরে) তিনি বললেন, বৎস! এ স্বপ্ন (তোমার) ভাইদের কাছে বর্ণনা কর না। (কেননা, নবী-পরিবারের লোক বিধায় তারা এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে পারবে যে, এগারটি নক্ষত্র হচ্ছে এগার জন ভাই, সূর্য পিতা এবং চন্দ্র মাতা। সিজদা করার তাৎপর্য হচ্ছে তোমার প্রতি তাদের অনুগত ও আজ্ঞাবহ হওয়া)। তাহলে তারা তোমার (অনিষ্ট সাধনের) জন্য চক্রান্ত করবে। (অর্থাৎ ভাইদের অধিকাংশই একাজ করবে। কারণ, দশ ভাই ছিলেন বৈমাত্রেয়। তাদের পক্ষ থেকেই বিপদাশঙ্কা ছিল। 'বেনিয়ামিন' নামে একজন মাত্র সহোদর ভাই ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে বিরোধিতার আশংকা ছিল না। কিন্তু তার মুখ থেকে কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল)। নিঃসন্দেহে শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (তাই সে ভাইদের মনে কুমন্ত্রণা জাগিয়ে তুলবে)। এবং (আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে তোমাকে এ সম্মান দেবেন যে, সবাই তোমার অনুগত ও আজ্ঞাবহ হবে)। এমনিভাবে তোমার পালনকর্তা তোমাকে (নবুয়তের সম্মানের জন্যও) মনোনীত করবেন, তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জ্ঞান দান করবেন; যেমন ইতিপূর্বে তোমার পিতামহ ইবরাহীম ও ইসহাক (আ)-এর প্রতি স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করেছেন। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

চারটি আয়াত ছাড়া সমগ্র সূরা-ইউসুফ মক্কায় অবতীর্ণ এ সূরায় হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ কাহিনীটি শুধুমাত্র এ সূরাতেই

উল্লিখিত হয়েছে। সমগ্র কোরআনে কোথাও এর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। এটা একমাত্র ইউসুফ (আ) সম্পর্কিত কাহিনীরই বৈশিষ্ট্য। এছাড়া অন্য সব আম্বিয়া (আ)-এর কাহিনী ও ঘটনাবলী সমগ্র কোরআনে প্রাসঙ্গিকভাবে খণ্ড খণ্ডভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব-ইতিহাস এবং অতীত অভিজ্ঞতার মধ্যে মানুষের ভবিষ্যত জীবনের জন্য বিরাট শিক্ষা নিহিত থাকে। এসব শিক্ষার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মানুষের মন ও মস্তিষ্কের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার চাইতে অধিক গভীর ও অনায়াসলব্ধ হয়। এ কারণেই গোটা মানবজাতির জন্য সর্বশেষ নির্দেশ-নামা হিসাবে প্রেরিত কোরআন পাকে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহের ইতিহাসের নির্বাচিত অধ্যায়সমূহ সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে, যা মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত সংশোধনের জন্য অমোঘ ব্যবস্থাপত্র। কিন্তু কোরআন পাক বিশ্ব-ইতিহাসের এসব অধ্যায়কেও স্বীয় বিশেষ ও অনুপম রীতিতে এমনভাবে উদ্ধৃত করেছে যে, এর পাঠক অনুভবই করতে পারে না যে, এটি কোন ইতিহাস গ্রন্থ বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন কাহিনীর যতটুকু অংশ শিক্ষা ও উপদেশের জন্য অত্যাবশ্যক মনে করা হয়েছে, সেখানে ঠিক ততটুকু অংশই বিবৃত করা হয়েছে। অতঃপর অন্য কোন ক্ষেত্রে এ অংশের প্রয়োজন অনুভূত হলে পুনর্বার তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ কারণেই এসব কাহিনীর বর্ণনায় ঘটনার কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। কোথাও কাহিনীর প্রথম অংশ পরে এবং শেষ অংশ আগে উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআনের এ বিশেষ বর্ণনা রীতিতে স্বতন্ত্র নির্দেশ এই যে, জগতের ইতিহাস ও অতীত ঘটনাবলী পাঠ করা এবং স্মরণ রাখা স্বয়ং কোন লক্ষ্য নয় বরং প্রত্যেক কাহিনী থেকেই কোন না কোন শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সুতরাং অনেক অনুসন্ধানবিদ বলেছেন ঃ মানুষের বাক্যাবলীর দুটি প্রকারের মধ্যে خبر (ঘটনা বর্ণনা) ও انشاء (রচনা)-এর মধ্যে শেষোক্ত প্রকারই আসল উদ্দেশ্য। خبر স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে কখনও উদ্দেশ্য হয় না বরং প্রত্যেক খবর ও ঘটনা শোনা ও দেখার মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একমাত্র স্বীয় অবস্থা ও কর্মের সংশোধন হওয়া উচিত।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করার একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, ইতিহাস রচনাও একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র। এতে ইতিহাস রচয়িতাদের জন্য বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যে, বর্ণনা এমন সংক্ষিপ্ত না হয় যাতে পূর্ণ বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে বর্ণনা এত দীর্ঘ হওয়াও সমীচীন নয় যাতে তা পড়া ও স্মরণ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। বস্তুত আলোচ্য কাহিনীর কোরআনী বর্ণনা থেকে এ বিষয়টিও প্রতীয়মান হয়।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ এই যে, কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, ইহুদীরা পরীক্ষার্থে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেছিল ঃ যদি আপনি সত্যিই আল্লাহ্র নবী হন, তবে বলুন ইয়াকুব-পরিবার সিরিয়া থেকে মিসরে কেন স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং ইউসুফ

(আ)-এর ঘটনা কি ছিল? প্রত্যুত্তরে তাঁর মাধ্যমে পূর্ণ কাহিনী অবতারণ করা হয়। এটা নিঃসন্দেহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মো'জেযা ও তাঁর নবুয়তের একটি বড় প্রমাণ। কেননা, তিনি ছিলেন নিরক্ষর এবং জীবনের প্রথম থেকেই মক্কায় বসবাসকারী। তিনি কারও কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি এবং কোন গ্রন্থও পাঠ করেন নি। এতদসত্ত্বেও তওরাতে বর্ণিত আদ্যোপান্ত ঘটনাটি বিশুদ্ধরূপে বর্ণনা করে দেন। বরং কিছু এমন বিষয়ও তিনি বর্ণনা করেন, যেগুলো তওরাতে উল্লিখিত ছিল না। এ কাহিনীতে প্রসঙ্গক্রমে অনেক বিধি-বিধানেরও অবতারণা করা হয়েছে। এগুলো পরে যথাস্থানে বর্ণিত হবে।

সর্বপ্রথম আয়াতে الٓر অক্ষরসমূহ হচ্ছে কোরআনের খণ্ডবাক্য। এগুলো সম্পর্কে অধিক সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সিদ্ধান্ত এই যে, এগুলো বক্তা ও সম্বোধিত ব্যক্তি অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রসূলের মধ্যকার একটি গোপন রহস্য, যা কোন তৃতীয় ব্যক্তি বুঝতে পারে না এবং এগুলোর অর্থ উদ্ঘাটন করার জন্য তৎপর হওয়াও সমীচীন নয়।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ — অর্থাৎ এগুলো সে গ্রন্থের আয়াত, যা হালাল ও হারামের বিধি-বিধান এবং প্রত্যেক কাজের সীমা ও শর্ত বর্ণনা করে। মানুষকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রের জন্য একটি সুষম ও সরল জীবন ব্যবস্থা দান করে। এগুলো অবতীর্ণ করার অঙ্গীকার তওরাতে পাওয়া যায় এবং ইহুদীরা এ সম্পর্কে অবহিতও বটে।

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ — অর্থাৎ আমি একে আরবী কোরআন হিসাবে নাযিল করেছি, হয়তো এতে তোমরা বুঝতে পারবে।

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী সম্পর্কে যারা প্রশ্ন তুলেছিল, তারা ছিল আরবের ইহুদী। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরই ভাষায় এ কাহিনী নাযিল করেছেন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সততা ও সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাহিনীতে বর্ণিত বিধান ও নির্দেশাবলীকে চলার পথের আলোকবর্তিকা হিসাবে গ্রহণ করে।

এ জন্যই এখানে لعل শব্দটি 'সম্ভবত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, এসব সম্বোধিত ব্যক্তির অবস্থা জানা ছিল যে, সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সামনে এসে যাবার পরেও তাদের কাছ থেকে সত্য গ্রহণের আশা করা ছিল সুদূর পরাহত।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ -

অর্থাৎ আমি এ কোরআনকে ওহীর মাধ্যমে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করে আপনার কাছে সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি। নিঃসন্দেহে আপনি ইতিপূর্বে এসব ঘটনা সম্পর্কে অনবগত ছিলেন।

এতে ইহুদীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা আমার পয়গম্বরের যেভাবে পরীক্ষা নিতে চেয়েছ, তাতেও তাঁর গুণগত উৎকর্ষ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেননা, তিনি পূর্ব থেকে নিরক্ষর এবং বিশ্ব-ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞও ছিলেন। সুতরাং তিনি এখন যে বিজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছেন, তার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র শিক্ষা ও ওহী ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ○

অর্থাৎ ইউসুফ (আ) তাঁর পিতাকে বললেনঃ পিতঃ, আমি স্বপ্নে এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি। আরও দেখেছি যে, তারা আমাকে সিজদা করছে।

এটা ছিল হযরত ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্ন। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ এগারোটি নক্ষত্রের অর্থ হচ্ছে ইউসুফ (আ)-এর এগার ভাই, সূর্য ও চন্দ্রের অর্থ পিতা ও মাতা।

তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছেঃ হযরত ইউসুফ (আ)-এর মাতা এ ঘটনার পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন এবং তাঁর খালা তখন তাঁর পিতার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। খালা এমনিতেও মায়ের সমতুল্য গণ্য হয়। বিশেষত যদি পিতার ভার্যা হয়ে যায়, তবে সাধারণত পরিভাষায় তাকে মা-ই বলা হবে।

قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ○

অর্থাৎ বৎস! তুমি এ স্বপ্ন ভাইয়ের কাছে বর্ণনা করো না। আল্লাহ্ না করুন, তারা এ স্বপ্ন শুনে তোমার মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত হয়ে তোমাকে বিপর্যস্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে। কেননা, শয়তান হল মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থকড়ির লোভ দেখিয়ে মানুষকে এহেন অপকর্মে লিপ্ত করে দেয়।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

স্বপ্নের তাৎপর্য স্তর ও প্রকারভেদঃ সর্বপ্রথম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে স্বপ্নের স্বরূপ এবং তা থেকে যেসব ঘটনা ও বিষয় জানা যায়, সেগুলোর গুরুত্ব ও পর্যায়। তফসীরে

মাযহারীতে কাযী সানাউল্লাহ্ (র) বলেন : স্বপ্নের তাৎপর্য এই যে, নিদ্রা কিংবা সংজ্ঞাহীনতার কারণে মানুষের মন যখন দেহের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন সে কল্পনাশক্তির পথে কিছু কিছু আকার-আকৃতি দেখতে পায়। এরই নাম স্বপ্ন। স্বপ্ন তিন প্রকার। তন্মধ্যে দু'প্রকার সম্পূর্ণ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন। এগুলোর কোন বাস্তবতা নেই। অবশিষ্ট একটি প্রকার মৌলিকত্বের দিক দিয়ে নির্ভুল ও বাস্তব। কিন্তু এতে মাঝে মাঝে নানা উপসর্গ যুক্ত হয়ে এগুলোকেও অবাস্তব এবং অবিশ্বাস্য করে দেয়।

এ উক্তির ব্যাখ্যা এই যে, কোন কোন সময় মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যেসব বিষয় ও ঘটনা প্রত্যক্ষ করে, সেগুলোই স্বপ্নে নানা আকার-আকৃতি নিয়ে দৃষ্টিগোচর হয়। আবার কোন কোন সময় শয়তান আনন্দদায়ক ও ভয়াবহ উভয় প্রকার দৃশ্য ও ঘটনাবলী মানুষের স্মৃতিতে জাগিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, এ উভয় প্রকার স্বপ্নই ভিত্তিহীন ও অবান্তর। এগুলোর কোন বাস্তব ব্যাখ্যা হতে পারে না। এতদুভয়ের প্রথম প্রকারকে حديث النفس তথা মনের সংলাপ এবং দ্বিতীয় প্রকারকে تسويل الشيطان অর্থাৎ শয়তানের বিভ্রান্তি বলা হয়।

তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন সত্য ও বিশুদ্ধ। এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক প্রকার ইলহাম (আল্লাহ্‌র ইশারা), যা বান্দাকে আনন্দ অথবা সুসংবাদ দানের উদ্দেশ্যে করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে কোন কোন বিষয় বান্দার মন ও মস্তিষ্কে জাগিয়ে দেন।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : মু'মিন ব্যক্তির স্বপ্ন একটি সংলাপ বিশেষ। এর মাধ্যমে সে তার পালনকর্তার সাথে বাক্যালাপ করার গৌরব অর্জন করে। তিবরানী বিশুদ্ধ সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।—(মাযহারী)

সূফী বুযুর্গগণের বর্ণনা অনুযায়ী এর স্বরূপ এই যে, জগতে অস্তিত্ব লাভের পূর্বে প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ আকৃতি 'আলমে মিসাল' অর্থাৎ উপমা-জগতে বিদ্যমান থাকে, তেমনি 'মা'আনী' তথা অর্থবাচক বিষয়াদিরও বিশেষ আকার-আকৃতি বিদ্যমান থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় মানুষের মন যখন বাহ্যিক দেহের ক্রিয়া-কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে, তখন মাঝে মাঝে উপমা জগতের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় এবং সেখানকার আকার-অবয়ব সে দেখতে পায়। এছাড়া এসব আকার-অবয়ব অদৃশ্য জগৎ থেকে দেখানো হয়। মাঝে মাঝে এগুলোতেও এমন সব উপসর্গ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, আসল সত্যের সাথে কিছু কিছু অবাস্তব কল্পনাও মিশ্রিত হয়ে পড়ে। এ কারণে ব্যাখ্যাদাতাদের পক্ষেও এর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে পড়ে। আর যা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রেরিত আকার-অবয়ব যাবতীয় উপসর্গ থেকে পরিচ্ছন্ন থাকে। তখনই সেগুলো হয় আসল সত্য। কিন্তু এগুলোর মধ্যেও কোন কোন স্বপ্ন থাকে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কারণ, তাতে বাস্তব ঘটনা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। এমতাবস্থায়ও যদি ব্যাখ্যা নির্ভুল হয়, তবে ঘটনা ভিন্ন আকার ধারণ করে। তাই একমাত্র সে স্বপ্নই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রেরিত ইলহাম ও

বাস্তব সত্য বলে বিবেচিত হবে, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হবে, তাতে কোন উপসর্গের সংমিশ্রণ হবে না এবং ব্যাখ্যাও বিশুদ্ধ দেওয়া হবে।

পয়গম্বরগণের সব স্বপ্ন ছিল এই পর্যায়ের। তাই তাদের স্বপ্নও ওহীর সমপর্যায়-ভুক্ত। সাধারণ মুসলমানদের স্বপ্নে নানাবিধ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। তাই তা কারও জন্য প্রমাণ হয় না। তাদের স্বপ্নে কোন কোন সময় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিগত আকার-আকৃতির মিশ্রণ সংঘটিত হয়ে যায়, কোন সময় পাপের অন্ধকার ও মালিন্য স্বপ্নকে আচ্ছন্ন করে দুর্বোধ্য করে দেয়। মাঝে মাঝে এবং বিবিধ কারণে বিশুদ্ধ ব্যাখ্যায়ও উপনীত হওয়া যায় না।

স্বপ্নের বর্ণিত তিনটি প্রকারই রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : স্বপ্ন তিন প্রকার। এক প্রকার শয়তানী। এতে শয়তানের পক্ষ থেকে কিছু কিছু বিষয় মনে জাগ্রত হয়। দ্বিতীয় প্রকার স্বপ্ন হচ্ছে মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যা কিছু দেখে, নিদ্রায়ও তাই সামনে আসে। তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন সত্য ও অভ্রান্ত। এটি নবুয়তের ৪৬ তম অংশ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইলহাম।

স্বপ্ন নবুয়তের অংশ—এর অর্থ ও ব্যাখ্যা : স্বপ্নের এ সত্য ও বিশুদ্ধ প্রকার সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে। কোন হাদীসে নবুয়তের ৪০ তম অংশ, কোন হাদীসে ৪৬তম অংশ এবং কোন হাদীসে ৪৯তম, ৫০তম এবং ৭০তম অংশ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। এসব হাদীস তফসীরে কুরতুবীতে একত্রে সন্নিবেশিত করে ইবনে আবদুল বারের বিশ্লেষণে এরূপ বর্ণিত আছে যে, এগুলোর মধ্যে কোনরূপ পরস্পর বিরোধিতা নেই। বরং প্রত্যেকটি হাদীস স্ব-স্থানে বিশুদ্ধ ও সঠিক। যারা স্বপ্ন দেখে, তাদের অবস্থাভেদে বিভিন্নরূপ অংশ বর্ণনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি সততা, বিশ্বস্ততা, ধর্মপরায়ণতা ও পরিপূর্ণ ঈমান দ্বারা বিভূষিত, তার স্বপ্ন নবুয়তের ৪০তম অংশ হবে। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এসব গুণ কম, তার স্বপ্ন ৪৬তম অথবা ৫০তম অংশ হবে এবং যার মধ্যে এসব গুণ আরও কম, তার স্বপ্ন নবুয়তের ৭০তম অংশ হবে।

এখানে এ বিষয়টি চিন্তাসাপেক্ষ যে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের অংশ—এর অর্থ কি? তফসীরে মাযহারীতে এর তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে তেইশ বৎসর পর্যন্ত ওহী আগমন করতে থাকে। তন্মধ্যে প্রথম ছয়মাস স্বপ্নের আকারে এ ওহী আগমন করে। অবশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ ষান্মাসিকে জিবরাঈলের মধ্যস্থতায় ওহী আগমন করে। এ হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের ৪৬তম অংশ। যেসব হাদীসে কম-বেশী সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোতে হয় কাছাকাছি হিসাবে বলা হয়েছে, না হয় সনদের দিক দিয়ে সেসব হাদীস ধর্তব্য নয়।

ইমাম কুরতুবী বলেন : স্বপ্ন নবুয়তের অংশ হওয়ার তাৎপর্য এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে স্বপ্নে এমন বিষয় দেখে, যা তার সাধ্যাতীত। উদাহরণত, কেউ দেখে যে সে আকাশে উড়ছে। অথবা অদৃশ্য জগতের এমন- কোন বিষয় দেখে, যার জ্ঞান অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। অতএব এরূপ স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও প্রেরণা

ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না, যা প্রকৃতপক্ষে নবুয়তের বৈশিষ্ট্য। তাই স্বপ্নকে নবুয়তের অংশ স্থির করা হয়েছে।

কাদিয়ানী দাজ্জালের একটি বিভ্রান্তি খণ্ডন ঃ এ সম্পর্কে কিছু সংখ্যক লোক একটি অভিনব বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। তারা বলে ঃ নবুয়তের অংশ যখন দুনিয়াতে অবশিষ্ট ও প্রচলিত আছে, তখন নবুয়তও অবশিষ্ট ও প্রচলিত রয়েছে। অথচ এটা কোরআনের অকাট্য আয়াত ও অসংখ্য সহীহ্ হাদীসের পরিপন্থী এবং সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের খতমে নবুয়ত সম্পর্কিত সর্বসম্মত বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা এ সহজ সত্যটি বুঝতে পারল না যে, কোন বস্তুর একটি অংশ বিদ্যমান থাকলে বস্তুটি বিদ্যমান থাকা জরুরী হয়ে পড়ে না। যদি কোন ব্যক্তির একটি নখ অথবা একটি চুল কোথাও বিদ্যমান থাকে, তবে কেউ একথা বলতে পারে না যে, এখানে ঐ ব্যক্তি বিদ্যমান আছে। মেশিনের অনেক কলকব্জার মধ্য থেকে কোন একটি কলকব্জা অথবা একটি স্ক্রু যদি কারও কাছে থাকে এবং সে দাবী করে বসে যে, তার কাছে অমুক মেশিনটি আছে, তবে বিশ্ববাসী তাকে হয় মিথ্যাবাদী, না হয় আস্ত আহাম্মক বলতে বাধ্য হবে।

হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সত্য স্বপ্ন অবশ্যই নবুয়তের অংশ কিন্তু নবুয়ত নয়। নবুয়ত তো আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে।

সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ لم يبق من النبوة الا المبشرات অর্থাৎ ভবিষ্যতে 'মুবাশ্‌শিরাত' ব্যতীত নবুয়তের কোন অংশ বাকী থাকবে না। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ 'মুবাশ্‌শিরাত' বলতে কি বোঝায়? উত্তর হল ঃ সত্য স্বপ্ন। এতে প্রমাণিত হয় যে, নবুয়ত কোন প্রকারে অথবা কোন আকারেই অবশিষ্ট নেই। শুধুমাত্র এর একটি ক্ষুদ্রতম অংশ অবশিষ্ট আছে যাকে মুবাশ্‌শিরাত অথবা সত্য স্বপ্ন বলা হয়।

কোন সময় কাফির ও ফাসিক ব্যক্তির স্বপ্নও সত্য হতে পারে ঃ মাঝে মাঝে পাপাচারী, এমন কি কাফির ব্যক্তিও সত্য স্বপ্ন দেখতে পারে। একথা কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং অভিজ্ঞতায় জানা। সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ (আ)-এর দুজন কারা-সঙ্গীর স্বপ্ন সত্য হওয়া এবং মিসর-সম্রাটের স্বপ্ন ও তা সত্য হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে। অথচ তারা সবাই ছিল অমুসলমান। হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাব সম্পর্কে পারস্য সম্রাটের স্বপ্নের কথা বর্ণিত আছে, যা সত্যে পরিণত হয়েছে। অথচ পারস্য সম্রাট মুসলমান ছিলেন না। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ফুফু আতেকা কাফির থাকা অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে সত্য স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ ছাড়া কাফির বাদশাহ্ বখতে নসরের স্বপ্ন সত্য ছিল, যার ব্যাখ্যা হযরত দানিয়াল (আ) দিয়েছেন।

এতে বোঝা যায় যে, সত্য স্বপ্ন দেখা এবং তদনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া—এতটুকু বিষয়ই কারও সৎ, ধার্মিক এমনকি মুসলমান হওয়ারও প্রমাণ নয়। তবে এটা ঠিক যে, সৎ ও সাধু ব্যক্তিদের স্বপ্ন সাধারণত সত্য হবে—এটাই আল্লাহ্‌র সাধারণ রীতি। ফাসিক ও পাপাচারীদের সাধারণত মনের সংলাপ ও শয়তানী প্ররোচনা ধরনের মিথ্যা স্বপ্ন হয়ে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে এর বিপরীতও হওয়া সম্ভব।

মোট কথা, সত্য স্বপ্ন সাধারণ মুসলমানদের জন্য হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সুসংবাদ কিংবা হুঁশিয়ারির চাইতে অধিক মর্যাদা রাখে না। এটা স্বয়ং তাদের জন্য কোন ব্যাপারে প্রমাণরূপে গণ্য নয় এবং অন্যের জন্যও নয়। কোন কোন অজ্ঞ লোক এ ধরনের স্বপ্ন দেখে নানা রকম কুমন্ত্রণায় লিপ্ত হয়। কেউ একে নিজের ওলীত্বের লক্ষণ মনে করতে থাকে এবং কেউ স্বপ্নলব্ধ বিষয়াদিকে শরীয়তের নির্দেশের মর্যাদা দিতে থাকে। এসব বিষয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন; বিশেষত যখন একথাও জানা হয়ে গেছে যে, সত্য স্বপ্নের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে প্রবৃত্তিগত অথবা শয়তানী অথবা উভয় প্রকার ধ্যান-ধারণার মিশ্রণ আসতে পারে।

স্বপ্ন প্রত্যেকের কাছে বর্ণনা করা ঠিক নয় : মাস'আলা : قَالَ يَا بُنَيَّ আয়াতে ইয়াকুব (আ) ইউসুফ (আ)-কে স্বীয় স্বপ্ন ভাইদের কাছে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহানুভূতিশীল নয়—এরূপ লোকের কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করা উচিত নয়। এছাড়া স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে পারদর্শী নয়—এমন ব্যক্তির কাছেও স্বপ্ন ব্যক্ত করা সঙ্গত নয়।

তিরমিযীর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : সত্য স্বপ্ন নবুয়তের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। কারও কাছে বর্ণনা না করা পর্যন্ত স্বপ্ন ঝুলন্ত থাকে। যখন বর্ণনা করা হয় এবং শ্রোতা কোন ব্যাখ্যা দেয়, তখন ব্যাখ্যার অনুরূপ বাস্তবে প্রতিফলিত হয়ে যায়। তাই এমন ব্যক্তি ছাড়া স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করা উচিত নয়, যে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান অথবা কমপক্ষে বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী নয়।

তিরমিযী ও ইবনে মাজার হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : স্বপ্ন তিন প্রকার। এক. আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুসংবাদ, দুই. প্রবৃত্তিগত চিন্তাভাবনা এবং তিন. শয়তানী কুমন্ত্রণা। অতএব যদি কেউ স্বপ্ন দেখে এবং তা তার কাছে ভাল লাগে, তবে ইচ্ছা করলে অন্যের কাছে বর্ণনা করতে পারে। পক্ষান্তরে যদি খারাপ কিছু দেখে, তবে অন্যের কাছে বর্ণনা করবে না এবং গাত্রোত্থান করে নামায পড়বে। মুসলিমের হাদীসে আরও বলা হয়েছে : খারাপ স্বপ্ন দেখলে বাম দিকে তিন বার ফুঁ মারবে, আল্লাহ্র কাছে এর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং কারও কাছে উল্লেখ করবে না। এরূপ করলে এ স্বপ্ন দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন ক্ষতি হবে না। কারণ এই যে, কোন কোন স্বপ্ন শয়তানী ওয়াসওয়াসা হয়ে থাকে। উপরোক্ত নিয়ম পালন করলে শয়তানী প্রভাব দূর হয়ে যাবে। সত্য স্বপ্ন হলে এ নিয়মের মাধ্যমে স্বপ্নের অনিষ্ট দূর হয়ে যাবে বলেও আশা করা যায়।

মাস'আলা : স্বপ্ন যে ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল থাকে, এর অর্থ তফসীরে মাযহারীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন কোন 'তকদীর' (ভাগ্য) অকাট্য হয় না বরং ঝুলন্ত থাকে। অর্থাৎ অমুক কাজ হয়ে গেলে এ বিপদ টলে যাবে, নতুবা বিপদ এসে যাবে। একে বলা হয় 'কাযায়ে-মুয়াল্লাক' অর্থাৎ ঝুলন্ত ফয়সালা। এমতাবস্থায় মন্দ

ব্যাখ্যা দিলে ব্যাপার মন্দ এবং ভাল ব্যাখ্যা দিলে ভাল হয়ে যায়। এ জন্যই তিরমিযীর উল্লিখিত হাদীসে বুদ্ধিমান নয় কিংবা হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহানুভূতিশীল নয়—এমন লোকের কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এরূপ কারণও হতে পারে যে, স্বপ্নের খারাপ ব্যাখ্যা শুনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, এখন তার উপর বিপদ পতিত হবে। হাদীসে আল্লাহ্‌র উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে,

انا عند ظن عبدى بى —অর্থাৎ 'বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করে, আমি তার জন্য তদ্রূপই হয়ে যাব।' আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিপদ আসার ব্যাপারে যখন সে দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্‌র এ রীতি অনুযায়ী তার উপর বিপদ আসা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

মাস'আলা ঃ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কষ্টদায়ক ও বিপজ্জনক স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করতে নেই। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এ নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র দয়া ও সহানুভূতির উপর ভিত্তিশীল —আইনগত হারাম নয়। সহীহ্ হাদীসসমূহে বলা হয়েছে, ওহদ যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার তরবারি 'যুলফাকার' ভেঙ্গে গেছে এবং আরও কিছু গাভীকে জবাই হতে দেখেছি। এর ব্যাখ্যা ছিল হযরত হামযা (রা)-সহ অনেক মুসলমানের শাহাদত বরণ। এটা একটা আশু মারাত্মক বিপর্যয় সম্পর্কিত ইঙ্গিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহাবীদের কাছে এ স্বপ্ন বর্ণনা করেছিলেন।—(কুরতুবী)

মাস'আলা ঃ এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, মুসলমানকে অপরের অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য অপরের কোন মন্দ অভ্যাস অথবা কুনিয়ত প্রকাশ করা জায়েয। এটা গীবত তথা অসাক্ষাতে পরনিন্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। উদাহরণত কেউ জানতে পারল যে, যায়েদ বকরের গৃহে চুরি করার অথবা তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। এমতাবস্থায় বকরকে অবহিত করা তার কর্তব্য। এটা গীবতের মধ্যে গণ্য হবে না। আয়াতে ইয়াকুব (আ) ইউসুফ (আ)-কে বলে দিয়েছেন যে, ভাইদের পক্ষ থেকে তার প্রাণ নাশের আশংকা রয়েছে।

মাস'আলা ঃ এ আয়াত থেকেই আরও জানা যায় যে, যদি একজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও মাহাত্ম্যের কথা শুনে কারও মনে হিংসা জাগরিত হওয়ার এবং ক্ষতি সাধনের চেষ্টায় মেতে উঠার আশংকা থাকে, তবে তার সামনে স্বীয় মাহাত্ম্য, ধনসম্পদ ও মান-সম্মানের কথা উল্লেখ করবে না। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

স্বীয় অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে হলে তাকে গোপন রাখ। এটা লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে। কেননা, জগতে প্রত্যেক সুখী ব্যক্তির প্রতি হিংসা পোষণ করা হয়।

মাস'আলা ঃ এ আয়াত এবং পরবর্তী যেসব আয়াতে ইউসুফ (আ)-কে হত্যা করা অথবা কূপে নিক্ষেপ করার পরামর্শ ও বাস্তবায়নের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, এগুলো থেকে আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে যে, ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা আল্লাহ্‌র নবী ও পয়গম্বর ছিল না। পয়গম্বর হলে ইউসুফ (আ)-কে হত্যার পরামর্শ, তাঁকে ধ্বংস করার অপকৌশল এবং

পিতার অবাধ্যতার মত জঘন্য কাজ তাদের দ্বারা সম্ভবপর হত না। কেননা, পয়গম্বরদের জন্য যাবতীয় গোনাহ্ থেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ হওয়া জরুরী। অতএব তাবারী গ্রন্থে তাদেরকে যে পয়গম্বর বলা হয়েছে, তা শুদ্ধ নয়। —(কুরতুবী)

ষষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে কতিপয় নিয়ামত দানের ওয়াদা করেছেন। প্রথম—

كَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ—অর্থাৎ আল্লাহ্ স্বীয় নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজির জন্য আপনাকে মনোনীত করবেন। মিসর দেশে রাজ্য, সম্মান ও ধনসম্পদ লাভের মাধ্যমে এ ওয়াদা পূর্ণতা লাভ করেছে। দ্বিতীয়, وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ

এখানে اَحَادِيْث বলে মানুষের স্বপ্ন বোঝান হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। এতে আরও জানা গেল যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র, যা আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন ব্যক্তিকে দান করেন। সবাই এর যোগ্য নয়।

মাস'আলা ঃ তফসীরে কুরতুবীতে শাদ্দাদ ইবনুল-হাদের উক্তি বর্ণিত আছে যে, ইউসুফ (আ)-এর এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা চল্লিশ বৎসর পর প্রকাশ পায়। এতে বোঝা যায় যে, তাৎক্ষণিকভাবে স্বপ্ন ফলে যাওয়া জরুরী নয়।

তৃতীয় ওয়াদা وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ—অর্থাৎ আল্লাহ্ আপনার প্রতি স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করবেন। এতে নবুয়ত দানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং পরবর্তী বাক্য সমূহেও এর প্রতি ইঙ্গিত আছে। كَمَا اَتَمَّهَا عَلٰى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ

وَاِسْحٰقَ—অর্থাৎ যেভাবে আমি স্বীয় নবুয়তের নিয়ামত আপনার পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি ইতিপূর্বে পূর্ণ করেছি। এতে এদিকেও ইশারা হয়ে গেছে যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত শাস্ত্র যেমন ইউসুফ (আ)-কে দান করা হয়েছিল, তেমনি ভাবে ইবরাহীম ও ইসহাক (আ)-কেও শেখানো হয়েছিল।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ—অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানবান, সুবিজ্ঞ। কাউকে কোন শাস্ত্র শেখানো তাঁর পক্ষে কঠিন নয় এবং তিনি প্রত্যেককেই তা শেখান না। বরং বিজ্ঞতা অনুযায়ী বেছে বেছে কোন কোন ব্যক্তিকে এ কৌশল শিখিয়ে দেন।

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ ۝ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ

وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۖ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ

مُبِينٍ ۝ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ

وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا

يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ

كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ

وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ۝ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ

لَحَافِظُونَ ۝ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ

الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ۝ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ

عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ ۝ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي

غَيَابَتِ الْجُبِّ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا

يَشْعُرُونَ ۝ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۝ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا

ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ۖ وَمَا أَنْتَ

بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۝ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ

عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۝ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ ۖ

قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۚ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ

الزَّاهِدِينَ ۝

পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য এ কাহিনী জিজ্ঞেস করেছিল, তারাও এতে নবুয়তের প্রমাণ পেতে পারে]। সে সময়টি স্মর্তব্য, যখন তারা (বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা পারস্পরিক পরামর্শ হিসেবে) বলাবলি করল : (একি ব্যাপার যে) ইউসুফ ও তার (সহোদর) ভাই (বেনিয়ামিন) আমাদের পিতার অধিক প্রিয় অথচ (অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে তারা উভয়েই তাঁর সেবাযত্নের যোগ্যও নয় এবং) আমরা একটি ভারী দল, (আমরা আমাদের শক্তি ও সংখ্যাধিক্যের কারণে সর্বপ্রযত্নে তাঁর সেবাযত্নও করি)। নিশ্চয় আমাদের পিতা সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত আছেন। (কাজেই ইউসুফ যেহেতু উভয়ের মধ্যে অধিক প্রিয়, তাই কৌশলে তাকে পিতার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এর উপায় এই যে) হয় ইউসুফকে হত্যা করে ফেল, না হয় তাকে কোন (দূর-দূরান্ত) দেশে রেখে এস। এতে করে (আবার) তোমাদের পিতার দৃষ্টি একান্তভাবে তোমাদের প্রতি নিবদ্ধ হয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত তোমরাই তাঁর কাছে যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তাদের মধ্যেই একজন বলল : ইউসুফকে হত্যা করো না। (এটা জঘন্য অপরাধ)। এবং তাকে কোন অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে দাও, (যাতে ডুবে যাওয়ার মত পানি না থাকে। নতুবা তাও এক প্রকার হত্যাই। তবে জনবসতি ও লোক চলাচলের পথ দূরে না থাকা চাই) যাতে কোন পথিক তাকে বের করে নিয়ে যায়। যদি তোমরা একাজ করতেই চাও, (তবে এভাবে কর। এতে সবাই একমত হয়ে গেল এবং) সবাই (মিলে পিতাকে) বলল : আব্বাজান, এর কারণ কি যে, ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না (এবং কখনও কোথাও আমাদের সাথে প্রেরণ করেন না) অথচ আমরা (মনেপ্রাণে) তার হিতাকাঙ্ক্ষী? (এরূপ করা সঙ্গত নয় বরং) আপনি তাকে আগামীকাল আমাদের সাথে (জঙ্গলে) প্রেরণ করুন, যাতে সে খায় ও খেলাধুলা করে। আমরা তার পুরোপুরি দেখাশোনা করব। ইয়াকুব (আ) বললেন : (তোমাদের সাথে প্রেরণ করতে দুটি বিষয় আমাকে বাধা দান করে : এক, চিন্তা-ভাবনা এবং দুই, বিপদাশংকা। ভাবনা এই যে) তোমরা তাকে (আমার দৃষ্টির সামনে থেকে) নিয়ে যাবে—এটা আমার জন্য ভাবনার কারণ এবং (বিপদাশংকা এই যে) আমার আশংকা হয় যে, তাকে ব্যাঘ্র খেয়ে ফেলবে এবং তোমরা (নিজ কাজকর্মে ব্যস্ত থাকার কারণে) তার দিক থেকে গাফিল থাকবে (কেননা ঐ জঙ্গলে অনেক ব্যাঘ্র ছিল)। তারা বলল : যদি তাকে ব্যাঘ্র খেয়ে ফেলে এবং আমরা দলকে দল (বিদ্যমান) থাকি, তবে আমরা সম্পূর্ণই অকর্মন্য প্রমাণিত হব। [মোটকথা তারা বলেকয়ে ইউসুফকে ইয়াকুব (আ)-এর কাছ থেকে নিয়ে চলল] যখন তাকে (সাথে করে জঙ্গলে) নিয়ে গেল এবং (পূর্ব প্রস্তাব অনুযায়ী) সবাই তাকে কোন অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে কৃতসংকল্প হল (এবং তা কার্যেও পরিণত করে ফেলল,) তখন আমি (ইউসুফের সান্ত্বনার জন্য) তার কাছে প্রত্যাদেশ করলাম যে, (তুমি চিন্তিত হয়ো না। আমি তোমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে উচ্চ পদমর্যাদায় আসীন করব। একদিন আসবে, যখন) তুমি তাদেরকে একথা ব্যক্ত করবে এবং তারা তোমাকে (অপ্রত্যাশিতভাবে শাহী পোশাকে দেখার কারণে) চিনবেও না। [কার্যতও তাই হয়েছিল। ইউসুফের ভ্রাতারা মিসরে গিয়েছিল এবং অবশেষে ইউসুফ তাদেরকে বলেছিলেন :

هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ —এ হচ্ছে ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা] এবং (এদিকে)

তারা সন্ধ্যায় পিতার কাছে কাঁদতে কাঁদতে পৌঁছল (পিতা যখন ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন, তখন) বলল : আব্বাজান, আমরা সবাই তো পরস্পরে দৌড় প্রতিযোগিতায় ব্যাপৃত হলাম এবং ইউসুফকে (এমন জায়গায়, যেখানে ব্যাঘ্র থাকার ধারণা ছিল না) আসবাবপত্রের কাছে ছেড়ে দিলাম। অতঃপর (ঘটনাচক্রে) একটি ব্যাঘ্র (আসল এবং) তাকে খেয়ে ফেলল। আর আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী। [যখন তারা ইয়াকুব (আ)-এর কাছে আসছিল, তখন] ইউসুফের জামায় কৃত্রিম রক্তও লাগিয়ে এনেছিল। (অর্থাৎ কোন জন্তুর রক্ত তাঁর জামায় মাখিয়ে নিজেদের বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করল)। ইয়াকুব (আ) দেখলেন যে, জামার কোন অংশ ছিন্ন ছিল না। (তাবারী কর্তৃক ইবনে-আব্বাস থেকে বর্ণিত) তখন বললেন : (ইউসুফকে ব্যাঘ্র কিছুতেই খায়নি) বরং তোমরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একথা বলছ। অতএব আমি সবরই করব, যাতে অভিযোগের লেশমাত্রও থাকবে না। (যে সবরে বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই, তাই 'সবরে জামীল'—এ তফসীর বিশুদ্ধ হাদীসের বরাত দিয়ে তাবারী বর্ণনা করেছেন)। তোমরা যা বর্ণনা করছ, তাতে আল্লাহ্ তা'আলাই সাহায্য করুন [অর্থাৎ আপাতত এ বিষয়ে আমার সবর করার সামর্থ্য হোক এবং ভবিষ্যতে তোমাদের মিথ্যার মুখোশ উন্মোচিত হোক। মোটকথা, হযরত ইয়াকুব (আ) সবর করে বসে রইলেন এবং ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা হল এই যে, ঘটনাক্রমে সেদিকে] একটি কাফেলা আগমন করল [যা মিসর যাচ্ছিল। তারা নিজেদের লোককে পানি আনার জন্য (কূপে) প্রেরণ করল। সে বালতি ফেলল। ইউসুফ বালতি ধরে ফেললেন। বালতি উপরে আনার পর ইউসুফকে দেখে আনন্দিত হয়ে] সে বলতে লাগল : কি আনন্দের বিষয়! এ তো চমৎকার এক কিশোর বের হয়ে এসেছে। (কাফিলার লোকেরা জানতে পেরে তারাও আহ্লাদে আটখানা) তারা তাকে (পণ্য) দ্রব্য সাব্যস্ত করে (এ ধারণার বশবর্তী হয়ে) গোপন করে ফেলল (যেন কোন দাবীদার বের না হয় এবং একে মিসরে নিয়ে উচ্চমূল্য বিক্রয় করা যায়) তাদের সব কার্যক্রম আল্লাহ্ তা'আলার জানা ছিল। [এদিকে ভ্রাতারাও আশেপাশে ঘোরাফিরা করছিল এবং কূপের ভেতরে ইউসুফের দেখাশোনা করত। তাকে কিছু খাদ্যও তারা পৌঁছাত। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ইউসুফ না মরুক, কেউ এসে তাকে অন্য দেশে নিয়ে যাক এবং ইয়াকুব (আ) যেন ঘুণাক্ষরেও তা জানতে না পারেন। সেদিন ইউসুফকে কূপের ভেতরে না দেখে এবং নিকটেই একটি কাফেলাকে অবস্থান করতে দেখে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে উপস্থিত হল, তারা ইউসুফের সন্ধান পেয়ে কাফেলার লোকদেরকে বলল : ছেলেটি আমাদের ক্রীতদাস। সে পলায়ন করে এসেছে। এখন আমরা তাকে রাখতে চাই না]। এবং (এ কথা বলে) তাকে খুবই কম মূল্যে (কাফিলার লোকদের কাছে) বিক্রি করে দিল, অর্থাৎ গুণা-গুনতি কয়েকটি দিরহামের পরিবর্তে এবং (কারণ ছিল এই যে,) তারা তো তার সঠিক মূল্যায়নকারী ছিলই না (যে, উৎকৃষ্ট মাল মনে করে উচ্চমূল্যে বিক্রি করত। আসলে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, এ সূরায় বর্ণিত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীকে শুধুমাত্র একটি কাহিনীর নিরিখে দেখা উচিত নয় বরং এতে জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির বড় বড় নিদর্শন ও নির্দেশাবলী রয়েছে।

এর উদ্দেশ্য এরূপও হতে পারে যে, যেসব ইহুদী পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা)-কে এ কাহিনী জিজ্ঞেস করেছিল, তাদের জন্য এতে বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যে সময় মক্কায় অবস্থানরত ছিলেন এবং তাঁর সংবাদ মদীনায় পৌঁছেছিল, তখন মদীনায় ইহুদীরা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য একদল লোক মক্কায় প্রেরণ করেছিল। তারা অস্পষ্ট ভঙ্গিতে এরূপ প্রশ্ন করেছিল যে, আপনি সত্য নবী হলে বলুন, কোন্ পয়গম্বরের এক পুত্রকে সিরিয়া থেকে মিসরে স্থানান্তর করা হয় এবং তার বিরহব্যথায় ক্রন্দন করতে করতে পিতা অন্ধ হয়ে যায় ?

জিজ্ঞাসার জন্য এ ঘটনাটি মনোনীত করার পেছনে কারণ ছিল এই যে, এ ঘটনা সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ ছিল না এবং মক্কার কেউ এ সম্পর্কে জ্ঞাতও ছিল না। তখন মক্কায় কিতাবী সম্প্রদায়ের কেউ বাস করত না যে, তওরাত ও ইনজীলের বরাতে তার কাছ থেকে এ ঘটনার কোন অংশবিশেষ জানা যেত। বলা বাহুল্য, তাদের এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্ণ সূরা ইউসুফ অবতীর্ণ হয়। এতে হযরত ইয়াকুব ও ইউসুফ (আ)-এর সম্পূর্ণ কাহিনী এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তওরাত ও ইনজীলেও তেমনটি হয়নি। তাই এর বর্ণনা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি প্রকাশ্য মু'জিযা।

আলোচ্য আয়াতের এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইহুদীদের প্রশ্ন বাদ দিলেও স্বয়ং এ কাহিনীতে এমন এমন বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে, যেগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলার অপার মহিমার নিদর্শন এবং অনুসন্ধানকারীদের জন্য বড় বড় নির্দেশ বিধান ও মাস'আলা বিদ্যমান রয়েছে। যে বালককে ভ্রাতারা ধ্বংসের গর্তে নিক্ষেপ করেছিল, আল্লাহ্র অপরিসীম শক্তি তাকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছে, কিভাবে তার হিফাযত হয়েছে! এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশেষ বান্দাদেরকে স্বীয় নির্দেশাবলী পালনের কেমন গভীর আগ্রহ দান করে থাকেন! যৌবনাবস্থায় অবাধ ভোগের চমৎকার সুযোগ হাতে আসা সত্ত্বেও ইউসুফ (আ) আল্লাহ্র ভয়ে প্রবৃত্তিকে কিভাবে পরাভূত করে অক্ষত অবস্থায় এ বিপদের কবল থেকে বের হয়ে আসেন! আরও জানা যায় যে, যে ব্যক্তি সাধুতা ও আল্লাহ্ভীতির পথে চলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শত্রুদের বিপরীতে কিরূপ ইয্যত দান করেন এবং শত্রুদেরকে কিভাবে তার পদতলে লুটিয়ে দেন। এগুলোই হচ্ছে এ কাহিনীর শিক্ষা এবং আল্লাহ্র শক্তির মহান নিদর্শন। চিন্তা করলেই এগুলো বোঝা যায়। —(কুরতুবী, মাযহারী)

আলোচ্য আয়াতে ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইউসুফ (আ) সহ হযরত ইয়াকুব (আ)-এর বারজন পুত্র সন্তান ছিল। তাদের প্রত্যেকেরই সন্তান-সন্ততি হয় এবং বংশ বিস্তার লাভ করে। ইয়াকুব (আ)-এর উপাধি ছিল 'ইসরাঈল'। তাই বারটি পরিবার সবাই 'বনী ইসরাঈল' নামে খ্যাত হয়।

বার পুত্রের মধ্যে দশজন জ্যেষ্ঠপুত্র ইয়াকুব (আ)-এর প্রথমা স্ত্রী লাইয়্যা বিনতে লাইয়্যানের গর্ভে জন্মলাভ করে। তাঁর মৃত্যুর পর ইয়াকুব (আ) লাইয়্যার ভগিনী রাহীলকে বিবাহ করেন। রাহীলের গর্ভে দু'পুত্র ইউসুফ ও বেনিয়ামিন জন্মগ্রহণ করেন। তাই ইউসুফ (আ)-এর একমাত্র সহোদর ভাই ছিলেন বেনিয়ামিন এবং অবশিষ্ট দশজন বৈমাত্রেয় ভাই। ইউসুফ জননী রাহীলও বেনিয়ামিনের জন্মের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন।—(কুরতুবী)

দ্বিতীয় আয়াত থেকে ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী শুরু হয়েছে। ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা পিতা ইয়াকুব (আ)-কে দেখল যে, তিনি ইউসুফের প্রতি অসাধারণ মহব্বত রাখেন। ফলে তাদের মনে হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এটাও সম্ভবপর যে, তারা কোনরূপে ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্নের বিষয়ও অবগত হয়েছিল, যদ্দরুন তারা ইউসুফ (আ)-এর বিরাট মাহাত্ম্যের কথা টের পেয়ে তাঁর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল। তারা পরস্পর বলাবলি করল ঃ আমরা পিতাকে দেখি যে, তিনি আমাদের তুলনায় ইউসুফ ও তার অনুজ বেনি-য়ামিনকে অধিক ভালবাসেন। অথচ আমরা দশ জন এবং তাদের জ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে গৃহের কাজকর্ম করতে সক্ষম। তারা উভয়েই ছোট্ট বালক বিধায় গৃহস্থালীর কাজ করার শক্তি রাখে না। আমাদের পিতার উচিত হল এ বিষয় অনুধাবন করা এবং আমাদেরকে অধিক মহব্বত করা। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে অবিচার করে যাচ্ছেন। তাই তোমরা হয় ইউ-সুফকে হত্যা কর, না হয় এমন দূরদেশে নির্বাসিত কর, যেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে না পারে।

এ আয়াতে ভ্রাতারা নিজেদের সম্পর্কে عُصْبَةٌ শব্দ ব্যবহার করেছে। আরবী ভাষায় পাঁচ থেকে দশজনের একটি দলের অর্থে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়। পিতা সম্পর্কে তারা বলেছে ঃ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ—এতে ضلال শব্দের আভিধানিক অর্থ পথভ্রষ্টতা। কিন্তু এখানে ধর্মীয় পথভ্রষ্টতা বোঝানো হয়নি। নতুবা এরূপ ধারণা করার কারণে তারা সবাই কাফির হয়ে যেত। কেননা, ইয়াকুব (আ) ছিলেন আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত পয়গম্বর। তাঁর সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করা নিশ্চিত কুফর।

ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাদের সম্পর্কে স্বয়ং কোরআন পাকে উল্লিখিত রয়েছে যে, পরবর্তীকালে তারা দোষ স্বীকার করে পিতার কাছে মাগফিরাতের দোয়া প্রার্থনা করেছিল। পিতা তাদের এ প্রার্থনা কবুল করেছিলেন। এতে বাহ্যত বোঝা যায় যে, তাদের অপরাধ ক্ষমা করা হয়েছে। এগুলো তখনই সম্ভবপর, যখন তাদের মুসলমান ধরা হয়। নতুবা কাফিরের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা বৈধ নয়। এ কারণেই ভ্রাতাদের পয়গম্বর হওয়ার ব্যাপারে তো আলিমরা মতভেদ করেছেন কিন্তু মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। এতে বোঝা যায় যে, এখানে ضلال শব্দটি শুধু এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে, তিনি সন্তানদের প্রতি সমতাপূর্ণ ব্যবহার করেন না।

তৃতীয় আয়াতে ভাইদের পরামর্শ বর্ণিত হয়েছে। কেউ মত প্রকাশ করল যে, ইউসুফকে হত্যা করা হোক। কেউ বলল : তাকে কোন অন্ধকূপের গভীরে নিক্ষেপ করা হোক—যাতে মাঝখান থেকে এ কণ্টক দূর হয়ে যায় এবং পিতার সমগ্র মনোযোগ তোমাদের প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে যায়। হত্যা কিংবা কূপে নিক্ষেপ করার কারণে যে গোনাহ্ হবে, তার প্রতিকার এই যে, পরবর্তীকালে তওবা করে তোমরা সাধু হয়ে যেতে পারবে। আয়াতের وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ বাক্যের এক অর্থ তাই বর্ণনা করা হয়েছে।

এ ছাড়া এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফকে হত্যা করার পর তোমাদের অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। কেননা, পিতার মনোযোগের কেন্দ্র শেষ হয়ে যাবে। অথবা অর্থ এই যে, হত্যার পর পিতামাতার কাছে দোষ স্বীকার করে তোমরা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে।

ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা যে পয়গম্বর ছিল না, উপরোক্ত পরামর্শ তার প্রমাণ। কেননা, এ ঘটনায় তারা অনেকগুলো কবিরা গোনাহ্ করেছে। একজন নিরপরাধকে হত্যার সংকল্প, পিতার অবাধ্যতা ও তাঁকে কষ্ট প্রদান, চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ ও মিথ্যা চক্রান্ত ইত্যাদি। বিজ্ঞ আলিমগণের বিশ্বাস অনুযায়ী পয়গম্বরগণ দ্বারা নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও এরূপ গোনাহ্ হতে পারে না।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে : ভ্রাতাদের মধ্যেই একজন সমস্ত কথাবার্তা শুনে বলল : ইউসুফকে হত্যা করো না। যদি কিছু করতেই হয় তবে কূপের গভীরে এমন জায়গায় নিক্ষেপ কর, যেখানে সে জীবিত থাকে এবং পথিক যখন কূপে আসে, তখন তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে একদিকে তোমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে এবং অপরদিকে তাকে নিয়ে তোমাদেরকে কোন দূর দেশে যেতে হবে না। কোন কাফিলা আসবে, তারা স্বয়ং তাকে সাথে করে দূর-দূরান্তে পৌঁছে দেবে।

এ অভিমত প্রকাশকারী ছিল তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুদা। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, সবার মধ্যে রুবীল ছিল জ্যেষ্ঠ। সে-ই এ অভিমত দিয়েছিল। এ ব্যক্তি সম্পর্কেই পরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিসরে যখন ইউসুফ (আ)-এর ছোট ভাই বেনিয়ামিনকে আটক করা হয়, তখন সে বলেছিল : আমি ফিরে গিয়ে পিতাকে কিভাবে মুখ দেখাব? তাই আমি কেনানে ফিরে যাব না।

আয়াতে غَيَابَةِ الْجُبِّ বলা হয়েছে; যা কোন বস্তুকে ঢেকে ফেলে দৃষ্টির আড়াল করে দেয়, তাকেই غيابة বলা হয়। এ কারণেই কবরকেও غيابة বলা হয়। যে কূপের পাড় তৈরী করা হয় না, তাকে جب বলা হয়।

يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ এখানে التقاط শব্দটি لقطة থেকে উদ্ভূত। যে পড়ে থাকা বস্তু অন্বেষণ ব্যতিরেকেই কেউ পেয়ে ফেলে, তাকে لقطة বলা হয়। অ-প্রাণী-

পতিত বস্তু হলে لقطة এবং প্রাণী/মানুষ হলে ফিকাহবিদদের পরিভাষায় لقيط বলা হয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও অপরিপক্ক বালক হলেও কুড়িয়ে পাওয়া মানুষকে لقيط বলা হবে। কুরতুবী এ শব্দ দ্বারাই প্রমাণ করেছেন যে, ইউসুফ (আ)-কে যখন কূপে নিক্ষেপ করা হয়, তিনি তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ছিলেন। এ ছাড়া ইয়াকুব (আ)-এর এরূপ বলাও তাঁর বালক হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, আমার আশংকা হয় বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে। কেননা, বাঘে খেয়ে ফেলা বাচ্চাদের বেলায়ই কল্পনা করা যায়। ইবনে জারীর ও ইবনে আবী শায়বার রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, তখন ইউসুফ (আ)-এর বয়স ছিল সাত বছর।—(মাযহারী)

ইমাম কুরতুবী এ স্থলে لقطة ও لقيط এর বিস্তারিত বিধানাবলী বর্ণনা করেছেন। এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই। তবে এ সম্পর্কে একটি মৌলিক বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার যে, ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের জান ও মালের হিফাযত, পথঘাট ও সড়ক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ ইত্যাদি একমাত্র সরকারী বিভাগসমূহের দায়িত্ব নয়; প্রত্যেক ব্যক্তির কাঁধে এ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। পথেঘাটে ও সড়কে দাঁড়িয়ে অথবা নিজের কোন আসবাবপত্র ফেলে দিয়ে যারা পথিকদের চলার পথে অসুবিধা সৃষ্টি করে, তাদের সম্পর্কে হাদীসে কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে: যে ব্যক্তি মুসলমানদের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তার জিহাদও গ্রহণীয় নয়। এমনিভাবে রাস্তায় কোন বস্তু পড়ে থাকার কারণে যদি অপরের কষ্ট পাওয়ার আশংকা থাকে, যেমন কাঁটা, কাঁচের টুকরা, পাথর ইত্যাদি, তবে এগুলোকে সরানো শুধু ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষেরই দায়িত্ব নয় বরং প্রত্যেক মুসলমানকেই এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং যারা এ কাজ করে তাদের জন্য অনেক প্রতিদান ও সওয়াবের আশীর্বাদ করা হয়েছে।

এ মূলনীতি অনুযায়ীই কারও হারানো মাল পেলে তা আত্মসাৎ না করাই শুধু তার দায়িত্ব নয় বরং এটাও তার দায়িত্ব যে, মালটি উঠিয়ে সযত্নে রেখে দেবে এবং ঘোষণা করে মালিকের সন্ধান নেবে। সন্ধান পাওয়া গেলে এবং লক্ষণাদি বর্ণনার পর যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এ মাল তারই, তবে তাকে প্রত্যর্পণ করবে। পক্ষান্তরে ঘোষণা ও খোঁজাখুঁজি সত্ত্বেও যদি মালিক না পাওয়া যায় এবং মালের গুরুত্ব অনুযায়ী অনুমিত হয় যে, মালিক আর তালাশ করবে না, তবে প্রাপক নিজে দরিদ্র হলে নিজেই তা ভোগ করতে পারবে। অন্যথায় ফকির-মিসকীনকে দান করে দেবে। উভয় অবস্থায় সেটি প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে দান রূপে গণ্য করা হবে। দানের সওয়াব সে-ই পাবে, যেন পরকালের হিসাবে সেটি তার নামেই জমা করে দেওয়া হবে।

এগুলো হচ্ছে জনসেবা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মূলনীতি। এগুলোর দায়িত্ব মুসলিম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আফসোস! মুসলমানরা নিজেদের দীনকে বুঝলে এবং তা যথাযথ পালন করলে বিশ্ববাসীর চোখ খুলে যেত। তারা দেখত যে, সরকারের বড় বড় বিভাগ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও যে কাজ সম্পন্ন করতে পারে না, তা অনায়াসে কিভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়!

পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ভাইয়েরা পিতার কাছে এরূপ ভাষায় আবেদন পেশ করল ঃ আব্বাজান! ব্যাপার কি যে, আপনি ইউসুফ সম্পর্কে আমাদের প্রতি আস্থা রাখেন না অথচ আমরা তার পুরোপুরি হিতাকাঙ্ক্ষী। আগামীকাল আপনি তাকে আমাদের সাথে প্রমোদ ভ্রমণে পাঠিয়ে দিন, যাতে সে-ও স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলা করতে পারে। আমরা সবাই তার পুরোপুরি দেখাশোনা করব।

তাদের এ আবেদন থেকেই বোঝা যায় যে, তারা ইতিপূর্বেও এ ধরনের আবেদন কোন সময়ে করেছিল, যা পিতা অগ্রাহ্য করেছিলেন। তাই এবার কিঞ্চিৎ জোর ও পীড়াপীড়ি সহকারে পিতাকে নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ আয়াতে হযরত ইয়াকুব (আ)-এর কাছে প্রমোদ-ভ্রমণ এবং স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। হযরত ইয়াকুব (আ) তাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেন নি। তিনি শুধু ইউসুফকে তাদের সাথে দিতে ইতস্তত করেছেন, যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে। এতে বোঝা গেল যে, প্রমোদ ভ্রমণ ও খেলাধুলা বিধিবদ্ধ সীমার ভেতরে নিষিদ্ধ নয় বরং সহীহ্ হাদীস থেকেও এর বৈধতা জানা যায়। তবে শর্ত এই যে, খেলাধুলায় শরীয়তের সীমালংঘন বাঞ্ছনীয় নয় এবং তাতে শরীয়তের বিধান লংঘিত হতে পারে এমন কোন কিছুর মিশ্রণও উচিত নয়।—(কুরতুবী)

ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা যখন আগামীকাল ইউসুফকে তাদের সাথে প্রমোদ ভ্রমণে প্রেরণের আবেদন করল, তখন ইয়াকুব (আ) বললেন ঃ তাকে প্রেরণ করা আমি দু'কারণে পছন্দ করি না। প্রথমত, এ নয়নের মণি আমার সামনে না থাকলে আমি শান্তি পাই না। দ্বিতীয়ত, আশংকা আছে যে, জঙ্গলে তোমাদের অসাবধানতার মুহূর্তে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলতে পারে।

বাঘে খাওয়ার আশংকা হওয়ার কারণ এই যে. কেনানে বাঘের বিস্তর প্রাদুর্ভাব ছিল। কিংবা ইয়াকুব (আ) স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি পাহাড়ের উপর আছেন। নিচে পাহাড়ের পাদদেশে ইউসুফ (আ)। হঠাৎ দশটি বাঘ এসে তাকে ঘেরাও করে ফেলে এবং আক্রমণ করতে উদ্যত হয় কিন্তু একটি বাঘই এগিয়ে এসে তাকে মুক্ত করে দেয়। অতঃপর ইউসুফ (আ) মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গা-ঢাকা দেন।

এর ব্যাখ্যা এ ভাবে প্রকাশ পায় যে. দশটি বাঘ ছিল দশজন ভাই এবং যে বাঘটি তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে, সে ছিল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুদা। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গা-ঢাকা দেওয়ার অর্থ কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এ স্বপ্নের ভিত্তিতে হযরত ইয়াকুব (আ) স্বয়ং এ ভাইদের পক্ষ থেকেই আশংকা করেছিলেন এবং তাদেরকেই বাঘ বলেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে ওদের কাছে এই কথা প্রকাশ করেন নি।—(কুরতুবী)

ভ্রাতারা ইয়াকুব (আ)-এর কথা শুনে বলল ঃ আপনার এ ভয়ভীতি অমূলক। আমাদের দশ জনের শক্তিশালী দল তার হিফাযতের জন্য বিদ্যমান রয়েছি। আমাদের সবার বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি বাঘেই তাকে খেয়ে ফেলে, তবে আমাদের অস্তিত্বই নিষ্ফল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আমাদের দ্বারা কোন কাজের আশা করা যেতে পারে?

হযরত ইয়াকুব (আ) পয়গম্বর সুলভ গাম্ভীর্যের কারণে পুত্রদের সামনে এ কথা প্রকাশ করলেন না যে, আমি স্বয়ং তোমাদের পক্ষ থেকেই আশংকা করি। কারণ, এতে প্রথমত তাদের মনোকষ্ট হত, দ্বিতীয়ত পিতার এরূপ বলার পর ভ্রাতাদের শত্রুতা আরও বেড়ে যেতে পারত। ফলে এখন ছেড়ে দিলেও অন্য কোন সময় কোন ছলছুঁতায় তাকে হত্যা করার ফিকিরে থাকত। তাই তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু ভাইদের কাছ থেকে অঙ্গীকারও নিয়ে নিলেন, যাতে ইউসুফের কোনরূপ কষ্ট না হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুবীল অথবা ইয়াহুদার হাতে বিশেষ করে তাকে সোপর্দ করে বললেন ঃ তুমি তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও অন্যান্য প্রয়োজনের ব্যাপারে দেখাশোনা করবে এবং শীঘ্র ফিরিয়ে আনবে। ভ্রাতারা পিতার সামনে ইউসুফকে কাঁধে তুলে নিল এবং পালাক্রমে সবাই উঠাতে লাগল। কিছু দূর পর্যন্ত হযরত ইয়াকুব (আ)ও তাদেরকে বিদায় দেওয়ার জন্য গেলেন।

কুরতুবী ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, তারা যখন ইয়াকুব (আ)-এর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, তখন ইউসুফ (আ) যে ভাইয়ের কাঁধে ছিলেন, সে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তখন ইউসুফ (আ) পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন কিন্তু অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে তাদের সাথে সাথে দৌড়াতে অক্ষম হয়ে অন্য একজন ভাইয়ের আশ্রয় নিলেন। সে কোনরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন না করায় তৃতীয়, চতুর্থ এমনিভাবে প্রত্যেক ভাইয়ের কাছে সাহায্য চাইলেন। কিন্তু সবাই উত্তর দিল যে, 'তুই যে এগারটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র-সূর্যকে সিজদা করতে দেখেছিস, তাদেরকে ডাক দে। তারাই তোকে সাহায্য করবে।'

কুরতুবী এর ভিত্তিতেই বলেন যে, এ থেকে জানা গেল, ভাইয়েরা কোন না কোন উপায়ে ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্নের বিষয়বস্তু অবগত হয়েছিল। সে স্বপ্নই তাদের তীব্র ক্রোধ ও কঠোর ব্যবহারের কারণ হয়েছিল।

অবশেষে ইউসুফ (আ) ইয়াহুদাকে বললেন ঃ আপনি জ্যেষ্ঠ। আপনিই আমার দুর্বলতা ও অল্পবয়স্কতা এবং পিতার মনোকষ্টের কথা চিন্তা করে দয়ার্দ্র হোন। আপনি ঐ অঙ্গীকার স্মরণ করুন, যা পিতার সাথে করেছিলেন। একথা শুনে ইয়াহুদার মনে দয়ার সঞ্চার হল এবং তাকে বলল ঃ যতক্ষণ আমি জীবিত আছি এসব ভাই তোকে কোন কষ্ট দিতে পারবে না।

ইয়াহুদার অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও ন্যায়ানুগ কাজ করার প্রেরণা জাগ্রত করে দিলেন। সে অন্যান্য ভাইকে সম্বোধন করে বলল ঃ নিরপরাধকে হত্যা করা মহাপাপ। আল্লাহ্কে ভয় কর এবং বালককে তার পিতার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চল। তবে তার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়ে নাও যে, সে পিতার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করবে না।

ভাইয়েরা উত্তর দিল ঃ আমরা জানি, তোমার উদ্দেশ্য কি। তুমি পিতার অন্তরে নিজের মর্যাদার আসন সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাও। শুনে রাখ, যদি তুমি আমাদের ইচ্ছার পথে প্রতিবন্ধক হও, তবে আমরা তোমাকেও হত্যা করব। ইয়াহুদা

দেখল যে, নয় ভাইয়ের বিপরীতে সে একা কিছুই করতে পারবে না। তাই সে বলল, তোমরা যদি এ বালককে নিপাত করতে মনস্থ করে থাক, তবে আমার কথা শোন। নিকটেই একটি প্রাচীন কূপ রয়েছে। এতে অনেক ঝোপ-জঙ্গল গজিয়েছে। সর্প, বিচ্ছু ও হরেক রকমের ইতর প্রাণী এখানে বাস করে। তোমরা তাকে কূপে ফেলে দাও। যদি কোন সর্প ইত্যাদি দংশন করে তাকে শেষ করে দেয়, তবে তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ এবং নিজ হাতে হত্যা করার দোষ থেকে তোমরা মুক্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি সে জীবিত থাকে, তবে হয়তো কোন কাফেলা এখানে আসবে এবং পানির জন্য কূপে বালতি ফেলবে। ফলে সে বের হয়ে আসবে। তারা তাকে সাথে করে অন্য কোন দেশে পৌঁছিয়ে দেবে। এমতাবস্থায়ও তোমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে।

এ প্রস্তাবে ভাইয়েরা সবাই একমত হল। এ বিষয়টি তৃতীয় আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

অর্থাৎ ভাইয়েরা যখন ইউসুফ (আ)-কে জঙ্গলে নিয়ে গেলে এবং তাকে হত্যা করার ব্যাপারে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে সবাই একমত্যে পৌঁছল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আ)-কে সংবাদ দিলেন যে, একদিন আসবে, যখন তুমি তাদের কাছে তাদের এ কুকর্মের কথা ব্যক্ত করবে। তারা তখন কিছুই বুঝতে পারবে না।

এখানে وَأَوْحَيْنَا শব্দটি فَلَمَّا ذَهَبُوا এর جَوَاب বা উত্তর। এখানে و অক্ষরটি অতিরিক্ত।—(কুরতুবী)

উদ্দেশ্য এই যে, ভাইয়েরা যখন নিশ্চিতভাবে তাকে কূপে নিক্ষেপ করার সংকল্প করেই ফেলল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-এর সান্ত্বনার জন্য ওহী প্রেরণ করলেন। এতে ভবিষ্যতে কোন সময় ভাইদের সাথে সাক্ষাত এবং সাথে সাথে এ বিষয়েরও সুসংবাদ দেওয়া হল যে, তখন সে ভাইদের প্রতি অমুখাপেক্ষী এবং তাদের ধরা-ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে থাকবে। ফলে সে তাদের অন্যায়-অত্যাচারের বিচার করবে অথচ তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানবে না।

ইমাম কুরতুবী বলেনঃ এ ওহী সম্পর্কে দু'প্রকার ধারণা সম্ভবপর। এক. কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তাঁর সান্ত্বনা ও মুক্তির সুসংবাদ দানের জন্য এ ওহী আগমন করেছিল। দুই. কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আ)-কে ভবিষ্যত ঘটনাবলী বলে দিয়েছিলেন। এতে আরও বলে দিয়েছিলেন যে, তুমি এভাবে ধ্বংসের হওয়ার কবল থেকে মুক্ত থাকবে এবং এমন পরিস্থিতি দেখা দেবে যে, তুমি তাদের তিরস্কার করার সুযোগ পাবে অথচ তারা তোমাকে চিনবেও না যে, তুমিই তাদের ভাই ইউসুফ।

ইউসুফ (আ)-এর প্রতি শৈশবে অবতীর্ণ এ ওহী সম্পর্কে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, এটা নবুয়তের ওহী ছিল না। কেননা, নবুয়তের ওহী চল্লিশ বছর বয়ঃক্রমকালে অবতীর্ণ হয়। বরং এ ওহীটি ছিল এ ধরনের, যেমন মূসা (আ)-এর জননীকে ওহীর মাধ্যমে জ্ঞাত করানো হয়েছিল। ইউসুফ (আ)-এর প্রতি নবুয়তের ওহীর আগমন মিসর পৌঁছা ও যৌবনে পদার্পণের পর শুরু হয়েছিল। বলা হয়েছে : وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ইবনে জারীর, ইবনে আবীহাতেম প্রমুখ একে ব্যতিক্রমধর্মী নবুয়তের ওহীই আখ্যা দিয়েছেন, যেমন ঈসা (আ)-কে শৈশবেই নবুয়তের ওহী দান করা হয়েছিল।—(মাযহারী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : মিসর পৌঁছার পর আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে স্বীয় অবস্থা জানিয়ে হযরত ইয়াকুব (আ)-এর নিকট খবর পাঠাতে ওহীর মাধ্যমে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।—(কুরতুবী) একারণেই ইউসুফ (আ)-এর মত একজন পয়গম্বর জেল থেকে মুক্তি এবং মিসরের রাজত্ব লাভ করার পরও বৃদ্ধ পিতাকে স্বীয় নিরাপত্তার সংবাদ পৌঁছিয়ে নিশ্চিন্ত করার কোন ব্যবস্থা করেন নি।

এ কর্মপন্থার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার কি কি রহস্য লুক্কায়িত ছিল, তা জানার সাধ্য কার? সম্ভবত আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যে কোন কিছুর প্রতি অপরিসীম ভালবাসা রাখা যে আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয় নয়, এ বিষয়ে ইয়াকুব (আ)-কে সতর্ক করাও এর লক্ষ্য ছিল। এ ছাড়া শেষ পর্যন্ত যাঞ্চাকারীর বেশে ভাইদেরকেই ইউসুফ (আ)-এর সামনে উপস্থিত করে তাদেরকেও তাদের পূর্বকৃত দুষ্কর্মের কিছু শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

ইমাম কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ এস্থলে ইউসুফ (আ)-কে কূপে নিক্ষেপ করার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : যখন ওরা তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করতে লাগল, তখন তিনি কূপের প্রাচীর জড়িয়ে ধরলেন। ভাইয়েরা তাঁর জামা খুলে তদ্দ্বারা হাত বেঁধে দিল। তখন ইউসুফ (আ) পুনরায় তাদের কাছে দয়া ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু তখনও সেই একই উত্তর পাওয়া গেল যে, যে এগারটি নক্ষত্র তোকে সিজদা করে, তাদেরকে ডাক দে। তারাই তোর সাহায্য করবে। অতঃপর একটি বালতিতে রেখে তা কূপে ছাড়তে লাগল। মাঝপথে যেতেই উপর থেকে রশি কেটে দিল। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং ইউসুফের হিফাযত করলেন। পানিতে পড়ার কারণে তিনি কোনরূপ আঘাত পান নি। নিকটেই একখণ্ড ভাসমান প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হল। তিনি সুস্থ ও বহাল তবিয়তে তার উপর বসে গেলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে; জিবরাঈল (আ) আল্লাহ্র আদেশ পেয়ে তাঁকে প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়ে দেন।

ইউসুফ (আ) তিনদিন কূপে অবস্থান করলেন। ইয়াহুদা প্রত্যহ গোপনে তাঁর জন্য কিছু খাদ্য আনত এবং বালতির সাহায্যে তাঁর কাছে পৌঁছে দিত।

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ —অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলায় তারা ক্রন্দন করতে করতে পিতার নিকট পৌঁছল। ইয়াকুব (আ) ক্রন্দনের শব্দ শুনে বাইরে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : ব্যাপার কি? তোমাদের ছাগপালের উপর কেউ আক্রমণ করেনি তো? ইউসুফ কোথায়? তখন ভাইয়েরা বলল :

يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ○

অর্থাৎ পিতঃ, আমরা দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলাম এবং ইউসুফকে আসবাবপত্রের কাছে রেখে দিলাম। ইতিমধ্যে বাঘ এসে ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছে। আমরা যত সত্যবাদীই হই কিন্তু আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না।

ইবনে আরাবী 'আহকামুল কোরআনে' বলেন : পারস্পরিক (দৌড়) প্রতিযোগিতা শরীয়তসিদ্ধ এবং একটি উত্তম খেলা। এটা জিহাদেও কাজে আসে। এ কারণেই রসুলুল্লাহ্ (সা)-র স্বয়ং এ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। অশ্ব-প্রতিযোগিতা করানো (অর্থাৎ ঘোড়দৌড়)ও প্রমাণিত রয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সালামা ইবনে আকওয়া' জনৈক ব্যক্তির সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন।

উল্লিখিত আয়াত ও রেওয়ায়েত দ্বারা আসল ঘোড়দৌড়ের বৈধতা প্রমাণিত হয়। এছাড়া ঘোড়দৌড় ছাড়া দৌড়, তীরে লক্ষ্যভেদ ইত্যাদিতেও প্রতিযোগিতা করা বৈধ। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পক্ষকে তৃতীয় পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করাও জায়েয। কিন্তু পরস্পর হারজিতে কোন টাকার অংশ শর্ত করা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত যা কোরআন পাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আজকাল ঘোড়দৌড়ের যত প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, তার কোনটিই জুয়া থেকে মুক্ত নয়। তাই এগুলি হারাম ও না-জায়েয।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা পারস্পরিক আলোচনার পর অবশেষে তাকে একটি অন্ধকূপে ফেলে দিল এবং পিতাকে এসে বলল যে, তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে অতঃপর কাহিনী এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ —অর্থাৎ ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে এনেছিল, যাতে পিতার মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারে যে, বাঘই তাকে খেয়ে ফেলেছে।

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মিথ্যা ফাঁস করে দেওয়ার জন্য তাদেরকে একটি

জরুরী বিষয় থেকে গাফিল করে দিয়েছিলেন। তারা যদি রক্ত লাগানোর সাথে সাথে জামাটিও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিত, তবে ইউসুফকে বাঘে খাওয়ার কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারত। কিন্তু তারা অক্ষত ও আস্ত জামায় ছাগল ছানার রক্ত লাগিয়ে পিতাকে ধোঁকা দিতে চাইল। ইয়াকুব (আ) অক্ষত ও আস্ত জামা দেখে বললেন ঃ বাছারা, এ বাঘ কেমন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ছিল যে, ইউসুফকে তো খেয়ে ফেলেছে কিন্তু জামার কোন অংশ ছিন্ন হতে দেয়নি।

এভাবে ইয়াকুব (আ)-এর কাছে তাদের জালিয়াতি ফাঁস হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ

—অর্থাৎ ইউসুফকে বাঘে খায়নি বরং তোমাদেরই মন একটি বিষয় খাড়া করেছে। এখন আমার জন্য উত্তম এই যে, ধৈর্যধারণ করি এবং তোমরা যা বল, তাতে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করি।

মাস'আলা ঃ ইয়াকুব (আ) জামা অক্ষত হওয়া দ্বারা ইউসুফ ভ্রাতাদের মিথ্যা সপ্রমাণ করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, বিচারকের উচিত, উভয় পক্ষের দাবী ও যুক্তি প্রমাণের সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আলামতের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

মাওয়ারদি বলেন ঃ হযরত ইউসুফের জামাও কিছু আশ্চর্যজনক বিষয়াদির স্মারক হয়ে রয়েছে। তিনটি বিরাট ঘটনা এ জামার সাথেই জড়িত রয়েছে।

প্রথম ঘটনা হল, রক্ত রঞ্জিত করে পিতাকে ধোঁকা দেওয়া এবং জামার সাক্ষ্য দ্বারাই তাদের মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া; দ্বিতীয়, যুলায়খার ঘটনা। এতেও ইউসুফ (আ)-এর জামাটিই সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। তৃতীয়, ইয়াকুব (আ)-এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার ঘটনা। এতেও তাঁর জামাটিই মো'জেযার প্রতীক প্রমাণিত হয়েছে।

মাস'আলা ঃ কোন কোন আলিম বলেন ঃ কাহিনীর এ পর্যায়ে ইয়াকুব (আ) পুত্রদেরকে বলেছেন ঃ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا অর্থাৎ তোমাদের মন একটি বিষয় খাড়া করে নিয়েছে। তিনি হুবহু এই উক্তি তখনও করেছিলেন, যখন মিসরে ইউসুফ (আ)-এর সহোদর ভাই বেনিয়ামিন কথিত একটি চুরির অভিযোগে ধৃত হয় এবং তার ভ্রাতারা ইয়াকুব (আ)-কে এর সংবাদ দেন। এ সংবাদ শুনেও তিনি بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا বলেছিলেন। এখানে চিন্তা করার বিষয় এই যে, ইয়াকুব (আ) উভয় ক্ষেত্রে নিজ অভিমত অনুসারে একথা বলেছিলেন কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে তা নির্ভুল প্রমাণিত হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভ্রান্ত। কেননা, এক্ষেত্রে ভাইদের কোন

দোষ ছিল না। এতে বুঝা যায় যে, পয়গম্বরগণের অভিমতও প্রথম পর্যায়ে ভ্রান্ত হতে পারে। তবে পরবর্তী পর্যায়ে ওহীর মাধ্যমে তাঁদেরকে ভ্রান্তির উপর কায়েম থাকতে দেওয়া হয় না।

কুরতুবী বলেন : এতে বুঝা যায় যে, অভিমতের ভ্রান্তি বড়দের তরফ থেকেও হতে পারে। কাজেই প্রত্যেক অভিমত প্রদানকারীর উচিত, নিজ অভিমতকে ভ্রান্তির সম্ভাবনামুক্ত মনে করা এবং নিজ মতামতের উপর কারও অটল অনড় হয়ে থাকা উচিত নয় যে, অপরের মতামত শুনতে এবং তা মেনে নিতে সম্মত নয়।

سيارة —وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ— এখানে

শব্দের অর্থ কাফিলা। وارد বলে কাফিলার অগ্রবর্তী লোকদেরকে বুঝান হয়েছে। কাফিলার পানি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা তাদের দায়িত্ব। إدلاء

শব্দের অর্থ কূপে বালতি নিক্ষেপ করা। উদ্দেশ্য এই যে, ঘটনাচক্রে একটি কাফিলা এ স্থানে এসে যায়। তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে : এ কাফিলা সিরিয়া থেকে মিসর যাচ্ছিল। পথ ভুলে এ জনমানবহীন জঙ্গলে এসে উপস্থিত হয়। তারা পানি সংগ্রহ-কারীদের কূপে প্রেরণ করল।

মিসরীয় কাফিলার পথ ভুলে এখানে পৌঁছা এবং এই অন্ধ কূপের সম্মুখীন হওয়া সাধারণ দৃষ্টিতে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে। কিন্তু যারা সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, তারা জানে যে, এসব ঘটনা একটি পরস্পর সংযুক্ত ও অটুট ব্যবস্থাপনার মিলিত অংশ। ইউসুফের স্রষ্টা ও রক্ষকই কাফিলাকে পথ থেকে সরিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন এবং কাফিলার লোকদেরকে এই অন্ধ কূপে প্রেরণ করেছেন। সাধারণ মানুষ যেসব ঘটনাকে আকস্মিক ব্যাপারাধীন মনে করে, সেগুলোর অবস্থাও তদ্রূপ। দার্শনিকরা এগুলোকে দৈবাধীন ঘটনা আখ্যা দিয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, এটা প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টজগতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। নতুবা সৃষ্টি পরম্পরায় দৈবাৎ কোন কিছু হয় না। আল্লাহ্ তা'আলার অবস্থা হচ্ছে فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ (তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন)। তিনি গোপন রহস্যের অধীনে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দেন যে, বাহ্যিক ঘটনাবলীর সাথে তার কোন সম্পর্ক বুঝা যায় না। মানুষ একেই দৈব ঘটনা মনে করে বসে।

মোট কথা, কাফিলার মালেক ইবনে দোবর নামে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি এই কূপে পৌঁছলেন এবং বালতি নিক্ষেপ করলেন। ইউসুফ (আ) সর্বশক্তি-মানের সাহায্য প্রত্যক্ষ করে বালতির রশি শক্ত করে ধরলেন। পানির পরিবর্তে বালতির সাথে একটি সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডল দৃষ্টিতে ভেসে উঠল। এ মুখমণ্ডলের ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেও উপস্থিত ক্ষেত্রেও অনুপম সৌন্দর্য ও গুণগত উৎকর্ষের নিদর্শ-নাবলী তার মহত্ত্বের কম পরিচায়ক ছিল না। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে কূপের তলদেশ থেকে ভেসে উঠা এই অল্পবয়স্ক, অপরূপ ও বুদ্ধিদীপ্ত বালককে দেখে মালেক সোল্লাসে

চিৎকার করে উঠল : يَٰبُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَٰمٌ —আরে, আনন্দের কথা—এ তো বড় চমৎকার এক কিশোর বের হয়ে এসেছে। সহীহ্ মুসলিমের মি'রাজ রজনীর হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আমি ইউসুফ (আ)-এর সাথে সাক্ষাতের পর দেখলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের রূপ-সৌন্দর্যের অর্ধেক তাঁকে দান করেছেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক সমগ্র বিশ্বে বন্টন করা হয়েছে।

وَأَسَرُّوهُ بِضَٰعَةً —অর্থাৎ তাকে একটি পণ্যদ্রব্য মনে করে গোপন করে ফেলল।

উদ্দেশ্য এই যে, শুরুতে তো মালেক ইবনে দোবর এ কিশোরকে দেখে অবাক বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল কিন্তু পরে চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করল যে, এটা জানাজানি না হওয়া উচিত এবং গোপন করে ফেলা দরকার, যাতে একে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ আদায় করা যায়। সমগ্র কাফিলার মধ্যে এ বিষয় জানাজানি হয়ে গেলে সবাই এতে অংশীদার হয়ে যাবে।

এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা বাস্তব ঘটনা গোপন করে তাকে পণ্যদ্রব্য করে নিল, যেমন কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, ইয়াহুদা প্রত্যহ ইউসুফ (আ)-কে কূপের মধ্যে খানা পৌঁছানোর জন্য যেতো। তৃতীয় দিন তাকে কূপের মধ্যে না পেয়ে সে ফিরে এসে ভাইদের কাছে ঘটনা বর্ণনা করল। অতঃপর সব ভাই একত্রে সেখানে পৌঁছল এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পর কাফিলার লোকদের কাছ থেকে ইউসুফকে বের করল। তখন তারা বলল : এই ছেলেটি আমাদের গোলাম। পলায়ন করে এখানে এসেছে। তোমরা একে কব্জায় নিয়ে খুব খারাপ কাজ করেছ। একথা শুনে মালেক ইবনে দোবর ও তার সঙ্গীরা ভীত হয়ে গেল যে, তাদেরকে চোর সাব্যস্ত করা হবে। তাই ভাইদের সাথে তাকে ক্রয় করার ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে লাগল।

এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, ইউসুফ ভ্রাতারা নিজেরাই ইউসুফকে পণ্যদ্রব্য স্থির করে বিক্রি করে দিল।

وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ —অর্থাৎ তাদের সব কর্মকাণ্ড আল্লাহ্ তা'আলার জানা ছিল।

উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা কি করবে এবং তাদের কাছ থেকে ক্রেতা কাফিলা কি করবে—সব আল্লাহ্ তা'আলার জানা ছিল। তিনি তাদের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেওয়ারও শক্তি রাখতেন। কিন্তু বিশেষ কোন রহস্যের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা এসব পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করেন নি বরং নিজস্ব পথে চলতে দিয়েছেন।

ইবনে কাসীর বলেন : এ বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্যও নির্দেশ রয়েছে যে, আপনার কওম আপনার সাথে যা কিছু করছে অথবা করবে, তা সবই আমার জ্ঞান ও শক্তির আওতাধীন রয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে সব বানচাল করে দিতে

পারি কিন্তু আপাতত তাদেরকে শক্তি পরীক্ষার সুযোগ দেওয়াই হিকমতের চাহিদা। পরিণামে আপনাকে বিজয়ী করে সত্যের বিজয় নিশ্চিত করা হবে, যেমন ইউসুফ (আ)-এর সাথে করা হয়েছে।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ —আরবী ভাষায় شرا শব্দ ক্রয় করা ও বিক্রয় করা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলেও উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। যদি সর্বনামকে ইউসুফ ভ্রাতাদের দিকে ফিরানো হয়, তবে বিক্রয় করার অর্থ হবে এবং কাফিলার লোকদের দিকে ফেরানো হলে ক্রয় করার অর্থ হবে। উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা বিক্রয় করে দিল কিংবা কাফিলার লোকেরা ইউসুফকে খুব সস্তা মূল্যে অর্থাৎ নামে মাত্র কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করল।

কুরতুবী বলেনঃ আরব বণিকদের অভ্যাস ছিল, তারা মোটা অঙ্কের লেনদেন পরিমাপের মাধ্যমে করত এবং চল্লিশের ঊর্ধ্বে নয়, এমন লেনদেন গণনার মাধ্যমে করত। তাই دراهم শব্দের সাথে معدودة (গুণাগুনতি) শব্দের প্রয়োগ থেকে বুঝা যায় যে, দিরহামের পরিমাণ চল্লিশের কম ছিল। ইবনে কাসীর আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের রেওয়ায়েতে লেখেনঃ বিশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছিল এবং দশ ভাই দুই দিরহাম করে নিজেদের মধ্যে তা বণ্টন করে নিয়েছিল। দিরহামের সংখ্যা কত ছিল এ ব্যাপারে কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে বাইশ এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে চল্লিশ।—(ইবনে কাসীর)

وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ —এখানে زاهدين শব্দটি زاهد -এর বহুবচন, زهد থেকে এর উৎপত্তি। زهد -এর শাব্দিক অর্থ বৈরাগ্য ও নির্লিপ্ততা। সাধারণ বাকপদ্ধতিতে এর অর্থ হয় সাংসারিক ধনসম্পদের প্রতি অনাসক্তি ও বিমুখতা। আয়াতের অর্থ এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা এ ব্যাপারে আসলে ধনসম্পদের আকাঙ্ক্ষী ছিল না। তাদের আসল লক্ষ্য ছিল ইউসুফ (আ)-কে পিতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। তাই অল্প সংখ্যক দিরহামের বিনিময়েই ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যায়।

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ
يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ
وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ

وَكَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ ۝ وَرَاوَدَتۡهُ الَّتِىۡ هُوَ فِىۡ بَيۡتِهَا عَنۡ نَّفۡسِهٖ وَغَلَّقَتِ الۡاَبۡوَابَ وَقَالَتۡ هَيۡتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّىۡۤ اَحۡسَنَ مَثۡوَاىَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفۡلِحُ الظّٰلِمُوۡنَ ۝

(২১) মিসরে যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল ঃ একে সম্মানে রাখ। সম্ভবত সে আমাদের কাজে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নেব। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং এ জন্য যে তাকে বাক্যাদির পূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দেই। আল্লাহ্ নিজ কাজে প্রবল থাকেন কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (২২) যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গেল, তখন তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম। এমনিভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দেই। (২৩) আর সে যে মহিলার ঘরে ছিল, ঐ মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগল এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল। সে মহিলা বলল ঃ শুন! তোমাকে বলছি, এদিকে আস! সে বলল ঃ আল্লাহ্ রক্ষা করুন; তোমার স্বামী আমার মালিক। তিনি আমাকে সযত্নে থাকতে দিয়েছেন। নিশ্চয় সীমা লংঘনকারিগণ সফল হয় না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কাফিলার লোকেরা ইউসুফকে ভাইদের কাছ থেকে ক্রয় করে মিসরে নিয়ে গেল এবং 'আজীজে মিসরের' হাতে বিক্রয় করে দিল)। আর যে ব্যক্তি মিসরে তাকে ক্রয় করল (অর্থাৎ আজীজ), সে (তাকে গৃহে এনে স্ত্রীর হাতে সোপর্দ করল এবং) স্ত্রীকে বলল ঃ তাকে সযত্নে রাখ। আশ্চর্য কি যে, সে (বড় হয়ে) আমাদের কাজে আসবে কিংবা আমরা তাকে পুত্ররূপেই গ্রহণ করে নেব। (কথিত আছে যে, তাদের সন্তান-সন্ততি ছিল না তাই এ কথা বলেছিল)। আমি (যেভাবে ইউসুফকে বিশেষ কৃপায় অন্ধ কূপ থেকে মুক্তি দিয়েছি) তেমনিভাবে ইউসুফকে এ দেশে (মিসরে) প্রতিষ্ঠিত করেছি (অর্থাৎ রাজত্ব দিয়েছি) এবং (এ মুক্তিদান এ উদ্দেশ্যও ছিল) যাতে আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেই। (উদ্দেশ্য এই যে, মুক্তিদানের লক্ষ্য ছিল তাকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ধনসম্পদে ধনী করা) এবং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় (ঈপ্সিত) কাজে প্রবল (ও শক্তিমান, যা ইচ্ছা, তাই করেন), কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। [কেননা, ঈমানদার বিশ্বাসীদের সংখ্যা কম। এ বিষয়টি কাহিনীর মাঝখানে 'অসম্পর্কশীল' বাক্য হিসাবে আনা হয়েছে। কারণ, ইউসুফ (আ)-এর বর্তমান অবস্থা অর্থাৎ ক্রীতদাস হয়ে থাকা বাহ্যত উত্তম অবস্থা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, এ অবস্থাটি ক্ষণস্থায়ী এবং অন্য একটি অবস্থার উপায় ও অবলম্বন মাত্র। তাকে উচ্চস্থান দান করাই আসল লক্ষ্য। আজীজে মিসর ও তার গৃহে লালিত-পালিত হওয়াকে এর উপায় করা হয়েছে।

কেননা, উচ্চপদস্থ লোকদের ঘরে লালিত-পালিত হলে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বাড়ে এবং রাজকীয় বিষয়াদির জ্ঞান জন্মে। এ বিষয়বস্তুরই অবশিষ্টাংশ পরবর্তী বাক্যে বর্ণিত হয়েছে ঃ] এবং যখন সে যৌবনে (অর্থাৎ পরিণত বয়স অথবা ভরা যৌবনে) পদার্পণ করল, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম [এর অর্থ নবুয়তের জ্ঞান দান করা। কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় তাঁর কাছে যে ওহী প্রেরণের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা নবুয়তের ওহী ছিল না বরং সেটা ছিল মূসা (আ)-র জননীর কাছে প্রেরিত ওহীর অনুরূপ]। এবং আমি সৎকর্মশীলদেরকে এমনিভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি। [ইউসুফ (আ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের যে কাহিনী পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে, তার পূর্বে এ বাক্যগুলোতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তা নিছক মিথ্যা ও অপপ্রচার হবে। কারণ, যাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করা হয়, তার দ্বারা এ ধরনের কোন দুষ্কর্ম অনুষ্ঠিত হতেই পারে না। অতঃপর এ অপবাদ আরোপের কাহিনী উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, ইউসুফ (আ) আজীজে মিসরের গৃহে সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগলেন] এবং (ইতিমধ্যেই এ পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন যে) যে মহিলার গৃহে ইউসুফ (আ) বাস করতেন, সে (তার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ল এবং) তার সাথে স্বীয় কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্য ফুসলাতে লাগল এবং (গৃহের) সব দরজা বন্ধ করে দিল এবং (তাঁকে) বলতে লাগল ঃ এদিকে এসো, তোমাকেই বলছি। ইউসুফ (আ) বললেন ঃ (প্রথমত এটা একটা মহাপাপ) আল্লাহ্ রক্ষা করুন, (দ্বিতীয়ত) তিনি (অর্থাৎ তোমার স্বামী) আমার লালন-পালনকারী (ও অনুগ্রহকারী)। তিনি আমার বসবাসের সুবন্দোবস্ত করেছেন। (অতএব আমি কি করে তাঁর সম্ভ্রম নষ্ট করব?) নিশ্চয় অকৃতজ্ঞরা সফলতা অর্জন করতে পারে না। (বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুনিয়াতেই তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। পরন্তু পরকালের শাস্তি তো নিশ্চিতই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইউসুফ (আ)-এর প্রাথমিক জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ কাফিলার লোকেরা যখন তাঁকে কূপ থেকে উদ্ধার করল, তখন ভ্রাতারা তাঁকে নিজেদের পলাতক ক্রীতদাস আখ্যা দিয়ে গুটিকতক দিরহামের বিনিময়ে তাঁকে বিক্রি করে দিল। প্রথমত এ কারণে যে, তারা এ মহাপুরুষের সঠিক মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। দ্বিতীয়ত তাদের আসল লক্ষ্য তাঁর দ্বারা টাকা-পয়সা উপার্জন করা ছিল না; বরং পিতার কাছ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াই ছিল মূল লক্ষ্য। তাই শুধু বিক্রি করে দিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি বরং তারা আশংকা করছিল যে, কাফিলার লোকেরা তাকে এখানেই ছেড়ে যাবে এবং অতঃপর সে কোন রকমে পিতার কাছে পৌঁছে আগাগোড়া চক্রান্ত ফাঁস করে দেবে। তাই তফসীরবিদ মুজাহিদের বর্ণনা অনুযায়ী, তারা কাফিলা রওয়ানা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করল। যখন কাফিলা রওয়ানা হয়ে গেল, তখন তারা কিছু দূর পর্যন্ত কাফিলার পেছনে পেছনে গেল এবং তাদেরকে বলল ঃ দেখ, এর পলায়নের অভ্যাস রয়েছে। একে মুক্ত ছেড়ে দিয়ো না বরং বেঁধে রাখ। এ

অমূল্য নিধির মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ কাফিলার লোকেরা তাঁকে এমনিভাবে মিসরে নিয়ে গেল।—(ইবনে কাসীর)

এর পরবর্তী ঘটনা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত রয়েছে। কোরআনের নিজস্ব সংক্ষিপ্তকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী কাহিনীর যতটুকু অংশ আপনা-আপনি বুঝা যায়, তার বেশী উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করা হয়নি; উদাহরণত কাফিলার বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করে মিসর পর্যন্ত পৌঁছা, সেখানে পৌঁছে ইউসুফ (আ)-কে বিক্রি করে দেওয়া ইত্যাদি। এগুলো ছেড়ে দিয়ে অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَقَالَ الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِىْ مَثْوٰىهُ —অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইউসুফ (আ)-কে মিসরে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল ঃ ইউসুফের বসবাসের সুবন্দোবস্ত কর।

তফসীর কুরতুবীতে বলা হয়েছে ঃ কাফিলার লোকেরা তাঁকে মিসর নিয়ে যাওয়ার পর বিক্রয়ের কথা ঘোষণা করতেই ক্রেতারা প্রতিযোগিতামূলকভাবে দাম বলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ইউসুফ (আ)-এর ওজনের সমান স্বর্ণ, সমপরিমাণ মৃগনাভি এবং সমপরিমাণ রেশমী বস্ত্র দাম সাব্যস্ত হয়ে গেল।

আল্লাহ্ তা'আলা এ রত্ন আজীজে মিসরের জন্য অবধারিত করেছিলেন। তিনি বিনিময়ে উল্লিখিত দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে ইউসুফ (আ)-কে ক্রয় করে নিলেন।

কোরআনের পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে জানা গেছে যে, এগুলো কোন দৈবাৎ ঘটনা নয় বরং বিশ্ব পালকের রচিত অটুট ব্যবস্থাপনার অংশমাত্র। তিনি মিসরে ইউসুফ (আ)-কে ক্রয় করার জন্য এ দেশের সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তিকে মনোনীত করেছিলেন। ইবনে কাসীর বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইউসুফ (আ)-কে ক্রয় করেছিলেন, তিনি ছিলেন মিসরের অর্থমন্ত্রী। তাঁর নাম 'কিতফীর' কিংবা 'ইতফীর' বলা হয়ে থাকে। তখন মিসরের সম্রাট ছিলেন আমালেকা জাতির জনৈক ব্যক্তি 'রাইয়ান ইবনে ওসায়দ'। তিনি পরবর্তীকালে ইউসুফ (আ)-এর হাতে মুসলমান হয়েছিলেন এবং তাঁরই জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।—(মাযহারী) ক্রেতা আজীজে মিসরের স্ত্রীর নাম ছিল 'রাঈল' কিংবা 'জুলায়খা'। আজীজে মিসর 'কিতফীর' ইউসুফ (আ) সম্পর্কে স্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন ঃ তাকে বসবাসের উত্তম জায়গা দাও—ক্রীতদাসের মত রেখো না এবং তার প্রয়োজনাদির সুবন্দোবস্ত কর।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন ঃ দুনিয়াতে তিন ব্যক্তি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং চেহারা দেখে শুভাশুভ নিরূপণকারী প্রমাণিত হয়েছেন। প্রথম, আজীজে মিসর। তিনি স্বীয় নিরূপণ শক্তি দ্বারা ইউসুফ (আ)-এর গুণাবলী অবহিত হয়ে স্ত্রীকে উপরোক্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়, হযরত শো'আয়ব (আ)-এর ঐ কন্যা, যে মূসা (আ) সম্পর্কে পিতাকে বলেছিল ঃ يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ

اِسْتَأْجِرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ——পিতাঃ, 'তাকে চাকর রেখে দিন। কেননা উত্তম চাকর ঐ ব্যক্তি, যে সবল, সুঠাম ও বিশ্বস্ত হয়।' তৃতীয়, হযরত আবূবকর সিদ্দীক, যিনি ফারূকে আযম (রা)-কে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেছিলেন।—(ইবনে কাসীর)

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ——অর্থাৎ এমনিভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠা দান করলাম। এতে ভবিষ্যৎ ঘটনার সুসংবাদ রয়েছে যে, যে ইউসুফ এখন ক্রীতদাসের বেশে আজীজে মিসরের গৃহে প্রবেশ করেছে, অতি সত্বর সে মিসরের সর্ব-প্রধান ব্যক্তি হবে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করবে।

وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ——এখানে শুরুতে واو কে عطف-এর অর্থে নিলে এ অর্থেরই একটি বাক্য উহ্য মেনে নেওয়া হবে। অর্থাৎ আমি ইউসুফ (আ)-কে রাজত্ব দান করেছি, যাতে সে পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচারের মাধ্যমে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করে এ দেশবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে পারে এবং তাকে আমি বাক্যা-দির পরিপূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি শিক্ষা দেই। উপরোক্ত কথাটি ব্যাপক অর্থবহ। ওহী যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করা, তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা, যাবতীয় জরুরী জ্ঞান অর্জিত হওয়া, স্বপ্নের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ——অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কর্মে প্রবল ও শক্তিমান। যাবতীয় বাহ্যিক কারণ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সংঘটিত হয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়ার সব উপ-করণ তার জন্য প্রস্তুত করে দেন।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ——কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য বুঝে না। তারা বাহ্যিক উপকরণাদিকেই সব কিছু মনে করে এগুলোর চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে এবং উপ-করণ সৃষ্টিকারী ও সর্বশক্তিমানের কথা ভুলে যায়।

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا——অর্থাৎ যখন ইউসুফ (আ) পূর্ণ শক্তি ও যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম।

'শক্তি ও যৌবন' কোন্ বয়সে অর্জিত হল, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ (রা) বলেনঃ তখন বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। যাহ্হাক বিশ বছর এবং হাসান বসরী চল্লিশ বছর বর্ণনা করেছেন।

তবে এ বিষয়ে সবাই একমত যে, প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করার অর্থ এস্থলে নবুয়ত দান করা। এতে আরও জানা গেল যে, ইউসুফ (আ) মিসর পৌঁছারও অনেক পরে নবুয়ত লাভ করেছিলেন। কূপের গভীরে যে ওহী তার কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল, তা নবুয়তের ওহী ছিল না বরং আভিধানিক 'ওহী' ছিল, যা পয়গম্বর নয়—এমন ব্যক্তির কাছেও প্রেরণ করা যায়। যেমন মূসা (আ)-র জননী এবং হযরত ঈসা (আ)-র মাতা মরিয়ম সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে।

كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ—আমি সৎকর্মশীলদেরকে এমনিভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি। উদ্দেশ্য এই যে, নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে রাজত্ব ও সম্মান পর্যন্ত পৌঁছানো ছিল ইউসুফ (আ)-এর সদাচরণ, আল্লাহ্ ভীতি ও সৎ কর্মের পরিণতি। এটা শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য নয়, যে কেউ এমন সৎকর্ম করবে, সে এমনিভাবে আমার পুরস্কার লাভ করবে।

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ

অর্থাৎ যে মহিলার গৃহে ইউসুফ (আ) থাকতেন, সে তাঁর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ল এবং তাঁর সাথে কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাঁকে ফুসলাতে লাগল। সে গৃহের সব দরজা বন্ধ করে দিল এবং তাঁকে বলল ঃ শীঘ্র এসে যাও, তোমাকেই বলছি।

প্রথম আয়াতে জানা গিয়েছিল যে, এ মহিলা ছিল আজীজে মিসরের স্ত্রী। কিন্তু এ স্থলে কোরআন 'আজীজ-পত্নী' এই সংক্ষিপ্ত শব্দ ছেড়ে 'যার গৃহে সে ছিল' এ শব্দ ব্যবহার করেছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইউসুফ (আ)-এর গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা এ কারণে আরও অধিক কঠিন ছিল যে, তিনি তারই গৃহে—তারই আশ্রয়ে থাকতেন। তার আদেশ উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না।

গোনাহ্ থেকে বাঁচার প্রধান অবলম্বন স্বয়ং আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা ঃ এর বাহ্যিক কারণ ঘটে এই যে, ইউসুফ (আ) যখন নিজেকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত দেখলেন, তখন পয়গম্বরসুলভ ভঙ্গিতে সর্বপ্রথম আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করলেন।

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ তিনি শুধু নিজ ইচ্ছা ও সংকল্পের ওপর ভরসা করেন নি। এটা জানা কথা যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আশ্রয় লাভ করে, তাকে কেউ বিশুদ্ধ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। অতঃপর তিনি পয়গম্বরসুলভ বিজ্ঞতা ও উপদেশ প্রয়োগ করে স্বয়ং যুলায়খাকে উপদেশ দিতে লাগলেন যে, তারও উচিত আল্লাহ্কে ভয় করা এবং মন্দ বাসনা থেকে বিরত থাকা। তিনি বললেন ঃ اِنَّهٗ رَبِّىْۤ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ

তিনি আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে সুখে রেখেছেন। মনে রেখো, অত্যাচারীরা কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না।

বাহ্যিক অর্থ এই যে, তোমার স্বামী আজীজে মিসর আমাকে লালন-পালন করেছেন, আমাকে উত্তম জায়গা দিয়েছেন। অতএব তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহকারী। আমি তাঁর ইযযতে হস্তক্ষেপ করব? এটা জঘন্য অনাচার অথচ অনাচারীরা কখনও কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না। এভাবে তিনি যেন স্বয়ং যুলায়খাকেও এ শিক্ষা দিলেন যে, আমি কয়েকদিন লালন-পালনের কৃতজ্ঞতা যখন এতটুকু স্বীকার করি, তখন তোমাকে আরও বেশী স্বীকার করা দরকার।

এখানে ইউসুফ (আ) আজীজে মিসরকে স্বীয় 'রব'—পালনকর্তা বলেছেন। অথচ এ শব্দটি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বৈধ নয়। কারণ, এধরনের শব্দ শিরকের ধারণা সৃষ্টিকারী এবং মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করার কারণ হয়ে থাকে। এ কারণেই ইসলামী শরীয়তে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে, কোন দাস স্বীয় প্রভুকে 'রব' বলতে পারবে না এবং কোন প্রভু স্বীয় দাসকে 'বান্দা' বলতে পারবে না। কিন্তু এ হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের বৈশিষ্ট্য। এতে শিরক নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে এমন বিষয়বস্তুকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা শিরকের উপায় হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তে শিরককে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হলেও কারণ এবং উপায়াদির উপর কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। এ কারণে পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে চিত্রনির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে বিধায় একে শিরক থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত রাখার কারণে শিরকের উপায়াদি তথা চিত্র ও শিরকের ধারণা সৃষ্টিকারী শব্দাবলীও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মোটকথা, ইউসুফ (আ)-এর إِنَّهُ رَبِّي 'তিনি আমার পালনকর্তা' বলা স্বস্থানে ঠিকই ছিল।

পক্ষান্তরে إِنَّهُ শব্দের সর্বনামটি আল্লাহ্র দিকে ফিরানোও সম্ভবপর। অর্থাৎ ইউসুফ (আ) আল্লাহ্কেই 'রব' বলেছেন। বসবাসের উত্তম জায়গাও প্রকৃতপক্ষে তিনিই দিয়েছেন। সেমতে তাঁর অবাধ্যতা সর্ববৃহৎ জুলুম। এরূপ জুলুমকারী কখনও সফল হয় না।

সুদ্দী ইবনে ইসহাক প্রমুখ তফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, এ নির্জনতায় যুলায়খা ইউসুফ (আ)-কে আকৃষ্ট করার জন্য তাঁর রূপ ও সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগল। সে বলল : তোমার মাথার চুল কত সুন্দর! ইউসুফ (আ) বললেন : মৃত্যুর পর এই চুল সর্বপ্রথম আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এরপর যুলায়খা বলল : তোমার নেত্রদ্বয় কতই না মনোহর! ইউসুফ (আ) বললেন : মৃত্যুর পর এগুলো পানি হয়ে আমার মুখমণ্ডলে প্রবাহিত হবে। যুলায়খা আরও বলল : তোমার মুখমণ্ডল কতই না কমনীয়! ইউসুফ (আ) বললেন : এগুলো সব মৃত্তিকার খোরাক। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মনে পরকালের চিন্তা এত বেশী প্রবল করে দেন যে, ভরা যৌবনেও জগতের যাবতীয় ভোগবিলাস তাঁর দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায়। সত্য বলতে কি পরকালের চিন্তাই মানুষকে সর্বত্র সব অনিষ্ট থেকে নির্লিপ্ত রাখতে পারে।

সূচী-পত্র

اللهم ارزقنا ايانا

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذٰلِكَ
لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿۲۴﴾

(২৪) নিশ্চয় মহিলা তার বিষয়ে চিন্তা করেছিল এবং সেও মহিলার বিষয়ে চিন্তা করত। যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার মহিমা অবলোকন করত। এমনিভাবে হয়েছে, যাতে আমি তার কাছ থেকে মন্দ বিষয় ও নির্লজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয় সে আমার মনোনীত বান্দাদের একজন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এ মহিলার অন্তরে তাঁর কল্পনা (দৃঢ় সংকল্পরূপে) প্রতিষ্ঠিতই হচ্ছিল এবং তাঁর মনেও এ মহিলার কিছু কিছু কল্পনা (স্বাভাবিক পর্যায়ে) হতে যাচ্ছিল। (যা ইচ্ছার বাইরে; যেমন গ্রীষ্মকালের রোযায় পানির প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক হয়, যদিও রোযা ভঙ্গ করার সামান্যতম ইচ্ছাও মনে জাগে না) যদি স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শন (অর্থাৎ এ কর্ম যে গোনাহ্, তার প্রমাণ—যা শরীয়তের নির্দেশ) প্রত্যক্ষ না করত, (অর্থাৎ শরীয়-তের জ্ঞান ও কর্মপ্রেরণা যদি তার অর্জিত না থাকত) তবে কল্পনা বদ্ধমূল হওয়া আশ্চর্য ছিল না। (কেননা, এর শক্তিশালী কারণ ও উপকরণ উপস্থিত ছিল কিন্তু) আমি এমনি-ভাবে তাঁকে জ্ঞান দান করেছি, যাতে আমি তাঁর কাছ থেকে সগীরা ও কবীরা গোনাহ্-সমূহকে দূরে সরিয়ে রাখি (অর্থাৎ ইচ্ছা ও কর্ম উভয় বিষয় থেকে রক্ষা করেছি। কেননা,) সে ছিল আমার মনোনীত বান্দাদের অন্যতম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতে ইউসুফ (আ)-এর বিরাট পরীক্ষা উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, আজীজে মিসরের স্ত্রী যুলায়খা গৃহের দরজা বন্ধ করে তাকে পাপকাজের দিকে আহ্বান করতে সচেষ্ট হল এবং নিজের প্রতি আকৃষ্ট ও প্রবৃত্ত করার সব উপকরণ উপস্থিত করে দিল কিন্তু ইযযতের মালিক আল্লাহ্ এ সৎ যুবককে এহেন অগ্নিপরীক্ষায় দৃঢ়পদ রাখলেন। এর আরও বিবরণ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, যুলায়খা তো পাপকাজের কল্পনায় বিভোরই ছিল, ইউসুফ (আ)-এর মনেও মানবিক স্বভাববশত কিছু কিছু অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ঠিক সেই মুহূর্তে স্বীয় যুক্তি প্রমাণ ইউসুফ (আ)-এর সামনে তুলে ধরেন, যদ্দরুন সেই অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক ক্রমবর্ধিত হওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এবং তিনি মহিলার নাগপাশ ছিন্ন করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন

এ আয়াতে هَمّ শব্দটি (কল্পনা অর্থে) যুলায়খা ও ইউসুফ (আ) উভয়ের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا একথা সুনিশ্চিত যে, যুলায়খার কল্পনা ছিল পাপকাজের কল্পনা। এতে ইউসুফ (আ) সম্পর্কেও এ ধরনের ধারণা হতে পারত। অথচ মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী এটা নবুয়ত ও রিসালতের পরিপন্থী। কেননা, সকল মুসলিম মনীষীই এ বিষয়ে একমত যে, পয়গম্বরগণ সর্বপ্রকার সগীরা ও কবীরা গোনাহ্ থেকে পবিত্র থাকেন। তাঁদের দ্বারা কবীরা গোনাহ্ ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা ভুলবশত কোনরূপেই হতে পারে না। তবে সগীরা গোনাহ্ অনিচ্ছা ও ভুলবশত হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। কিন্তু তাঁদেরকে এর উপরও সক্রিয় থাকতে দেওয়া হয় না বরং সতর্ক করে তা থেকে সরিয়ে আনা হয়।

পয়গম্বরগণের পবিত্রতার এ বিষয়টি কোরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত হওয়া ছাড়াও তাঁদের যোগ্যতার প্রশ্নেও জরুরী। কেননা, যদি পয়গম্বরগণের দ্বারা গোনাহ্ সংঘটিত হওয়ার আশংকা থাকে, তবে তাঁদের আনীত ধর্ম ও ওহীর প্রতি আস্থার কোন উপায় থাকে না এবং তাঁদেরকে প্রেরণ ও তাঁদের প্রতি গ্রন্থ অবতারণের কোম উপকারিতাও অবশিষ্ট থাকে না। একারণেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক পয়গম্বরকেই গোনাহ্ থেকে পবিত্র রেখেছেন।

তাই, সাধারণভাবে এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত ও নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া গেছে যে, ইউসুফ (আ)-এর মনে যে কল্পনা ছিল তা পাপ পর্যায়ের ছিল না। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, আরবী ভাষায় هَمّ শব্দটি দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক. কোন কাজের ইচ্ছা ও সংকল্প করে ফেলা। দুই. শুধু অন্তরে ধারণা ও অনিচ্ছাকৃত ভাব উদয় হওয়া। প্রথমোক্ত প্রকারটি পাপের অন্তর্ভুক্ত এবং শাস্তিযোগ্য। হ্যাঁ, যদি ইচ্ছা ও সংকল্পের পর একমাত্র আল্লাহ্র ভয়ে কেউ এ গোনাহ্ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে, তবে হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ গোনাহ্র পরিবর্তে তার আমলনামায় একটি পুণ্য লিপিবদ্ধ করে দেন। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ শুধু অন্তরে ধারণা ও অনিচ্ছাকৃত ভাব উদয় হওয়া এবং তা কার্যে পরিণত করার ইচ্ছা মোটেই না থাকা। যেমন, গ্রীষ্মকালীন রোযায় পানির দিকে স্বাভাবিক ও অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক প্রায় সবারই জাগ্রত হয় অথচ রোযা অবস্থা হওয়ার ফলে তা পান করার ইচ্ছা মোটেই জাগ্রত হয় না। এই প্রকার কল্পনা মানুষের ইচ্ছাধীন নয় এবং এ জন্য কোন শাস্তি বা গোনাহ্ নেই।

সহীহ্ বুখারীর হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের এমন পাপচিন্তা ও কল্পনা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যা সে কার্যে পরিণত করে না।—(কুরতুবী)

বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন : আমার বান্দা যখন কোন সৎ কাজের ইচ্ছা করে, তখন শুধু ইচ্ছার কারণে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও। যদি সে সৎ কাজটি সম্পন্ন করে, তবে দশটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। পক্ষান্তরে যদি কোন পাপকাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর আল্লাহ্র ভয়ে তা পরিত্যাগ করে, তখন পাপের পরিবর্তে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও এবং যদি পাপ কাজটি করেই ফেলে, তবে একটি গোনাহ্ই লিপিবদ্ধ কর। —(ইবনে কাসীর)

তফসীর কুরতুবীতে উপরোক্ত দু'অর্থে هَمّ শব্দের ব্যবহার প্রমাণিত করা হয়েছে এবং এর সমর্থনে আরবদের প্রচলিত বাকপদ্ধতি ও কবিতার সাক্ষ্য বর্ণনা হয়েছে।

এতে বুঝা গেল যে, আয়াতে যদিও هَمّ শব্দটিকে যুলায়খা ও ইউসুফ (আ) উভয়ের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, তবুও উভয়ের هَمّ অর্থাৎ কল্পনার মধ্যে ছিল বিরাট পার্থক্য। প্রথমটি গোনাহ্র অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বিতীয়টি অনিচ্ছাকৃত ধারণা, যা গোনাহ্র অন্তর্ভুক্ত নয়। কোরআনের বর্ণনাভঙ্গিও এ দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কেননা, উভয়ের কল্পনা যদি একই প্রকার হত, তবে এ ক্ষেত্রে تثنية তথা দ্বিবাচক পদ ব্যবহার করে وَلَقَدْ هَمَّا বলা হত, যা সংক্ষিপ্ত ছিল। কিন্তু এটা ছেড়ে উভয়ের কল্পনা পৃথক পৃথক বর্ণনা করে هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا বলা হয়েছে। যুলায়খার কল্পনার সাথে তাকিদের শব্দ لَقَدْ যোগ করা হয়েছে এবং ইউসুফ (আ)-এর هَمّ ও কল্পনার সাথে তা যোগ করা হয়নি। এতে বুঝা যায় যে, এ বিশেষ শব্দটির মাধ্যমে একথাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, যুলায়খার কল্পনা এবং ইউসুফ (আ)-এর কল্পনা ছিল ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির।

সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে : যখন ইউসুফ (আ) এ পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তখন ফেরেশতারা আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে আরয করল : আপনার এ খাঁটি বান্দা পাপচিন্তা করছে অথচ সে এর কুপরিণাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছে। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন : অপেক্ষা কর। যদি সে এ গোনাহ্ করে ফেলে, তবে যেরূপ কাজ করে, তদ্রূপই তার আমলনামায় লিখে দাও, আর যদি সে বিরত থাকে, তবে পাপের পরিবর্তে তার আমলনামায় নেকী লিপিবদ্ধ কর। কেননা, সে একমাত্র আমার ভয়ে স্বীয় খাহেশ পরিত্যাগ করেছে। এটা খুব বড় নেকী।—(কুরতুবী)

মোটকথা এই যে, ইউসুফ (আ)-এর অন্তরে যে কল্পনা অথবা ঝোঁক সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিছক অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল। এটা গোনাহ্র অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর এ ধারণার বিপক্ষে কাজ করার দরুন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাঁর মর্যাদা আরও বেড়ে গেছে।

কোন কোন তফসীরবিদ এ স্থলে একথাও বলেছেন যে, আয়াতের বাক্যাংশ অগ্র-পশ্চাৎ হয়েছে।

لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ —অংশটি পরে উল্লেখ করা হলেও তা আসলে অগ্রে রয়েছে। অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, ইউসুফ (আ)-এর মনেও কল্পনা সৃষ্টি হত, যদি তিনি আল্লাহ্‌র প্রমাণ অবলোকন না করতেন। কিন্তু পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করার কারণে তিনি এ কল্পনা থেকে বেঁচে গেলেন। এ বিষয়বস্তুটি সঠিক কিন্তু কোন কোন তফসীরবিদ এ অগ্র-পশ্চাৎকে ব্যাকরণিক ভুল আখ্যা দিয়েছেন। এদিক দিয়েও প্রথম তফসীরই অগ্রগণ্য। কারণ, এতে ইউসুফ (আ)-এর আল্লাহ্‌ভীতি ও পবিত্রতার মাহাত্ম্য আরও উচ্চে চলে যায়। কেননা, তিনি স্বভাবিক ও মানসিক ঝোঁক সত্ত্বেও গোনাহ্ থেকে দূরে থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পরবর্তী বাক্য হচ্ছে لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ —এখানে এর جَزَاء উহ্য রয়েছে। অর্থ এই যে, যদি তিনি পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন না করতেন, তবে এ কল্পনাতেই লিপ্ত থাকতেন। পালনকর্তার প্রমাণ দেখে নেওয়ার কারণে অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও এখনও অন্তর থেকে দূর হয়ে গেল।

যাঁর পালনকর্তার যে প্রমাণ ইউসুফ (আ)-এর দৃষ্টির সামনে এসেছিল, তা কি ছিল কোরআন পাক তা ব্যক্ত করেনি। এ কারণেই এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণ নানা মত ব্যক্ত করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবায়র, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন, হাসান বসরী (র) প্রমুখ বলেছেন: আল্লাহ্ তা'আলা মু'জেযা হিসাবে এ নির্জন কক্ষে হযরত ইয়াকুব (আ)-এর চিত্র এভাবে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করে দেন যে, তিনি হাতের অঙ্গুলি দাঁতে চেপে তাঁকে হুঁশিয়ার করেছেন। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন: আযীযে-মিসরের মুখচ্ছবি তাঁর সম্মুখে ফুটিয়ে তোলা হয়। কেউ বলেন: ইউসুফ (আ)-এর দৃষ্টি ছাদের দিকে উঠতেই সেখানে কোরআন পাকের এ আয়াত লিখিত দেখলেন:

لَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا —অর্থাৎ ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। কেননা, এটা খুবই নির্লজ্জতা, (আল্লাহ্‌র শাস্তির কারণ) এবং (সমাজের জন্য) অত্যন্ত মন্দ পথ। কেউ কেউ বলেছেন: যুলায়খার গৃহে একটি মূর্তি ছিল। সে বিশেষ মুহূর্তটিতে যুলায়খা সেই মূর্তিটি কাপড় দ্বারা আবৃত করলে ইউসুফ (আ) এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল: এটা আমার উপাস্য। এর সামনে গোনাহ্ করার মত সাহস আমার নেই। ইউসুফ (আ) বললেন: আমার উপাস্য আরও বেশী লজ্জা করার যোগ্যতাসম্পন্ন। তাঁর দৃষ্টিকে কোন পর্দা ঠেকাতে পারে না। কারও কারও মতে ইউসুফ (আ)-এর নবুয়ত ও বিজ্ঞজ্ঞানই ছিল স্বয়ং পালনকর্তার প্রমাণ।

তফসীরবিদ ইবনে কাসীর এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর যে মন্তব্য করেছেন, তা সব সুধীজনের কাছেই সর্বাপেক্ষা সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন: কোরআন-পাক যতটুকু বিষয় বর্ণনা করেছে, ততটুকু নিয়েই ক্ষান্ত থাকা দরকার। অর্থাৎ ইউসুফ

(আ) এমন কিছু বস্তু দেখেছেন, যদ্দরুন তাঁর মন থেকে সীমালংঘন করার সামান্য ধারণাও বিদূরিত হয়ে গেছে। এ বস্তুটি কি ছিল—তফসীরবিদগণ যেসব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন; সেগুলোর যে কোন একটাই হতে পারে। তাই নিশ্চিতরূপে কোন একটিকে নির্দিষ্ট করা যায় না।—(ইবনে কাসীর)

كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

অর্থাৎ আমি ইউসুফ (আ)-কে এ প্রমাণ এজন্য দেখিয়েছি, যাতে তার কাছ থেকে মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতাকে দূরে সরিয়ে দেই। 'মন্দ কাজ' বলে সগীরা গোনাহ্ এবং 'নির্লজ্জতা' বলে কবীরা গোনাহ্ বুঝানো হয়েছে।—(মাযহারী)

এখানে একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতাকে ইউসুফ (আ)-এর কাছ থেকে সরানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইউসুফ (আ)-কে মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতা থেকে সরানোর কথা বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইউসুফ (আ) নবুয়তের কারণে এ গোনাহ্ থেকে নিজেই দূরে ছিলেন কিন্তু মন্দ কাজ নির্লজ্জতা তাঁকে আবেষ্টন করার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু আমি এর জাল ছিন্ন করে দিয়েছি। কোরআন পাকের এ ভাষাও সাক্ষ্য দেয় যে, ইউসুফ (আ) কোন সামান্যতম গোনাহেও লিপ্ত হননি এবং তাঁর মনে যে কল্পনা জাগরিত হয়েছিল, তা গোনাহ্র অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নতুবা এখানে এভাবে ব্যক্ত করা হত যে, আমি ইউসুফকে গোনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে দিলাম—এভাবে বলা হত না যে, গোনাহ্কে তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে দিলাম।

কেননা, ইউসুফ আমার মনোনীত বান্দাদের একজন। এখানে مُخْلَصِينَ শব্দটি লামের যবর-যোগে مُخْلَص -এর বহুবচন। এর অর্থ মনোনীত। উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ (আ) আল্লাহ্ তা'আলার ঐ সব বান্দার অন্যতম, যাঁদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্ রিসালতের দায়িত্ব পালন ও মানবজাতির সংশোধনের জন্য মনোনীত করেছেন। এমন লোকদের চারপাশে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হিফাজতের পাহারা থাকে, যাতে তাঁরা কোন মন্দ কাজে লিপ্ত হতে না পারেন। স্বয়ং শয়তানও তার বিবৃতিতে একথা স্বীকার করেছে যে, আল্লাহ্র মনোনীত বান্দাদের ওপর তার কলাকৌশল অচল। শয়তানের উক্তি এই :

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝ অর্থাৎ

আপনার ইয্যত ও শক্তির কসম, আমি সব মানুষকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করব, তবে যে সব বান্দাকে আপনি মনোনীত করেছেন, তাদেরকে ছাড়া।

কোন কোন কিরা'আতে এ শব্দটি مُخْلِصِينَ লামের যের-যোগেও পঠিত হয়েছে। مُخْلِص —ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্য আন্তরিকতার সাথে করে—এতে কোন পার্থিব ও প্রবৃত্তিগত উদ্দেশ্য, সুখ্যাতি ইত্যাদির প্রভাব থাকে না। এমতাবস্থায়

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তিই স্বীয় কর্ম ও ইবাদতে আন্তরিক হয়, পাপ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সাহায্য করেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা দুটি শব্দ فحشاء ও سوء ব্যবহার করেছেন। প্রথমটির শাব্দিক অর্থ মন্দ কাজ এবং এর দ্বারা সগীরা গোনাহ্ বুঝানো হয়েছে। فحشاء শব্দের অর্থ নির্লজ্জতা। এর দ্বারা কবীরা গোনাহ্ বুঝান হয়েছে। এত দ্বারা বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে সগীরা ও কবীরা উভয় প্রকার গোনাহ্ থেকেই মুক্ত রেখেছেন।

এ থেকে আরও বোঝা গেল যে, কোরআনে ইউসুফ (আ)-এর প্রতি যে هم অর্থাৎ কল্পনা শব্দটিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, তা নিছক অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল, যা কবীরা ও সগীরা কোন প্রকারের গোনাহেরই অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং মাফ।

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ
قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا اِلَّآ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ﴿٢٥﴾ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۚ
اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٦﴾ وَاِنْ
كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا
رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۖ اِنَّ كَيْدَكُنَّ
عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾ يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۚ اِنَّكِ
كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ ﴿٢٩﴾

(২৫) তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং মহিলা ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল। উভয়ে মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল। মহিলা বলল ঃ যে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে তাকে কারাগারে পাঠানো অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া ছাড়া তার আর কি শাস্তি হতে পারে? (২৬) ইউসুফ (আ) বললেন ঃ সে-ই আমাকে আত্মসংবরণ না করতে ফুসলিয়েছে। মহিলার পরিবারের জনৈক সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা সত্যবাদিনী এবং সে মিথ্যাবাদী। (২৭) এবং যদি তার জামা পিছন দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা মিথ্যাবাদিনী এবং সে সত্যবাদী। (২৮) অতঃপর গৃহস্বামী যখন দেখল

যে, তার জামা পিছন দিক থেকে ছিন্ন, তখন সে বলল ঃ নিশ্চয় এটা তোমাদের ছলনা। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক। (২৯) ইউসুফ এ প্রসঙ্গ ছাড়! আর হে স্ত্রীলোক এ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে তুমি-ই পাপাচারিনী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[যখন মহিলা আবার পীড়াপীড়ি করল, তখন ইউসুফ (আ) প্রাণপণে সেখান থেকে দৌড় দিলেন এবং সে তাকে ধরার জন্য পেছনে দৌড় দিল] এবং তারা উভয়ে আগে পিছে দরজার দিকে দৌড় দিল এবং (দৌড় দেওয়া অবস্থায় যখন তাঁকে ধরতে চাইল, তখন) মহিলা তার জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল [অর্থাৎ সে জামা ধরে টান দিতে চেয়েছিল এবং ইউসুফ (আ) সামনের দিকে দৌড় দিয়েছিলেন। ফলে জামা ছিঁড়ে গেল কিন্তু ইউসুফ (আ) দরজার বাইরে চলে গেলেন] আর (মহিলাও তাঁর পশ্চাতে ছিল। তখন) উভয়ে (ঘটনাচক্রে) মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে (দণ্ডায়মান) পেল। মহিলা স্বামীকে দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল এবং (তৎক্ষণাৎ কথা বানিয়ে) বলল ঃ যে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি এছাড়া আর কি (হতে পারে) যে, তাকে কারাগারে পাঠানো হবে অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে (যেমন দৈহিক নির্যাতন)। ইউসুফ (আ) বললেন ঃ (সে যে আমাকে অভিযুক্ত করার ইঙ্গিত করছে, সে সম্পূর্ণ মিথ্যা বাদিনী বরং ব্যাপার উল্টো)। সে-ই আমার দ্বারা স্বীয় কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্য আমাকে ফুসলাচ্ছিল এবং (এসময়) সেই মহিলার পরিবারের একজন সাক্ষী [যে ছিল দুগ্ধপায়ী শিশু। ইউসুফ (আ)-এর মু'জেযাস্বরূপ সে কথা বলতে শুরু করল এবং তাঁর পবিত্রতার] সাক্ষ্য দিল [এ শিশুর কথা বলাই ছিল ইউসুফ (আ)-এর একটি মু'জেযা। তদুপরি দ্বিতীয় মু'জেযা এই প্রকাশ পেল যে, এ দুগ্ধপায়ী শিশু একটি যুক্তিসঙ্গত আলামত বর্ণনা করে বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালাও প্রদান করল এবং বলল] যে, তার জামা (দেখ, তা কোন্ দিকে ছিন্ন রয়েছে,) যদি সামনের দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে, তবে মহিলা সত্য-বাদিনী এবং সে মিথ্যাবাদী এবং যদি জামাটি পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে, তবে মহিলা মিথ্যাবাদিনী এবং সে সত্যবাদী। অতঃপর যখন (আজিজ) তার জামা পেছন দিক থেকে ছিন্ন দেখল, তখন (মহিলাকে) বলল ঃ এটা তোমাদের ছলনা। নিঃসন্দেহে তোমা-দের ছলনাও বড় মারাত্মক হয়ে থাকে। [অতঃপর ইউসুফ (আ)-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল ঃ] ইউসুফ, এ বিষয়টি ছেড়ে দাও (অর্থাৎ এর আলোচনা করো না কিংবা কিছু মনে নিও না)। এবং (মহিলাকে) বলল ঃ তুমি (ইউসুফের কাছে) স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তুমিই অপরাধিনী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে যে আজীজে-মিসরের পত্নী যখন ইউসুফ (আ)-কে পাপে লিপ্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃতা ছিল এবং ইউসুফ (আ) তা থেকে আত্ম-

রক্ষার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু মনে স্বাভাবিক ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনার দ্বিধাদ্বন্দ্বও ছিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মনোনীত পয়গম্বরের সাহায্যার্থে অলৌকিকভাবে কোন এমন বস্তু তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত করে দেন, যার ফলে সে অনিচ্ছাকৃত কল্পনাও তাঁর মন থেকে উধাও হয়ে যায়। সে বস্তুটি পিতা ইয়াকুব (আ)-এর আকৃতিই হোক কিংবা ওহীর কোন আয়াত।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইউসুফ (আ) এ নির্জন কক্ষে আল্লাহ্র প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথেই সেখান থেকে পলায়নোদ্যত হলেন এবং বাইরে চলে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে দৌড় দিলেন। আজীজ-পত্নী তাঁকে ধরার জন্য পেছনে দৌড় দিল এবং তাঁর জামা ধরে তাঁকে বহির্গমনে বাধা দিতে চাইল। তিনি পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ়সংকল্প, তাই থামলেন না। ফলে জামা পেছন দিক থেকে ছিন্ন হয়ে গেল। ইত্যবসরে ইউসুফ (আ) দরজার বাইরে চলে গেলেন এবং তাঁর পশ্চাতে যুলায়খাও তথায় উপস্থিত হল। ঐতিহাসিকসূত্রে বর্ণিত আছে যে, দরজা তালাবদ্ধ ছিল। ইউসুফ (আ) দৌড়ে দরজায় পৌঁছ-তেই আপনা-আপনি তালা খুলে নিচে পড়ে গেল।

উভয়ে দরজার বাইরে এসে আজীজে-মিসরকে সামনেই দণ্ডায়মান দেখতে পেল। তার পত্নী চমকে উঠল এবং কথা বানিয়ে ইউসুফ (আ)-এর উপর দোষ ও অপবাদ চাপা-নোর জন্য বলল ঃ যে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি এ ছাড়া কি হতে পারে যে, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে অথবা অন্য কোন কঠোর দৈহিক নির্যাতন।

ইউসুফ (আ) পয়গম্বরসুলভ ভদ্রতার খাতিরে সম্ভবত সেই মহিলার গোপন অভি-সন্ধির তথ্য প্রকাশ করতেন না কিন্তু যখন সে নিজেই এগিয়ে এসে ইউসুফ (আ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের ইঙ্গিত করল, তখন বাধ্য হয়ে তিনিও সত্য প্রকাশ করে বললেন ঃ

هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي —অর্থাৎ সে-ই আমার দ্বারা স্বীয় কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য আমাকে ফুসলাচ্ছিল।

ব্যাপার ছিল খুবই নাজুক এবং আজীজে-মিসরের পক্ষে কে সত্যবাদী, তার মীমাংসা করা সুকঠিন ছিল। সাক্ষ্য-প্রমাণের কোন অবকাশ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে গোনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে নিষ্পাপ ও পবিত্র রাখেন, এমনিভাবে দুনিয়াতেও তাঁদেরকে গোনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে রাখার অলৌকিকভাবে ব্যবস্থা করে দেন। সাধারণত এরূপ ক্ষেত্রে স্বভাবত কথা বলতে অক্ষম —এরূপ কচি শিশুদেরকে কাজে লাগানো হয়েছে। অলৌকিকভাবে তাদেরকে বাকশক্তি দান করে প্রিয় বান্দাদের পবিত্রতা সপ্রমাণ করা হয়েছে। যেমন হযরত মরিয়মের প্রতি যখন লোকেরা অপবাদ আরোপ করতে থাকে, তখন একদিনের কচি শিশু ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা বাকশক্তি দান করে তাঁর মুখে জননীর পবিত্রতা প্রকাশ করে দেন এবং স্বীয় কুদরতের একটি বিশেষ দৃশ্য সবার সামনে প্রকাশ করেন। বনী ইসরাঈলের একজন সাধু ব্যক্তি জুরাইজের প্রতি গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এমনি ধরনের একটি অপবাদ আরোপ করা হলে নবজাত শিশু

সেই ব্যক্তির পবিত্রতার সাক্ষ্য দান করে। মূসা (আ)-এর প্রতি ফিরাউনের মনে সন্দেহ দেখা দিলে ফিরাউন-পত্নীর কেশ পরিচর্যাকারিণী মহিলার সদ্যজাত শিশু বাকশক্তি প্রাপ্ত হয়। সে মূসা (আ)-কে শৈশবে ফিরাউনের কবল থেকে রক্ষা করে।

ঠিক এমনিভাবে ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা)-র বর্ণনা অনুযায়ী একটি কচি শিশুকে আল্লাহ্ তা'আলা বিজ্ঞ ও দার্শনিক সুলভ বাকশক্তি দান করলেন। এ কচি শিশু এ গৃহেই দোলনায় লালিত হচ্ছিল। তার সম্পর্কে কার ধারণা ছিল যে, সে এসব কর্মকাণ্ড দেখবে এবং বুঝবে, অতঃপর অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে তা বর্ণনাও করে দেবে। কিন্তু সর্বশক্তিমান স্বীয় আনুগত্যের পথে সাধনাকারীদের সঠিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলার জন্য জগদ্বাসীকে দেখিয়ে দেন যে, বিশ্বে প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু তাঁর গুপ্ত পুলিশ (গোয়েন্দা বাহিনী)। এরা অপরাধীকে ভালভাবেই চেনে, তার অপরাধের রেকর্ড রাখে এবং প্রয়োজন মুহূর্তে তা প্রকাশও করে দেয়। হাশরের ময়দানে হিসাব-কিতাবের সময় মানুষ দুনিয়ার পুরাতন অভ্যাস অনুযায়ী যখন স্বীয় অপরাধসমূহ স্বীকার করতে অস্বীকার করবে, তখন তারই হস্তপদ, চর্ম ও গৃহপ্রাচীরকে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদাতারূপে দাঁড় করানো হবে। তারা তার প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ড হাশরের লোকারণ্যের মধ্যে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দেবে। তখন মানুষ বুঝতে পারবে যে, হস্তপদ, গৃহ-প্রাচীর ও রক্ষা ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে কোনটিই তার আপন ছিল না বরং এরা সবাই ছিল রাব্বুল আলামীনের গোপন পুলিশ বাহিনী।

মোট কথা এই যে, যে ছোট্ট শিশুটি বাহ্যত জগতের সবকিছু থেকে উদাসীন ও নির্বিকার অবস্থায় দোলনায় পড়েছিল, সে ইউসুফ (আ)-এর মু'জিযা হিসেবে ঠিক ঐ মুহূর্তে মুখ খুলল, যখন আজীজে-মিসর ছিল এ ঘটনা সম্পর্কে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত।

এ শিশুটি যদি এতটুকুই বলে দিত যে, ইউসুফ (আ) নির্দোষ এবং দোষ যুলায়খার, তবে তাও একটি মু'জিযারূপে ইউসুফ (আ)-এর পক্ষে তাঁর পবিত্রতার বিরাট সাক্ষ্য হয়ে যেত কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ শিশুর মুখে একটি দার্শনিকসুলভ উক্তি উচ্চারণ করিয়েছেন যে, ইউসুফ (আ)-এর জামাটি দেখ—যদি তা সামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে যুলায়খার কথা সত্য এবং ইউসুফ (আ) মিথ্যাবাদীরূপে সাব্যস্ত হবেন। পক্ষান্তরে যদি জামাটি পেছন দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে এতে এ ছাড়া অন্য কোন আশংকাই নেই যে, ইউসুফ (আ)-পলায়নরত ছিলেন এবং যুলায়খা তাঁকে পলায়নে বাধা দিতে চাচ্ছিল।

শিশুর বাকশক্তির অলৌকিকতা ছাড়াও এ বিষয়টি প্রত্যেকের হৃদয়ঙ্গম হতে পারত। অতঃপর যখন বর্ণিত আলামত অনুযায়ী জামাটি পেছন দিক থেকে ছিন্ন দেখা গেল, তখন বাহ্যিক আলামত দৃষ্টেও ইউসুফ (আ)-এর পবিত্রতা সপ্রমাণ হয়ে গেল।

'সাক্ষ্যদাতা'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা বলেছি যে, সে ছিল একটি কচি শিশু, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা অলৌকিকভাবে বাকশক্তি দান করেন। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে এ ব্যাখ্যা প্রমাণিত রয়েছে। ইমাম আহমদ স্বীয় মসনদে, ইবনে হাব্বান স্বীয় গ্রন্থে এবং হাকিম তাঁর মুস্তাদরাকে এটি উল্লেখ করে বর্ণনাটিকে সহীহ্ হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীসে বলা হয়েছে : আল্লাহ্ তা'আলা চারটি শিশুকে দোলনায় বাকশক্তি দান করেছেন। এ শিশু চতুষ্টয় তারাই, যাদের কথা এইমাত্র বর্ণনা করা হয়েছে।—(মাযহারী) কোন কোন রেওয়ায়েতে 'সাক্ষ্যদাতা'র অন্যান্য ব্যাখ্যাও বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু ইবনে জরীর, ইবনে-কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদের মতে প্রথম ব্যাখ্যাই অগ্রগণ্য।

কতিপয় বিধান ও মাস'আলা : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় বিধান ও মাস-আলা বুঝা যায় :

মাস'আলা : (১) وَاسْتَبَقَا الْبَابَ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, যে জায়গায় পাপে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে, সে জায়গাকেই পরিত্যাগ করা উচিত; যেমন ইউসুফ (আ) সেখান থেকে পলায়ন করে এর প্রমাণ দিয়েছেন।

মাস'আলা : (২) আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলী পালনে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার ত্রুটি না করা মানুষের অবশ্যই কর্তব্য, যদিও এর ফলাফল বাহ্যত বের হতে দেখা না যায়। ফলাফল আল্লাহ্র হাতে। মানুষের কাজ হল স্বীয় শ্রম ও সাধ্যকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে দাসত্বের পরিচয় দেওয়া, যেমন ইউসুফ (আ)—সব দরজা বন্ধ হওয়া এবং ঐতি-হাসিক বর্ণনা অনুযায়ী তালাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দরজার দিকে দৌড় প্রদানে নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে দিয়েছেন। এহেন অবস্থায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্যের আগমনও অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা হয়। বান্দা যখন নিজের চেষ্টা পূর্ণ করে ফেলে তখন আল্লাহ্র সাফল্যের উপকরণাদিও সরবরাহ করে দেন। মওলানা রূমী এ বিষয়বস্তু সম্পর্কেই বলেন :

گرچہ رخنہ نیست عالم را پدید
خیرہ یوسف وار می باید دوید

এমতাবস্থায় বাহ্যিক সফলতা অর্জিত না হলেও এ অকৃতকার্যতা বান্দার জন্য কৃত-কার্যতার চাইতে কম নয় —

گر مرادت را مذاق شکرست
نامرادی نے مراد دلبرست

জনৈক বুযুর্গ আলিম কারাগারে ছিলেন। তিনি শুক্রবার দিন স্বীয় সামর্থ্য ও ক্ষমতা অনুযায়ী গোসল করতেন, কাপড়-চোপড় ধুতেন, অতঃপর জুম'আর জন্য তৈরী হয়ে কারাগারের ফটক পর্যন্ত যেতেন। সেখানে পৌঁছে বলতেন : ইয়া আল্লাহ্, এতটুকুই আমার সাধ্য ছিল। এরপর আপনার মর্জি। আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপক অনুগ্রহদৃষ্টে এটা অসম্ভব ছিল না যে, কারাগারের দরজা খুলে যেত এবং তিনি জুম'আর নামায পড়ে নিতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এই বুযুর্গকে এমন উচ্চমর্যাদা দান করলেন, যার সামনে, হাজারো কেরামত তুচ্ছ। তাঁর এ কর্মের কারণে কারাগারের দরজা খোলেনি কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি স্বীয় কর্মে সাহস হারালেন না। প্রতি শুক্রবারে অবিরাম এ কর্ম করে গেলেন। কর্মের এ দৃঢ়তাকেই শীর্ষস্থানীয় সুফী-বুযুর্গগণ কেরামতের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন।

মাস'আলা ঃ (৩) এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, কারও প্রতি কোন মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হলে আত্মপক্ষ সমর্থন করে সাফাই বলা পয়গম্বরগণের সুন্নত। এসময় চুপ থেকে নিজেই নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করা কোন তাওয়াক্কুল বা বুযুর্গী নয়।

মাস'আলা ঃ (৪) شاهد শব্দটি যখন লেনদেন ও মামলা-মোকদ্দমার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তখন ঐ ব্যক্তিকে বোঝায়, যে বিচারাধীন ব্যাপার সম্পর্কে কোন চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করে। আলোচ্য আয়াতে যাকে شاهد শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, সে কোন ঘটনা অথবা তৎসম্পর্কিত নিজের কোন চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেনি বরং ফয়সালার একটি প্রকারের দিকে ইঙ্গিত করেছে মাত্র। পরিভাষার দিক দিয়ে তাকে شاهد বা সাক্ষ্যদাতা বলা যায় না।

কিন্তু এসব পরিভাষা পরবর্তীকালের আলিম ও ফিকাহ্‌বিদগণ বিষয়টা সহজে বোঝানোর জন্য রচনা করেছেন। এগুলো কোরআন পাকের পরিভাষা নয় এবং এগুলো মেনে চলতে কোরআন বাধ্যও নয়। কোরআন এখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এ অর্থের দিক দিয়ে شاهد তথা সাক্ষ্যদাতা বলেছে যে, সাক্ষ্যদাতার বর্ণনা দ্বারা যেমন বিচারের মীমাংসা সহজ এবং এক পক্ষের সত্যবাদী হওয়া প্রমাণিত হয়ে যায়, এ শিশুর বর্ণনার দ্বারাও এমনি ধরনের উপকার সাধিত হয়েছে। তার অলৌকিক বাকশক্তিই আসলে ইউসুফ (আ)-এর পবিত্রতার প্রমাণ ছিল। তদুপরি সে যেসব আলামত ব্যক্ত করেছে, সেগুলোও পরিণামে ইউসুফ (আ)-এরই পবিত্রতার সাক্ষী। তাই একথা বলা নির্ভুল যে, সে ইউসুফ (আ)-এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে অথচ ইউসুফ (আ)-কে সত্যবাদী বলেনি বরং উভয় সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছে। সে যুলায়খার সত্যবাদিতা এমন এক অবস্থায় ধরে নেওয়ার পর্যায়ে স্বীকার করে নিয়েছিল যাতে তার সত্যবাদিনী হওয়া নিশ্চিত ছিল না বরং বিপরীত হওয়ার আশংকা বিদ্যমান ছিল। কেননা, সামনের দিকে জামা ছিন্ন হওয়া উভয় অবস্থাতেই সম্ভবপর। পক্ষান্তরে ইউসুফ (আ)-এর সত্যবাদিতাকে সে এমন এক অবস্থায় স্বীকার করে নিয়েছিল, যাতে এছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু ইউসুফ (আ)-এর পবিত্রতা প্রমাণিত হওয়াই ছিল এ কর্মপন্থার শেষ পরিণতি।

মাস'আলা ঃ (৫) এ থেকে বোঝা যায় যে, মামলা-মোকদ্দমা ও বিচার-আচারের মীমাংসায় ইঙ্গিত ও আলামতের সাহায্য নেওয়া যায়, যেমন এ সাক্ষ্যদাতা, জামার পিছন দিক থেকে ছিন্ন হওয়াকে এ বিষয়ের আলামত সাব্যস্ত করেছে যে, ইউসুফ (আ) পলায়নরত ছিলেন এবং যুলায়খা তাঁকে পাকড়াও করার চেষ্টা করছিল। এ ব্যাপারে সব ফিকাহবিদ একমত যে, ঘটনাবলীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে আলামত ও ইঙ্গিতকে অবশ্যই কাজে লাগানো উচিত, যেমন এখানে করা হয়েছে কিন্তু শুধু আলামত ও ইঙ্গিতকেই একমাত্র প্রমাণের মর্যাদা দেওয়া যায় না। ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায়ও প্রকৃতপক্ষে পবিত্রতার প্রমাণ হচ্ছে কচি শিশুর অলৌকিকভাবে কথাবার্তা বলা। এর সাথে যেসব আলামত ও ইঙ্গিত উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর দ্বারা বিষয়টি সমর্থিত হয়েছে।

মোট কথা, এ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে যে, যুলায়খা যখন ইউসুফ (আ)-এর চরিত্রে অপবাদ আরোপ করল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা একটি কচি শিশুকে বাকশক্তি দান করে তার মুখ থেকে এ বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা প্রকাশ করলেন যে, ইউসুফ (আ)-এর জামাটি দেখা হোক। যদি তা পেছন দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে তা এ বিষয়ের পরিষ্কার আলামত যে, তিনি পলায়ন করছিলেন এবং যুলায়খা তাঁকে ধরার চেষ্টা করছিল। কাজেই ইউসুফ (আ) নির্দোষ।

আলোচ্য আয়াতসমূহের শেষ দু'আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আজীজে-মিসর শিশু-টির এভাবে কথা বলা দ্বারাই বুঝে নিয়েছিল যে, ইউসুফ (আ)-এর পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্যই এ অস্বাভাবিক তথা অলৌকিক ঘটনার অবতারণা হয়েছে। অতঃপর তার বক্তব্য অনুযায়ী যখন দেখল যে, ইউসুফ (আ)-এর জামাটিও পেছন দিক থেকেই ছিন্ন, সে তখন নিশ্চিত হয়ে গেল যে, দোষ যুলায়খার এবং ইউসুফ (আ) পবিত্র। তদনুসারে সে যুলায়খাকে সম্বোধন করে বলল : إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ অর্থাৎ এসব তোমার ছলনা। তুমি নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাও। এরপর বলল : নারী জাতির ছলনা খুবই মারাত্মক। একে বোঝা এবং এর জাল ছিন্ন করা সহজ নয়। কেননা, তারা বাহ্যত কোমল, নাজুক ও অবলা হয়ে থাকে। যারা তাদেরকে দেখে, তারা তাদের কথায় দ্রুত বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলে। কিন্তু বুদ্ধি ও ধর্মভীরুতার অভাববশত তা অধিকাংশ সময় ছলনা হয়ে থাকে।— (মাযহারী)

তফসীর কুরতুবীতে আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, নারীদের ছলনা ও চক্রান্ত শয়তানের ছলনা ও চক্রান্তের চাইতে গুরুতর। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে বলেছেন : إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا অর্থাৎ শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। পক্ষান্তরে নারীদের চক্রান্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে : إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ —অর্থাৎ তোমাদের চক্রান্ত খুবই জটিল। এটা জানা কথা যে, এখানে সব নারী বুঝানো হয়নি বরং ঐসব নারী সম্পর্কেই বলা হয়েছে, যারা এ ধরনের ছল-চাতুরীতে লিপ্ত থাকে। আজীজে-মিসর যুলায়খার ভুল বর্ণনা করার পর ইউসুফ (আ)-কে বলল : يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا অর্থাৎ ইউসুফ, এ ঘটনাকে উপেক্ষা কর এবং বলাবলি করো না, যাতে বেইজ্জতি না হয়। অতঃপর যুলায়খাকে সম্বোধন করে বলল : وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ অর্থাৎ ভুল তোমারই। তুমি নিজ ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। এতে বাহ্যত বুঝানো হয়েছে

যে, স্বামীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ (আ)-এর কাছে ক্ষমা চাও। কারণ, নিজে অন্যায় করেছ এবং দোষ তাঁর ঘাড়ে চাপিয়েছ।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, স্বামীর সামনে স্ত্রীর এহেন বিশ্বাসঘাতকতা ও নির্লজ্জতা প্রমাণিত হওয়ার পরও তার উত্তেজিত না হওয়া এবং পূর্ণ ধীরতা ও স্থিরতা সহকারে কথাবার্তা বলা মানবস্বভাবের পক্ষে বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ এর কারণ হয়তো এই যে, আজীজে-মিসরের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ বলতে কোন কিছু ছিল না। দ্বিতীয়ত, এটাও সম্ভবপর যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে গোনাহ্ থেকে অতঃপর বদনামী থেকে বাঁচাবার জন্য যে অলৌকিক ব্যবস্থা করেছিলেন, তারই অংশ হিসেবে আজীজে-মিসরকে ক্রোধে উত্তেজিত হতে দেননি। নতুবা সহজাত অভ্যাস অনুযায়ী এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণত প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধান না করেই ধৈর্য-হারা হয়ে পড়ে এবং মারপিট শুরু করে দেয়। মৌখিক গালিগালাজ তো মামুলী বিষয়। মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী যদি আজীজে-মিসর উত্তেজিত হয়ে যেত, তবে তার মুখ কিংবা হাত দ্বারা ইউসুফ (আ)-এর পক্ষে মর্যাদাহানিকর কোন কিছু ঘটে যাওয়া বিচিত্র ছিল না। এটা আল্লাহ্র কুদরতেরই লীলা। তিনি আনুগত্যশীল বান্দাদের পদে পদে হিফাযত করেন। فتبارك الله احسن الخالقين

পরবর্তী আয়াতসমূহে অন্য ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী কাহিনীর সাথেই সংশ্লিষ্ট। তা এই যে, এ ঘটনা গোপন করা সত্ত্বেও শাহী দরবারের পদস্থ ব্যক্তিদের অন্তঃপুরে তা ছড়িয়ে পড়ল। তারা আজীজে-মিসরের স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এরূপ মহিলার সংখ্যা ছিল পাঁচ এবং এরা সবাই ছিল আজীজে-মিসরের নিকটতম কর্মকর্তাদের স্ত্রী।—(কুরতুবী, মাযহারী)

তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল ঃ দেখ, কেমন বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয়। আজীজে-মিসরের বেগম এতবড় পদমর্যাদা সত্ত্বেও নিজের তরুণ ক্রীতদাসের প্রতি প্রেমা-সক্ত হয়ে তাঁর দ্বারা কুমতলব চরিতার্থ করতে চায়। আমরা তাকে নিদারুণ পথভ্রষ্ট মনে করি। আয়াতে فتى শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ তরুণ। সাধারণের পরিভাষায় অল্পবয়স্ক ক্রীতদাসকে গোলাম, যুবক ক্রীতদাসকে فتى এবং যুবতী ক্রীত-দাসীকে ঃ فتاة বলা যায়। এখানে ইউসুফ (আ)-কে যুলায়খার ক্রীতদাস বলার কারণ হয়তো এই যে, স্বামীর জিনিসকেও স্ত্রীর জিনিস বলার অভ্যাস প্রচলিত রয়েছে অথবা যুলায়খা ইউসুফ (আ)-কে স্বামীর কাছ থেকে উপঢৌকন হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছিল। —(কুরতুবী)

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتٰهَا عَنْ نَّفْسِهٖ

قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۚ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ فَلَمَّا سَمِعَتْ

بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّ قَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ﴿٣١﴾ قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِىْ لُمْتُنَّنِىْ فِيْهِ ؕ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ؕ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَاۤ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِىْۤ اِلَيْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّىْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٣٣﴾ فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٣٥﴾

(৩০) নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, আজীজের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলায়। সে তার প্রেমে উম্মত্ত হয়ে গেছে। আমরা তো তাকে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি। (৩১) যখন সে তাদের চক্রান্ত শুনল, তখন তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্য একটি ভোজসভার আয়োজন করল। সে তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিল। বলল ঃ ইউসুফ, এদের সামনে চলে এস। যখন তারা তাকে দেখল, হতভম্ব হয়ে গেল এবং আপন হাত কেটে ফেলল। তারা বলল ঃ কখনই নয়—এ ব্যক্তি মানব নয়! এ তো কোন মহান ফেরেশতা! (৩২) মহিলা বলল ঃ এ ঐ ব্যক্তি, যার জন্য তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করছিলে। আমি ওরই মন জয় করতে চেয়েছিলাম! কিন্তু সে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে। আর আমি যা আদেশ দেই, সে যদি তা না করে, তবে অবশ্যই সে কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাঞ্ছিত হবে। (৩৩) ইউসুফ বলল ঃ হে পালনকর্তা, তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে, তার চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (৩৪) অতঃপর তার পালনকর্তা তার দোয়া কবুল করে নিলেন। অতঃপর তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (৩৫) অতঃপর এসব নিদর্শন দেখার পর তারা তাকে কিছু দিন কারাগারে রাখা সমীচীন মনে করল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শহরের কিছুসংখ্যক মহিলা বলাবলি করল যে, আযীযের স্ত্রী স্বীয় ক্রীতদাসকে তার দ্বারা (অবৈধ) মতলব হাসিলের জন্য ফুসলায় (কেমন নীচ কাণ্ড যে, ক্রীতদাসের জন্য মরে!) এ ক্রীতদাসের প্রেম তার অন্তরে আসন করে নিয়েছে। আমরা তো তাকে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর যখন সে তাদের কুৎসা (সংবাদ) শুনল, তখন কারও মাধ্যমে তাদেরকে ডেকে পাঠাল (যে, তোমাদের দাওয়াত) এবং তাদের জন্য তাকিয়াযুক্ত আসন সজ্জিত করল এবং (যখন তারা আগমন করল এবং তাদের সামনে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও ফল উপস্থিত করল—তন্মধ্যে কিছু খাদ্যবস্তু চাকু দ্বারা কেটে খাওয়ার ছিল। তাই) প্রত্যেককে এক-একটি চাকু (-ও) দিল, (যা বাহ্যত ফলকাটার উপলক্ষে ছিল এবং আসল লক্ষ্য পরে বর্ণিত হবে যে, তারা দিশাহারা হয়ে নিজ নিজ হাতই ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলবে) এবং [এসব আয়োজন সমাপ্ত করে এক কক্ষে অবস্থান-কারী ইউসুফ (আ)-কে] বলল: এদের সামনে একটু আস। [ইউসুফ (আ) মনে করলেন যে, হয়তো কোন সদুদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, তাই বাইরে আসলেন।] মহিলারা যখন তাঁকে দেখল, তখন (তাঁর রূপ-লাবন্য প্রত্যক্ষ করে) কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল এবং (এ হত-বুদ্ধিতায়) নিজ নিজ হাতই কেটে ফেলল। [তারা চাকু দিয়ে ফল কাটছিল। ইউসুফ (আ)-কে দেখে হতবুদ্ধিতায় এমন আচ্ছন্ন হল যে, চাকু হাতে লেগে গেল—) বলতে লাগল: আল্লাহ্র কসম, এ ব্যক্তি মানব কখনই নয়, সে তো একজন মহান ফেরেশতা। যুলায়খা বলল: (দেখে নাও) সে ঐ ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করতে; (আমি ক্রীতদাসের প্রেমে পড়েছি বলে রটনা করতে) এবং বাস্তবিকই আমি তার দ্বারা স্বীয় কুমতলব চরিতার্থ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে নিষ্পাপ রয়েছে এবং [অতঃপর ইউসুফ (আ)-কে শাসনের উদ্দেশ্যে তাঁকে শুনিয়েই বলল:] যদি ভবিষ্যতে সে আমার আদেশ পালন না করে, (যেমন এ পর্যন্ত পালন করেনি) তবে অবশ্যই কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাঞ্ছিত হবে। [সমাগত মহিলারাও ইউসুফ (আ)-কে বলতে লাগল: যে মহিলা তোমার এতটুকু উপকার করেছে, তার প্রতি এমন বিমুখতা তোমার জন্য উপযুক্ত নয়, তার আদেশ পালন করা উচিত।] ইউসুফ (এসব কথা শুনলেন এবং দেখলেন যে, তারা সবাই যুলায়খার সুরে সুর মিলাচ্ছে, তখন আল্লাহ্র কাছে) দোয়া করলেন: হে আমার পালন-কর্তা, যে অবৈধ কাজের দিকে মহিলারা আমাকে আহ্বান করছে, এর চাইতে কারাগারে যাওয়াই আমি অধিক পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি হয়ত তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ব এবং নির্বুদ্ধিতার কাজ করে বসব। অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং মহিলাদের চক্রান্ত প্রতিহত করে দিলেন। নিশ্চয় তিনি দোয়া শ্রবণকারী (তাঁর হাল-হকিকত সম্পর্কে) জ্ঞানবান। এরপর (ইউসুফের পবিত্রতার) বিভিন্ন নির্দশন দেখার পর (যদ্দারা ইউসুফের সচ্চরিত্রতা সম্পর্কে স্বয়ং তাদের মনে কোন সন্দেহ রইল না, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে বিষয়টি প্রচার হয়ে গিয়েছিল, তা দূর করার উদ্দেশ্যে) তাদের কাছে (অর্থাৎ আযীয ও

তাঁর পারিষদবর্গের কাছে) এটাই সমীচীন মনে হল যে, তাকে কিছু দিনের জন্য কারা-গারে রাখা হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ—অর্থাৎ যখন যুলায়খা উক্ত মহিলাদের চক্রান্তের কথা জানতে পারল, তখন তাদেরকে একটি ভোজসভায় ডেকে পাঠাল।

এখানে মহিলাদের কানাঘুষাকে যুলায়খা مكر অর্থাৎ চক্রান্ত বলেছে। অথচ বাহ্যত তারা কোন চক্রান্ত করেনি। কিন্তু যেহেতু তারা গোপনে গোপনে কুৎসা রটনা করত, তাই একে চক্রান্ত বলা হয়েছে।

وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً—অর্থাৎ তাদের জন্য তাকিয়াযুক্ত আসন সজ্জিত করল।

وَاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا—অর্থাৎ যখন মহিলারা ভোজসভায় উপস্থিত হল, তাদের সামনে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও ফল উপস্থিত করা হল। তন্মধ্যে কিছু খাদ্য চাকু দিয়ে কেটে খাওয়ার ছিল। তাই প্রত্যেককে এক একটি চাকুও দেওয়া হল। এর বাহ্যিক উদ্দেশ্য তো ছিল ফল কাটা; কিন্তু মনে অন্য ইচ্ছা লুক্কায়িত ছিল, যা পরে বর্ণিত হবে। অর্থাৎ আগত মহিলারা ইউসুফ (আ)-কে দেখে হতভম্ব হয়ে যাবে এবং চাকু দিয়ে ফলের পরিবর্তে নিজ নিজ হাত কেটে ফেলবে।

وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ—অর্থাৎ এসব আয়োজন সমাপ্ত করার পর অন্য এক কক্ষে অবস্থানরত ইউসুফ (আ)-কে যুলায়খা বলল : একটু বের হয়ে এস। ইউসুফ (আ) তার কু-উদ্দেশ্য জানতেন না। তাই বাইরে এসে ভোজসভায় উপস্থিত হলেন।

فَلَمَّا رَاَيْنَهٗٓ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَآ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ○

অর্থাৎ সমাগত মহিলারা ইউসুফ (আ)-কে দেখল, তখন তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য দর্শনে বিমোহিত হয়ে গেল এবং নিজ নিজ হাত কেটে ফেলল। অর্থাৎ ফল কাটার সময় যখন এ বিস্ময়কর ঘটনা দৃষ্টিগোচর হল, তখন চাকু হাতেই লেগে গেল। অন্য-মনস্কতায় সময় প্রায়ই এরূপ হয়ে থাকে। তারা বলতে লাগল : হায় আল্লাহ্, এ ব্যক্তি কখনই মানব নয়। সে তো মহানুভব ফেরেশতা। উদ্দেশ্য এই যে, ফেরেশতারাই এরূপ নূরানী চেহারাযুক্ত হতে পারে।

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِىْ لُمْتُنَّنِىْ فِيْهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ○

যুলায়খা বলল : দেখে নাও, এ ঐ ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করতে। বাস্তবিকই আমি তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে নিষ্পাপ রয়েছে। ভবিষ্যতে সে আমার আদেশ পালন না করলে অবশ্যই কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাঞ্ছিত হবে।

যুলায়খা যখন দেখল যে, সমাগত মহিলাদের সামনে তার গোপন ভেদ ফাঁস হয়ে গেছে, তখন সে তাদের সামনেই ইউসুফ (আ)-কে ভীতি প্রদর্শন করতে লাগল। কোন কোন তফসীরবিদ বর্ণনা করেছেন যে, তখন আমন্ত্রিত মহিলারাও ইউসুফ (আ)-কে বলতে লাগল : তুমি যুলায়খার কাছে ঋণী। কাজেই তার ইচ্ছার অবমাননা করা উচিত নয়।

পরবর্তী আয়াতের কোন কোন শব্দ দ্বারাও মহিলাদের উপরোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়; যেমন— يَدْعُوْنَنِىْ এবং كَيْدَهُنَّ —এগুলোতে বহুবচনে কয়েকজনের কথা বলা হয়েছে :

ইউসুফ (আ) দেখলেন যে, সমবেত মহিলারাও যুলায়খার সুরে সুর মিলিয়েছে এবং তাকে সমর্থন করছে। কাজেই তাদের চক্রান্তের জাল ছিন্ন করার বাহ্যিক কোন উপায় নেই। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁর দরবারে আরয করলেন :

رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِىْٓ اِلَيْهِ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّىْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! এই মহিলারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করছে, এর চাইতে জেলখানাই আমার অধিক পছন্দনীয়। যদি আপনি আমা থেকে ওদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন, তবে সম্ভবত আমি তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ব এবং নির্বুদ্ধিতার কাজ করে ফেলব। "আমি জেলখানা পছন্দ করি"—ইউসুফ (আ)-এর এ উক্তি বন্দীজীবন প্রার্থনা বা কামনা নয়, বরং পাপকাজের বিপরীতে এই পার্থিব বিপদকে সহজ মনে করার বহিঃপ্রকাশ। কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে : যখন ইউসুফ (আ) জেলে প্রেরিত হলেন, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসল, আপনি নিজেকে জেলে নিক্ষেপ করেছেন। কারণ, আপনি বলেছিলেন اَلسِّجْنُ اَحَبُّ اِلَىَّ অর্থাৎ

এর চাইতে আমি জেলখানাকে অধিক পছন্দ করি। আপনি নিরাপত্তা চাইলে আপনাকে পুরাপুরি নিরাপত্তা দান করা হতো। এ থেকে বোঝা গেল যে, কোন বড় বিপদ থেকে বাঁচার জন্য দোয়ায় 'এর চাইতে অমুক ছোট বিপদে পতিত করা আমি ভাল মনে করি' —বলা সমীচীন নয়; বরং প্রত্যেক বিপদাপদের সময় আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তাই প্রার্থনা করা উচিত। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তিকে সবরের দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, সবরের অর্থ হচ্ছে বিপদাপদে পতিত হওয়ার পর তা সহ্য করার ক্ষমতা। কাজেই আল্লাহ্‌র কাছে সবরের দোয়া করার পরিবর্তে নিরাপত্তার দোয়া করা উচিত। —(তিরমিযী)

একবার হযরত (সা)-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা) আরয করলেন: আমাকে কোন একটি দোয়া শিক্ষা দিন। তিনি বললেন: পালনকর্তার কাছে নিরাপত্তার দোয়া করুন। হযরত আব্বাস (রা) বলেন: কিছুদিন পর আমি আবার তাঁর কাছে দোয়া শিক্ষা দেওয়ার আবেদন করলাম। তিনি বললেন: আল্লাহ্‌র কাছে ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা প্রার্থনা করুন।

"যদি আপনি ওদের চক্রান্তকে প্রতিহত না করেন তবে সম্ভাবত আমি ওদের দিকে ঝুঁকে পড়ব"—ইউসুফ (আ)-এর এ কথা বলা নবুয়তের জন্য যে পবিত্রতা জরুরী, তার পরিপন্থী নয়। কারণ, এ পবিত্রতার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে গোনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে নেবেন। যদিও নবুয়তের কারণে এ লক্ষ্য পূর্ব থেকেই অর্জিত ছিল, তথাপি শিষ্টাচার প্রসূত চূড়ান্ত ভীতির কারণে এরূপ দোয়া করতে বাধ্য হয়েছেন। এ থেকে আরও জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই গোনাহ্ থেকে বাঁচতে পারে না। আরও জানা গেল যে, প্রত্যেক গোনাহ্‌র কাজ মূর্খতাবশত হয়ে থাকে। জ্ঞান মানুষকে গোনাহ্‌র কাজ থেকে বিরত রাখে।—(কুরতুবী)

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থাৎ তাঁর পালনকর্তা দোয়া কবুল করলেন এবং মহিলাদের চক্রান্তকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। নিশ্চয় তিনি পরম শ্রোতা ও জ্ঞানী।

আল্লাহ্ তা'আলা মহিলাদের চক্রান্তজাল থেকে ইউসুফ (আ)-কে বাঁচানোর জন্য একটি ব্যবস্থা করলেন। ইউসুফ (আ)-এর সচ্চরিত্রতা, আল্লাহ্‌ভীতি ও পবিত্রতার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখে আযীযে-মিসর ও তাঁর বন্ধুদের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছিল যে, ইউসুফ সৎ। কিন্তু শহরময় এ বিষয়ে কানাঘুষা হতে থাকে। এ কানাঘুষার অবসান করার জন্য এটাই উত্তম পথ বিবেচিত হল যে, ইউসুফ (আ)-কে কিছুদিনের জন্য জেলে আবদ্ধ রাখাই সমীচীন হবে। এ দ্বারা নিজের ঘরও রক্ষা পাবে এবং জনগণের মধ্যেও এ বিষয়ের আলোচনা স্তিমিত হয়ে পড়বে।

অর্থাৎ— ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ

এর পর আযীয ও তাঁর পারিষদবর্গ কিছু দিনের জন্য ইউসুফ (আ)-কে জেলে আবদ্ধ রাখাটাই মঙ্গলজনক বলে বিবেচনা করলেন এবং সে মতে ইউসুফ (আ) জেলে প্রেরিত হলেন।

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ؕ قَالَ اَحَدُهُمَاۤ اِنِّيْۤ اَرٰىنِيْۤ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ
وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْۤ اَرٰىنِيْۤ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ؕ نَبِّئْنَا
بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۳۶﴾ قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖۤ
اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ؕ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ ؕ اِنِّيْ
تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۳۷﴾ وَ
اتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ مَا كَانَ لَنَاۤ اَنْ نُّشْرِكَ
بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿۳۸﴾ يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ
الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ؕ﴿۳۹﴾ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَاۤ
اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ
اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۴۰﴾ يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّاۤ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ
خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ؕ قُضِيَ الْاَمْرُ
الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ؕ﴿۴۱﴾ وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ
رَبِّكَ ۫ فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿۴۲﴾

(৩৬) তাঁর সাথে কারাগারে দু'জন যুবক প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মদ নিঙড়াচ্ছি। অপরজন বলল ঃ আমি দেখলাম যে, নিজ মাথায় রুটি বহন করছি। তা থেকে পাখি ঠুকরিয়ে খাচ্ছে। আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলুন। আমরা আপনাকে সৎকর্মশীল দেখতে পাচ্ছি। (৩৭) তিনি বললেন ঃ তোমাদেরকে প্রত্যহ যে খাদ্য দেওয়া হয়, তা তোমাদের কাছে আসার আগেই আমি তার ব্যাখ্যা বলে দেব। এ জ্ঞান আমার পালনকর্তা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি ঐসব লোকের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি যারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং পরকালে অবিশ্বাসী। (৩৮) আমি আপন পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্ম অনুসরণ করছি। আমাদের জন্য শোভা পায়না যে, কোন বস্তুকে আল্লাহ্র অংশীদার করি। এটা আমাদের প্রতি এবং অন্য সব লোকের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোক অনুগ্রহ স্বীকার করে না। (৩৯) হে কারাগারের সঙ্গীরা! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্? (৪০) তোমরা আল্লাহ্কে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপদাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ্ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। আল্লাহ্ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (৪১) হে কারাগারের সঙ্গীরা! তোমাদের একজন আপন প্রভুকে মদ্যপান করাবে এবং দ্বিতীয়জন, তাকে শূলে চড়ানো হবে। অতঃপর তাঁর মস্তক থেকে পাখি আহার করবে। তোমরা যে বিষয়ে জানার আগ্রহী তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। (৪২) যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ বলে দিল ঃ আপন প্রভুর কাছে আমার আলোচনা করবে। অতঃপর শয়তান তাকে প্রভুর কাছে আলোচনার কথা ভুলিয়ে দিল। ফলে তাঁকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ইউসুফ (আ)-এর সাথে (অর্থাৎ সে সময়েই) আরও দু'জন শাহী ক্রীতদাস কারাগারে প্রবেশ করল। [তাদের একজন বাদশাহ্কে সুরা পান করাত এবং অপরজন ছিল রুটি পাকানোর বাবুর্চি। তাদের বন্দীত্বের কারণ ছিল এই যে, তারা বাদশাহ্র খাদ্যে ও মদে বিষ মিশ্রিত করেছিল বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। এ মোকদ্দমা আদালতে বিচারাধীন থাকাকালে তাদেরকে বন্দী করা হয়। তারা ইউসুফ (আ)-এর মধ্যে সাধুতার চিহ্ন দেখতে পেয়েছিল। তাই] তাদের একজন (ইউসুফকে) বলল ঃ আমি নিজেকে স্বপ্ন দেখেছি (যেন) মদ (তৈরী করার জন্য আঙুরের রস) নিঙড়াচ্ছি (এবং বাদশাহ্কে সেই মদ পান করাচ্ছি)। অন্যজন বলল ঃ আমি নিজেকে দেখি, (যেন) মাথায় রুটি নিয়ে যাচ্ছি, এবং তা থেকে পাখি (আঁচড়িয়ে আঁচড়িয়ে) আহার করছে, আমাদেরকে এ স্বপ্নের (যা আমরা উভয়ে দেখেছি) ব্যাখ্যা বলে দিন। আমরা আপনাকে একজন সৎলোক মনে করি। ইউসুফ [যখন দেখলেন যে, তারা সরল বিশ্বাসে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, তখন তিনি তাদেরকে সর্বপ্রথম ঈমানের দাওয়াত দিতে চাইলেন। তাই প্রথমে

তিনি যে নবী, তা একটি মু'জিযা দ্বারা প্রমাণ করার জন্য) বললেন : (দেখ) তোমাদের কাছে যে খাদ্য আসে যা তোমরা খাওয়ার জন্য (কারাগারে) পাও, তা আসার আগেই আমি তার স্বরূপ তোমাদেরকে বলে দেই যে, অমুক বস্তু আসবে এবং এমন এমন হবে এবং.]। এ বলে দেওয়া ঐ জ্ঞানের বদৌলতে, যা আমাকে আমার পালনকর্তা শিক্ষা দিয়েছেন (অর্থাৎ আমি ওহীর মাধ্যমে জেনে ফেলি। অতএব এটা একটি মু'জিযা, যা নবুয়তের প্রমাণ। এ সময়ে এ মু'জিযাটি বিশেষভাবে স্থানোপযোগী ছিল। কারণ, যে ঘটনায় বন্দীরা ব্যাখ্যার জন্য তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিল, তাও খাদ্যের সাথেই সম্পৃক্ত ছিল। নবুয়ত সপ্রমাণ করার পর একত্ববাদ সপ্রমাণের বিষয়বস্তু বর্ণনা করে বললেন :) আমি তো তাদের ধর্ম (প্রথমেই) পরিত্যাগ করেছি, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং তারা পরকালেও অবিশ্বাসী। আমি আপন (মহাপুরুষ) বাপদাদার ধর্ম অবলম্বন করেছি—ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব (আ)-এর। (এ ধর্মের প্রধান স্তম্ভ এই যে) আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে (ইবাদতে) শরীক সাব্যস্ত করা আমাদের জন্য মোটেই শোভা পায় না। এটা (অর্থাৎ একত্ববাদের বিশ্বাস) আমাদের প্রতি এবং (অন্যান্য) লোকদের প্রতি (ও) আল্লাহ্ তা'আলার একটি অনুগ্রহ। (কারণ, এর মাধ্যমেই ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল সাধিত হয়) কিন্তু অধিকাংশ লোক (এ নিয়ামতের) শোকর (আদায়) করে না। (অর্থাৎ একত্ববাদ অবলম্বন করে না।) হে কারাগারের সঙ্গীরা! (একটু চিন্তা করে বল যে, ইবাদতের জন্য) বিভিন্ন উপাস্য ভাল, না এক সত্য উপাস্য ভাল, যিনি পরাক্রমশালী? তোমরা তো আল্লাহ্‌কে ছেড়ে নিছক কতগুলো ভিত্তিহীন নামের ইবাদত কর, যেগুলো তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা (নিজেরাই) সাব্যস্ত করে নিয়েছ। আল্লাহ্ তা-'আলা তাদের (উপাস্য হওয়ার) কোন যুক্তিগত অথবা ইতিহাসগত প্রমাণ অবতীর্ণ করেন-নি এবং বিধান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই অর্থাৎ একত্ববাদ ও ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করা সরল পথ, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (ঈমানের দাও-য়াতের পর এখন তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলছেন যে, হে কারাগারের সঙ্গীরা!) তোমাদের একজন তো নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে স্বীয় প্রভুকে যথারীতি মদ্যপান করাবে এবং অন্যজন দোষী সাব্যস্ত হয়ে শূলে চড়বে এবং তার মস্তক পাখিরা ঠুকরে ঠুকরে খাবে। যে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞেস করছিলে, তা এমনিভাবে অবধারিত হয়ে গেছে। (সেমতে মোকদ্দমার তদন্ত শেষে তাই হল। একজন বেকসুর খালাস এবং অন্যজন অপরাধী সাব্যস্ত হয়। উভয়কে কারাগার থেকে ডেকে নেওয়া হল; একজনকে মুক্তিদানের জন্য এবং অপর-জনকে শূলে চড়ানোর জন্য)। এবং (যখন তারা কারাগার ত্যাগ করে যেতে লাগল, তখন) যে ব্যক্তি সম্পর্কে মুক্তি পাওয়ার ধারণা ছিল, তাকে ইউসুফ (আ) বললেন : আপন প্রভুর সামনে আমার কথাও আলোচনা করবে যে, একজন নির্দোষ ব্যক্তি কারাগারে আবদ্ধ রয়েছে। সে ওয়াদা করল। অতঃপর আপন প্রভুর কাছে ইউসুফের প্রসঙ্গে আলোচনা করার কথা শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিল। ফলে কারাগারে আরও কয়েক বছর তাঁকে থাকতে হল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীর একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ কথা বার বার বলা হয়েছে যে, কোরআন-পাক কোন ঐতিহাসিক ও কিস্‌সা-কাহিনীর গ্রন্থ নয়। এতে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা, উপদেশ ও জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করা। সমগ্র কোরআন এবং অসংখ্য পয়গম্বরের ঘটনাবলীর মধ্যে একমাত্র ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীটিই কোরআন ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছে। নতুবা স্থানোপযোগী ঐতিহাসিক ঘটনার কোন অত্যাবশ্যকীয় অংশই শুধু উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীটি আদ্যোপান্ত পর্যালোচনা করলে এতে শিক্ষা ও উপদেশের অনেক উপাদান এবং মানব জীবনের বিভিন্ন স্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ রয়েছে। প্রাসঙ্গিক এ ঘটনাটিতেও অনেক হিদায়ত নিহিত রয়েছে।

ঘটনা এই যে, ইউসুফ (আ)-এর নিষ্পাপ চরিত্র ও পবিত্রতা দিবালোকের মত ফুটে ওঠা সত্ত্বেও আযীযে-মিসর ও তার স্ত্রী লোক নিন্দা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কিছু দিনের জন্য ইউসুফ (আ)-কে কারাগারে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটা প্রকৃতপক্ষে ইউসুফ (আ)-এর দোয়া ও বাসনার বাস্তব রূপায়ণ ছিল। কেননা, আযীযে-মিসরের গৃহে বাস করে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইউসুফ (আ) কারাগারে পৌঁছলে সাথে আরও দু'জন অভিযুক্ত কয়েদীও কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বাদশাহ্‌কে মদ্যপান করাত এবং অপরজন বাবুর্চি ছিল। ইবনে কাসীর তফসীরবিদগণের বরাত দিয়ে লিখেছেন ঃ তারা উভয়েই বাদশাহ্‌র খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল। মোকাদ্দমার তদন্ত চলছিল বলে তাদেরকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল।

ইউসুফ (আ) কারাগারে প্রবেশ করে পয়গম্বরসুলভ চরিত্র, দয়া ও অনুকম্পার কারণে সব কয়েদীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন এবং সাধ্যমত তাদের দেখাশোনা করতেন। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবা-শুশ্রূষা করতেন। কাউকে চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত দেখলে তাকে সান্ত্বনা দিতেন। ধৈর্য শিক্ষা এবং মুক্তির আশা দিয়ে তার হিম্মত বাড়াতেন। নিজে কষ্ট করে অপরের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করতেন এবং সারারাত আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তাঁর এহেন অবস্থা দেখে কারাগারের সব কয়েদী তাঁর ভক্ত হয়ে গেল। কারাধ্যক্ষও তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ হল এবং বলল ঃ আমার ক্ষমতা থাকলে আপনাকে ছেড়ে দিতাম। এখানে যাতে আপনার কোনরূপ কষ্ট না হয়, এখন শুধু সেদিকেই লক্ষ্য রাখতে পারি।

একটি আশ্চর্য ঘটনা ঃ কারাধ্যক্ষ কিংবা কয়েদীদের মধ্যে কেউ হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মহব্বত প্রকাশ করে বলল ঃ আমরা আপনাকে খুব মহব্বত করি। ইউসুফ (আ) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম আমাকে মহব্বত করো না। কারণ, যখনই কেউ আমাকে মহব্বত করেছে, তখনই আমি কোন না কোন বিপদে জড়িয়ে পড়েছি।

শৈশবে ফুফু আমাকে মহব্বত করতেন। ফলে আমার উপর চুরির অভিযোগ আনা হয়। এরপর আমার পিতা আমাকে মহব্বত করেন। ফলে ভাইদের হাতে কূপে নিক্ষিপ্ত অতঃপর গোলামি ও নির্বাসনে পতিত হয়েছি। সর্বশেষে বেগম আযীযের মহব্বতের পরিণামে এ কারাগারে পৌঁছেছি। —(ইবনে কাসীর, মাযহারী ।)

ইউসুফ (আ)-এর সাথে কারাগারে প্রবেশকারী দু'জন কয়েদী একদিন বলল ঃ আমাদের দৃষ্টিতে আপনি একজন সৎ ও মহানুভব ব্যক্তি । তাই আপনার কাছে আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে চাই । হযরত ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন ঃ তারা বাস্তবিকই এ স্বপ্ন দেখেছিল। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ প্রকৃত স্বপ্ন ছিল না । শুধু ইউসুফ (আ)-এর মহানুভবতা ও সততা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে স্বপ্ন রচনা করা হয়েছিল।

মোটকথা তাদের একজন অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাদশাহকে মদ্যপান করাত, সে বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখি যে, আঙুর থেকে শরাব বের করছি। দ্বিতীয়জন অর্থাৎ বাবুর্চি বলল ঃ আমি দেখি যে, আমার মাথায় রুটিভর্তি একটি ঝুড়ি রয়েছে। তা থেকে পাখিরা ঠুকরে ঠুকরে আহার করছে। তারা উভয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে অনুরোধ জানাল।

ইউসুফ (আ)-কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়েছে, কিন্তু তিনি পয়গম্বরসুলভ ভঙ্গিতে এ প্রশ্নের উত্তর দানের পূর্বে ঈমানের দাওয়াত ও ধর্ম প্রচারের কাজ আরম্ভ করে দিলেন। প্রচারের মূলনীতি অনুযায়ী প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম তাদের অন্তরে আস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একটি মু'জিযা উল্লেখ করলেন যে, তোমাদের জন্য প্রত্যহ যে খাদ্য তোমাদের বাসা থেকে কিংবা অন্য কোন জায়গা থেকে আসে, তা আসার আগেই আমি তোমাদেরকে খাদ্যের প্রকার, গুণাগুণ, পরিমাণ ও সময় সম্পর্কে বলে দেই। বাস্তবে আমার সরবরাহকৃত তথ্য সব সত্য হয়। ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي —অর্থাৎ এটা কোন ভবিষ্যৎ কথন, জ্যোতিষ বিদ্যা অথবা অতীন্দ্রিয়বাদের ভেল্‌কি নয় বরং আমার পালনকর্তা ওহীর মাধ্যমে আমাকে যা বলে দেন, আমি তাই তোমাদেরকে জানিয়ে দেই। নিঃসন্দেহে এ প্রকাশ্য মু'জিযাটি নবুয়তের প্রমাণ এবং আস্থার অনেক বড় কারণ। এরপর প্রথমে কুফরের নিন্দা এবং কাফিরদের ধর্মের প্রতি স্বীয় বিমুখতা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আরও বলেছেন যে, আমি নবী পরিবারেরই একজন এবং তাঁদেরই সত্য ধর্মের অনুসারী। আমার পিতৃপুরুষ হচ্ছেন ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব। এ বংশগত আভিজাত্যও স্বভাবত মানুষের আস্থা অর্জনে সহায়ক হয়। এরপর বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে আল্লাহর গুণাবলীতে অংশীদার মনে করা আমাদের জন্য মোটেই বৈধ নয়! এ সত্য ধর্মের তওফীক আমাদের প্রতি এবং সব লোকের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলারই অনুগ্রহ । তিনি সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দান করে সত্যকে গ্রহণ করা আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন কিন্তু অনেক লোক এ নিয়ামতের কদর ও অনুগ্রহ স্বীকার করে না। অতঃপর তিনি কয়েদীদেরকেই প্রশ্ন করলেন ঃ আচ্ছা তোমরাই বল, অনেক

পালনকর্তার উপাসক হওয়া উত্তম, না এক আল্লাহ্র দাস হওয়া ভাল, যিনি সবার উপরে পরাক্রমশালী ? অতঃপর অন্য এক পন্থায় মূর্তিপূজার অনিষ্টকারিতা বর্ণনা করে বললেন ঃ তোমরা এবং তোমাদের পিতৃ পুরুষেরা কিছু সংখ্যক প্রতিমাকে পালনকর্তা মনে করে নিয়েছ। এরা শুধু নামসর্বস্বই অথচ এদেরকেই তোমরা মা'বুদ সাব্যস্ত করে নিয়েছ। ওদের মধ্যে এমন কোন সত্তাগত গুণ নেই যে, ওদেরকে সামান্যতম শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী মনে করা যেতে পারে। কারণ, ওরা সবাই চেতনা ও অনুভূতিহীন। এটা চাক্ষুষ বিষয়। ওদের সত্য উপাস্য হওয়ার অপর একটি উপায় ছিল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ওদের আরাধনার জন্য নির্দেশ নাযিল করতেন। এমতাবস্থায় চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও বিবেক-বুদ্ধি যদিও ওদের আল্লাহ্র স্বীকার না করত, কিন্তু আল্লাহ্র নির্দেশের কারণে আমরা চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে ছেড়ে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করতাম। কিন্তু এখানে এরূপ কোন নির্দেশও নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এসব কৃত্রিম উপাস্যের ইবাদতের জন্য কোন প্রমাণ কিংবা সনদও নাযিল করেননি। বরং তিনি এ কথাই বলেছেন যে, নির্দেশ ও শাসনক্ষমতার অধিকার আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারও নেই। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত করো না। আমার পিতৃপুরুষেরা এ সত্য ধর্মই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য জানে না।

প্রচার ও দাওয়াত সমাপ্ত করার পর ইউসুফ (আ) কয়েদীদের স্বপ্নের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের একজন তো মুক্তি পাবে এবং চাকরিতে পুনর্বহাল হয়ে বাদশাহ্কে মদ্যপান করাবে। অপর জনের অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং তাকে শূলে চড়ানো হবে। পাখিরা তার মাথার মগজ ঠুকরে খাবে।

পয়গম্বরসুলভ অনুকম্পার অভিনব দৃষ্টান্ত ঃ ইবনে কাসীর বলেন ঃ উভয় কয়েদীর স্বপ্ন পৃথক পৃথক ছিল। প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট ছিল এবং এটাও নির্দিষ্ট ছিল যে, যে ব্যক্তি বাদশাহ্কে মদ্যপান করাত, সে মুক্ত হয়ে চাকরিতে পুনর্বহাল হবে এবং বাবুর্চিকে শূলে চড়ানো হবে। কিন্তু ইউসুফ (আ) পয়গম্বরসুলভ অনুকম্পার কারণে নির্দিষ্ট করে বলেন নি যে, তোমাদের অমুককে শূলে চড়ানো হবে—যাতে সে এখন থেকেই চিন্তান্বিত হয়ে না পড়ে। বরং তিনি সংক্ষেপে বলেছেন যে, একজন মুক্তি পাবে এবং অপরজনকে শূলে চড়ানো হবে।

সবশেষে বলেছেন ঃ আমি তোমাদের স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, তা নিছক অনুমান-ভিত্তিক নয় বরং এটাই আল্লাহ্র অটল ফয়সালা। যেসব তফসীরবিদ তাদের স্বপ্নকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলেছেন, তাঁরা একথাও বলেছেন যে, ইউসুফ (আ) যখন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন, তখন তারা উভয়েই বলে উঠল ঃ আমরা কোন স্বপ্নই দেখিনি বরং মিছামিছি বানিয়ে বলেছিলাম। তখন ইউসুফ (আ) বললেন ঃ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ —তোমরা এ স্বপ্ন দেখে থাক বা না থাক, এখন বাস্তবে তাই হবে, যা

বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা মিথ্যা স্বপ্ন তৈরী করার যে গোনাহ্ করেছ, এখন তার শাস্তি তাই, যা ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে রেহাই পাবে, তাকে ইউসুফ (আ) বললেনঃ যখন তুমি মুক্ত হয়ে কারাগারের বাইরে যাবে এবং শাহী দরবারে পৌঁছবে, তখন বাদশাহর কাছে আমার বিষয়েও আলোচনা করবে যে, এ নিরপরাধ লোকটি কারাগারে পড়ে রয়েছে। কিন্তু মুক্ত হয়ে লোকটি ইউসুফ (আ)-এর কথা ভুলে গেল। ফলে ইউসুফ (আ)-এর মুক্তি আরও বিলম্বিত হয়ে গেল এবং এ ঘটনার পর আরও কয়েক বছর তাঁকে কারাগারে কাটাতে হল। আয়াতে بِضْعَ سِنِيْنَ বলা হয়েছে। শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা বুঝায়। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এ ঘটনার পর আরও সাত বছর তাঁকে জেলে থাকতে হয়েছে।

বিধি-বিধান ও মাস'আলা: আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে অনেক বিধিবিধান, মাস-'আলা ও নির্দেশ জানা যায়। এগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা যেতে পারে।

মাস'আলা: (১) ইউসুফ (আ) কারাগারে প্রেরিত হন। কারাগার গুণ্ডা, বদমায়েশ ও অপরাধীদের আড্ডা। কিন্তু তিনি তাদের সাথেও এমন সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেন যে, তারা সবাই তাঁর ভক্ত হয়ে যায়। এতে বোঝা গেল যে, অপরাধী ও পাপাচারীদের সাথে দয়া ও সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করে তাদেরকে বশে ও আয়ত্তাধীন রাখা প্রত্যেক সংস্কারকের অবশ্য কর্তব্য। তাদের প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার ভাব প্রকাশ করা উচিত নয়।

মাস'আলা: (২) আয়াতের إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ বাক্য থেকে জানা গেল যে, যাদেরকে পুণ্যবান, সৎকর্মী ও সহানুভূতিশীল বলে বিশ্বাস করা হয়, স্বপ্নের ব্যাখ্যা তাদের কাছেই জিজ্ঞেস করা উচিত।

মাস'আলা: (৩) যারা সত্যের দাওয়াত দেন এবং সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তাঁদের কর্মপন্থা এরূপ হওয়া উচিত যে, প্রথমে স্বীয় চরিত্রমাধুর্য এবং জ্ঞানগত ও কর্মগত পরাকাষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের আস্থাভাজন হতে হবে; যদিও এতে নিজের কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশও করতে হয়; যেমন ইউসুফ (আ) এক্ষেত্রে স্বীয় মু'জিযাও উল্লেখ করেছেন এবং তিনি যে নবী পরিবারের একজন তাও প্রকাশ করেছেন। এ গুণগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ যদি জনসংস্কারের উদ্দেশ্যে হয় এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য না হয়, তবে তা কোরআনে নিষিদ্ধ নিজের শুচিতা নিজে প্রকাশ করার অন্তর্ভুক্ত নয়। কোরআনে বলা হয়েছে: فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ নিজের শুচিতা নিজে প্রকাশ করো না।

মাস'আলা: (৪) প্রচারক ও সংস্কারকের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে স্বীয় প্রচারবৃত্তিকে সব কাজের অগ্রে রাখা। প্রচারকর্মের এ একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি, যা আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। কেউ তাঁর কাছে কোন কার্যোপলক্ষে আগমন করলে তাঁর আসল কর্তব্য

বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়; যেমন ইউসুফ (আ)-এর কাছে কয়েদীরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে এসেছিল। তিনি উত্তরদানের পূর্বে দাওয়াতএবং প্রচারের মাধ্যমে তাদেরকে হেদায়েত উপহার দিলেন। এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, দাওয়াত ও প্রচার জনসভা, মিম্বর অথবা মঞ্চেই হয়। ব্যক্তিগত সাক্ষাত ও একান্ত আলোচনার মাধ্যমেই বরং এ কাজ আরও বেশী কার্যকর হয়ে থাকে।

মাস'আলা : (৫) পথপ্রদর্শন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে এমন কথা বলা উচিত, যা সম্বোধিত ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণ করতে পারে; যেমন ইউসুফ (আ) কয়েদীদেরকে দেখিয়েছেন যে, তিনি যা কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন, তা কুফরী ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করারই ফলশ্রুতি। এরপর তিনি কুফর ও শিরকের অনিষ্টকারিতা চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন।

মাস'আলা : (৬) এ থেকে প্রমাণিত হল : যে ব্যাপার সম্বোধিত ব্যক্তির জন্যে কষ্টকর ও অপ্রিয় এবং তা প্রকাশ করা জরুরী, তা তার সামনে যতদূর সম্ভব এমন ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে হবে যে, তার কষ্ট যথাসম্ভব কম হয়; যেমন স্বপ্নের ব্যাখ্যায় এক ব্যক্তির মৃত্যু নির্দিষ্ট ছিল কিন্তু ইউসুফ (আ) তা অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এরূপ নির্দিষ্ট করে বলেননি যে, তোমাকে শূলীতে চড়ানো হবে।— (ইবনে-কাসীর, মাযহারী)

মাস'আলা : (৭) ইউসুফ (আ) কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কয়েদীকে বললেন : যখন বাদশাহ্‌র কাছে যাবে তখন আমার কথা আলোচনা করবে যে, সে নিরপরাধ —কারাগারে আবদ্ধ রয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, বিপদ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য কোন ব্যক্তিকে চেষ্টা-তদবীরের মাধ্যমে স্থির করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।

মাস'আলা : (৮) আল্লাহ্ তা'আলা মনোনীত পয়গম্বরগণের জন্য সকল বৈধ প্রচেষ্টাও পছন্দ করেন না; যেমন, তাঁরা মুক্তির জন্য কোন মানুষকে মধ্যস্থতাকারী স্থির করবেন। তাঁদের ও আল্লাহ্ তা'আলার মাঝখানে কোন মধ্যস্থতা না থাকাই পয়গম্বরগণের আসল স্থান। সম্ভবত এ কারণেই মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী ইউসুফ (আ)-এর কথা ভুলে যায় এবং তাঁকে আরও কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হয়। এক হাদীসেও রসূলুল্লাহ্ (সা) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾ يُوسُفُ

أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ لَّعَلِّيٓ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ
فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِ
ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ
﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾
وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِۦ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ
فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّٰتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ
عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

(৪৩) বাদশাহ বলল : আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গাভী—এদেরকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক। হে পারিষদবর্গ! তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাক। (৪৪) তারা বলল : এটা কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন। এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাদের জানা নেই। (৪৫) দু'জন কারারুদ্ধের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর স্মরণ হলো, সে বলল, আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলছি। তোমরা আমাকে প্রেরণ কর। (৪৬) সে তথায় পৌছে বলল : হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটাতাজা গাভী—তাদেরকে খাচ্ছে সাতটি শীর্ণ গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক ; আপনি আমাদেরকে এ স্বপ্ন সম্পর্কে পথনির্দেশ প্রদান করুন : যাতে আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের অবগত করাতে পারি। (৪৭) বলল : তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। অতঃপর যা কাটবে, তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে তা ছাড়া অবশিষ্ট শস্য শীষ সমেত রেখে দেবে। (৪৮) এবং এরপরে আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর ; তোমরা এ দিনের জন্যে যা রেখেছিলে, তা খেয়ে যাবে, কিন্তু অল্প পরিমাণ ব্যতীত, যা তোমরা তুলে রাখবে। (৪৯) এরপরই আসবে একবছর—এতে মানুষের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং এতে তারা রস নিংড়াবে। (৫০) বাদশাহ বলল : ফিরে যাও তোমাদের প্রভুর কাছে এবং জিজ্ঞেস কর তাঁকে : ঐ মহিলাদের স্বরূপ কি, যারা স্বীয় হস্ত কর্তন করেছিল! আমার পালনকর্তা তো তাদের ছলনা সবই জানেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মিসরের বাদশাহ্ (-ও একটি স্বপ্ন দেখল এবং পারিষদবর্গকে একত্র করে) বলল : আমি (স্বপ্নে) দেখি যে, সাতটি মোটাতাজা গাভীকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে ফেলেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও আরও সাতটি শুষ্ক শীষ। শুষ্ক শীষগুলো এমনিভাবে সবুজ শীষগুলোকে জড়িয়ে ধরে তাদেরকে শুষ্ক করে দিয়েছে। হে সভাসদবর্গ, যদি তোমরা (স্বপ্নের) ব্যাখ্যা দিতে পার, তবে আমার এ স্বপ্ন সম্বন্ধে আমাকে উত্তর দাও। তারা বলল : (প্রথমত এটা কোন স্বপ্নই নয় যে, আপনি চিন্তিত হবেন।) এমনি বিক্ষিপ্ত কল্পনা এবং (দ্বিতীয়ত) আমরা (রাজকার্যে পারদর্শী) স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জ্ঞান রাখি না। (দু'রকম উত্তর দেয়ার কারণ এই যে, প্রথম উত্তর দ্বারা বাদশাহ্র মন থেকে অস্থিরতা ও উদ্বেগ দূর করা উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় উত্তর দ্বারা নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করা লক্ষ্য। মোটামুটি ব্যাপার এই যে, প্রথমত এরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যাযোগ্য নয় এবং দ্বিতীয়ত আমরা এ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ।) এবং (উল্লেখিত) দু'কয়েদীর মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল, (সে দরবারে উপস্থিত ছিল) সে বলল এবং দীর্ঘকাল পর তার (ইউসুফের উপদেশের কথা) স্মরণ হয়েছিল : আমি এর ব্যাখ্যার খবর আনছি। আপনারা আমাকে একটু যাওয়ার অনুমতি দিন। (দরবার থেকে তাকে অনুমতি দেওয়া হল। সে কয়েদখানায় ইউসুফের কাছে পৌঁছে বলল :) হে ইউসুফ হে সততার মূর্ত প্রতীক, আপনি আমাদেরকে এর (অর্থাৎ স্বপ্নের) জওয়াব (অর্থাৎ ব্যাখ্যা) দিন যে, সাতটি মোটাতাজা গাভীকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে ফেলেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ এবং এ ছাড়া (সাতটি) শুষ্কও। (শুষ্কগুলোতো জড়িয়ে ধরার ফলে সবুজগুলোও শুষ্ক হয়ে গেছে। আপনি ব্যাখ্যা দিন,) যাতে আমি (যারা আমাকে পাঠিয়েছে) তাদের কাছে ফিরে যাই, (এবং বর্ণনা করি) যাতে (এর ব্যাখ্যা এবং ফলে আপনার অবস্থা) তাদেরও জানা হয়ে যায় (তারা ব্যাখ্যা অনুযায়ী কর্মপন্থা নিরূপণ করে এবং আপনার মুক্তির উপায় হয়)। তিনি বললেন : (সাতটি মোটাতাজা গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষের অর্থ হচ্ছে প্রচুর উৎপাদন ও বৃষ্টির বছর। অতএব) তোমরা সাত বছর উপর্যুপরি (খুব) শস্য বপন করবে, অতঃপর ফসল কেটে তাকে শীষের মধ্যেই থাকতে দেবে, (যাতে ঘুণ লেগে না যায়) তবে অল্প পরিমাণে, যা তোমাদের খাওয়ায় লাগবে, (তাই শীষ থেকে বের করা হবে।) অতঃপর এর (অর্থাৎ সাত বছরের) পর সাত বছর এমন কঠিন (ও দুর্ভিক্ষের) আসবে যে, ঐ (গাটা) ভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে, যা তোমরা এ বছরগুলোর জন্য সঞ্চয় করে রেখে থাকবে কিন্তু অল্প পরিমাণে, যা (বীজের জন্য) রেখে দেবে (তা অবশ্য বেঁচে যাবে। শুষ্ক শীষ ও শীর্ণ গাভী এ সাত বছরের প্রতিই ইঙ্গিত বহন করে)। অতঃপর (অর্থাৎ সাত বছর পর) এক বছর এমন আসবে, যাতে মানুষের জন্য খুব বৃষ্টিপাত হবে এবং এতে (আঙ্গুরের পর্যাপ্ত ফলনের কারণে) রসও নিংড়াবে (এবং মদ্যপান করবে। মোটকথা, এ ব্যক্তি ব্যাখ্যা নিয়ে দরবারে পৌঁছল) এবং (পৌঁছে বর্ণনা করল)। বাদশাহ্ (যখন শুনল, তখন ইউসুফের জ্ঞানে ও গুণে মুগ্ধ হয়ে গেল এবং) নির্দেশ দিল : তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। (সেমতে দরবার থেকে দূত রওয়ানা হল) অতঃপর যখন দূত তাঁর কাছে পৌঁছল (এবং বার্তা দিল তখন) তিনি বললেন : (যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এ অপবাদ থেকে মুক্ত হওয়া ও নির্দোষ হওয়া প্রমাণিত না হয়ে যায়, ততক্ষণ আমি যাব না।) তুমি তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও,

অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞেস কর যে, (আপনি কিছু জানেন কি) ঐ মহিলাদের কি অবস্থা, যারা আপন হস্ত কেটে ফেলেছিল? (উদ্দেশ্য এই যে, তাদেরকে ডেকে যে ঘটনায় আমাকে বন্দী করা হয়েছে, তার তদন্ত করা হোক। 'মহিলাদের অবস্থা' বলে ইউসুফের অবস্থা তাদের জানা রয়েছে, কি জানা নেই, তা বোঝান হয়েছে। বিশেষ করে মহিলাদের কথা বলার কারণ সম্ভবত এই যে, তাদের সামনে যুলায়খা স্বীকার করেছিল: وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهُ عَن نَّفْسِهِ)

فَاسْتَعْصَمَ আমার পালনকর্তা এ নারীদলের ছলনা সম্পর্কে খুব জ্ঞাত রয়েছেন।

(অর্থাৎ আল্লাহ্‌র তো জানাই আছে যে, যুলায়খা কর্তৃক আমাকে অপবাদ আরোপ একটি ছলনা মাত্র। কিন্তু মানুষের কাছেও বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। সেমতে বাদশাহ্ মহিলাদেরকে দরবারে উপস্থিত করলেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-এর মুক্তির জন্য অদৃশ্য যবনিকার অন্তরাল থেকে একটি উপায় সৃষ্টি করলেন। বাদশাহ্ একটি স্বপ্ন দেখে উদ্বেগাকুল হলেন এবং রাজ্যের জ্ঞানী ব্যাখ্যাতা ও অতীন্দ্রিয়বাদীদেরকে একত্র করে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। স্বপ্নটি কারও বোধগম্য হল না। তাই সবাই উত্তর দিল: أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ। এখানে ضِغْثٌ শব্দটি ضِغْثٌ এর বহুবচন। এর অর্থ এমন পুঁটলী, যাতে বিভিন্ন প্রকার আবর্জনা ও ঘাসখড় জমা থাকে। অর্থ এই যে, এ স্বপ্নটি মিশ্র ধরনের। এতে কল্পনা ইত্যাদি শামিল রয়েছে। আমরা এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানি না। সঠিক স্বপ্ন হলে ব্যাখ্যা দিতে পারতাম।

এঘটনা দেখে দীর্ঘকাল পর ইউসুফ (আ)-এর কথা মুক্তিপ্রাপ্ত সেই কয়েদীর মনে পড়ল। সে অগ্রসর হয়ে বলল: আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারব। তখন সে ইউসুফ (আ)-এর গুণাবলী, স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদর্শিতা এবং মজলুম হয়ে কারাগারে আবদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণনা করে অনুরোধ করল যে, তাকে কারাগারে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হোক। বাদশাহ্ এ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন এবং সে ইউসুফ (আ)-এর কাছে উপস্থিত হল। কোরআন পাক এসব ঘটনা একটিমাত্র শব্দ فَأَرْسِلُونِ দ্বারা বর্ণনা করেছে। এর অর্থ আমাকে পাঠিয়ে দিন। ইউসুফ (আ)-এর নামোল্লেখ, সরকারী মঞ্জুরি অতঃপর কারাগারে পৌঁছা—এসব ঘটনা আপনা আপনি বোঝা যায়। তাই এগুলো পরিষ্কার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করা হয়নি বরং এ বর্ণনা শুরু করা হয়েছে: يُوسُفُ أَيُّهَا

الصِّدِّيْقُ —অর্থাৎ লোকটি কারাগারে পৌঁছে ঘটনার বর্ণনা শুরু করে প্রথমে ইউসুফ (আ)-এর صِدِّيْق অর্থাৎ কথা ও কাজে সাচ্চা হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। অতঃপর দরখাস্ত করেছে যে, আমাকে একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন। স্বপ্ন এই যে, বাদশাহ সাতটি মোটাতাজা গাভী দেখেছেন। এগুলোকেই অন্য সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও সাতটি গমের সবুজ শীষ ও সাতটি শুষ্ক শীষ দেখেছেন।

لَعَلِّيْ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ —অর্থাৎ আপনি ব্যাখ্যা বলে দিলে অচিরাৎ আমি ফিরে যাব এবং তাদের কাছে ব্যাখ্যা বর্ণনা করব। এতে সম্ভবত তারা আপনার জ্ঞানগরিমা সম্পর্কে অবগত হবে।

তফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছে, 'আলমে-মিসাল' তথা প্রত্যাকৃতি-জগতে ঘটনাবলী যে আকারে থাকে, স্বপ্নে তাই দৃষ্টিগোচর হয়। এ জগতের প্রত্যাকৃতিসমূহের বিশেষ অর্থ আছে। স্বপ্ন ব্যাখ্যা শাস্ত্র পুরাপুরিই এ সব অর্থ জানার ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে এ শাস্ত্র পুরাপুরি শিক্ষা দান করেছিলেন। তিনি স্বপ্নের বিবরণ শুনে বুঝে নিলেন যে, সাতটি মোটাতাজা গাভী ও সাতটি সবুজ শীষের অর্থ হচ্ছে প্রচুর ফলনসম্পন্ন সাত বছর। কেননা, মৃত্তিকা চষায় ও ফসল ফলানোর কাজে গাভীর বিশেষ ভূমিকা থাকে। এমনিভাবে সাতটি শীর্ণ গাভী ও সাতটি শুষ্ক শীষের অর্থ হচ্ছে, প্রথম সাত বছরের পর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সাতটি বছর আসবে। শীর্ণ সাতটি গাভী মোটাতাজা সাতটি গাভীকে খেয়ে ফেলার অর্থ এই যে, পূর্ববর্তী সাত বছরে খাদ্যশস্যের যে ভাণ্ডার সঞ্চিত থাকবে, তা সবই দুর্ভিক্ষের সাত বছরে নিঃশেষ হয়ে যাবে। শুধু বীজের জন্য কিছু খাদ্যশস্য বেঁচে যাবে।

বাদশাহ্‌র স্বপ্নে বাহ্যত এতটুকুই ছিল যে, সাত বছর ভাল ফলন হবে, এরপর সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে। কিন্তু ইউসুফ (আ) আরও কিছু বাড়িয়ে বললেন যে, দুর্ভিক্ষের বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে এক বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে। এ বিষয়টি ইউসুফ (আ) এভাবে জানতে পারেন যে, দুর্ভিক্ষের বছর যখন সর্বমোট সাতটি, তখন আল্লাহ্‌র চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী অষ্টম বছর বৃষ্টিপাত ও উৎপাদন হবে। হযরত কাতাদাহ্ (রা) বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আ)-কে এ বিষয়ে জ্ঞাত করিয়েছিলেন, যাতে স্বপ্নের ব্যাখ্যার অতিরিক্ত কিছু সংবাদ তারা লাভ করে, তাঁর জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ পায় এবং তাঁর মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। তদুপরি ইউসুফ (আ) শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং এর সাথে একটি বিজ্ঞজনোচিত ও সহানুভূতিমূলক পরামর্শও দিয়েছিলেন যে, প্রথম সাত বছরে যে অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হবে, তা গমের শীষের মধ্যেই সংরক্ষিত রাখতে হবে—যাতে পুরানো হওয়ার পর গমে পোকা না লাগে—অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, শস্য যতদিন শীষের মধ্যে থাকে, ততদিন তাতে পোকা লাগে না।

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ —অর্থাৎ প্রথম সাত বছরের পর ভয়াবহ খরা ও দুর্ভিক্ষের সাত বছর আসবে এবং পূর্ব সঞ্চিত শস্যভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে। বাদশাহ্ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, শীর্ণ ও দুর্বল গাভীগুলো মোটাতাজা ও শক্তিশালী গাভীগুলোকে খেয়ে ফেলছে। তাই ব্যাখ্যায় এর সাথে মিল রেখে বলেছেন যে, দুর্ভিক্ষের বছরগুলো পূর্ববর্তী বছরগুলোর সঞ্চিত শস্যভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে; যদিও বছর এমন কোন বস্তু নয়, যা কোন কিছুকে ভক্ষণ করতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ ও জীব-জন্তুতে দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে পূর্ব-সঞ্চিত শস্যভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে।

কাহিনীর গতিধারা দেখে বোঝা যায় যে, এ ব্যক্তি স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে ফিরে এসেছে এবং বাদশাহ্কে তা অবহিত করেছে। বাদশাহ্ বৃত্তান্ত শুনে নিশ্চিন্ত ও ইউসুফ (আ)-এর গুণ-গরিমায় মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু কোরআন পাক এসব বিষয় উল্লেখ করা দরকার মনে করেনি। কারণ, এগুলো আপনা থেকেই বোঝা যায়। পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ —অর্থাৎ বাদশাহ্ আদেশ দিলেন যে, ইউসুফ (আ)-কে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে এস। অতঃপর বাদশাহ্র জনৈক দূত এ বার্তা নিয়ে কারাগারে পৌঁছল।

ইউসুফ (আ) দীর্ঘ বন্দীজীবনের দুঃসহ যাতনায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন এবং মনে মনে মুক্তি কামনা করছিলেন। কাজেই বাদশাহ্র প্রেরিত বার্তাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে বের হয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরগণকে যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, তা অন্যের পক্ষে অনুধাবন করাও সম্ভব নয়।

তিনি দূতকে উত্তর দিলেন ঃ

قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ○

অর্থাৎ ইউসুফ (আ) দূতকে বললেন ঃ তুমি বাদশাহ্র কাছে ফিরে গিয়ে প্রথমে জিজ্ঞেস কর যে, আপনার মতে ঐ মহিলাদের ব্যাপারটি কিরূপ, যারা হাত কেটে ফেলেছিল? বাদশাহ এ ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করেন কি না এবং আমাকে দোষী মনে করেন কি না।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, ইউসুফ (আ) এখানে হস্ত কর্তনকারিণী মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছেন, আযীয-পত্নীর নাম উল্লেখ করেন নি, অথচ সে-ই ছিল ঘটনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। বলা বাহুল্য. এতে ঐ নিমকের কদর করা হয়েছে, যা ইউসুফ (আ) আযীযের

গৃহে লালিত পালিত হয়ে থেয়েছিলেন। প্রকৃত ভদ্র স্বভাবের লোকেরা স্বভাবতই এরূপ মিমকহালালী করার চেষ্টা করে থাকেন।—(কুরতুবী)

আরেক কারণ এই যে, নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। এ মহিলা-দের মাধ্যমেও এ উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারত এবং এতে তাদেরও তেমন কোন অপমান ছিল না। তারা সত্য কথা স্বীকার করলে শুধু পরামর্শ দানের দোষ তাদের ঘাড়ে চাপত। আযীয-পত্নীর অবস্থা এরূপ ছিল না। সরাসরি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলে তাকে ঘিরেই তদন্ত কার্য অনুষ্ঠিত হত। ফলে তার অপমান বেশী হত। ইউসুফ (আ) সাথে সাথে আরও বললেন : اِنَّ رَبِّىْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ অর্থাৎ আমার পালনকর্তা তো তাদের মিথ্যা ও ছলচাতুরী অবহিতই রয়েছেন। আমি চাই যে, বাদশাহ্ও বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবগত হোন। এ বাক্যে সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে নিজের পবিত্রতাও বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে বুখারী ও তিরমিযীর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, যদি আমি এত দীর্ঘকাল কারাগারে থাকতাম, অতঃপর আমাকে মুক্তিদানের জন্য ডাকা হত, তবে আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে যেতাম।

ইমাম তাবারীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে : ইউসুফ (আ)-এর ধৈর্য, সহনশীলতা ও সচ্চরিত্রতা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। কারাগারে যখন তাঁকে বাদশাহ্র স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়, তখন আমি তাঁর জায়গায় থাকলে বলতাম যে, আগে আমাকে কারা-গার থেকে মুক্ত কর, এর পর ব্যাখ্যা দেব। দ্বিতীয় বার যখন মুক্তির বার্তা নিয়ে দূত আগমন করে, তখন তাঁর জায়গায় থাকলে তৎক্ষণাৎ কারাগারের দরজার দিকে পা বাড়া-তাম।—(কুরতুবী)

এ হাদীসে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইউসুফ (আ)-এর ধৈর্য, সহনশীলতা ও সচ্চ-রিত্রতার প্রশংসা করাই হাদীসের উদ্দেশ্য। কিন্তু এর বিপরীতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিজের কর্মপন্থা বর্ণিত হয়েছে, যা আমি থাকলে দেরী করতাম না —এর অর্থ কি? যদি এর অর্থ এই হয় যে, তিনি ইউসুফ (আ)-এর কর্মপন্থাকে উত্তম এবং নিজের কর্মপন্থাকে অনুত্তম বলেছেন; তবে এটা শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বরের অবস্থার সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন নয়। এর উত্তরে বলা যায় যে, নিঃসন্দেহে রসূলুল্লাহ্ (সা) শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর। কিন্তু কোন আংশিক কাজে অন্য পয়গম্বরও শ্রেষ্ঠতম হতে পারেন।

এ ছাড়া তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে : এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ (আ)-এর কর্মপন্থার মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা ও মহান চরিত্রের অনন্যসাধারণ প্রমাণ রয়েছে, তা যথাস্থানে প্রশংসনীয় কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের যে কর্মপন্থা বর্ণনা করে-ছেন, উম্মতের শিক্ষা ও জনগণের হিতাকাঙ্ক্ষার দিক দিয়ে তাই উপযুক্ত ও উত্তম। কেননা, বাদশাহ্দের মেজাজের কোন স্থিরতা নেই। এরূপ ক্ষেত্রে শর্ত যোগ করা অথবা দেরী করা সাধারণ লোকদের পক্ষে উপযুক্ত হয় না। কারণ, বাদশাহ্র মত পাল্টে যেতে পারে। ফলে কারাবাসের বিপদ যথারীতি অব্যাহত থাকতে পারে। ইউসুফ (আ) তো পয়গম্বর হওয়ার কারণে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ কথা জেনেও থাকতে পারেন যে, এ বিলম্বের

সত্যবাদী। (সম্ভবত অগারক অবস্থায় যুলায়খা এ বিষয়টি স্বীকার করেছিল। মোটকথা, মোকদ্দমার পূর্ণ বৃত্তান্ত, এজাহার ও ইউসুফের পবিত্রতার প্রমাণ তাঁর কাছে বলে পাঠানো হলো। তখন) ইউসুফ বলল ঃ এসব বিচার-আচার (যা আমি দায়ের করেছি) শুধু এ কারণে যে, আযীয যেন দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে জেনে নেয় যে, আমি তার অনুপস্থিতিতে তার ইযযতের ওপর হস্তক্ষেপ করিনি এবং এ কথা (জানা হয়ে যায়) যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণাকে এগুতে দেন না। (যুলায়খা অপরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আযীযের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এর মুখোশ খুলে দিয়েছেন। আমার উদ্দেশ্য এটাই ছিল।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইউসুফ (আ)-কে যখন রাজকীয় দূত মুক্তির পয়গাম দিয়ে ডেকে নিতে আসে, তখন তিনি দূতকে উত্তর দেন যে, প্রথমে ঐ মহিলাদের অবস্থা তদন্ত করা হোক যারা হাত কেটে ফেলেছিল। এতে অনেক রহস্য নিহিত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বর-দেরকে যেমন পূর্ণ ধার্মিকতা দান করেছিলেন, তেমনি তাঁদেরকে পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা ও বিভিন্ন ব্যাপারাদি সম্পর্কে পূর্ণ দূরদৃষ্টিও দান করেছিলেন। রাজকীয় পয়গাম পেয়ে ইউসুফ (আ) অনুমান করে নেন যে, কারামুক্তির পর মিসরের বাদশাহ্ তাঁকে কোন সম্মানে ভূষিত করবেন। তখন এটাই ছিল বুদ্ধিমত্তা যে, যে অপকর্মের অপবাদ তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়েছিল এবং যে কারণে তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছিল তার স্বরূপ বাদশাহ্ ও অন্য সবার দৃষ্টিতে ফুটে উঠুক এবং তাঁর পবিত্রতার ব্যাপারে কারও মনে কোনরূপ সন্দেহ না থাকুক। নতুবা এর পরিণাম হবে এই যে, রাজকীয় সম্মানের কারণে জন-সাধারণের মুখ বন্ধ হয়ে গেলেও তাদের অন্তরে এ ধারণা ঘুরপাক খাবে যে, এ ব্যক্তিই যে মালিকের স্ত্রীর প্রতি কুমতলবের হাত প্রসারিত করেছিল। কোন সময় এ জাতীয় ধারণা দ্বারা স্বয়ং বাদশাহ্রও প্রভাবান্বিত হয়ে যাওয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তাই মুক্তির পূর্বে এ ব্যাপারে সাফাই ও তদন্তকে তিনি জরুরী মনে করলেন। উল্লিখিত দু' আয়াতের দ্বিতীয় আয়াতে স্বয়ং ইউসুফ (আ) এ কর্ম ও মুক্তি বিলম্বিত করার দু'টি কারণ বর্ণনা করেছেন।

প্রথম ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّىْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ — এ বিলম্বের কারণ হচ্ছে, যাতে আযীযে-মিসর নিশ্চিত হন যে, আমি তাঁর অবর্তমানে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।

তাঁকে নিশ্চয়তা দানের জন্যে উদগ্রীব হওয়ার কারণ এই যে, আযীযে-মিসরের মনে আমার প্রতি সন্দেহ থাকলে এবং রাজকীয় সম্মানের কারণে আমাকে কিছু বলতে না পারলে তাতে একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। আমার রাজকীয় সম্মানও তার কাছে অপ্রিয় থাকবে এবং চুপ থাকা তার জন্য আরও কষ্টকর হবে। যে ব্যক্তি কিছুকাল পর্যন্ত প্রভু ছিল, তার মনে কষ্ট দেওয়া ইউসুফ (আ) পছন্দ করেন নি। এ ছাড়া

আযীযে-মিসর তাঁর পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলে অন্যদের মুখ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যেত।

দ্বিতীয় কারণ, وَاَنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِیْ كَیْدَ الْخَآئِنِیْنَ—অর্থাৎ এসব তদন্তের কারণ হচ্ছে, যাতে সবাই জেনে নেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণা এগুতে দেন না।

এর দুটি অর্থ হতে পারে। এক. তদন্তের মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাসঘাতকতা ফুটে উঠবে এবং সবাই জানতে পারবে যে, বিশ্বাসঘাতককে পরিণামে লাঞ্ছনাই ভোগ করতে হয়। ফলে ভবিষ্যতে সবাই এহেন কাজ থেকে বেঁচে থাকার সযত্ন চেষ্টা করবে। দুই. যদি এ ঘোলাটে পরিস্থিতিতে ইউসুফ (আ) রাজকীয় সম্মানে ভূষিত হতেন, তবে অন্যরা ধারণা করতে পারত যে, বিশ্বাসঘাতকরাও বড় বড় পদমর্যাদা লাভ করতে পারে। ফলে তাদের বিশ্বাসে ত্রুটি দেখা দিত এবং বিশ্বাসঘাতকতার কুফল মন থেকে মুছে যেত। মোটকথা, উল্লিখিত কারণসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে ইউসুফ (আ) মুক্তির পয়গাম পাওয়া মাত্রই কারাগার থেকে বের হয়ে পড়া পছন্দ করেন নি বরং রাজকীয় পর্যায়ে তদন্ত দাবী করেছেন।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে এ তদন্তের সারমর্ম উল্লেখ করা হয়েছে: قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ یُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ—অর্থাৎ বাদশাহ্ হস্ত কর্তনকারিণী মহিলাদেরকে উপস্থিত করে প্রশ্ন করলেন: কি ব্যাপার ঘটেছে যখন তোমরা ইউসুফের কাছে কুমতলবের খায়েশ করেছিলে? বাদশাহ্‌র এ প্রশ্ন থেকে জানা যায় যে, স্বস্থানে তাঁর মনে এ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, দোষ ইউসুফের নয়—মহিলাদেরই। তাই তিনি বলেছেন: তোমরা তার কাছে কুমতলবের খায়েশ করেছিলে। এরপর মহিলাদের উত্তর উল্লেখ করা হয়েছে:

قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَیْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ط قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِیْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِیْنَ ○

অর্থাৎ সবাই বলল: আল্লাহ্ মহান, আমরা তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্রও মন্দ কোন কিছু জানি না। আযীয-পত্নী বলল: এখন তো সত্য কথা ফুটেই উঠেছে। আমিই তাঁর কাছে কুমতলবের কামনা করেছিলাম। সে নিশ্চিতই সত্যবাদী।

ইউসুফ (আ) তদন্তের দাবীতে আযীয-পত্নীর নাম চাপা দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ যখন কাউকে ইযযত দান করেন, তখন তার সততা ও সাফাই প্রকাশে মানুষের মুখ আপনা

থেকেই খুলে যায়। এ ক্ষেত্রে আযীয-পত্নী সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নিজেই সত্য প্রকাশ করে দিয়েছে।

এ পর্যন্ত বর্ণিত ইউসুফ (আ)-এর অবস্থা ও ঘটনাবলীতে অনেক উপকারিতা, মাস-'আলা ও মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ রয়েছে। তন্মধ্যে ইতিপূর্বে আটটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আরও কিছু মাস'আলা ও পথনির্দেশ নিম্নে বর্ণিত হল :

মাস'আলা : (৯) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য নিজেই অদৃশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁরা কোন সৃষ্ট জীবের কাছে ঋণী হোন—এটা তিনি পছন্দ করেন না। এ কারণেই ইউসুফ (আ) যখন মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীকে বললেন : বাদশাহ্র কাছে আমার কথা বলো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অনেক দিন পর্যন্ত বিস্মৃত করে রাখেন এবং অদৃশ্য যবনিকার অন্তরাল থেকে এমন ব্যবস্থা করেন, যাতে ইউসুফ (আ) কারও কাছে ঋণী না হন এবং পূর্ণ মান-সম্ভ্রমের সাথে কারাগার থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়।

এ ব্যবস্থা ছিল এই যে, মিসরের বাদশাহ্কে একটি উদ্বেগজনক স্বপ্ন দেখানো হয়, যার ব্যাখ্যা দিতে দরবারের সবাই অক্ষমতা প্রকাশ করল। ফলে ইউসুফ (আ)-এর কাছে যেতে হল।

মাস'আলা : (১০) এতে সচ্চরিত্রতার শিক্ষা রয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী বাদশাহ্র কাছে বলে দেয়ার মত কাজটাও না করার দরুন ইউসুফ (আ)-কে অতিরিক্ত সাত বছর পর্যন্ত বন্দী জীবনের দুঃসহ যাতনা ভোগ করতে হয়। সাত বছর পর যখন সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা নেয়ার জন্য আগমন করল, তখন তিনি স্বভাবতই তাকে ভর্ৎসনা করতে পারতেন এবং বলতে পারতেন যে, তোমার দ্বারা আমার এতটুকু কাজও হল না। কিন্তু ইউসুফ (আ) তা করেন নি। তিনি পয়গম্বরসুলভ চরিত্রের পরিচয় দিয়ে এ বিষয়টি উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি—(ইবনে-কাসীর, কুরতুবী)

মাস'আলা : (১১) সাধারণ লোকদের পারলৌকিক মঙ্গল চিন্তা করা এবং তাদেরকে পরকালে ক্ষতিকর কাজকর্ম থেকে বাঁচিয়ে রাখা যেমন পয়গম্বর ও আলিমদের কর্তব্য, তেমনি মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখাও তাদের দায়িত্ব। ইউসুফ (আ) এক্ষেত্রে শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, বরং বিজ্ঞজনোচিত ও হিতাকাঙ্ক্ষার পরামর্শও দেন যে, উৎপন্ন শস্য শীষের মধ্যেই থাকতে দেবে এবং খোরাকীর পরিমাণে বের করবে—যাতে সেসব শস্য নষ্ট না হয়ে যায়।

মাস'আলা : (১২) অনুসরণযোগ্য আলিম সমাজের এদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত যে, তাদের সম্পর্কে জনগণের মধ্যে যেন কোন মিথ্যা বা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি না হয়। কেননা কুধারণা মূর্খতাপ্রসূত হলেও তা দাওয়াত ও প্রচারকার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। জনগণের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কথার ওজন থাকে না।—(কুরতুবী)

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

অপবাদের স্থান থেকে বেঁচে থাক। অর্থাৎ এমন অবস্থা ও ক্ষেত্র থেকেও নিজকে দূরে সরিয়ে রাখ, যেখানে কেউ তোমার প্রতি অপবাদ আরোপ করার সুযোগ পায়। এ নির্দেশ সাধারণ মুসলমানদের জন্য। তবে আলিম শ্রেণীকে এ ব্যাপারে দ্বিগুণ সাবধান হতে হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) যাবতীয় গোনাহ্ থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি এ ব্যাপারে বিশেষ রকম যত্নবান ছিলেন। একবার তাঁর একজন স্ত্রী তাঁর সাথে মদীনার এক গলিতে হেঁটে যাচ্ছিলেন। জনৈক সাহাবীকে সম্মুখ থেকে আসতে দেখে তিনি দূর থেকেই বলে দিলেন, আমার সাথে আমার অমুক স্ত্রী রয়েছে। উদ্দেশ্য, যাতে তিনি অনাত্মীয়া কোন মহিলার সাথে পথ অতিক্রম করছেন বলে কেউ সন্দেহ না করে। এ ক্ষেত্রে ইউসুফ (আ) কারাগার থেকে মুক্তি এবং রাজকীয় আহবান পাওয়া সত্ত্বেও মুক্তির পূর্বে জনগণের মন থেকে সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করেছেন।

মাস'আলা ঃ (১৩) অধিকারের ভিত্তিতে যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা জরুরী যদি অনিবার্য পরিস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতেও হয়, তবে এতেও সাধ্যানুযায়ী অধিকার ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা ভদ্রতার দাবি। ইউসুফ (আ) স্বীয় পবিত্রতা সপ্রমাণ করার জন্য যখন ঘটনার তদন্ত দাবি করেন, তখন আযীয ও তাঁর পত্নীর নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে ঐ মহিলাদের কথা বলেছেন, যারা হাত কেটে ফেলেছিলেন।—(কুরতুবী) কেননা উদ্দেশ্য এতেও সিদ্ধ হতে পারত।

মাস'আলা ঃ (১৪) এতে উত্তম চরিত্রের একটি শিক্ষা রয়েছে যে, যাদের হাতে সাত অথবা বার বছর পর্যন্ত কারাভোগ করতে হয়েছিল, মুক্তির পর ক্ষমতা পেয়েও ইউসুফ (আ) তাদের উপর কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। অধিকন্তু তিনি তাদেরকে এতটুকু কষ্ট দেয়াও পছন্দ করেন নি, যেমন لِيَعْلَمَ اَنِّىْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ আয়াতে এ বিষয়ের উপরই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ ۚ
إِنَّ رَبِّيْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِيْ بِهٖٓ أَسْتَخْلِصْهُ
لِنَفْسِيْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ۝
قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّيْ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۝ وَكَذٰلِكَ
مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۚ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيبُ
بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ

خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

(৫৩) আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ, কিন্তু সে নয়—আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৫৪) বাদশাহ্ বলল ঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি তাকে নিজের বিশ্বস্ত সহচর করে রাখব। অতঃপর যখন তার সাথে মত বিনিময় করল তখন বলল ঃ নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছে আজ থেকে বিশ্বস্ত হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছেন। (৫৫) ইউসুফ বলল ঃ আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান। (৫৬) এমনিভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশের বুকে প্রতিষ্ঠা দান করেছি। সে তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত। আমি স্বীয় রহমত যাকে ইচ্ছা পৌঁছে দেই এবং আমি পুণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। (৫৭) এবং ঐ লোকদের জন্য পরকালে প্রতিদান উত্তম যারা ঈমান এনেছে ও সতর্কতা অবলম্বন করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি নিজের মনকে (- ও সত্তাগত দিক দিয়ে) মুক্ত (ও পবিত্র) বলি না। (কেননা প্রত্যেকের) মন মন্দেরই আদেশ দেয়, ঐ মন ছাড়া—যার প্রতি আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ করেন [এবং যার মধ্যে মন্দের বীজ না রাখেন; যেমন পয়গম্বরদের মন। এগুলোকে 'মুতমায়িন্না' (প্রশান্ত) বলা হয়। ইউসুফ (আ)-এর মনও ছিল এগুলোর অন্তর্ভুক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, আমার পবিত্রতা ও সাধুতা আমার মনের সত্তাগত গুণ নয়, বরং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সুদৃষ্টির ফল। তাই আমার মন মন্দ কাজের আদেশ দেয় না। নতুবা অন্য লোকদের মন যেমন, আমার মনও তেমনি হত]। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থাৎ উপরে মনের দু'প্রকার শ্রেণীভেদ জানা গেছে ঃ 'আম্মারা' ও 'মুতমায়িন্না'। আম্মারা তওবা করলে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয় এবং এ পর্যায়ে তাকে 'লাওয়ামা' বলা হয়। মুত-মায়িন্নার গুণ তার সত্তার জরুরী অঙ্গ নয়, বরং আল্লাহ্র অনুকম্পা ও রহমতের ফল। অতএব আম্মারা যখন লাওয়ামা হয়, তখন 'ক্ষমা' গুণ প্রকাশ পায় এবং 'মুত-মায়িন্না' 'দয়ালু' গুণ প্রকাশ পায়।

এসব হচ্ছে ইউসুফ (আ)-এর বক্তব্যের বিষয়বস্তু। এখন প্রশ্ন এই যে, অপবিত্রতা প্রমাণের এ কাজটি মুক্তির পরও তো সম্ভবপর ছিল। মুক্তির আগে তা কেন করা হল? সম্ভবত এর কারণ এই যে, মুক্তির পূর্বে এ পবিত্রতা প্রমাণ করলে যতটুকু বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে, মুক্তির পর ততটুকু হতে পারে না। কেননা, যুক্তি-প্রমাণ মুক্তির আগে ও পরে উভয় অবস্থাতে পবিত্রতা সপ্রমাণ করত ঠিক, কিন্তু মুক্তির আগে পেশকৃত যুক্তি-প্রমাণের সাথে একটি অতিরিক্ত বিষয়ও রয়েছে। তা এই যে, বাদশাহ্ ও আত্মীয় যেন বুঝতে পারেন যে, যখন পবিত্রতা প্রমাণ ব্যতিরেকে ইউসুফ মুক্ত হতে চায় না, অথচ এমতাবস্থায় মুক্তিই

কয়েদীর পরম বাসনা হয়ে থাকে ; তখন বোঝা যায় যে, স্বীয় পবিত্রতার ব্যাপারে তিনি পূর্ণ আস্থাবান। তাই তা প্রমাণিত হয়ে যাবে বলে নিশ্চিন্ত। বলা বাহুল্য, এরূপ পূর্ণ আস্থা নির্দোষ ব্যক্তিরই হতে পারে—দোষী ব্যক্তির নয়। বাদশাহ্ এসব কথাবার্তা শুনলেন] এবং (শুনে) বাদশাহ্ বললেন ঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি তাকে একান্তভাবে নিজের (কাজের) জন্য রাখব (এবং আযীযের কাছ থেকে নিয়ে নেব। সে আর তার অধীনে থাকবে না। লোকেরা তাকে বাদশাহর কাছে নিয়ে এল)। যখন বাদশাহ্ তাঁর সাথে কথা বললেন (এবং কথাবার্তার মধ্যে তাঁর আরও গুণ-গরিমা প্রকাশ পেল) তখন বাদশাহ্ (তাঁকে) বললেন ঃ আপনি আমার কাছে আজ (থেকে) খুবই সম্মানার্হ ও বিশ্বস্ত। (এরপর স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলোচনা হল। বাদশাহ্ বললেন ঃ এতবড় দুর্ভিক্ষের মুকাবেলা করা খুবই কঠিন কাজ। এর ব্যবস্থাপনা কার দায়িত্বে দেয়া যায়?) ইউসুফ (আ) বললেন ঃ আমাকে জাতীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করুন। আমি (এগুলোর) রক্ষণাবেক্ষণ (-ও) করব এবং (আমি আমদানী-রফতানীর ব্যবস্থা ও হিসাব-কিতাবের পদ্ধতি সম্পর্কেও) পুরাপুরি অভিজ্ঞতা রাখি (সেমতে তাঁকে বিশেষ কোন পদ দানের পরিবর্তে নিজের প্রতিভূ হিসাবে সর্বপ্রকার ক্ষমতাই দান করলেন। বাস্তবে যেন ইউসুফই বাদশাহ্ হয়ে গেলেন এবং তিনি নামেমাত্র বাদশাহ্ রইলেন। ইউসুফ (আ) আযীযের পদাধিকারী বলে খ্যাত হয়ে গেলেন। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ) আমি এমনি (আশ্চর্যজনক) ভাবে ইউসুফকে (মিসর) দেশে ক্ষমতাশালী করে দিলাম। সে যথা ইচ্ছা, তথায় বসবাস করতে পারে। (যেমন বাদশাহ্গণ এ ব্যাপারে স্বাধীন হয়। অর্থাৎ এমন এক সময় ছিল, যখন তিনি কূপে বন্দী ছিলেন। এরপর আযীযের অধীনে গোলাম ছিলেন। আজ এমন সময় এসেছে যে, তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছেন। ব্যাপার এই যে) আমি যাকে ইচ্ছা, স্বীয় অনুগ্রহ পৌঁছে দেই এবং আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। (অর্থাৎ ইহকালেও সৎকাজের প্রতিদান পায় অর্থাৎ পবিত্র জীবন লাভ করে। হয় ধনাঢ্য হয়ে—যেমন ইউসুফ লাভ করেছেন, না হয় ধনাঢ্যতা ব্যতিরেকে— অল্পে তুষ্টি ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে মধুর জীবন প্রাপ্ত হয়ে। এ হচ্ছে ইহকালের কথা) এবং পরকালের প্রতিদান আরও উত্তম ঈমান ও আল্লাহ্-ভীতি অবলম্বনকারীদের জন্য।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করা দুরস্ত নয় ; কিন্তু বিশেষ অবস্থায় ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে ইউসুফ (আ)-এর এ উক্তি বর্ণিত হয়েছিল ঃ আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পুরাপুরি তদন্তের পূর্বে আমি কারাগার থেকে মুক্তি পছন্দ করি না—যাতে আযীয ও বাদশাহর মনে পুরাপুরি বিশ্বাস জন্মে যে, আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং অভিযোগটি নিছক মিথ্যা ছিল। এ উক্তিতে একটি অনিবার্য প্রয়োজনে নিজের মুখেই নিজের পবিত্রতা বর্ণিত হয়েছিল, যা বাহ্যত নিজের শুচিতা নিজে বর্ণনা করার শামিল। এটা আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয় নয় ; যেমন কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ

অর্থাৎ আপনি কি তাদেরকে দেখেন না যারা নিজেরাই নিজেদেরকে শুচিশুদ্ধ বলে? বরং আল্লাহ্ তা'আলারই অধিকার আছে, তিনি যাকে ইচ্ছা, শুচিশুদ্ধ সাব্যস্ত করবেন। সূরা নজমেও এ বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি আয়াত রয়েছে ঃ

فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ —অর্থাৎ তোমরা নিজের শুচিতা নিজে দাবি করো না। আল্লাহ্ তা'আলাই সম্যক জ্ঞাত আছেন, কে বাস্তবিক পরহিযগার ও আল্লাহ্ভীরু।

তাই আলোচ্য আয়াতে ইউসুফ (আ) আপন পবিত্রতা প্রকাশ করার সাথে সাথেই এ সত্যও ফুটিয়ে তুলেছেন যে, আমার এ কথা বলা নিজের আল্লাহ্ভীরুতা ও পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্য নয়; বরং সত্য এই যে, প্রত্যেক মানুষের মন, যার মৌল উপাদান চার বস্তু যথা—অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু দ্বারা গঠিত হয়েছে, এ মন আপন স্বভাবে প্রত্যেককে মন্দ কাজের দিকেই আকৃষ্ট করে। তবে ঐ মন এর ব্যতিক্রম, যার প্রতি আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ করেন এবং মন্দ স্পৃহা থেকে পবিত্র রাখেন। পয়গম্বরগণের মন এরূপই হয়ে থাকে। কোর-আন পাকে এরূপ মনকে 'নফসে মুতমায়িন্না' আখ্যা দেয়া হয়েছে। মোটকথা, এমন কঠোর পরীক্ষার সময় গোনাহ্ থেকে বেঁচে যাওয়াটা আমার কোন সত্তাগত পরাকাষ্ঠা ছিল না; বরং আল্লাহ্ তা'আলারই রহমত ও পথ প্রদর্শনের ফল ছিল। তিনি যদি আমার মন থেকে হীন প্রবৃত্তিকে বহিষ্কার করে না দিতেন, তবে আমিও সাধারণ মানুষের মত কুপ্রবৃত্তির হাতে পরাভূত হয়ে যেতাম।

কোন কোন হাদীসে আছে, ইউসুফ (আ)-এর এ কথা বলার কারণ এই যে, তাঁর মনেও এক প্রকার কল্পনা সৃষ্টি হয়েই গিয়েছিল, যদিও তা অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল। কিন্তু নবুয়তের মাপকাঠিতে এটাও পদস্খলনই ছিল। তাই এ কথা ব্যক্ত করেছেন যে, আমি নিজের মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র মনে করি না।

মানব-মন তিন প্রকার ঃ আয়াতে এ বিষয়টি চিন্তাসাপেক্ষ যে, এতে প্রত্যেক মানব-মনকেই أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (মন্দ কাজের আদেশদাতা) বলা হয়েছে; যেমন এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে প্রশ্ন করলেন ঃ এরূপ সাথী সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা যাকে সম্মান-সমাদর করলে অর্থাৎ অন্ন দিলে, বস্ত্র দিলে সে তোমাদেরকে বিপদে ফেলে দেয়। পক্ষান্তরে তার অবমাননা করা হলে অর্থাৎ তাকে ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ রাখা হলে সে তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর চাইতে অধিক মন্দ দুনিয়াতে আর কোন কিছু হতে পারে না। তিনি বললেন ঃ ঐ সত্তার কসম, যার কব্জায় আমার প্রাণ, তোমাদের বুকের মধ্যে যে মনটি আছে সে এই ধরনের সাথী ঃ—(কুরতুবী) অন্য এক হাদীসে আছে,

তোমাদের প্রধান শত্রু স্বয়ং তোমাদের মন। সে তোমাদেরকে মন্দ কাজে লিপ্ত করে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে এবং নানাবিধ বিপদাপদেও জড়িত করে দেয়।

মোটকথা, উল্লিখিত আয়াত এবং হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, মানব-মন মন্দ কাজেই উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু সূরা কিয়ামায় এ মানব-মনকেই 'লাওয়ামা' উপাধি দিয়ে এভাবে সম্মানিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এর কসম খেয়েছেন ঃ

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ—এবং সূরা আল ফজরে এ মনকেই 'মুতমায়িন্না' আখ্যায়িত করে জান্নাতের সুসংবাদ দান করা হয়েছে— يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ এভাবে মানব-মনকে এক জায়গায় أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ—দ্বিতীয় জায়গায় لَوَّامَةٌ এবং তৃতীয় জায়গায় مُطْمَئِنَّةٌ বলা হয়েছে।

এর ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেক মানব-মন আপন সত্তার দিক দিয়ে أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ অর্থাৎ মন্দ কাজের আদেশদাতা। কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহ্ ও পরকালের ভয়ে মনের আদেশ পালনে বিরত থাকে, তখন তা لَوَّامَةٌ হয়ে যায়। অর্থাৎ মন্দ কাজের জন্য তিরস্কারকারী ও মন্দ কাজ থেকে তওবাকারী; যেমন সাধারণ সাধু-সজ্জনদের মন এবং যখন কোন মানুষ নিজের মনের বিরুদ্ধে সাধনা করতে করতে মনকে এ স্তরে পৌঁছিয়ে দেয় যে, তার মধ্যে মন্দ কাজের কোন স্পৃহাই অবশিষ্ট থাকে না, তখন তা 'মুতমায়িন্না' হয়ে যায় অর্থাৎ প্রশান্ত ও নিরুদ্বেগ মন। পুণ্যবানরা চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে এ স্তর অর্জন করতে পারে; কিন্তু তা সদাসর্বদা অব্যাহত থাকা নিশ্চিত নয়। পয়গম্বরগণকে আল্লাহ্ তা'আলা আপনা-আপনি পূর্বসাধনা ব্যতিরেকেই এ মন দান করেন এবং তাঁরা সদাসর্বদা এ স্তরেই অবস্থান করেন। এভাবে মনের তিনটি অবস্থার দিক দিয়ে তিন প্রকার ক্রিয়াকর্মকে তার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

আয়াতের শেষে إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ—বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমার পালনকর্তা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। غَفُورٌ শব্দে ইঙ্গিত আছে যে, নফসে-আম্মারা যখন স্বীয় গোনাহ্র জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং 'লাওয়ামা' হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা করে দেবেন। رَحِيمٌ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নফসে-মুতমায়িন্না প্রাপ্ত হওয়াও আল্লাহ্ তা'আলার রহমত তথা দয়ারই ফল।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي الخ বাদশাহ্ যখন ইউসুফ (আ)-এর দাবি অনুযায়ী মহিলাদের কাছে ঘটনার তদন্ত করলেন এবং যুলায়খা ও অন্যান্য সব মহিলা বাস্তব ঘটনা স্বীকার করল, তখন বাদশাহ্ নির্দেশ দিলেন ঃ ইউসুফ (আ)-কে আমার কাছে নিয়ে এস—যাতে আমি তাকে একান্ত উপদেষ্টা করে নেই। নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে সসম্মানে কারাগার থেকে দরবারে আনা হল। অতঃপর পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ফলে তাঁর যোগ্যতা ও প্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বাদশাহ্ বললেন ঃ আপনি আজ থেকে আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানার্হ এবং বিশ্বস্ত।

ইমাম বগভী বর্ণনা করেন, যখন বাদশাহ্‌র দূত দ্বিতীয় বার কারাগারে ইউসুফ (আ)-এর কাছে পৌঁছল এবং বাদশাহ্‌র পয়গাম পৌঁছাল, তখন ইউসুফ (আ) সব কারাবাসীদের জন্য দোয়া করলেন এবং গোসল করে নতুন কাপড় পরিধান করলেন। তিনি বাদশাহ্‌র দরবারে পৌঁছে এ দোয়া করলেন ঃ

حَسْبِي رَبِّي مِنْ دُنْيَايَ وَحَسْبِي رَبِّي مِنْ خَلْقِهِ عَزَّ جَارُهُ وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُهُ

অর্থাৎ—আমার দুনিয়ার জন্য আমার পালনকর্তাই যথেষ্ট এবং সকল সৃষ্ট জীবের মুকাবিলায় আমার পালনকর্তা আমার জন্য যথেষ্ট। যে তাঁর আশ্রয়ে আসে, সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই।

দরবারে পৌঁছে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হয়ে দোয়া করেন এবং আরবী ভাষায় সালাম করেন ঃ আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ এবং বাদশাহ্‌র জন্য হিব্রু ভাষায় দোয়া করলেন। বাদশাহ্ অনেক ভাষা জানতেন, কিন্তু আরবী ও হিব্রু ভাষা তাঁর জানা ছিল না। ইউসুফ (আ) বলে দেন যে, সালাম আরবী ভাষায় এবং দোয়া হিব্রু ভাষায় করা হয়েছে।

এ রিওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, বাদশাহ্ ইউসুফ (আ)-এর সাথে বিভিন্ন ভাষায় কথাবার্তা বলেন। তিনি তাঁকে প্রত্যেক ভাষায়ই উত্তর দেন এবং আরবী ও হিব্রু এ দু'টি অতিরিক্ত ভাষা শুনিয়ে দেন। এতে বাদশাহ্‌র মনে ইউসুফ (আ)-এর যোগ্যতা গভীরভাবে রেখাপাত করে।

অতঃপর বাদশাহ্ বললেন ঃ আমি আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনার মুখ থেকে সরাসরি শুনতে চাই। ইউসুফ (আ) প্রথমে স্বপ্নের এমন বিবরণ দিলেন, যা আজ পর্যন্ত বাদশাহ্ নিজেও কারও কাছে বর্ণনা করেন নি। এরপর ব্যাখ্যা বললেন।

বাদশাহ্ বললেন ঃ আমি আশ্চর্য বোধ করছি যে, আপনি এসব বিষয় কি করে জানলেন! অতঃপর তিনি পরামর্শ চাইলেন যে, এখন কি করা দরকার? ইউসুফ (আ) বললেন ঃ

প্রথম সাত বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে। এ সময় অধিকতর পরিমাণে চাষাবাদ করে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। জনগণকে অধিক ফসল ফলানোর জন্য নির্দেশ দিতে হবে। উৎপন্ন ফসলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিজের কাছে সঞ্চিতও রাখতে হবে।

এভাবে দুর্ভিক্ষের সাত বছরের জন্য মিসরবাসীদের কাছে প্রচুর শস্যভাণ্ডার মজুদ থাকবে এবং আপনি তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত থাকবেন। রাজস্ব আয় ও খাস জমি থেকে যে পরিমাণ ফসল সরকারের হাতে আসবে, তা ভিন্‌দেশী লোকদের জন্য রাখতে হবে। কারণ, এ দুর্ভিক্ষ হবে সুদূর দেশ অবধি বিস্তৃত। ভিন্‌দেশীরা তখন আপনার মুখাপেক্ষী হবে। আপনি খাদ্যশস্য দিয়ে সেসব আর্তমানুষকে সাহায্য করবেন। বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ মূল্য গ্রহণ করলেও সরকারী ধনভাণ্ডারে অভূতপূর্ব অর্থ সমাগম হবে। এ পরামর্শ শুনে বাদশাহ্‌ মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়ে বললেন ঃ এ বিরাট পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা কিভাবে হবে এবং কে করবে? ইউসুফ (আ) বললেন ঃ

اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ —অর্থাৎ জমির উৎপন্ন ফসলসহ দেশীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনি আমাকে সোপর্দ করুন। আমি এগুলোর পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম এবং ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ সম্পর্কেও আমার পুরাপুরি জ্ঞান আছে।—(কুরতুবী)

একজন অর্থমন্ত্রীর মধ্যে যেসব গুণ থাকার দরকার, উপরোক্ত দু'টি শব্দের মধ্যে ইউসুফ (আ) তার সবগুলোই বর্ণনা করে দিয়েছেন। কেননা, অর্থমন্ত্রীর জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে সরকারী ধনসম্পদ বিনষ্ট হতে না দেওয়া, বরং পূর্ণ হিফাযত সহকারে একত্রিত করা এবং অনাবশ্যক ও ভ্রান্ত খাতে ব্যয় না করা। দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে, যেখানে যে পরিমাণ ব্যয় করা জরুরী, সেখানে সেই পরিমাণে ব্যয় করা এবং এক্ষেত্রে কোন কমবেশী না করা। حَفِيظٌ শব্দটি প্রথম প্রয়োজনের এবং عَلِيمٌ শব্দটি দ্বিতীয় প্রয়োজনের গ্যারান্টি।

'বাদশাহ্‌ যদিও ইউসুফ (আ)-এর গুণাবলীতে মুগ্ধ ও তাঁর ধর্মপরায়ণতা ও বুদ্ধিমত্তায় পুরাপুরি বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলেন, তথাপি কার্যত তাকে অর্থমন্ত্রীর পদ সোপর্দ করলেন না, বরং এক বছর পর্যন্ত একজন সম্মানিত অতিথি হিসাবে দরবারে রেখে দিলেন।

এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর শুধু অর্থ মন্ত্রণালয়ই নয়, বরং যাবতীয় সরকারী দায়িত্বও তাঁকে সোপর্দ করে দেওয়া হলো। সম্ভবত এ বিলম্বের কারণ ছিল এই যে, নিকট-সান্নিধ্যে রেখে চরিত্র ও অভ্যাস সম্পর্কে পুরাপুরি অভিজ্ঞতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে এত বড় পদ দান করা উপযুক্ত ছিল না, যেমন শেখ সাদী বলেন ঃ

چو یوسف کسے در صلاح و تمیز
بیک سال باید کہ گردد عزیز

অর্থাৎ ঃ কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি ইউসুফ সমতুল্য যোগ্যতা ও শিষ্টাচার থাকে, তার পক্ষে এক বছর কালের মধ্যেই মন্ত্রী পর্যায়ের মর্যাদা লাভ সম্ভব।

কোন কোন তফসীরবিদ লিখেছেন ঃ এ সময়েই যুলায়খার স্বামী কিতফীর মৃত্যু-বরণ করে এবং বাদশাহ্‌র উদ্যোগে ইউসুফ (আ)-এর সাথে যুলায়খার বিবাহ হয়ে যায়। তখন ইউসুফ (আ) যুলায়খাকে বললেন ঃ তুমি যা চেয়েছিলে, এটা কি তার চাইতে উত্তম নয়? যুলায়খা স্বীয় দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা সসম্মানে তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন এবং খুব আমোদ-আহ্লাদে তাঁদের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হতে লাগল। ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী তাঁদের দু'জন পুত্র সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের নাম ছিল ইফরায়ীম ও মানশা।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, বিবাহের পর আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-এর অন্তরে যুলায়খার প্রতি এত গভীর ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন, যা যুলায়খার অন্তরে ইউসুফ (আ)-এর প্রতি ছিল না। এমন কি, একবার ইউসুফ (আ) যুলায়খাকে অভিযোগের সুরে বললেন ঃ এর কারণ কি যে, তুমি পূর্বের ন্যায় আমাকে ভালবাস না? যুলায়খা আরয করল ঃ আপনার ওসিলায় আমি আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা অর্জন করেছি। এ ভাল-বাসার সামনে সব সম্পর্ক ও চিন্তা-ভাবনা ম্লান হয়ে গেছে। এ ঘটনাটি আরও কিছু বর্ণনাসহ তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে বর্ণিত হয়েছে।

ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীতে সাধারণ মানুষের জন্যে কল্যাণকর অনেক পথনির্দেশ ও শিক্ষা নিহিত রয়েছে। পূর্বে এগুলোর আংশিক বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত-সমূহে বর্ণিত আরও কিছু পথনির্দেশ নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে ঃ

মাস'আলা ঃ (১) وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ইউসুফ (আ)-এর উক্তিতে সৎ আল্লাহ্ভীরু ও পরহিযগারদের জন্য পথনির্দেশ এই যে, কোন গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার তওফীক হলে তজ্জন্যে গর্ব করা উচিত নয় এবং এর বিপরীতে যারা গোনাহ্ করে, তাদেরকে হেয় মনে করা উচিত নয় বরং ইউসুফ (আ)-এর ন্যায় অন্তরে এ কথা বদ্ধমূল করতে হবে যে, এটা আমার কোন সত্তাগত গুণ নয় বরং আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা। তিনি 'নফসে-আম্মারা'কে আমার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে দেন নি। নতুবা প্রত্যেকের মন স্বভাবগতভাবে তাকে মন্দ কাজের দিকে আকৃষ্ট করে।

স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সরকারী কোন পদ প্রার্থনা করা বৈধ নয় কিন্তু কতিপয় শর্তাধীনে এর অনুমতি আছে ঃ

মাস'আলা ঃ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ বাক্য থেকে জানা যায় যে কোন বিশেষ সরকারী পদ নিজে তলব করা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় জায়েয, যেমন ইউসুফ (আ) দেশীয় সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্ব তলব করেছেন।

কিন্তু এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এই যে, কোন বিশেষ পদ সম্পর্কে যদি জানা যায় যে, অন্য কোন ব্যক্তি এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে না এবং নিজে ভালরূপে তা সম্পাদন করতে পারবে বলে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকে এবং তা ছাড়া কোন গোনাহে লিপ্ত হওয়ারও

আশংকা না থাকে, তবে পদটি নিজে চেয়ে নেয়াও জায়েয। তবে শর্ত এই যে, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থকড়ির মোহে নয় বরং জনগণের বিশুদ্ধ সেবা ও ইনসাফের সাথে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করাই উদ্দেশ্য থাকতে হবে; যেমন ইউসুফ (আ)-এর সামনে এ লক্ষ্যই ছিল। আর যেখানে এরূপ অবস্থা না হয়, সেখানে রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন সরকারী পদ প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন। যে ব্যক্তি নিজে কোন পদের জন্য আবেদন করেছে, তিনি তাকে পদ দেন নি।

মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুর রহমান ইবনে সামরা (রা)-কে বললেন : কখনও প্রশাসকের পদ প্রার্থনা করো না। নিজে প্রার্থনা করে যদি প্রশাসকের পদ পেয়েও ফেল, তবে আল্লাহ্র সাহায্য ও সমর্থন পাবে না। ফলে, তুমি ভুল-ভ্রান্তি ও পদস্খলন থেকে বাঁচতে পারবে না। পক্ষান্তরে দরখাস্ত ব্যতিরেকে যদি তোমাকে কোন পদ দান করা হয়, তবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য ও সমর্থন পাবে। ফলে তুমি পদের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

মুসলিমের অপর এক হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে একটি পদ প্রার্থনা করলে তিনি বললেন : انا لن نستعمل على عملنا من اراده । যে ব্যক্তি নিজে পদ প্রার্থনা করে, আমি তাকে সরকারী পদ দান করি না।

ইউসুফ (আ)-এর পদ প্রার্থনা বিশেষ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল ছিল : ইউসুফ (আ)-এর ব্যাপারটি এই প্রেক্ষাপট থেকে ভিন্ন। কারণ তিনি জানতেন যে, বাদশাহ্ কাফির। তার কর্মচারীরাও তেমনি। এদিকে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় স্বার্থ-বাদী মহল জনগণের প্রতি দয়ার্দ্র হবে না। ফলে লাখো মানুষ না খেয়ে মারা যাবে। এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না, যে গরীবের প্রতি সুবিচার করতে পারে। তাই তিনি নিজেই এ পদের জন্য আবেদন করলেন। তবে এর সাথে নিজের কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্যও তাঁকে প্রকাশ করতে হয়েছে, যাতে বাদশাহ্ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে এ পদ দান করেন।

আজও যদি কেউ সরকারী এমন কোন পদ দেখে যে, এ কর্তব্য যথাযথ পালন করার মত অন্য কেউ নেই এবং তিনি নিজে তা বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন, তবে সে পদের জন্য দরখাস্ত করা তাঁর জন্য জায়েয তো বটেই বরং ওয়াজিব; কিন্তু প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থকড়ি লাভ নয় বরং জনসেবা এখানে প্রধান উদ্দেশ্য থাকতে হবে। এর সম্পর্ক আন্তরিক ইচ্ছার সাথে, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা খুব উত্তমভাবে পরিজ্ঞাত।—(কুরতুবী)

খোলাফায়ে-রাশেদীন স্বেচ্ছায় খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন। এর কারণও তাই ছিল যে, তাঁরা জানতেন, অন্য কেউ এ দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারবে না। সাহাবায়ে-কিরামের মধ্যে হযরত আলী, হযরত মু'আবিয়া, হযরত হুসায়ন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের প্রমুখের মতানৈক্যও এ বিষয়ের ওপর ভিত্তিশীল ছিল যে, তাঁদের প্রত্যেকের ধারণা ছিল যে, তৎকালীন প্রেক্ষিতে খিলাফতের দায়িত্ব প্রতিপক্ষের তুলনায় তিনি অধিক সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবেন। প্রভাব-প্রতিপত্তি কিংবা অর্থকড়ি অর্জন কারও মূল লক্ষ্য ছিল না।

অমুসলিম রাষ্ট্রে সরকারী পদ গ্রহণ করা জায়েয কি না : মাস'আলা : (৩) হযরত ইউসুফ (আ) মিসর-সম্রাটের চাকুরী গ্রহণ করেছিলেন। অথচ সম্রাট ছিল কাফির। এ থেকে বোঝা যায় যে, কাফির অথবা ফাসিক শাসনকর্তার অধীনে সরকারী পদ গ্রহণ করা বিশেষ অবস্থায় জায়েয।

কিন্তু ইমাম জাসসাস فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ---(আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না) আয়াতের অধীনে লিখেছেন : এ আয়াতদৃষ্টে জালিম ও কাফিরদের সাহায্য করা অবৈধ প্রমাণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, কাফিরদের অধীনে সরকারী পদ গ্রহণ করা তাদের কার্যে অংশীদার হওয়া এবং সাহায্য করার নামান্তর। এ ধরনের সাহায্যকে কোরআন পাকের অনেক আয়াতে হারাম বলা হয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আ) এ চাকুরী শুধু গ্রহণই করেন নি বরং দরখাস্ত করে লাভ করেছেন। তফসীরবিদ মুজাহিদের মতে এর বিশেষ কারণ এই যে, বাদশাহ্ তখন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোরআন-হাদীসে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এর কারণ এই যে, ইউসুফ (আ) বাদশাহ্র আচরণদৃষ্টে অনুভব করেছিলেন যে, তিনি তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না এবং শরীয়ত বিরোধী কোন আইন জারি করতে তাঁকে বাধ্য করবেন না। তাঁকে পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করা হবে। ফলে তিনি স্বীয় অভিমত ও ন্যায়ানুগ আইন অনুযায়ী কাজ করতে পারবেন। শরীয়তবিরোধী কোন আইন মানতে বাধ্য করা হবে না---এরূপ পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে কোন কাফির অথবা জালিমের চাকুরী করার মধ্যে যদিও কাফিরের সাথে সহযোগিতা করার দোষ বিদ্যমান থাকে, তথাপি যে পরিস্থিতিতে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার শক্তি না থাকে এবং পদ গ্রহণ না করলে জনগণের অধিকার খর্ব হওয়ার অথবা অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রবল আশংকা থাকে, সেই পরিস্থিতিতে এতটুকু সহযোগিতা করার অবকাশ ইউসুফ (আ)-এর কর্ম দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়, যতটুকুতে স্বয়ং কোন শরীয়ত-বিরোধী কাজ সম্পাদন করতে না হয়। কেননা, এটা প্রকৃতপক্ষে তার গোমরাহীর কাজে সাহায্য করা হবে না; যদিও দূরবর্তী কারণ হিসেবে এতেও তার সাহায্য হয়ে যায়। উল্লিখিত পরিস্থিতিতে সাহায্যের দূরবর্তী কারণ সম্পর্কে শরীয়তসম্মত অবকাশ আছে। ফিকাহ্বিদগণ এর পূর্ণ বিবরণ দান করেছেন। পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অনেকেই এহেন পরিস্থিতিতে অত্যাচারী শাসনকর্তাদের চাকুরী গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণিত আছে।---(কুরতুবী, মাযহারী)

আল্লামা মাওয়ারদি 'শরীয়তসম্মত রাজনীতি' সম্পর্কে স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন যে, কেউ কেউ ইউসুফ (আ)-এর এ কর্মের ভিত্তিতে কাফির ও জালিম শাসকদের অধীনে চাকুরী কিংবা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করা এই শর্তে জায়েয বলেছেন যে, স্বয়ং তাকে শরীয়তবিরোধী কোন কাজ করতে না হয়। পক্ষান্তরে কেউ কেউ এ শর্ত সহকারেও এরূপ চাকুরী নাজায়েয বলেছেন। কারণ, এতেও জুলুমকারীদেরকে শক্তিশালী ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করা হয়। তাঁরা ইউসুফ (আ)-এর এ কাজের বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করে থাকেন। এগুলোর সারমর্ম এই যে, এ কাজটি গ্রহণ করা ইউসুফ (আ)-এর সত্তা অথবা তাঁর শরীয়তের বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্যান্যের জন্য

এখন তা জায়েয নয়। কিন্তু অধিক সংখ্যক আলিম ও ফিকাহ্‌বিদ প্রথমোক্ত মতামত গ্রহণ করে একে জায়েয বলেছেন। —(কুরতুবী)

তফসীর বাহ্‌রে-মুহীতে আছে ঃ যে ক্ষেত্রে জানা যায় যে, আলিম ও পুণ্যবান ব্যক্তিরা এ পদ গ্রহণ না করলে সর্বসাধারণের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে এবং সুবিচার পদে পদে ব্যাহত হবে, সেখানে পদ গ্রহণ করা জায়েয বরং সওয়াবের কাজ ; শর্ত এই যে, এ পদ গ্রহণ করে যদি স্বয়ং তাকে কোন শরীয়তবিরোধী কাজ করতে না হয়।

মাস'আলা ঃ (৪) ইউসুফ (আ)-এর إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিজের কোন গুণগত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা অবৈধ নয়। এটা কোর-আনে নিষিদ্ধ 'নিজের মুখে নিজের পবিত্রতা জাহির করা' অন্তর্ভুক্ত নয় ; অবশ্য যদি তা অহ-ঙ্কার, গর্ব ও আস্ফালনবশত না হয়।

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ○

অর্থাৎ আমি ইউসুফকে বাদশাহ্‌র দরবারে যেভাবে মান-সম্মান ও উচ্চ পদমর্যাদা দান করেছি, এমনিভাবে আমি তাকে সমগ্র মিসরের শাসনক্ষমতা দান করেছি। এখানে সে যেভাবে ইচ্ছা আদেশ জারি করতে পারে। আমি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমত ও নিয়ামত দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত করি এবং আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না।

ঘটনা এ ভাবে বর্ণনা করা হয় যে, এক বছর অভিজ্ঞতা অর্জনের পর বাদশাহ্ দরবারে একটি উৎসবের আয়োজন করেন। রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত পদাধিকারী ব্যক্তি ও কর্মকর্তা এতে আমন্ত্রিত হন। ইউসুফ (আ)-কে রাজমুকুট পরিহিত অবস্থায় দরবারে হাজির করা হয় এবং শুধু অর্থ দফতরের দায়িত্ব নয়—যাবতীয় রাজকার্যই কার্যত ইউসুফ (আ)-কে সোপর্দ করে বাদশাহ্ নির্জনবাসী হয়ে যান।—(কুরতুবী, মাযহারী)

ইউসুফ (আ) এমন সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনা করলেন যে, কারও কোন অভিযোগ রইল না। গোটা দেশ তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল এবং সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করতে লাগল। রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে স্বয়ং ইউসুফ (আ)-ও কোনরূপ বাধাবিপত্তি কিংবা কষ্টের সম্মুখীন হননি।

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ এসব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজক্ষমতা দ্বারা ইউসুফ (আ)-এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান জারি করা এবং তাঁর দীন প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি কোন সময় এ কর্তব্য বিস্মৃত হননি এবং অব্যাহতভাবে বাদশাহ্‌কে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। তাঁর অবিরাম দাওয়াত ও প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত বাদশাহ্‌ও মুসলমান হয়ে যান।

وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ — অর্থাৎ পরকালের প্রতিদান ও সওয়াব দুনিয়ার নিয়ামতের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ তাদের জন্য, যারা ঈমানদার এবং যারা তাকওয়া ও পরহেযগারী অবলম্বন করে।

জনগণের সুখশান্তি নিশ্চিত করার জন্য ইউসুফ (আ) এমন কাজ করেন, যার নজির খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সুখ-শান্তির সাত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ইউসুফ (আ) পেট ভরে খাওয়া ছেড়ে দিলেন। সবাই বলল : মিসর সাম্রাজ্যের যাবতীয় ধনভাণ্ডার আপনার কব্জায়, অথচ আপনি ক্ষুধার্ত থাকেন, এ কেমন কথা। তিনি বললেন : সাধারণ মানুষের ক্ষুধার অনুভূতি যাতে আমার অন্তর থেকে উধাও হয়ে না যায়, সেজন্য এটা করি। তিনি শাহী বাবুর্চিদেরকে নির্দেশ দিলেন : দিনে মাত্র একবার দ্বিপ্রহরের খাদ্য রান্না করবে, যাতে রাজপরিবারের সদস্যবর্গও জনসাধারণের ক্ষুধার কিছু অংশগ্রহণ করতে পারে।

وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ۞ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ ۚ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّيْٓ اُوْفِي الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۞ فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ۞ قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ۞ وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۞

---

(৫৮) ইউসুফের ভ্রাতারা আগমন করল, অতঃপর তার কাছে উপস্থিত হল। সে তাদেরকে চিনল এবং তারা তাকে চিনল না। (৫৯) এবং সে যখন তাদেরকে তাদের রসদ প্রস্তুত করে দিল, তখন সে বলল : তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখ না যে, আমি পুরা মাপ দেই এবং মেহমানদেরকে উত্তম সমাদর করি? (৬০) অতঃপর যদি তাকে আমার কাছে না আন, তবে আমার কাছে তোমাদের কোন বরাদ্দ নেই এবং তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে না। (৬১) তারা বলল : আমরা তার সম্পর্কে তার পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব এবং আমাদেরকে এ কাজ করতেই হবে। (৬২)

এবং সে ভৃত্যদেরকে বলল : তাদের পণ্যমূল্য তাদের রসদ-পত্রের মধ্যে রেখে দাও—সম্ভবত তারা গৃহে পৌঁছে তা বুঝতে পারবে, সম্ভবত তারা পুনর্বার আসবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মোটকথা, ইউসুফ [আ] ক্ষমতাসীন হয়ে খাদ্যশস্যের চাষাবাদ করাতে ও তার ব্যাপক সঞ্চয় করাতে শুরু করলেন সাত বছর পর দুর্ভিক্ষ শুরু হল। মিসরে সরকারের তরফ থেকে খাদ্যশস্য বিক্রি করা হচ্ছে—এ সংবাদ শুনে দূর-দূরান্ত থেকে দলে দলে লোক আসতে শুরু করল) এবং (কেনানেও দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।) ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা (-ও বেনিয়ামিন ছাড়া খাদ্যশস্য নিতে মিসরে) আগমন করল। অতঃপর ইউসুফ (আ)-এর কাছে উপস্থিত হলে ইউসুফ (আ) তাদেরকে চিনলেন, কিন্তু তারা তাঁকে চিনল না। (কেননা, তাদের চেহারা-ছবিতে পরিবর্তন কম হয়েছিল। এছাড়া তারা যে আসবেই সে সম্পর্কে ইউসুফ (আ)-এর প্রবল ধারণা ছিল। আপনি কে, কোথা থেকে এসেছেন—নবাগতকে এরূপ জিজ্ঞাসাবাদও করা যায় এবং পূর্বপরিচিত হলে সামান্য অনুসন্ধান দ্বারা চিনেও নেওয়া যায়। কিন্তু ইউসুফ [আ]-এর অবস্থা এরূপ ছিল না। তিনি ভাইদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় কচি বালক ছিলেন। ফলে তাঁর চেহারা-ছবিতে বিরাট পরিবর্তন এসে গিয়েছিল। তিনি যে ইউসুফ হবেন, ভ্রাতাদের মনে এরূপ ধারণাও ছিল না। এ ছাড়া 'আপনি কে', শাসকবর্গকে এরূপ জিজ্ঞাসা করারও রীতি নেই। ইউসুফ [আ]-এর রীতি ছিল, তিনি প্রত্যেকের কাছে তার প্রয়োজনের পরিমাণ খাদ্যশস্য বিক্রি করতেন। ভ্রাতারা যখন দেখল যে, তাদেরও মূল্যের বিনিময়ে মাথাপিছু এক উট বোঝাই খাদ্যশস্য দেয়া হচ্ছে, তখন তারা বলল : আমাদের আরও একটি বৈমাত্রেয় ভাই আছে। আমাদের পিতার একটি ছেলে ছোট বেলায় নিখোঁজ হয়ে গেছে। তাই সান্ত্বনার জন্য পিতা তাকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। অতএব, তার অংশেরও এক উট বোঝাই খাদ্যসম্ভার আমাদেরকে দেয়া হোক। ইউসুফ [আ] বললেন : এটা আইনের বিপরীত। তার অংশ নিতে হলে তাকে স্বয়ং আসতে হবে। শেষ পর্যন্ত তাদের অংশের খাদ্যশস্য তাদেরকে প্রদত্ত হল।) যখন ইউসুফ [আ] তাদের (খাদ্যশস্যের) বোঝা প্রস্তুত করে দিলেন, তখন (প্রস্থানের সময়) বলে দিলেন : (এ খাদ্যশস্য শেষ হওয়ার পর যদি আবার আসতে চাও তবে) তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকেও (সাথে) আনবে (যাতে তার অংশও দেয়া যায়)। তোমরা কি দেখ না যে, আমি পুরাপুরি মেপে দেই এবং আমি সর্বাধিক অতিথিপরায়ণ? (অতএব তোমাদের ঐ ভাই আসলে তাকে আমি পুরাপুরি অংশ দেব এবং তাকে আদর-আপ্যায়ন করব, যেমন তোমরা নিজেদের ব্যাপারে তা দেখেছ। মোটকথা, তার আগমনে তোমাদেরই উপকার নিহিত রয়েছে) এবং যদি তোমরা (দ্বিতীয় বার আস এবং) তাকে আমার কাছে না আন, তবে (আমি বুঝব যে, তোমরা আমাকে প্রতারিত করে অধিক খাদ্যশস্য নিতে চেয়েছিলে। এর শাস্তি এই যে,) আমার কাছে তোমাদের নামের কোন খাদ্যশস্য বরাদ্দ নেই এবং তোমরা আমার কাছে আসতেও পারবে না। (অতএব তাকে না আনলে তোমাদের ক্ষতি এই যে, তোমাদের অংশের খাদ্যশস্যও বাতিল হয়ে যাবে)। তারা বলল : (দেখুন) আমরা (যথাসাধ্য) তার পিতার কাছ থেকে তাকে চাইব এবং আমরা

এ কাজ (অর্থাৎ চেষ্টা ও অনুরোধ) অবশ্যই করব। (এরপর পিতার ইচ্ছা) এবং (যখন সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে তারা চলতে লাগল, তখন) ইউসুফ (আ) চাকরদেরকে বললেন : তাদের দেয়া পণ্যমূল্য (যার বিনিময়ে তারা খাদ্যশস্য ক্রয় করেছে) তাদেরই আসবাবপত্রের মধ্যে (গোপনে) রেখে দাও—যাতে গৃহে পৌঁছে একে (যখন আসবাব-পত্রের ভেতর থেকে বের হয়ে আসে তখন) চিনে। সম্ভবত (এ দয়া ও অনুগ্রহ দেখে) তারা পুনর্বার ফিরে আসবে। (তাদের পুনর্বার আসা এবং ভাইকে নিয়ে আসা ইউসুফ [আ]-এর কাম্য ছিল। তাই তিনি এর উপায় অবলম্বন করেছেন। প্রথমত তিনি ওয়াদা করেছেন যে, তাকে নিয়ে আসলে তার অংশ পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত সাবধান করে দিয়েছেন যে, তাকে না আনলে নিজেদের অংশও পাবে না। তৃতীয়ত মূল্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা প্রচলিত মুদ্রার পরিবর্তে অন্য কোন বস্তু ছিল। এর পেছনে দু'টি ধারণা কার্যরত ছিল। এক. একে দয়া ও অনুগ্রহ বুঝে তারা আবার আসবে। দুই. সম্ভবত তাদের কাছে এ-ছাড়া কোন মূল্য নেই, ফলে পুনর্বার আসতে সক্ষম হবে না। এ মূল্য পেয়ে এগুলো নিয়েই তারা পুনর্বার আসতে পারবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসুফ (আ) আল্লাহ্র কৃপায় মিসরের পূর্ণ শাসন ক্ষমতা লাভ করলেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে ইউসুফ-ভ্রাতাদের খাদ্যশস্যের জন্য মিসরে আগমন উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলা হয়েছে যে, দশ ভাই মিসরে আগমন করেছিল। ইউসুফ (আ)-এর সহোদর ছোট ভাই তাদের সাথে ছিল না।

কাহিনীর মধ্যবর্তী অংশ কোরআন বর্ণনা করেন নি। কারণ, তা আপনা-আপনি বোঝা যায়।

ইবনে-কাসীর সুদ্দী, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ তফসীরবিদের বরাতে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা ঐতিহাসিক ও ইসরাইলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত হলেও কিছুটা গ্রহণ-যোগ্য। কারণ, কোরআনের বর্ণনারীতিতে এর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তাঁরা বলেছেন : ইউসুফ (আ)-এর হাতে মিসরের শাসনভার অর্পিত হওয়ার পর স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সাত বছর সমগ্র দেশের জন্য প্রভূত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণ নিয়ে আসে। অঢেল ফসল উৎপন্ন হয় এবং তা অধিকতর পরিমাণে অর্জন ও সঞ্চয়ের চেষ্টা করা হয়। এরপর স্বপ্নের দ্বিতীয় অংশ প্রকাশ পেতে থাকে। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তা দীর্ঘ সাত বছর অব্যাহত থাকে। ইউসুফ (আ) পূর্ব থেকেই জ্ঞাত ছিলেন যে, দুর্ভিক্ষ সাত বছর পর্যন্ত অবিরাম অব্যাহত থাকবে। তাই দুর্ভিক্ষের প্রথম বছরে তিনি দেশের মওজুদ শস্যভাণ্ডার খুব সাবধানে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত রাখলেন।

মিসরের অধিবাসীদের কাছে তাদের প্রয়োজন পরিমাণে খাদ্যশস্য পূর্ব থেকে সঞ্চিত করানো হলো। এখন দুর্ভিক্ষ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ল এবং চতুর্দিক থেকে বুভুক্ষু জন-সাধারণ মিসরে আগমন করতে লাগল। ইউসুফ (আ) একটি বিশেষ পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে শুরু করলেন। অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে এক উট-বোঝাই খাদ্যশস্য দিতেন—

এর বেশি দিতেন না। কুরতুবী এর পরিমাণ এক ওসক্ অর্থাৎ ষাট সা' লিখেছেন, যা আমাদের ওজন অনুযায়ী দু'শ দশ সের অর্থাৎ পাঁচ মণের কিছু বেশি হয়।

তিনি এ কাজকে এতটুকু গুরুত্ব দেন যে, বিক্রয় কার্যের তদারকি নিজেই করতেন। শুধু মিসরেই দুর্ভিক্ষ সীমাবদ্ধ ছিল না বরং দূর-দূরান্ত অঞ্চল এর করালগ্রাসে পতিত হয়েছিল। হযরত ইয়াকুব (আ)-এর জন্মভূমি কেনান ছিল ফিলিস্তীনের একটি অংশ। অদ্যাবধি তা 'খলিল' নামে একটি সমৃদ্ধ শহরের আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউসুফ (আ)-এর সমাধি অবস্থিত। এ বাসভূমিও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত ছিল না। ফলে ইয়াকুব (আ)-এর পরিবারেও অনটন দেখা দেয়। সাথে সাথেই মিসরের এ সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যে, সেখানে মূল্যের বিনিময়ে খাদ্যশস্য পাওয়া যায়। হযরত ইয়াকুব (আ)-এর কানে এ সংবাদ পৌঁছে যে, মিসরের বাদশাহ্ অত্যন্ত সৎ ও দয়ালু ব্যক্তি। তিনি জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করেন। অতঃপর তিনি পুত্রদেরকে বললেন: তোমরাও যাও এবং মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে এস।

এ কথাও জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে, একজনকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশি খাদ্যশস্য দেওয়া হয় না। তাই তিনি সব পুত্রকেই পাঠাতে মনস্থ করলেন। সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র বেনিয়ামিন ছিল ইউসুফ (আ)-এর সহোদর। ইউসুফ নিখোঁজ হওয়ার পর ইয়াকুব (আ)-এর স্নেহ ও ভালবাসা তার প্রতি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তাই সান্ত্বনা ও দেখাশোনার জন্য তাঁকে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

দশ ভাই কেনান থেকে মিসর পৌঁছল। ইউসুফ (আ) শাহী পোশাকে রাজ্যাধিপতির বেশে তাদের সামনে এলেন। শৈশবে সাত বছর বয়সে ভ্রাতারা তাঁকে কাফেলার লোকজনের কাছে বিক্রয় করে দিয়েছিল কিন্তু এখন আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। ---(কুরতুবী, মাযহারী)

বলা বাহুল্য, এত দীর্ঘ সময়ে মানুষের অঙ্গাবয়ব পরিবর্তিত হয়ে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে যায়। তাদের ধারণাও এ কথা ছিল না যে, যে বালককে তারা গোলামরূপে বিক্রয় করেছিল, সে কোন দেশের মন্ত্রী বা বাদশাহ্ হয়ে যেতে পারে। তাই তারা ইউসুফ (আ)-কে চিনল না; কিন্তু ইউসুফ (আ) তাদেরকে চিনে ফেললেন। فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ বাক্যের অর্থ তাই। আরবী ভাষায় اِنْكَار শব্দের আসল অর্থ অপরিচিত মনে করা, তাই مُنْكِرُون -এর অর্থ অজ্ঞ ও অপরিচিত।

ইউসুফ (আ)-এর চিনে নেওয়া সম্পর্কে সুদ্দীর বরাত দিয়ে ইবনে কাসীর আরও বর্ণনা করেন যে, দশ ভাই দরবারে পৌঁছলে ইউসুফ (আ) তাদেরকে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, যেমন সন্দেহযুক্ত লোকদেরকে করা হয়---যাতে তারা সম্পূর্ণ সত্য উদঘাটন করে দেয়। প্রথমত জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা মিসরের অধিবাসী নও। তোমাদের ভাষাও হিব্রু। এমতাবস্থায় এখানে কিরূপে এলে? তারা বলল: আমাদের দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। আমরা আপনার প্রশংসা শুনে খাদ্যশস্যের জন্য এখানে এসেছি। দ্বিতীয়ত প্রশ্ন করলেন: তোমরা যে সত্য বলছ এবং

তোমরা কোন শত্রুর চর নও—একথা কিরূপে বিশ্বাস করব ? তারা বলল ঃ আল্লাহ্‌র পানাহ্। আমাদের দ্বারা এরূপ কখনও হতে পারে না। আমরা আল্লাহ্‌র নবী ইয়াকুব (আ)-এর সন্তান। তিনি কেনানে বসবাস করেন।

হযরত ইয়াকুব (আ)-এর ও তাঁর পরিবারের বর্তমান হাল অবস্থা জানা এবং ওদের মুখ থেকেই অতীতের কিছু ঘটনা বর্ণিত হোক—তাদেরকে প্রশ্ন করার পেছনে এটাই ছিল ইউসুফ (আ)-এর লক্ষ্য। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের পিতার আরও কোন সন্তান আছে কি ? তারা বলল ঃ আমরা বারো ভাই ছিলাম। তন্মধ্যে ছোট এক ভাই জঙ্গলে নিখোঁজ হয়ে গেছে। আমাদের পিতা তাকেই সর্বাধিক আদর করতেন। এরপর তার ছোট সহোদর ভাইকে আদর করতে শুরু করেন। এ সান্ত্বনার জন্য তাকে আমাদের সাথে এ সফরে পাঠান নি।

এ সব কথা শুনে ইউসুফ (আ) তাদেরকে রাজকীয় মেহমানের মর্যাদায় রাখা এবং যথারীতি খাদ্যশস্য প্রদান করার আদেশ দিলেন।

বন্টনের ব্যাপারে ইউসুফ (আ)-এর রীতি ছিল এই যে, একবারে কোন এক ব্যক্তিকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশি পরিমাণ খাদ্যশস্য দিতেন না। হিসাব অনুযায়ী যখন তা শেষ হয়ে যেত, তখন পুনর্বার দিতেন।

ভাইদের কাছে সব বিবরণ জানার পর তাঁর মনে এরূপ আকাঙ্ক্ষা উদয় হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, তারা পুনর্বার আসুক। এর জন্য একটি প্রকাশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি স্বয়ং ভাইদেরকে বললেন ঃ

ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ○

অর্থাৎ, তোমরা যখন পুনর্বার আসবে, তখন তোমাদের সেই ভাইকেও নিয়ে আসবে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে, আমি কিভাবে পুরাপুরি খাদ্যশস্য প্রদান করি এবং কিভাবে অতিথি আপ্যায়ন করি।

এরপর একটি সাবধানবাণীও শুনিয়ে দিলেন ঃ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ অর্থাৎ তোমরা যদি ভাইকে সাথে না আন, তবে আমি তোমাদের কাউকেই খাদ্যশস্য দেব না (কেননা, আমি মনে করব যে, তোমরা আমার সাথে মিথ্যা বলেছ)। এভাবে তোমরা আমার কাছে আসবে না।

অপর একটি গোপন ব্যবস্থা এই করলেন যে, তারা খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ যেসব নগদ অর্থকড়ি কিংবা অলংকার জমা দিয়েছিল, সেগুলো গোপনে তাদের আসবাবপত্রের মধ্যে

রেখে দেওয়ার জন্য কর্মচারীদেরকে আদেশ দিলেন, যাতে বাড়ীতে পৌঁছে যখন তারা আসবাব খুলবে এবং নগদ অর্থ ও অলংকার পাবে, তখন যেন পুনর্বার খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য আসতে পারে।

ইবনে কাসীর ইউসুফ (আ)-এর এ কাজের কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ বর্ণনা করেছেন। এক. ইউসুফ (আ) মনে করলেন যে, তাদের কাছে এ নগদ অর্থ ও অলংকার ছাড়া সম্ভবত আর কিছুই নেই। ফলে পুনর্বার খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য তারা আসতে পারবে না। দুই. তিনি পিতা ও ভাইদের কাছ থেকে খাদ্যশস্যের মূল্য গ্রহণ করা পছন্দ করেন নি। তাই শাহী ভাণ্ডারে নিজের কাছ থেকে পণ্যমূল্য জমা করে দিয়েছেন এবং তাদের অর্থ তাদেরকে ফেরত দিয়েছেন। তিন. তিনি জানতেন যে তাদের অর্থ যখন তাদের কাছে ফিরে যাবে এবং পিতা তা জানতে পারবেন, তখন তিনি আল্লাহ্‌র নবী বিধায় এ অর্থকে মিসরীয় রাজভাণ্ডারের আমানত মনে করে অবশ্যই ফেরত পাঠাবেন। ফলে ভাইদের পুনর্বার আসা আরও নিশ্চিত হয়ে যাবে।

মোটকথা, ইউসুফ (আ) কর্তৃক এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করার কারণ ছিল এই যে, ভবিষ্যতেও ভাইদের আগমন যেন অব্যাহত থাকে এবং ছোট সহোদর ভাইয়ের সাথেও তাঁর সাক্ষাত ঘটার সুযোগ উপস্থিত হয়।

অনুধাবনযোগ্য মাস'আলা : ইউসুফ (আ)-এর এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, যদি দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এমন চরমে পৌঁছে যে, সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অনেক লোক জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে, তবে সরকার এমন দ্রব্য-সামগ্রীকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে এবং খাদ্যশস্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারে। ফিকাহ্‌বিদগণ এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইউসুফ (আ)-এর অবস্থা সম্পর্কে পিতাকে অবহিত না করা আল্লাহ্‌র আদেশের কারণে ছিল : ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় একটি চরম বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, একদিকে তাঁর পিতা আল্লাহ্‌র নবী ইয়াকুব (আ) তাঁর বিরহ-ব্যথায় অশ্রু বিসর্জন করতে করতে অন্ধ হয়ে গেলেন এবং অন্যদিকে ইউসুফ (আ) স্বয়ং নবী ও রসূল, পিতার প্রতি স্বভাবগত ভালবাসা ব্যতীত তাঁর অধিকার সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। কিন্তু সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর সময়ের মধ্যে তিনি একবারও বিরহ-যাতনায় অস্থির ও মুহ্যমান পিতাকে কোন উপায়ে স্বীয় কুশল সংবাদ পৌঁছানোর কথা চিন্তাও করলেন না। সংবাদ পৌঁছানো তখনও অসম্ভব ছিল না, যখন তিনি গোলাম হয়ে মিসরে পৌঁছেছিলেন। আজীজে-মিসরের গৃহে তাঁর সব রকম স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধার সামগ্রী বিদ্যমান ছিল। তখন কারও মাধ্যমে পত্র অথবা খবর পৌঁছিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে তেমন কঠিন ছিল না। এমনিভাবে কারাগারের জীবনেও যে সংবাদ এদিক সেদিক পৌঁছাতে পারে, তা কে না জানে। বিশেষত আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁকে সসম্মানে কারাগার থেকে মুক্তি দেন এবং মিসরের শাসনক্ষমতা তাঁর হাতে আসে, তখন নিজে গিয়ে পিতার কাছে উপস্থিত হওয়া তাঁর সর্বপ্রথম কাজ হওয়া উচিত ছিল। এটা কোন কারণে অসমীচীন হলে কমপক্ষে দূত প্রেরণ করে পিতাকে নিরুদ্বেগ করে দেওয়া তো ছিল তাঁর জন্য নেহাত মামুলি ব্যাপার।

কিন্তু আল্লাহ্‌র পয়গম্বর ইউসুফ (আ) এরূপ ইচ্ছা করেছেন বলেও কোথাও বর্ণিত

নেই। নিজে ইচ্ছা করা দূরের কথা, যখন খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য ভ্রাতারা আগমন করল, তখনও আসল ঘটনা প্রকাশ না করে তাদেরকে বিদায় করে দিলেন।

এ অবস্থা কোন সামান্যতম মানুষের কাছ থেকেও কল্পনা করা যায় না। আল্লাহ্‌র মনোনীত পয়গম্বর হয়ে তিনি তা কিরূপে বরদাশত করলেন!

এ বিস্ময়কর নীরবতার জওয়াবে সব সময় মনে একথা জাগ্রত হয় যে, সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ রহস্যের অধীনে ইউসুফ (আ)-কে আত্মপ্রকাশে বিরত রেখেছিলেন। তফসীর কুরতুবীতে পরে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আ)-কে নিজের সম্পর্কে কোন সংবাদ গৃহে প্রেরণ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলার রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন। মানুষের পক্ষে তা বোঝা কিরূপে সম্ভব! তবে মাঝে মাঝে কোন বিষয় কারও বোধগম্য হয়েও যায়। এখানে বাহ্যত ইয়াকুব (আ)-এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করাই ছিল আসল রহস্য। এ কারণেই ঘটনার শুরুতে যখন ইয়াকুব (আ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইউসুফকে বাঘে খায়নি, বরং এটা তাঁর ভাইদের দুষ্কৃতি, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পৌঁছে সরেজমিনে তদন্ত করা তাঁর কর্তব্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মনকে এ দিকে যেতে দেন নি। অতঃপর দীর্ঘদিন পর তিনি ছেলেদেরকে বললেনঃ তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর। আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন কাজ করতে চান, তখন তার কারণাদি এমনিভাবে সন্নিবেশিত করে দেন।

فَلَمَّا رَجَعُوٓا إِلَىٰٓ أَبِيهِمْ قَالُوا۟ يَٰٓأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ
مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ۝ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ
إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰٓ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَٰفِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ
ٱلرَّٰحِمِينَ ۝ وَلَمَّا فَتَحُوا۟ مَتَٰعَهُمْ وَجَدُوا۟ بِضَٰعَتَهُمْ رُدَّتْ
إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا۟ يَٰٓأَبَانَا مَا نَبْغِى ۖ هَٰذِهِۦ بِضَٰعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ
أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ۝ قَالَ
لَنْ أُرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِى بِهِۦٓ
إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا
نَقُولُ وَكِيلٌ ۝

(৬৩) তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এল, তখন বলল : হে আমাদের পিতা, আমাদের জন্য খাদ্যশস্যের বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব আপনি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, যাতে আমরা খাদ্যশস্যের বরাদ্দ আনতে পারি এবং আমরা অবশ্যই তার পুরাপুরি হিফাযত করব। (৬৪) বললেন, আমি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে কি সেরূপ বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই সম্পর্কে বিশ্বাস করেছিলাম? অতএব আল্লাহ্ উত্তম হিফাযতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু। (৬৫) এবং যখন তারা আসবাবপত্র খুলল, তখন দেখতে পেল যে, তাদেরকে তাদের পণ্যমূল্য ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বলল : হে-আমাদের পিতা, আমরা আর কি চাইতে পারি! এই আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য, আমাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা আবার আমাদের পরিবারবর্গের জন্যে রসদ আনব; এবং আমাদের ভাইয়ের দেখাশোনা করব এবং এক উটের বরাদ্দ খাদ্যশস্য আমরা অতিরিক্ত আনব। ঐ বরাদ্দ সহজ। (৬৬) বললেন : তাকে ততক্ষণ তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ তোমরা আমাকে আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার না দাও যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেবে, কিন্তু যদি তোমরা সবাই একান্তই অসহায় না হয়ে যাও। অতঃপর যখন সবাই তাঁকে অঙ্গীকার দিল, তখন তিনি বললেন : আমাদের মধ্যে যা কথাবার্তা হলো সে ব্যাপারে আল্লাহ্ই মধ্যস্থ রইলেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মোটকথা, তারা যখন পিতা (ইয়াকুব আ)-র কাছে ফিরে এল, তখন বলল : হে আমাদের পিতা, (আমাদের খুব সমাদর হয়েছে, খাদ্যশস্যও পেয়েছি, কিন্তু বেনিয়ামিনের অংশ পাইনি। ভবিষ্যতেও বেনিয়ামিনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ব্যতীত) আমাদের জন্য খাদ্যশস্যের বরাদ্দ (একেবারেই) নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব এমতাবস্থায় জরুরী যে, আপনি ভাই (বেনিয়ামিন)-কে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, যাতে (পুনর্বার খাদ্যশস্য আনার পথে যে বাধা, তা অপসারিত হয়ে যায় এবং) আমরা (আবার) খাদ্যশস্যের বরাদ্দ আনতে পারি এবং (যদি তাকে প্রেরণ করতে আপনি কোন আশংকা বোধ করেন, তবে সে সম্পর্কে আরয এই যে) আমরা তার পুরাপুরি হিফাযত করব। ইয়াকুব (আ) বললেন : ব্যস, (রাখ রাখ) আমি কি তার সম্পর্কেও তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করবো, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই (ইউসুফ)-এর ব্যাপারে তোমাদেরকে বিশ্বাস করেছিলাম? (অর্থাৎ আমার মন তো সাক্ষ্য দেয় না; কিন্তু তোমরা বলছ যে, তার যাওয়া ব্যতীত ভবিষ্যতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ পাওয়া যাবে না; অথচ খাদ্যশস্যের উপর জীবন নির্ভরশীল এবং জান বাঁচানো ফরয)। অতএব (যদি নিয়েই যাও, তবে) আল্লাহ্ তা'আলার (কাছে তাকে সোপর্দ করলাম। তিনি) সর্বোত্তম রক্ষণাবেক্ষণকারী। (আমার রক্ষণাবেক্ষণে কি হয়!) এবং তিনি সব দয়ালুর চাইতে দয়ালু। (আমার দয়া ও স্নেহে কি হয়!) এবং (এ কথাবার্তার পর) যখন তারা আসবাবপত্র খুলল, তখন (তাতে) তাদের জমা দেওয়া পণ্যমূল্য (-ও) পাওয়া গেল, যা তাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। তারা বলল : পিতঃ (নিন) আমরা আর কি চাই! এই আমাদের জমা দেওয়া পণ্যমূল্য,

যা আমাদেরকেই ফেরত দেওয়া হয়েছে! (এমন দয়ালু বাদশাহ্! আমরা এর চাইতে বেশি কোন দয়ার জন্য অপেক্ষা করব? এটাই যথেষ্ট। এ কারণে আমাদের পুনর্বার বাদশাহ্র কাছে যাওয়া উচিত। এটা ভাইকে নিয়ে যাওয়ার উপর নির্ভরশীল। কাজেই অনুমতি দিন, আমরা তাকে নিয়ে যাব) এবং পরিবারের জন্য (আরও) রসদ আনব এবং ভাইয়ের খুব হিফাযত করব এবং এক উটের বরাদ্দ পরিমাণ খাদ্যশস্য বেশি আনব। (কেননা, এখন যে পরিমাণ এনেছি) এ তো অপ্রতুল। (শীঘ্র শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর আরও প্রয়োজন হবে এবং তা পাওয়া ভাইকে নিয়ে যাওয়ার উপর নির্ভরশীল)। ইয়াকুব (আ) বললেন: তাকে আমি ততক্ষণ তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা তাকে অবশ্যই আমার নিকট পৌঁছে দেবে! অবশ্য যদি তোমরা একান্তভাবেই অসহায় হয়ে পড় তাহলে ভিন্ন কথা। (এমতাবস্থায় পাঠাতে অস্বীকার করি না; কিন্তু) যতক্ষণ তোমরা হিফাযতের কসম না খাও (ততক্ষণ আমি পাঠাতে অক্ষম। সেমতে তারা সবাই কসম খেল)। যখন তারা কসম খেয়ে পিতাকে অঙ্গীকার দিল, তখন তিনি বললেন: আমরা যা কিছু বলছি, তা আল্লাহ্ তা'আলায় সমর্পিত (অর্থাৎ তিনিই আমাদের কথা ও অঙ্গীকারের সাক্ষী। কারণ, তিনি শুনছেন। তিনি একথা পূর্ণ করতে পারেন। অতএব এ কথা বলার দু'উদ্দেশ্য—এক. তাদেরকে আপন অঙ্গীকারের প্রতি লক্ষ্য রাখতে উৎসাহিত ও সতর্ক করা। আল্লাহ্কে 'হাজির' ও 'নাযির' মনে করলে তা অর্জিত হয়। দুই. তকদীরকে এই তদবীরের শেষ সীমা স্থির করা, যা তাওয়াক্কুলের সারমর্ম। অতঃপর বেনিয়ামিনকে সাথে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন। পুনর্বার মিসর সফরের জন্য বেনিয়ামিনসহ তারা সবাই প্রস্তুত হয়ে গেল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে ঘটনার অবশিষ্টাংশ বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা যখন মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল, তখন পিতার কাছে মিসরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথাও বলল: আজীজে-মিসর ভবিষ্যতের জন্য আমাদেরকে খাদ্যশস্য দেওয়ার ব্যাপারে একটি শর্ত আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ছোট ভাইকে সাথে আনলে খাদ্যশস্য পাবে, অন্যথায় নয়। তাই আপনি ভবিষ্যতে বেনিয়ামিনকেও আমাদের সাথে প্রেরণ করুন—যাতে ভবিষ্যতেও আমরা খাদ্যশস্য পাই। আমরা তার পুরাপুরি হিফাযত করব। তার কোনরূপ কষ্ট হবে না।

পিতা বললেন: আমি কি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম? উদ্দেশ্য, এখন তোমাদের কথায় কি বিশ্বাস! একবার বিশ্বাস করে বিপদ ভোগ করেছি। তখনও হিফাযতের ব্যাপারে তোমরা এ ভাষাই প্রয়োগ করেছিলে।

এটা ছিল তাদের কথার উত্তর। কিন্তু পরে পরিবারের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পয়গম্বরসুলভ তাওয়াক্কুল এবং এ বাস্তবতায় ফিরে গেলেন যে, লাভ-ক্ষতি কোনটাই বান্দার ক্ষমতাধীন নয়—যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা না করেন। আল্লাহ্র ইচ্ছা হয়ে গেলে তা

কেউ টলাতে পারে না। তাই সৃষ্ট জীবের উপর ভরসা করাও ঠিক নয় এবং তাদের কথার উপর নির্ভর করাও অসমীচীন।

তাই বললেন : فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا অর্থাৎ তোমাদের হিফাযতের ফল তো

ইতিপূর্বে দেখে নিয়েছি। এখন আমি আল্লাহ্‌র হিফাযতের উপরই ভরসা করি।

وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ এবং তিনি সর্বাধিক দয়ালু। তাঁর কাছেই আশা করি, তিনি আমার বার্ধক্য, বর্তমান দুঃখ ও দুশ্চিন্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে অধিক কষ্টে নিপতিত করবেন না।

মোটকথা, ইয়াকুব (আ) বাহ্যিক অবস্থা ও সন্তানদের ওয়াদা-অঙ্গীকারের উপর ভরসা করলেন না। তবে আল্লাহ্‌র ভরসায় কনিষ্ঠ ছেলেকেও সাথে প্রেরণ করতে সম্মত হলেন।

وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ قَالُوْا

يَا اَبَانَا مَا نَبْغِيْ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا

وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ٥

অর্থাৎ এতক্ষণ পর্যন্ত সফরের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই তাদের কথাবার্তা হচ্ছিল। আসবাবপত্র তখনও খোলা হয়নি। অতঃপর যখন আসবাবপত্র খোলা হল এবং দেখা গেল যে, খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ পরিশোধিত পণ্যমূল্য আসবাবপত্রের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, তখন তারা অনুভব করতে পারল যে, এ কাজ ভুলবশত হয়নি, বরং ইচ্ছাপূর্বক আমাদের পুঁজি আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। তাই رُدَّتْ اِلَيْنَا বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ পণ্যমূল্য

আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। অতঃপর তারা পিতাকে বলল : مَا نَبْغِيْ অর্থাৎ আমরা

আর কি চাই? খাদ্যশস্যও এসে গেছে এবং এর মূল্যও ফেরত পাওয়া গেছে। এখন তো অবশ্যই ভাইকে নিয়ে পুনর্বার নির্বিঘ্নে যাওয়া দরকার। কারণ, এ আচরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আজীজে-মিসর আমাদের প্রতি খুবই সদয়। কাজেই কোন আশংকার কারণ নেই, আমরা পরিবারের জন্য খাদ্যশস্য আনব, ভাইকেও হিফাযতে রাখব এবং ভাইয়ের অংশের

বরাদ্দ অতিরিক্ত পাব। কারণ, আমরা যা এনেছি, তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। অল্প-দিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

مَا نَبْغِي বাক্যের এক অর্থ বর্ণিত হল। এ বাক্যের مَا শব্দটি 'না' বোধক অর্থে নিলে বাক্যের আরেকটি অর্থ এরূপও হতে পারে যে, তারা পিতাকে বলল : এখন তো আমাদের কাছে খাদ্যশস্য আনার জন্য মূল্যও রয়েছে। আমরা আপনার কাছে কিছুই চাই না—শুধু ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন।

এসব কথা শুনে পিতা উত্তর দিলেন :

لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ

অর্থাৎ আমি বেনিয়ামিনকে তোমাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্র কসম এবং সাথে এরূপ ওয়াদা-অঙ্গীকার আমাকে দাও যে, তোমরা অবশ্যই তাকে সাথে নিয়ে আসবে। কিন্তু সত্যদর্শীদের দৃষ্টি থেকে এ বিষয় কোন সময় উধাও হয় না যে, মানুষ বাহ্যত যত শক্তি-সামর্থ্যই রাখুক, আল্লাহ্র শক্তির সামনে সে নিতান্তই অপারক ও অক্ষম। সে কাউকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কতটুকু ওয়াদা-অঙ্গীকারই বা করতে পারে। কারণ, তা পালন করার পূর্ণ শক্তি তার নেই। তাই ইয়াকুব (আ) এ ওয়াদা-অঙ্গীকারের সাথে একটি ব্যতিক্রমও জুড়ে দিলেন : إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ অর্থাৎ ঐ অবস্থা ব্যতীত, যখন তোমরা সবাই কোন বেষ্টনীতে পড়ে যাও। তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন : এর অর্থ এই যে, তোমরা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হও। কাতাদাহ্র মতে অর্থ এই যে, তোমরা সম্পূর্ণ অক্ষম ও পরাভূত হয়ে পড়।

فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ---অর্থাৎ ছেলেরা যখন প্রার্থিত পন্থায় ওয়াদা-অঙ্গীকার করল অর্থাৎ সবাই কসম খেল এবং পিতাকে আশ্বস্ত করার জন্য কঠোর ভাষায় প্রতিজ্ঞা করল, তখন ইয়াকুব (আ) বললেন : বেনিয়ামিনের হিফাযতের জন্য হলফ নেয়া ও হলফ করার যে কাজ আমরা করেছি, আল্লাহ্ তা'আলার উপরই তার নির্ভর। তিনি শক্তি দিলেই কেউ কারও হিফাযত করতে পারে এবং দেয় অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারে। নতুবা মানুষ অসহায়; তার ব্যক্তিগত সামর্থ্যাধীন কোন কিছু নয়।

নির্দেশ ও মাস'আলা : আলোচ্য আয়াতসমূহে মানুষের জন্য অনেক নির্দেশ ও মাস-আলা বিদ্যমান রয়েছে। এগুলো স্মরণ রাখা দরকার :

সন্তান ভুলত্রুটি করলে সম্পর্কচ্ছেদের পরিবর্তে সংশোধনের চিন্তা করাই একান্ত বিধেয় :

মাস'আলা (১) : ইউসুফ-ভ্রাতারা ইতিপূর্বে যে ভুল করেছিল, তাতে অনেক কবীরা

ও জঘন্য গোনাহ্ সংঘটিত হয়েছিল। উদাহরণত এক. মিথ্যা কথা বলে ইউসুফকে তাদের সাথে খেলাধুলার জন্য প্রেরণ করতে পিতাকে সম্মত করা। দুই. পিতার সাথে অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করা। তিন. কচি ও নিষ্পাপ ভাইয়ের সাথে নির্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করা। চার. বৃদ্ধ পিতাকে নিদারুণ মনোকষ্ট দানে ভ্রূক্ষেপ না করা। পাঁচ. একটি নিরপরাধ লোককে হত্যা করার পরিকল্পনা করা। ছয়. একজন মুক্ত ও স্বাধীন লোককে জোর-জবরদস্তি ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে দেয়া।

এগুলো ছিল চরম অপরাধ। ইয়াকুব (আ) যখন জানতে পারলেন যে, তারা মিথ্যা ভাষণ দিয়েছে এবং স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে ইউসুফকে কোথাও রেখে এসেছে, তখন বাহ্যত এটা ছেলেদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার কিংবা ওদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার মত বিষয় ছিল। কিন্তু তিনি তা করেন নি। বরং তারা যথারীতি পিতার কাছেই থাকে। এমনকি, মিসর থেকে খাদ্যশস্য আনার জন্য পিতা তাদেরকেই প্রেরণ করেন। তদুপরি দ্বিতীয়বার তার ছোট ভাই সম্পর্কে পিতার কাছে আবেদন-নিবেদন করার সুযোগ পায় এবং অবশেষে তাদের কথা মেনে নিয়ে ছোট ছেলেকেও তাদের হাতেই সমর্পণ করেন।

এ থেকে জানা গেল যে, সন্তান কোন গোনাহ্ ও ত্রুটি করে ফেললে পিতার কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষা ও উপদেশ দানের মাধ্যমে তার সংশোধন করা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনের আশা থাকে, ততক্ষণ সম্পর্কচ্ছেদ না করা। হযরত ইয়াকুব (আ) তাই করেছিলেন। অবশেষে ছেলেরা সবাই কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে এবং গোনাহ্র জন্য তওবা করেছে। হ্যাঁ, যদি সংশোধনের আশা না থাকে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে অন্যদের ধর্মীয় ক্ষতির আশংকা থাকে, তবে সম্পর্কচ্ছেদ করাই অধিকতর সমীচীন।

মাস'আলা (২)ঃ এখানে ইয়াকুব (আ) সদাচরণ ও সচ্চরিত্রতার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ছেলেদের এহেন কঠিন অপরাধ সত্ত্বেও তিনি এমন আচরণ দেখিয়েছেন যে, তারা পুনর্বার ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানাতে সাহসী হয়েছে।

মাস'আলা (৩)ঃ এমতাবস্থায় সংশোধনের উদ্দেশ্যে অন্যায়কারীকে একথা বলে দেওয়াও সমীচীন যে, বিগত আচরণের কারণে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করাই উচিত ছিল, কিন্তু আমি তা ক্ষমা করে দিচ্ছি। এতে সে লজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে পুরাপুরি তওবা করার সুযোগ পাবে। যেমন ইয়াকুব (আ) প্রথমে বলে নিয়েছিলেন যে, বেনিয়ামিনের ব্যাপারেও কি আমি তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম? কিন্তু বলার পর অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের তওবার কথা জেনে তিনি আল্লাহ্র উপর ভরসা করেছেন এবং ছোট ছেলেকে তাদের হাতে সঁপে দিয়েছেন।

মাস'আলা (৪)ঃ কোন মানুষের ওয়াদা ও হিফাযতের আশ্বাসের উপর সত্যিকারভাবে ভরসা করা ভুল। প্রকৃত ভরসা শুধু আল্লাহ্র উপর হওয়া উচিত। তিনিই সত্যিকার কার্যনির্বাহী এবং কারণ উদ্ভাবক। কারণ সরবরাহ করা অতঃপর তাতে ক্রিয়া-শক্তি দান করার ক্ষমতা তাঁরই। এ কারণেই ইয়াকুব (আ) বলেছেনঃ

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا

সূচী-পত্র

কা'বে আহবার বলেন ঃ এবার ইয়াকুব (আ) শুধু ছেলেদের উপর ভরসা করেন নি, বরং ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করেছেন। তাই আল্লাহ্ বললেন ঃ আমার ইয্‌যত ও প্রতাপের কসম, এখন আমি আপনার উভয় সন্তানকেই আপনার কাছে ফেরত পাঠাব।

মাস'আলা (৫) ঃ যদি অন্য ব্যক্তির মাল অথবা কোন বস্তু আসবাব-পত্রের মধ্যে পাওয়া যায় এবং বলিষ্ঠ আলামত দ্বারা বোঝা যায় যে, সে তাকে দেওয়ার জন্য ইচ্ছা পূর্বক আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দিয়েছে তবে তা গ্রহণ করা এবং তাকে নিজ কাজে ব্যয় করা জায়েয। ইউসুফ ভ্রাতাদের আসবাবপত্রের মধ্যে যে পণ্যমূল্য পাওয়া গিয়েছিল সে সম্পর্কে বলিষ্ঠ আলামতের সাক্ষ্য ছিল এই যে, ভুল অথবা অনিচ্ছা বশত তা হয়নি, বরং ইচ্ছাপূর্বকই তা ফেরত দেওয়া হয়েছে। তাই ইয়াকুব (আ) তা ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেন নি। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ভুলবশত এসে যাওয়ার সন্দেহ থাকে, সেখানে মালিকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করা ব্যতীত তা ব্যবহার করা বৈধ নয়।

মাস'আলা (৬) ঃ কোন ব্যক্তিকে এরূপ কসম দেওয়া উচিত নয়, যা পূর্ণ করা তার সাধ্যাতীত। যেমন, ইয়াকুব (আ) বেনিয়ামিনকে সুস্থ ও নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কসম দেওয়ার সাথে সাথে একটি অবস্থার ব্যতিক্রম প্রকাশ করেছেন যে, যদি তারা সম্পূর্ণ অপারক ও অক্ষম হয়ে পড়ে কিংবা সবাই ধ্বংসের মুখে পতিত হয়, তবে ভিন্ন কথা।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সাহাবায়ে-কিরামের কাছ থেকে স্বীয় আনুগত্যের অঙ্গীকার নেন, তখন নিজেই তাতে 'সাধ্যের শর্ত' যুক্ত করে দেন। অর্থাৎ আমরা সাধ্যানু-যায়ী আপনার পুরাপুরি আনুগত্য করব।

মাস'আলা (৭) ঃ ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছ থেকে এরূপ ওয়াদা-অঙ্গীকার নেওয়া যে, তারা বেনিয়ামিনকে ফিরিয়ে আনবে—এ থেকে বোঝা যায় যে,

(ব্যক্তির জামানত) বৈধ। অর্থাৎ কোন মোকদ্দমার আসামীকে মোকদ্দমার তারিখে আদালতে হাযির করার জামানত নেওয়া জায়েয।

এ মাস'আলায় ইমাম মালেক (র) ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। তিনি শুধু আর্থিক জামানতকে বৈধ মনে করেন এবং ব্যক্তির জামানতকে অবৈধ আখ্যায়িত করেন।

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ

مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَاۤ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۶۷﴾ وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ

اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا

حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضٰهَا ۚ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلٰى يُوسُفَ اٰوٰى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾

(৬৭) ইয়াকুব বললেন : হে আমার বৎসগণ! সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে যেয়ো না, বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। আল্লাহ্‌র কোন বিধান থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। নির্দেশ আল্লাহ্‌রই চলে। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত ভরসাকারীদের। (৬৮) তারা যখন পিতার কথামত প্রবেশ করল, তখন আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধে তা তাদের বাঁচাতে পারল না। কিন্তু ইয়াকুবের সিদ্ধান্তে তাঁর মনের একটি বাসনা ছিল, যা তিনি পূর্ণ করেছেন। এবং তিনি তো আমার শেখানো বিষয় অবগত ছিলেন। কিন্তু অনেক মানুষ অবগত নয়। (৬৯) যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, তখন সে আপন ভ্রাতাকে নিজের কাছে রাখল। বলল : নিশ্চয়ই আমি তোমার সহোদর। অতএব তাদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ করো না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (রওয়ানা হওয়ার সময়) ইয়াকুব (আ) (তাদেরকে) বললেন : বৎসগণ, (যখন মিসরে পৌঁছবে, তখন) সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে যেয়ো না, বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে যেয়ো এবং (এটা কুদৃষ্টি ইত্যাদি অপছন্দনীয় বিষয় থেকে আত্মরক্ষার একটি বাহ্যিক তদবীর মাত্র। নতুবা) আল্লাহ্‌র নির্দেশকে আমি তোমাদের উপর থেকে হটাতে পারি না। নির্দেশ তো একমাত্র আল্লাহ্‌রই (চলে; এ বাহ্যিক তদবীর সত্ত্বেও মনেপ্রাণে) তাঁর উপরই ভরসা রাখি। এবং ভরসাকারীদের উচিত, তাঁরই উপর ভরসা রাখা। (অর্থাৎ তোমরাও তাঁর উপরই ভরসা রেখো —তদবীরের দিকে দৃষ্টি দিও না। মোটকথা, সবাই বিদায় নিয়ে চলল।) যখন (মিসরে পৌঁছে) পিতার কথামত (শহরে) প্রবেশ করল, তখন পিতার মনোবাসনা পূর্ণ হয়ে গেল। (নতুবা) তাদের উপর থেকে, (এ তদবীর বলে) আল্লাহ্‌র নির্দেশ এড়ানো পিতার উদ্দেশ্য ছিল না (যে, তার কাজে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করা যাবে কিংবা তদবীর উপকারী না হওয়ার দরুন তার প্রতি সন্দেহ করা হবে। তিনি নিজেই তো বলেছিলেন : مَا أُغْنِي عَنكُم الخ —

কিন্তু ইয়াকুব (আ)-এর মনে (তদবীর পর্যায়ে) একটি বাসনা (এ যে) ছিল, যা তিনি প্রকাশ করেছেন এবং তিনি নিশ্চিতই বড় আলিম ছিলেন এ কারণে যে, আমি তাকে শিক্ষা

দিয়েছিলাম। (তিনি ইলমের বিপরীত তদবীরকে বিশ্বাসের পর্যায়ে সত্যিকার প্রভাবশালী কিরূপে মনে করতে পারতেন? তার এ উক্তির কারণ সেই তদবীরই ছিল, যা শরীয়তসিদ্ধ ও প্রশংসনীয়।) কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না (বরং মূর্খতাবশত তদবীরকে সত্যিকার প্রভাবশালী বলে বিশ্বাস করে নেয়) এবং যখন তারা (অর্থাৎ ইউসুফ-ভ্রাতারা) ইউসুফ (আ)-এর কাছে পেঁছিল (এবং বেনিয়ামিনকে উপস্থিত করে বলল: আপনার নির্দেশে আমরা তাকে এনেছি) তখন সে ভাইকে নিজের কাছে ডেকে নিল এবং (একান্তে তাকে) বলল: আমি তোমার ভাই (ইউসুফ)। অতএব তারা যা কিছু (অসদাচরণ) করেছে, সেজন্য দুঃখ করো না। (কেননা, এখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে মিলিত করে দিয়েছেন। এখন সব দুঃখ ভুলে যাওয়া উচিত। ইউসুফ (আ)-এর সাথে অসদ্ব্যবহারের কথা তো সবারই জানা। বেনিয়ামিনকেও হয়তো তারা কষ্ট দিয়ে থাকবে। যদি কষ্ট না-ও দিয়ে থাকে, তবে ইউসুফের বিচ্ছেদ কি তার জন্য কম কষ্টদায়ক ছিল? অতঃপর উভয় ভ্রাতা মিলে পরামর্শ করলেন বেনিয়ামিনকে কিভাবে রেখে দেওয়া যায়। এমনিতে রাখলে ভ্রাতারা অঙ্গীকার ও কসমের কারণে নিয়ে যেতে পীড়াপীড়ি করবে। ফলে অযথা কথা কাটাকাটি হবে। পক্ষান্তরে রাখার কারণ প্রকাশ হয়ে পড়লে গোপন ভেদ ফাঁস হয়ে যাবে। আর কারণ গোপন থাকলে ইয়াকুব (আ)-এর কষ্ট বাড়বে যে, বিনা কারণে কেন রাখা হল, কিংবা কেন রইল? ইউসুফ (আ) বললেন: উপায় তো রয়েছে, কিন্তু এতে তোমার বদনাম হবে। বেনিয়ামিন বলল: বদনামের পরওয়া করি না। মোটকথা, তাদের মধ্যে একথাই সাব্যস্ত হয়ে গেল। এদিকে সবাইকে খাদ্যশস্য দিয়ে বিদায় দেওয়ার আয়োজন করা হল।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে ইউসুফ-ভ্রাতাদের দ্বিতীয়বার মিসর সফরের কথা বর্ণিত হয়েছে। তখন ইয়াকুব (আ) তাদেরকে মিসর শহরে প্রবেশ-করার জন্য একটি বিশেষ উপদেশ দেন যে, তোমরা এগারো ভাই শহরের একই প্রবেশ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং নগর-প্রাচীরের কাছে পেঁছে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেয়ো এবং বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করো।

এরূপ উপদেশ দানের কারণ এই আশংকা ছিল যে, স্বাস্থ্যবান, সুঠাম দেহী, সুদর্শন এবং রূপ ও ঔজ্জ্বল্যের অধিকারী এসব যুবক সম্পর্কে যখন লোকেরা জানবে যে, এরা একই পিতার সন্তান এবং ভাই ভাই, তখন কারও বদ নজর লেগে তাদের ক্ষতি হতে পারে। অথবা সংঘবদ্ধভাবে প্রবেশ করার কারণে হয়তো কেউ হিংসাপরায়ণ হয়ে তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে।

ইয়াকুব (আ) তাদেরকে প্রথম সফরের সময় এরূপ উপদেশ দেন নি; দ্বিতীয় সফরের প্রাক্কালেই দিয়েছেন। এর কারণ সম্ভবত এই যে, প্রথমবার তারা মুসাফিরের বেশে এবং দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় মিসরে প্রবেশ করেছিল। কেউ তাদেরকে চিনত না এবং তাদের প্রতি কারও অতিরিক্ত মনোযোগ দানের আশংকা ছিল না। কিন্তু প্রথম সফরেই মিসরসম্রাট

তাদের প্রতি অসামান্য সম্মান প্রদর্শন করেন। ফলে সাধারণ রাজ কর্মচারী ও শহর-বাসীদের কাছে তারা পরিচিত হয়ে পড়ে। সুতরাং এখন কারও কুদৃষ্টি লেগে যাওয়ার আশংকা প্রবল হয়ে ওঠে কিংবা সবাইকে একটি জাঁকজমকপূর্ণ দল মনে করে হয়ত কেউ হিংসায় মেতে উঠতে পারে। এছাড়া এবারকার সফরে ছোট পুত্র বেনিয়ামিন সঙ্গে থাকাও তাদের প্রতি পিতার অধিকতর মনোযোগ দানের কারণ হতে পারে।

কুদৃষ্টির প্রভাব সত্য : এতে বোঝা গেল যে, মানুষের চোখ (কুদৃষ্টি) লাগা এবং এর ফলে অন্য মানুষ অথবা জন্তু জানোয়ারের কষ্ট কিংবা ক্ষতি হওয়া সত্য। এটা মূর্খতাসুলভ কুসংস্কার নয়। এ কারণেই ইয়াকুব (আ) এ থেকে পুত্রদের আত্মরক্ষার চিন্তা করেছেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও একে সত্যায়িত করেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন : কুদৃষ্টি মানুষকে কবরে এবং উটকে উনানে ঢুকিয়ে দেয়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) যেসব বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এবং উম্মতকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন, তন্মধ্যে من كل عين لامة-ও রয়েছে। অর্থাৎ আমি কুদৃষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। —(কুরতুবী)

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আবু মহল ইবনে হুনায়ফের ঘটনা সুবিখ্যাত। একবার গোসল করার জন্য পরিধেয় বস্ত্র খুলতেই তাঁর গৌরবর্ণ ও সুঠাম দেহের উপর আমের ইবনে রবীয়ার দৃষ্টি পতিত হয়। সাথে সাথে তার মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে : আমি আজ পর্যন্ত এমন সুন্দর ও কান্তিময় দেহ কারও দেখিনি। আর যায় কোথায়, তৎক্ষণাৎ মহল ইবনে হুনায়ফের দেহে ভীষণ জ্বর চেপে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) সংবাদ পেয়ে প্রতি-কারার্থে আমের ইবনে রবীয়াকে আদেশ দিলেন যে, সে যেন ওযু করে ওযুর পানি থেকে কিছু অংশ পাত্রে রাখে। অতঃপর তা যেন মহল ইবনে হুনায়ফের দেহে ঢেলে দেওয়া হয়। আদেশ মত কাজ করা হলে মহল ইবনে হুনায়ফ রক্ষা পেলেন। তার জ্বর থেমে গেল এবং তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে পূর্ব নির্ধারিত অভিযানে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সা) আমের ইবনে রবীয়াকে সতর্ক করে বলেছিলেন : علام يقتل احدكم اخاه الا بركت ان العين حق কেউ আপন ভাইকে কেন হত্যা করে? তোমার দৃষ্টিতে যখন তার দেহ সুন্দর প্রতিভাত হয়েছিল তখন তুমি তার জন্য বরকতের দোয়া করলে না কেন? মনে রেখো, চোখ লেগে যাওয়া সত্য।

এ হাদীস থেকে আরও জানা গেল যে, অপরের জান ও মালের মধ্যে যদি কেউ বিস্ময়কর কোন কিছু দেখে, তবে তার উচিত দোয়া করা যে, আল্লাহ্ তা'আলা এতে বরকত দান করুন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে : مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ বলা উচিত। এতে কুদৃষ্টির প্রভাব বিনষ্ট হয়ে যায়। আরও জানা গেল যে, কেউ চোখ

লাগার আক্রান্ত হলে যার চোখ লাগে, তার হাত, পা ও মুখমণ্ডল ধোয়া পানি রোগীর দেহে ছেড়ে দিলে চোখ লাগার অনিষ্ট বিদূরিত হয়ে যায়।

কুরতুবী বলেন ঃ আহ্লে সুন্নত ওয়াল-জমাআতের সব শীর্ষস্থানীয় আলিম এ বিষয়ে একমত যে, চোখ লাগা এবং তদ্দ্বারা ক্ষতি সাধিত হওয়া সত্য।

ইয়াকুব (আ) একদিকে কুদৃষ্টি অথবা হিংসার আশংকাবশত ছেলেদেরকে একই দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন এবং অন্যদিকে একটি বাস্তব সত্য প্রকাশ করাও জরুরী মনে করেছেন। এ সত্যের প্রতি ঔদাসীন্যের ফলে এ জাতীয় ব্যাপারাদিতে জনসাধারণ মূর্খতাসুলভ ধারণা ও কুসংস্কারের শিকার হয়ে পড়ে। সত্যটি এই যে, কোন মানুষের জান ও মালের মধ্যে কুদৃষ্টির প্রভাব এক প্রকার মেসমেরিজম। ক্ষতিকর ঔষধ কিংবা খাদ্য যেমন মানুষকে অসুস্থ করে দেয় এবং শীত ও গ্রীষ্মের তীব্রতায় রোগব্যাধি জন্ম নেয়, তেমনি কুদৃষ্টি ও মেসমেরিজমের প্রভাবও এসব অভ্যস্ত কারণের অধীন। দৃষ্টি অথবা কল্পনার শক্তিবলে এদের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। স্বয়ং এদের মধ্যে কোন সত্যিকার প্রভাবশক্তি নাই। বরং সব কারণ আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তি, ইচ্ছা ও ইরাদার অধীন। আল্লাহ্র তকদীরের বিপরীতে কোন উপকারী তদবীরে উপকার হতে পারে না এবং ক্ষতিকর তদবীরের ক্ষতির প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই ইয়াকুব (আ) বলেছেন ঃ

وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ○

অর্থাৎ কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার যে তদবীর আমি বলেছি, আমি জানি যে তা আল্লাহ্র ইচ্ছাকে এড়াতে পারবে না। আদেশ একমাত্র আল্লাহ্রই চলে। তবে মানুষের প্রতি বাহ্যিক তদবীর করার নির্দেশ আছে। তাই এ উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি তদবীরের উপর ভরসা করি না বরং আল্লাহ্র উপরই ভরসা করি। তাঁর উপরই ভরসা করা এবং বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক তদবীরের উপর ভরসা না করা প্রত্যেক মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

ইয়াকুব (আ) যে সত্য প্রকাশ করেছেন, ঘটনাচক্রে হয়েছেও কিছুটা তেমনি। এ সফরেও বেনিয়ামিনকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার যাবতীয় তদবীর চূড়ান্ত করা সত্ত্বেও সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং বেনিয়ামিনকে মিসরে আটকে রাখা হয়েছে। ফলে ইয়াকুব (আ) আরও একটি আঘাত পেলেন। তাঁর তদবীরের ব্যর্থতা পরবর্তী আয়াতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য তাই যে, আসল লক্ষ্যের দিক দিয়ে তদবীর ব্যর্থ হয়েছে, যদিও কুদৃষ্টি হিংসা ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার তদবীর সফল হয়েছে। কারণ, সফরে অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরে যে দুর্ঘটনা অনিবার্য ছিল, ইয়াকুব (আ)-এর দৃষ্টি সেদিকে যায়নি এবং এর জন্য কোন তদবীর করতে

নির্দেশ ও মাস'আলা : আলোচ্য দু' আয়াত থেকে কতিপয় মাস'আলা ও নির্দেশ জানা যায় :

(১) চোখ লাগা সত্য। সুতরাং ক্ষতিকর খাদ্য ও ক্ষতিকর ক্রিয়াকর্ম থেকে আত্মরক্ষার তদবীর করার ন্যায় এ থেকে আত্মরক্ষার তদবীর করাও সমভাবে শরীয়তসিদ্ধ ও প্রশংসনীয়।

(২) প্রতিহিংসা থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ নিয়ামত ও গুণগত বৈশিষ্ট্যকে গোপন রাখা দুরস্ত।

(৩) ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক তদবীর করা তাওয়াক্কুল ও পয়গম্বরগণের পদমর্যাদার পরিপন্থী নয়।

(৪) যদি কেউ অন্য কারও সম্পর্কে আশংকা পোষণ করে যে, সে দুঃখ-কষ্টে পতিত হবে, তবে তাকে অবহিত করা এবং দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে আত্মরক্ষার সম্ভাব্য উপায় বাতলে দেওয়া উত্তম, যেমন ইয়াকুব (আ) করেছিলেন।

(৫) যদি অন্য কারও কোন গুণ অথবা নিয়ামত দৃষ্টিতে বিস্ময়কর ঠেকে এবং চোখ লেগে যাওয়ার আশংকা হয়, তবে তা দেখে بَارَكَ اللّٰهُ অথবা مَا شَاءَ اللّٰهُ বলা দরকার, যাতে অন্যের কোন ক্ষতি না হয়।

(৬) চোখ লাগা থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে কোন সম্ভাব্য তদবীর করা জায়েয। তন্মধ্যে দোয়া-তাবীজ ইত্যাদি দ্বারা প্রতিকার করাও অন্যতম, যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা) জা'ফর ইবনে আবূ তালিবের দু'ছেলেকে দুর্বল দেখে তাবীজ ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসা করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

(৭) বিজ্ঞ মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক কাজে আসল ভরসা আল্লাহ্র উপর রাখা। কিন্তু বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক উপায়াদিকেও উপেক্ষা করবে না এবং সাধ্যানুযায়ী বৈধ উপায়াদি অবলম্বন করতে ত্রুটি করবে না। ইয়াকুব (আ) তাই করেছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাই শিক্ষা দিয়েছেন। মাওলানা রূমী বলেন :

بر توکل زانوئے اشتر بہ بند

এটাই পয়গম্বরসুলভ তাওয়াক্কুল ও রাসূল (সা)-এর সুন্নত।

(৮) এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ইউসুফ (আ) ছোট ভাইকে আনার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং যখন সে এসেছে, তখন তার কাছে নিজের পরিচয়ও প্রকাশ করে দিয়েছেন। কিন্তু পিতাকে আনার জন্য কোন চিন্তাও করেন নি এবং তাঁকে স্বীয় কুশল সংবাদ অবগত করানোর কোন পদক্ষেপও গ্রহণ করেন নি। এর কারণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, চল্লিশ বছর সময়ের মধ্যে এমন অনেক সুযোগ ছিল, যখন তিনি পিতাকে স্বীয় অবস্থা ও কুশল সংবাদ দিতে পারতেন, কিন্তু যা কিছু হয়েছে, সব আল্লাহ্র নির্ধারিত তকদীর ও ওহীর ইঙ্গিতেই হয়েছে। হয়তো তখন পর্যন্ত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পিতাকে স্বীয় অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করার অনুমতি ছিল না। কারণ, তখনও প্রিয় পুত্র বেনিয়ামিনের বিচ্ছেদের

মাধ্যমে পিতার আরও একটি পরীক্ষা বাকী ছিল। এ পরীক্ষা সমাপ্ত করার জন্যই সব ব্যবস্থাদি সম্পন্ন হয়েছে।

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ۝ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ۝ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۝ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ۝ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ۝ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝

(৭০) অতঃপর যখন ইউসুফ তাদের রসদপত্র প্রস্তুত করে দিলেন, তখন পানপাত্র আপন ভাইয়ের রসদের মধ্যে রেখে দিল। অতঃপর একজন ঘোষক ডেকে বলল ঃ হে কাফিলার লোকজন, তোমরা অবশ্যই চোর। (৭১) তারা ওদের দিকে মুখ করে বলল ঃ তোমাদের কি হারিয়েছে? (৭২) তারা বলল ঃ আমরা বাদশাহ্র পানপাত্র হারিয়েছি এবং যে কেউ এটা এনে দেবে সে এক উটের বোঝা পরিমাণ মাল পাবে এবং আমি এর যামিন। (৭৩) তারা বলল ঃ আল্লাহ্র কসম, তোমরা তো জান, আমরা অনর্থ ঘটাতে এদেশে আসিনি এবং আমরা কখনও চোর ছিলাম না। (৭৪) তারা বলল ঃ যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও, তবে যে চুরি করেছে তার কি শাস্তি? (৭৫) তারা বলল ঃ এর শাস্তি এই যে, যার রসদপত্র থেকে তা পাওয়া যাবে, এর প্রতিদানে সে দাসত্বে যাবে। আমরা জালিমদেরকে এভাবেই শাস্তি দিই। (৭৬) অতঃপর ইউসুফ আপন ভাইয়ের থলের পূর্বে তাদের থলে তল্লাশী শুরু করলেন। অবশেষে সেই পাত্র আপন ভাইয়ের থলের মধ্য থেকে বের করলেন। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম। সে

বাদশাহ্‌র আইনে আপন ভাইকে কখনও দাসত্বে নিতে পারত না, কিন্তু আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন। আমি যাকে ইচ্ছা, মর্যাদায় উন্নীত করি এবং প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে আছেন অধিকতর এক জ্ঞানীজন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর যখন ইউসুফ (আ) তাদের (খাদ্যশস্য ও রওয়ানা হওয়ার) রসদপত্রাদি প্রস্তুত করে দিলেন তখন (নিজেই কিংবা কোন নির্ভরযোগ্য কর্মচারীর মাধ্যমে) পানপাত্র (যাতে পানি দেওয়ার কাজও হত তাই) আপন ভাইয়ের রসদের মধ্যে রেখে দিলেন। অতঃপর (যখন তারা রওয়ানা হল, তখন ইউসুফের আদেশে পেছন দিক থেকে) একজন আহ্বানকারী ডেকে বলল: হে কাফেলার লোকজন, তোমরা অবশ্যই চোর। তারা তাদের (অর্থাৎ অন্বেষণকারীদের) দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল: তোমাদের কি বস্তু হারিয়েছে (যা চুরির ব্যাপারে আমাদেরকে সন্দেহ করছ)? তারা বলল: আমরা শাহী পরিমাপ পাত্র পাচ্ছি না (তা উধাও হয়ে গেছে)। যে ব্যক্তি তা (এনে) উপস্থিত করবে, সে এক উট বোঝাই খাদ্যশস্য (পুরস্কার হিসাবে সরকারের থেকে) পাবে। (কিংবা উদ্দেশ্য এই যে, যদি স্বয়ং চোর মাল ফেরত দেয়, তবে ক্ষমার পর পুরস্কার পাবে) আমি তার (পুরস্কার আদায় করে দেওয়ার) যামিন। [সম্ভবত ইউসুফ (আ)-এর আদেশেই এ আহ্বান ও পুরস্কারের ওয়াদা করা হয়েছিল] তারা বলল: আল্লাহ্‌র কসম তোমরা তো ভালরূপেই জান যে, আমরা দেশে অশান্তি ছড়ানোর জন্য (যার মধ্যে চুরি অন্যতম) আসিনি এবং আমরা চোর নই (অর্থাৎ এটা আমাদের অভ্যাস নয়)। তারা (অনুসন্ধানকারীরা) বলল: আচ্ছা যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও, (এবং তোমাদের মধ্যে কারও চুরি প্রমাণিত হয়ে যায়) তবে তার (চৌর্য-কর্মের) শাস্তি কি? তারা [ইয়াকুব (আ)-এর শরীয়তানুযায়ী] উত্তর দিল: তার শাস্তি এই যে, যার রসদপত্রের মধ্যে তা পাওয়া যায়, সে নিজেই তার শাস্তি (অর্থাৎ চুরির বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট চোরকে গোলাম বানিয়ে রেখে)। আমরা জালিম (অর্থাৎ) চোরদেরকে এমনি শাস্তি দেই। (অর্থাৎ আমাদের শরীয়তের নির্দেশ ও কাজ তাই। মোটকথা, পরস্পরে এসব কথাবার্তা সমাপ্ত হওয়ার পর রসদপত্র নামানো হল)। অতঃপর (তল্লাশি নেওয়ার সময়) ইউসুফ (নিজে অথবা কোন নির্ভরযোগ্য কর্মচারীর মাধ্যমে) আপন ভাইয়ের (রসদপত্রের) থলের আগে অন্য ভাইদের থলে তল্লাশি শুরু করলেন। অতঃপর (শেষে) পাত্রটিকে (অর্থাৎ পানপাত্রটিকে) আপন ভাইয়ের (রসদপত্রের) থলে থেকে বের করলেন। আমি ইউসুফ (আ)-এর খাতিরে এভাবে (বেনিয়ামিনকে) তার নিকটে রাখার তদবীর করেছি (এ তদবীরের কারণ এই যে) ইউসুফ স্বীয় ভাইকে বাদশাহ্‌র আইন অনুযায়ী নিতে পারতেন না, (কেননা বাদশাহ্‌র আইনে চুরির শাস্তি কিছু মারপিট ও জরিমানা ছিল।—তিবয়ানী রূহুল মা'আনী) কিন্তু এটা আল্লাহ্ তা'আলারই কাম্য ছিল। (তাই ইউসুফের মনে এই তদবীর জাগ্রত হয়েছে এবং তার ভাইয়ের মুখ থেকে এরূপ সিদ্ধান্তের কথা বের হয়েছে। ফলে উদ্দিষ্ট বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখানে সত্যিকারভাবে গোলাম করা হয়নি বরং বেনিয়ামিনের সম্মতিক্রমে গোলামের রূপ ধারণ করা হয়েছিল মাত্র।

কাজেই এখানে استرقاق حر অর্থাৎ মুক্ত ব্যক্তিকে গোলামে পরিণত করার সন্দেহ অমূলক। ইউসুফ যদিও বড় আলিম ও বুদ্ধিমান ছিলেন, তথাপি আমার তদবীর শেখানোর প্রতি মুখাপেক্ষী ছিলেন। বরং আমি) যাকে ইচ্ছা (ইল্মে) বিশেষ স্তর পর্যন্ত উন্নীত করি এবং সব বিদ্বানের চাইতে বড় বিদ্বান রয়েছেন। (অর্থাৎ আল্লাহ্) সৃষ্টজীবের জ্ঞান অপূর্ণ এবং স্রষ্টার জ্ঞান পূর্ণ। অতএব প্রত্যেক সৃষ্টজীব জ্ঞান ও তদবীরের মুখাপেক্ষী। তাই إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ও كِدْنَا বলা হয়েছে। মোট কথা এই যে, তাদের রসদ বা আসবাবপত্র থেকে যখন পানপাত্র বের হয়ে পড়ল এবং বেনিয়ামিনকে আটকানো হল, তখন তারা সবাই নিরতিশয় লজ্জিত হল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সহোদর ভাই বেনিয়ামিনকে রেখে দেওয়ার জন্য ইউসুফ (আ) একটি কৌশল ও তদবীর অবলম্বন করলেন। যখন সব ভাইকে নিয়ম মাফিক খাদ্যশস্য দেওয়া হল, তখন প্রত্যেক ভাইয়ের খাদ্যশস্য পৃথক পৃথক উটের পিঠে পৃথক পৃথক নামে চাপানো হল।

বেনিয়ামিনের যে খাদ্যশস্য উটের পিঠে চাপানো হল, তাতে একটি পাত্র গোপনে রেখে দেওয়া হল। কোরআন পাক এ পাত্রটিকে এক জায়গায় سِقَايَة শব্দের দ্বারা এবং অন্যত্র صُوَاعَ الْمَلِكِ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। سِقَايَة শব্দের অর্থ পানি পান করার পাত্র এবং صُوَاع শব্দটিও এমনি ধরনের পাত্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়। একে مَلِك তথা বাদশাহ্র দিকে নির্দেশিত করার ফলে আরও জানা গেল যে, এ পাত্রটি বিশেষ মূল্যবান ও মর্যাদাবান ছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, পাত্রটি 'যবরজদ' পাথর দ্বারা নির্মিত ছিল। আবার কেউ স্বর্ণ নির্মিত এবং রৌপ্য নির্মিতও বলেছেন। মোট কথা, বেনিয়ামিনের রসদপত্রে গোপনে রক্ষিত এ পাত্রটি যথেষ্ট মূল্যবান হওয়া ছাড়াও বাদশাহ্র সাথে এর বিশেষ সম্পর্কও ছিল। বাদশাহ্ নিজে তা ব্যবহার করতেন অথবা বাদশাহ্র আদেশে তা খাদ্যশস্য পরিমাপের পাত্ররূপে ব্যবহৃত হত।

ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ —অর্থাৎ কিছুক্ষণ পর জনৈক ঘোষক ডেকে বলল: হে কাফিলার লোকজন, তোমরা চোর।

এখানে ثُمَّ শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, এ ঘোষণা তৎক্ষণাৎ করা হয়নি বরং কাফিলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর করা হয়েছে—যাতে কেউ জালিয়াতির সন্দেহ না করতে পারে। মোট কথা, ঘোষক ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাফিলাকে চোর আখ্যা দিল।

قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ—অর্থাৎ ইউসুফ-ভ্রাতাগণ ঘোষণা-কারীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল : তোমরা আমাদেরকে চোর বলছ । প্রথমে এ কথা আমাদের বল যে, তোমাদের কি বস্তু চুরি হয়েছে ?

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

—ঘোষণাকারিগণ বলল, বাদশাহ্‌র পানপাত্র হারিয়ে গেছে। যে ব্যক্তি তা বের করে দেবে, সে এক উটের বোঝাই পরিমাণ খাদ্যশস্য পুরস্কার পাবে এবং আমি এর যামিন।

এখানে প্রথমে প্রশ্ন এই যে, ইউসুফ (আ) বেনিয়ামিনকে আটকানোর জন্য এ কৌশল কেন করলেন, অথচ তিনি জানতেন যে, স্বয়ং তাঁর বিচ্ছেদের আঘাত পিতার জন্য অসহনীয় ছিল? এমতাবস্থায় অপর ভাইকে আটকে তাঁকে আরও একটি আঘাত দেওয়া তিনি কিরূপে পছন্দ করলেন ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ। তা এই যে, নিরপরাধ ভাইদের বিরুদ্ধে চুরির অভি-যোগ আনা, গোপনে তাদের আসবাব-পত্রের মধ্যে কোন বস্তু রেখে দেওয়ার মত জালিয়াতি করা এবং প্রকাশ্যে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা—এসব কাজ অবৈধ। আল্লাহ্‌র পয়গম্বর ইউসুফ (আ) এগুলো কিভাবে সহ্য করলেন ?

কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ বর্ণনা করেন : বেনিয়ামিন যখন ইউসুফ (আ)-কে নিশ্চিতরূপে চিনে ফেলে, তখন সে নিজেই ভাইকে অনুরোধ করে যে, তাকে যেন ভাইদের কাছে ফেরত পাঠানো না হয়। বরং ইউসুফ (আ)-এর কাছে রাখা হয়। ইউসুফ (আ) প্রথমে এ অজুহাতই পেশ করলেন যে, তাকে এখানে রাখা হলে পিতার মনোকষ্টের অন্ত থাকবে না। দ্বিতীয়ত তাকে এখানে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে, তাকে চুরির অভিযোগে অভি-যুক্ত করে গ্রেফতার করে আটক রাখা। বেনিয়ামিন ভাইদের সাথে বসবাস করতে এতই নারাজ ছিল যে, সে এ জাতীয় প্রস্তাবেও সম্মত হয়ে যায়।

কিন্তু এ ঘটনা সত্য হলেও পিতার মনোকষ্ট, ভাইদের লাঞ্ছনা এবং তাদেরকে চোর বলা শুধু বেনিয়ামিনের সম্মতির কারণে বৈধ হতে পারে না। কেউ কেউ কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ঘোষক বোধ হয় ইউসুফ (আ)-এর অজ্ঞাতসারে এবং বিনা অনুমতিতে ভাইদের চোর বলেছিল। এ উক্তি যেমন প্রমাণহীন, তেমনি ঘটনার সাথে বেখাপ্পা। এমনিভাবে কেউ কেউ বলেন : ভ্রাতাগণ ইউসুফ (আ)-কে পিতার কাছ থেকে চুরি করে বিক্রয় করেছিল। তাই তাদেরকে চোর বলা হয়েছে। এটাও একটা নিছক ব্যাখ্যা বৈ নয়। অতএব, এসব প্রশ্নের বিশুদ্ধ উত্তর তাই—যা কুরতুবী, মাযহারী প্রমুখ গ্রন্থকার দিয়েছেন। তা এই যে, এ ঘটনায় যা করা হয়েছে এবং যা বলা হয়েছে, তা বেনিয়ামিনের বাসনার

ফলশ্রুতিও ছিল না এবং ইউসুফ (আ)-এর প্রস্তাবের ফলও ছিল না; বরং এসব কাজ ছিল আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁরই অপার রহস্যের বহিঃপ্রকাশ। এসব কাজের মাধ্যমে ইয়াকুব (আ)-এর পরীক্ষার বিভিন্ন স্তর পূর্ণতা লাভ করছিল। এ উত্তরের প্রতি স্বয়ং কোরআনের এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ —অর্থাৎ আমি ইউসুফের খাতিরে এমনিভাবে তার ভাইকে আটকানোর কৌশল করেছি।

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে এ ফন্দি ও কৌশলকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব, এসব কাজ যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে সম্পন্ন হয়েছে তখন এগুলোকে অবৈধ বলার কোন মানে নাই। এগুলো মূসা ও খিযিরের ঘটনায় নৌকা ভাঙ্গা, বালককে হত্যা করা ইত্যাদির মতই। এগুলো বাহ্যত গোনাহ্‌র কাজ ছিল বলেই মূসা (আ) তা মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু খিযির (আ) সব কাজ আল্লাহ্‌র নির্দেশে বিশেষ উপযোগিতার অধীনে করে যাচ্ছিলেন। তাই এগুলো গোনাহের কাজ ছিল না।

قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ

অর্থাৎ শাহী ঘোষক যখন ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাদেরকে চোর বলল, তখন তারা উত্তরে বলল: সভাসদবর্গও আমাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন যে, আমরা এখানে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোর নই।

قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ —রাজকর্মচারীরা বলল: যদি তোমাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে বল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কি শাস্তি?

قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝

অর্থাৎ ইউসুফের ভ্রাতাগণ বলল: যার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হবে, সে নিজেই তার শাস্তি। আমরা চোরকে এমনি ধরনের সাজা দেই।

উদ্দেশ্য, ইয়াকুব (আ)-এর শরীয়তে চোরের শাস্তি এই যে, যার মাল চুরি করে সে চোরকে গোলাম করে রাখবে। রাজকর্মচারীরা এভাবে স্বয়ং ভ্রাতাদের কাছ থেকে ইয়াকুবী শরীয়ত অনুযায়ী চোরের শাস্তি জেনে নিল, যাতে বেনিয়ামিনের আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হলো নিজেদেরই ফয়সালা অনুযায়ী তাকে ইউসুফ (আ)-এর হাতে সোপর্দ করতে বাধ্য হয়।

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ —অর্থাৎ সরকারী তল্লাশকারীরা প্রকৃত ষড়যন্ত্র ঢেকে রাখার জন্য প্রথমে অন্য ভাইদের আসবাবপত্র তালাশ করল। প্রথমেই বেনিয়ামিনের আসবাবপত্র খুলল না, যাতে তাদের সন্দেহ না হয়।

ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ —অর্থাৎ সব শেষে বেনিয়ামিনের আসবাবপত্র খোলা হলে তা থেকে শাহী পাত্রটি বের হয়ে এল।

তখন ভাইদের অবস্থা দেখে কে? লজ্জায় সবার মাথা হেট হয়ে গেল। তারা বেনিয়ামিনকে গাল-মন্দ দিয়ে বলল : তুমি আমাদের মুখে চুনকালি দিলে।

كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

অর্থাৎ এমনিভাবে আমি ইউসুফের খাতিরে কৌশল করেছি। তিনি বাদশাহ্র আইনানুযায়ী ভাইকে গ্রেফতার করতে পারতেন না। কেননা, মিসরের আইনে চোরকে মারপিট করে এবং চোরাই মালের দ্বিগুণ মূল্য আদায় করে ছেড়ে দেওয়ার বিধান ছিল। কিন্তু তারা এখানে ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছ থেকেই ইয়াকুবী শরীয়তানুযায়ী চোরের বিধান জেনে নিয়েছিল। এ বিধান দৃষ্টে বেনিয়ামিনকে আটকে রাখা বৈধ হয়ে গেল। এমনি-ভাবে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় ইউসুফ (আ)-এর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ —অর্থাৎ আমি যাকে ইচ্ছা উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করে দেই, যেমন এ ঘটনায় ইউসুফের মর্যাদা তাঁর ভাইদের তুলনায় উচ্চ করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরই তদপেক্ষা অধিক জ্ঞানী বিদ্যমান রয়েছে।

উদ্দেশ্য এই যে, জ্ঞানের দিক দিয়ে সৃষ্ট জীবের মধ্যে একজনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। একজন যত বড় জ্ঞানীই হোক, তার মুকাবিলায় আরও অধিক জ্ঞানী থাকে। মানব জাতির মধ্যে যদি কেউ এমন হয় যে, তার চাইতে অধিক জ্ঞানী আর নেই, তবে এ অবস্থায়ও আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জ্ঞান সবারই ঊর্ধ্বে।

নির্দেশ ও মাস'আলা : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় নির্দেশ ও মাস'আলা জানা যায়।

(১) وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্য মজুরি কিংবা পুরস্কার নির্ধারণ করে যদি এই মর্মে ঘোষণা দান করা হয় যে, যে ব্যক্তি এ কাজ করবে, সে এই পরিমাণ পুরস্কার কিংবা মজুরি পাবে, তবে তা জায়েয হবে; যেমন অপরাধীদেরকে গ্রেফতার করার জন্য কিংবা হারানো বস্তু ফেরত দেওয়ার জন্য এ ধরনের পুরস্কার ঘোষণা সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে। যদিও এ জাতীয়

লেনদেন ফিকাহ্ শাস্ত্রে বর্ণিত ইজারার সংজ্ঞানুরূপ নয়, তথাপি এ আয়াতদৃষ্টে তার বৈধতা প্রমাণিত হয়।—(কুরতুবী)

(২) أَنَا بِهِ زَعِيمٌ—দ্বারা বোঝা গেল যে, একজন অন্যজনের পক্ষে আর্থিক অধিকারের যামিন হতে পারে। সাধারণ ফিকাহ্‌বিদদের মতে এ ব্যাপারে বিধান এই যে, প্রাপক আসল দেনাদার কিংবা যামিন এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একজনের কাছ থেকে তার পাওনা আদায় করে নিতে পারে। যদি যামিনের কাছ থেকে আদায় করা হয়, তবে সে দেনা পরিমাণ অর্থ আসল দেনাদারের কাছ থেকে নিয়ে নেবে।—(কুরতুবী)

(৩) كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ—থেকে জানা গেল যে, কোন শরীয়তসম্মত উপযোগিতার ভিত্তিতে যদি লেনদেনের আকারে এমন পরিবর্তন করা হয়, যার ফলে বিধান পরিবর্তিত হয়ে যায়, তবে তা আইনত জায়েয হবে। ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় একে حيلة (হীলা) বলা বলা হয়। এর জন্য শর্ত এই যে, এর ফলে যেন শরীয়তের কোন বিধান বাতিল না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শরীয়তের বিধান বাতিল হয়ে যায়—এরূপ হীলা সর্বসম্মতভাবে হারাম। যেমন যাকাত থেকে গা বাঁচানোর জন্য কোন হীলা করা অথবা রমযানের পূর্বে কোন অনাবশ্যক সফরে বের হয়ে পড়া—যাতে রোযা না রাখার অজুহাত সৃষ্টি হয়। এরূপ করা সর্বসম্মতভাবে হারাম। এ জাতীয় হীলা করার কারণে কোন কোন জাতি আযাবে নিপতিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ হীলা করতে নিষেধ করেছেন। এরূপ হীলার আশ্রয় নিলে কোন অবৈধ কাজ বৈধ হয়ে যায় না বরং পাপের মাত্রা দ্বিগুণ হয়। এক পাপ আসল অবৈধ কাজের এবং দ্বিতীয় পাপ অবৈধ হীলার, যা একদিক দিয়ে আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে প্রতারণার নামান্তর। ইমাম বুখারী كتاب الحيل তথা হীলা অধ্যায়ে এ জাতীয় হীলার অবৈধতা প্রমাণ করেছেন।

قَالُوٓا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُۥ مِن قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ
فِى نَفْسِهِۦ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۖ وَٱللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُوا يَٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥٓ أَبًا شَيْخًا
كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥٓ ۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾ قَالَ
مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَٰعَنَا عِندَهُۥٓ إِنَّآ إِذًا
لَّظَٰلِمُونَ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا ٱسْتَيْـَٔسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ

أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَ
مِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِى يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتّٰى
يَأْذَنَ لِىٓ أَبِىٓ أَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِى ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِينَ ﴿٨٠﴾ ارْجِعُوٓا
إِلٰىٓ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يٰٓأَبَانَآ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا
بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِينَ ﴿٨١﴾ وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِى
كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِىٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصٰدِقُونَ ﴿٨٢﴾

(৭৭) তারা বলতে লাগল ঃ যদি সে চুরি করে থাকে, তবে তার এক ভাইও ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। তখন ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে রাখলেন এবং তাদেরকে জানালেন না। মনে মনে বললেন ঃ তোমরা লোক হিসাবে নিতান্ত মন্দ এবং আল্লাহ্ খুব জ্ঞাত রয়েছেন, যা তোমরা বর্ণনা করছ; (৭৮) তারা বলতে লাগল ঃ হে আযীয, তার পিতা আছেন, যিনি খুবই বৃদ্ধ বয়স্ক। সুতরাং আপনি আমাদের একজনকে তার বদলে রেখে দিন। আমরা আপনাকে অনুগ্রহশীল ব্যক্তিদের একজন দেখতে পাচ্ছি। (৭৯) তিনি বললেন ঃ যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া আর কাউকে গ্রেফতার করা থেকে আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন। তা হলে তো আমরা নিশ্চিতই অন্যায়কারী হয়ে যাব। (৮০) অতঃপর যখন তারা তাঁর কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরামর্শের জন্য একান্তে বসল। তাদের জ্যেষ্ঠ ভাই বলল ঃ তোমরা কি জান না যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বে ইউসুফের ব্যাপারেও তোমরা অন্যায় করেছ? অতএব আমি তো কিছুতেই এদেশ ত্যাগ করব না, যে পর্যন্ত না পিতা আমাকে আদেশ দেন অথবা আল্লাহ্ আমার পক্ষে কোন ব্যবস্থা করে দেন। তিনিই সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক। (৮১) তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বল পিতঃ, আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা তাই বলে দিলাম, যা আমাদের জানা ছিল এবং অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য ছিল না। (৮২) জিজ্ঞেস করুন ঐ জনপদের লোকদেরকে যেখানে আমরা ছিলাম এবং ঐ কাফেলাকে, যাদের সাথে আমরা এসেছি। নিশ্চিতই আমরা সত্য বলছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা বলতে লাগল যে, (জনাব) যদি সে চুরি করে থাকে, তবে (আশ্চর্যের বিষয় নয়; কেননা) তার এক ভাই (ছিল, সে)ও (এমনিভাবে) ইতিপূর্বে চুরি করেছে। 'দুররে মনসূর' গ্রন্থে এ কাহিনী এভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে ঃ ইউসুফ (আ)-এর ফুফু তাঁকে লালন-পালন করতেন।

যখন তিনি জ্ঞান-বুদ্ধির বয়সে পৌঁছেন, তখন ইয়াকুব (আ) তাঁকে নিজের কাছে আনতে চান। ফুফু তাঁকে খুব আদর করতেন। তাই নিজেই রাখতে চাইলেন। সেমতে কোমরে একটি হাঁসুলি কাপড়ের ভেতরে বেঁধে প্রচার করে দিলেন যে, তার হাঁসুলি চুরি হয়েছে। সবার তল্লাশি নেওয়ার পর ইউসুফ (আ)-এর কোমর থেকে তা বের হল। ফলে ইয়াকুবী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ইউসুফ (আ)-কে ফুফুর কাছেই থাকতে হল। ফুফুর মৃত্যুর পর তিনি পিতা ইয়াকুব (আ)-এর কাছে চলে আসেন। সম্ভবত এখানেও ইউসুফ (আ)-এর সম্মতিক্রমেই তাঁকে গোলাম বানানোর প্রহসন করা হয়েছিল। তাই এতে 'আযাদকে গোলাম বানানোর' অভিযোগ আসে না; ইউসুফ (আ)-এর চরিত্র ও বিভিন্ন আলামতদৃষ্টে ভাইয়েরা অবশ্যই জানত যে, ইউসুফ চুরি করেনি—সে পবিত্র; কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে বেনিয়ামিনের প্রতি তাদের যে চরম আক্রোশ ছিল সে কারণে এ কথাও বলে দিল)। অতঃপর ইউসুফ সে কথাটি (যা এখনই উল্লিখিত হবে) আপন মনে গোপন রাখলেন এবং তাদের সামনে (মুখে) প্রকাশ করলেন না (অর্থাৎ মনে মনে) বললেনঃ এ (চুরির) স্তরে তোমরা তো আরও খারাপ (অর্থাৎ আমরা ভ্রাতৃদ্বয় প্রকৃত চুরি করিনি; কিন্তু তোমরা এমন জঘন্য কাজ করেছ যে, টাকা-পয়সার বিনিময়ে মানুষই গায়েব করে দিয়েছ অর্থাৎ আমাকে পিতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছ। বলা বাহুল্য, মানুষ চুরি টাকা-পয়সা চুরির চাইতে জঘন্য অপরাধ)। এবং তোমরা (আমাদের ভ্রাতাদ্বয় সম্পর্কে) যা কিছু বর্ণনা করছ (যে আমরা চোর) এ সম্পর্কে (অর্থাৎ এর স্বরূপ সম্পর্কে) আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম রূপে জ্ঞাত আছেন (যে, আমরা চোর নই। ভাইয়েরা যখন দেখল যে, তিনি বেনিয়ামিনকে গ্রেফতার করে কব্জা করে নিয়েছেন, তখন খোশামোদের ছলে) তারা বলতে লাগলঃ হে আযীয, এর (বেনিয়ামিনের) পিতা রয়েছেন, যিনি খুবই বয়োবৃদ্ধ (তিনি একে অত্যধিক আদর করেন। এর বিরহ-ব্যথায় আল্লাহ্ জানে তাঁর কি অবস্থা হবে। আমাদেরকে এত আদর করেন না)। অতএব আপনি (এমন করুন যে) এর স্থলে আমাদের একজনকে রেখে দিন (এবং গোলাম করে নিন)। আমরা আপনাকে হৃদয়বান দেখতে পাচ্ছি। (আশা করি এ দরখাস্ত মনজুর করবেন।) ইউসুফ (আ) বললেনঃ এমন (অন্যায়) ব্যাপার থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে রক্ষা করুন যে, যার কাছে আমরা মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে রেখে দেব। (যদি আমরা এমন করি, তবে) এমতাবস্থায় আমরা খুবই অন্যায়কারী বিবেচিত হব। (কোন মুক্ত ব্যক্তিকে গোলাম বানানো এবং তার সাথে গোলামের মত ব্যবহার করা তার সম্মতিক্রমেও হারাম)। অতঃপর যখন তারা (তার পরিষ্কার জবাবের কারণে), ইউসুফ (এর কাছ) থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেল, তখন (সেখান থেকে) সরে গিয়ে পরস্পর পরামর্শ করতে লাগল (যে, কি করা যায়? অধিকাংশের মত হল যে, উপায় নেই। সবারই দেশে ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু) তাদের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ, সে বললঃ (তোমরা সবাই ফিরে যাওয়ার যে মত প্রদান করছ, জিজ্ঞেস করি) তোমরা কি জান না যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্র নামে শপথ নিয়েছেন (যে তোমরা তাকে সাথে আনবে। কিন্তু সবাই বিপদগ্রস্ত হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। অতএব আমরা সবাই তো আর বিপদে পরিবেষ্টিত হইনি যে, তদবীরের কোন অবকাশ নেই। তাই যথাসম্ভব তদবীর করা দরকার)। এবং ইতিপূর্বে ইউসুফ সম্পর্কে তোমরা কতটুকু ত্রুটি করেছ। (তার সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে পিতার অধিকার সম্পূর্ণরূপে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সেই পুরানো

লজ্জাই কি কম নাকি যে, নতুন আরেকটি লজ্জা নিয়ে যাব ?) অতএব আমি তো এখান থেকে নড়ব না, যে পর্যন্ত না পিতা আমাকে (উপস্থিতির) অনুমতি দেন কিংবা আল্লাহ্ তা'আলা এর একটা সুরাহা করেন এবং তিনিই সর্বোত্তম সুরাহাকারী। (অর্থাৎ কোন-না-কোন উপায়ে বেনিয়ামিন ছাড়া পাক। মোট কথা আমি হয় তাকে নিয়ে যাব, না হয় তারপর পরে যাব। অতএব আমাকে এখানেই থাকতে দাও এবং) তোমরা পিতার কাছে ফিরে যাও এবং (গিয়ে) বল : আব্বা আপনার ছেলে (বেনিয়ামিন) চুরি করে (তাই গ্রেফতার হয়েছে)। আমরা তো তাই বর্ণনা করি, যা (প্রত্যক্ষভাবে) জেনেছি। এবং আমরা (ওয়াদা-অঙ্গীকার দেওয়ার সময়) অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানী ছিলাম না (যে, চুরি করবে। জ্ঞাত থাকলে কখনও ওয়াদা-অঙ্গীকার দিতাম না)। এবং (যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না করেন, তবে) ঐ জনপদ (অর্থাৎ মিসর) বাসীদের কাছে (কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে) জিজ্ঞেস করে নিন, যেখানে আমরা (তখন) বিদ্যমান ছিলাম (যখন চুরিতে ধরা পড়ে)। এবং ঐ কাফেলার লোকজনকেও জিজ্ঞেস করুন, যাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমরা (এখানে) এসেছি। (এতে বোঝা যায় যে, কেনান অথবা তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার আরও লোক খাদ্যশস্য আনার জন্য গিয়েছিল)। এবং বিশ্বাস করুন, আমরা সম্পূর্ণ সত্য কথা বলছি। (সেমতে জ্যেষ্ঠকে সেখানে রেখে সবাই দেশে ফিরে পিতার কাছে সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছিল যে, মিসরে ইউসুফ (আ)-এর সহোদর ভাই বেনিয়ামিনের রসদপত্রের মধ্যে একটি শাহী পাত্র লুকিয়ে রেখে অতঃপর কৌশলে তা বের করে তাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন ভাইদের সামনে বেনিয়ামিনের আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হল এবং লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট হয়ে গেল, তখন বিরক্ত হয়ে তারা বলতে লাগল :

إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ —অর্থাৎ সে যদি চুরি করে থাকে তাতে আশ্চর্যের কি আছে। তার এক ভাই ছিল। সেও এমনিভাবে ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। উদ্দেশ্য এই যে, সে আমাদের সহোদর ভাই নয়—বৈমাত্রেয় ভাই। তার এক সহোদর ভাই ছিল সে-ও চুরি করেছিল।

ইউসুফ-ভ্রাতারা এখন স্বয়ং ইউসুফ (আ)-এর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল। এতে ইউসুফ (আ)-এর শৈশবকালীন একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এখানে বেনিয়ামিনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উত্থাপনের জন্য যেভাবে চক্রান্ত করা হয়েছে, তেমনি হুবহু তেমনিভাবে ইউসুফ (আ)-এর বিরুদ্ধেও তার অজ্ঞাতে চক্রান্ত করা হয়েছিল। তখন এই ভ্রাতারা ভালোভাবেই জানত যে, উক্ত অভিযোগের ব্যাপারে ইউসুফ (আ) সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু এখানে বেনিয়ামিনের প্রতি আক্রোশের আধিক্যবশত সে ঘটনাটিকে চুরি আখ্যা দিয়ে ইউসুফ (আ)-কেও তাতে অভিযুক্ত করে দিয়েছে।

ঘটনাটি কি ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। ইবনে কাসীর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও মুজাহিদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, ইউসুফ (আ)-এর জন্মের পর কিছুকালের মধ্যেই বেনিয়ামিন জন্মগ্রহণ করে। ফলে এ সন্তান-প্রসবই জননীর মৃত্যুর কারণ হয়। ইউসুফ ও বেনিয়ামিন উভয়েই মাতৃহীন হয়ে পড়লেন। তাদের লালন-পালন ফুফুর কোলে সম্পন্ন হতে লাগল। আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে শিশুকাল থেকেই এমন রূপ-সৌন্দর্য দান করেছিলেন যে, তাকে যে-ই দেখত, সে-ই আদর করতে বাধ্য হত। ফুফুর অবস্থাও ছিল তাই। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও তাকে দৃষ্টি থেকে দূর হতে দিতেন না এবং দিতে পারতেন না। এদিকে পিতা হযরত ইয়াকুব (আ)-এর অবস্থাও এর চাইতে কম ছিল না। কিন্তু কচি শিশু হওয়ার কারণে কোন মহিলার রক্ষণাবেক্ষণে থাকা জরুরী বিধায় তাকে ফুফুর হাতে সমর্পণ করে দেন। শিশু যখন চলাফেরার যোগ্য হয়ে গেল, তখন ইয়াকুব (আ) তাকে নিজের সাথেই রাখতে চাইলেন। ফুফুকে একথা বললে প্রথমে আপত্তি করলেন। অতঃপর অধিক পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে ইউসুফকে পিতার হাতে সমর্পণ করলেন। কিন্তু ফেরত নেওয়ার জন্য গোপন একটি ফন্দি আঁটলেন। ফুফু হযরত ইসহাক (আ)-এর কাছ থেকে একটি হাঁসুলি পেয়েছিলেন। এটিকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করা হত। ফুফু এই হাঁসুলিটিই ইউসুফ (আ)-এর কাপড়ের নিচে কোমরে বেঁধে দিলেন।

ইউসুফ (আ)-এর চলে যাওয়ার পর ফুফু জোরেশোরে প্রচার শুরু করলেন যে, তার হাঁসুলিটি চুরি হয়ে গেছে। অতঃপর তল্লাশি নেওয়ার পর ইউসুফ (আ)-এর কাছ থেকে তা বের হল। ইয়াকুবী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ফুফু ইউসুফকে গোলাম করে রাখার অধিকার পেলেন। ইয়াকুব (আ) যখন দেখলেন যে, আইনত ফুফু ইউসুফের মালিক হয়ে গেছেন, তখন তিনি দ্বিরুক্তি না করে ইউসুফকে তার হাতে সমর্পণ করলেন। এরপর যতদিন ফুফু জীবিত ছিলেন, ইউসুফ (আ) তাঁর কাছেই রইলেন।

এই ছিল ঘটনা, যাতে ইউসুফ (আ) চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপর সবার কাছেই এ সত্য দিবালোকের মত ফুটে উঠেছিল যে, ইউসুফ (আ) চুরির এতটুকু সন্দেহ থেকেও মুক্ত ছিলেন। ফুফুর আদরই তাঁকে ঘিরে এ চক্রান্ত-জাল বিস্তার করেছিল। এ সত্য ভাইদেরও জানা ছিল। এদিক দিয়ে ইউসুফ (আ)-কে কোন চুরির ঘটনার সাথে জড়িত করা তাদের পক্ষে শোভনীয় ছিল না। কিন্তু তাঁর ব্যাপারে তাদের যে বাড়াবাড়ি ও অবৈধাচরণ আজ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, এটা তারই সর্বশেষ অংশ ছিল।

فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ---অর্থাৎ ইউসুফ (আ) ভাইদের কথা শুনে একথা মনে মনেই রাখলেন যে, এরা দেখি এখনও পর্যন্ত আমার পেছনে লেগে রয়েছে। এখনো তারা আমাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করছে। কিন্তু তিনি ভাইদের কাছে এ কথা প্রকাশ হতে দিলেন না যে, তিনি তাদের একথা শুনেছেন এবং তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ---অর্থাৎ ইউসুফ (আ)

মনে মনে বললেন : তোমাদের স্তর ও অবস্থাই মন্দ যে, জেনেশুনে ভাইয়ের প্রতি চুরির দোষারোপ করছ। আরও বললেন : তোমাদের কথা সত্য কি মিথ্যা সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক জানেন। প্রথম বাক্যটি মনে মনে বলেছেন এবং দ্বিতীয় বাক্যটি সম্ভবত জোরেই বলেছেন।

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

ইউসুফ ভ্রাতারা যখন দেখল যে, কোন চেষ্টাই ফলবতী হচ্ছে না এবং বেনিয়ামিনকে এখানে ছেড়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, তখন তারা প্রার্থনা জানাল যে, এর পিতা নিরতিশয় বয়োবৃদ্ধ ও দুর্বল। এর বিচ্ছেদের যাতনা সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই আপনি এর পরিবর্তে আমাদের কাউকে গ্রেফতার করে নিন। আমরা দেখছি, আপনি খুবই অনুগ্রহশীল। এ ভরসায়ই আমরা এ প্রার্থনা জানাচ্ছি। অথবা অর্থ এই যে, আপনি পূর্বেও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ۝

ইউসুফ (আ) ভাইদেরকে আইনানুগ উত্তর দিয়ে বললেন : যাকে ইচ্ছা গ্রেফতার করার ক্ষমতা আমাদের নেই, বরং যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে, তাকে ছাড়া যদি অন্য কাউকে গ্রেফতার করি, তবে আমরা তোমাদেরই ফতোয়া ও ফয়সালা অনুযায়ী জালিম হয়ে যাব। কারণ, তোমরাই বলেছ যে, যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হবে, সে-ই তার শাস্তি পাবে।

فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا —অর্থাৎ ইউসুফ-ভ্রাতারা যখন বেনিয়ামিনের মুক্তির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরস্পর পরামর্শ করার জন্য একটি পৃথক জায়গায় একত্রিত হল।

قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ —তাদের জ্যেষ্ঠ ভাই বলল : তোমাদের কি জানা নেই যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে বেনিয়ামিনকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কঠিন শপথ নিয়েছিলেন? তোমরা ইতিপূর্বেও ইউসুফের ব্যাপারে একটি মারাত্মক অন্যায় করেছ। তাই আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মিসর ত্যাগ করব না, যতক্ষণ পিতা নিজেই আমাকে এখান থেকে

ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ না দেবেন অথবা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে আমার এখান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ না আসে। আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বোত্তম নির্দেশদাতা।

এখানে যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উক্তি বর্ণিত হয়েছে, কেউ কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন ইয়াহুদা। তিনি ছিলেন বয়সে সবার বড়। একদা ইউসুফ (আ)-কে হত্যা না করার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন। কারও মতে তিনি হচ্ছেন শামউন। তিনি প্রভাব-প্রতিপত্তির ও মর্যাদার দিক দিয়ে সবার বড় গণ্য হতেন।

اِرْجِعُوْا اِلٰى اَبِيْكُمْ—অর্থাৎ বড় ভাই বললেন—আমি তো এখানেই থাকব! তোমরা সবাই পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁকে বল যে, আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা যা বলছি তা আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট চাক্ষুষ ঘটনা। আমাদের সামনেই তার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে।

وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِيْنَ—অর্থাৎ আমরা আপনার কাছে ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছিলাম যে, বেনিয়ামিনকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনব। আমাদের এ ওয়াদা ছিল বাহ্যিক অবস্থা বিচারে। অদৃশ্যের অবস্থা আমাদের জানা ছিল না যে, সে চুরি করে গ্রেফতার হবে এবং আমরা নিরুপায় হয়ে পড়ব। এ বাক্যের এ অর্থও হতে পারে যে, আমরা ভাই বেনিয়ামিনের যথাসাধ্য হিফাযত করেছি, যাতে সে কোন অনুচিত কাজ করে বিপদে না পড়ে। কিন্তু আমাদের এ চেষ্টা বাহ্যিক অবস্থা পর্যন্তই সম্ভবপর ছিল। আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ও অজ্ঞাতে সে এমন কাজ করবে, আমাদের জানা ছিল না।

ইউসুফ-ভ্রাতারা ইতিপূর্বে পিতাকে একবার ধোঁকা দিয়েছিল। ফলে তারা জানত যে, এ বর্ণনায় পিতা কিছুতেই আশ্বস্ত হবেন না এবং তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। তাই অধিক জোর দেওয়ার জন্য বলল ঃ আপনি যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না করেন, তবে যে শহরে আমরা ছিলাম (অর্থাৎ মিসরে), তথাকার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন এবং আপনি ঐ কাফেলার লোকজনকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন যারা আমাদের সাথেই মিসর থেকে কেনান এসেছে। আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সত্যবাদী।

এ ক্ষেত্রে তফসীরে-মাযহারীতে এ প্রশ্নটি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইউসুফ (আ) পিতার সাথে এমন নির্দয় ব্যবহার কেন করলেন? নিজের অবস্থা তো পিতাকে জানালেনই না, তদুপরি ছোট ভাইকেও রেখে দিলেন। ভ্রাতারা বারবার মিসরে এসেছে; কিন্তু তিনি তাদের কাছে আত্মপরিচয় প্রকাশ করলেন না এবং পিতার কাছেও সংবাদ পাঠালেন না। এসব প্রশ্নের উত্তরে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ

انه عمل ذلك بامر الله تعالى ليزيد فى بلاء يعقوب—অর্থাৎ ইউসুফ (আ) এসব কাজ আল্লাহ্‌র নির্দেশেই করেছিলেন, ইয়াকুব (আ)-এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করাই ছিল এ সবের উদ্দেশ্য।

বিধান ও মাস'আলা ঃ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا---দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যখন কারও সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তখন তা বাহ্যিক অবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়---অজানা বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। ইউসুফ-ভ্রাতারা পিতার সাথে বেনিয়ামিনের হিফাযত সম্পর্কে যে অঙ্গীকার করেছিল, তা ছিল তাদের আয়ত্তাধীন বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বেনিয়ামিনের চুরির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়াতে অঙ্গীকারে কোন ত্রুটি দেখা দেয়নি।

তফসীরে-কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে আরও একটি মাস'আলা বের করে বলা হয়েছে ঃ এ বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাক্ষ্যদান জানার উপর নির্ভরশীল। ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান যে কোন ভাবে হোক, তদনুযায়ী সাক্ষ্য দেওয়া যায়। তাই কোন ঘটনার সাক্ষ্য যেমন চাক্ষুষ দেখে দেওয়া যায়, তেমনি কোন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে শুনেও দেওয়া যায়। তবে আসল সূত্র গোপন করা যাবে না---বর্ণনা করতে হবে যে, ঘটনাটি সে নিজে দেখেনি---অমুক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে শুনেছে। এ নীতির ভিত্তিতেই মালেকী মাযহাবের ফিকাহ্‌বিদগণ অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্যকেও বৈধ সাব্যস্ত করেছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি সৎ ও সঠিক পথে থাকে, কিন্তু ক্ষেত্র এমন যে, অন্যেরা তাকে অসৎ কিংবা পাপ কাজে লিপ্ত বলে সন্দেহ করতে পারে তবে তার পক্ষে এ সন্দেহের কারণ দূর করা উচিত, যাতে অন্যরা কু-ধারণার গোনাহে লিপ্ত না হয়। ইউসুফ (আ)-এর সাথে কৃত পূর্ববর্তী আচরণের আলোকে বেনিয়ামিনের ঘটনায় ভাইদের সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, এবারও তারা মিথ্যা ও সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাই এ সন্দেহ দূরীকরণের জন্য জনপদ অর্থাৎ মিসরবাসীদের এবং যুগপৎ কাফেলার লোকজনের সাক্ষ্য উপস্থিত করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমেও এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একবার তিনি উম্মুল-মু'মিনীন হযরত সাফিয়্যা (রা)-কে সাথে নিয়ে মসজিদ থেকে এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন। গলির মাথায় দু'জন লোককে দেখে তিনি দূর থেকেই বলে দিলেন ঃ আমার সাথে 'সাফিয়্যা বিনতে হুযাই' রয়েছে। ব্যক্তিদ্বয় আরয করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার সম্পর্কেও কেউ কু-ধারণা করতে পারে কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই কারও মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেওয়া বিচিত্র নয়।---(বুখারী, মুসলিম, কুরতুবী)

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَ

قَالَ يٰٓاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ
۝٨٤ قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ
مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ۝٨٥ قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ
مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٨٦ يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَ
اَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ
اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝٨٧

(৮৩) তিনি বললেন : কিছুই না, তোমার মনগড়া একটি কথা নিয়েই এসেছ। এখন ধৈর্য ধারণই উত্তম। সম্ভবত আল্লাহ্ তাদের সবাইকে একসঙ্গে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। তিনিই সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৮৪) এবং তাদের দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন : হায় আফসোস ইউসুফের জন্য! এবং দুঃখে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল। এবং অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট। (৮৫) তারা বলতে লাগল : আল্লাহ্র কসম! আপনি তো ইউসুফের স্মরণ থেকে নিবৃত্ত হবেন না। যে পর্যন্ত মরণাপন্ন না হয়ে যান কিংবা মৃত্যুবরণ না করেন। (৮৬) তিনি বললেন : আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহ্র সমীপেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তা তোমরা জান না! (৮৭) বৎসগণ! যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর এবং আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্র রহমত থেকে কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ইয়াকুব (আ) (ইউসুফের ব্যাপারে তাদের সবার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তাই পূর্বেকার ঘটনার অনুরূপ মনে করে) বলতে লাগলেন : (বেনিয়ামিন চুরিতে ধৃত হয়নি;) বরং তোমরা মনগড়া একটি বিষয় গড়ে নিয়েছ। অতএব (পূর্বেকার মত) সবরই করব, যাতে অভিযোগের লেশমাত্র থাকবে না। আল্লাহ্র কাছ থেকে (আমার) আশা যে, তিনি তাদের সবাইকে (অর্থাৎ ইউসুফ বেনিয়ামিন ও মিসরে অবস্থানরত বড় ভাই—এই তিনজনকে) আমার কাছে একসঙ্গে পেঁছে দেবেন। কেননা তিনি (বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে) খুবই জ্ঞাত, (তাই তিনি সবারই খবর জানেন যে, তারা কোথায় এবং কি অবস্থায় আছে। তিনি) খুবই প্রজ্ঞাময়। (যখনই মিলিত করতে চাইবেন, তখন হাজারো কারণ ও পন্থা ঠিক করে দেবেন)। এবং (এ উত্তর দিয়ে

তাদের পক্ষ থেকে ব্যথা পাওয়ার কারণে) তাদের দিক থেকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং (এ নতুন ব্যথার ফলে পুরাতন ব্যথা তাজা হয়ে যাওয়ার কারণে ইউসুফকে স্মরণ করে বলতে লাগলেন, হায় ইউসুফ! আফসোস! এবং ব্যথায় কাঁদতে কাঁদতে) তাঁর চোখ দুটি শ্বেত বর্ণ হয়ে গেল। (কেননা অধিক কান্নার ফলে চোখের কৃষ্ণতা হ্রাস পায় এবং চোখ অনুজ্জ্বল অথবা জ্যোতিহীন হয়ে পড়ে) এবং তিনি (মনোবেদনায় ভেতরে ভেতরেই) ক্ষয়িত হচ্ছিলেন (কেননা, তীব্র মনোকষ্টের সাথে তীব্র দমন সংযুক্ত হলে ক্ষয়ের অবস্থা সৃষ্টি হয়; ধৈর্যশীলরা এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হন)। ছেলেরা বলতে লাগল: আল্লাহ্র কসম, (মনে হয়), আপনি সদাসর্বদা ইউসুফের স্মরণেই ব্যাপৃত থাকবেন, এমন কি শুকিয়ে মরণাপন্ন হয়ে যাবেন কিংবা মরেই যাবেন (অতএব এত দুঃখে ফায়দা কি?) ইয়াকুব (আ) বললেন: (আমার কান্নায় তোমাদের অসুবিধা কি?) আমি তো আমার দুঃখ ও ব্যথা একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই প্রকাশ করি (তোমাদেরকে তো কিছু বলি না) এবং আল্লাহ্র ব্যাপার আমি যতটুকু জানি তোমরা জান না। ('আল্লাহ্র ব্যাপার' বলে হয় অনুগ্রহ, কৃপা ও রহমত বোঝানো হয়েছে, না হয় সবার সাথে মিলনের ইলহাম বোঝানো হয়েছে, প্রত্যক্ষভাবে হোক কিংবা ইউসুফের সেই স্বপ্নের মাধ্যমে, যার ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত বাস্তবায়িত হচ্ছিল না কিন্তু অবশ্যম্ভাবী ছিল)। বৎসগণ! (আমি তো শুধু আল্লাহ্র দরবারেই দুঃখ প্রকাশ করি। কারণাদির স্রষ্টা তিনিই। কিন্তু বাহ্যিক তদবীর তোমরাও কর এবং একবার আবার সফরে) যাও (এবং) ইউসুফ ও তার ভাইকে খোঁজ কর (অর্থাৎ এমন পন্থা অন্বেষণ কর, যদ্দ্বারা ইউসুফের সন্ধান মেলে এবং বেনিয়ামিনকে মুক্ত করা যায়) এবং আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্র রহমত থেকে তারাই নিরাশ হয়, যারা কাফির।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইয়াকুব (আ)-এর ছোট ছেলে বেনিয়ামিন মিসরে গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর ভ্রাতারা দেশে ফিরে এল এবং ইয়াকুব (আ)-কে যাবতীয় বৃত্তান্ত শুনাল। তারা তাঁকে আশ্বস্ত করতে চাইল যে, এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ সত্যবাদী। বিশ্বাস না হলে মিসরবাসীদের কাছে কিংবা মিসর থেকে কেনানে আগত কাফেলার লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করা যায়। তারাও বলবে যে, বেনিয়ামিন চুরির কারণে গ্রেফতার হয়েছে। ইউসুফ (আ)-এর ব্যাপারে ছেলেদের মিথ্যা একবার প্রমাণিত হয়েছিল। তাই এবারও ইয়াকুব (আ) বিশ্বাস করতে পারলেন না, যদিও বাস্তবে এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্রও মিথ্যা বলেনি। এ কারণে এ ক্ষেত্রেও তিনি ঐ বাক্যই উচ্চারণ করলেন, যা ইউসুফ (আ)-এর নিখোঁজ হওয়ার সময় উচ্চারণ করেছিলেন। بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ—অর্থাৎ তোমরা যা বলছ সত্য নয়। তোমরা মনগড়া কথা বলছ। কিন্তু আমি এবারও সবর করব। সবরই আমার জন্য উত্তম।

এ থেকেই কুরতুবী বলেন ঃ মুজতাহিদ ইজতিহাদের মাধ্যমে যে কথা বলেন তা ভ্রান্তও হতে পারে। এমনকি, পয়গম্বরও যদি ইজতিহাদ করে কোন কথা বলেন, তবে প্রথম পর্যায়ে তা সঠিক না হওয়াও সম্ভবপর। যেমন, এ ব্যাপারে হয়েছে। ইয়াকুব (আ) ছেলেদের সত্যকেও মিথ্যা মনে করে নিয়েছেন। কিন্তু পয়গম্বরগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে ভ্রান্তি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কাজেই পরিণামে তাঁরা সত্যে উপনীত হন।

এমনও হতে পারে যে, 'মনগড়া কথা' বলে ইয়াকুব (আ) ঐ কথা বুঝিয়েছেন যা মিসরে গড়া হয়েছিল। অর্থাৎ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কৃত্রিম চুরি দেখিয়ে বেনিয়ামিনকে গ্রেফতার করে নেওয়া। অবশ্য ভবিষ্যতে এর পরিণাম চমৎকার আকারে প্রকাশ পেত। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এ দিকে ইঙ্গিতও হতে পারে। বলা হয়েছে ঃ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا—অর্থাৎ আশা করা যায় যে সম্ভবত শীঘ্রই আল্লাহ্ তাদের সবাইকে আমার কাছে পৌঁছে দেবেন।

মোট কথা, ইয়াকুব (আ) এবার ছেলেদের কথা মেনে নেন নি। এই না-মানার তাৎপর্য ছিল এই যে, প্রকৃতপক্ষে কোন চুরিও হয়নি এবং বেনিয়ামিনও গ্রেফতার হয়নি। এটা যথাস্থানে নির্ভুল ছিল। কিন্তু ছেলেরা নিজ জ্ঞানমতে যা বলেছিল, তাও ভ্রান্ত ছিল না।

وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰۤاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ—অর্থাৎ দ্বিতীয়বার আঘাত পাওয়ার পর ইয়াকুব (আ) এ ব্যাপারে ছেলেদের সাথে বাক্যালাপ ত্যাগ করে পালনকর্তার কাছেই ফরিয়াদ করতে লাগলেন এবং বললেন ঃ ইউসুফের জন্য বড়ই পরিতাপ। এ ব্যথায় ক্রন্দন করতে করতে তাঁর চোখ দুটি শ্বেত বর্ণ ধারণ করল। অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি লোপ পেল কিংবা দুর্বল হয়ে গেল। তফসীরবিদ মুকাতিল বলেন ঃ ইয়াকুব (আ)-এর এ অবস্থা ছয় বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময় দৃষ্টিশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছিল। فَهُوَ كَظِيْمٌ—অর্থাৎ অতঃপর তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কারও কাছে নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করতেন না। كَظِيْمٌ শব্দটি كَظْمٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং ভরে যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, দুঃখ ও বিষাদে তাঁর মন ভরে গেল এবং মুখ বন্ধ হয়ে গেল। কারও কাছে তিনি দুঃখের কথা বর্ণনা করতেন না।

এ কারণেই كظم শব্দটি ক্রোধ সংবরণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ মন ক্রোধে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মুখ অথবা হাত দ্বারা ক্রোধের কোন কিছু প্রকাশ না পাওয়া। হাদীসে আছে : ومن يكظم الغيظ يأجره الله —অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্রোধ প্রকাশ করে না, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বড় প্রতিদান দেবেন।

এক হাদীসে আছে, হাশরের দিন আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ লোকদেরকে প্রকাশ্য সমাবেশে এনে বলবেন : জান্নাতের নিয়ামতসমূহের মধ্যে যেটি ইচ্ছা, গ্রহণ কর।

ইমাম ইবনে জরীর এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, বিপদ মুহূর্তে انا لله وانا اليه راجعون বলার শিক্ষা এ উম্মতেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে এ বাক্যটি অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য এভাবে জানা গেছে যে, তীব্র দুঃখ ও আঘাতের সময় ইয়াকুব (আ) এ বাক্যটির পরিবর্তে يا اسفى على يوسف বলেছেন।—বায়হাকী 'শোআবুল-ঈমানে'ও এ হাদীসটি ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন।

ইউসুফের প্রতি ইয়াকুব (আ)-এর গভীর মহব্বতের কারণ : ইউসুফ (আ)-এর প্রতি হযরত ইয়াকুব (আ)-এর অসাধারণ মহব্বত ছিল। ইউসুফ (আ) নিখোঁজ হয়ে গেলে তিনি একেবারেই হতোদ্যম হয়ে পড়েন। কোন কোন রেওয়ায়েতে পিতা-ছেলের বিচ্ছেদের সময়কাল চল্লিশ বছর এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে আশি বছর বলা হয়েছে। দীর্ঘ সময় তিনি ছেলের শোকে কাঁদতে কাঁদতে অতিবাহিত করেন। ফলে তাঁর দৃষ্টি-শক্তি রহিত হয়ে যায়। সন্তানের মহব্বতে এতটা বাড়াবাড়ি বাহ্যত পয়গম্বরসুলভ পদ-মর্যাদার পক্ষে শোভনীয় নয়। কোরআন পাকে সন্তান-সন্ততিকে 'ফিতনা' আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে : انما اموالكم واولادكم فتنة অর্থাৎ তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফিতনা ও পরীক্ষা বৈ নয়। পক্ষান্তরে কোরআন পাকের ভাষায় পয়গম্বরগণের শান হচ্ছে এই : انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار --অর্থাৎ আমি পয়গম্বরগণকে একটি বিশেষ গুণে গুণান্বিত করেছি। সে গুণ হচ্ছে পরকালের স্মরণ। মালেক ইবনে দীনারের মতে এর অর্থ এই যে, আমি তাঁদের অন্তর থেকে সাংসারিক মহব্বত বের করে দিয়েছি এবং শুধু আখিরাতের মহব্বত দ্বারা তাদের অন্তর পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। কোন বস্তু গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আখিরাত।

এ বর্ণনা থেকে এ সন্দেহ আরও কঠিনভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াকুব (আ)-এর সন্তানের মহব্বতে এতটুকু ব্যাকুল হয়ে পড়া কেমন করে শুদ্ধ হতে পারে?

কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র) তফসীরে মাযহারীতে এ প্রশ্ন উল্লেখ করে হযরত মুজাদ্দিদে-আলফেসানীর এক বিশেষ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, নিঃসন্দেহে সংসার ও সংসারের উপকরণাদির প্রতি মহব্বত নিন্দনীয়। কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু সংসারের যেসব বস্তু আখিরাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোর মহব্বত প্রকৃতপক্ষে আখিরাতেরই মহব্বত। ইউসুফ (আ)-এর গুণ-গরিমা শুধু দৈহিক রূপ-সৌন্দর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং পয়গম্বরসুলভ পবিত্রতা ও চারিত্রিক সৌন্দর্যও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সমষ্টির কারণে তাঁর মহব্বত সংসারের মহব্বত ছিল না বরং প্রকৃতপক্ষে আখিরাতের মহব্বত ছিল।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, এ মহব্বত যদিও প্রকৃতপক্ষে সংসারের মহব্বত ছিল না, কিন্তু সর্বাবস্থায় এতে একটি সাংসারিক দিকও ছিল। এ জন্যই এটা হযরত ইয়াকুব (আ)-এর পরীক্ষার কারণ হয়েছে এবং তাঁকে চল্লিশ বছরের সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের অসহনীয় যাতনা ভোগ করতে হয়েছে। এই ঘটনার আদ্যোপান্ত এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন সব পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে, যাতে ইয়াকুব (আ)-এর যাতনা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে গেছে। নতুবা ঘটনার শুরুতে এত গভীর মহব্বত পোষণকারী পিতার পক্ষে পুত্রদের কথা শুনে নিশ্চুপ ঘরে বসে থাকা কিছুতেই সম্ভবপর হত না, বরং তিনি অবশ্যই অকুস্থলে পৌঁছে খোঁজ-খবর নিতেন। ফলে তখনই যাতনার পরিসমাপ্তি ঘটতে পারত। কিন্তু আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, তখন এদিকে দৃষ্টি যায়নি। এরপর ইউসুফ (আ)-কে পিতার সাথে যোগাযোগ করতে ওহীর মাধ্যমে নিষেধ করা হল। ফলে মিসরের শাসন-ক্ষমতা হাতে পেয়েও তিনি যোগাযোগের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। এর চাইতে বেশী ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দেওয়ার মত ঘটনাবলী তখন ঘটেছে, যখন ইউসুফ-ভ্রাতারা বার বার মিসর গমন করতে থাকে। তিনি তখনও ভাইদের কাছে গোপন রহস্য খোলেন নি এবং পিতাকে সংবাদ দেওয়ার চেষ্টা করেন নি, বরং একটি কৌশলের মাধ্যমে অপর ভাইকে নিজের কাছে আটকে রেখে পিতার মর্মবেদনাকে দ্বিগুণ করে দেন। এসব কর্মকাণ্ড ইউসুফ (আ)-এর মত একজন মনোনীত পয়গম্বর দ্বারা ততক্ষণ সম্ভবপর নয়, যতক্ষণ না তাঁকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হয়। এ কারণেই কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ ইউসুফ (আ)-এর এসব কর্মকাণ্ডকে আল্লাহ্র ওহীর ফলশ্রুতি সাব্যস্ত করেছেন। কোরআনের كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ বাক্যেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। واللّٰه أعلم

تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ—অর্থাৎ ছেলেরা পিতার এহেন মনোবেদনা সত্ত্বেও এমন অভিযোগহীন সবর দেখে বলতে লাগল : আল্লাহ্র কসম, আপনি তো সদা-সর্বদা ইউসুফকেই স্মরণ করতে থাকেন। ফলে হয় আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন, না হয়

সূচী-পত্র

মরেই যাবেন। (প্রত্যেক আঘাত ও দুঃখের একটা সীমা আছে। সাধারণত সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষ দুঃখ-বেদনা ভুলে যায়। কিন্তু আপনি এত দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও প্রথম দিনের মতই রয়েছেন এবং আপনার দুঃখ তেমনি সতেজ রয়েছে।)

ইয়াকুব (আ) ছেলেদের কথা শুনে বললেনঃ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي

إِلَى اللَّهِ—অর্থাৎ আমি আমার ফরিয়াদ ও দুঃখ-কষ্টের বর্ণনা তোমাদের অথবা অন্য কারও কাছে করি না বরং আল্লাহ্‌র কাছে করি। কাজেই আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। সাথে সাথে এ কথাও প্রকাশ করলেন যে, আমার স্মরণ করা বৃথা যাবে না। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জান না। অর্থাৎ আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমাকে সবার সাথে মিলিত করবেন।

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ—অর্থাৎ বৎসরা, যাও। ইউসুফ ও তার ভাইকে খোঁজ কর এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা, কাফির ছাড়া কেউ তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।

ইয়াকুব (আ) এতদিন পর ছেলেদেরকে আদেশ দিলেন যে, যাও। ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ কর এবং তাদেরকে পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না। ইতিপূর্বে কখনও তিনি এমন আদেশ দেন নি। এটা তকদীরেরই ব্যাপার। ইতিপূর্বে তাদেরকে পাওয়া তকদীরে ছিল না। তাই এরূপ কোন কাজও করা হয়নি। এখন মিলনের মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এর উপযুক্ত তদবীরও মনে জাগিয়ে দিলেন।

উভয়কে খোঁজ করার স্থান মিসরই সাব্যস্ত করা হল। এটা বেনিয়ামিনের বেলায় নির্দিষ্টই ছিল কিন্তু ইউসুফ (আ)-কে মিসরে খোঁজ করার বাহ্যত কোন কারণ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন এর উপযুক্ত কারণাদিও উপস্থিত করে দেন। তাই এবার ইয়াকুব (আ) সবাইকে খোঁজ করার জন্য ছেলেদেরকে আবার মিসর যেতে নির্দেশ দিলেন। কেউ কেউ বলেনঃ আযীযে-মিসর কর্তৃক ছেলেদের রসদপত্রের মধ্যে পণ্য ফেরত দেওয়ার ঘটনা থেকে ইয়াকুব (আ) প্রথম বার আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, এই আযীযে-মিসর খুবই ভদ্র ও দয়ালু ব্যক্তি। বিচিত্র নয় যে, সে-ই তাঁর হারানো ইউসুফ।

নির্দেশ ও মাস'আলা ঃ ইমাম কুরতুবী বলেনঃ ইয়াকুব (আ)-এর ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জান, মাল ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে কোন বিপদ ও কষ্ট দেখা দিলে প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হচ্ছে সবর ও আল্লাহ্‌র ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমে এর প্রতিকার করা এবং ইয়াকুব (আ) ও অন্যান্য পয়গম্বরের অনুসরণ করা।

হাসান বসরী (রহ) বলেন ঃ মানুষ যত ঢোক গিলে, তন্মধ্যে দু'টি ঢোকই আল্লাহ্র কাছে অধিক প্রিয়। এক. বিপদে সবর ও দুই. ক্রোধ সংবরণ।

হাদীসে আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, من بث لم يصبر অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় বিপদ সবার কাছে বর্ণনা করে, সে সবর করেনি।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াকুব (আ)-কে সবরের কারণে শহীদদের সওয়াব দান করেছেন। এ উম্মতের মধ্যেও যে ব্যক্তি বিপদে সবর করবে, তাকে এমনি প্রতিদান দেওয়া হবে।

ইমাম কুরতুবী ইয়াকুব (আ)-এর এই অগ্নি পরীক্ষার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ একদিন ইয়াকুব (আ) তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন। আর তাঁর সামনে ঘুমিয়ে ছিলেন ইউসুফ (আ)। হঠাৎ ইউসুফ (আ)-এর নাক ডাকার শব্দ শুনে তাঁর মনোযোগ সেদিকে নিবদ্ধ হয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও এমনি হল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বললেন ঃ দেখ, আমার দোস্ত ও মকবুল বান্দা আমাকে সম্বোধন করার মাঝখানে অন্যের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। আমার ইয্যত ও প্রতাপের কসম, আমি তার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করে দেব, যদ্দ্বারা সে অন্যের দিকে তাকায় এবং যার দিকে মনোযোগ দিয়েছে, তাকে দীর্ঘকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেব। কোন কোন রেওয়ায়েতেও এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

তাই বুখারীর হাদীসে হযরত আয়েশা (রা)-র রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ নামাযে অন্য দিকে তাকানো কেমন? তিনি বললেন ঃ এর মাধ্যমে শয়তান বান্দার নামায ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي ۖ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴿٩١﴾ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ

لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾

(৮৮) অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল তখন বলল : হে আযীয, আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি এবং আমরা অপর্যাপ্ত পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি আমাদেরকে পুরাপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহ্ দাতাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (৮৯) ইউসুফ বললেন : তোমাদের জানা আছে কি, যা তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে করেছ, যখন তোমরা অপরিণামদর্শী ছিলে? (৯০) তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ! বললেন : আমিই ইউসুফ এবং এ হল আমার সহোদর ভাই। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয়, যে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, আল্লাহ্ এহেন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। (৯১) তারা বলল : আল্লাহ্র কসম, আমাদের চাইতে আল্লাহ্ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম। (৯২) বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবানের চাইতে অধিক মেহেরবান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর [ইয়াকুব (আ)-এর فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ নির্দেশ মোতাবেক তারা মিসর রওয়ানা হল। কেননা, বেনিয়ামিনকে মিসরেই রেখে এসেছিল। তারা হয়ত মনে করে থাকবে যে, যার ঠিকানা জানা আছে, প্রথমে তাকেই বাদশাহ্র কাছে চেয়ে আনার চেষ্টা করা দরকার। এরপর ইউসুফের ঠিকানা তালাশ করা যাবে। মোট কথা, মিসরে পৌঁছে] যখন ইউসুফ (আ)-এর কাছে (যাকে তারা আযীয মনে করত) পৌঁছল, (এবং খাদ্য-শস্যেরও প্রয়োজন ছিল। তাই মনে করল যে, খাদ্যশস্যের বাহানায় আযীযের কাছে পৌঁছব এবং খরিদ প্রসঙ্গে খোশামোদের কথাবার্তা বলব। যখন মন নরম ও প্রফুল্ল দেখব, তখন বেনিয়ামিনের মুক্তির দরখাস্ত করব। তাই প্রথমে খাদ্যশস্য নেওয়ার ব্যাপারে কথাবার্তা শুরু করল এবং) বলতে লাগল : হে আযীয! আমরা এবং আমাদের পরিবারের সবাই (দুর্ভিক্ষের কারণে) খুবই কষ্টে আছি। (আমরা এমনভাবে দারিদ্র্যে বেষ্টিত আছি যে, খাদ্যশস্য ক্রয় করার জন্য প্রয়োজনীয় মুদ্রাও যোগাড় করা সম্ভব হয়নি)। আমরা কিছু অকেজো বস্তু নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি (এ ত্রুটি উপেক্ষা করে) খাদ্যশস্যের পুরাপুরি বরাদ্দ দিয়ে দিন (এবং এ ত্রুটির কারণে খাদ্যশস্যের পরিমাণ হ্রাস করবেন না) এবং (আমাদের কোন অধিকার নেই) আমাদেরকে খয়রাত (মনে করে) দিয়ে দিন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা খয়রাত দাতাদেরকে (সত্যিকার খয়রাত দিক বা সুযোগ-সুবিধা দান করুক, এটাও খয়রাতেরই মত) উত্তম প্রতিদান দেন (মু'মিন হলে আখিরাতেও, নতুবা শুধু দুনিয়াতেই)। ইউসুফ (তাদের কাতরোক্তি শুনে স্থির থাকতে পারলেন না এবং নিজেকে প্রকাশ করে দিতে চাইলেন। এটাও আশ্চর্য নয় যে, তিনি অন্তরের নূর দ্বারা জেনে নিয়েছিলেন যে, এবার তারা তালাশ

করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছে এবং তাঁর কাছে এটাও হয় তো প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল যে, বিচ্ছেদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। অতঃপর পরিচয়ের ভূমিকা হিসেবে) বললেন ঃ (বল,) তোমাদের স্মরণ আছে কি, যা তোমরা ইউসুফ ও তাঁর ভাইয়ের সাথে (ব্যবহার) করেছিলে, যখন তোমাদের মূর্খতার দিন ছিল ? [এবং ভালমন্দের বিচার ছিল না। এ কথা শুনে প্রথমে তারা স্তম্ভিত হয়ে গেল যে, ইউসুফের ঘটনার সাথে আযীযে-মিসরের কি সম্পর্ক ? ইউসুফ (আ) বাল্যকালে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং যে জন্য তারা তাঁর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে-ছিল তদ্দ্বারা প্রবল সম্ভাবনা ছিলই যে, ইউসুফ সম্ভবত খুব উচ্চ মর্তবায় পৌঁছবে। ফলে তাঁর সামনে আমাদেরকে মস্তক নত করতে হবে। এ কারণে এ কথা শুনে তাদের মনে সন্দেহ দেখা দিল এবং চিন্তা করে কিছু কিছু চিনল। আরও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে] তারা বলতে লাগল ঃ সত্যি সত্যি তুমিই কি ইউসুফ ? তিনি বললেন ঃ (হ্যাঁ) আমিই ইউসুফ, আর এ হল (বেনিয়ামিন) আমার সহোদর ভাই। (এ কথা জুড়ে দেওয়ার কারণ নিজের পরিচয়কে জোরদার করা কিংবা এটা তাদের মিশনের সাফল্যের সুসংবাদ যে, তোমরা যাদেরকে তালাশ করতে বেরিয়েছ, আমরা উভয়েই এক জায়গায় একত্র রয়েছি)। আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন (যে, আমাদের উভয়কে প্রথমে সবর ও তাকওয়ার তওফিক দিয়েছেন। এরপর এর বরকতে আমাদের কষ্টকে সুখে, বিচ্ছেদকে মিলনে এবং অর্থ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির স্বল্পতাকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন।) বাস্তবিকই যে গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে এবং (বিপদাপদে) সবর করে, আল্লাহ্ তা'আলা এহেন সৎকর্মীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। তারা (সব অতীত কাহিনী স্মরণ করে অনুতপ্ত হল এবং ক্ষমা প্রার্থনার সুরে) বলতে লাগল ঃ আল্লাহ্র কসম, নিশ্চয় তিনি তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন (এবং তুমি এরই যোগ্য ছিলে) এবং (আমরা যা কিছু করেছি) নিশ্চয় আমরা (তাতে) দোষী ছিলাম (আল্লাহ্র ওয়াস্তে মাফ করে দাও)। ইউসুফ (আ) বললেন ঃ না, তোমাদের বিরুদ্ধে আজ (আমার পক্ষ থেকে) কোন অভিযোগ নেই। (নিশ্চিন্ত থাক। আমার মন পরিষ্কার হয়ে গেছে)। আল্লাহ্ ত'আলা তোমাদের দোষ ক্ষমা করুন এবং তিনি সব মেহেরবানের চাইতে অধিক মেহেরবান। [তিনি তওবাকারীর দোষ ক্ষমাই করেন। এ দোয়া থেকে আরও জানা গেল যে, ইউসুফ (আ)-ও তাদেরকে ক্ষমা করেছেন]।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইউসুফ (আ) ও তাঁর ভাইদের অবশিষ্ট কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাদের পিতা ইয়াকুব (আ) তাদেরকে আদেশ করেন যে যাও ইউসুফ ও তাঁর ভাইকে তালাশ কর। এ আদেশ পেয়ে তারা তৃতীয়বার মিসর সফরে রওয়ানা হয়। কেননা বেনিয়ামিন যে সেখানে আছে, তা জানাই ছিল। তাই তার মুক্তির জন্য প্রথমে চেষ্টা করা দরকার ছিল। ইউসুফ (আ) মিসরে রয়েছেন বলে যদিও জানা ছিল না কিন্তু যখন কোন কাজের সময় এসে যায়, তখন মানুষের চেষ্টা-চরিত্র অজান্তেও সঠিক পথেই এগুতে থাকে। এক হাদীসে রয়েছে,যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন তার কারণাদি আপনা-আপনি উপস্থিত করে দেন। তাই ইউসুফকে তালাশ করার জন্যও অজান্তে মিসর সফরই উপযুক্ত ছিল। এছাড়া খাদ্যশস্যেরও প্রয়োজন ছিল। এটাও এক কারণ ছিল যে, খাদ্যশস্য চাওয়ার

বাহানায় আযীযে-মিসরের সাথে সাক্ষাত হবে এবং তাঁর কাছে বেনিয়ামিনের মুক্তির ব্যাপারে আবেদন করা যাবে।

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا الاية—অর্থাৎ ইউসুফ-ভ্রাতারা যখন পিতার নির্দেশ মোতাবেক মিসরে পৌঁছল এবং আযীযে-মিসরের সাথে সাক্ষাত করল, তখন নিতান্ত কাতরভাবে কথাবার্তা শুরু করল। নিজেদের দরিদ্রতা ও নিঃস্বতা প্রকাশ করে বলতে লাগল ঃ হে আযীয! দুর্ভিক্ষের কারণে আমরা পরিবারবর্গ নিয়ে খুবই কষ্টে আছি। এমন কি, এখন খাদ্যশস্য কেনার জন্য আমাদের কাছে উপযুক্ত মূল্যও নেই। আমরা অপারক হয়ে কিছু অকেজো-বস্তু খাদ্যশস্য কেনার জন্য নিয়ে এসেছি। আপনি নিজ চরিত্রগুণে এসব অকেজো বস্তু কবুল করে নিন এবং পরিবর্তে আমাদেরকে পুরাপুরি খাদ্যশস্য দিয়ে দিন, যা উত্তম মূল্যের বিনিময়ে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, আমাদের কোন অধিকার নেই। আপনি খয়রাত মনে করেই দিয়ে দিন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা খয়রাতদাতাকে উত্তম পুরস্কার দান করেন।

অকেজো বস্তুগুলো কি ছিল, কোরআন ও হাদীসে তার কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন ঃ এগুলো ছিল কৃত্রিম রৌপ্য মুদ্রা, যা বাজারে অচল ছিল। কেউ বলেন ঃ কিছু ঘরে ব্যবহারযোগ্য আসবাবপত্র ছিল। এ হচ্ছে ঃ مُزْجَاة শব্দের অনুবাদ। এর আসল অর্থ এমন বস্তু যা নিজে সচল নয় বরং জোরজবরদস্তি সচল করতে হয়।

ইউসুফ (আ) ভাইদের এহেন মিসকীনসুলভ কথাবার্তা শুনে এবং দুরবস্থা দেখে স্বভাবগতভাবে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হচ্ছিলেন। ঘটনা প্রবাহে অনুমিত হয় যে, ইউসুফ (আ)-এর উপর স্বীয় অবস্থা প্রকাশের ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে বিধি-নিষেধ ছিল, এখন তা অবসানের সময়ও এসে গিয়েছিল। তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এসময় হযরত ইয়াকুব (আ) আযীযে-মিসরের নামে একটি পত্র লিখে দিয়েছিলেন। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল এরূপ ঃ

ইয়াকুব সফিউল্লাহ্ ইবনে ইসহাক যবিহুল্লাহ্ ইবনে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্র পক্ষ থেকে আযীযে-মিসর সমীপে।
বিনীত আরয!

বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যেরই অঙ্গবিশেষ। নমরূদের আগুনের দ্বারা আমার পিতামহ ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্র পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। অতঃপর আমার পিতা ইসহাকেরও কঠোর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এরপর আমার সর্বাধিক প্রিয় এক পুত্রের মাধ্যমে আমার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। তার বিরহ-ব্যথায় আমার দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গেছে। তারপর তার ছোট ভাই ছিল ব্যথিতের সান্ত্বনার একমাত্র সম্বল যাকে আপনি চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করেছেন। আমি বলি, আমরা পয়গম্বরদের সন্তান-সন্ততি। আমরা কখনও চুরি করিনি এবং আমাদের সন্তানদের মধ্যেও কেউ চোর হয়ে জন্ম নেয়নি। ওয়াস্‌সালাম।

পত্র পাঠ করে ইউসুফ (আ) কেঁপে উঠলেন এবং কান্না রোধ করতে পারলেন না। এরপর নিজের গোপন ভেদ প্রকাশ করে দিলেন। পরিচয়ের ভূমিকা হিসেবে ভাইদেরকে প্রশ্ন করলেন : তোমাদের স্মরণ আছে কি, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি ব্যবহার করেছিলে, যখন তোমাদের মূর্খতার দিন ছিল এবং যখন তোমরা ভাল-মন্দের বিচার করতে পারতে না ?

এ প্রশ্ন শুনে ইউসুফ-ভ্রাতাদের মাথা ঘুরে গেল যে, ইউসুফের কাহিনীর সাথে আযীযে-মিসরের কি সম্পর্ক! অতঃপর তারা একথাও চিন্তা করল যে, শৈশবে ইউসুফ একটি স্বপ্ন দেখে-ছিল, যার ব্যাখ্যা ছিল এই যে, কালে ইউসুফ কোন উচ্চ মর্তবায় পৌঁছবে এবং তার সামনে আমাদের সবাইকে মাথা নত করতে হবে। অতএব এ আযীযে-মিসরই স্বয়ং ইউসুফ নয় তো! এরপর আরও চিন্তা-ভাবনার পর কিছু কিছু আলামত দ্বারা চিনে ফেলল এবং আরও তথ্য জানার জন্য বলল :

أَئِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ● সত্যি সত্যিই কি তুমি ইউসুফ? ইউসুফ (আ) বললেন : হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ এবং এ হচ্ছে আমার সহোদর ভাই। ভাইয়ের প্রসঙ্গ জুড়ে দেওয়ার কারণ, যাতে তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস হয়। আরও কারণ এই যে, যাতে তাদের লক্ষ্য অর্জনে পুরোপুরি সাফল্যের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যে দু'জনের খোঁজে তারা বের হয়েছিল তারা উভয়েই এক জায়গায় বিদ্যমান রয়েছে। এরপর ইউসুফ (আ) বললেন :

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ط إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা করেছেন। প্রথমে আমাদের উভয়কে সবর ও তাকওয়ার দু'টি গুণ দান করেছেন। এগুলো সাফল্যের চাবিকাঠি এবং প্রত্যেক বিপদাপদের রক্ষা কবচ। এরপর আমাদের কষ্টকে সুখে, বিচ্ছেদকে মিলনে এবং অর্থ-সম্পদের স্বল্পতাকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করেছেন। নিশ্চয় যারা পাপকাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং বিপদাপদে সবর করে, আল্লাহ্ এহেন সৎকর্মীদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

এখন নিজেদের অপরাধ স্বীকার ও ইউসুফ (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়া ছাড়া ইউসুফ ভ্রাতাদের উপায় ছিল না। সবাই একযোগে বলল : تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ আল্লাহ্‌র কসম, তিনি তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তুমি এরই যোগ্য ছিলে। আমরা নিজেদের কৃতকর্মে দোষী ছিলাম। আল্লাহ্ মাফ করুন। উত্তরে ইউসুফ (আ) পয়গম্বরসুলভ গাম্ভীর্যের সাথে বললেন :

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ---অর্থাৎ তোমাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া তো দূরের কথা, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগও নেই। এ হচ্ছে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমার সুসংবাদ। অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন :

يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অন্যায় ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবানের চাইতে অধিক মেহেরবান।

অতঃপর বললেন :

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ —অর্থাৎ আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং আমার পিতার চেহারার উপর রেখে দাও, এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। ফলে এখানে আসতেও সক্ষম হবেন। পরিবারের অন্য সবাইকেও আমার কাছে নিয়ে এস যাতে সবাই দেখা-সাক্ষাত করে আনন্দিত হতে পারি, আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত দ্বারা উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হতে পারি।

বিধান ও নির্দেশ : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে অনেক বিধান এবং মানবজীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জানা যায়।

تَصَدَّقْ عَلَيْنَا- বাক্যে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ইউসুফ-ভ্রাতারা পয়গম্বরগণের আওলাদ। তাদের জন্য সদকা-খয়রাত কেমন করে হালাল ছিল? এছাড়া সদকা হালাল হলেও চাওয়া কিভাবে বৈধ ছিল? ইউসুফ-ভ্রাতারা পয়গম্বর না হলেও ইউসুফ (আ) তো পয়গম্বর ছিলেন। তিনি এ ভ্রান্তির কারণে তাঁদেরকে হুঁশিয়ার করলেন না কেন?

এর একটি পরিষ্কার উত্তর এই যে, এখানে 'সদকা' শব্দ বলে সত্যিকার সদকা বুঝানো হয়নি বরং কারবারে সুযোগ-সুবিধা দেওয়াকেই 'সদকা' 'খয়রাত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, তারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে খাদ্যশস্যের সওয়াল করেনি বরং কিছু অকেজো বস্তু পেশ করেছিল। অনুরোধের সারমর্ম ছিল এই যে, এসব স্বল্প মূল্যের বস্তু রেয়াত করে গ্রহণ করুন। এ উত্তরও সম্ভবপর যে, পয়গম্বরগণের আওলাদের জন্য সদকা-খয়রাতের অবৈধতা শুধু উম্মতে মুহাম্মদীর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। তফসীরবিদগণের মধ্যে মুজাহিদের উক্তি তাই।---(বয়ানুল কোরআন)

إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ---দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সদকা-খয়রাতদাতাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এই যে, সদকা-খয়রাতের এক প্রতিদান হচ্ছে ব্যাপক, যা মু'মিন ও কাফির নির্বিশেষে সবাই দুনিয়াতেই পায়

এবং তা হচ্ছে বিপদাপদ দূর হওয়া। অপর একটি প্রতিদান শুধু পরকালেই পাওয়া যাবে, অর্থাৎ জান্নাত। এটা শুধু ঈমানদারদের প্রাপ্য। এখানে আযীযে মিসরকে সম্বোধন করা হয়েছে। ইউসুফ-ভ্রাতারা তখনও পর্যন্ত জানত না যে, তিনি ঈমানদার, না কাফির। তাই তারা এমন ব্যাপক বাক্য বলেছে, যাতে ইহকাল ও পরকাল উভয়কালই বোঝা যায়। ---(বয়ানুল কোরআন)

এ ছাড়া এখানে বাহ্যত আযীযে-মিসরকে সম্বোধন করে বলা উচিত ছিল যে, 'আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দেবেন।' কিন্তু তারা জানত না যে, আযীযে মিসর ঈমানদার। তাই সদকাদাতা মাত্রকেই আল্লাহ্ প্রতিদান দিয়ে থাকেন, এরূপ ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, বিশেষভাবে তিনিই প্রতিদান পাবেন এমন বলা হয়নি। —(কুরতুবী)

قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا—দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যখন কোন বিপদ ও কষ্টে পতিত হয়, এরপর আল্লাহ্ যখন তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন, তখন তার উচিত অতীত বিপদ ও কষ্টের কথা উল্লেখ না করে উপস্থিত নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা। বিপদ মুক্তি ও আল্লাহ্র নিয়ামত লাভ করার পরও অতীত দুঃখ-কষ্টের কথা স্মরণ করে হাহুতাশ করা অকৃতজ্ঞতা। কোরআন পাকে এ ধরনের অকৃতজ্ঞকে বলা হয়েছে (كَنُوْد) (اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ) كَنُوْد ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে অনুগ্রহ স্মরণ না করে—শুধু কষ্ট ও বিপদাপদের কথাই স্মরণ করে।

এ কারণেই ইউসুফ (আ) ভাইদের ষড়যন্ত্রে দীর্ঘকাল ধরে যেসব বিপদাপদ ভোগ করেছিলেন, এ সময় সেগুলোর কথা মোটেই উল্লেখ করেন নি বরং আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহরাজির কথাই উল্লেখ করেছেন।

সবর ও তাকওয়া সমস্ত বিপদের প্রতিকার : اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ শীর্ষক আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, তাকওয়া অর্থাৎ গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা এবং বিপদে সবর ও দৃঢ়তা অবলম্বন এ দুটি গুণ মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেয়। কোরআন পাক অনেক জায়গায় এ দুটি গুণের উপরই মানুষের সাফল্য ও কামিয়াবী নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে : اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

অর্থাৎ তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন কর তবে শত্রুদের শত্রুতামূলক কলা-কৌশল তোমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন করতে পারবে না।

এখানে বাহ্যত বোঝা যায় যে, ইউসুফ (আ) দাবী করেছেন যে, তিনি মুত্তাকী ও সবরকারী, তাঁর তাকওয়া ও সবরের কারণে বিপদাপদ দূর হয়েছে এবং উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়েছে। অথচ কোরআন পাকে এরূপ দাবী করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। فَلَا تُزَكُّوْا

اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى অর্থাৎ "নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করো না ; আল্লাহ্ তা'আলাই বেশী জানেন কে মুত্তাকী।" কিন্তু এখানে প্রকৃতপক্ষে দাবী করা হয়নি বরং আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহরাজি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি প্রথমে সবর ও তাকওয়া দান করেছেন, অতঃপর এর মাধ্যমে সব নিয়ামত দিয়েছেন।

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ — অর্থাৎ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। এটা চরিত্রের উচ্চতম স্তর যে, অত্যাচারীকে শুধু ক্ষমাই করেন নি বরং একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এখন তোমাদেরকে তিরস্কারও করা হবে না।

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ
وَاْتُوْنِىْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ
اِنِّىْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ﴿٩٤﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ
لَفِىْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾ فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ
فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا
تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ ﴿٩٧﴾ قَالَ
سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٩٨﴾ فَلَمَّا دَخَلُوْا
عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ
اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾ وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ
وَقَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَاىَ مِنْ قَبْلُ ۫ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّىْ
حَقًّا ؕ وَقَدْ اَحْسَنَ بِىْٓ اِذْ اَخْرَجَنِىْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ
الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اِخْوَتِىْ ؕ اِنَّ رَبِّىْ
لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿١٠٠﴾

(৯৩) তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও। এটি আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখে দিও, এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। আর তোমাদের পরিবারবর্গের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এস। (৯৪) যখন কাফেলা রওয়ানা হল, তখন তাদের পিতা বললেনঃ যদি তোমরা আমাকে অপ্রকৃতিস্থ না বল, তবে বলিঃ আমি নিশ্চিতরূপেই ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। (৯৫) লোকেরা বললঃ আল্লাহ্র কসম, আপনি তো সেই পুরানো ভ্রান্তিতেই পড়ে আছেন। (৯৬) অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা পৌঁছল, সে জামাটি তাঁর মুখে রাখল। অমনি তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা জানি তোমরা তা জান না? (৯৭) তারা বললঃ পিতঃ, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করান। নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম। (৯৮) বললেন, সত্বরই আমি পালনকর্তার কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৯৯) অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল, তখন ইউসুফ পিতা-মাতাকে নিজের কাছে জায়গা দিলেন এবং বললেনঃ আল্লাহ্ চাহেন তো শান্ত চিত্তে মিসরে প্রবেশ করুন (১০০) এবং তিনি পিতামাতাকে সিংহাসনের উপর বসালেন এবং তারা সবাই তাঁর সামনে সিজদাবনত হল। তিনি বললেনঃ পিতঃ, এ হচ্ছে আমার ইতিপূর্বে-কার স্বপ্নের বর্ণনা। আমার পালনকর্তা একে সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দেওয়ার পর। আমার পালনকর্তা যা চান, কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এখন তোমরা (গিয়ে পিতাকে সুসংবাদ দাও এবং সুসংবাদের সাথে সাথে) আমার এ জামাটি (ও) নিয়ে যাও এবং এটি পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখে দাও। এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে (এবং এখানে চলে আসবেন) এবং (অন্যান্য) সব পরিবারবর্গকে (-ও) আমার কাছে নিয়ে এস (যাতে সবাই সাক্ষাত করে আনন্দিত হতে পারি। কেননা, বর্তমান অবস্থায় আমার যাওয়া কঠিন। তাই পরিবারবর্গই চলে আসুক) এবং যখন [ইউসুফ (আ)-এর সাথে কথাবার্তা হয়ে গেল এবং তাঁর কথামত জামা নিয়ে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করল এবং] কাফেলা (মিসর থেকে) রওয়ানা হল (যার মধ্যে তারাও ছিল) তখন তাদের পিতা কাছের লোকদেরকে বলতে শুরু করলেনঃ 'তোমরা যদি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে প্রলাপ করছি' মনে না কর, তবে আমি একটি কথা বলব যে, আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। (মু'জিযা ইচ্ছাধীন হয় না। তাই ইতিপূর্বে তা বোঝা যায়নি। নিকটের) লোকেরা বলতে লাগলঃ আল্লাহ্র কসম আপনি তো পুরানো ভ্রান্তিতেই পড়ে রয়েছেন [যে, ইউসুফ জীবিত আছে এবং তাকে ফিরে পাবেন। এ ধারণার প্রাবল্যেই এখন গন্ধ অনুভূত হচ্ছে। নতুবা বাস্তবে গন্ধ বা কোন কিছুই না। ইয়াকুব (আ) চুপ হয়ে গেলেন]। অতঃপর যখন (ইউসুফের সহি-সালামত হওয়ার) সুসংবাদবাহীরা (জামা সহ এখানে) এসে পৌঁছল, তখন

সূচী-পত্র

(এসেই) সে জামাটি তাঁর মুখের উপর রেখে দিল। অতঃপর (চোখে লাগাতেই মস্তিষ্কে সুগন্ধি পৌঁছে গেল এবং) তৎক্ষণাৎ তাঁর চক্ষু খুলে গেল। (এবং তারা সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁর কাছে বর্ণনা করল)। তিনি (ছেলেদেরকে) বললেনঃ (কেমন), আমি কি বলিনি যে, আল্লাহ্‌র ব্যাপারাদি আমি যতটুকু জানি, তোমরা জান না ? (এ জন্যই আমি তোমাদেরকে ইউসুফের খোঁজে পাঠিয়েছিলাম। দেখ, অবশেষে আল্লাহ্ আমার আশা পূর্ণ করেছেন। তাঁর কথা পূর্ববর্তী রুকূতে বর্ণিত হয়েছে। তখন) ছেলেরা বলল ঃ পিতঃ, আমাদের জন্য (আল্লাহ্‌র কাছে) মাগফিরাতের দোয়া করুন। (আমরা ইউসুফের ব্যাপারে আপনাকে যে সব কষ্ট দিয়েছি তাতে) আমরা অবশ্যই দোষী ছিলাম। (উদ্দেশ্য এই যে, আপনিও মাফ করে দিন। কেননা, স্বভাবত অন্যের জন্য মাগফিরাতের দোয়া সে-ই করে, যে নিজেও ধরপাকড় করতে চায় না)। ইয়াকুব (আ) বললেন ঃ সত্বরই পালনকর্তার কাছে তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করব। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। [এ থেকে তাঁর মাফ করে দেওয়াও বোঝা গেল। 'সত্বরই' বলার উদ্দেশ্য এই যে, তাহাজ্জুদের সময় আসতে দাও। এ সময় দোয়া কবুল হয়। (كذا فى الدر المنثور) মোটকথা, সবাই তৈরী হয়ে মিসর অভিমুখে রওয়ানা হল। ইউসুফ (আ) খবর পেয়ে অভ্যর্থনার জন্য শহরের বাইরে আগমন করলেন এবং বাইরেই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হল]। অতঃপর যখন সবাই ইউসুফ (আ)-এর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি (সবার সাথে দেখা-সাক্ষাত করে) পিতামাতাকে (সম্মানার্থ) নিজের কাছে স্থান দিলেন এবং (কথাবার্তা শেষ করে) বললেন ঃ সবাই শহরে চলুন (এবং) ইনশাআল্লাহ্ (সেখানে)সুখ-শান্তিতে থাকুন। (বিচ্ছেদের যাতনা ও দুর্ভিক্ষের কষ্ট সব দূর হয়ে গেল। মোটকথা সবাই, মিসরে পৌঁছল এবং (সেখানে পৌঁছে সম্মানার্থ)। পিতামাতাকে (রাজ) সিংহাসনে বসালেন এবং (তখন সবার অন্তরে ইউসুফের মাহাত্ম্য এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করল যে) সবাই তাঁর সামনে সিজদায় অবনত হয়ে গেল। (এ অবস্থা দেখে) তিনি বললেন ঃ পিতঃ, এই হচ্ছে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা আমি পূর্বে দেখে-ছিলাম (যে, সূর্য-চন্দ্র ও এগারটি নক্ষত্র আমাকে সিজদা করছে)। আমার পালনকর্তা এ (স্বপ্ন) কে সত্যে পরিণত করেছেন। (অর্থাৎ এর সত্যতা প্রকাশ করেছেন)। এবং (এ সম্মান ছাড়া আমার পালনকর্তা আমার প্রতি আরও অনুগ্রহ করেছেন। সেমতে এক) তখন অনুগ্রহ করেছেন, যখন আমাকে জেল থেকে বের করেছেন (এবং এ রাজকীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন)। এবং (দুই) শয়তান আমার ও ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করার পর (যে কারণে সারা জীবন মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এই যে) তিনি আপনাদের সবাইকে (যাদের মধ্যে আমার ভাইও আছে)। বাইরে থেকে (এখানে) নিয়ে এসেছেন (এবং সবাইকে মিলিয়ে দিয়েছেন)। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা সূক্ষ্ম তদবীর দ্বারা সম্পন্ন করেন, যা চান। নিশ্চয় তিনি জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (স্বীয় জ্ঞান ও হিকমত দ্বারা সবকিছুর তদবীর ঠিক করে দেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইঙ্গিতে যখন ইউসুফ (আ) এর গোপন রহস্য ফাঁস করে দেওয়ার সময় এসে যায়, তখন তিনি ভাইদের সামনে

বাস্তব অবস্থা প্রকাশ করে দেন। ভাইয়েরা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি শুধু ক্ষমাই করেন নি, বরং অতীত ঘটনাবলীর জন্য তিরস্কার করাও পছন্দ করেন নি। তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেন। এরপর তিনি পিতার সাথে সাক্ষাতের চিন্তা করেন। পরিস্থিতি লক্ষ্য করে এটাই উপযোগী মনে করেন যে, পিতাই পরিবারবর্গসহ এখানে আগমন করুন। কিন্তু একথাও জানা হয়ে যায় যে, পিতা বিচ্ছেদ কালে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তাই সর্বপ্রথম এ বিষয়টি চিন্তা করে ভাইদেরকে বললেন ঃ اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ — عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ يَاْتِ بَصِيْرًا অর্থাৎ তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং পিতার মুখমণ্ডলে রেখে দাও। এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। বলাবাহুল্য, কারও জামা মুখমণ্ডলে রেখে দেওয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার বস্তুগত কারণ হতে পারে না, বরং এটা ছিল ইউসুফ (আ)-এর একটি মু'জিযা। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তিনি জানতে পারেন যে, যখন তাঁর জামা পিতার চেহারায় রাখা হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দৃষ্টিশক্তি বহাল করে দেবেন।

যাহ্হাক ও মুজাহিদ প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন ঃ এটা এ জামার বৈশিষ্ট্য ছিল। কারণ, এ জামাটি সাধারণ কাপড়ের মত ছিল না, বরং হযরত ইবরাহীম (আ) -এর জন্য এটি জান্নাত থেকে তখন আনা হয়েছিল, যখন নমরূদ তাঁকে উলঙ্গ করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। এরপর এই জান্নাতী পোষাকটি সব সময়ই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ওফাতের পর হযরত ইসহাক (আ)-এর কাছে আসে। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত ইয়াকুব (আ) লাভ করেন। তিনি একে খুবই পবিত্র বস্তুর মর্যাদায় একটি নলের মধ্যে পুরে ইউসুফ (আ)-এর গলায় তাবিজ হিসাবে বেঁধে দিয়েছিলেন, যাতে বদ নযর থেকে নিরাপদ থাকেন। ভাইয়েরা পিতাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য যখন তাঁরা জামা খুলে নেয় এবং উলঙ্গ অবস্থায় তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করে, তখন জিবরাঈল এসে গলায় ঝুলানো নল খুলে এ জামা বের করে ইউসুফ (আ)-কে পরিয়ে দেন। এরপর থেকে জামাটি সর্বদাই তাঁর কাছে সংরক্ষিত ছিল। এ সময়েও জিবরাঈল ইউসুফ (আ)-কে পরামর্শ দেন যে এটি জান্নাতের পোশাক। এর বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্ধ ব্যক্তির চেহারায় রাখলে সে দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে যায়। এটিই তিনি পিতার কাছে পাঠিয়েছিলেন। যদ্দ্বারা তিনি দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানীর সুচিন্তিত বক্তব্য এই যে, ইউসুফ (আ)-এর রূপ-সৌন্দর্য এবং তাঁর সত্তাই ছিল জান্নাতী বস্তু। তাই তাঁর দেহের স্পর্শপ্রাপ্ত প্রত্যেক জামার মধ্যেই এ বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে।---(মাযহারী)

وَاْتُوْنِىْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ —অর্থাৎ তোমরা সব ভাই আপন আপন পরিবার-বর্গকে আমার কাছে মিসরে নিয়ে এস। পিতাকে আনাই আসল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এখানে স্পষ্টত পিতার পরিবর্তে পরিবারবর্গকে আনার কথা উল্লেখ করেছেন সম্ভবত একারণে যে,

...র কথা বলা আদবের খেলাফ মনে করেছেন। এছাড়া এ বিশ্বাস তো তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে এবং এখানে আসতে কোন বাধা থাকবে না, ...ই আগ্রহী হয়ে চলে আসবেন। কুরতুবী বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে যে, ইয়াহুদা বলল ঃ এই জামা আমি নিয়ে যাব। কারণ, তাঁর জামায় কৃত্রিম রক্ত ...ও আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম। ফলে পিতা অনেক আঘাত পেয়েছিলেন। এখন এর ক্ষতিপূরণও আমার হাতেই হওয়া উচিত।

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ —অর্থাৎ কাফেলা শহর থেকে বের হতেই কেনানে ইয়াকুব (আ)-নিকটস্থ লোকদেরকে বললেন ঃ তোমরা যদি আমাকে বোকা না ঠাওরাও, তবে আমি বলছি যে, আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। মিসর থেকে কেনান পর্যন্ত হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুযায়ী আট দিনের দূরত্ব ছিল। হযরত হাসান বসরীর বর্ণনা মতে আশি ফরসখ অর্থাৎ প্রায় আড়াইশ' মাইলের ব্যবধান ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এত দূর থেকে ইউসুফ (আ)-এর জামার মাধ্যমে তাঁর গন্ধ ইয়াকুব (আ)-এর মস্তিষ্কে পৌঁছে দেন। এটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বটে! অথচ ইউসুফ যখন কেনানেরই এক কূপের ভেতরে তিন দিন পড়ে রইলেন, তখন ইয়াকুব (আ) এ গন্ধ অনুভব করেন নি। এ থেকেই জানা যায় যে, মু'জিযা পয়গম্বরগণের ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এবং প্রকৃতপক্ষে মু'জিযা পয়গম্বরগণের নিজস্ব কর্মকাণ্ডও নয়--- সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার কর্ম। আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন, মু'জিযা প্রকাশ করেন। ইচ্ছা না হলে নিকটতম বস্তুও দূরবর্তী হয়ে যায়।

قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ —অর্থাৎ উপস্থিত লোকেরা বলল ঃ আল্লাহ্র কসম আপনি তো সেই পুরানো ভ্রান্ত ধারণায়ই পড়ে রয়েছেন যে, ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলন হবে।

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ —অর্থাৎ যখন সুসংবাদদাতা কেনানে পেঁ।ছল এবং ইউসুফের জামা ইয়াকুব (আ)-এর চেহারায় রাখল, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল। সুসংবাদদাতা ছিল জামা বহনকারী ইয়াহুদা।

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ —অর্থাৎ আমি কি বলিনি যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আমি এমন বিষয় জানি, যা তোমরা জান না? অর্থাৎ ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলন হবে।

قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ - বাস্তব ঘটনা

যখন সবার জানা হয়ে গেল, তখন ইউসুফের ভ্রাতারা স্বীয় অপরাধের জন্য পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল : আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাতের দোয়া করুন। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাতের দোয়া করবে, সে নিজেও তাদের অপরাধ মাফ করে দেবে।

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي —ইয়াকুব (আ) বললেন : আমি সত্বরই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব।

ইয়াকুব (আ) এখানে তৎক্ষণাৎ দোয়া করার পরিবর্তে অতিসত্বরই দোয়া করার ওয়াদা করেছেন। তফসীরবিদগণ এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, এর উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ গুরুত্ব সহকারে শেষ রাত্রে দোয়া করবেন। কেননা, তখনকার দোয়া বিশেষ ভাবে কবুল হয়। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত আছে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে পৃথিবী থেকে নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন এবং ঘোষণা করেন : কেউ আছে কি, যে দোয়া করবে---আমি কবুল করব? কেউ আছে কি, যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে---আমি ক্ষমা করব?

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ----কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ইউসুফ (আ) ভাইদের সাথে দু'শ উট বোঝাই করে অনেক আসবাবপত্র বস্ত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠিয়ে দিলেন, যাতে গোটা পরিবার মিসরে আসার জন্য ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। ইয়াকুব (আ) তাঁর আওলাদ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রস্তুত হয়ে মিসরের উদ্দেশে রওনা হলে---এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদের সংখ্যা বাহাত্তর এবং অন্য রিওয়ায়েত অনুযায়ী তিরানব্বই জন পুরুষ ও মহিলা ছিল।

অপরদিকে মিসর পৌঁছার সময় নিকটবর্তী হলে ইউসুফ (আ) ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য শহরের বাইরে আগমন করলেন। তাদের সাথে চার হাজার সশস্ত্র সিপাহীও সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে জমায়েত হল। সবাই যখন মিসরে ইউসুফ (আ)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি পিতামাতাকে নিজের কাছে জায়গা দিলেন।

এখানে أَبَوَيْهِ- --(পিতামাতা) উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ইউসুফ (আ)-এর মাতা তাঁর শৈশবেই ইন্তিকাল করেছিলেন। কিন্তু তারপর ইয়াকুব (আ) মৃতার ভগিনী লায়্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি ইউসুফ (আ)-এর খালা হওয়ার দিক দিয়েও মায়ের মতই ছিলেন এবং পিতার বিবাহিতা স্ত্রী হওয়ার দিক দিয়েও মাতা অভিহিত হওয়ার যোগ্য ছিলেন।

মায়ের মতই ছিলেন এবং পিতার বিবাহিতা স্ত্রী হওয়ার দিক দিয়েও মাতা অভিহিতা হওয়ার যোগ্য ছিলেন।(১)

وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ —ইউসুফ (আ) পরিবারের সবাইকে বললেন, আপনারা সবাই আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ভয়ে, অবাধে মিসরে প্রবেশ করুন। উদ্দেশ্য এই যে, ভিনদেশীদের প্রবেশের ব্যাপারে স্বভাবত যে সব বিধি-নিষেধ থাকে আপনারা সেগুলো থেকে মুক্ত।

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ —অর্থাৎ ইউসুফ (আ) পিতামাতাকে রাজ সিংহাসনে বসালেন।

وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا —অর্থাৎ পিতামাতা ও ভ্রাতারা সবাই ইউসুফ (আ)-এর সামনে সিজদা করলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এ কৃতজ্ঞতাসূচক সিজদাটি ইউসুফ (আ)-এর জন্য নয়---আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশেই করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন ঃ উপাসনামূলক সিজদা প্রত্যেক পয়গম্বরের শরীয়তে আল্লাহ্ ছাড়া কারও জন্য বৈধ ছিল না ; কিন্তু সম্মানসূচক সিজদা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তে বৈধ ছিল। শিরকের সিঁড়ি হওয়ার কারণে ইসলামী শরীয়তে তাও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা বৈধ নয়।

وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ ইউসুফ (আ)-এর সামনে যখন পিতামাতা ও এগার ভাই একযোগে সিজদা করল, তখন শৈশবের স্বপ্নের কথা তাঁর মনে পড়ল। তিনি বললেন ঃ পিতা ঃ, এটা আমার শৈশবে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা যাতে দেখেছিলাম যে, সূর্য, চন্দ্র ও এগারটি নক্ষত্র আমাকে সিজদা করছে। আল্লাহ্র শোকর যে তিনি এ স্বপ্নের সত্যতা চোখে দেখিয়ে দিয়েছেন।

(১) কারণটি ঐ রেওয়ায়েত অনুযায়ী বর্ণিত হয়েছে, যাতে বেনিয়ামিনের জন্মের সময় তাঁর মাতার ইন্তিকালের কথা বলা হয়েছে। এ জন্য এখানে লেখকের বক্তব্য সূরার প্রারম্ভে বর্ণিত বক্তব্যের সাথে পরস্পর বিরোধী হয়ে গেছে। সেখানে ইউসুফ (আ)-এর বিমাতার নাম রাহীল বলা হয়েছে। আসলে এ ব্যাপারে কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত নেই। যা আছে সবই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। এগুলোও পরস্পর বিরোধী। রূহুল মাআনীর গ্রন্থকার লেখেন ঃ বেনিয়ামিনের জন্মের সময় তার মাতার ইন্তিকাল ইহুদীরা স্বীকার করে না। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী কোন প্রশ্ন উঠে না। এমতাবস্থায় আয়াতে ইউসুফ (আ)-এর আপন মাতাই বোঝানো হয়েছে। ইবনে-জরীর ও ইবনে-কাসীরের মতে এ রেওয়ায়েতই অগ্রগণ্য। ইবনে-জরীর বলেন ঃ ইউসুফ (আ)-এর মাতার ইন্তিকালের কোন প্রমাণ নেই। কোরআনের ভাষা থেকেও বাহ্যত তাই বুঝা যায়।—মোঃ তকী ওসমানী

নির্দেশ ও মাস'আলা ঃ (১) ছেলেদের ক্ষমা প্রার্থনা ও মাগফিরাতের দরখাস্ত শুনে ইয়াকুব (আ) বলেছিলেন ঃ অতিসত্বর তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করব। তিনি তৎক্ষণাৎ দোয়া করেন নি।

এ বিলম্বের কারণ হিসেবে কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, ইয়াকুব (আ) চেয়েছিলেন, প্রথমে ইউসুফের সাথে দেখা করে জেনে নেওয়া যাক যে, সে তাদের অন্যায় ক্ষমা করেছে কি না। কারণ, মযলুম ক্ষমা না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলাও ক্ষমা করেন না। এমতাবস্থায় মাগফিরাতের দোয়া সময়োপযোগী ছিল না।

একথা সম্পূর্ণ সত্য ও নীতিগত যে, বান্দা তার হক আদায় না করা কিংবা ক্ষমা না করা পর্যন্ত বান্দার হকের ব্যাপারে তওবা দুরস্ত হয় না। এমতাবস্থায় শুধু মৌখিক তওবা ও ইস্তিগফার যথেষ্ট নয়।

(২) হযরত সুফিয়ান সওরী (রহ) বর্ণনা করেন ঃ ইয়াহুদা ইউসুফ (আ)-এর জামা এনে যখন ইয়াকুব (আ)-এর মুখমণ্ডলে রাখল, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ ইউসুফ কেমন আছে ? ইয়াহুদা বলল ঃ সে মিসরের বাদশাহ। ইয়াকুব (আ) বললেন ঃ সে বাদশাহ না ফকীর আমি তা জিজ্ঞেস করি না। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, ইমান ও আমলের দিক দিয়ে তার অবস্থা কিরূপ ? তখন ইয়াহুদা তাঁর তাকওয়া ও পবিত্রতার অবস্থা বর্ণনা করল। এ হচ্ছে পয়গম্বরগণের মহব্বত ও সম্পর্কের স্বরূপ। তাঁরা সন্তানদের দৈহিক সুখ-শান্তির চাইতে আত্মিক উন্নতির জন্য অধিক চিন্তা করেন। প্রত্যেক মুসলমানেরও তা অনুসরণ করা উচিত।

(৩) হযরত হাসান বসরী থেকে বর্ণিত রয়েছে, সুসংবাদাতা যখন ইউসুফ (আ)-এর জামা নিয়ে পৌঁছল, তখন ইয়াকুব (আ) তাকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন। কিন্তু আর্থিক অবস্থা শোচনীয় থাকায় অক্ষমতা প্রকাশ করে বললেন ঃ সাত দিন ধরে আমাদের ঘরে রুটিও পাকানো হয়নি। এমতাবস্থায় আমি তোমাকে কোন বস্তুগত পুরস্কার দিতে অক্ষম। কিন্তু দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার মৃত্যু-যন্ত্রণা সহজ করুন। কুরতুবী বলেন ঃ এ দোয়া ছিল তার জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার।

(৪) এ ঘটনা থেকে আরও জানা গেল যে, সুসংবাদদাতাকে পুরস্কৃত করা পয়গম্বরগণের সুন্নত। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত কা'ব ইবনে মালেকের ঘটনাটি সুপ্রসিদ্ধ। তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার কারণে যখন তাঁর উপর আল্লাহ্র ক্রোধ নাযিল হয় এবং পরে তওবা কবুল করা হয়, তখন যে ব্যক্তি তওবা কবুলের সংবাদ নিয়ে এসেছিল, তাকে তিনি তাঁর মূল্যবান বস্ত্রজোড়া খুলে পরিয়ে দিয়েছিলেন।

এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, আনন্দের সময় উল্লাস প্রকাশার্থে বন্ধু-বান্ধবকে ভোজে দাওয়াত করাও সুন্নত। হযরত ফারুকে আযম (রা) যখন সূরা বাকারা খতম করতেন, তখন আনন্দের আতিশয্যে একটি উট যবেহ্ করে সবাইকে ভোজে আপ্যায়িত করতেন।

(৫) ইয়াকুব (আ)-এর ছেলেরা বাস্তব ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর পিতা ও ভাইয়ের

কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এতে বোঝা গেল যে, হাতে বা মুখে কাউকে কষ্ট দিলে অথবা কারও কোন পাওনা থাকলে তৎক্ষণাৎ তা পরিশোধ করা অথবা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া জরুরী।

সহীহ্ বুখারীতে আবূ হোরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যার যিম্মায় অপরের কোন আর্থিক প্রাপ্য থাকে কিংবা সে অপরকে হাতে কিংবা মুখে কষ্ট দেয়, তার সঙ্গে সঙ্গে তা পরিশোধ করে দেওয়া কিংবা ক্ষমা প্রার্থনা করে দায়িত্বমুক্ত হওয়া উচিত। কিয়ামতের পূর্বেই তা করা উচিত। কিয়ামতের দিন আর্থিক পাওনা পরিশোধ করা যাবে না। তাই তার সৎকর্মসমূহ প্রাপককে দিয়ে দেওয়া হবে। ফলে সে রিক্তহস্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে তার কর্মসমূহ যদি সৎ না হয়, তবে প্রতিপক্ষের গোনাহ্র বোঝা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। اعاذنا الله!

ইউসুফ (আ)-এর সবর ও শোকরের স্তর ঃ এরপর ইউসুফ (আ) পিতামাতার সামনে কিছু অতীত কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করলেন। এখানে এক দণ্ড থেমে একটু চিন্তা করুন, আজ যদি কেউ এতটুকু দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়, যতটুকু ইউসুফ (আ)-এর উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে এবং এত দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ ও নৈরাশ্যের পর পিতামাতার সাথে মিলন ঘটে, তবে সে পিতামাতার সামনে নিজের কাহিনী কিভাবে বর্ণনা করবে? কতটুকু কাঁদবে এবং কাঁদাবে? দুঃখ-কষ্টের করুণ কাহিনী বর্ণনা করতে কতদিন লাগবে? কিন্তু এখানে উভয়পক্ষই আল্লাহ্র রসূল ও পয়গম্বর। তাঁদের কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করুন, ইয়াকুব (আ)-এর বিরহী প্রিয় ছেলে হাজারো দুঃখ-কষ্টের প্রান্তর অতিক্রম করে যখন পিতার সাথে মিলিত হন, তখন কি বলেনঃ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন কারাগার থেকে আমাকে বের করেছেন এবং আপনাকে বাইরে থেকে এখানে এনেছেন, অথচ শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

ইউসুফ (আ)-এর দুঃখ-কষ্ট যথাক্রমে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত হয়। এক. ভাইদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন। দুই. পিতামাতার কাছ থেকে দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ। এবং তিন. কারাগারের কষ্ট। আল্লাহ্র মনোনীত পয়গম্বর স্বীয় বিবৃতিতে প্রথমে ঘটনাবলীর ধারা-বাহিকতা পরিবর্তন করে কারাগার থেকে কথা শুরু করেছেন। কিন্তু এতে কারাগারে প্রবেশ করা এবং সেখানকার দুঃখ-কষ্টের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। বরং কারাগার থেকে অব্যাহতির কথা আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতাসহ বর্ণনা করেছেন। কারাগার থেকে মুক্তি এবং তজ্জন্য আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে যেন একথাও বলে দিয়েছেন যে, তিনি কোন সময় কারাগারেও ছিলেন।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, ইউসুফ (আ) কারাগার থেকে বের হওয়ার কথা তো উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ভ্রাতারা যে তাঁকে---কূপে নিক্ষেপ করেছিল, তা এদিক দিয়েও উল্লেখ করেন নি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ঐ কূপ থেকে বের করেছেন। কারণ এই যে,

ভাইদের অপরাধ পূর্বেই মাফ করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ তাই যে কোনভাবে কূপের কথা উল্লেখ করে ভাইদেরকে লজ্জা দেওয়া তিনি সমীচীন মনে করেন নি।—(কুরতুবী)

এরপর ছিল পিতামাতা থেকে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ ও তার প্রতিক্রিয়াদি বর্ণনা করার পালা। তিনি সব বিষয় থেকে পাশ কাটিয়ে শুধু শেষ পরিণতি ও পিতামাতার সাথে সাক্ষাতের কথা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতাসহ উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্ আপনাকে গ্রাম থেকে মিসর শহরে এনে দিয়েছেন। এখানে এই নিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইয়াকুব (আ)-এর বাসভূমি গ্রামে ছিল সেখানে জীবন যাপনের সুযোগ-সুবিধা কম ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে শহরে রাজকীয় সম্মানের মাঝে পৌঁছে দিয়েছেন।

এখন প্রথম অধ্যায়টি অবশিষ্ট রইল—অর্থাৎ ভাইদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন। একেও শয়তানের ঘাড়ে চাপিয়ে এভাবে চুকিয়ে দিলেন যে, আমার ভ্রাতারা এরূপ ছিল না। শয়তান তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে কলহ সৃষ্টির এ কাজটি করিয়েছে।

এ হচ্ছে নবুয়তের শান। নবীগণ দুঃখ-কষ্টে শুধু সবরই করেন না, বরং সর্বত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিকও আবিষ্কার করে ফেলেন। এ কারণেই তাঁদের এমন কোন অবস্থা নেই, যেখানে তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ নন। সাধারণ মানুষের অবস্থা এর বিপরীত। তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত পেয়েও কোন নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে না, কিন্তু কোন সময় সামান্য কষ্ট পেলে জীবনভর তা গেয়ে বেড়ায়। কোরআনে এ বিষয়েই অভিযোগ করে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُوْدٌ অর্থাৎ মানুষ পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।

ইউসুফ (আ) দুঃখ-কষ্টের ইতিকথা সংক্ষেপে তিন শব্দে ব্যক্ত করার পর বললেন ঃ إِنَّ رَبِّي لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ —অর্থাৎ আমার পালনকর্তা যে কাজ করতে চান, তার তদবীর সূক্ষ্ম করে দেন। নিশ্চয় তিনি সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান।

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ
فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قف اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ
تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۝

---

(১০১) হে পালনকর্তা, আপনি আমাকে রাজত্বের অংশবিশেষ দান করেছেন এবং আমাকে বিভিন্ন বিষয় যথাযথ তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছেন। হে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের স্রষ্টা, আপনিই আমার কার্যনির্বাহী ইহকাল ও পরকালে। আমাকে ইসলামের উপর মৃত্যুদান করুন এবং আমাকে সজ্জনদের সাথে মিলিত করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[এরপর সবাই হাসিখুশি জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন। এক সময় ইয়াকুব (আ)-এর আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে আসে। ওফাতের পর ওসিয়ত মোতাবেক মৃতদেহ সিরিয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়। পূর্বপুরুষগণের সমাধিপার্শ্বে দাফন করা হয়। এরপর ইউসুফ (আ)-এর মনেও পরকালের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পায় এবং তিনি দোয়া করেন ঃ] হে আমার পালন-কর্তা, আপনি আমাকে (সব রকম নিয়ামতই দিয়েছেন, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণও। বাহ্যিক এই যে, উদাহরণত) রাজত্বের বড় অংশ দিয়েছেন এবং (আভ্যন্তরীণ এই যে, উদাহরণত) আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন (যা একটি মহান বিদ্যা, বিশেষ করে তা যদি নিশ্চিত হয়। ব্যাখ্যার নিশ্চয়তা নির্ভর করে ওহীর উপর। সুতরাং এর অস্তিত্ব নবুওয়তের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত)। হে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের স্রষ্টা, আপনি আমার কার্যনির্বাহী ইহকালে ও পরকালে (অতএব ইহকালে যেমন আমার সব কাজ নির্বাহ করেছেন, রাজত্ব দান করেছেন এবং জ্ঞান দান করেছেন, তেমনি পরকালের কাজও সুষ্ঠু ও সঠিক করে দিন। অর্থাৎ আমাকে) আনুগত্যশীল অবস্থায় দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন এবং সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। (অর্থাৎ আমার যে সব পূর্বপুরুষ মহান পয়গম্বর ছিলেন, আমাকেও তাঁদের স্তরে পৌঁছে দিন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইউসুফ (আ) পিতাকে সম্বোধন করেছিলেন। এরপর পিতা-মাতা ও ভাইদের সাথে সাক্ষাতের ফলে যখন জীবনে শান্তি এল, তখন সরাসরি আল্লাহর প্রশংসা, গুণকীর্তন ও দোয়ায় মশগুল হয়ে গেলেন। বললেন ঃ

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۝

অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে রাজত্বের অংশবিশেষ দান করেছেন এবং আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, আপনিই ইহকাল

ও পরকালে আমার কার্যনির্বাহী। আমাকে পূর্ণ আনুগত্যশীল অবস্থায় দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন এবং আমাকে পরিপূর্ণ সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত রাখুন। পরিপূর্ণ সৎ বান্দা পয়গম্বরগণই হতে পারেন। তাঁরা যাবতীয় গোনাহ্ থেকে পবিত্র।—(মাযহারী)

এ দোয়ায় 'খাতেমা-বিলখায়র' অর্থাৎ অন্তিম সময়ে পূর্ণ আনুগত্যশীল হওয়ার প্রার্থনাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়জনদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা ইহকাল ও পরকালে যত উচ্চ মর্তবাই লাভ করুন এবং যত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পদ-মর্যাদাই তাঁদের পদচুম্বন করুক, তাঁরা কখনও গর্বিত হন না, বরং সর্বদাই এ সব অবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার অথবা হ্রাস পাওয়ার আশংকা করতে থাকেন। তাই তাঁরা দোয়া করতে থাকেন, যাতে আল্লাহ্-প্রদত্ত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নিয়ামতসমূহ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, বরং সেগুলো আরও যেন বৃদ্ধি পায়।

এ পর্যন্ত কোরআনে বর্ণিত ইউসুফ (আ)-এর বিস্ময়কর কাহিনী এবং এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন নির্দেশের বর্ণনা সমাপ্ত হল। এর পরবর্তী কাহিনী কোরআন পাক অথবা কোন মরফু' হাদীসে বর্ণিত হয়নি। অধিকাংশ তফসীরবিদ ঐতিহাসিক কিংবা ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে তা বর্ণনা করেছেন।

তফসীর ইবনে-কাসীরে হযরত হাসানের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, ইউসুফ (আ) যখন কূপে নিক্ষিপ্ত হন, তখন তাঁর বয়স ছিল (১৭) সতের বছর। এরপর পিতার কাছ থেকে আশি বছর নিরুদ্দেশ থাকেন এবং পিতামাতার সাথে সাক্ষাতের পর তেইশ বছর জীবিত থাকেন। একশ বিশ বছর বয়সে ওফাত পান।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেনঃ কিতাবী সম্প্রদায়দের রেওয়ায়েতে আছে যে, ইউসুফ (আ) ও ইয়াকুব (আ)-এর বিচ্ছেদের মেয়াদ ছিল চল্লিশ বছর। এরপর ইয়াকুব (আ) মিসরে আগমন করার পর ছেলের সাথে সতের বছর জীবিত থাকেন। অতঃপর তাঁর ওফাত হয়ে যায়।

তফসীর কুরতুবীতে ঐতিহাসিকদের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, মিসরে চব্বিশ বছর অবস্থান করার পর ইয়াকুব (আ)-এর ওফাত হয়ে যায়। ওফাতের পূর্বে তিনি ইউসুফ (আ)-কে ওসিয়ত করেন যেন তাঁর মৃতদেহ দেশে পাঠিয়ে পিতা ইসহাক (আ)-এর পার্শ্বে দাফন করা হয়।

সায়ীদ ইবনে জুবায়ের বলেনঃ ইয়াকুব (আ)-কে শাল কাঠের শবাধারে রেখে বায়তুল-মুকাদ্দাসে স্থানান্তরিত করা হয়। এ কারণেই সাধারণ ইহুদীদের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত হয়ে যায় যে, তারা মৃতদেহ দূর-দূরান্ত থেকে বায়তুল-মোকাদ্দাসে এনে দাফন করে। ওফাতের সময় হযরত ইয়াকুব (আ)-এর বয়স ছিল একশ সাতচল্লিশ বছর।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ বলেনঃ ইয়াকুব (আ) পরিবারবর্গসহ যখন মিসরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁদের সংখ্যা ছিল তিরানব্বই জন। পরবর্তীকালে ইয়াকুব (আ)-এর আওলাদ অর্থাৎ, বনী-ইসরাঈল যখন মূসা (আ)-এর সাথে মিসর থেকে বের হয়, তখন তাদের সংখ্যা ছিল ছয় লাখ সত্তর হাজার।—(কুরতুবী, ইবনে-কাসীর)

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সাবেক আযীযে-মিসরের মৃত্যুর পর বাদশাহ্‌র উদ্যোগে ইউসুফ (আ) যুলায়খাকে বিয়ে করেছিলেন।

তওরাত ও কিতাবী সম্প্রদায়ের ইতিহাসে আছে, তাঁর গর্ভে ইউসুফ (আ)-এর দুই ছেলে ইফরায়ীম ও মনশা এবং এক কন্যা 'রহমত বিনতে ইউসুফ' জন্মগ্রহণ করেন। রহমতের বিয়ে হযরত আইউব (আ)-এর সাথে সম্পন্ন হয়। ইফরায়ীমের বংশধরের মধ্যে মূসা (আ)-এর সহচর ইউশা ইবনে-নূন জন্মগ্রহণ করেন।—(মাযহারী)

হযরত ইউসুফ (আ) একশ বিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং নীলনদের কিনারায় সমাহিত হন।

ইবনে ইসহাক হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণনা করেন, মূসা (আ)-কে যখন বনী ইসরাঈলদের সাথে নিয়ে মিসর ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন ওহীর মাধ্যমে একথাও বলা হয় যে, ইউসুফের মৃতদেহ মিসরে রেখে যাবেন না, বরং সাথে নিয়ে সিরিয়া চলে যান এবং তাঁর পিতৃপুরুষদের পাশে দাফন করুন। এ নির্দেশ পেয়ে মূসা (আ) খোঁজাখুঁজি করে তাঁর কবর আবিষ্কার করেন, যা মর্মর পাথরের একটি শবাধারে রক্ষিত ছিল। তিনি তাঁকে কেনান ভূমি অর্থাৎ, ফিলিস্তীনে নিয়ে যান এবং হযরত ইসহাক ও ইয়াকুব (আ) এর পাশে দাফন করেন।—(মাযহারী)

ইউসুফ (আ)-এর পর মিসর দেশ 'আমালিক' গোত্রের ফেরআউনদের করতলগত হয়। বনী ইসরাঈল তাদের রাজত্বে বাস করে ইউসুফ (আ)-এর ধর্ম পালন করতে থাকে, কিন্তু বিদেশী হওয়ার অজুহাতে তাদের উপর নানাবিধ নির্যাতন চলতে থাকে। অবশেষে মূসা (আ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ নির্যাতন থেকে উদ্ধার করেন।—(মাযহারী)

নির্দেশ ও বিধান : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে প্রথমত জানা যায় যে, পিতামাতার প্রতি সম্মানসূচক সিজদা তখন জায়েয ছিল বলেই তাঁর পিতামাতা ও ভ্রাতারা সিজদা করেছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদী শরীয়তে সিজদা হচ্ছে ইবাদতের বিশেষ আলামত। তাই আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সিজদা করা হারাম। কোরআন পাকে বলা হয়েছে

لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ —সূর্য ও চন্দ্রকে সিজদা কর না। হাদীসে আছে, হযরত মুয়ায সিরিয়া গমন করে যখন দেখলেন যে, খৃস্টানরা তাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সিজদা করে, তখন ফিরে এসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সিজদা করতে উদ্যত হন। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে নিষেধ করে বললেন : যদি আমি কাউকে সিজদা করা জায়েয মনে করতাম, তবে স্ত্রীদেরকে আদেশ দিতাম তারা যেন স্বামীদেরকে সিজদা করে। এমনিভাবে হযরত সালমান ফারিসী রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সিজদা করতে চেয়েছিলেন। তিনি নিষেধ করে বলেছিলেন : لا تسجد لى يا سلمان و اسجد للحى الذى لا يموت —অর্থাৎ

সালমান, আমাকে সিজদা করো না ; বরং ঐ চিরঞ্জীবীকে সিজদা কর, যার ক্ষয় নেই।--- (ইবনে-কাসীর)

এতে বুঝা গেল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যখন সম্মানসূচক সিজদা করা জায়েয নয়, তখন আর কোন বুযুর্গ অথবা পীরের জন্য কেমন করে তা জায়েয হতে পারে?

هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ---থেকে জানা যায় যে, মাঝে মাঝে স্বপ্নের অর্থ দীর্ঘদিন পরও প্রকাশ পায়। যেমন এ ঘটনায় চল্লিশ কিংবা আশি বছর পর প্রকাশ পেয়েছে। —(ইবনে-জরীর, ইবনে কাসীর)

قَدْ اَحْسَنَ بِيْ---দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রোগ-শোক ও বিপদাপদে পতিত হওয়ার পর যদি মুক্তি পাওয়া যায়, তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা পয়গম্বরগণের সুন্নত এবং রোগ ও বিপদাপদের কথা উল্লেখ না করাও সুন্নত।

اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَاءُ---থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে কাজের ইচ্ছা করেন, তার জন্য ধারণাতীত সূক্ষ্ম ও গোপন তদবীরের ব্যবস্থা করে থাকেন, যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا ---বাক্যে ইউসুফ (আ) ঈমান ও ইসলামের উপর মৃত্যুর জন্য দোয়া করেছেন। এতে বুঝা গেল, বিশেষ অবস্থায় মৃত্যুর জন্য দোয়া নিষিদ্ধ নয়। সহীহ্ হাদীসে মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, সংসারের দুঃখ-কষ্টে পেরেশান ও অধৈর্য হয়ে মৃত্যু কামনা করা দুরস্ত নয়। বিপদের কারণে মৃত্যুর জন্য দোয়া করতে রসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করেছেন। যদি দোয়া করতেই হয় তবে এভাবে করবে, ইয়া আল্লাহ্, যে পর্যন্ত জীবিত রাখ ঈমানের সাথে বেঁচে থাকার তাওফীক দাও এবং যখন মৃত্যু শ্রেয় হয়, তখনই আমাকে মৃত্যু দান কর।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْٓا
اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۝ وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ
۝ وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝
وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ

عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۝ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ
۝ اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ
السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا
اِلَى اللّٰهِ ۟ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۭ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِيْنَ ۝ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ
اَهْلِ الْقُرٰى ۭ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۭ اَفَلَا
تَعْقِلُوْنَ ۝

(১০২) এগুলো অদৃশ্যের খবর, আমি আপনার কাছে প্রেরণ করি। আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা স্বীয় কাজ সাব্যস্ত করছিল এবং চক্রান্ত করছিল। (১০৩) আপনি যতই চান, অধিকাংশ লোক বিশ্বাসকারী নয়। (১০৪) আপনি এর জন্যে তাদের কাছে কোন বিনিময় চান না। এটা তো সারা বিশ্বের জন্য উপদেশ বৈ নয়। (১০৫) অনেক নিদর্শন রয়েছে নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে যেগুলোর উপর দিয়ে তারা পথ অতিক্রম করে এবং তারা এসবের দিকে মনোনিবেশ করে না। (১০৬) অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে। (১০৭) তারা কি নির্ভীক হয়ে গেছে এ বিষয়ে যে, আল্লাহ্র আযাবের কোন বিপদ তাদেরকে আবৃত করে ফেলবে অথবা তাদের কাছে হঠাৎ কিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা টেরও পাবে না? (১০৮) বলে দিনঃ এই আমার পথ। আমি আল্লাহ্র দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই---আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ্ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। (১০৯) আপনার পূর্বে আমি যতজনকে রসূল করে পাঠিয়েছি, তারা সবাই পুরুষই ছিল জনপদবাসীদের মধ্য থেকে। আমি তাঁদের কাছে ওহী প্রেরণ করতাম। তারা কি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে না, যাতে দেখে নিত কিরূপ পরিণতি হয়েছে তাদের, যারা পূর্বে ছিল? সংযমকারীদের জন্য পরকালের আবাসই উত্তম। তারা কি এখনও বুঝে না?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এই কাহিনী (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে, আপনার জন্য) অন্যতম অদৃশ্য সংবাদ। (কেননা এটা জানার কোন বাহ্যিক উপায় আপনার কাছে ছিল না, শুধু) আমি(-ই)

ওহীর মাধ্যমে আপনাকে এ কাহিনী বলছি এবং' (বলা বাহুল্য) আপনি তাদের (ইউসুফ ভ্রাতাদের) কাছে তখন ছিলেন না, যখন তারা (ইউসুফকে কূপে নিক্ষেপ করার) স্বীয় অভিসন্ধি পাকাপোক্ত করেছিল এবং তারা (এ সম্পর্কে) তদবীর করেছিল (যে, তারা পিতার কাছে এমন বলবে, যাতে তারা তাকে এমনভাবে নিয়ে যায় ইত্যাদি। এভাবে এটা নিশ্চিত যে, আপনি এ কাহিনী কারও কাছে শুনেন নি। অতএব, এটা নবুয়তের এবং ওহী প্রাপ্তির পরিষ্কার প্রমাণ) এবং (নবুয়তের প্রমাণাদি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও) অধিকাংশ লোক বিশ্বাস স্থাপন করে না; যদিও আপনি কামনা করেন আর (তাদের বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণে অবশ্য আপনার কোন ক্ষতি নেই। কেননা) আপনি তাদের কাছে এর (কোরআনের) জন্য কোন বিনিময় চান না (যাতে এরূপ সম্ভাবনা থাকে যে, তারা এ কোরআন কবুল না করলে আপনার পারিশ্রমিক পণ্ড হয়ে যাবে)। এটা (অর্থাৎ কোরআন) তো শুধু বিশ্বাসীর জন্য একটি উপদেশ। (কেউ না মানলে তাতে তারই ক্ষতি।) এবং (এরা যেমন নবুয়ত অস্বীকার করে, এমনিভাবে প্রমাণাদি সত্ত্বেও একত্ববাদ অস্বীকারকারীও রয়েছে। সেমতে) বহু নিদর্শন রয়েছে (যেগুলো একত্ববাদের প্রমাণ) নভোমণ্ডলে (যেমন, নক্ষত্ররাজি ইত্যাদি) এবং ভূ-মণ্ডলে; (যেমন পদার্থ ও উপাদান,) যেগুলোর উপর দিয়ে তারা পথ অতিক্রম করে (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করতে থাকে) এবং তারা এগুলোর প্রতি (সামান্যও) মনোযোগ দেয় না। (অর্থাৎ এগুলো দ্বারা কোন কিছু প্রমাণ করে না।) এবং অধিকাংশ লোক, যারা আল্লাহ্‌কে মানে, তারা সাথে সাথে শিরকও করে। (অতএব একত্ববাদ ব্যতীত আল্লাহ্‌কে মানা, না মানারই শামিল। সুতরাং তারা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে এবং নবুয়তের সাথেও কুফরী করে।) অতএব (আল্লাহ্ ও রসূলে অবিশ্বাসী হয়েও) তারা কি এ ব্যাপারে নিরুদ্বেগ হয়ে বসেছে যে, আল্লাহ্‌র আযাবের কোন বিপদ এসে তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে অথবা তাদের কাছে অতর্কিত কিয়ামত এসে যাবে এবং তারা (পূর্ব থেকে) টেরও পাবে না? (উদ্দেশ্য, কুফরের পরিণাম হচ্ছে শাস্তি; দুনিয়াতে নাযিল হোক কিংবা কিয়ামতের দিন পতিত হোক। অতএব তাদের উচিত ভয় করা এবং কুফরী পরিত্যাগ করা।) আপনি বলে দিন: আমি (একত্ববাদ ও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আহ্বায়ক হওয়ার) প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে দাওয়াত দেই—আমি নিজেও এবং আমার অনুসারীরাও। (অর্থাৎ আমার কাছেও তওহীদ ও রিসালতের প্রমাণ রয়েছে এবং আমার সঙ্গীরাও প্রমাণের ভিত্তিতে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আমি প্রমাণহীন বিষয়ের প্রতি কাউকে দাওয়াত দেই না। প্রমাণ শোন এবং বুঝ। অতএব আমার পথের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ এক এবং আমি দাওয়াতদাতা) এবং আল্লাহ্ (শিরক থেকে) পবিত্র এবং আমি (এ পথ কবুল করি এবং) মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (তারা যে নবুয়তের ব্যাপারে সন্দেহ করে যে, নবীর ফেরেশতা হওয়া উচিত, এটা অর্থহীন বাজে কথা। কেননা) আমি আপনার পূর্বে বিভিন্ন জনপদবাসীর মধ্য থেকে যতজনকে (রসূল করে) প্রেরণ করেছি, তারা সবাই মানুষই ছিল, যাদের কাছে আমি ওহী প্রেরণ করতাম। (কেউ ফেরেশতা ছিল না। যারা তাদেরকে মানেনি এবং এ ধরনের অনর্থক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে এরাও শাস্তি পাবে—ইহকালে হোক কিংবা

পরকালে। এরা যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রয়েছে) এরা কি (কোথাও) দেশ ভ্রমণে যায়নি যে, (স্বচক্ষে) তাদের পরিণাম দেখে নিত, যারা তাদের পূর্বে (কাফির হিসাবে) গত হয়েছে? (এবং মনে রেখো, যে দুনিয়ার ভালবাসায় মত্ত হয়ে তোমরা কুফরের পথ ধরেছ, তা ধ্বংসশীল ও তুচ্ছ,) নিশ্চয় পরজগত তাদের জন্য খুবই উত্তম, যারা (শিরক ইত্যাদি থেকে) সংযমী হয় (এবং একত্ববাদ ও আনুগত্য অবলম্বন করে)। অতএব, তোমরা কি এতটুকুও বুঝ না (যে ধ্বংসশীল ও ভিত্তিহীন বস্তু ভাল, না চিরস্থায়ী ও অক্ষয় বস্তু ভাল)?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী পুরাপুরি বর্ণনা করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ

---অর্থাৎ এই কাহিনী ঐ সব অদৃশ্য সংবাদের অন্যতম, যেগুলো আমি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে বলেছি। আপনি ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছে উপস্থিত ছিলেন না, যখন তারা ইউসুফকে কূপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এজন্য কলাকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছিল।

এ বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীটি পূর্ণ বিবরণসহ ঠিক ঠিক বলে দেওয়া আপনার নবুয়ত ও ওহীর সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা, কাহিনীটি হাজারো বছর পূর্বেকার। আপনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না যে, স্বচক্ষে দেখে বিবৃত করবেন এবং আপনি কারও কাছে শিক্ষাও গ্রহণ করেন নি যে, ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করে অথবা কারও কাছে শুনে বর্ণনা করবেন। অতএব, আল্লাহ্‌র ওহী ব্যতীত এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

কোরআন পাক শুধু এতটুকু বিষয় উল্লেখ করেছে যে, (আপনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না।) অন্য কোন ব্যক্তি অথবা গ্রন্থ থেকে এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জিত না হওয়ার কথা উল্লেখ করা জরুরী মনে করা হয়নি। কারণ, সমগ্র আরবের জানা ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মী বা নিরক্ষর। তিনি কারও কাছে লেখাপড়া করেন নি। সবার আরও জানা ছিল যে, তাঁর সমগ্র জীবন মক্কায় অতিবাহিত হয়েছে। একবার চাচা আবূ তালিবের সাথে সিরিয়া সফরে গমন করে মাঝপথ থেকেই ফিরে এসেছিলেন। দ্বিতীয় সফর, বাণিজ্য ব্যাপদেশে করেছিলেন, কিন্তু মাত্র কয়েকদিন অবস্থান করেই ফিরে আসেন। এ সফরেও কোন পণ্ডিত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত অথবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কের বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না। তাই এ ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা জরুরী মনে করা হয়নি। তবে কোরআন পাকের অন্যত্র একথাও উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا ---অর্থাৎ কোরআন অবতরণের পূর্বে এ সব ঘটনা আপনিও জানতেন এবং আপনার স্বজাতিও জানত না।

ইমাম বগভী বলেনঃ ইহুদী ও কুরাইশরা সম্মিলিতভাবে পরীক্ষার্থে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করলঃ আপনি যদি সত্য নবী হন, তবে বলুন, ইউসুফ (আ)-এর ঘটনাটি কি এবং কিভাবে ঘটেছিল? যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর মাধ্যমে সব বলে দিলেন এবং এরপরও তারা কুফরী ও অস্বীকারে অটল রইল, তখন তিনি অন্তরে দারুন আঘাত পেলেন। এরই প্রেক্ষিতে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আপনার রিসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও অনেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়—আপনি যত চেষ্টাই করুন না কেন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনার কাজ হল প্রচার এবং সংশোধনের চেষ্টা করা। চেষ্টাকে সফল করা আপনার ক্ষমতাধীন নয়। অধিকন্তু এটা আপনার দায়িত্বও নয়। কাজেই দুঃখ করাও উচিত নয়। এরপর বলা হয়েছেঃ

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ —অর্থাৎ আপনি প্রচার ও বিশুদ্ধ পথ বলে দেওয়ার যে চেষ্টা করছেন, সেজন্য তাদের কাছে তো কোন পারিশ্রমিক চান না যে, এটা মেনে নেওয়া বা শোনা তাদের পক্ষে কঠিন হবে। আপনার কথাবার্তা তো নির্ভেজাল মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও উপদেশ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। এতে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আপনার এ চেষ্টার লক্ষ্য যখন পার্থিব উপকার লাভ নয়, বরং পরকালের সওয়াব ও জাতির হিতাকাঙ্ক্ষা, তখন এ লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেছে। সুতরাং আপনি কেন চিন্তিত হন?

وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ

অর্থাৎ শুধু তাই নয় যে এরা জেদ ও হঠকারিতাবশত কোন শুভাকাঙ্ক্ষীর উপদেশে শ্রবণ করে না, বরং তাদের অবস্থা হল এই যে, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ্র যেসব সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর কাছ দিয়েও এরা উদাসীন হয়ে ও চোখ বুজে চলে যায়। একটুও লক্ষ্য করে না যে, এগুলো কার অপার শক্তির নিদর্শন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। অতীতের আযাবপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ তাদের দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তারা এগুলো থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করে না।

যারা আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও শক্তিতেই বিশ্বাস করে না, উপরোক্ত বর্ণনা ছিল তাদের সম্পর্কে। অতঃপর এমন লোকদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু তাঁর সাথে অন্য বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। বলা হয়েছেঃ

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ —অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তারাও শিরকের সাথে করে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি গুণের সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, যা একান্ত অন্যায় ও নিছক মূর্খতা।

ইবনে কাসীর বলেন ঃ যেসব মুসলমান ঈমান সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রকার শিরকে লিপ্ত রয়েছে, তারাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। মসনদে আহমদের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি তোমাদের জন্য যেসব বিষয়ের আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে সবচাইতে বিপজ্জনক হচ্ছে ছোট শিরক। সাহাবায়ে কিরামের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন ঃ রিয়া (লোক-দেখানো ইবাদত) হচ্ছে ছোট শিরক। এমনিভাবে এক হাদীসে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের কসম খাওয়াকেও শিরক বলা হয়েছে।—(ইবনে কাসীর) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও নামে মান্নত করা এবং নিয়াজ দেয়াও ফিকাহ্‌বিদগণের মতে শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

এরপর তাদের অমনোযোগিতা ও মূর্খতার কারণে পরিতাপ ও বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা অস্বীকার ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও কিরূপে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের উপর কোন আযাব এসে যাবে কিংবা অতর্কিতে কিয়ামত এসে যাবে তাদের প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বেই।

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

অর্থাৎ আপনি তাদেরকে বলে দিন ঃ তোমরা মান অথবা না মান—আমার তরীকা এই যে, মানুষেকে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দিতে থাকব—আমি এবং আমার অনুসারীরাও।

উদ্দেশ্য এই যে, আমার দাওয়াত আমার কোন চিন্তাধারার উপর ভিত্তিশীল নয়; বরং এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার ফলশ্রুতি। এ দাওয়াত ও জ্ঞানে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর অনুসারীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এতে সাহাবায়ে কিরামকে বুঝানো হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জ্ঞানের বাহক এবং আল্লাহ্‌র সিপাহী। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ বলেন ঃ সাহাবায়ে কিরাম এ উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের অন্তর পবিত্র এবং জ্ঞান সুগভীর। তাঁদের মধ্যে লৌকিকতার নাম-গন্ধও নেই। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে স্বীয় রসূলের সংসর্গ ও সেবার জন্য মনোনীত করেছেন। তোমরা তাঁদের চরিত্র অভ্যাস ও তরিকা আয়ত্ত কর। কেননা, তাঁরা সরল পথের পথিক।

وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ব্যাপক অর্থেও হতে পারে। এতে ঐ সব ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দাওয়াতকে উম্মত পর্যন্ত পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত থাকবেন। কলবী ও ইবনে যায়েদ বলেন ঃ এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনুসরণের দাবী করে, তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তাঁর দাওয়াতকে ঘরে ঘরে পৌঁছানো এবং কোরআনের শিক্ষাকে ব্যাপকতর করা। —(মাযহারী)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ---অর্থাৎ আল্লাহ্ শিরক থেকে পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। উপরে বর্ণিত হয়েছিল যে, অধিকাংশ লোক ঈমানের সাথে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শিরককেও যুক্ত করে দেয়। তাই শিরক থেকে নিজের সম্পূর্ণ পবিত্রতা প্রকাশ করেছেন। সারকথা এই যে, আমার দাওয়াতের উদ্দেশ্য মানুষকে নিজের দাসে পরিণত করা নয়; বরং আমি নিজেও আল্লাহ্‌র 'বান্দা' এবং মানুষকেও তাঁর দাসত্ব স্বীকার করার দাওয়াত দেই। তবে দাওয়াতদাতা হিসাবে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয।

মুশরিকরা এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করত যে, আল্লাহ্‌র রসূল ও দূত মানুষ নয়; বরং ফেরেশতা হওয়া দরকার। এর উত্তর পরবর্তী আয়াতে দেওয়া হয়েছে ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى

অর্থাৎ তাদের এ ধারণা ভিত্তিহীন ও নিরর্থক যে, আল্লাহ্‌র রসূল ফেরেশতা হওয়া দরকার---মানব হতে পারে না। বরং ব্যাপার উল্টা। মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌র রসূল সবসময় মানবই হয়েছেন। তবে সাধারণ লোকদের থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য এই যে, তাঁর প্রতি সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ওহী আগমন করে। এটা কারও প্রচেষ্টা ও কর্মের ফল নয়। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে উপযুক্ত মনে করেন, এ কাজের জন্য মনোনীত করেন। এ মনোনয়ন এমন কতগুলো বিশেষ গুণের ভিত্তিতে হয়, যেগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে না।

পরবর্তী আয়াতে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত-দাতার ও রসূলের নির্দেশাবলী অমান্য করে আল্লাহ্‌র আযাবকে ডেকে আনে। বলা হয়েছে ঃ

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ

قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ٥

অর্থাৎ তারা কি দেশ-ভ্রমণে বের হয় না, যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের শোচনীয় পরিণতি স্বচক্ষে দেখে নিতে পারে? কিন্তু তারা ইহকালের বাহ্যিক আরাম-আয়েশ ও সাজ-সজ্জায় মত্ত হয়ে পরকাল ভুলে গেছে। অথচ পরহিযগারদের জন্য পরকাল ইহকালের চাইতে অনেক উত্তম। তারা কি এতটুকুও বুঝে না যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ ভাল, না পরকালের চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশ ও নিয়ামত ভাল?

বিধান ও নির্দেশ ঃ অদৃশ্যের সংবাদ ও অদৃশ্যের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য ঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ---এগুলোর সব অদৃশ্যের সংবাদ,

যা আমি আপনাকে ওহীর মাধ্যমে বলি। এ বিষয়বস্তুটি প্রায় এমনি ভাষায় সূরা আলে ইমরানের ৪৩ আয়াতে মরিয়মের কাহিনীতে ব্যক্ত হয়েছে। সূরা হূদের ৪৮ আয়াতে নূহ (আ)-এর ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ

—এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পয়গম্বরদেরকে অদৃশ্যের সংবাদ বলে দেন। বিশেষ করে আমাদের শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে এসব অদৃশ্য সংবাদের বিশেষ অংশ দান করা হয়েছে, যার পরিমাণ পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের তুলনায় বেশী। এ কারণেই তিনি উম্মতকে এমন অনেক ঘটনা বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন, যেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে। 'কিতাবুল ফিতান' শিরোনামে ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন বর্ণনা সম্বলিত বহুসংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী হাদীস-গ্রন্থসমূহে বিস্তর মওজুদ রয়েছে।

সাধারণ মানুষ 'অদৃশ্যের জ্ঞান' বলতে যে কোনরূপে অদৃশ্যের সংবাদ অবগত হওয়াকেই বোঝে। এ গুণ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এ জন্যই তাদের মতে রসূলুল্লাহ্ (সা) 'আলিমুল-গায়ব' (অদৃশ্যে জ্ঞানী) ছিলেন। কিন্তু কোরআন পাক পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ---এতে জানা যায় যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ আলিমুল গায়ব হতে পারে না। এটা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণ। এতে কোন রসূল অথবা ফেরেশ-তাকে শরীক মনে করা তাদেরকে আল্লাহ্র সমতুল্য করার নামান্তর এবং তা খৃস্টানদের অপকর্ম; তারা রসূলকে আল্লাহ্র পুত্র এবং আল্লাহ্র সত্তায় অংশীদার সাব্যস্ত করে। কোরআন পাকের উল্লিখিত আয়াত দ্বারা ব্যাপারটির পূর্ণ স্বরূপ ফুটে উঠেছে যে, অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণ এবং 'আলিমুল-গায়ব', একমাত্র তিনিই। তবে অদৃশ্যের অনেক সংবাদ আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পয়গম্বরগণকে অবহিত করেন। কোরআন পাকের পরিভাষায় একে অদৃশ্যের জ্ঞান বলা হয় না। সাধারণ মানুষ এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি বোঝে না। তারা অদৃশ্যের সংবাদকেই অদৃশ্যের জ্ঞান বলে আখ্যায়িত করে। এরপর কোরআনের পরিভাষায় যখন বলা হয় যে, অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহ্ ছাড়া কারও নেই, তখন তারা এতে দ্বিমত প্রকাশ করতে থাকে। এর স্বরূপ এর বেশি নয় যে ঃ

اختلاف خلق از نام اوفتاد
چوں بمعنی رفت آرام اوفتاد

অর্থ ঃ জনসাধারণের মতভেদ নামের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যখন তাৎ-পর্যে পৌঁছে গেছে, তখন সকল মতভেদ থেমে গেছে।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ

এ আয়াতে পয়গম্বরগণের সম্পর্কে رِجَالًا শব্দের ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে, পয়গম্বর সব সময় পুরুষই হন, নারীদের মধ্যে কেউ নবী কিংবা রসূল হতে পারেন না।

ইবনে কাসীর ব্যাপক সংখ্যক আলিমের এ অভিমত বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন নারীকে নবী কিংবা রসূল নিযুক্ত করেন নি। কোন কোন আলিম কয়েকজন মহিলা সম্পর্কে নবী হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন; উদাহরণত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বিবি সারা, হযরত মূসা (আ)-এর জননী এবং হযরত ঈসা (আ)-এর জননী হযরত মরিয়ম। এ তিনজন মহিলা সম্পর্কে কোরআন পাকে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যদ্দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্র নির্দেশে ফেরেশতারা তাঁদের সাথে বাক্যালাপ করেছে, সুসংবাদ দিয়েছে কিংবা ওহীর মাধ্যমে স্বয়ং তারা কোন বিষয় জানতে পেরেছেন। কিন্তু ব্যাপক সংখ্যক আলিমের মতে এসব আয়াত দ্বারা উপরোক্ত তিন জন মহিলার মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ্র কাছে তাঁদের উচ্চ মর্যাদাশালিনী হওয়া বোঝা যায় মাত্র। এই ভাষা নবুয়ত ও রিসালত প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়।

এ আয়াতেই أَهْلِ الْقُرَىٰ শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণত শহর ও নগরবাসীদের মধ্য থেকে রসূল প্রেরণ করেছেন। অজ্ঞ গ্রাম কিংবা বনাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্য থেকে রসূল প্রেরিত হয় নি। কারণ, সাধারণত গ্রাম বা বনাঞ্চলের অধিবাসীরা স্বভাব-প্রকৃতি ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে নগরবাসীদের তুলনায় পশ্চাদপদ হয়ে থাকেন।
---(ইবনে-কাসীর, কুরতুবী প্রমুখ)

حَتَّىٰٓ إِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١٠﴾ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُّفْتَرَىٰ وَلَٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

(১১০) এমনকি, যখন পয়গম্বরগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন যে, তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পেঁৗছে। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি তারা

উদ্ধার পেয়েছে। আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না। (১১১) তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোন মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্য পূর্বেকার কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ রহমত ও হিদায়ত।

তাফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আযাবের বিলম্ব দেখে যদি তোমরা কাফিরদের উপর আযাব আসবে না বলে সন্দেহ কর, তবে তা তোমাদের ভুল। কারণ, পূর্ববর্তী উম্মতের কাফিরদেরকেও সুদীর্ঘ অবকাশ দেওয়া হয়েছিল।) এমনকি (সময়ের মেয়াদ দীর্ঘ হওয়ার কারণে) রসূলগণ (এ ব্যাপারে) নিরাশ হয়ে গেলেন (যে আমরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কাফিরদের উপর আযাব আসার যে সময় নিজেদের অনুমানের ভিত্তিতে নির্ধারণ করেছিলাম যে, অমুক সময়ে কাফিরদের উপর আযাব আসবে, ফলে আমাদের প্রাধান্য ও সত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে) এবং তাদের প্রবল ধারণা হল যে, (আল্লাহ্‌র ওয়াদার সময় নির্ধারণে) আমরা ভুল করেছি, (কারণ, সুস্পষ্ট বর্ণনা ছাড়াই শুধু ইঙ্গিত অথবা আল্লাহ্‌র সাহায্য দ্রুত আসার কামনা ছাড়াই আমরা নিকটতম সময় নির্ধারণ করেছি, অথচ আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনির্ধারিত। এমন নৈরাশ্যের অবস্থায়) তাদের কাছে আমার সাহায্য আগমন করে (অর্থাৎ কাফিরদের উপর আযাব আসে)। অতঃপর (ঐ আযাব থেকে) আমি যাকে চেয়েছি, তাকে (অর্থাৎ মু'মিনদেরকে) বাঁচানো হয়েছে এবং (এ আযাব দ্বারা কাফিরদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। কারণ) আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায়কে রেহাই দেয় না (বরং তাদেরকে অবশ্যই পাকড়াও করে, যদিও দেরীতে করে থাকে। কাজেই মক্কার কাফিরদেরও ধোঁকায় পড়ে থাকা উচিত নয়)। তাদের (পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও উম্মতদের) কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য (বিরাট) শিক্ষা রয়েছে (অর্থাৎ যারা শিক্ষা অর্জন করে, তারা বুঝতে পারে যে, আনুগত্যের এই পরিমাণ আর অবাধ্যতার এই পরিমাণ)। এ কোরআন (যাতে এসব কাহিনী রয়েছে) কোন মনগড়া কথা নয় (যে, এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যাবে না), বরং এটি পূর্বে অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থসমূহের সমর্থক এবং প্রত্যেক (জরুরী) বিষয়ের বিবরণদাতা এবং ঈমানদারদের জন্য হিদায়ত ও রহমতের উপায়। (সুতরাং এমন গ্রন্থে শিক্ষা গ্রহণের যেসব বিষয়বস্তু থাকবে, সেগুলি দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্যই জরুরী।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পয়গম্বর প্রেরণ ও সত্যের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং পয়গম্বরদের সম্পর্কে কোন কোন সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছিল। উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা পয়গম্বরদের বিরুদ্ধাচরণের অশুভ পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে না। যদি তারা সামান্যও চিন্তা করত এবং পারিপার্শ্বিক শহর ও স্থানসমূহের ইতিহাস পাঠ করত, তবে নিশ্চয়ই জানতে পারত যে, পয়গম্বরগণের বিরুদ্ধাচরণকারীরা এ দুনিয়াতে কিরূপ ভয়ানক পরিণতির সম্মুখীন

হয়েছে। কওমে-লূতের জনপদসমূহ উল্টে দেওয়া হয়েছে। কওমে-আ'দ ও কওমে-সামুদকে নানাবিধ আযাব দ্বারা নাস্তানাবুদ করে দেওয়া হয়েছে। পরকালের আযাব আরও কঠোরতর হবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায়ই ক্ষণস্থায়ী। আসল চিন্তা পরকালের হওয়া উচিত। সেখানকার অবস্থান চিরস্থায়ী এবং সুখ-দুঃখও চিরস্থায়ী। আরও বলা হয়েছে যে, পরকালের সুখ-শান্তি তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাকওয়ার অর্থ শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন করা।

এ আয়াতের লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা দ্বারা বর্তমান লোকদেরকে সতর্ক করা। তাই পরবর্তী আয়াতে তাদের একটি সন্দেহ দূর করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুখে আল্লাহ্র আযাব থেকে ভয় প্রদর্শনের কথা অনেক লোক দীর্ঘ দিন থেকে শুনে আসছিল, কিন্তু তারা কোন আযাব আসতে দেখত না। এতে তাদের দুঃসাহস আরও বেড়ে যায়। তারা বলতে থাকে যে, আযাব যদি আসবারই হত, তবে এতদিনে কবেই এসে যেত। তাই বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় করুণা ও রহস্যবশত অনেক সময় অপরাধী সম্প্রদায়কে অবকাশ দান করেন। এ অবকাশ মাঝে মাঝে এত দীর্ঘতর হয় যে, অবাধ্যদের দুঃসাহস আরও বেড়ে যায় এবং পয়গম্বরগণ এক প্রকার অস্থিরতার সম্মুখীন হন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

حَتّٰىٓ إِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا
فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ○

অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের অবাধ্যদেরকে লম্বা লম্বা অবকাশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের উপর আযাব না আসার কারণে পয়গম্বরগণ এরূপ ধারণা করে নিরাশ হয়ে পড়েছেন যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত আযাবের সংক্ষিপ্ত ওয়াদার যে অবকাশ আমরা নিজেদের অনুমানের ভিত্তিতে স্থির করে রেখেছিলাম, সে সময়ে কাফিরদের উপর আযাব আসবে না এবং সত্যের বিজয় প্রকাশ পাবে না। পয়গম্বরগণ প্রবল ধারণা পোষণ করতে থাকেন, অনুমানের মাধ্যমে আল্লাহ্র ওয়াদার সময় নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমাদের বোধশক্তি ভুল করেছে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তো কোন নির্দিষ্ট সময় বলেন নি। আমরা বিশেষ বিশেষ ইঙ্গিতের মাধ্যমেই একটি সময় নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলাম। এমনকি নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে তাঁদের কাছে আমার সাহায্য এসে যায়, অর্থাৎ ওয়াদা অনুযায়ী কাফিরদের উপর আযাব এসে যায়। অতঃপর এ আযাব থেকে আমি যাকে ইচ্ছা করেছি, বাঁচিয়ে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পয়গম্বরগণের অনুসারী মু'মিনদেরকে বাঁচানো হয়েছে এবং কাফিরদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। কেননা, আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে অপসৃত করা হয় না, বরং আযাব অবশ্যই তাদেরকে পাকড়াও করে। কাজেই আযাবে বিলম্ব দেখে মক্কার কাফিরদের ধোঁকায় পতিত হওয়া উচিত নয়।

এ আয়াতে كُذِبُوا শব্দটি প্রসিদ্ধ কিরাআত অনুযায়ী পাঠ করা হয়েছে। আমরা এর যে তফসীর বর্ণনা করেছি, এটাই অধিকতর স্বীকৃত ও স্বচ্ছ। অর্থাৎ, كُذِبُوا শব্দের সারমর্ম হচ্ছে অনুমান ও ধারণা ভ্রান্ত হওয়া। এটা এক প্রকার ইজতেহাদী ভ্রান্তি। পয়গম্বর-গণের দ্বারা এরূপ ইজতেহাদী ভ্রান্তি সম্ভবপর। তবে পয়গম্বর ও অন্যান্য মুজতাহিদদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পয়গম্বরগণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ব্যাপী এরূপ ভুল ধারণার উপর স্থির থাকার সুযোগ দেওয়া হতো না, বরং তাদেরকে বাস্তব বিষয় জ্ঞাত করে প্রকৃত সত্য ফুটিয়ে তোলা হতো। অন্য মুজতাহিদদের জন্য এরূপ মর্যাদা নেই। হুদায়বিয়ার সন্ধির ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ঘটনা এ বিষয়বস্তুর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কোরআন পাকে উল্লিখিত আছে যে, এ ঘটনার ভিত্তি হচ্ছে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি স্বপ্ন। তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি সাহাবীগণ সমভি-ব্যাহারে খানায়ে কা'বার তওয়াফ করছেন। পয়গম্বরগণের স্বপ্ন ওহীর পর্যায়ভুক্ত। তাই এ ঘটনাটি যে ঘটবে, তা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নে এর কোন বিশেষ সময় বর্ণিত না হওয়ায় রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে অনুমান করে নিলেন যে, এ বছরই এরূপ হবে। তাই যথারীতি ঘোষণার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক সাহাবী সঙ্গে নিয়ে তিনি ওমরার উদ্দেশে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেলেন। কুরাইশরা বাধা দিল। ফলে সে বছর তওয়াফ ও ওমরা সম্পন্ন হল না। বরং দু'বছর পর অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের আকারে স্বপ্নটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবরূপে প্রকাশ পেল। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা সত্য ও নিশ্চিত ছিল। কিন্তু তিনি অনুমান বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে এর যে সময় নির্ধারিত করেছিলেন, তাতে ভুল হয়েছিল। কিন্তু এ ভুল তখনই দূর করে দেওয়া হয়।

এমনিভাবে আয়াতে قَدْ كُذِبُوا শব্দের মর্মও তাই যে, কাফিরদের উপর আযাব আসতে বিলম্ব হয়েছিল এবং পয়গম্বরগণ অনুমানের মাধ্যমে যে সময় মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন সে সময়ে আযাব আসেনি। ফলে তাঁরা ধারণা করেন যে, আমরা সময় নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে ভুল করেছি। এই তফসীরটি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে। আল্লামা তীবী বলেন ঃ এই রেওয়ায়েত নির্ভুল। কারণ, সহীহ্ বুখারীতে তা বর্ণিত আছে।

কোন কোন কিরাআতে এ শব্দটি যাল-এর তশদীদসহ قَدْ كُذِّبُوا -ও পঠিত হয়েছে। كُذِّبُوا ক্রিয়াপদটি تَكْذِيب ধাতু থেকে উদ্ভূত। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, পয়-গম্বরদের অনুমিত সময়ে আযাব না আসার কারণে তাঁরা আশংকা করতে থাকেন যে, এখন যারা মুসলমান, তারাও বুঝি তাঁদের প্রতি মিথ্যারোপ করতে শুরু করে যে, তাঁরা যা কিছু

বলেছিলেন, তা পূর্ণ হল না। এহেন দুর্বিপাকের সময় আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করে দেখালেন। অবিশ্বাসীদের উপর আযাব এসে গেল এবং মু'মিনদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হল। ফলে পয়গম্বরগণের বিজয় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠলো।

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ — অর্থাৎ পয়গম্বরগণের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য বিশেষ শিক্ষা রয়েছে।

এর অর্থ সব পয়গম্বরের কাহিনীতেও হতে পারে এবং বিশেষ করে ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীতেও হতে পারে, যা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। কেননা এ ঘটনায় পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত বান্দাদের কি কি ভাবে সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করা হয় এবং কূপ থেকে বের করে রাজসিংহাসনে এবং দুর্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে সুনামের উচ্চতম শিখরে কিভাবে পৌঁছে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে চক্রান্ত ও প্রতারণাকারীরা পরিণামে কিরূপ অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করে।

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ —অর্থাৎ এ কাহিনী কোন মনগড়া কথা নয়, বরং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থনকারী। কেননা, তওরাত ও ইনজীলেও এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ বলেন : যতগুলো আসমানী গ্রন্থ ও সহীফা অবতীর্ণ হয়েছে, ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী থেকে কোনটিই খালি নয়।—(মাযহারী)

وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ —অর্থাৎ এ কোরআন সব বিষয়েরই বিস্তারিত বিবরণ। অর্থাৎ, কোরআন পাকে এমন প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণ রয়েছে, যা, ধর্মীয় ক্ষেত্রে মানুষের জন্য জরুরী। ইবাদত, লেনদেন, চরিত্র, সামাজিকতা, রাষ্ট্র পরিচালনা, রাজনীতি ইত্যাদি মানবজীবনের প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধান ও নির্দেশ এতে রয়েছে। আরও বলা হয়েছে : এ কোরআন ঈমানদারদের জন্য হিদায়ত ও রহমত। এতে বিশেষ করে ঈমানদারদের কথা বলার কারণ এই যে, উপকারিতা ঈমানদারগণই পেতে পারেন। যদিও কাফিরদের জন্যও কোরআন রহমত ও হিদায়ত, কিন্তু তাদের কুকর্ম ও অবাধ্যতার কারণে এ রহমত ও হিদায়ত তাদের পক্ষে শাস্তির কারণ হয়ে যায়।

শায়খ আবূ মনসূর বলেন : সমগ্র সূরা ইউসুফ এবং এতে সন্নিবেশিত কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা প্রদান করা যে, স্বজাতির হাতে আপনি যেসব নির্যাতন ভোগ করছেন, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও সেগুলো ভোগ করেছেন। কিন্তু পরিণামে আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরগণকেই বিজয়ী করেছেন। আপনার ব্যাপারটিও তদ্রূপই হবে।

سورة الرعد

সূরা রা'দ

মক্কায় অবতীর্ণ, ৪৩ আয়াত, ৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ
عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ
كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ
بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ﴿٢﴾ وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا
رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ
يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٣﴾ وَفِي الْاَرْضِ
قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ
صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۙ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي
الْاُكُلِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٤﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আলিফ-লাম-মীম-রা, এগুলো কিতাবের আয়াত। যা কিছু আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না। (২) আল্লাহ্, যিনি উর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমণ্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত। তোমরা সেগুলো দেখ। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে

কর্মে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন, নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। (৩) তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দু' দু' প্রকার সৃষ্টি রেখেছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন। এতে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা করে। (৪) এবং যমীনে বিভিন্ন শস্যক্ষেত্র রয়েছে—একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন এবং আঙ্গুরের বাগান আছে আর শস্য ও খর্জুর রয়েছে—একটির মূল অপরটির সাথে মিলিত এবং কতক মিলিত নয়। এগুলোকে একই পানি দেওয়া হয়। আমি স্বাদে একটিকে অপরটির চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দেই। এগুলোর মধ্যে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তাভাবনা করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলিফ-লাম-মীম-রা—(এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন)। এগুলো (অর্থাৎ যেগুলো আপনি শুনছেন) আয়াত এক মহা-গ্রন্থের (অর্থাৎ কোরআনের)। এবং যা কিছু আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতরণ করা হয়, তা সম্পূর্ণ সত্য (এবং তা বিশ্বাস করা সবার উচিত ছিল) কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না। (এ পর্যন্ত কোরআনের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তওহীদের বিষয়বস্তু বর্ণিত হচ্ছে, যা কোরআনের প্রধান লক্ষ্য।) আল্লাহ্ এমন (শক্তিশালী) যে তিনি আকাশসমূহকে খুঁটি ব্যতীতই ঊর্ধ্বদেশে উন্নীত করে দিয়েছেন। তোমরা এগুলোকে (অর্থাৎ আকাশসমূহকে এমনিভাবে) দেখছ। অতঃপর (স্বীয় সিংহাসনে) আরশের উপর (এমনভাবে) অধিষ্ঠিত (ও বিরাজমান) হয়েছেন (যা তাঁর অবস্থার পক্ষে উপযুক্ত)। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। (এতদুভয়ের মধ্যে) প্রত্যেকটি (নিজ নিজ কক্ষপথে) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চলমান হয়। তিনিই (আল্লাহ্) প্রত্যেক কাজ (যা কিছু ঘটে) পরিচালনা করেন, (এবং সৃষ্টিগত ও আইনগত) প্রমাণাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেন—যাতে তোমরা আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতে (অর্থাৎ কিয়ামতে) বিশ্বাসী হও। (এর সম্ভাব্যতার বিশ্বাস এভাবে যে, আল্লাহ্ যখন এমন বিরাট বিরাট বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম, তখন মৃতকে জীবিত করতে কেন সক্ষম হবেন না? বাস্তবতার বিশ্বাস এভাবে যে, সত্যবাদী সংবাদদাতা একটি সম্ভাব্য বিষয়ের বাস্তবতা সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। অবশ্যই তা সত্য ও নির্ভুল।) এবং তিনই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং এতে (ভূমণ্ডলে) পাহাড় ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন এবং এতে সব রকম ফলের মধ্যে দু' দু' প্রকার পয়দা করেছেন। উদাহরণত টক ও মিষ্ট অথবা ছোট ও বড়। কোনটির এক রঙ ও কোনটি ভিন্ন রঙ। এবং রাত্রি দ্বারা (অর্থাৎ রাত্রির আঁধার দ্বারা) দিন (-এর উজ্জ্বলতা)-কে আচ্ছন্ন করে দেন। (অর্থাৎ রাতের আঁধারের কারণে দিনের আলো আচ্ছাদিত ও দূর হয়ে যায়। উল্লিখিত) এসব বিষয়ের মধ্যে চিন্তাশীলদের (বোঝার) জন্য (তওহীদের) প্রমাণাদি (বিদ্যমান) রয়েছে। (এর বিস্তারিত বির্ণনা দ্বিতীয় পারার

চতুর্থ রুকূর শুরুতে দ্রষ্টব্য।) এবং (এমনিভাবে তওহীদের আরও প্রমাণাদি আছে। সেমতে) যমীনে পাশাপাশি (এবং এতদসত্ত্বেও) বিভিন্ন খণ্ড রয়েছে (এগুলোর সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া বিশিষ্ট হওয়া বিস্ময়কর ব্যাপার বটে)। আর আঙ্গুরের বাগান আছে এবং (বিভিন্ন) শস্যক্ষেত্র রয়েছে এবং খর্জুর—(বৃক্ষ) আছে। এগুলোর মধ্যে কতক এমন যে, একটি কাণ্ড উপরে পৌঁছে দু'কাণ্ড হয়ে যায় এবং কতকের মধ্যে দু'কাণ্ড হয় না; (বরং মূল থেকে ডালা পর্যন্ত এক কাণ্ডই উঠে যায় এবং) সবগুলোকে একই পানি সিঞ্চন করা হয়। (এতদসত্ত্বেও) আমি এক প্রকার ফলকে অন্য প্রকার ফলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেই। এসব (উল্লিখিত) বিষয়ের মধ্যে (ও) বুদ্ধিমানদের (বোঝার) জন্য (তওহীদের) প্রমাণাদি (বিদ্যমান) আছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এতে সর্বমোট ৪৩টি আয়াত রয়েছে। এ সূরায়ও কোরআন পাকের সত্যতা, তওহীদ ও রিসালাতের বর্ণনা এবং বিভিন্ন সন্দেহের উত্তর উল্লিখিত হয়েছে।

الٓمّٓرٰ—এগুলো খণ্ড বর্ণ। এসবের অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। উম্মতকে এর অর্থ বলা হয়নি। সর্বসাধারণের পক্ষে এর পেছনে পড়াও সমীচীন নয়।

হাদীসও কোরআনের মত আল্লাহ্র ওহী ঃ প্রথম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআন পাক আল্লাহ্র কালাম এবং সত্য। কিতাব অর্থ কোরআনকেই বোঝানো হয়েছে এবং وَالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ বলেও কোরআন বোঝান যেতে পারে। কিন্তু عطف-এবং وَاوْ অক্ষরটি বাহ্যত বোঝায় যে, কিতাব এবং اَلَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ—দুটি পৃথক পৃথক বস্তু। এমতাবস্থায় কিতাবের অর্থ কোরআন এবং اَلَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ-এর অর্থ ঐ ওহী হবে, যা কোরআন ছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এসেছে। কেননা এবিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে যে ওহী আসত, তা শুধু কোরআনেই সীমাবদ্ধ নয়। স্বয়ং কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى—অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের খেয়াল খুশি আনুযায়ী কোন কিছু বলেন না; বরং তাঁর উক্তি একটি ওহী, যা আল্লাহ্র

পক্ষ থেকে তাঁর কাছে প্রেরিত হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কোরআন ছাড়া অন্য যেসব বিধি-বিধান দিয়েছেন, সেগুলোও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। পার্থক্য এতটুকু যে, কোরআনের তিলাওয়াত করা হয় এবং সেগুলোর তিলাওয়াত হয় না। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, কোরআনের অর্থ ও শব্দ উভয়টি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং কোরআন ছাড়া হাদীসে যে সব বিধি-বিধান রয়েছে, সেগুলোরও অর্থ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, কিন্তু শব্দ অবতীর্ণ নয়। এ জন্যই নামাযে এগুলোর তিলাওয়াত হয় না।

অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, এই কোরআন এবং যেসব বিধি-বিধান আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়, সেগুলো সব সত্য এবং সন্দেহের অবকাশমুক্ত কিন্তু অধিকাংশ লোক চিন্তাভাবনা করার কারণে তা বিশ্বাস করে না।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব ও তওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি ও কারিগরির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বিশ্বাস করতে হবে যে, এগুলোর এমন একজন স্রষ্টা আছেন যিনি সর্বশক্তিমান এবং সমগ্র সৃষ্টজগত যাঁর মুঠোর মধ্যে।

বলা হয়েছে ঃ اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا—অর্থাৎ আল্লাহ্ এমন, যিনি আকাশসমূহকে সুবিস্তৃত ও বিশাল গম্বুজাকার খুঁটি ব্যতীত উচ্চে উন্নীত রেখেছেন যেমন তোমরা আকাশসমূহকে এ অবস্থাই দেখ।

আকাশের দেহ দৃষ্টিগোচর হয় কি? সাধারণত বলা হয় যে, আমাদের মাথার উপরে যে নীল রঙ দৃষ্টিগোচর হয় তা আকাশের রঙ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন ঃ আলো ও অন্ধকারের সংমিশ্রণে এই রঙ অনুভূত হয়। নিচে তারকারাজীর আলো এবং এর উপরে অন্ধকার। উভয়ের সংমিশ্রণে বাইরে থেকে নীল রঙ অনুভূত হয়; যেমন গভীর পানিতে আলো বিচ্ছুরিত হলে তা নীল দেখা যায়। কোরআন পাকের কতিপয় আয়াতে আকাশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন এ আয়াতে تَرَوْنَهَا বলা হয়েছে এবং অন্য এক আয়াতে اِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ বলা হয়েছে। বিজ্ঞানীর বক্তব্য প্রথমত এর পরিপন্থী নয়। কেননা এটা সম্ভব যে, আকাশের রঙও নীলাভ হবে অথবা অন্য কোন রঙ হবে; কিন্তু মধ্যস্থলে আলো ও অন্ধকারের মিশ্রণের ফলে নীল দৃষ্টিগোচর হবে। শূন্যের রঙের মধ্যে যে আকাশের রঙও শামিল রয়েছে, এ কথা অস্বীকার করার কোন প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত কোরআন পাকে যেখানে আকাশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে অ-প্রাকৃত দেখাও অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ আকাশের অস্তিত্ব নিশ্চিত যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। ফতে তা যেন চাক্ষুষ দেখার মতই। —(রাহুল-মাআনী)

এরপর বলা হয়েছে ঃ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ — অর্থাৎ অতঃপর আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত ও বিরাজমান হলেন, যা সিংহাসনের অনুরূপ। এ বিরাজমান হওয়ার স্বরূপ কারও বোধগম্য নয়। এতটুকু বিশ্বাস রাখা যথেষ্ট যে, যেরূপ বিরাজমান হওয়া তাঁর পক্ষে উপযুক্ত, সেইরূপেই বিরাজমান রয়েছেন।

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রকে আজ্ঞাধীন করেছেন। প্রত্যেকটিই একটি নির্দিষ্ট গতিতে চলে।

আজ্ঞাধীন করার অর্থ এই যে, উভয়কে যে যে কাজে নিয়োজিত করেছেন, তারা অহর্নিশ তা করে যাচ্ছে। হাজারো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু কোন সময় তাদের গতি চুল পরিমাণ কম-বেশি হয়নি। তারা ক্লান্ত হয় না এবং কোন সময় নিজের নির্দিষ্ট কাজ ছেড়ে অন্য কাজে লিপ্ত হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের দিকে ধাবিত হওয়ার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা সমগ্র বিশ্বের জন্য নির্ধারিত সময় অর্থাৎ কিয়ামতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর তাদের গোটা ব্যবস্থাপনা তছনছ হয়ে যাবে।

আরেকটি সম্ভাব্য অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক গ্রহের জন্য একটি বিশেষ গতি ও বিশেষ কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তারা সবসময় নিজ নিজ কক্ষপথে নির্ধারিত গতিতে চলমান থাকে।

এ সব গ্রহের এক-একটির আয়তন পৃথিবীর চাইতে বহুগুণ বড়। এগুলো বিশেষ কক্ষপথে বিশেষ গতিতে হাজারো বছর যাবত একই ভঙ্গিতে চলমান রয়েছে। এদের কলকব্জা কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, ভাঙ্গে না এবং মেরামতেরও প্রয়োজন দেখা দেয় না। বিজ্ঞানের বর্তমান চূড়ান্ত উন্নতির পরও মানব নির্মিত বস্তুসমূহের মধ্যে এদের পূর্ণ নজির দূরের কথা, হাজার ভাগের এক ভাগ পাওয়াও অসম্ভব। প্রকৃতির এই ব্যবস্থাপনা উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলছে যে, এর পেছনে এমন একজন স্রষ্টা ও পরিচালক রয়েছেন, যিনি মানুষের অনুভূতি ও চেতনার বহু ঊর্ধ্বে।

প্রত্যেক কাজের পরিচালক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা, মানবীয় পরিচালনা নামেমাত্র ঃ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ——অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করেন। সাধারণত মানুষ নিজের কলাকৌশলের জন্য গর্ববোধ করে, কিন্তু একটু চোখ খুলে দেখলেই বোঝা যাবে যে, তার কলাকৌশল কোন বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলার সৃজিত বস্তুসমূহের নির্ভুল ব্যবহার বুঝে নেওয়াই তার কলাকৌশলের শেষ গন্তব্য। জাগতিক বস্তুসামগ্রী ব্যবহার করার যে ব্যবস্থা, তাও মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। কেননা, মানুষ প্রত্যেক কাজে অন্য হাজারো মানুষ, জানোয়ার ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মুখাপেক্ষী, যেগুলোকে সে নিজ কলাকৌশলের মাধ্যমে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে না।

আল্লাহ্র শক্তিই প্রত্যেক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছে যে, আপনা-আপনি এসে জড়ো হয়। আপনার গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন হলে স্থপতি থেকে শুরু করে রঙ পালিশকারী সাধারণ কর্মী পর্যন্ত শত শত মানুষ নিজেদের শারীরিক সামর্থ্য ও কারিগরী বিদ্যা নিয়ে আপনার সেবা করতে প্রস্তুত দেখা যাবে। বহু দোকানে বিক্ষিপ্ত নির্মাণ-সামগ্রী আপনি নিজ প্রয়োজনে প্রস্তুত পাবেন। কিন্তু নিজস্ব অর্থ অথবা কলাকৌশলের জোরে এসব বস্তুর মূল উপাদান সৃষ্টি করতে এবং সব মানুষকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ ও কারিগরী প্রতিভা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে আপনি সক্ষম হবেন কি? আপনি কেন, কোন বৃহত্তর সরকারও আইনের জোরে এ ব্যবস্থা কায়েম করতে পারে না। নিঃসন্দেহে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদান এবং তদ্দ্বারা বিশ্বব্যবস্থার নিখুঁত পরিচালনা একমাত্র চিরঞ্জীব ও মহা ব্যবস্থাপক আল্লাহ্রই কাজ। মানুষ একে নিজের কলাকৌশল মনে করলে তা মূর্খতা বৈ আর কিছু হবে না।

يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ—অর্থাৎ তিনি আয়াতসমূহকে তন্ন তন্ন করে বর্ণনা করেন।

এর অর্থ কোরআনের আয়াতসমূহ হতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো নাযিল করেছেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাধ্যমে তা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন।

অথবা আলোচ্য আয়াতের অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির নিদর্শনাবলীও হতে পারে। অর্থাৎ আসমান, যমীন ও স্বয়ং মানুষের অস্তিত্ব, এগুলো বিস্তারিতভাবে সর্বদা ও সর্বত্র মানুষের দৃষ্টির সামনে বিদ্যমান রয়েছে।

لَعَلَّكُمْ بِلِقَاۗءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ—অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও তার বিস্ময়কর পরিচালন-ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা এজন্য কায়েম করেছেন, যাতে তোমরা চিন্তাভাবনা করে পরকাল ও কিয়ামতে বিশ্বাসী হও। কেননা, এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা ও সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করার পর পরকালে মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করাকে আল্লাহ্র শক্তি বহির্ভূত মনে করা সম্ভবপর হবে না। যখন শক্তির অন্তর্ভুক্ত ও সম্ভবপর বোঝা যাবে, তখন দেখতে হবে যে, এ সংবাদ এমন একজন ব্যক্তি দিয়েছেন, যিনি জীবনে কোন দিন মিথ্যা বলেন নি। কাজেই তা বাস্তবতাসম্পন্ন ও প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ থাকতে পারে না।

وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا—তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে ভারী পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন।

ভূমণ্ডলের বিস্তৃতি তার গোলাকৃতির পরিপন্থী নয়। কেননা, গোলাকার বস্তু যদি অনেক বড় হয়, তবে তার প্রত্যেকটি অংশ একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠের মতই দৃষ্টিগোচর হয়। কোরআন পাক সাধারণ মানুষকে তাদের দৃষ্টিকোণে সম্বোধন করে। বাহ্যদর্শী ব্যক্তি পৃথিবীকে একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠরূপে দেখে। তাই একে বিস্তৃত করা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখা ও অন্যান্য অনেক উপকারিতার জন্য

এর উপর সুউচ্চ ও ভারী পাহাড় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এসব পাহাড় একদিকে ভূ-পৃষ্ঠের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং অন্যদিকে সমগ্র সৃষ্টজীবকে পানি পৌঁছাবার ব্যবস্থা করে। পানির বিরাট ভাণ্ডার পাহাড়ের শৃঙ্গে বরফ আকারে সঞ্চিত রাখা হয়। এর জন্য কোন চৌবাচ্চা নেই। এবং তা তৈরী করারও প্রয়োজন নেই। অপবিত্র বা দূষিত হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। অতঃপর একে একটি ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক ফল্গুধারার সাহায্যে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এ ফল্গুধারা থেকেই কোথাও প্রকাশ্য নদ-নদী ও খাল-বিল নির্গত হয় এবং কোথাও ভূগর্ভেই লুকিয়ে থাকে। অতঃপর কূপের মাধ্যমে এ ফল্গুধারার সন্ধান করে তা থেকে পানি উত্তোলন করা হয়।

وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ—অর্থাৎ এ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নানাবিধ ফল উৎপন্ন করছেন এবং প্রত্যেক ফলের দু' দু' প্রকার সৃষ্টি করছেনঃ লাল, সাদা, টক-মিষ্টি। زَوْجَيْنِ-এর অর্থ দু' না হয়ে একাধিক প্রকারও হতে পারে, যেগুলোর সংখ্যা কমপক্ষে দুই হবে। তাই বিষয়টা زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। زَوْجَيْنِ-এর অর্থ নর ও মাদী হওয়াও অসম্ভব নয়। যেমন, অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, অনেক বৃক্ষ নর ও মাদী হয়। উদাহরণত খেজুর, পেঁপে ইত্যাদি। অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যেও এরূপ সম্ভাবনা আছে ; যদিও গবেষণা এখনো এতটা অগ্রসর হয়নি।

يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ— অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই রাত্রি দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। অর্থাৎ দিনের আলোর পর রাত্রি নিয়ে আসেন ; যেমন কোন উজ্জ্বল বস্তুকে পর্দা দ্বারা আবৃত করে দেওয়া হয়।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ—নিঃসন্দেহে সমগ্র সৃষ্টি ও তার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে।

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۚ

অর্থাৎ অনেক ভূমি খণ্ড পরস্পর সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে বিভিন্নরূপ। কোনটি উর্বর জমি ও কোনটি অনুর্বর, কোনটি নরম ও কোনটি শক্ত এবং কোনটি শস্যের উপযোগী এবং কোনটি বাগানের উপযোগী। এসব ভূখণ্ডে রয়েছে আঙুরের বাগান, শস্য ক্ষেত্র এবং খেজুর বৃক্ষ; তন্মধ্যে কোন বৃক্ষ এমন যে এক কাণ্ড উপরে পেঁছে দু'কাণ্ড হয়ে যায়, যেমন সাধারণ বৃক্ষ এবং কোনটিতে এক কাণ্ডই থাকে; যেমন খেজুর বৃক্ষ ইত্যাদি।

এসব ফল একই জমিতে উৎপন্ন হয় একই পানি দ্বারা সিক্ত হয় এবং চন্দ্র ও সূর্যের কিরণ ও বিভিন্ন প্রকার বাতাসও সবাই এক রকম পায়; কিন্তু এ সত্ত্বেও এসবের রঙ ও স্বাদ বিভিন্ন এবং আকারের ছোট ও বড়।

সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও নানা ধরনের বিভিন্নতা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, একই উৎস থেকে উৎপন্ন বিচিত্রধর্মী এসব ফল-ফসলের সৃষ্টি কোন একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সত্তার আদেশের অধীনে চালু রয়েছে—শুধু বস্তুর রূপান্তরে নয়; যেমন এক শ্রেণীর অজ্ঞ লোক তাই মনে করে। কেননা, নিছক বস্তুর রূপান্তর হলে সব বস্তু অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এ বিভিন্নতা কিরূপে হত। একই জমি থেকে এক ফল এক ঋতুতে উৎপন্ন হয় এবং অন্য ফল অন্য ঋতুতে। একই বৃক্ষে একই ডালে বিভিন্ন প্রকার ছোট বড় এবং বিভিন্ন স্বাদের ফল ধরে।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ—নিঃসন্দেহে এতে আল্লাহ্‌র শক্তি, মাহাত্ম্য ও একত্বের অনেক নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানের জন্য। এতে ইঙ্গিত আছে যে, যারা এসব বিষয়ে চিন্তা করে না, তারা বুদ্ধিমান নয়—যদিও দুনিয়াতে তারা বুদ্ধিমান ও সমঝদার বলে কথিত হয়।

وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۬ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۞ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ؕ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ

إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَىْءٍ عِندَهُۥ بِمِقْدَارٍ ۝

(৫) যদি আপনি বিস্ময়ের বিষয় চান, তবে তাদের একথা বিস্ময়কর যে, আমরা যখন মৃত্তিকা হয়ে যাব, তখনও কি নতুনভাবে সৃজিত হব? এরাই স্বীয় পালনকর্তার সত্তায় অবিশ্বাসী হয়ে গেছে, এদের গর্দানেই লৌহ-শৃংখল পড়বে এবং এরাই দোযখী, এরা তাতে চিরকাল থাকবে। (৬) এরা আপনার কাছে মঙ্গলের পরিবর্তে দ্রুত অমঙ্গল কামনা করে। তাদের পূর্বে অনুরূপ অনেক শাস্তিপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী অতিক্রান্ত হয়েছে। আপনার পালনকর্তা মানুষকে তাদের অন্যায় সত্ত্বেও ক্ষমা করেন এবং আপনার পালনকর্তা কঠিন শাস্তিদাতাও বটেন। (৭) কাফিররা বলে: তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? আপনার কাজ তো ভয় প্রদর্শন করাই এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক হয়েছে। (৮) আল্লাহ্ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা সঙ্কুচিত ও বর্ধিত হয়। এবং তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে মুহাম্মদ,) যদি আপনি (তাদের কিয়ামত অস্বীকার করার কারণে) আশ্চর্যান্বিত হন, তবে (বাস্তবিকই) তাদের এ উক্তি আশ্চর্যান্বিত হওয়ার যোগ্য যে, যখন আমরা (মরে) মৃত্তিকা হয়ে যাব, তখন (মৃত্তিকা হয়ে) আমরা আবার কি কিয়ামতে নতুনভাবে সৃজিত হব? (আশ্চর্যান্বিত হওয়ার যোগ্য এ কারণে যে, যে সত্তা উপরোক্ত বস্তুসমূহ সৃষ্টি করতে প্রথমত সক্ষম, পুনর্বার সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে কেন কঠিন হবে? এ থেকেই পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করার জওয়াব হয়ে গেছে এবং নবুয়ত অস্বীকার করার জওয়াবও এতেই নিহিত রয়েছে। কেননা, পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করার উপরই এটি ভিত্তিশীল। ফলে প্রথমটির জওয়াব দ্বারা দ্বিতীয়টির জওয়াব হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের জন্য আযাবের সতর্কবাণী বর্ণিত হয়েছে যে) এরাই স্বীয় পালনকর্তার সাথে কুফরী করেছে। (কেননা পুনরুত্থানের অস্বীকৃতি দ্বারা পালনকর্তার শক্তি ও ক্ষমতা অস্বীকার করেছে এবং কিয়ামত অস্বীকার করা দ্বারা নবুয়ত অস্বীকার করা জরুরী হয়ে পড়ে।) এবং এদের গর্দানে (কিয়ামতে) শৃঙ্খল পরানো হবে এবং তারা দোযখী। তারা তাতে চিরকাল থাকবে। এরা বিপদ মুক্ততার (মেয়াদ শেষ হওয়ার) পূর্বে আপনার কাছে বিপদের (অর্থাৎ বিপদ নাযিল হওয়ার) তাগাদা করে (যে, আপনি নবী হলে আযাব এনে দিন। এতে বোঝা যায় যে, তারা আযাবকে খুব অবান্তর মনে করে) অথচ তাদের পূর্বে (অন্য কাফিরদের উপর) শাস্তির ঘটনাবলী ঘটেছে। (সুতরাং তাদের উপর শাস্তি এসে যাওয়া অসম্ভব কি?) এবং (আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু—একথা শুনে তারা যেন ধোঁকায় না পড়ে যে তাহলে আমদের আর কোন আযাব

হবে না। কেননা, তিনি শুধু ক্ষমাশীল দয়ালুই নন এবং সবার জন্যই ক্ষমাশীল দয়ালু নন, বরং উভয় গুণ যথাস্থানে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ) এটা নিশ্চিত যে, আপনার পালনকর্তা মানুষের অপরাধ তাদের (বিশেষ পর্যায়ের) অন্যায় সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেন এবং এটাও নিশ্চিত যে, আপনার পালনকর্তা কঠোর শাস্তি দেন। (অর্থাৎ তাঁর মধ্যে উভয় গুণ রয়েছে এবং প্রত্যেকটি প্রকাশ পাওয়ার শর্ত ও কারণ রয়েছে। অতএব, কাফিররা কারণ ছাড়াই নিজেদেরকে দয়া ও ক্ষমার যোগ্য কিরূপে মনে করে নিয়েছে; বরং কুফরীর কারণে তোমাদের পক্ষে আল্লাহ্ (তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা)। এবং কাফিররা (নবুয়ত অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে) বলে: তাঁর প্রতি বিশেষ মু'জিযা (যা আমরা চাই) কেন নাযিল করা হল না? (তাদের এ আপত্তি নিরেট নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা, আপনি মু'জিযার মালিক নন, বরং) আপনি শুধু (আল্লাহ্‌র আযাব থেকে কাফিরদেরকে) ভীতি প্রদর্শনকারী (নবী। আর নবীর জন্য বিশেষ মু'জিযার প্রয়োজন নেই—যে কোন মু'জিযা হলেই চলে, যা প্রকাশিত হয়ে গেছে।) এবং (আপনি কোন একক নবী হন নি। বরং অতীতে) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথ প্রদর্শক হয়েছে। (তাদের মধ্যেও এ রীতিই প্রচলিত ছিল যে, নবুয়ত দাবী করার জন্য যে কোন প্রমাণকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে—বিশেষ প্রমাণ জরুরী মনে করা হয়নি।) আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যা কিছু নারী গর্ভে ধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা সংকোচন ও বর্ধন হয়। আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যেক বস্তু বিশেষ পরিমাণ নিয়ে আছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রথম তিন আয়াতে কাফিরদের নবুয়ত সম্পর্কিত সন্দেহের জওয়াব রয়েছে এবং এর সাথে অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তির সতর্কবাণী বর্ণিত হয়েছে।

কাফিরদের সন্দেহ ছিল তিনটি। এক. তারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন এবং হাশরের হিসাব-কিতাবকে অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করত। এ কারণেই তারা পরকালের সংবাদদাতা পয়গম্বরগণকে অবিশ্বাসযোগ্য এবং তাঁদের নবুয়ত অস্বীকার করত। কোর-আন পাকের এক আয়াতে তাদের এ সন্দেহ বর্ণনা করে বলা হয়েছে: هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ তারা এসব কথা দ্বারা পয়গম্বরগণের প্রতি উপহাস করার জন্য বলত: এস, আমরা তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির কথা বলি, যে বলে যে, তোমরা যখন মৃত্যুর পর খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে এবং ধূলিকণা হয়ে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়বে, তখন তোমাদেরকে আবার নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে।

মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রমাণ: আলোচ্য প্রথম আয়াতে তাদের এ সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে:

وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ

এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ আপনি আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, কাফিররা আপনার সুস্পষ্ট মু'জিযা এবং নবুয়তের প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও আপনার নবুয়ত স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে তারা নিষ্প্রাণ ও চেতনাহীন পাথরকে উপাস্য মানে, যে পাথর নিজের উপকার ও ক্ষতি করতেও সক্ষম নয়, অপরের উপকার ও ক্ষতি কিরূপে করবে?

কিন্তু এর চাইতে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তাদের এই উক্তি যে, আমরা মৃত্যুর পর যখন মাটি হয়ে যাব, তখন দ্বিতীয়বার আমাদেরকে কিরূপে সৃষ্টি করা হবে? এটা কি সম্ভবপর? কোরআন পাক এ আশ্চর্যের কারণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেনি। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্র অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে প্রমাণিত করা হয়েছে যে, তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সমগ্র সৃষ্টজগতকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, অতঃপর প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যে এমন রহস্য নিহিত রেখেছেন, যা অনুভব করাও মানুষের সাধ্যাতীত। বলাবাহুল্য যে সত্তা প্রথমবার কোন বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনতে পারেন তাঁর পক্ষে পুনর্বার অস্তিত্বে আনা কিরূপে কঠিন হতে পারে? কোন নতুন বস্তু তৈরী করা মানুষের পক্ষেও প্রথমবার কঠিন মনে হয়, কিন্তু পুনর্বার তৈরী করতে চাইলে সহজ হয়ে যায়।

আশ্চর্যের বিষয়, কাফিররা এ কথা বিশ্বাস করে যে, প্রথমবার সমগ্র বিশ্বকে অসংখ্য হিকমতসহ আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। এরপর পুনর্বার সৃষ্টি করাকে তারা কিরূপে অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করে?

সম্ভবত অবিশ্বাসীদের কাছে বড় প্রশ্ন যে, মরে মাটি হয়ে যাওয়ার পর মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধূলিকণার আকারে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। বায়ু এসব ধূলিকণাকে কোথা থেকে কোথায় পেঁৗছে দেয়। অতঃপর কিয়ামতের দিন এসব ধূলিকণাকে কিরূপে একত্রিত করা হবে, একত্রিত করে কিরূপে জীবিত করা হবে?

কিন্তু তারা দেখে না যে, তাদের বর্তমান অস্তিত্বের মধ্যে সারা বিশ্বের কণা একত্রিত নয় কি? বিশ্বের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বস্তুসমূহ, পানি, বায়ু ও এদের আনীত কণা মানুষের খাদ্যের মধ্যে শামিল হয়ে তার দেহের অংশে পরিণত হয়। এ বেচারী অনেক সময় জানেও না যে, যে লোকমাটি সে মুখে পুরছে, তাতে কতগুলো কণা আফ্রিকার কতগুলো আমেরিকার এবং কতগুলো প্রাচ্য দেশসমূহের রয়েছে? যে সত্তা অপারশক্তি ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে সারা বিশ্বের বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একত্রিত করে, এমন মানুষ ও জন্তুর অস্তিত্ব খাড়া করেছেন, আগামীকাল এসব কণা একত্রিত করা তাঁর পক্ষে কেমন মুশকিল হবে? অথচ বিশ্বের সমস্ত শক্তি—পানি, বায়ু ইত্যাদি তাঁর আজ্ঞাবহ। তাঁর ইঙ্গিতে বায়ু তার ভিতরকার, পানি তার ভিতরকার এবং শূন্য তার ভিতরকার সব কণা যদি একত্রিত করে দেয়, তবে তা অবিশ্বাস্য হবে কেন?

সত্যি বলতে কি, কাফিররা আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও মহিমাকে চিনতেই পারেনি। তারা নিজেদের শক্তির নিরিখে আল্লাহ্র শক্তিকে বোঝে। অথচ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব বস্তু আপন মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক সচেতন এবং আল্লাহ্ তা'আলার আজ্ঞাধীন।

خاک و باد و آب و آتش زنده اند
با من و تو مرده با حق زنده اند

মোটকথা, সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও কাফিরদের পক্ষে নবুয়ত অস্বীকার করা যেমন আশ্চর্যের বিষয়, তার চাইতেও অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কিয়ামতে পুনর্জীবন ও হাশরের দিন অস্বীকার করা।

এরপর অবিশ্বাসীদের শাস্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এরা শুধু আপনাকেই অস্বীকার করে না ; বরং প্রকৃতপক্ষে পালনকর্তাকে অস্বীকার করে। তাদের শাস্তি এই যে, তাদের গর্দানে লৌহশৃখল পরানো হবে এবং তারা চিরকাল দোযখে বাস করবে।

কাফিরদের দ্বিতীয় সন্দেহ ছিল এই : যদি বাস্তবিকই আপনি আল্লাহ্র রসূল হয়ে থাকেন, তবে রসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আপনি যেসব শাস্তির কথা শুনান, সেগুলো আসে না কেন? দ্বিতীয় আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে :

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ

وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ -

অর্থাৎ তারা বিপদমুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে আপনার কাছে বিপদ নাযিল হওয়ার তাগাদা করে (যে আপনি নবী হয়ে থাকলে তাৎক্ষণিক আযাব এনে দিন। এতে বোঝা যায় যে, তারা আযাব আসাকে খুবই অবান্তর অথবা অসম্ভব মনে করে)। অথচ তাদের পূর্বে অন্য কাফিরদের উপর অনেক আযাব এসেছে। সকলেই তা প্রত্যক্ষ করেছে। এমতাবস্থায় ওদের উপর আযাব আসা অবান্তর হল কিরূপে? এখানে مَثُلٰتُ শব্দটি مَثُلَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ অপমানকর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।

এরপর বলা হয়েছে : নিশ্চিতই আপনার পালনকর্তা মানুষের গোনাহ্ ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। যারা এ ক্ষমা ও দয়া দ্বারা উপকৃত হয় না এবং অবাধ্যতায় ডুবে থাকে, তাদের জন্য তিনি কঠোর শাস্তিদাতাও। কাজেই কোনরূপ ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত থাকা উচিত নয় যে, আল্লাহ্ যখন ক্ষমাশীল, দয়ালু তখন আমাদের উপর কোন আযাব আসতেই পারে না।

কাফিরদের তৃতীয় সন্দেহ ছিল এই : আমরা রসূল (সা)-এর অনেক মু'জিযা দেখেছি কিন্তু বিশেষ ধরনের যেসব মু'জিযা আমরা দেখতে চাই, সেগুলো তিনি প্রকাশ করেন না কেন? এর উত্তর তৃতীয় আয়াতে দেওয়া হয়েছে :

يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ -

অর্থাৎ কাফিররা আপনার নবুয়তের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলে যে, আমরা যে বিশেষ মু'জিযা দেখতে চাই; তা তাঁর উপর নাযিল করা হল না কেন? এর উত্তর এই যে, মু'জিযা জাহির করা পয়গম্বরের ইচ্ছাধীন নয়; বরং এটা সরাসরি আল্লাহ্র কাজ। তিনি যখন যে ধরনের মু'জিযা প্রকাশ করতে চান, করেন। তিনি কারও দাবী ও খায়েশ পূরণ করতে বাধ্য নন। এ জন্যেই বলা হয়েছে : إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ অর্থাৎ আপনার কাজ শুধু কাফিরদেরকে আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা—মু'জিযা জাহির করা নয়।

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ—অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক ছিল। আপনি একক নবী নন। জাতিকে পথপ্রদর্শন করা সব পয়গম্বরেরই দায়িত্ব ছিল। মু'জিযা প্রকাশ করার ক্ষমতা কাউকে দেওয়া হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা যখন যে ধরনের মু'জিযা প্রকাশ করতে চান, করেন।

প্রত্যেক সম্প্রদায় ও দেশে পয়গম্বর আসা কি জরুরী ? : আয়াতে বলা হয়েছে : প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন সম্প্রদায় ও ভূখণ্ড পথপ্রদর্শক থেকে খালি থাকতে পারে না; যে কোন পয়গম্বর হোক কিংবা পয়গম্বরের প্রতিনিধিরূপে তাঁর দাওয়াতের প্রচারক হোক। উদাহরণত সূরা ইয়াসীনে পয়গম্বরের পক্ষ থেকে প্রথমে দু'ব্যক্তিকে কোন সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণের কথা উল্লিখিত রয়েছে। তাঁরা স্বয়ং নবী ছিলেন না। এরপর তাদের সাহায্য ও সমর্থনের জন্য তৃতীয় ব্যক্তিকে পাঠানোর কথা বর্ণিত হয়েছে।

তাই এ আয়াত থেকে এটা জরুরী হয় না যে, হিন্দুস্তানে কোন নবী ও রসূল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে রসূলের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য এ দেশে প্রচুর সংখ্যক আলিমের আগমন প্রমাণিত রয়েছে। এ ছাড়া এ জাতীয় অসংখ্য পথপ্রদর্শক যে এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাও সবার জানা।

এ পর্যন্ত তিন আয়াতে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের সন্দেহের জওয়াব বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ আয়াতে আবার তওহীদের আসল বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। সূরার শুরু থেকেই এ সম্পর্কে আলোচনা হয়ে এসেছে। বলা হয়েছে :

اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ٥

অর্থাৎ প্রত্যেক নারী যে গর্ভধারণ করে, তা ছেলে না মেয়ে, সুশ্রী না কুশ্রী, সৎ না অসৎ—তা সবই আল্লাহ্ জানেন এবং নারীদের গর্ভাশয়ে যে হ্রাসবৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ কোন সময় এক সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কোন সময় দ্রুত কোন সময় দেরীতে—তাও আল্লাহ্ জানেন।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি 'আলিমুল-গায়িব'। সৃষ্টজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু ও সে সবের পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। এর সাথেই মানব সৃষ্টির প্রতিটি স্তর প্রতিটি পরিবর্তন ও প্রতিটি চিহ্ন সম্পর্কে জাত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে না উভয়ই, না কিছুই না—শুধু পানি অথবা বায়ু রয়েছে—এসব বিষয়ের নিশ্চিত ও নির্ভুল জান একমাত্র তিনিই রাখেন। লক্ষণাদিদৃষ্টে কোন হাকীম অথবা ডাক্তার এ ব্যাপারে যে মত ব্যক্ত করে, তার মর্যাদা, ধারণা ও অনুমানের চাইতে বেশি নয়। অনেক সময় বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত প্রকাশ পায়। আধুনিক এক্সরে মেশিনও এ সত্য উদঘাটন করতে অক্ষম। এর সত্যিকার ও নিশ্চিত জান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই রাখেন। এ বিষয়টিই অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে :

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন যাকিছু গর্ভাশয়ে রয়েছে।

আরবী ভাষায় تَغِيضُ শব্দটি হ্রাস পাওয়া শুষ্ক হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে এর বিপরীতে تَزْدَادُ শব্দ এসে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যে, এখানে অর্থ হ্রাস পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, জননীর গর্ভাশয়ে যা কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তার বিশুদ্ধ জান আল্লাহ্ তা'আলাই রাখেন। এ হ্রাস-বৃদ্ধির অর্থ গর্ভজাত সন্তানের সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে, অর্থাৎ গর্ভে এক সন্তান আছে কিংবা বেশি এবং জন্মের সময়ও হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে, অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তান কত মাস, কত দিন ও কত ঘন্টায় জন্মগ্রহণ করে একজন বাহ্যিক মানুষের অস্তিত্ব লাভ করবে, তার নিশ্চিত জানও আল্লাহ্ ছাড়া কেউ রাখতে পারে না।

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন : গর্ভাবস্থায় নারীদের যে রক্তপাত হয়, তা গর্ভস্থ সন্তানের দৈহিক আয়তন ও স্বাস্থ্য হ্রাসের কারণে হয়। تَغِيضُ الْأَرْحَامُ বলে এই হ্রাস বোঝানো হয়েছে। বাস্তব সত্য এই যে, হ্রাসের যত প্রকার রয়েছে, আয়াতের ভাষা সব-গুলোতেই পরিব্যপ্ত। কাজেই কোন বিরোধ নেই।

كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ অনুমান ও মাপ নির্দিষ্ট রয়েছে। এর কমও হতে পারে না এবং বেশিও হতে পারে না। সন্তানের সব অবস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত। তার প্রত্যেকটি বিষয় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নির্ধারিত আছে। কতদিন গর্ভে থাকবে, কতকাল দুনিয়াতে জীবিত থাকবে এবং

কি পরিমাণ রিযিক পাবে—এসব বিষয়ে আল্লাহ্‌র অনুপম জ্ঞান তাঁর তওহীদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ۝৯ سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ
اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِالَّيْلِ وَ سَارِبٌۢ
بِالنَّهَارِ ۝১০ لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ
مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا
بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ
مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ۝১১ هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ
السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝১২ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ
ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ
فِي اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ۝১৩ لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ
لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝১৪
وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ
بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ ۝১৫

(৯) তিনি সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত, মহোত্তম, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (১০) তোমাদের মধ্যে কেউ গোপনে কথা বলুক বা তা সশব্দে প্রকাশ করুক, রাতের অন্ধকারে সে আত্মগোপন করুক বা প্রকাশ্য দিবালোকে বিচরণ করুক, সবাই তাঁর নিকট সমান। (১১) তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে তারা ওদের হিফাযত করে। আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে। আল্লাহ্ যখন

কোন জাতির উপর বিপদ চান, তখন তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (১২) তিনিই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখান ভয়ের জন্য এবং আশার জন্য এবং উত্থিত করেন ঘন মেঘমালা। (১৩) তাঁর প্রশংসা পাঠ করে বজ্র নির্ঘোষ এবং সব ফেরেশতা, সভয়ে। তিনি বজ্রপাত করেন, অতঃপর যাকে ইচ্ছা, তাকে তা দ্বারা আঘাত করেন; তথাপি তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতণ্ডা করে, অথচ তিনি মহাশক্তিশালী। (১৪) সত্যের আহবান একমাত্র তাঁরই এবং তাঁকে ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তারা তাদের কোন কাজে আসে না; ওদের দৃষ্টান্ত সেরূপ, যেমন কেউ দু'হাত পানির দিকে প্রসারিত করে যাতে পানি তার মুখে পৌঁছে যায়; অথচ পানি কোন সময় পৌঁছবে না। কাফিরদের যত আহবান তার সবই পথভ্রষ্টতা। (১৫) আল্লাহ্‌কে সিজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের প্রতিচ্ছায়াও সকাল-সন্ধ্যায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনি সব গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞানী, সবার বড় (এবং) সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি চুপি চুপি কথা বলে এবং যে উচ্চৈঃস্বরে বলে এবং যে রাত্রে কোথাও আত্মগোপন করে এবং সে দিবালোকে চলাফেরা করে, তারা সব (আল্লাহ্‌র জ্ঞান) সমান। (অর্থাৎ তিনি সবাইকে সমভাবে জানেন। তিনি যেমন তোমাদের প্রত্যেককে জানেন, তেমনিভাবে প্রত্যেকের হিফাযতও করেন। সেমতে তোমাদের মধ্যে থেকে) প্রত্যেকের (হিফাযতের) জন্য কিছু ফেরেশতা (নির্ধারিত) রয়েছে, যারা অদল-বদল হতে থাকে। কিছু তার সামনে এবং কিছু তার পশ্চাতে। তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশে (অনেক বিপদাপদ থেকে) তার হিফাযত করে। (এতে কেউ যেন মনে না করে যে, যখন ফেরেশতা আমাদের হিফাযত করে, তখন যা ইচ্ছা, কর; তা কুফরীই হোক না কেন। আযাব নাযিলই হবে না। এরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা (প্রাথমিক পর্যায়ে তো কাউকে আযাব দেন না। তাঁর চিরাচরিত রীতি এই যে, তিনি) কোন জাতির (ভাল) অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত তারা নিজেদের যোগ্যতাবলে স্বীয় অবস্থা পরিবর্তন না করে। (কিন্তু এর সাথে এটাও আছে যে, যখন তারা নিজেদের প্রতিভায় ত্রুটি করতে থাকে, তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের প্রতি বিপদ ও শাস্তি নেমে আসে)। এবং যখন আল্লাহ্ কোন জাতিকে বিপদে পতিত করতে চান, তখন তা রদ করার কোন উপায়ই নেই। (তা পতিত হয়ে যায়)। এবং (এমন মুহূর্তে) আল্লাহ্ ব্যতীত (যাদের হিফাযতের ধারণা তারা পোষণ করে) তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (এমন কি, ফেরেশতাও তাদের হিফাযত করে না—করলেও সে হিফাযত তাদের কাজে আসবে না।) তিনি এমন (মহীয়ান) যে, তোমাদেরকে (বৃষ্টিপাতের সময়) বিদ্যুৎ (চমকানো অবস্থায়) দেখান, যদ্দরুন (তা পতিত হওয়ার) ভয়ও হয় এবং (তা থেকে বৃষ্টির) আশাও হয় এবং তিনি পানিভর্তি মেঘমালাকে (ও) উত্তোলন করেন এবং রা'দ (ফেরেশতা) তাঁর প্রশংসা কীর্তন করে এবং অন্যান্য ফেরেশতাও তাঁর ভয়ে প্রশংসা ও গুণ কীর্তন করে)। এবং তিনি (পৃথিবীর দিকে) বজ্র প্রেরণ

করেন অতঃপর যার উপর ইচ্ছা ফেলে দেন এবং তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে (অর্থাৎ তাঁর তওহীদ সম্পর্কে, তাঁর এমন মহীয়ান হওয়া সত্ত্বেও) তর্ক-বিতর্ক করে। অথচ তিনি প্রবল পরাক্রমশালী। (ভয় করার যোগ্য, কিন্তু তারা ভয় করে না এবং তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করে। তিনি এমন দোয়া কবুলকারী যে,) সত্য দোয়া বিশেষভাবে তাঁরই (কেননা, তা কবুল করার শক্তি তাঁর আছে।) আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে তারা (প্রয়োজনে ও বিপদে) ডাকে, তারা (শক্তিহীন হওয়ার কারণে) তাদের আবেদন এতটুকুই মঞ্জুর করতে পারে, যতটুকু পানি ঐ ব্যক্তির দরখাস্ত মঞ্জুর করে যে উভয় হাত পানির দিকে প্রসারিত করে (এবং ইঙ্গিতে নিজের দিকে ডাকে), যাতে তা (অর্থাৎ পানি) তার মুখ পর্যন্ত (উড়ে) এসে যায়, অথচ তা (নিজে নিজে) তার মুখ পর্যন্ত (কিছুতেই) আসবে না। (সুতরাং পানি যেমন তাদের আবেদন মঞ্জুর করতে অক্ষম তেমনিভাবে তাদের উপাস্যরাও অপারক। তাই তাদের কাছে) কাফিরদের আবেদন নিষ্ফল বৈ নয়। আল্লাহ্ তা'আলারই সামনে (অর্থাৎ তিনি এমন সর্বশক্তিমান যে, তাঁরই সামনে) সবাই মাথা নত করে—যারা আছে নভোমণ্ডলে এবং যারা আছে ভূমণ্ডলে, (কেউ) খুশীতে এবং (কেউ) বাধ্যবাধকতায়। (খুশীতে মাথা নত করার মানে স্বেচ্ছায় তাঁর ইবাদত করা এবং বাধ্যবাধকতার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে সৃষ্টজীবের মধ্যে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চান, সে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না)। এবং তাদের (অর্থাৎ পৃথিবীবাসীদের) প্রতিচ্ছায়াও (মাথা নত করে) সকালে ও বিকালে। অর্থাৎ ছায়াকে যতটুকু ইচ্ছা বাড়ান এবং যতটুকু ইচ্ছা সঙ্কুচিত করেন। যেহেতু এই হ্রাস-বৃদ্ধি, সকাল-বিকালে বেশী প্রকাশ পায়, তাই বিশেষভাবে সকাল-বিকাল উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা ছায়াও সর্বাবস্থায় অনুগত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছিল। সে-গুলো ছিল প্রকৃতপক্ষে তওহীদের প্রমাণ। এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ এখানে غيب শব্দ দ্বারা ঐ বস্তু বুঝান হয়েছে যা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাছে অনুপস্থিত, অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, নাকে ঘ্রাণ নেওয়া যায় না, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ বোঝা যায় না এবং হাতে স্পর্শ করা যায় না।

এর বিপরীত شهادة হচ্ছে ঐ সব বস্তু, যেগুলো উল্লিখিত পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণ যে তিনি প্রত্যেক অনুপস্থিতকে এমনিভাবে জানেন, যেমন উপস্থিত ও বিদ্যমানকে জেনে থাকেন।

الكبير শব্দের অর্থ বড় এবং متعال -এর অর্থ উচ্চ। উভয় শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তিনি সৃষ্ট বস্তুসমূহের গুণাবলীর ঊর্ধ্বে এবং সবার চেয়ে বড়। কাফির ও মুশরিকরা সংক্ষেপে আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব ও উচ্চমর্যাদা স্বীকার করত, কিন্তু উপলব্ধি

দোষে তারা আল্লাহ্‌কে সাধারণ মানুষের সমতুল্য জ্ঞান করে তাঁর জন্য এমন গুণাবলী সাব্যস্ত করত, যেগুলো তাঁর মর্যাদার পক্ষে খুবই অসম্ভব। উদাহরণত ইহুদী ও খৃস্টানরা আল্লাহ্‌র জন্য পুত্র সাব্যস্ত করেছে। কেউ কেউ তাঁর জন্য মানুষের ন্যায় দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করেছে এবং কেউ কেউ বিশেষ দিক নির্ধারণ করেছে। অথচ তিনি এসব অবস্থা ও গুণ থেকে উচ্চে, উর্ধ্বে ও পবিত্র। কোরআন পাক তাদের বর্ণিত গুণাবলী থেকে পবিত্রতা প্রকাশের জন্য বার বার বলেছে : سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব গুণ থেকে পবিত্র, যেগুলো তারা বর্ণনা করে।

প্রথম ৪ اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى-এর তৎপূর্ববর্তী عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ বাক্যে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছিল। দ্বিতীয় الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ বাক্যে শক্তি ও মাহাত্ম্যের পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর শক্তির ও সামর্থ্য মানুষের কল্পনার উর্ধ্বে। এর পরবর্তী আয়াতেও এ জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা একটি বিশেষ আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে :

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ

اَسَرَّ শব্দটি اِسْرَارٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আস্তে কথা বলা এবং جَهْر শব্দের অর্থ, জোরে কথা বলা। অপরকে শোনানোর জন্য যে কথা বলা হয়, তাকে جَهْر বলে এবং যে কথা স্বয়ং নিজেকে শোনানোর জন্য বলা হয়, তাকে سِر বলে مُسْتَخْفٍ শব্দের অর্থ যে গা ঢাকা দেয় এবং سَارِبٌ-এর অর্থ যে স্বাধীন নিশ্চিন্তভাবে পথ চলে।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান সর্বব্যাপী। কাজেই যে ব্যক্তি আস্তে কথা বলে এবং যে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে, তারা উভয়ই আল্লাহ্‌র কাছে সমান। তিনি উভয়ের কথা সমভাবে শোনেন এবং জানেন। এমনিভাবে যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেয় এবং যে ব্যক্তি দিবালোকে প্রকাশ্য রাস্তায় চলে, তারা উভয়ই আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির দিক দিয়ে সমান। উভয়ের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা তিনি সমভাবে জানেন এবং উভয়ের উপর তাঁর শক্তি সমভাবে পরিব্যাপ্ত। কেউ তাঁর ক্ষমতার আওতা-বহির্ভূত নয়। এ বিষয়টিই পরবর্তী আয়াতে আরও ব্যক্ত করে বলা হয়েছে :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

مُعَقِّبَاتٌ শব্দটি مُعَقِّبَةٌ-এর বহুবচন। যে দল অপর দলের পেছনে কাছাকাছি হয়ে আসে, তাকে مُعَقِّبَةٌ অথবা مُعَقِّبٌ বলা হয়। مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ-এর শাব্দিক অর্থ উভয় হাতের মাঝ খানে। উদ্দেশ্য মানুষের সম্মুখ দিক। مِنْ خَلْفِهِ-এর অর্থ পশ্চাদ্দিক مِنْ أَمْرِ اللَّهِ এখানে مِنْ কারণবোধক অর্থ দেয়, অর্থাৎ بِأَمْرِ اللَّهِ কোন কোন কিরাআতে এ শব্দটি بِأَمْرِ اللَّهِ বর্ণিতও আছে। (রূহুল-মা'আনী)

আয়াতের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কথা গোপন করতে কিংবা প্রকাশ করতে চায় এবং যে ব্যক্তি চলাফেরাকে রাতের অন্ধকারে ঢেকে রাখতে চায় অথবা প্রকাশ্য সড়কে ঘোরাফেরা করে—এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের দল নিযুক্ত রয়েছে। তার সম্মুখ ও পশ্চাদ্দিক থেকে তাকে ঘিরে রাখে। তাদের কাজ ও দায়িত্ব পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তারা একের পর এক আগমন করে। আল্লাহ্‌র নির্দেশে মানুষের হিফাযত করা তাদের দায়িত্ব।

সহীহ্ বুখারীর হাদীসে বলা হয়েছেঃ ফেরেশতাদের দুটি দল হিফাযতের জন্য নিযুক্ত রয়েছেন। একদল রাত্রির জন্য এবং একদল দিনের জন্য। উভয় দল ফজরের ও আসরের নামাযের সময় একত্রিত হন। ফজরের নামাযের পর রাতের পাহারাদার দল বিদায় যান এবং দিনের পাহারাদাররা কাজ বুঝে নেন। আসরের নামাযের পর তাঁরা বিদায় হয়ে যান এবং রাতের ফেরেশতা দায়িত্ব নিয়ে চলে আসেন।

আবূ দাউদের এক হাদীসে হযরত আলী মুর্তজা (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মানুষের সাথে কিছু সংখ্যক হিফাযতকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তার উপর যাতে কোন প্রাচীর ধ্বসে না পড়ে কিংবা সে কোন গর্তে পতিত না হয় কিংবা কোন জন্তু অথবা মানুষ তাকে কষ্ট না দেয় ইত্যাদি বিষয়ে ফেরেশতাগণ তার হিফাযত করেন। তবে কোন মানুষকে বিপদাপদে জড়িত করার জন্য যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ জারি হয়ে যায়, তখন হিফাযতকারী ফেরেশতারা সেখান থেকে সরে যায়।—(রূহুল-মা'আনী)

হযরত উসমান গণী (রা)-এর রেওয়ায়েতে ইবনে-জরীরের এক হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, হিফাযতকারী ফেরেশতাদের কাজ শুধু পার্থিব বিপদাপদ ও দুঃখকষ্ট থেকে

হিফাযত করাই নয়, বরং তারা মানুষকে পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখারও চেষ্টা করেন। মানুষের মনে সাধুতা ও আল্লাহ্‌ভীতির প্রেরণা জাগ্রত করেন যাতে সে গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে। এরপরও যদি সে ফেরেশতাদের প্রেরণার প্রতি উদাসীন হয়ে পাপে লিপ্ত হয়ে যায় তবে তারা দোয়া ও চেষ্টা করে যাতে সে শীঘ্র তওবা করে পাক হয়ে যায়। অগত্যা যদি সে কোনরূপেই হুঁশিয়ার না হয়, তখন তারা তার আমলনামায় গোনাহ্ লিখে দেয়।

মোটকথা এই যে, হিফাযতকারী ফেরেশতা দীন ও দুনিয়া উভয়ের বিপদাপদ থেকে মানুষের নিদ্রায় ও জাগরণে হিফাযত করে। হযরত কা'ব আহবার বলেন : মানুষের উপর থেকে আল্লাহ্‌র হিফাযতের এই পাহারা সরিয়ে দিলে জিনদের অত্যাচারে মানবজীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাবে। কিন্তু এসব রক্ষামূলক পাহারা ততক্ষণ পর্যন্তই কার্যকর থাকে, যতক্ষণ তকদীরে-ইলাহী মানুষের হিফাযতের অনুমতি দেয়। যদি আল্লাহ্ তা'আলাই কোন বান্দাকে বিপদে জড়িত করতে চান, তবে এসব রক্ষামূলক পাহারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়টিই বর্ণনা করে বলা হয়েছে :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ স্বয়ং তারাই নিজেদের অবস্থা ও কাজকর্ম মন্দ ও অশান্তিতে পরিবর্তিত করে না নেয়। (তারা যখন নিজেদের অবস্থা অবাধ্যতা ও নাফরমানীতে পরিবর্তিত করে নেয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলাও স্বীয় কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন। বলা বাহুল্য) যখন আল্লাহ্ তা'আলাই কাউকে আযাব দিতে চান, তখন কেউ তা রদ করতে পারে না এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিপরীতে তার সাহায্যার্থে কেউ এগিয়ে আসতে পারে না।

সারকথা এই যে, মানুষের হিফাযতের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের পাহারা নিয়োজিত থাকে, কিন্তু সম্প্রদায় যখন আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করে কুকর্ম, কুচরিত্র ও অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলাও স্বীয় রক্ষামূলক পাহারা উঠিয়ে নেন। এরপর আল্লাহ্‌র গযব ও আযাব তাদের উপর নেমে আসে। এ আযাব থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকে না।

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, আলোচ্য আয়াতের অবস্থা পরিবর্তন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যখন কোন সম্প্রদায় আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার পথ ত্যাগ করে স্বীয় অবস্থায় মন্দ পরিবর্তন সূচিত করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলাও স্বীয় অনুকম্পা ও হিফাযতের কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন।

এ আয়াতের অর্থ সাধারণতঃ এরূপ বর্ণনা করা হয় যে, কোন জাতির জীবনে কল্যাণকর বিপ্লব ততক্ষণ পর্যন্ত আসে না, যতক্ষণ তারা এ কল্যাণকর বিপ্লবের জন্য

নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নিজেদেরকে তার যোগ্য করে না নেয়। এ অর্থেই নিম্নোক্ত কবিতাটি সুবিদিত ঃ

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সে পর্যন্ত কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন নি যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করার খেয়াল করেছে।

এ বিষয়বস্তুটি যদিও কিছুটা নির্ভুল; কিন্তু আলোচ্য আয়াতের অর্থ এরূপ নয়। কবিতার বিষয়বস্তুটি একটি সাধারণ আইন হিসেবে নির্ভুল। অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বয়ং নিজের অবস্থা সংশোধন করার ইচ্ছা করে না, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেও তাকে সাহায্য করার ওয়াদা নেই। সাহায্য করার ওয়াদা তখনই কার্যকর হয় যখন কেউ স্বয়ং সংশোধনের চেষ্টা করে, যেমন এক আয়াত اَلَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেও হিদায়তের পথ তখনই উন্মুক্ত হয়, যখন কারও মধ্যে হিদায়তের অন্বেষণ থাকে। কিন্তু আল্লাহ্‌র নিয়ামত দান এ আইনের অধীন নয়। অনেক সময় অন্বেষণ ছাড়াই নিয়ামত দান করা হয়।

داد حق را قابلیت شرط نیست
بلکہ شرط قابلیت داد اوست

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দানের জন্য যোগ্যতা শর্ত নয়, যোগ্যতা ব্যতীতও তাঁর দান এসে পতিত হয়।

স্বয়ং আমাদের অস্তিত্ব ও তন্মধ্যস্থিত অসংখ্য নিয়ামত আমাদের চেষ্টার ফলশ্রুতি নয়। আমরা কোন সময় এরূপ দোয়াও করিনি যে, আমাদেরকে এমন সত্তা দান করা হোক যার চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ ও যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিখুঁত হয়। এসব নিয়ামত চাওয়া ছাড়াই পাওয়া গেছে।

ما نبودیم و تقاضا ما نبود
لطف تو ناگفتۂ ما می شنود

অর্থাৎ আমি ছিলাম না এবং আমার তরফ থেকে কোন প্রার্থনাও ছিলনা, তোমার অনুগ্রহই আমার না বলা প্রার্থনা শ্রবণ করেছে।

তবে নিয়ামত দানের যোগ্যতা ও ওয়াদা স্বকীয় চেষ্টা ব্যতীত অর্জিত হয় না এবং কোন জাতির পক্ষে চেষ্টা ও কর্ম ব্যতীত নিয়ামতদানের অপেক্ষায় থাকা আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছু নয়।

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ—

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন। এটা মানুষের জন্য ভয়েরও কারণ হতে পারে। কারণ, এটা যে জায়গায় পতিত হয় সবকিছু জ্বালিয়ে ছাইভস্ম করে দেয়। আবার এটা আশাও সঞ্চার করে যে, বিদ্যুৎ চমকানোর পর বৃষ্টি হবে, যা মানুষ ও জীবজন্তুর জীবনের অবলম্বন। এবং আল্লাহ্ তা'আলাই বড় বড় ভারী মেঘমালাকে মৌসুমী বায়ুতে রূপান্তরিত করে উত্থিত করেন এবং জলপূর্ণ মেঘমালাকে শূন্যে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যান। এরপর স্বীয় ফয়সালা ও তকদীর অনুযায়ী যথা ইচ্ছা, তা বর্ষণ করেন।

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ—অর্থাৎ রা'দ আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার তসবীহ্ পাঠ করে এবং ফেরেশতারাও তাঁর ভয়ে তসবীহ্ পাঠ করে। সাধারণের পরিভাষায় রা'দ বলা হয় মেঘের গর্জনকে, যা মেঘমালার পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়। এর তসবীহ্ পাঠ করার অর্থ ঐ তসবীহ্, যে সম্পর্কে কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে উল্লিখিত রয়েছে যে, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে এমন কোন বস্তু নেই, যে আল্লাহ্র তসবীহ্ পাঠ করে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই তসবীহ্ শুনতে সক্ষম হয় না।

কোন কোন হাদীসে আছে যে, বৃষ্টি বর্ষণের কাজে নিযুক্ত ও আদিষ্ট ফেরেশতার নাম রা'দ। এই অর্থে তসবীহ্ পাঠ করার মানে সুস্পষ্ট।

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ—এখানে صواعق শব্দটি صاعقة এর বহুবচন। এর অর্থ বজ্র, যা মাটিতে পতিত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই এসব বিদ্যুৎ মর্ত্যে প্রেরণ করেন, যেগুলো দ্বারা যাকে ইচ্ছা জ্বালিয়ে দেন।

وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ—এখানে محال শব্দটি মীমের যেরযোগে কৌশল, শাস্তি, শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হয়, আয়াতের অর্থ এই যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার তওহীদের ব্যাপারে পারস্পরিক কলহ-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত রয়েছে; অথচ আল্লাহ্ তা'আলা শক্তিশালী কৌশলকারী। তাঁর সামনে সবার চাতুরী অচল।

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ قُلِ اللّٰهُ ۚ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ
دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي

الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ أَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ
شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ
كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ
أَوْدِيَةٌ ۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ
عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ
اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ
النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾

(১৬) জিজ্ঞেস করুন ঃ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা কে ? বলে দিন ঃ আল্লাহ্। বলুন ঃ তবে কি ঃ তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত এমন অভিভাবক স্থির করেছ, যারা নিজেদের ভাল-মন্দেরও মালিক নয় ? বলুন ঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হয় ? অথবা কোথাও কি অন্ধকার ও আলো সমান হয় ? তবে কি তারা আল্লাহ্র জন্য এমন অংশীদার স্থির করেছে যে, তারা কিছু সৃষ্টি করেছে, যেমন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ ? অতঃপর তাদের সৃষ্টি এরূপ বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে ? বলুন ঃ আল্লাহ্ই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি একক, পরাক্রমশালী। (১৭) তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর স্রোতধারা প্রবাহিত হতে থাকে নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী। অতঃপর স্রোতধারা স্ফীত ফেনারাশি উপরে নিয়ে আসে। এবং অলংকার অথবা তৈজসপত্রের জন্য যে বস্তুকে আগুনে উত্তপ্ত করে, তাতেও তেমনি ফেনারাশি থাকে। এমনিভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। অতএব, ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ্ এমনিভাবে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (তাদেরকে এইভাবে) বলুন ঃ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা (উদ্ভাবক ও স্থায়িত্বদাতা, অর্থাৎ, স্রষ্টা ও সংরক্ষক) কে? (যেহেতু এ প্রশ্নের জবাব নির্দিষ্ট, তাই জওয়াবও) আপনি (-ই) বলে দিন ঃ আল্লাহ্। (অতঃপর আপনি) বলুন তবুও কি (তওহীদের এসব প্রমাণ শুনে) তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সাহায্যকারী (অর্থাৎ উপাস্য) স্থির করে রেখেছ, যারা (চরম অক্ষমতাবশত) স্বয়ং নিজেদের লাভ-লোকসানেরও ক্ষমতা রাখে না ? (অতঃপর শিরক খণ্ডন ও তওহীদ সপ্রমাণ করার পর তওহীদপন্থী ও শিরক-পন্থী এবং

স্বয়ং তওহীদ ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য ফুটিয়ে তোলার জন্য) আপনি (আরও) বলুন ঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? (এ হচ্ছে শিরক ও তওহীদের দৃষ্টান্ত)। অথবা তারা আল্লাহ্‌র এমন অংশীদার সাব্যস্ত করেছে যে, ওরাও। (কোন বস্তু) সৃষ্টি করেছে, যেমন আল্লাহ্ (তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ীও) সৃষ্টি করেন? অতঃপর (এ কারণে) তাদের কাছে (উভয়ের) সৃষ্টিকর্ম একরূপ মনে হয়েছে? (এবং এ থেকে তারা প্রমাণ করেছে যে, উভয়েই যখন একরূপ স্রষ্টা তখন উভয়েই একরূপ উপাস্যও হবে। এ সম্পর্কেও) আপনি (-ই) বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তা'আলাই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনিই (সত্তা ও পূর্ণতার গুণাবলীতে) একক (এবং সব সৃষ্টবস্তুর উপর) প্রবল। আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর (পানি দ্বারা) নালা (ভর্তি হয়ে) প্রবাহিত হতে লাগল নিজ পরিমাণ অনুযায়ী (অর্থাৎ ছোট নালায় অল্প পানি এবং বড় নালায় বেশী পানি)। অতঃপর জলস্রোত (পানির) উপরে ভাসমান আবর্জনা বইয়ে আনল। (এক আবর্জনা হল এই)। এবং যে বস্তুকে অগ্নির মধ্যে (রেখে) অলঙ্কার অথবা অন্য তৈজসপত্র (পাত্র ইত্যাদি) তৈরীর উদ্দেশ্যে উত্তপ্ত করা হয়, তাতেও এমনি আবর্জনা (উপরে ভাসমান) রয়েছে। (অতএব এ দৃষ্টান্তদ্বয়ের মধ্যে দু'বস্তু আছে। একটি উপকারী বস্তু অর্থাৎ আসল পানি ও আসল মাল এবং অপরটি অকেজো বস্তু অর্থাৎ আবর্জনা ও ময়লা। মোট কথা) আল্লাহ্ তা'আলা সত্য (অর্থাৎ তওহীদ, ঈমান ইত্যাদি) ও মিথ্যার (অর্থাৎ কুফর, শিরক ইত্যাদির) এমনি ধরনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেনে (যা পরবর্তী বিষয়বস্তু দ্বারা পূর্ণতা লাভ করবে)। অতএব (উল্লিখিত দৃষ্টান্তদ্বয়ের মধ্যে) যা আবর্জনা, তা তো ফেলে দেওয়া হয় এবং যা মানুষের উপকার করে, তা পৃথিবীতে (হিতকর অবস্থায়) অবশিষ্ট থাকে। (এবং সত্য ও মিথ্যার যেমন উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে) আল্লাহ্ তা'আলা এমনিভাবে (প্রত্যেক জরুরী বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে) উদাহরণসমূহ বর্ণনা করেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উভয় দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, এসব দৃষ্টান্তে ময়লা ও আবর্জনা যেমন কিছু-ক্ষণের জন্য আসল বস্তুর উপরে দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু পরিণামে তা আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয় এবং আসল বস্তু অবশিষ্ট থাকে, তেমনি মিথ্যাকে যদিও কিছুদিন সত্যের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করতে দেখা যায়; কিন্তু অবশেষে মিথ্যা বিলুপ্ত ও পর্যুদস্ত হয় এবং সত্য অবশিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত থাকে।—(জালালাইন)

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ۚ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ
لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ
لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۱۸﴾ اَفَمَنْ

يَعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ۭ اِنَّمَا
يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝١٩ الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا
يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ۝٢٠ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ
وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْۗءَ الْحِسَابِ ۝٢١ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا
ابْتِغَاۗءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا
وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝٢٢
جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَاۗىِٕهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَ
ذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰۗىِٕكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۝٢٣ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ
بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝٢٤

(১৮) যারা পালনকর্তার আদেশ পালন করে, তাদের জন্যে উত্তম প্রতিদান রয়েছে এবং যারা আদেশ পালন করে না, যদি তাদের কাছে জগতের সব কিছু থাকে এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে সবই নিজেদের মুক্তিপণস্বরূপ দিয়ে দিবে। তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর হিসাব। তাদের আবাস হবে জাহান্নাম। সেটা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থান! (১৯) যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যে অন্ধ? তারাই বোঝে, যারা বোধশক্তিসম্পন্ন। (২০) ইহারা এমন লোক, যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। (২১) এবং যারা বজায় রাখে ঐ সম্পর্ক, যা বজায় রাখতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন এবং স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কঠোর হিসাবের আশংকা রাখে। (২২) এবং যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্যে সবর করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা মন্দের বিপরীতে ভাল করে, তাদের জন্যে রয়েছে পরকালের গৃহ। (২৩) তা হচ্ছে বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী স্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (২৪) বলবে: তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণাম-গৃহ কতই না চমৎকার!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা স্বীয় পালনকর্তার আদেশ পালন করে (এবং তওহীদ ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে,) তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান (অর্থাৎ জান্নাত নির্ধারিত) আছে এবং যারা তাঁর আদেশ পালন করে না (এবং কুফর ও গোনাহে কায়েম থাকে) তাদের কাছে (কিয়ামতের দিন) যদি সারা জগতের বিষয়-সম্পদ (বিদ্যমান) থাকে, (বরং) তার সাথে সে সবের সমপরিমাণ আরও (অর্থসম্পদ) থাকে, তবে সবই মুক্তির জন্য দিয়ে ফেলবে। তাদের কঠোর শাস্তি হবে। (অন্য এক আয়াতে سوء الحساب 'মুশকিল হিসাব' বলা হয়েছে)। তাদের ঠিকানা (সদাসর্বদার জন্য) দোযখ। এটা নিকৃষ্ট অবস্থানস্থল। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, যা কিছু আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা সবই সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির মত হতে পারে, যে (এ জ্ঞান থেকে নিরেট) অন্ধ? (অর্থাৎ কাফির ও মু'মিন সমান নয়)। অতএব, বুদ্ধিমানরাই উপদেশ গ্রহণ করে (এবং) তারা (বুদ্ধিমানরা) এমন যে, আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং (এ) অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না এবং তারা এমন যে, আল্লাহ্ যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ দিয়েছেন, সেগুলো বজায় রাখে, স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কঠোর শাস্তির আশংকা করে (যা বিশেষভাবে কাফিরদের জন্যই। তাই কুফর থেকে বেঁচে থাকে)। এবং তারা এমন যে, স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির কামনায় (সত্য ধর্মে) অটল থাকে, নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তা থেকে গোপনেও এবং প্রকাশ্যভাবেও (যখন যেরূপ করা সমীচীন হয়) ব্যয় করে এবং (অপরে) দুর্ব্যবহারকে (যা তাদের সাথে করা হয়) সদ্ব্যবহার দ্বারা এড়িয়ে যায়। (অর্থাৎ কেউ তাদের সাথে অসদ্ব্যবহার করলে তারা কিছু মনে করে না, বরং তার সাথে সদ্ব্যবহার করে)। তাদের জন্য সে জগতে (অর্থাৎ পরকালে) উত্তম পরিণাম রয়েছে, (অর্থাৎ সদাসর্বদা বসবাসের উদ্যান,) যাতে তারাও প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতামাতা স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা (জান্নাতের) যোগ্য (অর্থাৎ মু'মিন) হবে, (যদিও পূর্বোক্তদের সমপর্যায়ভুক্ত না হয়) তারাও (জান্নাতে তাদের কল্যাণে তাদেরই শ্রেণীতে) প্রবেশ করবে এবং ফেরেশতারা তাদের কাছে প্রত্যেক (দিকের) দরজা দিয়ে আগমন করবে। (তারা বলবে:) তোমরা (প্রত্যেক বিপদ আশংকা থেকে) শান্তিতে থাকবে এ কারণে যে, (তোমরা সত্যধর্মে) অটল ছিলে। অতএব এ জগতে তোমাদের পরিণাম খুবই ভাল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উদাহরণের মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থীদের লক্ষণাদি, গুণাবলী, ভাল ও মন্দ কাজকর্ম এবং প্রতিদান ও শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলী পালন ও আনুগত্যকারীদের জন্য উত্তম প্রতিদান এবং অবাধ্যতাকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে উভয় প্রকার লোকদের উদাহরণ 'অন্ধ ও চক্ষুমান' দ্বারা দেওয়া হয়েছে এবং পরিশেষে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ—অর্থাৎ বিষয়টি যদিও সুস্পষ্ট ; কিন্তু এটি তারাই বুঝতে পারে, যারা বুদ্ধিমান। পক্ষান্তরে অমনোযোগিতা ও গোনাহ্ যাদের বিবেককে অকর্মণ্য করে রেখেছে, তারা এতবড় তফাৎটুকুও বোঝে না।

তৃতীয় আয়াতে উভয় দলের বিশেষ কাজকর্ম ও লক্ষণের বর্ণনা শুরু হয়েছে। প্রথমে আল্লাহ্র বিধানাবলী পালনকারীদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ—অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে। সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে যেসব ওয়াদা অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এখানে সেগুলোই বুঝান হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ছিল পালনকর্তা সম্পর্কিত অঙ্গীকার। এটি সৃষ্টির সূচনাকালে সকল আত্মাকে সমবেত করে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল ঃ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ —অর্থাৎ আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই ?

উত্তরে সবাই সমস্বরে বলেছিল ঃ بَلَىٰ অর্থাৎ হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই আমাদের পালনকর্তা।

এমনিভাবে যাবতীয় বিধি-বিধানের আনুগত্য, সমস্ত ফরয কর্ম পালন এবং অবৈধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে উপদেশ এবং বান্দার পক্ষ থেকে স্বীকারোক্তি কোরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ —অর্থাৎ তারা কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। ঐ অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ্ তা'আলা ও বান্দার মধ্যে রয়েছে এবং এইমাত্র يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ঐসব অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো উম্মতের লোকেরা আপন পয়গম্বরের সাথে সম্পাদন করে এবং ঐসব অঙ্গীকারও বোঝান হয়েছে, যেগুলো মানবজাতি একে অপরের সাথে করে।

আবু দাউদ আওফ ইবনে মালেকের রিওয়ায়েতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে-কিরামের কাছ থেকে এ বিষয়ে অঙ্গীকার ও বায়'আত নিয়েছেন যে, তাঁরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে অংশীদার করবেন না, পাঞ্জেগানা নামায পাবন্দি সহকারে আদায় করবেন, নিজেদের মধ্যকার শাসক শ্রেণীর আনুগত্য করবেন এবং কোন মানুষের কাছে কোন কিছু যাচ্ঞা করবেন না।

যারা এ বায়'আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, অঙ্গীকার পালনের ব্যাপারে তাঁদের নিষ্ঠার তুলনা ছিল না। অশ্বারোহণের সময় তাঁদের হাত থেকে চাবুক পড়ে গেলেও তাঁরা কোন মানুষকে চাবুকটি উঠিয়ে দিতে বলতেন না; বরং স্বয়ং নিচে নেমে তা উঠিয়ে নিতেন।

এটা ছিল সাহাবায়ে-কিরামের মনে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ভালবাসা, মাহাত্ম্য ও আনুগত্য প্রসূত প্রেরণার প্রভাব। নতুবা বলাই বাহুল্য যে, এ ধরনের যাচ্ঞা নিষিদ্ধ করা উদ্দেশ্য ছিল না। উদাহরণত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) একবার মসজিদে প্রবেশ করছিলেন। এমতাবস্থায় দেখলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ভাষণ দিচ্ছেন। ঘটনাক্রমে তাঁর মসজিদে প্রবেশ করার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুখ থেকে 'বসে যাও' কথাটি বের হয়ে গেল। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ জানতেন যে, এর অর্থ এটা নয় যে, কেউ সড়কে অথবা সভাস্থলের বাইরে থাকলেও সেখানেই বসে যাবে। কিন্তু আনুগত্যের প্রেরণা তাঁকে সামনে পা বাড়াতে দিল না। দরজার বাইরেই যেখানে এ বাক্যটি কানে এসেছিল, তিনি সেখানেই বসে গেলেন।

আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দাদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ --অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তারা সেগুলো বজায় রাখে। এ বাক্যটির প্রচলিত তফসীর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আত্মীয়তার যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে আদেশ করেছেন, তারা সেসব সম্পর্ক বজায় রাখে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এর অর্থ এই যে, তারা ঈমানের সাথে সৎকর্মকে অথবা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাসের সাথে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের প্রতি এবং তাঁদের গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাসকে যুক্ত করে।

চতুর্থ গুণ এই : وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ---অর্থাৎ তারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে। এখানে خوف শব্দের পরিবর্তে خشية শব্দ ব্যবহার করায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তাদের ভয় হিংস্র জন্তু অথবা ইতর মানুষের প্রতি স্বাভাবিক ভয়ের মত নয়। বরং তা পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের এবং উস্তাদের প্রতি শিষ্যের অভ্যাসগত ভয়ের মত। কষ্টদানের আশংকা এ ভয়ের কারণ নয়; বরং মাহাত্ম্য ও ভালবাসার কারণে বান্দা এরূপ আশংকা করে যে, আমাদের কোন কর্ম অথবা কথা যেন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অপছন্দনীয় না হয়ে যায়। এ কারণেই যেখানে প্রশংসা স্থলে আল্লাহ্র ভয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই خشية শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ, মাহাত্ম্য ও ভালবাসার কারণ থেকে উদ্ভূত ভয়কে خشية বলা হয়। এ কারণেই পরবর্তী বাক্যে হিসাব কিতাবের কঠোরতার ভয় বর্ণনা প্রসঙ্গে خشية এর পরিবর্তে خوف শব্দটি ব্যবহার করে বলা হয়েছে :

وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ —অর্থাৎ তারা মন্দ হিসাবকে ভয় করে। 'মন্দ হিসাব' বলে কঠোর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব বোঝান হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা যদি কৃপাবশত সংক্ষেপে ও মার্জনা সহকারে হিসাব গ্রহণ করেন, তবেই মানুষ মুক্তি পেতে পারে। নতুবা যার কাছ থেকেই পুরোপুরি ও কড়ায় গণ্ডায় হিসাব নেওয়া হবে, তার পক্ষে আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর হবে না। কেননা, এমন ব্যক্তি কে আছে, যে জীবনে কখনো কোন গোনাহ্ বা ত্রুটি করেনি? এ হচ্ছে সৎ ও আনুগত্যশীল বান্দাদের পঞ্চম গুণ।

ষষ্ঠ গুণ এই: وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ---অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করার আশায় অকৃত্রিমভাবে ধৈর্যধারণ করে।

প্রচলিত কথায় কোন বিপদ ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করাকেই সবরের অর্থ মনে করা হয় কিন্তু আরবী ভাষায় এর অর্থ আরও অনেক ব্যাপক। কারণ, আসল অর্থ হচ্ছে স্বভাব-বিরুদ্ধ বিষয়াদির কারণে অস্থির না হওয়া, বরং দৃঢ়তা সহকারে নিজের কাজে ব্যাপৃত থাকা। এ কারণেই এর দুটি প্রকার বর্ণনা করা হয়। এক. صبر على الطاعة অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান পালনে দৃঢ় থাকা এবং দুই. صبر عن المعصية অর্থাৎ গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় থাকা।

সবরের সাথে ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ কথাটি যুক্ত হয়ে ব্যক্ত করেছে যে, সবর সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় নয়। কেননা, কোন না কোন সময় বেসবর ব্যক্তিরও দীর্ঘ দিন পরে হলেও সবর এসেই যায়। কাজেই যে সবর ইচ্ছাধীন নয়, তার বিশেষ কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এরূপ অনিচ্ছাধীন কাজের আদেশ আল্লাহ্ তা'আলা দেন না। এ জন্যই রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: الصبر عند الصدمة الأولى অর্থাৎ আসল ও ধর্তব্য সবর তাই যা বিপদের প্রাথমিক পর্যায়ে অবলম্বন করা হয় নতুবা পরবর্তীকালে তো কোন কোন সময় বাধ্যতামূলকভাবে মানুষের মধ্যে সবর এসেই যায়। সুতরাং স্বেচ্ছায় স্বভাব-বিরুদ্ধ বিষয়কে সহ্য করাই প্রশংসনীয় সবর, তা হোক কোন ফরয ও ওয়াজিব পালন করা কিংবা হারাম ও মকরূহ বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করা।

এ কারণেই যদি কোন ব্যক্তি চুরির নিয়তে কোন গৃহে প্রবেশ করে, অতঃপর সুযোগ না পেয়ে সবর করে ফিরে আসে, তবে এ অনিচ্ছাধীন সবর কোন প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ নয়। সওয়াব তখনই হবে, যখন গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহ্র ভয়ে ও তাঁর সন্তুষ্টির কারণে হয়।

সপ্তম গুণ হচ্ছে : أَقَامُوا الصَّلٰوةَ —'নামায কায়েম করার' অর্থ পূর্ণ আদব ও শর্ত এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে নামায আদায় করা—শুধু নামায পড়া নয়। এ জন্যই কোরআনে নামাযের নির্দেশ সাধারণত إِقَامَةِ صَلٰوةٍ শব্দ সহযোগে দেওয়া হয়েছে।

অষ্টম গুণ হচ্ছে : وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক থেকে কিছু আল্লাহ্র নামেও ব্যয় করে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছে চান না ; বরং নিজেরই দেওয়া রিযিকের কিছু অংশ তাও মাত্র শতকরা আড়াই ভাগের মত সামান্যতম পরিমাণ তোমাদের কাছে চান। এটা দেওয়ার ব্যাপারে স্বভাবত তোমাদের ইতস্তত করা উচিত নয়।

অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার সাথে سِرًّا وَعَلَانِيَةً শব্দ দু'টি যুক্ত হওয়ায় বুঝা যায় যে, সদকা-খয়রাত সর্বত্র গোপনে করাই সুন্নত নয়, বরং মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও দুরস্ত ও শুদ্ধ। এ জন্যেই আলিমগণ বলেন যে, যাকাত ও ওয়াজিব সদকা প্রকাশ্যে দেওয়াই উত্তম এবং গোপনে দেওয়া সমীচীন নয়—যাতে অন্যরাও শিক্ষা ও উৎসাহ পায়। তবে নফল সদকা-খয়রাত গোপনে দেওয়াই উত্তম। যেসব হাদীসে গোপনে দেওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নফল সদকা সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

নবম গুণ হচ্ছে : يَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ অর্থাৎ তারা মন্দকে ভাল দ্বারা, শত্রুতাকে বন্ধুত্ব দ্বারা এবং অন্যায় ও জুলুমকে ক্ষমা ও মার্জনা দ্বারা প্রতিহত করে। মন্দের জওয়াবে মন্দ ব্যবহার করে না। কেউ কেউ এ বাক্যটির এরূপ অর্থ বর্ণনা করেন যে, পাপকে পুণ্য দ্বারা ব্যবহৃত করে। অর্থাৎ কোন সময় কোন গোনাহ্ হয়ে গেলে তারা অধিকতর যত্ন সহকারে অধিক পরিমাণে ইবাদত করে। ফলে গোনাহ্ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (স.) হযরত মু'আয (রা)-কে বলেন : পাপের পর পুণ্য করে নাও, তাহলে তা পাপকে মিটিয়ে দিবে। অর্থ এই যে, যখন পাপের পর অনুতপ্ত হয়ে তওবা করবে এবং এর পশ্চাতে পুণ্য কাজ করবে, তখন এ পুণ্য কাজ বিগত গোনাহ্কে মিটিয়ে দিবে। অনুতাপ ও তওবা ব্যতীত পাপের পর কোন পুণ্য কাজ করে নেওয়া পাপমুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়।

আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যশীলদের নয়টি গুণ বর্ণনা করার পর তাদের প্রতিদান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে أُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ দার শব্দের অর্থ এখানে

دار آخرت অর্থাৎ পরকাল। আয়াতের অর্থ হচ্ছে তাদের জন্যই রয়েছে পরকালের সাফল্য। কেউ কেউ বলেন ঃ এখানে دار دنیا বলে دار অর্থাৎ ইহকাল বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই, সৎ লোকেরা যদি দুনিয়াতে কষ্টেরও সম্মুখীন হয়; কিন্তু পরিণামে দুনিয়াতেও সাফল্য তাদেরই প্রাপ্য অংশ হয়ে থাকে।

অতঃপর عقبى الدار অর্থাৎ পরকালের সাফল্য বর্ণিত হয়েছে যে, তা হচ্ছে جَنّٰتُ عَدْنٍ তারা এগুলোতে প্রবেশ করবে। عدن শব্দের অর্থ হচ্ছে অবস্থান ও স্থায়িত্ব। উদ্দেশ্য এই যে, এসব জান্নাত থেকে কখনও তাদেরকে বহিষ্কার করা হবে না; বরং এগুলোতে তাদের অবস্থান চিরস্থায়ী হবে। কেউ কেউ বলেন ঃ জান্নাতের মধ্যস্থলের নাম আদন। জান্নাতের স্থানসমূহের মধ্যে এটা উচ্চস্তরের।

এরপর তাদের জন্য আরও একটি পুরস্কার উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার এ নিয়ামত শুধু তাদের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তাদের বাপদাদা, স্ত্রী ও সন্তানরাও এর অংশ পাবে। শর্ত এই যে, তাদের উপযুক্ত হতে হবে। এর ন্যূনতম স্তর হচ্ছে মুসলমান হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের বাপদাদা ও স্ত্রীদের নিজস্ব আমল যদিও এ স্তরে পৌঁছার যোগ্য নয়, কিন্তু আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের খাতিরে ও বরকতে তাদেরকেও এ উচ্চস্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে।

এরপর তাদের আরও একটি পরকালীন সাফল্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করতে করতে প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে ঃ সবরের কারণে তোমরা যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছ। এটা পরকালের কতই না উত্তম পরিণাম।

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿۲۵﴾ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿۲۶﴾ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ﴿۲۷﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿۲۸﴾

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿٢٩﴾ كَذَٰلِكَ
أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ
الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ
إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾

(২৫) এবং যারা আল্লাহ্র অঙ্গীকারকে দৃঢ় ও পাকাপোক্ত করার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, ওরা ঐ সমস্ত লোক যাদের জন্য রয়েছে অভিসম্পাত এবং ওদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। (২৬) আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছা রুযী প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন। তারা পার্থিব জীবনের প্রতি মুগ্ধ। পার্থিব জীবন পরকালের সামনে অতি সামান্য সম্পদ বৈ নয়। (২৭) কাফিররা বলে : তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হল না? বলে দিন, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যে মনোনিবেশ করে, তাকে নিজের দিকে পথপ্রদর্শন করেন। (২৮) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহ্র যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহ্র যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়। (২৯) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ এবং মনোরম প্রত্যাবর্তনস্থল। (৩০) এমনিভাবে আমি আপনাকে একটি উম্মতের মধ্যে প্রেরণ করেছি। তাদের পূর্বে অনেক উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে। যাতে আপনি তাদেরকে ঐ নির্দেশ শুনিয়ে দেন, যা আমি আপনার কাছে প্রেরণ করেছি। তথাপি তারা দয়াময়কে অস্বীকার করে। বলুন : তিনিই আমার পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কারও উপাসনা নাই। আমি তাঁর উপরই ভরসা করেছি এবং তাঁর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যারা আল্লাহ্র অঙ্গীকারকে পাকাপোক্ত করার পর ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ যেসব সম্পর্ক বজায় রাখার আদেশ দিয়েছেন, সেগুলো ছিন্ন করে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে, এরূপ লোকদের প্রতি অভিসম্পাত হবে এবং তাদের জন্য সেই জগতে মন্দ অবস্থা হবে। (অর্থাৎ বাহ্যিক ধনৈশ্বর্য দেখে এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, তারা আল্লাহ্র রহমত পাচ্ছে। কেননা, ধনৈশ্বর্য তথা রিযিকের অবস্থা এই যে) আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অধিক রিযিক দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা রিযিক) সংকীর্ণ করে দেন। (রহমত ও গযবের মাপকাঠি এরূপ নয়।) এবং তারা (কাফিররা) পার্থিব জীবন নিয়ে (এবং এর বিলাস-ব্যসন নিয়ে) হর্ষোৎফুল্ল হয়। (তাদের এরূপ হর্ষোৎফুল্ল হওয়া সম্পূর্ণ নিরর্থক ও ভুল। কেননা) পার্থিব জীবন (ও এর

বিলাস-ব্যসন) পরকালের মোকাবিলায় একটি সামান্য সম্পদ বৈ কিছু নয়। কাফিররা (আপনার নবুয়তে দোষারোপ ও আপত্তি করার উদ্দেশ্যে) বলেঃ তাঁর (পয়গম্বরের) প্রতি কোন মু'জিযা (আমরা যা চাই সেরূপ মু'জিযাসমূহের মধ্য থেকে) তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কেন অবতীর্ণ করা হল না ? আপনি বলে দিনঃ বাস্তবিকই (তোমাদের এসব বাজে ফরমায়েশ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে) আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, পথভ্রষ্ট করে দেন। (বোঝা যাওয়ার কারণ এই যে, কোরআনের মত সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযাসহ যথেষ্ট মু'জিযা সত্ত্বেও ওরা অনর্থক বায়না ধরে। এতে বোঝা যায় যে, তাদের ভাগ্যেই পথভ্রষ্টতা লিখিত রয়েছে।) এবং (হঠকারীদের হিদায়তের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা কোরআন যথেষ্ট হয়নি এবং তাদের ভাগ্যে পথভ্রষ্টতা জুটেছে, তেমনি) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করে (এবং সত্য পথ অন্বেষণ করে, পরবর্তী اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ الخ আয়াতে যার বাস্তবরূপ ব্যক্ত হয়েছে। তাকে নিজের দিকে পৌঁছার পথ প্রদর্শন করার জন্য) হিদায়ত করে দেন (এবং পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন)। তারা ঐ সব লোক, যা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ্র যিকির দ্বারা (যার বড় অংশ হচ্ছে কোরআন) তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে (যার বড় অংশ হচ্ছে ঈমান। অর্থাৎ তারা কোরআনের অলৌকিকতাকে নবুয়ত প্রমাণের জন্য যথেষ্ট মনে করে এবং আবোল-তাবোল ফরমায়েশ করে না। এরপর আল্লাহ্র যিকির ও ইবাদতে এত আনন্দ যে, কাফিরদের মত পার্থিব জীবনে তত আনন্দ হয় না। এবং) ভালভাবে জেনে নাও যে, আল্লাহ্র যিকির (-এর এমনি বৈশিষ্ট্য যে, তা) দ্বারা অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায়। (অর্থাৎ যে পর্যায়ের যিকির সেই পর্যায়ের প্রশান্তি লাভ হয়। সেমতে কোরআন দ্বারা ঈমান এবং সৎকর্ম দ্বারা ইবাদতের সাথে নিবিড় সম্পর্ক ও আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ অর্জিত হয়। মোটকথা,) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, (যাদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে,) তাদের জন্য (দুনিয়াতে) সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং (পরকালে) উত্তম পরিণতি রয়েছে। এ বিষয়টি অন্য আয়াতে فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ الخ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।) এমনিভাবে আমি আপনাকে এমন এক উম্মতের মধ্যে রসূলরূপে প্রেরণ করেছি যে, এর (অর্থাৎ এ উম্মতের) পূর্বে আরও অনেক উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে (এবং আপনাকে এদের প্রতি রসূলরূপে প্রেরণ করার কারণ হলো) যাতে আপনি তাদেরকে ঐ গ্রন্থ পাঠ করে শোনান, যা আমি আপনার কাছে ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছি এবং (এই বিরাট নিয়ামতের কদর করা এবং মু'জিযা-রূপী এ গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তাদের উচিত ছিল ; কিন্তু) তারা পরম দয়াশীলের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে (এবং কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না।) আপনি বলে দিনঃ (তোমাদের বিশ্বাস স্থাপন না করাতে আমার কোন ক্ষতি নেই। কেননা তোমরা অধিকতরভাবে আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে। এ জন্য আমি ভীত নই। কারণ) তিনিই আমার পালনকর্তা (ও রক্ষক।) তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। (অতএব

নিশ্চয়ই তিনি পূর্ণ গুণসম্পন্ন হবেন এবং হিফাযতের জন্যে যথেষ্ট হবেন। তাই) আমি তাঁর উপরই ভরসা করেছি এবং তাঁর কাছেই আমাকে যেতে হবে। (মোট কথা এই যে, আমার হিফাযতের জন্য তো আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট। তোমরা আমার বিরুদ্ধাচরণ করে কিছুই করতে পারবে না। তবে এতে তোমাদেরই ক্ষতি হবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

রুকুর শুরুতে সমগ্র মানবজাতিকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করে বলা হয়েছিল যে, তাদের একদল আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত ও একদল অবাধ্য। অতঃপর অনুগত বান্দা-দের কতিপয় গুণ ও আলামত বর্ণিত হয়েছে এবং পরকালে তাদের জন্যে সর্বোত্তম প্রতিদানের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে দ্বিতীয় প্রকার লোকদের আলামত ও গুণাবলী এবং তাদের শাস্তির কথা বর্ণিত হচ্ছে। এতে অবাধ্য বান্দাদের একটি স্বভাব বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه — অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ তা'আলার অঙ্গীকারকে পাকাপোক্ত করার পর ভঙ্গ করে। আল্লাহ্ তা'আলার অঙ্গীকারের মধ্যে সেই অঙ্গীকারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা সৃষ্টির সূচনাকালে আল্লাহ্র পালনকর্তৃত্ব ও একত্ব সম্পর্কে সব আত্মার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। কাফির ও মুশরিকরা দুনিয়াতে এসে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং আল্লাহ্র মোকাবিলায় শত শত পালনকর্তা ও উপাস্য তৈরী করেছে।

এছাড়া ঐসব অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেগুলো পালন করা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' চুক্তির অধীনে মানুষের জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়। কারণ, কালিমায়ে তাইয়্যেবা, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' প্রকৃতপক্ষে একটি মহান চুক্তির শিরোনাম। এর অধীনে আল্লাহ্ ও রসূলের বর্ণিত বিধি-বিধান পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকারও এসে যায়। তাই কোন মানুষ যখন আল্লাহ্ অথবা রসূলের কোন আদেশ অমান্য করে, তখন সে ঈমানের চুক্তিই লঙ্ঘন করে।

অবাধ্য বান্দাদের দ্বিতীয় স্বভাব এরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

ويقطعون ما امر الله به ان يوصل — অর্থাৎ তারা ঐসব সম্পর্ক ছিন্ন করে, যেগুলো বজায় রাখতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে মানুষের যে সম্পর্ক, এখানে সেই সম্পর্কও বুঝানো হয়েছে। তাঁদের প্রদত্ত বিধি-বিধান অমান্য করাই হচ্ছে এ সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ। এছাড়া আত্মীয়তার সম্পর্কও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কোরআন পাকের স্থানে স্থানে এসব সম্পর্ক বজায় রাখা ও এগুলোর হক আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমান বান্দারা এসব হক ও সম্পর্কও ছিন্ন করে। উদাহরণত

পিতামাতা, ভাই-বোন, প্রতিবেশী ও অন্যান্য আত্মীয়ের যেসব অধিকার আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রসূল মানুষের উপর আরোপ করেছেন, তারা এগুলো আদায় করে না।

তৃতীয় স্বভাব এই : وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ—অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে। এ তৃতীয় স্বভাবটি প্রকৃতপক্ষে প্রথমোক্ত দু'স্বভাবেরই ফলশ্রুতি। যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও মানুষের অঙ্গীকারের পরওয়া করে না এবং কারও অধিকার ও সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য করে না, তাদের কর্মকাণ্ড যে অপরাপর লোকদের ক্ষতি ও কষ্টের কারণ হবে, তা বলাই বাহুল্য। ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি কাটাকাটির বাজার গরম হবে। এটাই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ফাসাদ।

অবাধ্য বান্দাদের এই তিনটি স্বভাব বর্ণনা করার পর তাদের শাস্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ—অর্থাৎ তাদের জন্য লা'নত ও মন্দ আবাস রয়েছে। লা'নতের অর্থ আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে থাকা এবং বঞ্চিত হওয়া। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে থাকাই সর্বাপেক্ষা বড় আযাব এবং সব বিপদের বড় বিপদ।

বিধান ও নির্দেশ : আলোচ্য আয়াতসমূহের মধ্যে মানবজীবনের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কিত বিশেষ বিশেষ বিধান ও নির্দেশ পাওয়া যায় ---কিছু স্পষ্টত এবং কিছু ইঙ্গিতে। উদাহরণত উল্লেখ্য :

(১) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ—থেকে প্রমাণিত হয় যে, কারও সাথে কোন চুক্তি করা হলে তা পালন করা ফরয এবং লংঘন করা হারাম। চুক্তিটি আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে হোক, যেমন ঈমানের চুক্তি, কিংবা সৃষ্টজগতের মধ্যে কোন মুসলমান অথবা কাফিরের সাথে হোক---চুক্তি লংঘন করা সর্বাবস্থায় হারাম।

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ---থেকে জানা যায় যে, ইসলাম বৈরাগ্য গ্রহণ করত জাগতিক চাহিদা ও বিষয়াদি ত্যাগ করা শিক্ষা দেয় না; বরং সম্পর্কিতদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করাকে ইসলামে অপরিহার্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। পিতামাতার অধিকার, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ও ভাই-বোনদের অধিকার এবং অন্যান্য আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের অধিকার পূরণ করা আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য করেছেন। এগুলোর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে নফল ইবাদত অথবা কোন ধর্মীয় কাজে আত্মনিয়োগ করাও জায়েয নয়। এমতাবস্থায় অন্য কাজে গেলে এগুলো ভুলে যাওয়া কিরূপে জায়েয হবে?

কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, আত্মীয়দেরকে দেখা-শোনা করা এবং তাদের অধিকার প্রদান করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে রিযিকের প্রশস্ততা ও কাজে-কর্মে বরকত কামনা করে, তার উচিত আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার অর্থ আত্মীয়দের দেখা-শোনা করা এবং সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করা।

হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা) বলেন ঃ জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গৃহে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করল ঃ আমাকে বলুন, ঐ আমল কোন্টি যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে ঠেলে দিবে? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত কর ; তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করো না, নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ।—(বগভী)

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, আত্মীয়-স্বজনের অনুগ্রহের বিনিময়ে অনুগ্রহ করাকেই আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা বলে না, বরং কোন আত্মীয় যদি তোমার অধিকার প্রদানে ত্রুটি করে, তোমার সাথে সম্পর্ক না রাখে ; এরপরও শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তার সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করাই হচ্ছে প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।

আত্মীয়দের অধিকার প্রদান করা এবং তাদের সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ নিজেদের বংশ-তালিকা সংরক্ষিত রাখ। এর মাধ্যমেই আত্মীয়তা সংরক্ষিত থাকতে পারবে এবং তোমরা তাদের অধিকার প্রদান করতে পারবে। তিনি আরও বলেছেন ঃ সম্পর্ক বজায় রাখার উপকারিতা এই যে, এতে পারস্পরিক ভাল-বাসা সৃষ্টি হয়, ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং আয়ুতে বরকত হয়। ---(তিরমিযী)

সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এটা প্রধান যে, পিতার মৃত্যুর পর পিতার বন্ধুদের সাথে তেমনি সম্পর্ক বজায় রাখবে, যেমন তাঁর জীবদ্দশায় রাখা হত।

(৩) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ---কোরআন ও হাদীসে সবরের অনেক ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণত সবরকারী আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গ ও সাহায্য লাভ করে এবং অগণন সওয়াব ও পুরস্কার পায়। উপরোক্ত আয়াত থেকে জানা যায় যে, এসব ফযিলত তখনই লাভ হয় যখন আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সবর এখ-তিয়ার করা হয়।

সবরের আসল অর্থ মনকে বশে রাখা এবং দৃঢ় থাকা। এর আবার শ্রেণীভেদ আছে। এক. কষ্ট ও বিপদে সবর অর্থাৎ অস্থির ও নিরাশ না হওয়া এবং আল্লাহ্র দিকে দৃষ্টি রেখে আশাবাদী হওয়া। দুই. ইবাদতে সবর অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধানাবলী পালন করা

কঠিন মনে হলেও তাতে অটল থাকা। তিন. গোনাহ্ ও মন্দ কাজ থেকে সবর অর্থাৎ মন মন্দ কাজের দিকে ধাবিত হতে চাইলেও আল্লাহ্র ভয়ে সেদিকে ধাবিত না হওয়া।

(৪) وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً —থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্র পথে গোপন ও প্রকাশ্যে উভয় প্রকারে ব্যয় করা দুরস্ত। তবে ওয়াজিব সদকা যেমন যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি প্রকাশ্যে দেওয়া উত্তম—যাতে অন্য মুসলমানগণ তা দিতে উৎসাহিত হয়। পক্ষান্তরে নফল দান-খয়রাত গোপনে প্রদান করা উচিত, যাতে রিয়া ও নামযশের সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

(৫) يَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ — প্রত্যেক মন্দকে প্রতিহত করা একটি যুক্তিগত ও স্বভাবগত দাবী। এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, মন্দ দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করা ইসলামের নীতি নয়। বরং ইসলামের শিক্ষা এই যে, মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত কর। কেউ তোমার উপর জুলুম করলে তুমি তার সাথে ন্যায়ানুগ আচরণ কর। যে তোমার সম্পর্কের হক প্রদান করেনি, তুমি তার হক প্রদান কর। কেউ রাগ করলে তুমি তার জওয়াব সহনশীলতার মাধ্যমে দাও। এর অনিবার্য পরিণতি হবে এই যে, শত্রু ও মিত্রে পরিণত হবে এবং দুষ্টও তোমার সামনে শিষ্ট হয়ে যাবে।

এ বাক্যের আরও একটি অর্থ এই যে, ইবাদত দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। যদি কোন সময় কোন গোনাহ্ হয়ে যায়, তবে অনতিবিলম্বে তওবা কর এবং এরপর আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে মনোনিবেশ কর। এতে তোমার বিগত গোনাহ্ও মাফ হয়ে যাবে।

হযরত আবূযর গিফারীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, তোমার দ্বারা যখন কোন মন্দ কাজ অথবা গোনাহ্ হয়ে যায়, তখন সাথে সাথে কোন সৎকাজ করে নাও। এতে গোনাহ্ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।—(আহমদ, মাযহারী) শর্ত এই যে, বিগত গোনাহ্ থেকে তওবা করে সৎকাজ করতে হবে।

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ

—এর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ নিজেরা তো জান্নাতে স্থান পাবেই, তাদের খাতিরে তাদের পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানরাও স্থান পাবে। শর্ত এই যে, তাদেরকে যোগ্য অর্থাৎ মু'মিন-মুসলমান হতে হবে—কাফির হলে চলবে না। তাদের সৎকর্ম আল্লাহ্র প্রিয় বান্দার সমান না হলেও আল্লাহ্ তা'আলা তার বরকতে তাদেরকেও জান্নাতে তার স্থানে পৌঁছিয়ে দেবেন। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে : أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ —অর্থাৎ আমি সৎ বান্দাদের বংশধর ও সন্তান-সন্ততিকেও তাদের সাথে মিলিত করে দেব।

এতে জানা যায় যে, বুযুর্গদের সাথে বংশ আত্মীয়তা অথবা বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকা পরকালে ঈমানের শর্তসহ উপকারী হবে।

(৬) سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ——থেকে জানা যায় যে, পরকালীন মুক্তি, উচ্চ মর্তবা ইত্যাদি সব দুনিয়াতে সবর করার ফলশ্রুতি। অর্থাৎ দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর বান্দাদের হক আদায় করতে হবে এবং আল্লাহ্র অবাধ্য থেকে বেঁচে থাকার জন্য মনকে বাধ্য করতে হবে।

أُولٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ--পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যেমন অনুগত বান্দাদের প্রতিদান উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, তাদের স্থান হবে জান্নাতে, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করে বলবে যে, এসব নিয়ামত তোমাদের সবর ও আনুগত্যের ফলশ্রুতি, তেমনিভাবে এ আয়াতে অবাধ্যদের অশুভ পরিণতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাদের উপর আল্লাহ্র লা'নত অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের আবাস অবধারিত। এতে বোঝা যায় যে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অভিসম্পাত ও জাহান্নামের কারণ। نعوذ بالله منه

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ
كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ؕ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ؕ اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ
حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿۳۱﴾ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ
بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۫ فَكَيْفَ كَانَ
عِقَابِ ﴿۳۲﴾ اَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ
شُرَكَآءَ ؕ قُلْ سَمُّوْهُمْ ؕ اَمْ تُنَبِّـُٔوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى الْاَرْضِ
اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ؕ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا
عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿۳۳﴾

(৩১) যদি কোন কোরআন এমন হত, যার সাহায্যে পাহাড় চলমান হয় অথবা যমীন খণ্ডিত হয় অথবা মৃতরা কথা বলে, তবে কি হত? বরং সব কাজ তো আল্লাহ্র হাতে। ঈমানদাররা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয় যে, যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে সব মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করতেন? কাফিররা তাদের কৃতকর্মের কারণে সবসময় আঘাত পেতে থাকবে অথবা তাদের গৃহের নিকটবর্তী স্থানে আঘাত নেমে আসবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্র ওয়াদা না আসে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ওয়াদা খেলাপ করেন না। (৩২) আপনার পূর্বে কত রসূলের সাথে ঠাট্টা করা হয়েছে। অতঃপর আমি কাফিরদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছি, এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি। অতএব কেমন ছিল আমার শাস্তি! (৩৩) ওরা প্রত্যেকেই কি মাথার উপর স্ব স্ব কৃতকর্ম নিয়ে দণ্ডায়মান নয়? এবং তারা আল্লাহ্র জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করে! বলুন; নাম বল অথবা খবর দাও পৃথিবীর এমন কিছু জিনিস সম্পর্কে যা তিনি জানেন না? অথবা অসার কথাবার্তা বলছ? বরং সুশোভিত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য তাদের প্রতারণাকে এবং তাদেরকে সৎপথে থেকে বাধা দান করা হয়েছে। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে পয়গম্বর এবং হে মুসলমানগণ, কাফিরদের একগুঁয়েমির অবস্থা এই যে, কোরআন যে মু'জিযা তা চিন্তা-ভাবনার উপর নির্ভরশীল। বর্তমান এই অবস্থায় কোরআনের পরিবর্তে) যদি কোন কোরআন এমন হত, যার সাহায্যে পাহাড় (স্ব স্থান থেকে) হটিয়ে দেওয়া হত অথবা তার সাহায্যে ভূপৃষ্ঠে দ্রুত অতিক্রম করা যেত অথবা তার সাহায্যে মৃতদের সাথে কাউকে আলাপ করিয়ে দেয়া যেত (অর্থাৎ মৃত জীবিত হয়ে যেত এবং কেউ তার সাথে আলাপ করে নিত। কাফিররা প্রায়ই এসব মু'জিযার ফরমায়েশ করত; কেউ সাধারণভাবেই এবং কেউ এভাবে যে, কোরআনকে বর্তমান অবস্থায় আমরা মু'জিযা বলে স্বীকার করি না। তবে যদি কোরআন দ্বারা এসব অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়, তবেই আমরা একে মু'জিযা বলে মেনে নেব। উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন দ্বারা এমন সব মু'জিযাও প্রকাশ পেত, যাতে উভয় প্রকার লোকদের ফরমায়েশ পূর্ণ হয়ে যেত অর্থাৎ যারা শুধু উল্লিখিত অলৌকিক ঘটনাবলী দাবী করত এবং যারা কোরআনের সাহায্যে এগুলোর প্রকাশ চাইত)। তবুও তারা বিশ্বাস স্থাপন করত না। (কেননা, এসব কারণ সত্যিকার ক্রিয়াশীল নয়) এবং সমগ্র ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলারই। (তিনি যাকে তওফীক দেন, সে-ই ঈমান আনয়ন করে। তাঁর রীতি এই যে, তিনি তলবকারীকে তওফীক দেন এবং একগুঁয়েকে বঞ্চিত রাখেন। কোন কোন মুসলমান মনে মনে কামনা করত যে, এসব মু'জিযা প্রকাশিত হয়ে গেলে সম্ভবত তারা ঈমান আনয়ন করবে। অতঃপর এই প্রেক্ষিতে তাদেরকে জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে) বিশ্বাসীদের কি (এ কথা শুনে যে, এরা একগুঁয়ে, সুতরাং বিশ্বাস স্থাপন করবে না, সব ক্ষমতা তো আল্লাহ্ তা'আলারই এবং সব কারণ সত্যিকারভাবে ক্রিয়াশীল নয়—) এ বিষয়ে মনস্তুষ্টি হয় না যে, আল্লাহ্ যদি চাইতেন, তবে (সারা বিশ্বের) সব মানুষকে হিদায়ত করে দিতেন? (কিন্তু কোন কোন

রহস্যের কারণে তিনি এরূপ চান না। অতএব সব মানুষ ঈমান আনবে না। এর বড় কারণ হঠকারিতা। এমতাবস্থায় হঠকারীদের ঈমানের চিন্তায় কেন পড়ে আছেন?) এবং (যখন ঠিক হয়ে গেল যে, এরা বিশ্বাস স্থাপন করবে না, তখন এরূপ ধারণা হতে পারে যে, তবে তাদের কেন শাস্তি দেওয়া হয় না? এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মক্কার) কাফিররা তো সর্বদাই (প্রায়ই) এ অবস্থায় থাকে যে, তাদের (কু) কীর্তির কারণে তাদের উপর কোন না কোন দুর্বিপাক আসতে থাকে (কোথাও হত্যা, কোথাও বন্দীত্ব এবং কোথাও পরাজয় ও বিপর্যয়) অথবা কোন কোন দুর্বিপাক (তাদের উপর না আসলেও) তাদের জনপদের নিকটবর্তী স্থানে নাযিল হতে থাকে (উদাহরণত কোন সম্প্রদায়ের উপর বিপদ আসল। এতে শংকিত হল যে, আমাদের উপরও বিপদ না এসে যায়)। এমনকি, (এমতাবস্থায়ই) আল্লাহ্‌র ওয়াদা এসে যাবে। (অর্থাৎ তারা পরকালীন আযাবের সম্মুখীন হয়ে যাবে, যা মৃত্যুর পর শুরু হয়ে যাবে। এবং) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ওয়াদার খেলাফ করেন না। (অতএব আযাব যে তাদের উপর পড়বে, তা নিশ্চিত, যদিও মাঝে মাঝে কিছু দেরী হতে পারে।) এবং (তারা আপনার সাথেই বিশেষভাবে মিথ্যারোপ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের আচরণ করে না, এমনিভাবে আযাবে বিলম্ব হওয়াও বিশেষভাবে তাদের বেলায় নয়; বরং পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ ও তাঁদের কওমের বেলায় এরূপ হয়েছে। সেমতে) আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের সাথে (কাফিরদের পক্ষ থেকে) ঠাট্টা-বিদ্রূপ হয়েছে। অতঃপর আমি কাফিরদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছি। অতঃপর আমি তাদের পাকড়াও করেছি। অতএব (চিন্তার বিষয় যে) আমার আযাব কিরূপ ছিল! (অর্থাৎ খুবই কঠোর ছিল। যখন জানা গেল যে, আল্লাহ্ই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তখন তা জানা ও প্রমাণিত হওয়ার পরও) যে (আল্লাহ্) প্রত্যেক ব্যক্তির কাজকর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত, সে এবং তাদের শরীকরা সমান হতে পারে কি? এবং (এতদসত্ত্বেও) তারা আল্লাহ্‌র জন্য অংশীদার স্থির করেছে। আপনি বলুন: তাদের (অর্থাৎ শরীকদের) নাম তো বল, (যাতে আমিও শুনি, তারা কে এবং কেমন?) তোমরা কি (তাদেরকে সত্যিকার শরীক মনে করে দাবী কর? তাহলে তো বোঝা যায় যে,) আল্লাহ্ তা'আলাকে এমন বিষয়ের খবর দিচ্ছ যে, (যারা) দুনিয়ায় তার (অস্তিত্বের) খবর আল্লাহ্ তা'আলারই জানা ছিল না। (কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ঐ বস্তুকেই অস্তিত্বশীল জানেন, বাস্তবে যার অস্তিত্ব আছে এবং অনস্তিত্বশীলকে তিনি অস্তিত্বশীল জানেন না। কেননা, তাতে জ্ঞানের ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে; যদিও প্রকাশ উভয়টির সমান। মোটকথা, তাদেরকে সত্যিকার শরীক বললে এ অসম্ভব বিষয়টি জরুরী হয়ে যায়। কাজেই তাদের শরীক হওয়াই অসম্ভব। অথবা (তাদেরকে সত্যিকার শরীক বল না; বরং) শুধু বাহ্যিক ভাষার দিক দিয়ে শরীক বল (বাস্তবে এর কোন প্রতীক নেই। তাহলে তারা যে শরীক নয়—একথা তোমরা নিজেরাই স্বীকার করছ। সুতরাং তারা যে শরীক নয়—একথা উভয় অবস্থাতেই প্রমাণিত হয়ে গেল। প্রথম অবস্থায় যুক্তির মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় তোমাদের স্বীকৃতির মাধ্যমে। এ বক্তব্যটি যদিও উচ্চতম পর্যায়ে যথেষ্ট, কিন্তু তারা তা মানবে না)। বরং কাফিরদের কাছে তাদের বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা (যার ভিত্তিতে তারা শিরকে লিপ্ত আছে) সুন্দর মনে হয় এবং (এ কারণেই) তারা (সৎ) পথ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে এবং

(আসল কথা তাই, যা পূর্ববর্ণিত بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ বাক্য থেকে জানা গেছে। অর্থাৎ) যাকে আল্লাহ্ তা'আলা পথভ্রষ্টতায় রাখেন, তাকে পথে আনার কেউ নেই। (তবে তিনি তাকেই পথভ্রষ্ট রাখেন, যে সত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠার পরও একগুঁয়েমি করে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মক্কার মুশরিকদের সামনে ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সত্য রসূল হওয়ার নিদর্শনাবলী তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের এবং বিস্ময়কর মু'জিযার মাধ্যমে দিবালোকের মত ফুটে উঠেছিল। তাদের সর্দার আবূ জাহ্ল বলে দিয়েছিল যে, বনু হাশিমের সাথে আমাদের পারিবারিক প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। আমরা তাদের এ শ্রেষ্ঠত্ব কিরূপে স্বীকার করতে পারি যে, আল্লাহ্র রসূল তাদের মধ্য থেকে আগমন করেছেন ? তাই তিনি যাই বলুন না কেন এবং যত নিদর্শনই প্রদর্শন করুন না কেন, আমরা কোন অবস্থাতেই তাকে বিশ্বাস করব না। এজন্যই সে বাজে ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ ও অবান্তর ফরমায়েশের মাধ্যমে সর্বত্র এ হঠকারিতা প্রকাশ করত। আলোচ্য আয়াতসমূহও আবূ জাহ্ল ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের এক প্রশ্নের উত্তরে নাযিল হয়েছে।

তফসীর বগভীতে আছে, একদিন মক্কার মুশরিকরা পবিত্র কাবা প্রাঙ্গণে এক সভায় মিলিত হল। তাদের মধ্যে আবূ জাহ্ল ও আবদুল্লাহ্ ইবনে উমাইয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা আবদুল্লাহ্ ইবনে উমাইয়াকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে প্রেরণ করল। সে বললঃ আপনি যদি চান যে, আমরা আপনাকে রসূল বলে স্বীকার করে নেই এবং আপনার অনুসরণ করি, তবে আমাদের কতগুলো দাবী আছে এগুলো কোরআনের মাধ্যমে পূরণ করে দিলে আমরা সবাই মুসলমান হয়ে যাব।

তাদের একটি দাবী ছিল এই যে, মক্কা শহরটি খুবই সংকীর্ণ। চতুর্দিক থেকে পাহাড়ে ঘেরা উচ্চভূমি, যাতে না চাষাবাদের সুযোগ আছে এবং না বাগবাগিচা ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের অবকাশ আছে। আপনি মু'জিযার সাহায্যে পাহাড়গুলোকে দূরে সরিয়ে দিন---যাতে মক্কার জমিন প্রশস্ত হয়ে যায়। আপনিই তো বলেন যে, দাউদ (আ)-এর জন্য পাহাড়ও সাথে সাথে তসবীহ্ পাঠ করত। আপনার কথা অনুযায়ী আপনি তো আল্লাহ্র কাছে দাউদের চাইতে খাটো নন।

দ্বিতীয় দাবী ছিল এই যে, আপনার কথা অনুযায়ী সুলায়মান (আ)-এর জন্য যেরূপ বায়ুকে আজ্ঞাবহ করে পথের বিরাট বিরাট দূরত্বকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল, আপনিও আমাদের জন্য তদ্রূপ করে দিন---যাতে সিরিয়া ইয়ামানের সফর আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়।

তৃতীয় দাবী ছিল এই যে, ঈসা (আ) মৃতদেরকে জীবিত করতেন। আপনি তাঁর চাইতে কোন অংশে কম নন। আপনিও আমাদের জন্য আমাদের দাদা কুসাইকে জীবিত করে দিন---যাতে আমরা তাকে জিজ্ঞেসা করি যে, আপনার ধর্ম সত্য কি না। (মাযহারী, বগভী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মরদুওয়াইহ্)

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব হঠকারিতাপূর্ণ দাবীর উত্তরে বলা হয়েছে :

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -

এখানে تسيير جبال বলে পাহাড়গুলোকে স্বস্থান থেকে হটানো, قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ বলে সংক্ষিপ্ত সময়ে লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করা এবং كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ বলে মৃতদেরকে জীবিত করে কথা বলা বোঝানো হয়েছে। لو حرف شرط -এর জওয়াব স্থানের ইঙ্গিতে উহ্য রয়েছে ; অর্থাৎ لَمَّا آمَنُوا যেমন কোরআনের অন্য এক জায়গায় এমনি বিষয়বস্তু এবং তার এরূপ জওয়াবই উল্লেখ করা হয়েছে :

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا

অর্থ এই যে, যদি কোরআনের সাহায্যে তাদের এসব দাবী পূরণ করে দেওয়া হয়, তবুও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। কেননা, তারা এসব দাবীর পূর্বে এমন এমন মু'জিযা প্রত্যক্ষ করেছে, যেগুলো তাদের প্রার্থিত মু'জিযার চাইতে অনেক ঊর্ধ্বে ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইশারায় চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত হওয়া পাহাড়ের স্বস্থান থেকে সরে যাওয়া এবং বায়ুকে আজ্ঞাবহ করার চাইতে অনেক বেশী বিস্ময়কর। এমনিভাবে তাঁর হাতে নিষ্প্রাণ কংকরের কথা বলা এবং তসবীহ পাঠ করা কোন মৃত ব্যক্তির জীবিত হয়ে কথা বলার চাইতে অধিকতর বিরাট মু'জিযা। শবে মি'রাজে মসজিদে আকসা, অতঃপর সেখানে থেকে নভোমণ্ডলের সফর এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রত্যাবর্তন, বায়ুকে বশ করা সুলায়মানী তখতের অলৌকিকতার চাইতে অনেক মহান। কিন্তু জালিমরা এগুলো দেখার পরও বিশ্বাস স্থাপন করেনি। অতএব এসব দাবীর পেছনেও তাদের নিয়ত যে টালবাহানা করা—কিছু মেনে নেওয়া ও করা নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মুশরিকদের এ সব দাবীর লক্ষ্য এটাই ছিল যে, তাদের দাবী পূরণ না করা হলে তারা বলবে : (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলাই এ সব কাজ করার শক্তি রাখেন না, অথবা রসূলের কথা আল্লাহ্‌র কাছে শ্রবণযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। এতে বোঝা যায় যে, তিনি আল্লাহ্‌র রসূল নন। তাই অতঃপর বলা হয়েছে : بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

অর্থাৎ ক্ষমতা সবটুকু আল্লাহ্ তা'আলারই। উদ্দেশ্য এই যে, উল্লিখিত দাবীগুলো পূরণ না করার কারণ এই নয় যে, এগুলো আল্লাহ্র শক্তি বহির্ভূত; বরং বাস্তব সত্য এই যে, জগতের মঙ্গলামঙ্গল একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি স্বীয় রহস্যের কারণে এ সব দাবী পূর্ণ করা উপযুক্ত মনে করেন নি। কারণ, দাবী উত্থাপণকারীদের হঠকারিতা ও বদনিয়ত তাঁর জানা আছে। তিনি জানেন যে, এসব দাবী পূরণ করা হলেও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

أَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا

ইমাম বগভী বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কিরাম মুশরিকদের এসব দাবী শুনে কামনা করতে থাকেন যে, মু'জিযা হিসেবে দাবীগুলো পূরণ করে দিলে ভালই হয়। মক্কার সবাই মুসলমান হয়ে যাবে এবং ইসলাম শক্তিশালী হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থ এই যে, মুসলমানরা মুশরিকদের ছলচাতুরী ও হঠকারিতা দেখা ও জানা সত্ত্বেও কি এখন পর্যন্ত তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়নি যে, এমন কামনা করতে শুরু করেছে? অথচ তারা জানে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে সব মানুষকে এমন হিদায়েত দিতে পারেন যে, মুসলমান হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকবে না। কিন্তু সবাইকে ইসলাম ও ঈমানে বাধ্য করা আল্লাহ্র রহস্যের অনুকূলে নয়; আল্লাহ্র রহস্য এটাই যে, প্রত্যেকের নিজস্ব ক্ষমতা অটুট থাকুক এবং এ ক্ষমতাবলে ইসলাম গ্রহণ করুক অথবা কুফর অবলম্বন করুক।

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ

—হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন قَارِعَةٌ শব্দের অর্থ আপদ-বিপদ। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশরিকদের দাবী-দাওয়া পূরণ করার কারণ এই যে, তাদের বদনিয়ত ও হঠকারিতা জানা ছিল যে, পূরণ করলেও বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তারা আল্লাহ্র কাছে দুনিয়াতেও আপদ-বিপদে পতিত হওয়ার যোগ্য; যেমন মক্কাবাসীদের উপর কখনও দুর্ভিক্ষের কখনও ইসলামী জিহাদ তথা বদর, ওহুদ ইত্যাদিতে হত্যা ও বন্দীত্বের বিপদ নাযিল হয়েছে। কারও উপরও বজ্র পতিত হয়েছে এবং কেউ অন্য কোন বালা-মুসীবতে আক্রান্ত হয়েছে।

أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ অর্থাৎ মাঝে মাঝে এমনও হবে যে, সরাসরি তাদের উপর বিপদ আসবে না; বরং তাদের নিকটবর্তী জনপদের উপর বিপদ আসবে যাতে তারা শিক্ষা লাভ করে এবং নিজেদের কুপরিণামও দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ —অর্থাৎ আপদ-বিপদের এ ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা পূর্ণ না হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহ্র ওয়াদা কোন সময় টলতে পারে না। ওয়াদা বলে এখানে মক্কা বিজয়

বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আপদ আসতে থাকবে। এমন কি, পরিশেষে মক্কা বিজিত হবে এবং তারা সবাই পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে যাবে।

আলোচ্য আয়াতে أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ বাক্য থেকে জানা যায় যে, কোন সম্প্রদায় ও জনপদের আশেপাশে আযাব অথবা বিপদ নাযিল হলে তাতে আল্লাহ্ তা'আলার এ রহস্যও নিহিত থাকে যে, পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোও হুঁশিয়ার হয়ে যায় এবং অন্যের দুরবস্থা দেখে তারাও নিজেদের ক্রিয়াকর্ম সংশোধন করে নেয়। ফলে অন্যের আযাব তাদের জন্য রহমত হয়ে যায়, নতুবা একদিন অন্যদের ন্যায় তারাও আযাবে পতিত হবে।

নিত্যদিনকার অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, আমাদের আশেপাশে প্রায়ই কোন না কোন সম্প্রদায় ও জনপদের উপর বিভিন্ন প্রকার আপদ-বিপদ আসছে। কোথাও বন্যার ধ্বংস-লীলা, কোথাও ঝড় ঝঞ্ঝা, কোথাও ভূমিকম্প এবং কোথাও যুদ্ধ-বিগ্রহ বা অন্য কোন বিপদ অহরহ আপতিত হচ্ছে। কোরআন পাকের উপরোক্ত বক্তব্য অনুযায়ী—এগুলো শুধু সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় ও জনপদের জন্যই শাস্তি নয়; বরং পার্শ্ববর্তী এলাকাবাসীদের জন্যও হুঁশিয়ারি সংকেত হয়ে থাকে। অতীতে যদিও জ্ঞান-বিজ্ঞান এতটুকু উন্নত ছিল না, কিন্তু মানুষের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় ছিল। কোথাও এ ধরনের দুর্ঘটনা দেখা দিলে স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যেত, আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করত তওবা করত এবং ইস্তেগফার ও দান-খয়রাতকে মুক্তির উপায় মনে করত। ফলে চাক্ষুষ দেখা যেত যে, তাদের বিপদ সহজেই দূর হয়ে গেছে। আজ আমরা এতই গাফিল হয়ে গেছি যে, বিপদের মুহূর্তেও আল্লাহ্ স্মরণে আসে না—বাকী সব কিছুই আমরা স্মরণ করি। দুনিয়ার তাবত অমুসলিমদের ন্যায় আমাদের দৃষ্টি কেবল বস্তুগত কারণাদির মধ্যেই নিবদ্ধ হয়ে থাকে। কারণাদির উদ্ভাবক আল্লাহ্র দিকে মনোযোগের তওফীক তখনও কম লোকেরই হয়। এরই ফলশ্রুতিতে বিশ্ব আজ একের পর এক উপর্যুপরি দুর্ঘটনার শিকার হতে থাকে।

حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ○ —অর্থাৎ কাফির ও মুশরিকদের উপর দুনিয়াতেও বিভিন্ন প্রকার আযাব ও আপদ-বিপদের ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা পৌঁছে না যায়। কেননা, আল্লাহ্ কখনও ওয়াদার খেলাফ করেন না।

ওয়াদার অর্থ এখানে মক্কা বিজয়। আল্লাহ্ তা'আলা এই ওয়াদা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে করে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, পরিশেষে মক্কা বিজিত হয়ে কাফির ও মুশরিকরা পর্যুদস্ত হবেই; এর পূর্বেও অপরাধের কিছু কিছু সাজা তারা ভোগ করবে। ওয়াদার অর্থ এ স্থলে কিয়ামতও হতে পারে। এ ওয়াদা সব পয়গম্বরের সাথে সব সময়ই করা আছে। ওয়াদাকৃত সেই কিয়ামতের দিন প্রত্যেক কাফির ও অপরাধী কৃতকর্মের পুরাপুরি শাস্তি ভোগ করবে।

বর্ণিত ঘটনায় মুশরিকদের হঠকারিতাপূর্ণ প্রশ্নের কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দুঃখিত ও ব্যথিত হওয়ার আশংকা ছিল। তাই পরবর্তী আয়াতে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ -

আপনি যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন, তা শুধু আপনারই পরিস্থিতি নয়। আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও এমনি ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন। অপরাধী ও অবিশ্বাসীদেরকে তাদের অপরাধের কারণে তাৎক্ষণিকভাবে ধরা হয়নি। তারা পয়গম্বরগণের সাথে ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে করতে যখন চরম সীমায় পৌঁছে যায়, তখন আল্লাহ্‌র আযাব তাদেরকে পরিবেষ্টন করে এবং এমনভাবে বেষ্টন করে যে, রুখে দাঁড়াবার কারও শক্তি থাকেনি।

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ--এ আয়াতে মুশরিকদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, এরা এতই বোকা যে, নির্জীব ও চেতনাহীন প্রতিমাগুলোকে ঐ অসীম সত্তার সমতুল্য স্থির করে, যিনি প্রত্যেক ব্যক্তির রক্ষক ও তার ক্রিয়াকর্মের হিসাব রাখেন। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ এর আসল কারণ এই যে, শয়তান তাদের মূর্খতাকেই তাদের দৃষ্টিতে সুশোভন করে রেখেছে। তারা একেই সাফল্যের চরম পরাকাষ্ঠা ও কৃতকার্যতা মনে করে।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ

مِن وَاقٍ ﴿٣٤﴾ مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوا وَّعُقْبَى

الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ

وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ ﴿٣٦﴾ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ

حُكْمًا عَرَبِيًّا ۭ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاۗءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاۗءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ۝

(৩৪) দুনিয়ার জীবনেই এদের জন্য রয়েছে আযাব এবং অতি অবশ্য আখিরাতের জীবন কঠোরতম। আল্লাহ্‌র কবল থেকে তাদের কোন রক্ষাকারী নেই। (৩৫) পরহিযগারদের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাতের অবস্থা এই যে, তার নিম্নে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং ছায়াও। এটা তাদের প্রতিদান, যারা সাবধান হয়েছে এবং কাফিরদের প্রতিফল অগ্নি। (৩৬) এবং যাদেরকে আমি গ্রন্থ দিয়েছি, তারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তজ্জন্য আনন্দিত হয় এবং কোন কোন-দল এর কোন কোন বিষয় অস্বীকার করে। বলুন, আমাকে এরূপ আদেশই দেওয়া হয়েছে যে, আমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করি। এবং তাঁর সাথে অংশীদার না করি। আমি তাঁর দিকেই দাওয়াত দেই এবং তাঁর কাছেই আমার প্রত্যাবর্তন। (৩৭) এমনিভাবেই আমি এ কোরআনকে আরবী ভাষায় নির্দেশরূপে অবতারণ করেছি। যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন আপনার কাছে জ্ঞান পৌঁছার পর, তবে আল্লাহ্‌র কবল থেকে আপনার না কোন সাহায্যকারী আছে এবং না কোন রক্ষাকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কাফিরদের জন্য পার্থিব জীবনে (ও) শাস্তি রয়েছে (তা হচ্ছে হত্যা, বন্দীত্ব, অপমান অথবা রোগ-শোক ও বিপদাপদ)। এবং পরকালের শাস্তি এর চাইতে অনেক বেশী কঠোর (কেননা তা যেমন তীব্র, তেমনি চিরস্থায়ীও) এবং আল্লাহ্‌র (আযাব) থেকে তাদেরকে রক্ষাকারী কেউ হবে না (এবং) যে জান্নাতের ওয়াদা পরহিযগারদের সাথে (অর্থাৎ কুফর ও শিরক থেকে আত্মরক্ষাকারীদের সাথে) করা হয়েছে, তার অবস্থা এই যে, তার (দালান-কোঠা ও বৃক্ষাদির) তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে এবং ফল ও ছায়া সদা-সর্বদা থাকবে। এটা তো পরহিযগারদের পরিণাম এবং কাফিরদের পরিণাম হবে দোযখ। আর যাদেরকে আমি (ঐশী) গ্রন্থ (অর্থাৎ তওরাত ও ইনজীল) দিয়েছি (এবং তারা তা পুরোপুরি মেনে চলত) তারা এ গ্রন্থের কারণে আনন্দিত হয়েছে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। (কেননা তারা তাদের গ্রন্থে এর খবর পায়। তারা আনন্দিত হয়ে একে মেনে নেয় এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যেমন ইহুদীদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গীরা এবং খৃস্টানদের মধ্যে নাজ্জাশী ও তাঁর প্রেরিত লোকগণ। অন্যান্য আয়াতেও তাদের কথা উল্লিখিত আছে)। এবং তাদের দলের মধ্যেই কেউ কেউ এমন যে, এর (অর্থাৎ এ গ্রন্থের) কোন কোন অংশ (যাতে তাদের গ্রন্থের বিরুদ্ধে বিধানাবলী আছে) অস্বীকার করে (এবং কুফরী করে)। আপনি (তাদেরকে) বলুন: (বিধানাবলী দু'প্রকার মৌলিক ও শাখাগত। তোমরা যদি মৌলিক বিধানাবলীতে বিরুদ্ধাচরণ কর, তবে সেগুলো

সব শরীয়তে অভিন্ন। সেমতে) আমি (তওহীদ সম্পর্কে) আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করি এবং কাউকে তাঁর অংশীদার না করি (এবং নবুয়তের সম্পর্কে এই যে) আমি (মানুষকে) আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেই (অর্থাৎ নবুয়তের সারমর্ম এই যে, আমি আল্লাহ্‌র দিকে আহবানকারী) এবং (পরকাল সম্পর্কে আমার বিশ্বাস এই যে) তাঁর দিকেই আমাকে (দুনিয়া থেকে ফিরে) যেতে হবে। (অর্থাৎ এ তিনটি হচ্ছে মূলনীতি। এদের একটিও অস্বীকারোপযোগী নয়। তওহীদ সবার কাছে স্বীকৃত। অন্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا الخ ব্যক্ত করা হয়েছে। নবুয়তের ব্যাপারে আমি নিজের জন্য অর্থকড়ি ও নামযশ চাই না, যদ্দরুন অস্বীকারের অবকাশ হবে—শুধু আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেই। পূর্বেই এরূপ ব্যক্তি আবির্ভূত হয়েছেন, যাদেরকে তোমরাও স্বীকার কর। এ বিষয়বস্তুটিই অন্যত্র مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ الخ আয়াতে বিধৃত হয়েছে। এমনিভাবে পরকালের বিশ্বাস অভিন্ন, স্বীকৃত ও অনস্বীকার্য। পক্ষান্তরে যদি তোমরা শাখাগত বিধানে বিরোধী হও, তবে এর জওয়াব আল্লাহ্ তা'আলা দেন যে, আমি যেভাবে অন্যান্য পয়গম্বরকে বিশেষ বিশেষ ভাষায় বিধান দান করেছি) এমনিভাবে আমি এ (কোরআন) কে এভাবে নাযিল করেছি যে, এটা আরবী ভাষায় বিশেষ বিধান। (আরবী বলায় অন্যান্য পয়গম্বরের অন্যান্য ভাষার প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে এবং ভাষার পার্থক্য দ্বারা উম্মতের পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে। অতএব জওয়াবের সারমর্ম এই যে, শাখাগত বিধানে পার্থক্য উম্মতের পার্থক্যের কারণ হয়েছে। কেননা, প্রতি যুগের উম্মতের উপযোগিতা ছিল বিভিন্নরূপ। সুতরাং শরীয়তসমূহের পার্থক্য বিরুদ্ধাচরণের কারণ হতে পারে না। স্বয়ং তোমাদের সর্বজনস্বীকৃত শরীয়তসমূহেও শাখাগত পার্থক্য হয়েছে। এমতাবস্থায় তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ ও অস্বীকারের কি অবকাশ আছে?) এবং [হে মুহাম্মদ (সা)] যদি আপনি (অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে) তাদের মানসিক প্রবৃত্তি (অর্থাৎ রহিত বিধানাবলী অথবা পরিবর্তিত বিধানাবলী) অনুসরণ করেন আপনার কাছে (উদ্দিষ্ট বিধানাবলীর বিশুদ্ধ) জ্ঞান পৌঁছার পর, তবে, আল্লাহ্‌র কবর থেকে আপনার না কোন সাহায্যকারী হবে এবং না কোন উদ্ধারকারী হবে। (যখন পয়গম্বরকে এমন সম্বোধন করা হচ্ছে, তখন অন্য লোকেরা অস্বীকার করে কোথায় যাবে? এতে গ্রন্থধারীদের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং উভয় অবস্থাতেই অস্বীকারকারীও বিরুদ্ধাচরণকারীদের জওয়াব হয়ে গেছে।)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾ وَإِن

مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ
وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ
أَطْرَافِهَا ۚ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝٤١
وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ
كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ۝٤٢ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهُ
عِلْمُ الْكِتٰبِ ۝٤٣

(৩৮) আপনার পূর্বে আমি অনেক রসূল প্রেরণ করেছি এবং তাঁদেরকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। কোন রসূলের এমন সাধ্য ছিল না যে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করে। প্রত্যেকটি ওয়াদা লিখিত আছে। (৩৯) আল্লাহ্ যা ইচ্ছা, মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন এবং মূলগ্রন্থ তাঁর কাছেই রয়েছে। (৪০) আমি তাদের সাথে যে ওয়াদা করেছি, তার কোন একটি যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই কিংবা আপনাকে উঠিয়ে নেই, তাতে কি---আপনার দায়িত্ব তো পৌঁছে দেওয়া এবং আমার দায়িত্ব হিসাব নেওয়া। (৪১) তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে সমানে সংকুচিত করে আসছি? আল্লাহ্ নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন। (৪২) তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা চক্রান্ত করেছে। আর সকল চক্রান্ত তো আল্লাহ্‌র হাতেই আছে। তিনি জানেন প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে। কাফিররা জেনে নেবে যে, পর জীবনের আবাসস্থল কাদের জন্য রয়েছে। (৪৩) কাফিররা বলে ঃ আপনি প্রেরিত ব্যক্তি নন। বলে দিন, আমার ও তোমাদের মধ্যে প্রকৃষ্ট সাক্ষী হচ্ছেন আল্লাহ্ এবং ঐ ব্যক্তি, যার কাছে গ্রন্থের জ্ঞান আছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (গ্রন্থধারীদের মধ্যে কেউ কেউ যে পয়গম্বরের প্রতি দোষারোপ করে তাঁর অনেক পত্নী রয়েছে, এর জওয়াব এই যে) আমি নিশ্চিতই আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততিও দিয়েছি (এটা পয়গম্বরীর পরিপন্থী বিষয় হল কিরূপে? এমন বিষয়বস্তু অন্য একটি আয়াতেও এভাবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ

عَلٰى مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ الخ) এবং (শরীয়তসমূহের পার্থক্যের সন্দেহটি অন্যান্য সন্দেহের চাইতে ছিল অধিক আলোচিত এবং পূর্বে খুব সংক্ষেপে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল, তাই পরবর্তী আয়াতে একে পুনর্বারও বিস্তারিত উল্লেখ করা হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি নবীর বিরুদ্ধে শরীয়তসমূহের পার্থক্যের প্রশ্ন তোলে, সে পরোক্ষভাবে নবীকে বিধানের মালিক মনে করে। অথচ কোন পয়গম্বরের ক্ষমতা নেই যে, একটি আয়াত (অর্থাৎ একটি বিধান) আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া (নিজের পক্ষ থেকে) উপস্থিত করতে পারে। (বরং বিধানাবলী নির্ধারিত হওয়া আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং আল্লাহ্‌র রহস্য ও উপযোগিতার দিক দিয়ে এরূপ রীতি আছে যে) প্রত্যেক যুগের উপযোগী বিশেষ বিশেষ বিধান হয় (এরপর অন্য যুগে কোন কোন ব্যাপারে অন্য বিধান আসে এবং পূর্ববর্তী বিধান মওকুফ হয়ে যায়। অবশ্য কোন কোন বিধান হুবহু বহাল থাকে। সুতরাং) আল্লাহ্ তা'আলা (-ই) যে বিধানকে ইচ্ছা মওকুফ করে দেন এবং যে বিধানকে ইচ্ছা বহাল রাখেন এবং মূল গ্রন্থ (অর্থাৎ লওহে মাহফুয) তাঁর কাছেই রয়েছে। (সব মওকুফকারী, মওকুফ ও প্রচলিত বিধান তাতে লিপিবদ্ধ আছে। সেটি সর্বাত্মক এবং যেন মূল ভাণ্ডার। অর্থাৎ যে স্থান থেকে এসব বিধান আসে, সে আল্লাহ্ তা'আলারই অধিকারভুক্ত। কাজেই সাবেক বিধানের অনুকূল কিংবা প্রতিকূল বিধান আনার ক্ষমতাও অবশ্যই কারও হতে পারে না।) এবং (তারা যে এ কারণে নবুয়ত অস্বীকার করে যে, আপনি নবী হলে নবুয়ত অস্বীকার করার কারণে যে আযাবের ওয়াদা করা হয়, তা নাযিল হয় না কেন? সে সম্পর্কে শুনে নিন) যে বিষয়ের (অর্থাৎ আযাবের) ওয়াদা আমি তাদের সাথে (নবুয়ত অস্বীকার করার কারণে) করেছি, যদি তার কিয়দংশ আমি আপনাকে দেখাই (অর্থাৎ আপনার জীবদ্দশায় কোন আযাব তাদের উপর নাযিল হয়ে যায়) কিংবা (আযাব নাযিল হওয়ার আগে) আমি আপনাকে ওফাত দান করি (এবং পরে আযাব নাযিল হয়---দুনিয়াতে হোক কিংবা পরকালে, উভয় অবস্থাতেই আপনি চিন্তিত হবেন না। কেননা) আপনার দায়িত্ব শুধু (বিধানাবলী) পৌঁছে দেওয়া এবং হিসাব নেওয়া আমার কাজ। আপনি কেন চিন্তিত হবেন যে, আযাব এসে গেলে সম্ভবত বিশ্বাস স্থাপন করত। আশ্চর্যের বিষয়, তারাও কুফরীর কারণে আযাব আসার কথা কিরূপে সোজাসুজি অস্বীকার করছে। তারা কি (আযাবের প্রথমাংশের মধ্য থেকে) এ বিষয়টি দেখছে না যে, আমি (ইসলামের বিজয়ের মাধ্যমে তাদের) দেশকে চতুর্দিক থেকে সমানে হ্রাস করে আসছি (অর্থাৎ ইসলামী বিজয়ের অগ্রগতির কারণে তাদের শাসনাধীন এলাকা দিন দিনই কমে আসছে। এটাও তো এক প্রকার আযাব---যা আসল আযাবের প্রথমাংশ; যেমন অন্য আয়াতে আছে وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ) এবং আল্লাহ্ যা চান, আদেশ করেন। তাঁর আদেশকে রদ করার কেউ নেই। (সুতরাং ছোট কিংবা বড়, যে আযাবই হোক, তাকে তাদের শরীক কিংবা

অন্য কেউ খণ্ডন করতে পারে না) এবং (যদি তারা কিছু সময়ও পায়, তাতে কি) তিনি খুব দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সময় আসার অপেক্ষা মাত্র। এরপর তৎক্ষণাৎ প্রতিশ্রুত সাজা শুরু হয়ে যাবে) এবং (এরা যে রসূল-পীড়ন কিংবা ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার কাজে নানা রকম কলাকৌশল অবলম্বন করছে, এতে কিছু আসে যায় না। সেমতে তাদের) পূর্বে যারা (কাফির) ছিল, তারা (ও এসব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য) বড় বড় চক্রান্ত করেছে। অতএব (কিছুই হয়নি। কেননা) আসল কলাকৌশল তো আল্লাহ্ তা'আলারই। (তাঁর সামনে কারও কলাকৌশল চলে না। তাই আল্লাহ্ তাদের কলাকৌশল ব্যর্থ করে দিয়েছেন।) এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে, তিনি সব জানেন। (এরপর সময়মত তাকে শাস্তি দেন) এবং (এমনিভাবে কাফিরদের কাজ-কর্মও তিনি সব জানেন। অতএব) কাফিররা সত্বরই জানতে পারবে যে, এ জগতে সুপরিণাম কার ভাগে রয়েছে? (তাদের না মুসলমানদের? অর্থাৎ সত্বরই তারা স্বীয় মন্দ পরিণাম ও কর্মের শাস্তি জানতে পারবে।) এবং কাফিররা (এসব শাস্তি বিস্মৃত হয়ে) বলে: (নাউযুবিল্লাহ) আপনি পয়গম্বর নন। আপনি বলে দিন: (তোমাদের অর্থহীন অস্বীকারে কি হয়) আমার ও তোমাদের মধ্যে (আমার নবুয়ত সম্পর্কে) আল্লাহ্ তা'আলা এবং ঐ ব্যক্তি, যার কাছে (ঐশী) গ্রন্থের জ্ঞান আছে (যাতে আমার নবুয়তের সত্যায়ন আছে) প্রকৃষ্ট সাক্ষী। (অর্থাৎ কিতাবী সম্প্রদায়ের ঐসব আলিম, যারা ন্যায়-পরায়ণ ছিলেন এবং নবুয়তের ভবিষ্যদ্বাণী দেখে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, আমার নবুয়তের দুটি প্রমাণ আছে: যুক্তিগত ও ইতিহাসগত। যুক্তিগত প্রমাণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নবুয়তের প্রমাণ হিসাবে মু'জিযা দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষী হওয়ার অর্থ তাই। ইতিহাসগত প্রমাণ এই যে, পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহে এর সংবাদ বিদ্যমান রয়েছে। বিশ্বাস না হলে ন্যায়পরায়ণ আলিমদের কাছে জিজ্ঞেস কর। তারা প্রকাশ করে দেবেন। অতএব, যুক্তিগত ও ইতিহাসগত প্রমাণাদি সত্ত্বেও নবুয়ত অস্বীকার করা দুর্ভাগ্য বৈ কিছু নয়। কোন বুদ্ধিমানের এ ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া উচিত নয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নবী-রসূল সম্পর্কে কাফির ও মুশরিকদের একটি সাধারণ ধারণা ছিল এই যে, তাদের মানুষ ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টজীব যেমন ফেরেশতা হওয়া দরকার। ফলে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিতর্কের উর্ধ্বে থাকবে। কোরআন পাক তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জওয়াব একাধিক আয়াতে দিয়ে বলেছে যে, তোমরা নবুয়ত-রিসালতের স্বরূপ ও রহস্যই বোঝনি। ফলে এ ধরনের কল্পনায় মেতে উঠেছ। রসূলকে আল্লাহ্ তা'আলা একটি আদর্শ হিসাবে প্রেরণ করেন, যাতে উম্মতের সবাই তাঁর অনুসরণ করে এবং তাঁর মতই কাজকর্ম ও চরিত্র শিক্ষা করে। বলা বাহুল্য, মানুষ তার স্বজাতীয় মানুষেরই অনুসরণ করতে পারে। স্বজাতীয় নয়—এরূপ কোন অমানবের অনুসরণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব-পর নয়। উদাহরণত ফেরেশতার ক্ষুধা নেই, পিপাসা নেই এবং মানসিক প্রবৃত্তির সাথেও তার কোন সম্পর্ক নেই। তার নিদ্রা আসে না এবং গৃহেরও প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় মানুষকে তার অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হলে তা সাধ্যাতীত কাজের নির্দেশ হয়ে যেত। এখানেও মুশরিকদের পক্ষ থেকে এ আপত্তিই উত্থাপিত হল। বিশেষ করে রসূলুল্লাহ্

(সা)-র বহু বিবাহ থেকে তাদের এ সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। এর জওয়াব প্রথম আয়াতের বাক্যগুলোতে দেওয়া হয়েছে যে, এক অথবা একাধিক বিবাহ করা এবং স্ত্রী-পুত্র পরিজন বিশিষ্ট হওয়াকে তোমরা কোন্ প্রমাণের ভিত্তিতে নবুয়ত ও রিসালতের পরিপন্থী মনে করে নিয়েছ ? সৃষ্টির আদিকাল থেকেই আল্লাহ্ তা'আলার চিরন্তন রীতি এই যে, তিনি পয়গম্বরদেরকে পরিবার-পরিজন বিশিষ্ট করেছেন। অনেক পয়গম্বর অতিক্রান্ত হয়েছেন এবং তাদের মধ্যে অনেকের নবুয়তের প্রবক্তা তোমরাও। তাদের সবাই একাধিক পত্নীর অধিকারী ছিলেন এবং তাদের সন্তানাদিও ছিল। অতএব একে নবুয়ত, রিসালাত অথবা সাধুতা ও ওলী হওয়ার খেলাফ মনে করা মূর্খতা বৈ নয়।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি তো রোযাও রাখি এবং রোযা ছাড়াও থাকি ; (অর্থাৎ আমি এমন নই যে, সব সময়ই রোযা রাখব)। তিনি আরও বলেন ঃ আমি রাত্রিতে নিদ্রাও যাই এবং নামাযের জন্য দণ্ডায়মানও হই ; (অর্থাৎ এমন নই যে, সারা রাত কেবল নামাযই পড়ব)। এবং মাংসও ভক্ষণ করি এবং নারীদেরকে বিবাহও করি। যে ব্যক্তি আমার এ সুন্নতকে আপত্তিকর মনে করে, সে মুসলমান নয়।

مَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ — অর্থাৎ কোন রসূলের এ ক্ষমতা নেই যে, সে আল্লাহ্র নির্দেশ ছাড়া একটি আয়াতও নিজে আনতে পারে।

কাফির ও মুশরিকরা সদাসর্বদা যেসব দাবী পয়গম্বরদের সামনে করে এসেছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনেও সমসাময়িক মুশরিকরা যে সব দাবী করেছে, তন্মধ্যে দুটি দাবী ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। এক. আল্লাহ্র কিতাবে আমাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী বিধি-বিধান অবতীর্ণ হোক। যেমন সূরা ইউনুসে তাদের এ আবেদন উল্লিখিত আছে যে, اِئْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ —অর্থাৎ আপনি বর্তমান কোরআনের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোরআন আনুন, যাতে আমাদের প্রতিমাসমূহের উপাসনা নিষিদ্ধ করা না হয় অথবা আপনি নিজেই এর আনীত বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দিন—আযাবের জায়গায় রহমত এবং হারামের জায়গায় হালাল করে দিন।

দুই. পয়গম্বরদের সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও নতুন নতুন মু'জিযা দাবী করে বলা যে, অমুক ধরনের মু'জিযা দেখালে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। কোরআন পাকের উপরোক্ত বাক্যে اٰيَةً শব্দ দ্বারা উভয় অর্থই হতে পারে। কারণ কোরআনের পরিভাষায় কোরআনের আয়াতকেও আয়াত বলা হয় এবং মু'জিযাকেও। এ কারণেই 'এ আয়াত' শব্দের ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরবিদ কোরআনী আয়াত অর্থ ধরে উদ্দেশ্য এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, কোন পয়গম্বরের এরূপ ক্ষমতা নেই যে, নিজের পক্ষ থেকে কোন আয়াত তৈরী করে নেবেন। কেউ কেউ এ আয়াতের অর্থ মু'জিযা ধরে ব্যাখ্যা করেছেন যে, কোন রসূল ও নবীকে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ ক্ষমতা দেননি যে, যখন ইচ্ছা, যে ধরনের

ইচ্ছা মু'জিযা প্রকাশ করেন। তফসীর রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, عموم مجاز এর কায়দা অনুযায়ী এখানে উভয়বিধ অর্থ হতে পারে এবং উভয় তফসীর বিশুদ্ধ হতে পারে।

এ দিক দিয়ে আলোচ্য আয়াতের সার বিষয়বস্তু এই যে, আমার রসূলের কাছে কোরআনী আয়াত পরিবর্তন করার দাবী অন্যায় ও ভ্রান্ত। আমি কোন রসূলকে এরূপ ক্ষমতা দেইনি। এমনিভাবে কোন বিশেষ ধরনের মু'জিযা দাবী করাও নবুয়তের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। কেননা, কোন নবী ও রসূলের এরূপ ক্ষমতা থাকে না যে, লোকদের খাহেশ অনুযায়ী মু'জিযা প্রদর্শন করবেন।

لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ এখানে اجل শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট সময় ও মেয়াদ, كتاب শব্দটি এখানে ধাতু। এর অর্থ লিখা। বাক্যের অর্থ এই যে, প্রত্যেক বস্তুর মেয়াদ ও পরিমাণ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে লিখিত আছে। তিনি সৃষ্টির সূচনালগ্নে লিখে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং এতদিন জীবিত থাকবে। কোথায় কোথায় যাবে, কি কি কাজ করবে এবং কখন ও কোথায় মরবে, তাও লিখিত আছে।

এমনিভাবে একথাও লিখিত আছে যে, অমুক যুগে অমুক পয়গম্বরের প্রতি কি ওহী এবং কি কি বিধি-বিধান অবতীর্ণ হবে। কেননা, প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক জাতির উপযোগী বিধি-বিধান আসতে থাকাই যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়ানুগ। আরও লিখিত আছে যে, অমুক পয়গম্বর দ্বারা অমুক সময়ে এই এই মু'জিযা প্রকাশ পাবে।

তাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এরূপ দাবী করা যে, অমুক ধরনের বিধি-বিধান পরিবর্তন করান অথবা অমুক ধরনের মু'জিযা দেখান---এটি একটি হঠকারিতাপূর্ণ ও ভ্রান্ত দাবী, যা রিসালত ও নবুয়তের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতার ওপর ভিত্তিশীল।

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗ اُمُّ الْكِتَابِ এখানে ام الكتاب এর শাব্দিক অর্থ মূলগ্রন্থ। এতে লওহে মাহ্ফুয বোঝানো হয়েছে, যাতে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতে পারে না।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি ও অসীম রহস্য জ্ঞান দ্বারা যে বিষয়কে ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যে বিষয়কে ইচ্ছা বহাল ও বিদ্যমান রাখেন। এরপর যা কিছু হয়, তা আল্লাহ্র কাছে সংরক্ষিত থাকে। এর উপর কারও কোন ক্ষমতা চলে না এবং তাতে হ্রাসবৃদ্ধিও হতে পারে না।

তফসীরবিদদের মধ্যে সায়ীদ ইবনে জারীর, কাতাদাহ প্রমুখ এ আয়াতটিকেও আহকাম ও বিধি-বিধানের নসখ্ তথা রহিতকরণ বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত সাব্যস্ত করেছেন। তাঁদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক জাতির জন্য বিভিন্ন পয়গম্বরের মাধ্যমে স্বীয় গ্রন্থ নাযিল করেন। এসব গ্রন্থে যেসব বিধি-বিধান ও ফরায়েয বর্ণিত হয়, সেগুলো চিরস্থায়ী ও সর্বকালে প্রযোজ্য থাকা জরুরী নয়,

বরং জাতিসমূহের অবস্থা ও যুগের পরিবর্তনের সাথে মিল রেখে রহস্যজ্ঞানের মাধ্যমে তিনি যেসব বিধান মিটিয়ে দিতে চান, সেগুলো মিটিয়ে দেন এবং যেগুলো বাকী রাখতে চান সেগুলো বাকী রাখেন। এবং মূল গ্রন্থ সর্বাবস্থায় তাঁর কাছে সংরক্ষিত থাকে। তাতে পূর্বেই লিখিত আছে যে, অমুক জাতির জন্য নাযিলকৃত অমুক বিধানটি একটি বিশেষ মেয়াদের জন্য অথবা বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধার্যকৃত হয়েছে। সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কিংবা অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেলে বিধানটিও পরিবর্তিত হয়ে যাবে। মূলগ্রন্থে এর মেয়াদ নির্ধারণের সাথে সাথে একথাও লিপিবদ্ধ আছে যে, এ বিধানটি পরিবর্তন করে তার স্থলে কোন্ বিধান আনয়ন করা হবে।

এ থেকে এ সন্দেহও দূরীভূত হয়ে গেল যে, আল্লাহ্র বিধান কোন সময়ই রহিত না হওয়া উচিত। কারণ, কোন বিধান জারি করার পর তা রহিত করে দিলে বোঝা যায় যে, বিধানদাতা পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ছিলেন না। তাই পরিস্থিতি দেখার পর বিধানটি পরিবর্তন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্র শান এর অনেক উর্ধ্বে। কোন বিষয় তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই। উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, যে নির্দেশটি রহিত করা হয়, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ব থেকেই জানেন যে, এ বিধান মাত্র এতদিনের জন্য জারি করা হয়েছে; এরপর পরিবর্তন করা হবে। উদাহরণত রোগীর অবস্থা দেখে ডাক্তার অথবা হাকীম তখনকার অবস্থার উপযোগী কোন ওষুধ মনোনীত করেন এবং তিনি জানেন যে, এ ওষুধের এই ক্রিয়া হবে। এরপর এই ওষুধ পরিবর্তন করে অন্য ওষুধ দেওয়া হবে। মোটকথা, এই তফসীর অনুযায়ী আয়াতে 'মিটানো' ও 'বাকী রাখার' অর্থ বিধানাবলীকে রহিত করা ও অব্যাহত রাখা।

সুফীয়ান সওরী, ওয়াকী প্রমুখ তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ আয়াতের ভিন্ন তফসীর বর্ণনা করেছেন। তাতে আয়াতের বিষয়বস্তুকে ভাগ্যলিপির সাথে সম্পর্কযুক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সৃষ্টজীবের ভাগ্য তথা প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স, সারা জীবনের রিযিক, সুখ কিংবা বিপদ এবং এসব বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্ তা'আলা সূচনালগ্নে সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অতঃপর সন্তান জন্মগ্রহণের সময় ফেরেশতাদেরকেও লিখিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রতি বছর শবে কদরে এ বছরের ব্যাপারাদির তালিকা ফেরেশ-তাদেরকে সোপর্দ করা হয়।

মোট কথা এই যে, প্রত্যেক সৃষ্টজীবের বয়স, রিযিক, গতিবিধি ইত্যাদি সব নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ ভাগ্যলিপি থেকে যতটুকু ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যতটুকু ইচ্ছা বহাল রাখেন। وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ —অর্থাৎ মিটানো ও বহাল রাখার পর যে মূলগ্রন্থ অবশেষে কার্যকর হয়, তা আল্লাহ্র কাছে রয়েছে। এতে কোন পরিবর্তন হতে পারে না।

বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। অনেক সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, কোন কোন কর্মের দরুন মানুষের বয়স ও রিযিক বৃদ্ধি পায় এবং কোন কোন কর্মের দরুন হ্রাস পায়।

সহীহ্ বুখারীতে আছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা বয়স বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। মসনদ-আহমদের রেওয়ায়েতে আছে, মানুষ মাঝে মাঝে এমন গোনাহ করে, যার কারণে তাকে রিযিক থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়। পিতামাতার সেবা-যত্ন ও আনুগত্যের কারণে বয়স বৃদ্ধি পায়। দোয়া ব্যতীত কোন বস্তু তকদীর খণ্ডন করতে পারে না।

এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কারও ভাগ্যলিপিতে যে বয়স, রিযিক ইত্যাদি লিখে দিয়েছেন, তা কোন কোন কর্মের দরুন কম অথবা বেশী হতে পারে এবং দোয়ার কারণেও তা পরিবর্তিত হতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ভাগ্যলিপিতে বয়স, রিযিক বিপদ অথবা সুখ ইত্যাদিতে কোন কর্ম অথবা দোয়ার কারণে যে পরিবর্তন হয়, তা ঐ ভাগ্য-লিপিতে হয়, যা ফেরেশতাদের হাতে অথবা জ্ঞানে থাকে। এতে কোন সময় কোন নির্দেশ বিশেষ শর্তের সাথে সংযুক্ত থাকে। শর্তটি পাওয়া না গেলে নির্দেশটিও বাকী থাকে না। এ শর্তটি কোন সময় লিখিত আকারে ফেরেশতাদের জ্ঞানে থাকে এবং কোন সময় অলিখিত আকারে শুধু আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানে থাকে। ফলে নির্দেশটি যখন পরিবর্তন করা হয়, তখন সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। এ ভাগ্যকে 'মুআল্লাক' (ঝুলন্ত) বলা হয়। আলোচ্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এতে 'মিটানো' ও 'বাকী রাখা'র কাজ অব্যাহত থাকে। কিন্তু আয়াতে শেষ বাক্য وَعِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ ব্যক্ত করেছে যে, 'মুআল্লাক ভাগ্য' ছাড়া একটি 'মুবরাম' (চূড়ান্ত) ভাগ্য আছে, যা মূল গ্রন্থে লিখিত অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে রয়েছে। তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জানার জন্যই। এতে ঐসব বিধান লিখিত হয়, যে-গুলো কর্ম ও দোয়ার শর্তের পর সর্বশেষ ফলাফল হয়ে থাকে। এ জন্যই এটা মিটানো ও বহাল রাখা এবং হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। —(ইবনে কাসীর)

وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, ইসলাম চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে এবং কুফর ও কাফিররা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। আল্লাহ্র এ ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কিন্তু আপনি এরূপ চিন্তা করবেন না যে, এ বিজয় কবে হবে। সম্ভবত আপনার জীবদ্দশাতেই হবে এবং এটাও সম্ভব যে, আপনার ওফাতের পরে হবে। আপনার মানসিক প্রশান্তির জন্য তো এটাই যথেষ্ট যে, আপনি অহরহ দেখছেন, আমি কাফিরদের ভূখণ্ড চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে দিচ্ছি অর্থাৎ এসব দিক মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের অধিকৃত এলাকা হ্রাস পাচ্ছে। এভাবে একদিন এ বিজয় চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে। নির্দেশ আল্লাহ্র হাতেই। তার নির্দেশ খণ্ডনকারী কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

سورة ابـراهيـم

সূরা ইবরাহীম

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৫২ আয়াত ঃ ৭ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۝ الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۗ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ۝

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু।

(১) আলিফ-লাম-রা; এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি---যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন---পরাক্রান্ত, প্রশংসার যোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে। (২) তিনি আল্লাহ্; যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সব কিছুর মালিক। কাফিরদের জন্য বিপদ রয়েছে, কঠোর আযাব; (৩) যারা পরকালের চাইতে পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে, আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান করে এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে, তারা পথ ভুলে দূরে পড়ে আছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলিফ-লাম-রা; (এর অর্থ তো আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন), এটি (কোরআন) একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি (এর সাহায্যে) সব মানুষকে তাদের পালনকর্তার নির্দেশে (প্রচার পর্যায়ে কুফরের) অন্ধকার থেকে বের করে (ঈমান ও হিদায়তের) আলোর দিকে (অর্থাৎ) পরাক্রান্ত, প্রশংসিত সত্তার পথের দিকে আনয়ন করেন (আলোর দিকে আনার অর্থ হচ্ছে আলোর পথ বলে দেওয়া)। যিনি এমন আল্লাহ্ যে,

নভোমণ্ডলে যা আছে এবং ভূমণ্ডলে যা আছে, তিনি সেসবের মালিক এবং (যখন এ গ্রন্থ আল্লাহ্‌র পথ বলে দেয়, তখন) বড় পরিতাপ অর্থাৎ কঠোর শাস্তি কাফিরদের জন্য, যারা (এ পথ নিজেরা তো কবূল করেই না ; বরং) পার্থিব জীবনকে পরকালের উপর অগ্রাধিকার দেয়, (ফলে ধর্মের অন্বেষণ করে না) এবং (অন্যদেরকেও এ পথ অবলম্বন করতে দেয় না, বরং) আল্লাহ্‌র এ (উল্লিখিত) পথে বাধাদান করে এবং তাতে বক্রতা (অর্থাৎ নানাবিধ সন্দেহ) অন্বেষণ করে (যদ্দ্বারা অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারে)। তারা খুব দূরবর্তী পথভ্রষ্টতায় পতিত আছে। (অর্থাৎ এ পথভ্রষ্টতা সত্য থেকে অনেক দূরবর্তী)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ও তার বিষয়বস্তু ঃ এটা কোরআন পাকের চতুর্দশতম সূরা—'সূরা ইবরাহীম'। এটা মক্কায় হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কতিপয় আয়াত সম্পর্কে মতভেদ আছে যে, মক্কায় হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ, না মদীনায় অবতীর্ণ।

এ সূরার শুরুতে রিসালাত, নবুয়ত ও এসবের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা হয়েছে এবং এর সাথে মিল রেখেই সূরার নাম 'সূরা ইবরাহীম' রাখা হয়েছে।

الٓر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

الٓر— এগুলো খণ্ড অক্ষর। এগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কে বারবার বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসৃত পন্থাই হচ্ছে সব চাইতে নির্মল ও স্বচ্ছ অর্থাৎ এরূপ বিশ্বাস রাখা যে, এ সবের যা অর্থ, তা সত্য। এগুলোর অর্থ কি, সে ব্যাপারে খোঁজাখুঁজি সমীচীন নয়।

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ—ব্যাকরণের দিক দিয়ে একে هذا এর خبر সাব্যস্ত করে এরূপ অর্থ নেওয়াই অধিক স্পষ্ট যে, এটা ঐ গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। এতে অবতীর্ণ করার কাজটি আল্লাহ্‌র দিকে সম্পৃক্ত করা এবং সম্বোধন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দিকে করার মধ্যে দু'টি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এক. এ গ্রন্থটি অত্যন্ত মহান। কারণ একে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন। দুই. রসূলুল্লাহ্ (সা) উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কারণ তিনি এ গ্রন্থের প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি।

لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ এখানে نَاس

শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল যুগের মানুষই বোঝান হয়েছে। ظلمات শব্দটি ظلمة এর বহুবচন। এর অর্থ অন্ধকার। এখানে ظلمات বলে কুফর শিরক ও মন্দকর্মের অন্ধকারসমূহ এবং نور বলে ঈমানের আলো বোঝান হয়েছে। এজন্যই ظلمات শব্দটির বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা কুফর ও শিরকের প্রকার অনেক। এমনিভাবে মন্দ কর্মের সংখ্যাও গণনার বাইরে। পক্ষান্তরে نور শব্দটি একবচনে আনা হয়েছে। কেননা, ঈমান ও সত্য এক। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি এ গ্রন্থ এজন্য আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি এর সাহায্যে বিশ্বের মানুষকে কুফর, শিরক ও মন্দ কর্মের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের পালনকর্তার আদেশক্রমে ঈমান ও সত্যের আলোর দিকে আনয়ন করেন। এখানে رب শব্দটি প্রয়োগ করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, গ্রন্থ ও পয়গম্বরের সাহায্যে সর্ব স্তরের মানুষকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দেওয়া—আল্লাহ্ তা'আলার এ অনুগ্রহের একমাত্র কারণ হচ্ছে ঐ কৃপা ও মেহেরবাণী, যা মানব জাতির স্রষ্টা ও প্রভু প্রতিপালকত্বের কারণে মানবজাতির প্রতি নিয়োজিত করে রেখেছেন। নতুবা আল্লাহ্ তা'আলার যিম্মায় না কারও কোন পাওনা আছে এবং না কারও জোর তাঁর উপর চলে।

হিদায়ত শুধু আল্লাহ্র কাজ : আলোচ্য আয়াতে অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে আলোর দিকে আনয়ন করাকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অথচ হিদায়ত দান করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ; যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

إِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ—অর্থাৎ আপনি নিজ ক্ষমতাবলে কোন প্রিয়জনকে হিদায়ত দিতে পারেন না; বরং আল্লাহ্ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা হিদায়ত দেন। এজন্যই আলোচ্য আয়াতে بِإِذْنِ رَبِّهِمْ কথাটি যুক্ত করে এ সন্দেহ দূর করে দেওয়া হয়েছে। কেননা এতে আয়াতের অর্থ এই হয়েছে যে, কুফর ও শিরকের অন্ধকার থেকে বের করে ঈমান ও সৎকর্মের আলোর মধ্যে আনয়ন করার ক্ষমতা যদিও মূলত আপনার হাতে নেই, কিন্তু আল্লাহ্র আদেশ ও অনুমতিক্রমে আপনি তা করতে পারেন।

বিধান ও নির্দেশ : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, মানবজাতিকে মন্দ কর্মের অন্ধকার থেকে বের করা এবং আলোর মধ্যে আনয়ন করার একমাত্র উপায় এবং মানব ও মানবতাকে ইহকাল ও পরকালে ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি দেওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে কোরআন পাক। মানুষ যতই এর নিকটবর্তী হবে, ততই তারা ইহকালেও সুখ-শান্তি নিরাপত্তা ও মনস্তুষ্টি লাভ করবে এবং পরকালেও সাফল্য ও কামিয়াবি অর্জন করবে। পক্ষান্তরে তারা যতই এ থেকে দূরে সরে পড়বে, ততই উভয় জাহানের দুঃখ ক্ষতি, আপদ-বিপদ ও অস্থিরতার গহ্বরে পতিত হবে।

আয়াতের ভাষায় এ-কথা ব্যক্ত করা হয়নি যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কোরআনের সাহায্যে কিভাবে মানুষকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে আলোর মধ্যে আনয়ন করবেন। কিন্তু এতটুকু অজানা নয় যে, কোন গ্রন্থের সাহায্যে কোন জাতিকে সংশোধন করার উপায় হচ্ছে গ্রন্থের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহকে জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া এবং তাদেরকে এর অনুসারী করা।

কোরআন পাকের তিলাওয়াত একটি স্বতন্ত্র লক্ষ্য : কিন্তু কোরআন পাকের আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এর তিলাওয়াত অর্থাৎ অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করে শুধু শব্দাবলী পাঠ করাও মানুষের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে। কমপক্ষে কুফর ও শিরকের যত মনোমুগ্ধকর জালই হোক, কোর-আন তিলাওয়াতকারী অর্থ না বুঝলেও এ জালে আবদ্ধ হতে পারে না। হিন্দুদের শুদ্ধি সংগঠন আন্দোলনের সময় এটা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে, তাদের জালে এমন কিছু সংখ্যক মুসলমানই মাত্র আবদ্ধ হয়েছিল, যারা কোরআন তিলাওয়াতেও অভ্যস্ত ছিল। আজকাল খৃস্টান মিশনারীরা প্রত্যেকটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় নানা ধরনের প্রলোভন ও সেবা প্রদানের জাল নিয়ে ঘোরাফেরা করে। কিন্তু ওদের প্রভাব শুধুমাত্র এমন পরিবারের উপরই পড়ে যারা মূর্খতার কারণে অথবা নব্যশিক্ষার কুপ্রভাবে কোরআন তিলাওয়াত থেকেও গাফিল।

সম্ভবত এই তাত্ত্বিক প্রভাবের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য কোরআন পাকে যেখানে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে অর্থ শিক্ষাদানের পূর্বে তিলাওয়াতকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ—অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তিনটি কাজের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এক. কোরআন পাকের তিলাওয়াত। বলা বাহুল্য, তিলাওয়াত শব্দের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থ বোঝা হয়—তিলাওয়াত করা হয় না। দুই. মানুষকে মন্দ কাজকর্ম থেকে পবিত্র করা। তিন. কোরআন পাক ও হিকমত অর্থাৎ সুন্নাহ্র শিক্ষা দান করা।

মোট কথা, কোরআন এমন একটি হিদায়তনামা, যার অর্থ বুঝে তদনুযায়ী কাজ করার মূল লক্ষ্য ছাড়াও মানব জীবনের সংশোধনে এর ক্রিয়াশীল হওয়াও সুস্পষ্ট; এতদ-সংগে এর শব্দাবলী তিলাওয়াত করাতেও অজ্ঞাতভাবে মানব মনের সংশোধনে প্রভাব বিস্তার করে।

এ আয়াতে আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনার কাজকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, যদিও হিদায়ত সৃষ্টি করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার কাজ। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে এটা অর্জন করা যায় না। কোরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যাও তাই গ্রহণযোগ্য, যা রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় উক্তি ও কর্ম দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এর বিপরীত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ- اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

—এ আয়াতের শুরুতে যে অন্ধকার ও আলোর উল্লেখ করা হয়েছিল, বলা বাহুল্য, তা ঐ অন্ধকার ও আলো নয়, যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায়। তাই তা ফুটিয়ে তোলার জন্য এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, ঐ আলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথ। এই পথে যারা চলে, তারা অন্ধকারে চলাচলকারীর অনুরূপ পথভ্রান্ত হয় না, হোঁচট খায় না এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে বিফল মনোরথ হয় না। আল্লাহ্‌র পথ বলে ঐ পথ বোঝান হয়েছে, যেপথে চলে মানুষ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে এবং তাঁর সন্তুষ্টির মর্যাদা অর্জন করতে পারে।

এ স্থলে আল্লাহ্ শব্দটি পরে এবং তাঁর আগে তাঁর দু'টি গুণবাচক নাম عزيز ও حميد উল্লেখ করা হয়েছে। عزيز শব্দের অর্থ শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত এবং حميد শব্দের অর্থ ঐ সত্তা, যিনি প্রশংসার যোগ্য। এ দু'টি গুণবাচক শব্দকে আসল নামের পূর্বে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ পথ পথিককে যে সত্তার দিকে নিয়ে যায়, তিনি পরাক্রান্তও এবং প্রশংসার যোগ্যও। ফলে এ পথের পথিক কোথাও হোঁচট খাবে না এবং তার প্রচেষ্টা বিফলে যাবে না ; বরং তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছা সুনিশ্চিত। শর্ত এই যে, এ পথ ছাড়তে পারবে না।

আল্লাহ্ তা'আলার এ দু'টি গুণ আগে উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ —অর্থাৎ তিনি ঐ সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব কিছুর স্রষ্টা ও মালিক। এতে কোন অংশীদার নেই।

وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ - ويل—শব্দের অর্থ কঠোর শাস্তি ও বিপর্যয়। অর্থ এই যে, যারা কোরআনরূপী নিয়ামত অস্বীকার করে এবং অন্ধকারেই থাকতে পছন্দ করে, তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস ও বরবাদী, ঐ কঠোর আযাবের কারণে যা তাদের উপর আপতিত হবে।

সারকথা ঃ আয়াতের সারমর্ম এই যে, সব মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আল্লাহ্‌র পথের আলোতে আনার জন্য কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু যে হতভাগা কোরআনকেই অস্বীকার করে, সে নিজেই নিজেকে আযাবে নিক্ষেপ করে। কোরআন যে আল্লাহ্‌র কালাম, যারা এ বিষয়টিই স্বীকার করে না, তারা তো নিশ্চিতরূপেই উপরোক্ত সাবধান বাণীর লক্ষ্য ; কিন্তু যারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অস্বীকার করে না, তবে কার্যক্ষেত্রে কোরআনকে ত্যাগ করে বসেছে —তিলাওয়াতের সাথেও কোন সম্পর্ক রাখে না এবং বোঝা ও তা মেনে চলার প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করে না, তারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সাবধান বাণীর আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।

اَلَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ۝

এ আয়াতে কোরআনে অবিশ্বাসী কাফিরদের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এক. তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের তুলনায় অধিক পছন্দ করে এবং অগ্রাধিকার দেয়। এজন্যই পার্থিব লাভ বা আরামের খাতিরে পরকালের ক্ষতি স্বীকার করে নেয়। এতে তাদের রোগ নির্ণয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা কেন কোরআনের সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও একে অস্বীকার করে? কারণ এই যে, দুনিয়ার বর্তমান জীবনের ভালবাসা তাদেরকে পরকালের ব্যাপারে অন্ধ করে রেখেছে। তাই তারা অন্ধকারকেই পছন্দ করে এবং আলোর দিকে আসার কোন আগ্রহ রাখে না।

দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, তারা নিজেরা তো অন্ধকারে থাকা পছন্দ করেই, তদুপরি সর্বনাশের কথা এই যে, নিজেদের ভ্রান্তি ঢাকা দেওয়ার জন্য অন্যদেরকেও আলোর মহাসড়ক অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে চলতে বাধা দান করে।

কোরআন বোঝার ব্যাপারে কোন কোন ভ্রান্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ : তৃতীয় অবস্থা يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا—বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ দ্বিবিধ হতে পারে। এক. তারা স্বীয় মন্দ বাসনা ও মন্দ কর্মের কারণে এ চিন্তায় মগ্ন থাকে যে, আল্লাহ্‌র উজ্জ্বল ও সরল পথে কোন বক্রতা ও দোষ দৃষ্টিগোচর হলেই তারা আপত্তি ও ভর্ৎসনা করার সুযোগ পাবে। ইবনে কাসীর এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

দুই. তারা এরূপ খোঁজাখুঁজিতে লেগে থাকে যে, আল্লাহ্‌র পথে অর্থাৎ কোরআন ও হাদীসের কোন বিষয়বস্তু তাদের চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তির অনুকূলে পাওয়া যায় কিনা, পাওয়া গেলে সেটাকে তারা নিজেদের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে পেশ করতে পারবে, তফসীরে-কুরতুবীতে এ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। আজকাল অসংখ্য পণ্ডিত ব্যক্তি এ ব্যাধিতে আক্রান্ত আছে। তারা মনে মনে একটি চিন্তাধারা কখনও ভ্রান্তিবশত এবং কখনও বিজাতীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে গড়ে নেয়। এরপর কোরআন ও হাদীসে এর সমর্থন তালাশ করে। কোথাও কোন শব্দ এ চিন্তাধারার অনুকূলে দৃষ্টিগোচর হলেই একে নিজেদের পক্ষে কোরআনী প্রমাণ মনে করে। অথচ এ কর্মপন্থাটি নীতিগতভাবেই ভ্রান্ত। কেননা, মু'মিনের কাজ হল নিজস্ব চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তি থেকে মুক্ত মন নিয়ে কোরআন ও হাদীসকে দেখা। এরপর এগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে যা প্রমাণিত হয়, সেটাকে নিজের মতবাদ সাব্যস্ত করা।

اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ—উপরে যেসব কাফিরের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে,

এ বাক্যে তাদেরই অশুভ পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তারা পথ-ভ্রষ্টতায় এত দূর পৌঁছে গেছে যে, সেখান থেকে সৎ পথে ফিরে আসা তাদের পক্ষে কঠিন।

বিধান ও মাস'আলা : তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, এ আয়াতে যদিও কাফির-দের এ তিনটি অবস্থা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদেরই এ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা পথভ্রষ্টতায় অনেক দূরে চলে গেছে, কিন্তু নীতির দিক দিয়ে যে মুসল-মানের মধ্যে এ তিনটি অবস্থা বিদ্যমান থাকে, সেও এ সাবধান বাণীর যোগ্য। অবস্থাত্রয়ের সারমর্ম এই :

(১) দুনিয়ার মহব্বতকে পরকালের উপর প্রবল রাখা এমনকি ধর্মপথে না আসা।

(২) অন্যদেরকেও নিজের সাথে শরীক রাখার জন্য আল্লাহ্‌র পথে চলতে না দেওয়া।

(৩) কোরআন ও হাদীসের অর্থ পরিবর্তন করে নিজস্ব চিন্তাধারার সাথে খাপ খাও-য়ানোর চেষ্টা করা।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ④

(৪) আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (এ গ্রন্থটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কোন কোন কাফির সন্দেহ করে যে, আরবী ভাষায় কেন? এতে তো সম্ভাবনা বোঝা যায় যে, স্বয়ং পয়গম্বর তা রচনা করে থাকবে। অনারব ভাষায় অবতীর্ণ হলে এরূপ সম্ভাবনাই থাকত না এবং অনারব হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য ঐশী গ্রন্থের অনুরূপও হত। তাদের এ সন্দেহ নিরর্থক। কেননা) আমি সব (পূর্ববর্তী) পয়গম্বরকে (ও) তাদেরই সম্প্রদায়ের ভাষায় পয়গম্বর করে প্রেরণ করেছি যাতে (তাদের ভাষায়) তাদের কাছে (আল্লাহ্‌র বিধানসমূহ) বর্ণনা করে। (কারণ, আসল লক্ষ্য হচ্ছে সুস্পষ্ট বর্ণনা। সব গ্রন্থেরই এক ভাষায় হওয়া কোন লক্ষ্য নয়)। অতঃপর (বর্ণনা করার পর) যাকে ইচ্ছা, আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন (অর্থাৎ সে বিধানসমূহ কবুল করে না) এবং যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন (অর্থাৎ সে বিধানসমূহ কবুল করে নেয়)। এবং তিনিই (সব কিছুর উপর) পরাক্রমশালী (এবং) প্রজ্ঞাময় (সুতরাং পরাক্রমশালী হওয়ার কারণে সবাইকে পথপ্রদর্শন করতে পারতেন; কিন্তু প্রজ্ঞাময় হওয়ার কারণে তা করেন নি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার একটি নিয়ামত ও সুবিধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি যখনই কোন রসূল কোন জাতির কাছে প্রেরণ করেছেন, তখনই সেই জাতির ভাষাভাষী রসূল প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি আল্লাহ্র বিধানসমূহ তাদেরই ভাষায় তাদেরই বোধগম্য আঙ্গিকে ব্যক্ত করে এবং তাদের পক্ষে তা বোঝা সহজ হয়। রসূলের ভাষা উম্মতের ভাষা থেকে ভিন্ন হলে বিধি-বিধান বোঝার ব্যাপারে উম্মতকে অনুবাদের ঝুঁকি গ্রহণ করতে হত। এরপরও বিধি-বিধানকে বিশুদ্ধরূপে বোঝার ব্যাপারটিতে সন্দেহ থেকে যেত। তাই হিব্রু ভাষীদের কাছে কোন রসূল প্রেরণ করা হলে তাঁর ভাষাও হিব্রুই হত, পারস্যবাসীদের প্রতি প্রেরিত রসূলের ভাষা ফারসী এবং বার্বারদের প্রতি প্রেরিত রসূলের ভাষা বার্বারী হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। যাকে রসূলরূপে প্রেরণ করা হত, কোন সময় তিনি ঐ জাতিরই একজন হতেন এবং জাতির ভাষাই তাঁর মাতৃভাষা হত। আবার কোন সময় এমনও হয়েছে যে, রসূলের মাতৃভাষা ভিন্ন হলেও আল্লাহ্ তা'আলা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন যে, তিনি ঐ জাতির ভাষা শিখে নিয়েছেন। উদাহরণত হযরত লূত (আ) জন্মগতভাবে ইরাকের অধিবাসী ছিলেন। ইরাকের ভাষা ছিল ফারসী। কিন্তু সিরিয়ায় হিজরত করে তিনি সেখানেই বিবাহ-শাদী করেন এবং তাদের ভাষা শিখে নেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সিরিয়ার এক অংশের রসূল নিযুক্ত করেন।

আমাদের রসূল (সা) স্থানের দিক দিয়ে সারা বিশ্বের জন্য এবং কালের দিক দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। জগতের কোন জাতি, কোন দেশের অধিবাসী এবং কোন ভাষাভাষী তাঁদের রিসালাত ও নবুয়তের আওতাবহির্ভূত নয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত নতুন জাতি ও নতুন ভাষার উদ্ভব হবে, তারা সবাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্বোধিত উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হবে। কোরআন পাকে বলা হয়েছে :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا — হে লোকসকল! আমি আল্লাহ্র রসূল, তোমাদের সবার প্রতি। সহী বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সব পয়গম্বরের মধ্যে নিজের পাঁচটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন : আমার পূর্বে প্রত্যেক রসূল ও নবী বিশেষভাবে নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আমাকেই সমগ্র মানব জাতির জন্য রসূল মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ) থেকে জগতে মানব-বসতি শুরু করেছেন এবং তাঁকেই মানব জাতির সর্বপ্রথম নবী ও পয়গম্বর মনোনীত করেন। এরপর পৃথিবীর জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন পয়গম্বরের মাধ্যমে হিদায়ত ও পথ-প্রদর্শনের ব্যবস্থা ততই সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক জাতির অবস্থার উপযোগী বিধি-বিধান ও শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মানব জগতের ক্রমবিকাশ যখন পূর্ণত্বের স্তরে উপনীত হয়েছে, তখন সাইয়েদুল

আওয়ালীন ওয়াল-আখেরীন ইমামুল-আম্বিয়া মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে সমগ্র বিশ্বের জন্য রসূলরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁকে যে গ্রন্থ ও শরীয়ত দান করা হয়েছে, তাকে সমগ্র বিশ্ব এবং কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ —অর্থাৎ

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য নিয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছি।

পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়ত ও নিজ নিজ সময় এবং ভূখণ্ডের দিক দিয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ছিল। সেগুলোকেও অসম্পূর্ণ বলা যায় না। কিন্তু মুহাম্মদী শরীয়তের সম্পূর্ণতা কোন কোন বিশেষ সময় ও বিশেষ ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ সম্পূর্ণতা সর্বকালীন ও সার্বত্রিক। এ দিক দিয়ে দীনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা এই শরীয়তেরই বৈশিষ্ট্য এবং এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত নবুয়তের পরম্পরা শেষ করে দেওয়া হয়েছে।

কোরআন আরবী ভাষায় কেন? এখানে প্রশ্ন হয় যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতি প্রেরিত রসূল তাদেরই ভাষাভাষী ছিলেন। ফলে তাদেরকে অনুবাদের শ্রম স্বীকার করতে হয়নি। শেষ পয়গম্বরের বেলায় এরূপ হল না কেন? রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শুধু আরবেই কেন আরবী ভাষা দিয়ে প্রেরণ করা হল এবং তাঁর গ্রন্থ কোরআনও আরবী ভাষায়ই কেন নাযিল হল? একটু চিন্তা-ভাবনা করলেই এর উত্তর পরিষ্কার হবে। বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে শত শত ভাষা প্রচলিত রয়েছে। এমতাবস্থায় সবাইকে হিদায়ত করার দু'টি মাত্র উপায় সম্ভবপর ছিল। এক. প্রত্যেক জাতির ভাষায় পৃথক পৃথক কোরআন অবতীর্ণ হওয়া এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শিক্ষাও তদ্রূপ প্রত্যেক জাতির ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। আল্লাহ্র অপার শক্তির সামনে এরূপ ব্যবস্থাপনা মোটেই কঠিন ছিল না কিন্তু সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য এক রসূল, এক গ্রন্থ, এক শরীয়ত প্রেরণ করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে হাজারো মতবিরোধ সত্ত্বেও ধর্মীয়, চারিত্রিক ও সামাজিক ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের যে মহান লক্ষ্য অর্জন করা উদ্দেশ্য ছিল, এমতাবস্থায় তা অর্জিত হত না।

এছাড়া প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশের কোরআন ও হাদীস ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় থাকলে কোরআন পরিবর্তনের অসংখ্য পথ খুলে যেত এবং কোরআন যে একটি সং-রক্ষিত কালাম, যা বিজাতি এবং কোরআন অবিশ্বাসীরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে, এ অলৌকিক বৈশিষ্ট্য খতম হয়ে যেত। এছাড়া একই ধর্ম এবং একই গ্রন্থ সত্ত্বেও এর অনুসারীরা শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত এবং তাদের মধ্যে ঐক্যের কোন কেন্দ্রবিন্দুই অবশিষ্ট থাকত না। এক আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল হওয়া সত্ত্বেও এর ব্যাখ্যা ও তফসীরে বৈধ সীমার মধ্যে কত মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে! অবৈধ পন্থায় যেসব মতবিরোধ হয়েছে, সেগুলোর তো ইয়ত্তাই নেই। এ থেকেই উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা সম্যক অনুমান করা যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যারা কোন না কোন স্তরে কোরআনের বিধি-বিধান পালন করে, তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে।

মোটকথা এই যে, রসূলে করীম (সা)-এর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রত্যেক জাতির ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন কোরআনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ববাসীর শিক্ষা ও হিদায়তের পন্থাকে কোন স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও সঠিক ও নির্ভুল মনে করতে পারে না। তাই দ্বিতীয় পন্থাটিই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তা এই যে, কোরআন একই ভাষায় অবতীর্ণ হবে এবং রসূলের ভাষাও কোরআনেরই ভাষা হবে। এরপর অন্যান্য দেশীয় ও আঞ্চলিক ভাষায় এর অনুবাদ প্রচার করা হবে। নায়েবে রসূল আলিমগণ প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নির্দেশাবলী তাঁদের ভাষায় বুঝাবেন এবং প্রচার করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা এর জন্য বিশ্বের ভাষাসমূহের মধ্য থেকে আরবী ভাষাকে নির্বাচন করেছেন। এর অনেক কারণ রয়েছে।

আরবী ভাষার কতিপয় বৈশিষ্ট্য : প্রথমত আরবী ভাষা ঊর্ধ্ব জগতের সরকারী ভাষা। ফেরেশতাদের ভাষা আরবী, লওহে মাহ্ফুযের ভাষা আরবী; যেমন আয়াত : بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ —থেকে জানা যায়। জান্নাত মানুষের আসল দেশ। সেখানে তাকে ফিরে যেতে হবে। সেখানকার ভাষাও আরবী। তাবারানী, মুস্তাদরাক, হাকিম ও শোয়াবুল ঈমান বায়হাকীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : احبوا العرب لثلاث لانى عربى والقران عربى وكلام اهل الجنة عربى —এ রেওয়ায়েতকে হাকিম বিশুদ্ধ বলেছেন। জামে সগীরেও বিশুদ্ধ হওয়ার আলামত ব্যক্ত করা হয়েছে। কোন কোন মুহাদ্দিস একে দুর্বল বলেছেন। হাদীস শাস্ত্রজ্ঞ ইবনে তাইমিয়া বলেন: এ হাদীসের বিষয়-বস্তুও প্রমাণিত—'হাসান'-এর নিম্নে নয়।— (ফয়যুল-কাদীর, শরহে জামে সগীর, ১ম খণ্ড ১৭৯ পৃঃ)

হাদীসের অর্থ এই যে, তোমরা তিনটি কারণে আরবকে ভালবাস : (১) আমি আরবীয়, (২) কোরআন আরবী ভাষায় এবং (৩) জান্নাতীদের ভাষা আরবী।

তফসীরে কুরতুবী প্রমুখ গ্রন্থে আরও বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে হযরত আদম (আ)-এর ভাষা ছিল আরবী। পৃথিবীতে অবতরণ ও তওবা কবুল হওয়ার পর আরবী ভাষাই কিছু পরিবর্তিত হয়ে সুরইয়ানী ভাষার রূপ পরিগ্রহ করে।

এ থেকে ঐ রেওয়ায়েতেরও সমর্থন পাওয়া যায়, যা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরগণের প্রতি যত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, সবগুলোর আসল ভাষা ছিল আরবী। জিবরাঈল (আ) সংশ্লিষ্ট পয়গম্বরের ভাষায় অনুবাদ করে তা পয়গম্বরগণের কাছে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা নিজ নিজ জাতীয় ভাষায় তা উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এই রেওয়ায়েতটি আল্লামা সুয়ূতী ইতকান গ্রন্থে এবং অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। এর সার বিষয়বস্তু এই যে, সব ঐশী গ্রন্থের আসল ভাষা আরবী। কিন্তু কোরআন ব্যতীত

অন্যান্য গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর দেশীয় ও জাতীয় ভাষায় অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে। তাই সেগুলোর অর্থসম্ভার তো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, কিন্তু ভাষা ও শব্দ পরিবর্তিত। এটা একমাত্র কোরআনেরই বৈশিষ্ট্য যে, এর অর্থসম্ভারের মত শব্দাবলীও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত। সম্ভবত এ কারণেই কোরআন দাবী করেছে যে, সমগ্র বিশ্বের জিন্ ও মানব একত্রিত হয়েও কোরআনের একটি ছোট সূরা—বরং আয়াতের অনুরূপ তুল্য রচনা করতে পারবে না। কেননা, এটা অর্থগত ও শব্দগত দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র কালাম এবং আল্লাহ্‌র গুণ। কেউ এর অনুকরণ করতে সক্ষম নয়। অর্থগত দিক দিয়ে তো অন্যান্য ঐশীগ্রন্থ আল্লাহ্‌র কালাম; কিন্তু সেগুলোতে সম্ভবত আসল আরবী ভাষার পরিবর্তে অনূদিত ভাষায় হওয়ার কারণে এই দাবী অন্য কোন ঐশীগ্রন্থ করেনি। নতুবা কোরআনের মত আল্লাহ্‌র কালাম হওয়ার সুবাদে প্রত্যেক গ্রন্থের অদ্বিতীয় ও অনুপম হওয়া নিশ্চিত ছিল।

আরবী ভাষার নিজস্ব গুণাবলীও এ ভাষাকে বেছে নেওয়ার অন্যতম কারণ। এ ভাষায় একটি উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করার জন্য অসংখ্য উপায় ও পথ বিদ্যমান রয়েছে।

আরও একটি কারণ এই যে, মুসলমানকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রকৃতগতভাবেই আরবী ভাষার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি অনায়াসে আরবী ভাষা যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু শিখে নিতে পারে। এ কারণেই সাহাবায়ে-কিরাম যে দেশেই পৌঁছেছেন, অল্পদিনের মধ্যেই কোনরূপ জোর জবরদস্তি ব্যতিরেকেই সে দেশের ভাষা আরবী হয়ে গেছে। মিসর, সিরিয়া, ইরাক—এ সব দেশের কোনটিরই ভাষা আরবী ছিল না। কিন্তু আজ এগুলো আরবদেশ বলে কথিত হয়।

আরও একটি কারণ এই যে, আরবরা ইসলাম-পূর্বকালে যদিও জঘন্য সব মন্দ কর্মে লিপ্ত ছিল, কিন্তু এমতাবস্থায়ও এ জাতির কর্মক্ষমতা, নৈপুণ্য ও ভাবাবেগ ছিল অনন্যসাধারণ। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ পয়গম্বরকে তাদের মধ্য থেকে উদ্ভূত করেন, তাদের ভাষাকে কোরআনের জন্য পছন্দ করেন এবং রসূল (সা)-কে সর্বপ্রথম তাদের হিদায়ত ও শিক্ষার আদেশ দেন। وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম স্বীয় রসূলের চারপাশে তাদেরই এমন ব্যক্তিবর্গকে জমায়েত করেন, যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য নিজেদের জানমাল, সন্তান-সন্ততি সবকিছু উৎসর্গ করে দেন এবং তাঁর শিক্ষাকে প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে করেন। এভাবে তাদের উপর তাঁর সংসর্গ ও শিক্ষার গভীর প্রভাব প্রতিফলিত হয় এবং তাদের দ্বারা এমন একটি আদর্শ সমাজ অস্তিত্ব লাভ করে, যার নজির ইতিপূর্বে আসমান ও জমিন প্রত্যক্ষ করেনি। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই নজিরবিহীন দলটিকে কোরআনী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য নিযুক্ত করেন এবং বলেন : بلغوا عني ولو آية অর্থাৎ তোমরা আমার কাছ থেকে শ্রুত প্রত্যেকটি কথা উম্মতের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। সাহাবায়ে কিরাম এই নির্দেশটি অলংঘনীয় বলে গ্রহণ করে নেন এবং বিশ্বের কোণায় কোণায় পৌঁছে গিয়ে কোরআনের শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের পর পঁচিশ বৎসরও অতিক্রান্ত

হয়নি, কোরআনের আওয়ায প্রাচ্য-প্রতীচ্য নির্বিশেষে তদানীন্তন পরিচিত পৃথিবীর সর্বত্র অনুরণিত হতে থাকে।

অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলা তক্দীরগত ও সৃষ্টিগতভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দাওয়াত পর্যায়ে উম্মত (দুনিয়ার সব মুশরিক এবং গ্রন্থধারী ইহুদী ও খৃস্টান যাদের অন্তর্ভুক্ত)-এর মধ্যে একটি বিশেষ নৈপুণ্য এবং শিক্ষা-দীক্ষা, গ্রন্থ রচনা ও প্রচারকার্যের এমন অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে দেন যে, এর নজির জগতের অতীত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর ফলশ্রুতিতে অনারব জাতিসমূহের মধ্যে শুধু কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জনের অদম্য স্পৃহাই জাগ্রত হয়নি, বরং আরবী ভাষা শিক্ষা ও তার প্রসারের ক্ষেত্রে অনারবদের অবদান আরবদের চাইতেও কোন অংশে কম নয়।

বর্তমানে আরবী ভাষা, এর বাকপদ্ধতি এবং ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রের যতগুলো গ্রন্থ পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, সেগুলোর অধিকাংশই অনারব লেখকদের রচিত। এটি এক বিস্ময়কর সত্য বটে। কোরআন ও হাদীসের সংকলন, তফসীর ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও অনারবদের ভূমিকা আরবদের চাইতে কম নয়।

এভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ভাষা এবং তাঁর গ্রন্থ আরবী হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র বিশ্বকে তা বেষ্টন করে নিয়েছে এবং দাওয়াত ও প্রচারের পর্যায়ে আরব ও অনারবের পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রত্যেক দেশ, জাতি এবং আরব-ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে এমন আলিম সৃষ্টি হয়েছে, যাঁরা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে নিজ নিজ জাতীয় ভাষায় অত্যন্ত সহজভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক জাতির ভাষায় পয়গম্বর প্রেরণের যে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হতে পারতো, তা অর্জিত হয়ে গেছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ আমি মানুষের সুবিধার জন্য পয়গম্বরগণকে তাদের ভাষায় প্রেরণ করেছি—যাতে পয়গম্বরগণ আমার বিধি-বিধান উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু হিদায়ত ও পথভ্রষ্টতা এরপরও মানুষের সাধ্যাধীন নয়। আল্লাহ্ তা'আলাই স্বীয় শক্তিবলে যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্টতায় রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়ত দেন। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ

وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝ وَاِذْ

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ

فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ

نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝ وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ

شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ۝ وَقَالَ مُوْسٰى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝

(৫) আমি মূসাকে নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করেছিলাম যে, স্বজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে আনয়ন এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিনসমূহ স্মরণ করান। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৬) যখন মূসা স্বজাতিকে বললেন ঃ তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর—যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দেন। তারা তোমাদেরকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দিত, তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েদেরকে জীবিত রাখত। এবং এতে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে বিরাট পরীক্ষা হয়েছিল। (৭) যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর। (৮) এবং মূসা বললেন ঃ তোমরা এবং পৃথিবীস্থ সবাই যদি কুফরী কর, তথাপি আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, যাবতীয় গুণের আধার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি মূসা (আ)-কে স্বীয় নিদর্শনাবলী দিয়ে প্রেরণ করেছি যে, স্বজাতিকে (কুফরী ও গোনাহ্‌র) অন্ধকার থেকে (বের করে ঈমান ও আনুগত্যের) আলোর দিকে আনয়ন করুন এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র (নিয়ামত ও আযাবের) ব্যাপারাদি স্মরণ করান। নিশ্চয় এসব ব্যাপারের মধ্যে শিক্ষা রয়েছে প্রত্যেক সবরকারী, শোকরকারীর জন্য। (কেননা, নিয়ামত স্মরণ করে শোকর করবে এবং শাস্তি ও তার অবসান স্মরণ করে ভবিষ্যত বিপদাপদে সবর করবে।) এবং স্মরণ করুন, যখন (আমার উপরোক্ত আদেশ অনুযায়ী) মূসা (আ) (স্বজাতিকে) বললেন ঃ তোমরা নিজেদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামত স্মরণ কর, যখন তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে মুক্তি দেন—যারা তোমাদেরকে অমানুষিক কষ্ট দিত এবং তোমাদের ছেলেসন্তানদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েদেরকে (অর্থাৎ কন্যাদেরকে, যারা বড় হয়ে বয়স্কা স্ত্রীলোকে পরিণত হয়ে যেত) ছেড়ে দিত (যাতে তাদেরকে শ্রমে নিযুক্ত করে। অতএব, এটাও হত্যার ন্যায় এক প্রকার শাস্তি ছিল।) এবং এতে (অর্থাৎ বিপদ ও মুক্তি উভয়ের মধ্যে) তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি বিরাট পরীক্ষা আছে। [অর্থাৎ মুসিবতে বালা এবং মুক্তিতে নিয়ামত ছিল। বালা ও নিয়ামত উভয়টি বান্দার জন্য পরীক্ষা। সুতরাং একথা বলে মূসা (আ) নিয়ামত ও শাস্তি উভয়টিই স্মরণ করিয়েছেন।] এবং (মূসা আরও বললেন যে, হে আমার সম্প্রদায়) স্মরণ কর,

যখন তোমাদের পালনকর্তা (আমার মাধ্যমে) ঘোষণা করে দেন যে, যদি (আমার নিয়ামত-সমূহ শুনে) তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তোমাদেরকে (হয় দুনিয়াতেও, না হয় পরকালে তো অবশ্যই) অধিক নিয়ামত দেব এবং যদি তোমরা (এসব নিয়ামত শুনে) অকৃতজ্ঞ হও, তবে (মনে রেখ,) আমার শাস্তি খুবই ভয়ঙ্কর। (অকৃতজ্ঞতা করলে এর সম্ভাবনা আছে।) এবং মূসা (আরও) বলেন ঃ যদি তোমরা এবং সারা বিশ্বের সব মানুষ একত্রিত হয়েও অকৃতজ্ঞতা কর, তবে আল্লাহ্ তা'আলা (-র কোন ক্ষতি নেই। কেননা, তিনি) সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী (এবং স্বীয় সত্তায়) প্রশংসার যোগ্য। (সেখানে অপরের দ্বারা পূর্ণতা অর্জনের সম্ভাবনাই নেই। তাই আল্লাহর ক্ষতি কল্পনাই করা যায় না। পক্ষান্তরে তোমরা তো إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ বাক্যে নিজেদের ক্ষতির কথা শুনলে। তাই কৃতজ্ঞ হও—অকৃতজ্ঞ হয়ো না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আমি মূসা (আ)-কে আয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছি, যাতে সে স্বজাতিকে কুফর ও গোনাহ্র অন্ধকার থেকে ঈমান ও আনুগত্যের আলোতে নিয়ে আসে।

آيَاتٌ —আয়াত শব্দের অর্থ তওরাতের আয়াতও হতে পারে ; কারণ, সেগুলো নাযিল করার উদ্দেশ্যই ছিল সত্যের আলো ছড়ানো। আয়াতের অন্য অর্থ মু'জিযাও হয়। এখানে এ অর্থও উদ্দিষ্ট হতে পারে। মূসা (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা ন'টি মু'জিযা বিশেষভাবে দান করেছিলেন। তন্মধ্যে লাঠির সর্প হয়ে যাওয়া এবং হাত উজ্জ্বল হয়ে যাওয়ার কথা কোরআনের একাধিক জায়গায় উল্লিখিত আছে। এ অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, মূসা (আ)-কে সুস্পষ্ট মু'জিযা দিয়ে পাঠানো হয়েছে, সেগুলো দেখার পর কোন ভদ্র ও সমঝদার ব্যক্তি অস্বীকার ও অবাধ্যতায় কায়েম থাকতে পারে না।

একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব এ আয়াতে 'কওম' শব্দ ব্যবহার করে নিজ কওমকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়বস্তুটিই যখন আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন সেখানে 'কওম' শব্দের পরিবর্তে ناس (মানবমণ্ডলী) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ—এতে ইঙ্গিত আছে যে, মূসা (আ) শুধু বনী ইসরাঈল ও মিসরীয় জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন, অপরদিকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ- অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে নির্দেশ দেন যে, স্বজাতিকে 'আইয়্যামুল্লাহ্' স্মরণ করান।

আইয়ামুল্লাহ ঃ ايام শব্দটি يوم-এর বহুবচন। এর অর্থ দিন, তা সুবিদিত। ايام الله শব্দটি দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক. যুদ্ধ অথবা বিপ্লবের বিশেষ দিন, যেমন বদর, ওহুদ, আহযাব, হুনায়ন ইত্যাদি যুদ্ধের ঘটনাবলী অথবা পূর্ববর্তী উম্মতের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ঘটনাবলী। এসব ঘটনায় বিরাট বিরাট জাতির ভাগ্য ওলট পালট হয়ে গেছে এবং তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় 'আইয়্যামুল্লাহ্' স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য হবে, এই সব জাতির কুফরের অশুভ পরিণতির ভয় প্রদর্শন করা এবং হুঁশিয়ার করা।

আইয়্যামুল্লাহ্র অপর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহও হয়। এগুলো স্মরণ করানোর লক্ষ্য হবে এই যে, ভাল মানুষকে যখন কোন অনুগ্রহদাতার অনুগ্রহ স্মরণ করানো হয়, তখন সে বিরোধিতা ও অবাধ্যতা করতে লজ্জাবোধ করে।

কোরআন পাকের সংশোধন পদ্ধতি সাধারণত এই যে, কোন কাজের নির্দেশ দিলে সাথে সাথে কাজটি করার কৌশলও বলে দেওয়া হয়। এখানে প্রথম বাক্যে মূসা (আ)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র আয়াত শুনিয়ে অথবা মু'জিযা প্রদর্শন করে স্বজাতিকে কুফরের অন্ধকার থেকে বের করুন এবং ঈমানের আলোতে নিয়ে আসুন। এ বাক্যে এর কৌশল বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, অবাধ্যদেরকে দু'উপায়ে সৎপথে আনা যায়। এক. শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা এবং দুই. নিয়ামত ও অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে আনুগত্যের দিকে আহবান করা। ذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ বাক্যে এ দু'টি উপায়ই উদ্দিষ্ট হতে পারে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের অবাধ্যদের অশুভ পরিণাম, তাদের আযাব, জিহাদে তাদের নিহত অথবা লাঞ্ছিত হওয়ার কথা স্মরণ করান যাতে তারা শিক্ষা অর্জন করে আত্মরক্ষা করে। এমনি-ভাবে এ জাতির উপর আল্লাহ্র যেসব নিয়ামত দিবারাত্র বর্ষিত হয় এবং যেসব বিশেষ নিয়ামত তাদেরকে দান করা হয়েছে, সেগুলো স্মরণ করিয়ে আল্লাহ্র আনুগত্য ও তওহীদের দিকে আহবান করুন; উদাহরণত তীহ্ উপত্যকায় তাদের মাথার উপর মেঘের ছায়া, আহারের জন্য মান্না ও সালওয়ার অবতরণ, পানীয় জলের প্রয়োজনে পাথর থেকে ঝরনা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ—এখানে ايات-এর অর্থ নিদর্শন ও প্রমাণাদি। صبار শব্দটি صبر থেকে مبالغة-এর পদ। এর অর্থ অত্যন্ত সবরকারী। شكور শব্দটি شكر থেকে مبالغة-এর পদ। এর অর্থ অধিক কৃতজ্ঞ। বাক্যের অর্থ এই যে, অবিশ্বাসীদের শাস্তি ও আযাব সম্পর্কিত হোক অথবা আল্লাহ্র নিয়ামত ও অনুগ্রহ সম্পর্কিত হোক, উভয় অবস্থাতেই অতীত ঘটনাবলীতে আল্লাহ্র অপার শক্তি ও অসীম রহস্যের বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান আছে ঐ ব্যক্তির জন্যে, যে অত্যন্ত সবরকারী এবং অধিক শোকরকারী।

উদ্দেশ্য এই যে, ঐ সকল সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও প্রমাণাদি যদিও প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির হিদায়তের জন্য, কিন্তু হতভাগ্য কাফিররা চিন্তাই করে না, তারা এগুলো থেকে কোন উপকারই লাভ করে না। উপকার তারাই লাভ করে, যারা সবর ও শোকর উভয় গুণে গুণান্বিত অর্থাৎ মু'মিন। কেননা, বায়হাকী হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, ঈমান দু'ভাগে বিভক্ত। এর অর্ধাংশ সবর এবং অর্ধাংশ শোকর।—(মাযহারী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, সবর ঈমানের অর্ধেক। সহীহ্ মুসলিম ও মসনদে আহমদে হযরত সোহায়ব (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, মু'মিনের প্রত্যেক অবস্থাই সর্বোত্তম ও মহত্তম। এ বিষয়টি মু'মিন ছাড়া আর কারও ভাগ্যে জোটেনি। কারণ, মু'মিন কোন সুখ, নিয়ামত অথবা সম্মান পেলে তজ্জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এটা তার জন্য ইহকাল ও পরকালে মঙ্গল ও সৌভাগ্যের কারণ হয়ে যায়। (ইহকালে তো আল্লাহ্র ওয়াদা অনুযায়ী নিয়ামত আরও বেড়ে যায় এবং অব্যাহত থাকে, পরকালে সে এ কৃতজ্ঞতার বিরাট প্রতিদান পায়।) পক্ষান্তরে মু'মিনের কষ্ট অথবা বিপদ হলে সে তজ্জন্য সবর করে। সবরের কারণে তার বিপদও তার জন্য নিয়ামত ও সুখ হয়ে যায়। (ইহকালে এভাবে যে, সবরকারীরা আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গলাভে সমর্থ হয়। কোরআন বলে ঃ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ আল্লাহ্ তা'আলা যার সঙ্গে থাকেন, পরিণামে তার মুছিবত আরামে রূপান্তরিত হয়ে যায়। পরকালে এভাবে যে, আল্লাহ্র কাছে সবরের বিরাট প্রতিদান অগণিত রয়েছে। কোরআন বলে ঃ

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

মোটকথা, মু'মিনের কোন অবস্থা মন্দ হয় না —সর্বোত্তম হয়ে থাকে। সে পতিত হয়েও উত্থিত হয় এবং নষ্ট হয়েও গঠিত হয়।

نہ شوخی چل سکی باد صبا کی
بگڑنے میں بھی زلف اسکی بنا کی

ঈমান এমন একটি অনন্য সম্পদ যা বিপদ ও কষ্টকেও নিয়ামত ও সুখে রূপান্তরিত করে দেয়। হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে বললেন, আমি আপনার পর এমন একটি উম্মত সৃষ্টি করব, যদি তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তবে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। পক্ষান্তরে যদি তাদের ইচ্ছা ও মর্জির বিরুদ্ধে কোন অপ্রিয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তবে তারা একে সওয়াবের উপায় মনে করে সবর করবে। এ বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা তাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানবুদ্ধি ও সহ্যগুণের ফলশ্রুতি নয় বরং আমি তাদেরকে স্বীয় জ্ঞান ও সহনশীলতার একটি অংশ দান করব।—(মাযহারী)

সংক্ষেপে শোকর ও কৃতজ্ঞতার স্বরূপ এই যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতা এবং হারাম ও অবৈধ কাজে ব্যয় না করা, মুখেও আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং স্বীয় কাজকর্মকেও তাঁর ইচ্ছার অনুগামী করা।

সবরের সারমর্ম হচ্ছে স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপারাদিতে অস্থির না হওয়া, কথায় ও কাজে অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ থেকে বেঁচে থাকা এবং ইহকালেও আল্লাহ্র রহমত আশা করা ও পরকালে উত্তম পুরস্কার প্রাপ্তিতে বিশ্বাস রাখা।

দ্বিতীয় আয়াতে পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যে, বনী ইসরাঈলকে নিম্নলিখিত বিশেষ নিয়ামতটি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য মূসা (আ)-কে আদেশ দেওয়া হয়ঃ

মূসা (আ)-এর পূর্বে ফেরাউন বনী ইসরাঈলকে অবৈধভাবে গোলামে পরিণত করে রেখেছিল। এরপর এসব গোলামের সাথেও মানবোচিত ব্যবহার করা হত না। তাদের ছেলে-সন্তানকে জন্মগ্রহণের পরই হত্যা করা হত এবং শুধু কন্যা-সন্তানদেরকে খিদমতের জন্য লালন-পালন করা হত। মূসা (আ)-কে প্রেরণের পর তাঁর বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তিদান করেন।

কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার পরিণাম ঃ

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ○

تَأَذَّنَ ---শব্দটির অর্থ সংবাদ দেওয়া ও ঘোষণা করা। আয়াতের উদ্দেশ্য এইঃ এ কথা স্মরণযোগ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করে দেন, যদি তোমরা আমার নিয়ামত সমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর অর্থাৎ সেগুলোকে আমার অবাধ্যতায় ও অবৈধ কাজে ব্যয় না কর এবং নিজেদের ক্রিয়াকর্মকে আমার মর্জির অনুগামী করার চেষ্টা কর, তবে আমি এসব নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেব। এ বাড়ানো নিয়ামতের পরিমাণেও হতে পারে এবং স্থায়িত্বেও হতে পারে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তওফীক প্রাপ্ত হয়, যে কোন সময় নিয়ামতের বরকত ও বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয় না। --(মাযহারী)

আল্লাহ্ আরও বলেনঃ যদি তোমরা আমার নিয়ামতসমূহের নাশোকরী কর, তবে আমার শাস্তিও ভয়ঙ্কর। নাশোকরীর সারমর্ম হচ্ছে আল্লাহ্র নিয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতার এবং অবৈধ কাজে ব্যয় করা অথবা তাঁর ফরয ও ওয়াজিব পালনে অবহেলা করা। অকৃতজ্ঞতার কঠোর শাস্তিস্বরূপ দুনিয়াতেও নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া যেতে পারে অথবা এমন বিপদ আসতে পারে যে, যেন নিয়ামত ভোগ করা সম্ভবপর না হয় এবং পরকালেও আযাবে গ্রেফতার হতে পারে।

এখানে এ বিষয়টি স্মরণীয় যে, আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কৃতজ্ঞদের জন্য প্রতিদান, সওয়াব ও নিয়ামত বৃদ্ধির ওয়াদা তাকিদ সহকারে করেছেন لَأَزِيدَنَّكُمْ কিন্তু এর

বিপরীতে অকৃতজ্ঞদের জন্য তাকিদ সহকারে لَاُعَذِّبَنَّكُمْ (আমি অবশ্যই তোমাকে শাস্তি দেব)। বলেননি; বরং শুধু 'আমার শাস্তিও কঠোর' বলেছেন এতে ঈঙ্গিত আছে যে, প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ আযাবে পতিত হবে—এটা জরুরী নয়; বরং ক্ষমারও সম্ভাবনা আছে।

قَالَ مُوْسٰى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ ۝ —অর্থাৎ মূসা (আ) স্বজাতিকে বললেন ঃ যদি তোমরা এবং পৃথিবীতে যারা বসবাস করে তারা সবাই আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতসমূহের নাশোকরী করে, তবে স্মরণ রেখ, এতে আল্লাহ্ তা'আলার কোন ক্ষতি নেই। তিনি সবার তারিফ, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার উর্ধ্বে। তিনি আপন সত্তার প্রশংসনীয় তোমরা তাঁর প্রশংসা না করলেও সব ফেরেশতা এবং সৃষ্টজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তাঁর প্রশংসায় মুখর।

কৃতজ্ঞতার উপকার সবটুকু তোমাদের জন্যই। তাই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতার জন্য যে তাকিদ করা হয়, তা নিজের জন্য নয়; বরং দয়াবশত তোমাদেরই উপকার করার জন্য।

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۛ
وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ ؕ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فِىْٓ اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْٓا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ
بِهٖ وَاِنَّا لَفِىْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ۝ قَالَتْ رُسُلُهُمْ
اَفِى اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ
ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ قَالُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ
مِّثْلُنَا ؕ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتُوْنَا
بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَ

لٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَمَا كَانَ لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ
بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١١ وَمَا لَنَآ
اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ؕ
وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝١٢ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ
لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا ؕ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ
لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ۝١٣ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ ذٰلِكَ
لِمَنْ خَافَ مَقَامِىْ وَخَافَ وَعِيْدِ ۝١٤ وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ
جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ۝١٥

(৯) তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তী কওমে-নূহ, আদ ও সামুদের এবং তাঁদের পরবর্তীদের খবর পৌঁছেনি ? তাদের বিষয়ে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। তাদের কাছে তাদের পয়গম্বর প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর তারা নিজেদের হাত নিজেদের মুখে রেখে দিয়েছে এবং বলেছে ঃ যা কিছু সহ তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে, আমরা তা মানি না এবং যে পথের দিকে তোমরা আমাদেরকে দাওয়াত দাও, সে সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ আছে, যা আমাদেরকে উৎকণ্ঠায় ফেলে রেখেছে। (১০) তাদের পয়গম্বরগণ বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ সম্পর্কে কি সন্দেহ আছে, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা ? তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেন যাতে তোমাদের কিছু গোনাহ্ ক্ষমা করেন এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের সময় দেন। তারা বলত ঃ তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ! তোমরা আমাদেরকে ঐ উপাস্য থেকে বিরত রাখতে চাও, যার ইবাদত আমাদের পিতৃপুরুষগণ করত। অতএব তোমরা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর। (১১) তাদের পয়গম্বর তাদেরকে বলেন ঃ আমরাও তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্ বান্দাদের মধ্য থেকে যার উপর ইচ্ছা, অনুগ্রহ করেন। আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতীত তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসা আমাদের কাজ নয়; ঈমানদারদের আল্লাহ্র উপর ভরসা করা চাই। (১২) আমাদের আল্লাহ্র উপর ভরসা না করার কি কারণ থাকতে পারে, অথচ তিনি আমাদেরকে পথ বলে দিয়েছেন। তোমরা আমাদেরকে যে পীড়ন করেছ, তজ্জন্য আমরা সবর করব। ভরসাকারিগণের আল্লাহ্র উপরই ভরসা করা উচিত। (১৩) কাফিররা পয়গম্বরগণকে বলেছিল ঃ আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে

ফিরে আসবে। তখন তাদের কাছে তাদের পালনকর্তা ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি জালিম-দেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব। (১৪) তাদের পর তোমাদেরকে দেশে আবাদ করব। এটা ঐ ব্যক্তি পায়, যে আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার আযাবের ওয়াদাকে ভয় করে। (১৫) পয়গম্বরগণ ফয়সালা চাইতে লাগলেন এবং প্রত্যেক অবাধ্য, হঠকারী ব্যর্থ কাম হল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মক্কার কাফিররা) তোমাদের কাছে কি ঐসব লোকের (ঘটনাবলীর) খবর (সংক্ষেপে হলেও) পৌঁছেনি, যারা তোমাদের পূর্বে ছিল? অর্থাৎ কওমে-নূহ, আদ, (কওমে হুদ,) সামূদ, (কওমে সালেহ্) এবং যারা তাদের পরে হয়েছে, যাদের (বিস্তারিত অবস্থা) আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না? (কারণ, তাদের তথ্যাদি ও বিবরণ লিপিবদ্ধ ও বর্ণিত হয়নি। তাদের ঘটনাবলী এই ঃ) তাদের পয়গম্বর তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর তারা (কাফিররা) আপন হাত পয়গম্বরগণের মুখে দিয়েছিল (অর্থাৎ মেনে নেওয়া দূরের কথা, তারা চেষ্টা করত, যাতে পয়গম্বরগণ কথা পর্যন্ত বলতে না পারে)। এবং বলল ঃ যে নির্দেশ দিয়ে তোমাদেরকে (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী) প্রেরণ করা হয়েছে (অর্থাৎ তওহীদ ও ঈমান), আমরা তা মানি না এবং যে বিষয়ের দিকে তোমরা আমাদেরকে দাওয়াত দাও (অর্থাৎ সেই তওহীদ ও ঈমান,) আমরা সে বিষয়ে বিরাট সন্দেহে আছি, যা (আমাদেরকে) উৎকণ্ঠায় ফেলে রেখেছে। (এর উদ্দেশ্য তওহীদ ও রিসালত উভয়টি অস্বীকার করা। তওহীদের অস্বীকার বর্ণনা সাপেক্ষ নয় এবং রিসালতের অস্বীকার تَدْعُوْنَا শব্দের মধ্যে নিহিত আছে। এর সারমর্ম এই যে, তোমরা নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে তওহীদের দাওয়াত দিচ্ছ। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট ও প্রেরিত নও)। তাদের পয়গম্বর (এর উত্তরে) বললেন ঃ (তোমরা) কি আল্লাহ্ সম্পর্কে (অর্থাৎ তাঁর তওহীদ সম্পর্কে) সন্দেহ (ও অস্বীকার) করছ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা? (অর্থাৎ এগুলো সৃষ্টি করা স্বয়ং তাঁর অস্তিত্ব ও একত্বের প্রমাণ। এহেন প্রমাণের উপস্থিতিতে সন্দেহ করা আশ্চর্যের বিষয় বটে। তোমরা সে তওহীদের দাওয়াতকে পৃথকভাবে আমাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত করছ, এটাও নিতান্ত ভুল। যদিও তওহীদের বিষয়বস্তুটি ন্যায়ানুগ হওয়ার কারণে কেউ যদি নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে এর দাওয়াত দেয়, তবুও শোভনীয়। কিন্তু বিতর্কিত ক্ষেত্রে তো আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে দাওয়াত দিচ্ছি। অতএব) তিনি (ই) তোমাদেরকে (তওহীদের দিকে) দাওয়াত দিচ্ছেন, যাতে (তা কবুল করার বরকতে) তোমাদের (অতীত) গোনাহ্‌সমূহ মাফ করে দেন এবং (তোমাদের বয়সের) নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদেরকে (সুষ্ঠুভাবে) আয়াত দান করেন। (উদ্দেশ্য এই যে, তওহীদ স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে সত্য হওয়া ছাড়াও তোমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে উপকারীও। এই জওয়াবে উভয় বিষয়ের জওয়াব হয়ে গেছে। أَفِي اللَّهِ شَكٌّ এ তওহীদ সম্পর্কে

এবং يُدْعُونَكُمْ এ রিসালত সম্পর্কেও।) তারা (অতঃপর উভয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা শুরু করল এবং) বলল ঃ তোমরা (পয়গম্বর নও ; বরং) নিছক মানব, যেমন আমরা। (মানবতা রিসালতের পরিপন্থী। তোমরা যা বল, তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়; বরং) তোমরা (নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতেই) চাও যে, আমাদের পিতৃপুরুষ যে বস্তুর ইবাদত করত, (অর্থাৎ প্রতিমা) তা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখ। অতএব (যদি রিসালতের দাবীদার হও, তবে উল্লিখিত প্রমাণাদি ছাড়া অন্য) কোন সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখাও (যা অধিকতর সুস্পষ্ট। এতে নবুয়তের তর্ক বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। আর يَعْبُدُ آبَاؤُنَا বাক্যে তওহীদের তর্কের দিকে ইঙ্গিত আছে। যার সারমর্ম এই যে, শিরক যে সত্য, তার প্রমাণ—ইহা আমাদের, বাপদাদার কাজ) তাদের পয়গম্বর (এর উত্তরে) বললেন ঃ (তোমাদের বক্তব্য কয়েক ভাগে বিভক্ত ঃ তওহীদ অস্বীকার, প্রমাণ—বাপদাদার কাজ। নবুয়ত অস্বীকার, পূর্ববর্তী প্রমাণাদি ছাড়া সুস্পষ্ট মু'জিযার দাবী। প্রথমোক্ত বিষয় সম্পর্কে فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ এ উত্তর হয়ে গেছে। কেননা, যুক্তির সামনে প্রথা ও প্রচলন কোন কিছু নয়। দ্বিতীয় ব্যাপারে আমরা নিজেদের মানবত্ব স্বীকার করি যে, বাস্তবিকই) আমরাও তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু (মানুষ হওয়া ও নবী হওয়ার মধ্যে বৈরিতা নেই। কেননা, নবুয়ত হচ্ছে একটি উচ্চস্তরের আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং) আল্লাহ্ (স্বেচ্ছাধীন) বান্দাদের মধ্য থেকে যার প্রতি ইচ্ছা, (এ) অনুগ্রহ করবেন (অনুগ্রহ বিশেষ করে অমানবের প্রতি হবে—এর কোন প্রমাণ নেই।) এবং (তৃতীয় বিষয় সম্পর্কে কথা এই যে, নবুয়তের দাবীসহ যে কোন দাবীর জন্য যে কোন যুক্তি এবং নবুয়তের দাবী হলে যে কোন প্রমাণ অবশ্যই দরকার। এগুলো পেশ করা হয়ে গেছে। এখন রইল বিশেষ যুক্তি ও বিশেষ মু'জিযার কথা, যাকে তোমরা সুলতানে-মুবীন অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রমাণ বলে ব্যক্ত করছ। এ সম্পর্কে কথা এই যে, প্রথমত এটা তর্কশাস্ত্রের নীতি অনুযায়ী জরুরী নয়। দ্বিতীয়ত) এটা আমাদের আয়ত্তাধীন বিষয় নয় যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া আমরা তোমাদেরকে কোন মু'জিযা দেখাই। (সুতরাং তোমাদের সব সন্দেহের জওয়াব হয়ে গেছে। এরপরও যদি তোমরা না মান এবং বিরোধিতা করে যাও, তবে কর। আমরা তোমাদের বিরোধিতাকে ভয় করি না, বরং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করি।) এবং আল্লাহ্‌র উপরই সব মু'মিনের ভরসা করি উচিত। (আমরাও ঈমানদার। ঈমানের দাবী হচ্ছে ভরসা করা। তাই আমরাও ভরসা করি।) এবং আমাদের আল্লাহ্‌র উপর ভরসা না করার কি কারণ থাকতে পারে? অথচ তিনি (আমাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপা করেছেন যে) আমাদেরকে আমাদের (ইহ-পরকালের লাভের) পথ বলে দিয়েছেন। (যার এত বড় মেহেরবানী, তার উপর তো অবশ্যই ভরসা করা উচিত।) এবং (বাইরের ক্ষতি থেকে তো আমরা এভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি, এখন রইল আভ্যন্তরীণ ক্ষতি অর্থাৎ তোমাদের বিরোধিতার চিন্তা-ভাবনা। অতএব) তোমরা (হঠকারিতা ও বিরুদ্ধাচরণ করে)

আমাদেরকে যেসব পীড়ন করেছ, আমরা তজ্জন্য সবর করব। (সুতরাং এর কারণেও আমাদের ক্ষতি রইল না। এ সবরের সারমর্মও সেই ভরসা।) এবং ভরসাকারীদের আল্লাহ্র উপরই ভরসা করা উচিত। এবং (এসব প্রমাণাদি সম্পন্ন করার পরও কাফিররা নরম হল না, বরং) কাফিররা পয়গম্বরগণকে বলল : আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেব, না হয় তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। (ফিরে আসা বলার কারণ এই যে, নবুয়ত লাভের পূর্বে চুপ থাকার কারণে তারাও বুঝতো যে, তাদের ধর্মবিশ্বাসও আমাদের মতই হবে।) তখন পয়গম্বরগণের প্রতি তাদের পালনকর্তা (সান্ত্বনার জন্য) ওহী প্রেরণ করলেন যে, (এ বেচারীরা তোমাদেরকে কি বের করবে) আমি (ই) জালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব এবং তাদের (ধ্বংস করার) পর তোমাদেরকে এ দেশে আবাদ করব। (এবং) এটা (অর্থাৎ আবাদ করার ওয়াদা বিশেষ করে তোমাদের জন্যই নয়, বরং) প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য (ব্যাপক), যে আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং আমার শাস্তির সতর্কবাণীকে ভয় করে। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসলমান। এর আলামত হচ্ছে কিয়ামতকে ও শাস্তির সতর্কবাণীকে ভয় করা। শাস্তির কবল থেকে মুক্তি দেওয়ার এ ওয়াদা সবার জন্য ব্যাপক।) এবং (পয়গম্বরগণ এ বিষয়বস্তু কাফিরদেরকে শোনালেন যে, তোমরা যুক্তির মীমাংসা অমান্য করেছ। এখন আযাবের মীমাংসা আগত প্রায় অর্থাৎ আযাব আসবে। তখন) কাফিররা (যেহেতু চরম মূর্খতা ও হঠকারিতায় নিমজ্জিত ছিল, তাই এতেও ভয় পেল না, বরং পুরাপুরি নির্ভয়ে সেই) মীমাংসা চাইতে লাগল (যেমন فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ও ইত্যাকার আয়াত থেকে জানা যায়।) এবং (যেমন সেই মীমাংসা আসল, তখন) যত অবাধ্য ও হঠকারী ছিল, সবাই (এ মীমাংসায়) বিফল মনোরথ হল (অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে গেল। তারা নিজেদেরকে সত্যপন্থী মনে করে বিজয় ও সাফল্য কামনা করত। তাতে এ মনস্কাম অপূর্ণ রয়ে গেল।)

مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ﴿۱۶﴾ يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ﴿۱۷﴾

---

(১৬) তার পেছনে দোযখ রয়েছে। তাতে পুঁজ মিশানো পানি পান করানো হবে। (১৭) ঢোক গিলে তা পান করবে এবং গলার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রতি দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আগমন করবে এবং সে মরবে না। তার পশ্চাতেও রয়েছে কঠোর আযাব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যে অবাধ্য হঠকারীর কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে, পার্থিব শাস্তি ছাড়া) তার সামনে

দোযখ (এর শাস্তি) রয়েছে। এবং তাকে (দোযখে) এমন পানি পান করতে দেওয়া হবে, যা পুঁজরক্ত (এর অনুরূপ) হবে—যা (দারুণ পিপাসার কারণে) ঢোক গিলে গিলে পান করবে এবং (অত্যন্ত গরম ও বিস্বাদ হওয়ার কারণে) গলার ভিতরে সহজে প্রবেশ করার উপায় থাকবে না এবং প্রতি দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আগমন করবে এবং সে কিছুতেই মরবে না ; (এবং এমনিভাবে কাতরাতে থাকবে।) এবং (এ শাস্তি এক অবস্থাতেই থাকবে না, বরং) তাকে আরও (অধিক) কঠোর আযাবের সম্মুখীন (সব সময়) হতে হবে। (ফলে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

(كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ِۨاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ
فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ۭ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰي شَيْءٍ ۭ ذٰلِكَ هُوَ
الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۭ
اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝ وَّمَا ذٰلِكَ عَلَي
اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ۝ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰۗؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا
اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۭ
قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ۭ سَوَاۗءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا
لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ۝ وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ
وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ۭ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ
مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا
اَنْفُسَكُمْ ۭ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۭ اِنِّىْ كَفَرْتُ بِمَآ
اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ۭ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

(১৮) যারা স্বীয় পালনকর্তার সত্তায় অবিশ্বাসী, তাদের অবস্থা এই যে, তাদের কর্মসমূহ ছাইভস্মের মত যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যায় ধূলিঝড়ের দিন। তাদের

উপার্জনের কোন অংশই তাদের করতলগত হবে না। এটাই দূরবর্তী পথভ্রষ্টতা। (১৯) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন? যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদেরকে বিলুপ্তিতে নিয়ে যাবেন এবং নতুন সৃষ্টি আনয়ন করবেন। (২০) এটা আল্লাহ্র পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। (২১) সবাই আল্লাহ্র সামনে দণ্ডায়মান হবে এবং দুর্বলেরা বড়দেরকে বলবে: আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম—অতএব তোমরা আল্লাহ্র আযাব থেকে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করবে কি? তারা বলবে: যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথ দেখাতেন, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সৎপথ দেখাতাম। এখন তো আমরা ধৈর্যচ্যুত হই কিংবা সবর করি—সবই আমাদের জন্য সমান—আমাদের রেহাই নেই। যখন সব কাজের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে: নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। অতএব তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করোনা এবং নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহ্র শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা জালিম তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যদি কাফিরদের ধারণা হয় যে, তাদের ক্রিয়াকর্ম তাদের জন্য উপকারী হবে, তবে এ সম্পর্কে সামগ্রিক নীতি শুনে নাও যে) যারা পালনকর্তার সাথে কুফরী করে, কর্মের দিক দিয়ে তাদের অবস্থা এই, (অর্থাৎ তাদের ক্রিয়াকর্মের দৃষ্টান্ত এমন) যেমন ছাই ভস্ম, (উড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে খুবই হালকা) যাকে ধূলিঝড়ের দিন প্রবল বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। (এমতাবস্থায় ছাই ভস্মের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না, এমনিভাবে) তারা যা কিছু কর্ম করে, তার কোন অংশ (অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াও উপকারের দিক থেকে) তাদের অর্জিত হবেনা। (ছাইভস্মের মত বিফলে যাবে।) এটাও অনেক দূরবর্তী পথভ্রষ্টতা। (ধারণা তো এরূপ যে, আমাদের ক্রিয়াকর্ম সৎ ও উপকারী কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রকাশ পায় অসৎ ও ক্ষতিকর—যেমন, মূর্তিপূজা অথবা অনুপকারী, যেমন: ক্রীতদাস মুক্ত করা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি। যেহেতু তাদের কর্ম সত্য থেকে অনেক দূরে, তাই একে দূরবর্তী পথভ্রষ্টতা বা ঘোরতর বিভ্রান্তি বলা হয়েছে। সুতরাং এপথে মুক্তি পাওয়ার তো কোন সম্ভাবনা নেই। পক্ষান্তরে যদি তাদের ধারণা হয় যে, কিয়ামতের অস্তিত্বই অসম্ভব বলে আযাবের সম্ভাবনা নেই। তবে এর জওয়াব এই যে,) তুমি কি (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) এ কথা জান না যে, আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে যথা-বিধি (অর্থাৎ উপকারিতা ও উপযোগিতার সমন্বয়ে) সৃষ্টি করেছেন (এবং এতে বোঝা যায় যে, তিনি সর্বশক্তিমান। সুতরাং) তিনি যদি চান, তোমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবেন এবং অন্য নতুন সৃষ্টজীব আনয়ন করবেন এবং এটা আল্লাহ্র পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

(সুতরাং নতুন সৃষ্টজীব আনয়ন করা যখন সহজ, তখন তোমাদেরকে পুনর্বার সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন ?) এবং (যদি এরূপ ধারণা হয় যে, তোমাদের বড়রা তোমাদেরকে বাঁচিয়ে নেবে, তবে এর স্বরূপ শুনে নাও যে, কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্র সামনে সবাই উপস্থাপিত হবে। অতঃপর নিম্নস্তরের লোক (অর্থাৎ জনসাধারণ তথা অনুসারীরা) উচ্চস্তরের লোকদেরকে (অর্থাৎ বিশিষ্ট ও অনুসৃতদেরকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনার ছলে) বলবে ঃ আমরা (পৃথিবীতে) তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এমনকি ধর্মের যে পথ তোমরা আমাদেরকে বলেছিলে, আমরা সে পথেরই অনুগামী হয়েছিলাম। (আজ আমরা বিপদে আছি।) অতএব তোমরা কি আল্লাহ্র আযাবের কিছু অংশ থেকে আমাদেরকে বাঁচাতে পার ? (অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাঁচাতে না পারলেও কিঞ্চিৎ পরিমাণেও বাঁচাতে পার কি ?) তারা (উত্তরে) বলবে ঃ (আমরা তোমাদেরকে বাঁচাব কি, স্বয়ং নিজেরাই তো বাঁচতে পারি না। তবে) যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে (কোন) পথ (আত্মরক্ষার্থে) বলতেন, তবে আমরা তোমাদেরকেও (সেই) পথ বলে দিতাম (এবং) এখন তো আমাদের সবার পক্ষে সমান—আমরা অস্থির হই (যেমন তোমাদের অস্থিরতা فهل انتم مغنون থেকে প্রকাশ পাচ্ছে এবং আমাদের অস্থিরতা لو هدنا الله থেকে বোঝাই যাচ্ছে।) অথবা আত্মসংবরণ করি। (উভয় অবস্থাতেই) আমাদের বাঁচার কোন উপায় নেই। (সুতরাং এই প্রশ্নোত্তর থেকে জানা গেল যে, কুফরের পথের বড়রাও তাদের অনুসারীদের কোন কাজে আসবে না। মুক্তির এ সম্ভাব্য পথটিও ভণ্ডুল হয়ে গেল। এবং যদি এরূপ ভরসা হয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উপাস্যেরা উপকার করবে, তবে এর অবস্থা এই কাহিনী থেকে জানা যাবে যে,) যখন (কিয়ামতে) সব মোকদ্দমার ফয়সালা সমাপ্ত হবে (অর্থাৎ ঈমানদাররা জান্নাতে এবং কাফিররা দোযখে প্রেরিত হবে তখন দোযখীরা সবাই সেখানে অবস্থানকারী শয়তানের কাছে গিয়ে তিরস্কার করবে যে, হতভাগা, তুমি তো ডুবলেই, আমাদেরকেও নিজের সাথে ডুবালে।) তখন শয়তান (উত্তরে) বলবে ঃ (তোমরা আমাকে অন্যায় তিরস্কার করছ। কেননা,) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সাথে (যত ওয়াদা করেছিলেন, সব) সত্য ওয়াদা করেছিলেন (যে, কিয়ামত হবে, কুফরীর কারণে ধ্বংস অনিবার্য এবং ঈমানের দ্বারা মুক্তি পাওয়া যাবে) এবং আমিও তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলাম (যে, কিয়ামত হবে না এবং তোমাদের কুফরীর পথও মুক্তির পথ) অতএব আমি সেসব ভুয়া ওয়াদা তোমাদের সাথে করেছিলাম। (এবং আল্লাহ্র ওয়াদা যে সত্য এবং আমার ওয়াদা যে মিথ্যা—এর ভূরি ভূরি অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান ছিল। এতদসত্ত্বেও তোমরা আমার ওয়াদাকে সত্য এবং আল্লাহ্র ওয়াদাকে মিথ্যা মনে করেছ। অতএব তোমরা নিজে নিজেই ডুবেছ। এবং যদি তোমরা বল যে, সত্য ওয়াদাকে মিথ্যা মনে করা এবং মিথ্যা ওয়াদাকে সত্য মনে করার কারণও তো আমিই ছিলাম, তবে কথা এই যে, বাস্তবিকই আমি কুমন্ত্রণাদানের পর্যায়ে কারণ ছিলাম, কিন্তু এটাও তো দেখবে যে, আমার কুমন্ত্রণা দানের পর তোমরা স্বেচ্ছাধীন ছিলে, না অক্ষম ও অপারক ? অতএব বলাই বাহুল্য যে,) তোমাদের উপর আমার এ ছাড়া অন্য কোন জোর ছিল না যে, আমি তোমাদেরকে (পথভ্রষ্টতার দিকে) ডেকেছিলাম, অতঃপর তোমরা (স্বেচ্ছায়) আমার কথা মেনে নিয়েছিলে। (যদি না মানতে, তবে আমি বলপূর্বক তোমাদেরকে

পথভ্রষ্ট করতে পারতাম না। যখন এটা প্রমাণিত) অতএব আমাকে (সম্পূর্ণ) ভৎর্সনা কর না (অর্থাৎ নিজেদেরকে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত মনে করে আমাকে সামগ্রিক পর্যায়ে দোষী মনে করো না।) এবং (বেশী) ভৎর্সনা নিজেদেরকেই কর। (কারণ আযাবের আসল হোতা তোমরাই। আমার কাজ তো নিরেট কারণ, যা দূরবর্তী এবং তোমাদের পথভ্রষ্টতাকে অপরিহার্য করে না। এ হচ্ছে ভৎর্সনার জওয়াব। পক্ষান্তরে তোমাদের কথার উদ্দেশ্য যদি সাহায্য প্রার্থনা হয়, তবে আমি অন্যের সাহায্য কিভাবে করতে পারি, যখন নিজেই বিপদগ্রস্ত এবং সাহায্য প্রত্যাশী হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমি জানি যে, কেউ আমাকে সাহায্য করবে না। নতুবা আমিও তোমাদের কাছে নিজের জন্য সাহায্য প্রত্যাশা করতাম। কেননা, তোমাদের সাথেই আমার সম্পর্ক বেশী। সুতরাং এখন তো) না আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী (হতে পারি) এবং না তোমরা আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী (হতে পার। তবে আমি যদি তোমাদের শিরককে সত্য মনে করতাম, তবুও এ সম্পর্কের কারণে সাহায্য প্রার্থনার অবকাশ থাকত, কিন্তু) আমি স্বয়ং তোমাদের এ কর্মে অবিশ্বাসী (এবং একে মিথ্যা মনে করি) যে, তোমরা ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে) আমাকে (আল্লাহ্‌র) শরীক সাব্যস্ত করতে। (অর্থাৎ মূর্তি ইত্যাদির পূজার ব্যাপারে আমার এমন আনুগত্য করতে, যে আনুগত্য বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র প্রাপ্য। সুতরাং মূর্তিদেরকে শরীক সাব্যস্ত করা এর অর্থ শয়তানকে শরীক সাব্যস্ত করা। অতএব আমাদের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই এবং তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করারও কোন অধিকার নেই।) নিশ্চয় জালিমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (নির্ধারিত) রয়েছে। (অতএব আযাবে পড়ে থাক। আমাকে ভৎর্সনা করে এবং আমার কাছে সাহায্য চেয়ে কোন উপকারের আশা করো না। তোমরা যে জুলুম করেছ, তা তোমরাই ভোগ কর। আমি যা করেছি, তা আমি ভোগ করব। তাই এসব কথাবার্তার এখন আর কোন অর্থ হয় না। এ হচ্ছে ইবলীসের উত্তরের সারমর্ম। এতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উপাস্যদের ভরসাও ছিন্ন হয়েছে। কেননা, ইবলীসই হচ্ছে অন্য উপাস্যদের উপাসনার আসল প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তা এবং প্রকৃতপক্ষে এ উপাসনা দ্বারা সে-ই অধিক সন্তুষ্ট হয়। এ কারণেই কিয়ামতের দিন দোযখীরা তার সাথেই কথাবার্তা বলবে এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্যকে কিছুই বলবে না। যখন সে পরিষ্কার জওয়াব দিয়ে দিল, তখন অন্যদের কাছ থেকে আর কি আশা করা যায়। সুতরাং কাফিরদের মুক্তির সব পথই রুদ্ধ হয়ে গেল। এ বিষয়বস্তুটিই আয়াতের উদ্দেশ্য ছিল।)

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿٢٣﴾

(২৩) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে তাদেরকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করানো হবে, যার পাদদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা তাতে পালনকর্তার নির্দেশে অনন্তকাল থাকবে। যেখানে তাদের সম্ভাষণ হবে সালাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তারা এমন উদ্যানে প্রবিষ্ট হবে, যার পাদদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে (এবং) তারা তাতে পালনকর্তার নির্দেশে অনন্তকাল থাকবে। সেখানে তাদেরকে (আস্‌সালামু আলাইকুম বলে) সালাম করা হবে। (অর্থাৎ পরস্পরেও এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ

আরও বলেন ঃ اِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا

عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ الاية

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝ تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۭ بِاِذْنِ رَبِّهَا ۭ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

(২৪) তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ্ তা'আলা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন ঃ —পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মত। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত। (২৫) সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল দান করে। আল্লাহ্ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন—যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনার কি জানা নেই (অর্থাৎ এখন জানা হয়েছে) যে, আল্লাহ্ তা'আলা কেমন (উত্তম ও স্থানোপযোগী) উপমা বর্ণনা করেছেন কালেমায়ে তাইয়্যেবার। (অর্থাৎ কালেমায়ে তওহীদ ও ঈমানের।) এটা একটা পবিত্র বৃক্ষসদৃশ (অর্থাৎ খেজুর বৃক্ষের মত) যার শিকড় দৃঢ়ভাবে (মাটির অভ্যন্তরে) প্রোথিত এবং এ শাখাসমূহ সুউচ্চে উত্থিত। (এবং) সে (অর্থাৎ বৃক্ষ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে প্রতি ঋতুতে (অর্থাৎ যখন তার ফলনের ঋতু আসে) ফল দান করে (অর্থাৎ যথেষ্ট ফলন হয়, কোন ঋতু মার যায় না। এমনিভাবে কালেমায়ে তওহীদ অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র একটি শিকড় আছে অর্থাৎ বিশ্বাস যা মু'মিনের অন্তরে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এর কিছু ডালপালা রয়েছে অর্থাৎ সৎকর্মসমূহ। ঈমানের পর এগুলো ফলদায়ক হয়। এগুলোকে আকাশপানে আল্লাহ্‌র দরবারে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর এগুলোর ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র চিরস্থায়ী সন্তুষ্টির ফল অর্জিত হয়।) এবং আল্লাহ্ তা'আলা (এধরনের) দৃষ্টান্ত লোকদের (বলার) জন্য এ কারণে বর্ণনা করেন—যাতে তারা (এর উদ্দেশ্যকে) ভালোভাবে বুঝে নেয়। (কেননা, দৃষ্টান্ত দ্বারা উদ্দেশ্য চমৎকার ফুটে উঠে।)

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ﴿٢٦﴾ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾

(২৬) এবং নোংরা বাক্যের উদাহরণ হলো নোংরা বৃক্ষ। একে মাটির উপর থেকে উপড়ে নেওয়া হয়েছে। এর কোন স্থিতি নেই। (২৭) আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন। পার্থিবজীবনে এবং পরকালে। এবং আল্লাহ্ জালিমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা, তা করেন। (২৮) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা আল্লাহ্র নিয়ামতকে কুফরে পরিণত করেছে এবং স্বজাতিকে সম্মুখীন করেছে ধ্বংসের আলয়ে (২৯) দোযখের? তারা তাতে প্রবেশ করবে সেটা কতই না মন্দ আবাস!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং নোংরা কালেমার (অর্থাৎ কালেমায়ে কুফর ও শিরকের) দৃষ্টান্ত এমন, যেমন একটি খারাপ বৃক্ষ (অর্থাৎ হান্যল বৃক্ষ), যাকে মাটির উপর থেকেই উৎপাটিত করে নেওয়া হয় (এবং) তার (মাটিতে) কোন স্থায়িত্ব নেই। ('খারাপ' বলা হয়েছে এর গন্ধ, স্বাদ ও রং-এর দিক দিয়ে অথবা এর ফলের গন্ধ, স্বাদ ও রং-এর দিক দিয়ে। এ হচ্ছে طَيِّبَةٌ পবিত্র বিশেষণের বিপরীত। উপর থেকে উৎপাটনের উদ্দেশ্য এই যে, এর শিকড় দূর পর্যন্ত যায় না, উপরে-উপরেই থাকে। এ হচ্ছে أَصْلُهَا ثَابِتٌ 'শিকড় গভীরে প্রোথিত' এর বিপরীত এবং مَا لَهَا مِن قَرَارٍ বাক্যটি এর তাকিদ। এর শাখার ঊর্ধ্বে না যাওয়া এবং এর ফলের খাওয়ার বস্তু হিসাবে কাম্য না হওয়া বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কালেমায়ে কুফরের অবস্থা তদ্রূপই। যদিও কাফিরের অন্তরে এর শিকড় আছে; কিন্তু সত্যের সামনে এর ক্ষয়প্রাপ্তি ও পরাভূত হয়ে যাওয়া এ অবস্থারই সমতুল্য, যেন এর শিকড়ই নেই। আল্লাহ্ বলেন: حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ — সম্ভবত: مَا لَهَا مِن قَرَارٍ বলে কুফরের এই ক্ষয়প্রাপ্তি ও পরাজয় ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য। কাফিরের সৎকর্ম

আল্লাহ্র কাছে কবুল হয় না। তাই এ বৃক্ষের যেন শাখাও ছড়ায় না। যেহেতু এ সৎকর্ম দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জিত হয় না, ফল যে হয় না—একথাও স্পষ্টত বোঝা যায়। যেহেতু কাফিরের মধ্যে কবূল ও সন্তুষ্টির মোটেই সম্ভাবনা নেই, তাই খারাপ বৃক্ষের শাখা ও ফলের উল্লেখ নিশ্চিতরূপেই পরিত্যক্ত হয়েছে। তবে কুফরের উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, এর অস্তিত্ব অনুভবও করা যায় এবং জিহাদ ইত্যাদির বিধি-বিধানে ধর্তব্যও। এ হচ্ছে উভয়ের দৃষ্টান্ত। অতঃপর প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হচ্ছেঃ) আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে মজবুত কথা দ্বারা (অর্থাৎ কালেমা তাইয়্যেবার বরকত দ্বারা) পার্থিব জীবনে ও পরকালে (উভয় জায়গায় ধর্মে ও পরীক্ষায়) মজবুত রাখেন এবং (নোংরা কালেমার অশুভ প্রভাবে) জালিমদেরকে (অর্থাৎ কাফিরদেরকে উভয় জায়গায়—ধর্মে ও পরীক্ষায়) পথভ্রষ্ট করে দেন এবং (কাউকে মজবুত রাখা ও কাউকে পথভ্রষ্ট করে দেওয়ার মধ্যে অনেক রহস্য রয়েছে।) আল্লাহ্ তা'আলা (স্বীয় রহস্যের কারণে) যা ইচ্ছা তা করেন। আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি (অর্থাৎ তাদের অবস্থা আশ্চর্যজনক), যারা নিয়ামতের (শোকরের) পরিবর্তে কুফরী করেছে? (উদ্দেশ্য মক্কার কাফির সম্প্রদায়—দুররে মনসূর) এবং যারা স্বজাতিকে ধ্বংসের গৃহ অর্থাৎ জাহান্নামে পৌঁছে দিয়েছে? (অর্থাৎ তাদেরকেও কুফর শিক্ষা দিয়েছে। ফলে) তারা তাতে (অর্থাৎ জাহান্নামে) প্রবেশ করবে। সেটা মন্দ বাসস্থান। (এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাদের প্রবেশ করা স্থায়ী ও চিরকালীন হবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বে এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যে, কাফিরদের ক্রিয়াকর্ম হচ্ছে ছাইভস্মের মত, যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যাওয়ার কারণে প্রতিটি কণা বাতাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরপর কেউ এগুলোকে একত্র করে কোন কাজ নিতে চাইলে তা অসম্ভব হয়ে যায়।

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي

يَوْمٍ عَاصِفٍ — উদ্দেশ্য এই যে, কাফিরদের ক্রিয়াকর্ম বাহ্যত সৎ হলেও তা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গ্রহণীয় নয়। তাই সব অর্থহীন ও অকেজো।

এরপর উল্লিখিত আয়াতসমূহে প্রথমে মু'মিন ও তার ক্রিয়াকর্মের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। অতঃপর কাফির ও মু'মিনদের ক্রিয়াকর্মের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতে মু'মিন ও তার ক্রিয়াকর্মের উদাহরণে এমন একটি বৃক্ষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার কাণ্ড মজবুত ও সুউচ্চ এবং শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত। ভূগর্ভস্থ ঝরনা থেকে সেগুলো সিক্ত হয়। গভীর শিকড়ের কারণে বৃক্ষটি এত শক্ত যে দমকা বাতাসে ভূমিসাৎ হয়ে যায় না। ভূপৃষ্ঠ থেকে উর্ধ্বে থাকার কারণে এর ফল ময়লা ও আবর্জনা থেকে মুক্ত। এ বৃক্ষের দ্বিতীয় গুণ এই যে, এর শাখা উচ্চতায় আকাশপানে ধাবমান। তৃতীয় গুণ এই যে, এর ফল সব সময় সর্বাবস্থায় খাওয়া যায়।

এ বৃক্ষটি কি এবং কোথায়, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সর্বাধিক সত্যাশ্রয়ী উক্তি এই যে, এটি হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ। এর সমর্থন অভিজ্ঞতা এবং চাক্ষুষ দেখা দ্বারাও হয় এবং বিভিন্ন হাদীস থেকেও পাওয়া যায়। খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড যে উচ্চ ও মজবুত, তা প্রত্যক্ষ বিষয় —সবাই জানে। এর শিকড়সমূহের মাটির গভীর অভ্যন্তরে পৌঁছাও সুবিদিত। এর ফলও সব সময় সর্বাবস্থায় খাওয়া যায়। বৃক্ষে ফল দেখা দেওয়ার পর থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত সর্বাবস্থায় চাট্‌নী, আচার ইত্যাদি বিভিন্ন পন্থায় এ ফল খাওয়া যায়। ফল পেকে গেলে এর ভাণ্ডারও সারা বছর অবশিষ্ট থাকে। সকাল-বিকাল, দিবা-রাত্র, শীত-গ্রীষ্ম—মোটকথা সব সময় ও সব ঋতুতে এটি কাজে আসে। এ বৃক্ষের শাঁসও খাওয়া হয়, এ বৃক্ষ থেকে মিষ্ট রসও বের করা হয়। এর পাতা দ্বারা অনেক উপকারী বস্তুসামগ্রী চাটাই ইত্যাদি তৈরী করা হয়। এর আঁটি জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য। অন্যান্য বৃক্ষের ফল এরূপ নয়। অন্যান্য বৃক্ষ বিশেষ ঋতুতে ফলবান হয় এবং ফল নিঃশেষ হয়ে যায়—সঞ্চয় করে রাখা হয় না এবং সেগুলোর প্রত্যেকটি অংশ দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।

তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান ও হাকিম হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কোরআনে উল্লিখিত পবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ এবং অপবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে হান্‌যল (মাকাল) বৃক্ষ। —(মাযহারী)

মসনদ আহ্‌মদে মুজাহিদের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বলেন ঃ একদিন আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে খেজুর বৃক্ষের শাঁস নিয়ে এল। তখন তিনি সাহাবায়ে কিরামকে একটি প্রশ্ন করলেন ঃ বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ হচ্ছে মরদে-মু'মিনের দৃষ্টান্ত। (বুখারীর রেওয়ায়েত মতে এস্থলে তিনি আরও বললেন যে, কোন ঋতুতেই এ বৃক্ষের পাতা ঝরে না।) বল, এ কোন্ বৃক্ষ? ইবনে ওমর বলেন ঃ আমার মনে চাইল যে, বলে দিই—খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু মজলিসে আবূ বকর, ওমর ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরকে নিশ্চুপ দেখে আমি বলার সাহস পেলাম না। এরপর স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ।

এ বৃক্ষ দ্বারা মু'মিনের দৃষ্টান্ত দেওয়ার কারণ এই যে, কালেমায়ে তাইয়্যেবার মধ্যে ঈমান হচ্ছে মজবুত ও অনড় শিকড় বিশিষ্ট, দুনিয়ার বিপদাপদ একে টলাতে পারে না। কামেল মু'মিন সাহাবী ও তাবেয়ী; বরং প্রতি যুগের খাঁটি মুসলমানদের এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়, যারা ঈমানের মুকাবিলায় জানমান ও কোন কিছুর পরওয়া করেন নি। দ্বিতীয় কারণ তাঁদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। তাঁরা দুনিয়ার নোংরামি থেকে সব সময় দূরে সরে থাকেন যেমন ভূ-পৃষ্ঠের ময়লা আবর্জনা উঁচু বৃক্ষকে স্পর্শ করতে পারে না। এ দু'টি গুণ হচ্ছে أَصْلُهَا ثَابِتٌ —এর দৃষ্টান্ত। তৃতীয় কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের শাখা যেমন আকাশের দিকে উচ্চ ধাবমান, মু'মিনের ঈমানের ফলাফলও অর্থাৎ সৎকর্মও তেমনি আকাশের দিকে উত্থিত হয়। কোরআন বলে ঃ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ —অর্থাৎ

পবিত্র বাক্যাবলী আল্লাহ্ তা'আলার দিকে উঠানো হয়। উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিন আল্লাহ্ তা'আলার যেসব যিক্‌র, তসবীহ্-তাহ্‌লীল, তিলাওয়াতে কোরআন ইত্যাদি করে, সেগুলো সকাল বিকাল আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছতে থাকে।

চতুর্থ কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের ফল যেমন সব সময় সর্বাবস্থায় এবং সব ঋতুতে দিবারাত্র খাওয়া হয়, মু'মিনের সৎকর্মও তেমনি সব সময়, সর্বাবস্থায় এবং সব ঋতুতে অব্যাহত রয়েছে এবং খেজুর বৃক্ষের প্রত্যেকটি বস্তু যেমন উপকারী, তেমনি মু'মিনের প্রত্যেক কথা ও কাজ, ওঠা-বসা এবং এসবের প্রতিক্রিয়া সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারী ও ফলদায়ক। তবে শর্ত এই যে, কামিল মানুষ এবং আল্লাহ্ ও রসূলের শিক্ষার অনুযায়ী হতে হবে।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ বাক্যে اكل শব্দের অর্থ ফল ও খাদ্যোপযোগী বস্তু এবং حين শব্দের অর্থ প্রতি মুহূর্ত। অধিকাংশ তফসীরবিদ এ অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারও কারও অন্য উক্তিও রয়েছে।

কাফিরদের দৃষ্টান্ত ঃ এর বিপরীতে কাফিরদের দ্বিতীয় উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে খারাপ বৃক্ষ দ্বারা। কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ যেমন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অর্থাৎ ঈমান, তেমনি কালেমায়ে খবীসার অর্থ কুফরী বাক্য ও কুফরী কাজকর্ম। পূর্বোল্লিখিত হাদীসে شَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ -অর্থাৎ খারাপ বৃক্ষের উদ্দিষ্ট অর্থ হানযল বৃক্ষ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেউ কেউ রসুন ইত্যাদি বলেছেন।

কোরআনে এই খারাপ বৃক্ষের অবস্থা এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এর শিকড় ভূগর্ভের অভ্যন্তরে বেশী যায় না। ফলে যখন কেউ ইচ্ছা করে, এ বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারে। اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ বাক্যের অর্থ তাই। কেননা, এর আসল অর্থ কোন বস্তুর অবয়বকে পুরোপুরি উৎপাটন করা।

কাফিরের কাজকর্মকে এ বৃক্ষের সাথে তুলনা করার কারণ তিনটি। এক. কাফিরের ধর্মবিশ্বাসের কোন শিকড় ও ভিত্তি নেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই নড়বড়ে হয়ে যায়। দুই. দুনিয়ার আবর্জনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। তিন. বৃক্ষের ফলফুল অর্থাৎ কাফিরের ক্রিয়াকর্ম আল্লাহ্‌র দরবারে ফলদায়ক নয়।

ঈমানের বিশেষ প্রতিক্রিয়া ঃ এরপর মু'মিনের ঈমান ও কালেমায়ে তাইয়্যেবার একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ —অর্থাৎ মু'মিনের কালেমায়ে তাইয়্যেবা মজবুত ও অনড় বৃক্ষের মত একটি

প্রতিষ্ঠিত উক্তি। একে আল্লাহ্ তা'আলা চিরকাল কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত রাখেন—দুনিয়াতেও এবং পরকালেও। শর্ত এই যে, এ কালেমা আন্তরিকতার সাথে বলতে হবে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র মর্ম পূর্ণরূপে বুঝতে হবে।

উদ্দেশ্য এই যে, এ কালেমায় বিশ্বাসী ব্যক্তিকে দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শক্তি যোগানো হয়। ফলে সে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ কালেমায় কায়েম থাকে, যদিও এর মুকাবিলায় অনেক বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। পরকালে এ কালেমাকে প্রতিষ্ঠিত রেখে তাকে সাহায্য করা হবে। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে আছে, আয়াতে পরকাল বলে বরযখ অর্থাৎ 'কবর জগৎ' বোঝানো হয়েছে।

কবরের শাস্তি ও শান্তি কোরআন ও হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কবরে মু'মিনকে প্রশ্ন করার ভয়ংকর মুহূর্তেও সে আল্লাহ্র সমর্থনের বলে এই কালেমার উপর কায়েম থাকবে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্র সাক্ষ্য দেবে। এরপর বলেন ঃ আল্লাহ্র বাণী يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ এর উদ্দেশ্য তা-ই। এ হাদীসটি হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আরও প্রায় চল্লিশজন সাহাবী থেকে একই বিষয়-বস্তুর হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এগুলো উল্লেখ করেছেন। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী স্বীয় কাব্যপুস্তিকা التثبيت عند التبييت এবং شرح الصدور এ সত্তরটি হাদীসের বরাত উল্লেখ করে সেগুলোকে মুতাওয়াতির বলেছেন। এসব সাহাবী সবাই আলোচ্য আয়াতে আখিরাতের অর্থ কবর এবং আয়াতটিকে কবরের আযাব ও সওয়াব সম্পর্কিত বলে সাব্যস্ত করেছেন।

মৃত্যু ও দাফনের পর কবরে পুনর্বার জীবিত হয়ে ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং এ পরীক্ষায় সাফল্য ও অকৃতকার্যতার ভিত্তিতে সওয়াব অথবা আযাব হওয়ার বিষয়টি কোরআন পাকের প্রায় দশটি আয়াতে ইঙ্গিতে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সত্তরটি মুতাওয়াতির হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। ফলে এ ব্যাপারে মুসলমানদের সন্দেহ করার অবকাশ নেই। তবে সাধারণ লোকের পক্ষ থেকে সন্দেহ করা হয় যে, এই সওয়াব ও আযাব দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানে এর বিস্তারিত উত্তর দানের অবকাশ নেই। সংক্ষেপে এতটুকু বুঝে নেওয়া যথেষ্ট যে, কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর না হওয়া সেই বস্তুটির অনস্তিত্বশীল হওয়ার প্রমাণ নয়। জীন ও ফেরেশতারাও দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তারা বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান যুগে রকেটের সাহায্যে যে মহাশূন্য জগৎ প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে, ইতিপূর্বে তা কারও দৃষ্টিগোচর হত না, কিন্তু অস্তিত্ব ছিল। ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে কোন বিপদে পতিত হয়ে বিষম কষ্টে অস্থির হতে থাকে, কিন্তু নিকটে উপবিষ্ট ব্যক্তি মোটেই তা টের পায় না।

নীতির কথা এই যে, এক জগতের অবস্থাকে অন্য জগতের অবস্থার সাথে তুলনা করা

নিতান্তই ভুল। সৃষ্টিকর্তা যখন রসূলের মাধ্যমে পর জগতে পৌঁছার পর এ আযাব ও সওয়াবের সংবাদ দিয়েছেন, তখন এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে তো প্রতিষ্ঠিত বাক্যের উপর কায়েম রাখেন, ফলে কবর থেকেই তাদের শান্তির আয়োজন শুরু হয়ে যায়। পক্ষান্তরে জালিম অর্থাৎ অস্বীকারকারী কাফির ও মুশরিকরা এ নিয়ামত পায় না। তারা মুনকার-নকীরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না। ফলে এখান থেকেই তারা এক প্রকার আযাবে জড়িত হয়ে পড়ে।

وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যা চান তাই করেন। তাঁর ইচ্ছাকে রুখে দাঁড়ায় এরূপ কোন শক্তি নেই। হযরত উবাই ইবনে কা'ব আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, হুযায়ফা ইবনে এয়ামান প্রমুখ সাহাবী বলেন ঃ মু'মিনের এরূপ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, তার যা কিছু অর্জিত হয়েছে, তা আল্লাহ্র ইচ্ছায়ই অর্জিত হয়েছে। এটা অর্জিত না হওয়া অসম্ভব ছিল। এমনিভাবে যে বস্তু অর্জিত হয়নি, তা অর্জিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাঁরা আরও বলেন ঃ যদি তুমি এরূপ বিশ্বাস না রাখ, তবে তোমার আবাস হবে জাহান্নাম।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّأَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۝ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۔

অর্থাৎ আপনি কি তাদেরকে দেখেন না, যারা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতের পরিবর্তে কুফর অবলম্বন করেছে এবং তাদের অনুসারী জাতিকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের অবস্থানে পৌঁছিয়ে দিয়েছে? তারা জাহান্নামে প্রজ্বলিত হবে। জাহান্নাম অত্যন্ত মন্দ আবাস।

এখানে 'আল্লাহ্র নিয়ামত' বলে সাধারণভাবে অনুভূত, প্রত্যক্ষ ও মানুষের বাহ্যিক উপকার সম্পর্কিত নিয়ামত বোঝান যেতে পারে; যেমন পানাহার ও পরিধানের দ্রব্য সামগ্রী, জমিজমা, বাসস্থান ইত্যাদি এবং মানুষের হিদায়তের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত বিশেষ নিয়ামতসমূহও; যেমন ঐশী গ্রন্থ এবং আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও রহস্যের নিদর্শনাবলী। এসব নিদর্শন স্বীয় অস্তিত্বের প্রতি গ্রন্থিতে, ভূমণ্ডল ও তার রহস্যমণ্ডিত জগতে মানবজাতির হিদায়তের সামগ্রীরূপে বিদ্যমান রয়েছে।

এই উভয় প্রকার নিয়ামতের দাবী ছিল এই যে, মানুষ আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও শক্তি-সামর্থ্য সম্যক উপলব্ধি করুক এবং তাঁর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করুক। কিন্তু কাফির ও মুশরিকরা নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা, অবাধ্যতা ও নাফরমানী করেছে। এর ফলশ্রুতিতে তারা সমগ্র

মানব সমাজকেই ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং নিজেরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

বিধান ও নির্দেশ ঃ আলোচ্য আয়াতত্রয়ে তওহীদ ও কলিমায়ে তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র মহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও ফলাফল এবং একে অস্বীকারের অমঙ্গল ও মন্দ পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। তওহীদ এমন অক্ষয় ধন যার বরকতে ইহকালে, পরকালে এবং কবরেও আল্লাহ্‌র সমর্থন অর্জিত হয়। একে অস্বীকার করা আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহকে আযাবে রূপান্তরিত করারই নামান্তর।

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ
إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ
وَلَا خِلَالٌ ﴿٣١﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ
فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ
وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

(৩০) এবং তারা আল্লাহ্‌র জন্য সমকক্ষ স্থির করেছে, যাতে তারা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। বলুন ঃ মজা উপভোগ করে নাও। অতঃপর তোমাদেরকে অগ্নির দিকেই ফিরে যেতে হবে। (৩১) আমার বান্দাদেরকে বলে দিন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা নামায কায়েম রাখুক এবং আমার দেওয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করুক ঐদিন আসার আগে, যেদিন কোন বেচা-কেনা নাই এবং বন্ধুত্বও নাই। (৩২) তিনিই আল্লাহ্ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্য ফলের রিযিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলাফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। (৩৩) এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিবাকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন। (৩৪)

যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহ্‌র নিয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী অকৃতজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ :

এবং (উপরে বলা হয়েছে যে, তারা নিয়ামতের শোকর করার পরিবর্তে কুফরী করেছে এবং নিজ জাতিকে জাহান্নামে পৌঁছিয়েছে। এই কুফরীও পৌঁছানোর বিবরণ এই যে) তারা আল্লাহ্‌র অংশীদার সাব্যস্ত করেছে, যাতে (অন্যান্যকেও) তাঁর দীনের পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। (সুতরাং অংশীদার সাব্যস্ত করা হচ্ছে কুফর এবং অন্যান্যকে পথভ্রষ্ট করা হচ্ছে জাহান্নামে পৌঁছানো)। আপনি (তাদের সবাইকে) বলে দিন : কিছুদিন মজা উপভোগ করে নাও। কেননা, পরিণামে তোমাদেরকে দোযখে যেতে হবে। (মজা উপভোগের অর্থ কুফরী অবস্থায় থাকা। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ধর্মমতের মধ্যে এক ধরনের তৃপ্তি অনুভব করে। অর্থাৎ আরও কিছু দিন কুফরী করে নাও। এটা ভীতি প্রদর্শন। কেননা উদ্দেশ্য এই যে, যেহেতু তোমাদের জাহান্নামে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী, তাই তোমাদের কুফরী থেকে বিরত হওয়া কঠিন। যাক, আরও কিছু দিন এভাবেই অতিবাহিত করে নাও। এরপর তো এ বিপদের সম্মুখীন হতেই হবে। এবং) আমার যেসব ঈমানদার বান্দা আছে (তাদেরকে এ অকৃতজ্ঞতার শাস্তি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে তা থেকে মুক্ত রাখার জন্য) তাদেরকে বলে দিন : তারা (এভাবে নিয়ামতের শোকর আদায় করুক যে) নামায প্রতিষ্ঠিত করুক এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে (শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী) গোপনে ও প্রকাশ্যে (যখন যেরূপ সুযোগ হয়) ব্যয় করুক, এমন দিন আসার পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় হবে না এবং বন্ধুত্ব হবে না। (উদ্দেশ্য এই যে, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতে আত্মনিয়োগ করুক। এটাই নিয়ামতের শোকর)। তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্য ফল জাতীয় রিযিক সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের উপকারার্থে নৌকা (ও জাহাজ)কে (স্বীয় শক্তির) অনুবর্তী করেছেন, যাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশে (ও কুদরতে) সমুদ্রে চলাচল করে (এবং তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভ্রমণের উদ্দেশ্য হাসিল হয়) এবং তোমাদের উপকারার্থে নদ-নদীকে (স্বীয় শক্তির) অনুবর্তী করেছেন (যাতে তা থেকে পানি পান কর, জল সেচন কর এবং নৌকা চালাও) এবং তোমাদের উপকারার্থে সূর্য ও চন্দ্রকে (স্বীয় শক্তির) অনুগামী করেছেন, যারা সদা-সর্বদা চলমানই থাকে, (যাতে তোমাদের আলো, উত্তাপ ইত্যাদির উপকার হয়) এবং তোমাদের উপকারার্থে রাত ও দিনকে (স্বীয় শক্তির) অনুগামী করেছেন (যাতে তোমাদের জীবিকা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা হয়)। এবং যে যে বস্তু তোমরা চেয়েছ (এবং যা তোমাদের উপযোগী হয়েছে) তার প্রত্যেকটি তোমাদেরকে দিয়েছেন। (শুধু উল্লিখিত বস্তুসমূহই কেন) আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত (তো এত অপরিমিত যে) যদি (এগুলোকে) গণনা কর, তবে গুণতিতেও শেষ করতে পারবে না। (কিন্তু) সত্য এই যে, মানুষ খুব অন্যায়কারী

অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। (তারা আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহের কদর ও শোকর করে না ; বরং উল্টা কুফর ও পাপকাজে লিপ্ত হয় ; যেমন পূর্বে বলা হয়েছে।

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ইবরাহীমের শুরুতে রিসালত, নবুয়ত ও পরকাল সম্পর্কিত বিষয়বস্তু ছিল। এরপর তওহীদের ফযীলত, কলেমায়ে কুফর ও শিরকের নিন্দা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর এ ব্যপারে মুশরিকদের নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র নিয়ামতের শোকর করার পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা ও কুফরীর পথ বেছে নিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে কাফির ও মুশরিকদের নিন্দা এবং তাদের অশুভ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে; দ্বিতীয় আয়াতে মু'মিনদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের শোকর আদায় করার জন্য কতিপয় বিধানের তাকিদ করা হয়েছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ্‌র মহান নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করে সেগুলোকে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় নিয়োজিত না করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা ঃ أَنْدَادًا শব্দটি نِدٌّ-এর বহুবচন। এর অর্থ সমতুল্য, সমান। প্রতিমাসমূহকে أَنْدَادٌ বলার কারণ এই যে, মুশরিকরা স্বীয় কর্মে তাদেরকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য সাব্যস্ত করে রেখেছিল। تَمَتُّع শব্দের অর্থ কোন বস্তু দ্বারা সাময়িক ভাবে কয়েকদিন উপকৃত হওয়া। আয়াতে মুশরিকদের ভ্রান্ত মতবাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, তারা প্রতিমাসমূহকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য ও তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আদেশ দেওয়া হয়েছে ঃ আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত দ্বারা উপকৃত হতে থাক। তোমাদের শেষ পরিণতি জাহান্নামের অগ্নি।

দ্বিতীয় আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হয়েছে ঃ (মক্কার কাফিররা তো আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে কুফরী দ্বারা পরিবর্তন করে নিয়েছে) আপনি আমার ঈমানদার বান্দাদেরকে বলুন যে, তারা নামায কায়েম করুক এবং আমি যে রিযিক তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করুক। এ আয়াতে মু'মিন বান্দাদের জন্য বিরাট সুসংবাদ ও সম্মান রয়েছে। প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নিজেদের বান্দা বলেছেন, এরপর ঈমান-গুণে গুণান্বিত করেছেন, অতঃপর তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখ ও সম্মানদানের পদ্ধতি বলে দিয়েছেন যে, তারা নামায কায়েম করুক। নামাযের সময়ে অলসতা এবং নামাযের সুষ্ঠু নিয়মাবলীতে ত্রুটি না করা চাই। এ ছাড়া আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক থেকে কিছু তাঁর পথেও ব্যয় করুক। ব্যয় করার উভয় পদ্ধতি বৈধ রাখা হয়েছে—গোপনে অথবা প্রকাশ্যে। কোন কোন আলিম বলেন ঃ ফরয যাকাত ফিতরা ইত্যাদি প্রকাশ্যে হওয়া উচিত —যাতে অন্যরাও উৎসাহিত হয়, আর নফল সদকা-খয়রাত গোপনে দান করা উচিত—

যাতে রিয়া ও নাম-যশ অর্জনের মতো মনোভঙ্গি সৃষ্টির আশংকা না থাকে। ব্যাপারটি আসলে নিয়াতের উপর নির্ভরশীল। যদি প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে রিয়া ও নাম যশের নিয়ত থাকে, তবে দানের ফযিলত খতম হয়ে যায়—ফরয হোক কিংবা নফল। পক্ষান্তরে যদি অপরকে উৎসাহিত করার নিয়ত থাকে, তবে ফরয ও নফল উভয়ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা বৈধ।

مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ এখানে خلال শব্দটি خلة এর বহুবচন হতে পারে। এর অর্থ স্বার্থহীন বন্ধুত্ব। একে باب مفاعلة এর ধাতুও বলা যায়, যেমন دفاع ও قتال ইত্যাদি। এমতাবস্থায় এর অর্থ দু'ব্যক্তি পরস্পর অকৃত্রিম বন্ধুত্ব করা। এ বাক্যটি উপরে বর্ণিত নামায ও সদকার নির্দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

উদ্দেশ্য এই যে, আজ আল্লাহ্ তা'আলা নামায পড়ার এবং গাফিলতিবশত বিগত যমানার না পড়া নামাযের কাযা করার শক্তি ও অবসর দিয়ে রেখেছেন। এমনিভাবে আজ টাকা-পয়সা ও অর্থসম্পদ তোমার করায়ত্ত রয়েছে। একে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল করে নিতে পার। কিন্তু এমন এক দিন আসবে, যখন এ দু'টি শক্তি ও সামর্থ্য তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। তোমার দেহও নামায পড়ার যোগ্য থাকবে না এবং তোমার মালিকানায় ও কোন টাকা-পয়সা থাকবে না, যদ্দ্বারা কারও পাওনা পরিশোধ করতে পার। সেদিন কোন কেনাবেচাও হতে পারবে না যে, তুমি স্বীয় ত্রুটি ও গোনাহের কাফ্ফারার জন্য কোন কিছু কিনে নেবে। সেদিন পারস্পরিক বন্ধুত্ব এবং সম্পর্কও কোন কাজে আসবে না। কোন প্রিয়জন কারও পাপের বোঝা বহন করতে পারবে না এবং তার আযাব কোনরূপে হটাতে পারবে না।

'ঐ দিন' বলে বাহ্যত হাশর ও কিয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। মৃত্যুর দিনও হতে পারে। কেননা, এসব প্রতিক্রিয়া মৃত্যুর সময় থেকেই প্রকাশ পায়। তখন কারও দেহে কাজ করার ক্ষমতা থাকে না এবং কারও মালিকানায় টাকা-পয়সাও থাকে না।

বিধান ও নির্দেশ : এ আয়াতে বলা হয়েছে : কিয়ামতের দিন কারও বন্ধুত্ব কারও কাজে আসবে না। এর উদ্দেশ্য এই যে, শুধু পার্থিব বন্ধুত্বই সেদিন কাজে আসবে না। কিন্তু যাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক আল্লাহ্র সন্তুষ্টির ভিত্তিতে এবং তাঁর দীনের কাজের জন্য হয়, তাদের বন্ধুত্ব তখনও উপকারে আসবে। সেদিন আল্লাহ্ তা'আলার সৎ ও প্রিয় বান্দারা অপরের জন্য সুপারিশ করতে সক্ষম হবেন। বহু হাদীসে এ বিষয়টি বর্ণিত রয়েছে। কোরআন পাকে বলা হয়েছে : الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ -অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা পরস্পরে বন্ধু ছিল, সেদিন

পরস্পরে শত্রু হয়ে যাবে; তারা বন্ধুর ঘাড়ে পাপের বোঝা চাপিয়ে নিজেরা মুক্ত হয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌ভীরু, তাদের কথা ভিন্ন। আল্লাহ্‌ভীরুরা সেখানেও সুপারিশের মাধ্যমে একে অপরের সাহায্য করবেন।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার অনেকগুলো নিয়ামত স্মরণ করিয়ে মানুষকে ইবাদত ও আনুগত্যের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাই হল যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, যাদের ওপর মানুষের অস্তিত্বের সূচনা ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। এরপর তিনি আকাশ থেকে পানি অবতারণ করেছেন, যার সাহায্যে হরেক রকমের ফল সৃষ্টি করেছেন, যাতে সেগুলো তোমাদের রিযিক হতে পারে। ثمرات শব্দটি ثمرة- এর বহুবচন। প্রত্যেক বস্তু থেকে অর্জিত ফলাফলকে ثمرة বলা হয়। তাই মানুষের খাদ্যজাতীয় বস্তু, পরিধেয় বস্ত্র এবং বসবাসের গৃহ—সবই ثمرات শব্দের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, আয়াতে ব্যবহৃত رزق শব্দটিতে এসব প্রয়োজন শামিল রয়েছে। —(মাযহারী)

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলাই নৌকা ও জাহাজসমূহকে তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন। এক আল্লাহ্‌র নির্দেশে নদ-নদীতে চলাফেরা করে। আয়াতে ব্যবহৃত سخر শব্দের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এসব জিনিষের ব্যবহার তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। কাঠ, লোহা-লক্কড়, নৌকা তৈরীর হাতিয়ার এবং এগুলোর বিশুদ্ধ ব্যবহারের জ্ঞান-বুদ্ধি—সবই আল্লাহ্ তা'আলার দান। কাজেই এসব বস্তুর আবিষ্কর্তার গর্ব করা উচিত নয় যে, সে এগুলো আবিষ্কার অথবা নির্মাণ করেছে। কেননা, নৌকা ও জাহাজে যেসব বস্তু ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর কোনটিই সে সৃষ্টি করেনি এবং করতে পারে না। আল্লাহ্‌র সৃজিত কাঠ, লোহা, তামা ও পিতলের মধ্যে কৌশল প্রয়োগ করে এই আবিষ্কারের মুকুট সে নিজের মাথায় পরিধান করেছে। নতুবা বাস্তব সত্য এই যে, স্বয়ং তার অস্তিত্ব, হাত-পা, মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধিও তার নিজের তৈরী নয়।

এরপর বলা হয়েছে ঃ আমি তোমাদের জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে অনুবর্তী করে দিয়েছি। এরা উভয়ে সর্বদা একই গতিতে চলাচল করে। دائبين শব্দটি دأب থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অভ্যাস। অর্থ এই যে, সর্বদা ও সর্বাবস্থায় চলা এ দু'টি গ্রহের অভ্যাসে পরিণত করে দেওয়া হয়েছে। এর খেলাফ হয় না। অনুবর্তী করার অর্থ এরূপ নয় যে, তারা তোমাদের আদেশ ও ইঙ্গিতে চলবে। কেননা, সূর্য ও চন্দ্রকে মানুষের আজ্ঞাধীন চলার অর্থে ব্যক্তিগত নির্দেশের অনুবর্তী করে দিলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিত। কেউ বলত, আজ দু'ঘন্টা পর সূর্যোদয় হোক। কারণ, রাতের কাজ বেশী। কেউ বলত, দু'ঘন্টা আগে সূর্যোদয় হোক। কারণ, দিনের কাজ বেশী। তাই আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও আকাশসমূহকে মানুষের অনুবর্তী করেছেন ঠিকই, কিন্তু এরূপ অর্থে করেছেন যে, ওগুলো সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার অপার রহস্যের অধীনে মানুষের কাজে নিয়োজিত আছে। এরূপ অর্থে নয় যে, তাদের উদয়, অস্ত ও গতি মানুষের ইচ্ছা ও মর্জীর অধীন।

এমনিভাবে রাত ও দিনকে মানুষের অনুবর্তী করে দেওয়ার অর্থও এরূপ যে, এগুলোকে মানুষের সেবা ও সুখ বিধানের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে।

وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ——অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ঐ সমুদয় বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা চেয়েছ। আল্লাহ্র দান ও পুরস্কার কারও চাওয়ার ওপর নির্ভরশীল নয়। আমরা নিজেদের অস্তিত্বও তাঁর কাছে চাইনি। তিনি নিজ কৃপায় চাওয়া ব্যতীতই দিয়েছেন —

ما نبود یم و تقاضا ما نبود
لطف تو نا گفتۂ ما می شنود

—'আমি ছিলাম না এবং আমার তরফ থেকে কোন তাকিদও ছিল না। তোমার অনুগ্রহই আমার না বলা আকাংখা শ্রবণ করেছে।'

আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সৃষ্টি করার জন্য প্রার্থনা কে করেছিল? এগুলো চাওয়া ছাড়াই আমাদের পালনকর্তা দান করেছেন। এ কারণেই কাযী বায়যাভী এ বাক্যের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে প্রত্যেক ঐ বস্তু দিয়েছেন, যা চাওয়ার যোগ্য, যদিও তোমরা চাওনি। কিন্তু বাহ্যিক অর্থ নেওয়া হলেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ, মানুষ সাধারণত যা যা চায়, তার অধিকাংশ তাকে দিয়েই দেওয়া হয়। যেখানে বাহ্যদৃষ্টিতে তার প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় না, সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য অথবা সারা বিশ্বের জন্য কোন না কোন উপযোগিতা নিহিত থাকে যা সে জানে না। কিন্তু সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ জানেন যে, তার প্রার্থনা পূর্ণ করা হলে স্বয়ং তার জন্য অথবা তার পরিবারের জন্য অথবা সমগ্র বিশ্বের জন্য বিপদের কারণ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় প্রার্থনা পূর্ণ না করাই বড় নিয়ামত। কিন্তু জ্ঞানের ত্রুটির কারণে মানুষ তা জানে না, তাই দুঃখিত হয়।

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا——অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত এত অধিক যে, সব মানুষ একত্রিত হয়ে সেগুলো গণনা করতে চাইলে গণে শেষ করতে পারবে না। মানুষের নিজের অস্তিত্ব স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ, দেহের প্রতিটি গ্রন্থি এবং শিরা-উপশিরায় আল্লাহ্ তা'আলার অন্তহীন নিয়ামত নিহিত রয়েছে। শতশত সূক্ষ্ম, নাজুক ও অভিনব যন্ত্রপাতি সজ্জিত এই ভ্রাম্যমান কারখানাটি সর্বদাই কাজে মশগুল রয়েছে। এরপর রয়েছে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ে অবস্থিত সৃষ্টবস্তু, সমুদ্র ও পাহাড়ে অবস্থিত সৃষ্টবস্তু। আধুনিক গবেষণা ও তাতে আজীবন নিয়োজিত হাজারো বিশেষজ্ঞও এগুলোর কূল-কিনারা করতে পারেনি। এছাড়া সাধারণভাবে ধনাত্মক আকারে যেগুলোকে নিয়ামত মনে করা হয়, নিয়ামত সেগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রত্যেক রোগ প্রত্যেক কষ্ট, প্রত্যেক বিপদ ও প্রত্যেক শোক ও দুঃখ থেকে নিরাপদ থাকাও এক একটা স্বতন্ত্র নিয়ামত। একজন মানুষ কত প্রকার রোগে ও কত প্রকার মানসিক ও দৈহিক কষ্টে পতিত

হতে পারে, তার গণনা কেউ করতে সক্ষম নয়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার সম্পূর্ণ দান ও নিয়ামতের গণনা কারও দ্বারা সম্ভবপর নয়।

অসংখ্য নিয়ামতের বিনিময়ে অসংখ্য ইবাদত ও অসংখ্য শোকর জরুরী হওয়াই ছিল ইনসাফের দাবী। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা দুর্বলমতি মানুষের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। মানুষ যখন সত্যের খাতিরে স্বীকার করে নেয় যে, যথার্থ শোকর আদায় করার সাধ্য তার নেই, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ স্বীকারোক্তিকেই শোকর আদায়ের স্থলাভিষিক্ত করে নেন। আল্লাহ্ তা'আলা দাউদ (আ)-এর এ ধরনের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই বলেছিলেন : الان قد شكرت يا داؤد -অর্থাৎ স্বীকারোক্তি করাই শোকর আদায়ের জন্য যথেষ্ট।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ -অর্থাৎ মানুষ খুবই জালিম এবং অত্যধিক অকৃতজ্ঞ। উদ্দেশ্য, কষ্ট ও বিপদে সবর করা, মুখ ও মনকে অভিযোগ থেকে পবিত্র রাখা, একজন রহস্যবিদের পক্ষ থেকে এসেছে বিধায় বিপদকে নিয়ামতই মনে করা, পক্ষান্তরে সুখ ও শান্তিতে সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই ছিল ইনসাফের তাকিদ। কিন্তু সাধারণত মানুষের অভ্যাস এ থেকে ভিন্ন। সামান্য কষ্ট ও বিপদ দেখা দিলেই তারা অধৈর্য হয়ে পড়ে এবং কাতরকণ্ঠে তা ব্যক্ত করতে শুরু করে। পক্ষান্তরে সুখ ও শান্তি লাভ করলে তাতে মত্ত হয়ে আল্লাহ্কে ভুলে যায়। এ কারণেই পূর্ববর্তী আয়াতে খাঁটি মু'মিনের গুণ شَكُورٌ ও صَبَّارٌ (অধিক সবরকারী, অধিক শোকরকারী) ব্যক্ত হয়েছে।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۝ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِى فَإِنَّهُۥ مِنِّى ۖ وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ رَّبَّنَآ إِنِّىٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْـِٔدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى

সূচী-পত্র

السَّمَآءِ ﴿٣٨﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٩﴾ رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

(৩৫) যখন ইবরাহীম বললেন ঃ হে পালনকর্তা, এ শহরকে শান্তিময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন। (৩৬) হে পালন-কর্তা, এরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার এবং কেউ আমার অবাধ্যতা করলে নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৭) হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষা-বাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি ; হে আমাদের পালনকর্তা, যাতে তারা নামায কায়েম রাখে। অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফলাদি দ্বারা রুযী দান করুন, সম্ভবত তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। (৩৮) হে আমাদের পালনকর্তা, আপনিতো জানেন আমরা যা কিছু গোপনে করি এবং যা কিছু প্রকাশ্য করি। আল্লাহ্‌র কাছে পৃথিবীতে ও আকাশে কোন কিছুই গোপন নয়। (৩৯) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাকে এই বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাক দান করেছেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণ করেন। (৪০) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নামায কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা, এবং কবুল করুন আমার দোয়া। (৪১) হে আমাদের পালনকর্তা, আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সব মু'মিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (ঐ সময়টিও স্মরণযোগ) যখন ইবরাহীম (আ) (হযরত ইসমাঈল ও হযরত হাজেরাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশে মক্কার প্রান্তরে এনে রাখার সময় দোয়া করে) বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, এ শহর (মক্কা)-কে শান্তির জায়গা করে দিন (অর্থাৎ এর অধিবাসীরা শান্তিতে থাকুক। উদ্দেশ্য, একে হরম করে দিন) এবং আমাকে ও আমার বিশেষ সন্তান-দেরকে মূর্তি উপাসনা থেকে (যা এখন মূর্খদের মধ্যে প্রচলিত আছে) দূরে রাখুন (যেমন এ যাবত দূরে রেখেছেন)। হে আমার পালনকর্তা, (আমি মূর্তিদের উপাসনা থেকে দূরে থাকার দোয়া এ জন্য করছি যে) এসব মূর্তি অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। (অর্থাৎ তাদের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়েছে। এজন্য ভীত হয়ে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি যেমনি সন্তানদেরকে দূরে রাখার দোয়া করি, তেমনি তাদেরকেও উপদেশ দান করতে

থাকব।) অতঃপর (আমার উপদেশ দানের পর) যে আমার পথে চলবে, সে আমার (এবং তার জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা আছেই) এবং যে (এ ব্যাপারে) আমার কথা মানবে না, (তাকে আপনি হিদায়ত করুন। কেননা) আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। (হিদায়ত দিয়ে তাদের ক্ষমা ও দয়ার ব্যবস্থাও করতে পারেন। এ দোয়ার উদ্দেশ্য মু'মিনদের জন্য সুপারিশ এবং অমু'মিনদের জন্য হিদায়ত প্রার্থনা।) হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজ সন্তানদেরকে (অর্থাৎ ইসমাঈল ও তার মাধ্যমে তার ভাবী বংশধরকে) আপনার পবিত্র গৃহের (অর্থাৎ খানায়ে কা'বার) নিকটে (যা পূর্ব থেকে নির্মিত ছিল এবং মানুষ সর্বদা যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আসছিল) একটি (অপরিসর) প্রান্তরে (যা কংকর-ময় হওয়ার কারণে) চাষাবাদযোগ্য (-ও) নয়, আবাদ করছি। হে আমাদের পালনকর্তা, (পবিত্র গৃহের নিকটে এজন্য আবাদ করছি) যাতে তারা নামাযের (বিশেষ) বন্দোবস্ত করে। (এবং যেহেতু এখন এটা একটা অপরিসর প্রান্তর) অতএব আপনি কিছু লোকের অন্তর এদিকে আকৃষ্ট করে দিন (যেন তারা এখানে এসে বসবাস করে এবং এটি ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে যায়।) এবং (যেহেতু এখানে চাষাবাদ নেই; তাই) তাদেরকে (স্বীয় কুদরত বলে) ফল-মূল আহার্য দান করুন---যাতে তারা (এসব নিয়ামতের) শোকর আদায় করে। হে আমাদের পালনকর্তা, (এসব দোয়া একমাত্র নিজের দাসত্ব ও অভাব প্রকাশের জন্য---আপনাকে অভাব সম্পর্কে জ্ঞাত করার জন্য নয়। কেননা) আপনি তো সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত, যা আমরা গোপন রাখি এবং যা প্রকাশ করি এবং (আমাদের প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়ই বলব কেন) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে (তো) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের কোন কিছুই অপ্রকাশ্য নয়। (আরও কিছু দোয়া পরে উল্লিখিত হবে। মাঝখানে কিছু সংখ্যক সাবেক নিয়ামতের কারণে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, যাতে কৃতজ্ঞতার বরকতে এসব দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। তাই বলেছেন:) সব প্রশংসা (ও গুণ বর্ণনা) আল্লাহ্র জন্য (শোভা পায়) যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাক (দু'পুত্র) দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণকারী। (অর্থাৎ কবুলকারী। সেমতে সন্তান দান সম্পর্কিত আমার দোয়া رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ কবুল করেছেন। অতঃপর এই নিয়ামতের শোকর আদায় করে অবশিষ্ট দোয়া পেশ করছেন:) হে আমার পালনকর্তা, (আপনার পবিত্র গৃহের কাছে আমি আমার সন্তানদেরকে আবাদ করেছি। উদ্দেশ্য, তারা নামায কায়েম করুক। আপনি আমার এ উদ্দেশ্য পূর্ণ করুন। তাদের জন্য নামাযের বন্দোবস্ত করা যেমন আমার কাম্য, তেমনিভাবে নিজের জন্যও কাম্য। তাই নিজের ও তাদের উভয় পক্ষের জন্য দোয়া করছি। যেহেতু আমি ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক অবিশ্বাসীও হবে, তাই দোয়া সবার জন্য করতে পারি না। সুতরাং এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে দোয়া করছি যে) আমাকেও নামায কায়েমকারী রাখুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যেও কিছু সংখ্যককে

(নামায কায়েমকারী করুন)। হে আমাদের পালনকর্তা এবং আমার (এই) দোয়া কবুল করুন। হে আমাদের পালনকর্তা, ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সব মু'মিনকে হিসাব কায়েম হওয়ার দিন। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন উল্লিখিত সবাইকে ক্ষমা করুন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদ-বিশ্বাসের যৌক্তিকতা, গুরুত্ব এবং শিরক সংক্রান্ত মূর্খতা ও নিন্দাবাদ বর্ণিত হয়েছে। তওহীদের ব্যাপারে পয়গম্বরগণের মধ্যে সবচাইতে অধিক সফল জিহাদ হযরত ইবরাহীম (আ) করেছিলেন। এ জন্যই ইবরাহীম (আ)-এর দীনকে বিশেষভাবে 'দীনে-হানীফ' বলা হয়।

এরই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনী বিবৃত হয়েছে। আরও একটি কারণ এই যে, পূর্ববর্তী اَلَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا আয়াতে মক্কার ঐসব কাফিরের নিন্দা করা হয়েছে, যারা পিতৃপুরুষের অনুসরণে ঈমানকে কুফরে এবং তওহীদকে শিরকে রূপান্তরিত করেছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে তাদের ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ ইবরাহীম (আ)-এর আকীদা ও আমল সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যাতে পিতৃ অনুসরণে অভ্যস্ত কাফিররা এদিকে লক্ষ্য করে কুফর থেকে বিরত হয়। —(বাহ্‌রে মুহীত)

বলা বাহুল্য, শুধু ইতিহাস বর্ণনা করার লক্ষ্যেই কোরআন পাকে পয়গম্বরগণের কাহিনী ও অবস্থা বর্ণনা করা হয়নি, বরং এসব কাহিনীতে মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে যেসব মৌলিক দিকনির্দেশ থাকে, সেগুলোকে ভাস্বর রাখার জন্য এসব ঘটনা বারবার কোরআন পাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে প্রথম আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দু'টি দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম দোয়া ঃ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا — অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, এ (মক্কা) নগরীকে শান্তির আলয় করে দাও। সূরা বাকারায়ও এ দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে بلد শব্দটি الف ও لام ব্যতীত بَلَدًا বলা হয়েছে। এর অর্থ অনির্দিষ্ট নগরী। কারণ এই যে, এ দোয়াটি যখন করা হয়েছিল তখন মক্কা নগরীর পত্তন হয়নি। তাই ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় দোয়া করেছিলেন যে, এ জায়গাকে একটি শান্তির নগরীতে পরিণত করে দিন।

এরপর মক্কায় যখন জনবসতি স্থাপিত হয়ে যায়, তখন এ আয়াতে বর্ণিত দোয়াটি করেন। এ ক্ষেত্রে মক্কাকে নির্দিষ্ট করে দোয়া করেন যে, একে শান্তির আবাসস্থল করে দিন। দ্বিতীয় দোয়া এই যে, আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

পয়গম্বরগণ নিষ্পাপ। তাঁরা শিরক, মূর্তিপূজা এমনকি কোন গোনাহ্ও করতে পারেন না। কিন্তু এখানে হযরত ইবরাহীম (আ) দোয়া করতে গিয়ে নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। এর কারণ এই যে, স্বভাবজাত ভীতির প্রভাবে পয়গম্বরগণ সর্বদা শংকা অনুভব করতেন। অথবা আসল উদ্দেশ্য ছিল সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচানোর দোয়া করা। সন্তানদেরকে এর গুরুত্ব বুঝাবার জন্য নিজেকেও দোয়ায় শামিল করে নিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় দোস্তের দোয়া কবুল করেছেন। ফলে তাঁর সন্তানরা শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে নিরাপদ থাকে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মক্কাবাসীরা তো সাধারণভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-এরই বংশধর। পরবর্তীতে তো তাদের মধ্যে মূর্তিপূজা বিদ্যমান ছিল। বাহরে-মুহীত গ্রন্থে সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়নার বরাত দিয়ে ইসমাঈল (আ)-এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, ইসমাঈল (আ)-এর সন্তানদের মধ্যে কেউ প্রকৃতপক্ষে মূর্তিপূজা করেন নি। বরং যে সময় জুরহাম গোত্রের লোকেরা মক্কা অধিকার করে এর সন্তানদেরকে হরম থেকে বের করে দেয়, তখন তারা হরমের প্রতি অগাধ ভালবাসা ও সম্মানের কারণে এখানকার কিছু পাথর সাথে করে নিয়ে যায়। তারা এগুলোকে হরম ও বায়তুল্লাহ্র স্মারক হিসাবে সামনে রেখে ইবাদত করত এবং এগুলোর প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করত। এতে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্যের কোনরূপ ধারণা ছিল না। বরং বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করে নামায পড়া এবং বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করা যেমন আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদত, তেমনি তারা এই পাথরের দিকে মুখ করা এবং এগুলো তাওয়াফ করাকে আল্লাহ্র ইবাদতের পরিপন্থী মনে করত না। এরপর এ কর্মপন্থাই মূর্তিপূজার কারণ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় আয়াতে এই দোয়ার কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, মূর্তিপূজা থেকে আমাদের অব্যাহতি কামনার কারণ এই যে, এ মূর্তি অনেক মানুষকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করেছে। ইবরাহীম (আ) স্বীয় পিতা ও জাতির অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলেছিলেন। মূর্তিপূজা তাদেরকে সর্বপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছিল।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে :

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ — অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার অনুসারী হবে অর্থাৎ ঈমান ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী হবে, সে তো আমারই। উদ্দেশ্য, তার প্রতি যে দয়া ও কৃপা করা হবে, তা বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করে তার জন্য আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। এখানে অবাধ্যতার অর্থ যদি কর্মগত অবাধ্যতা অর্থাৎ মন্দ কর্ম নেওয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ স্পষ্ট যে, আপনার কৃপায় তারও ক্ষমা আশা করা যায়। এবং যদি অবাধ্যতার অর্থ কুফরী ও অস্বীকৃতি নেওয়া হয়, তবে কাফির ও মুশরিকদের ক্ষমা না হওয়া নিশ্চিত ছিল এবং ওদের জন্য সুপারিশ না করার নির্দেশ ইবরাহীম (আ)-কে পূর্বেই দেওয়া হয়েছিল। এমতাবস্থায় তাদের ক্ষমার আশা ব্যক্ত করা সঠিক হতে পারে না। তাই বাহরে মুহীত গ্রন্থে বলা হয়েছে : এখানে হযরত ইবরাহীম (আ) আদৌ দোয়া অথবা সুপারিশের ভাষা প্রয়োগ করেন নি। একথা

বলেন নি যে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তবে তিনি পয়গম্বরসুলভ দয়া প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেক পয়গম্বরের আন্তরিক বাসনা এটাই ছিল যে, কোন কাফিরও যেন আযাবে পতিত না হয়। "আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু"---একথা বলে তিনি এই স্বভাবসুলভ বাসনা প্রকাশ করে দিয়েছেন মাত্র। একথা বলেন নি যে, এদের সাথে ক্ষমা ও দয়ার ব্যবহার করুন। হযরত ঈসা (আ)-ও স্বীয় উম্মতের কাফিরদের সম্পর্কে এরূপ বলেছিলেনঃ

وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ---অর্থাৎ আপনি যদি ওদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান, সবই করতে পারেন। আপনার কাজে কেউ বাধাদানকারী নেই।

আল্লাহ্ তা'আলার এ দু'জন মনোনীত পয়গম্বর কাফিরদের ব্যাপারে সুপারিশ করেন নি। কারণ এটা ছিল আদব ও শিষ্টাচারের পরিপন্থী। কিন্তু একথাও বলেন নি যে, কাফিরদের উপর আযাব নাযিল করুন। বরং আদবের সাথে বিশেষ ভংগিতে তাদের ক্ষমার স্বভাবজাত বাসনা প্রকাশ করেছেন মাত্র।

বিধান ও নির্দেশ ঃ দোয়া প্রত্যেকেই করে কিন্তু দোয়ার সঠিক ঢঙ সবার জানা থাকে না। পয়গম্বরগণের দোয়া শিক্ষাপ্রদ হয়ে থাকে। দোয়ায় কি জিনিস চাওয়া বিধেয় পয়গম্বরগণের দোয়া থেকে তা অনুমান করা যায়। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আলোচ্য দোয়ায় দু'টি অংশ রয়েছে। এক. মক্কা শহরকে ভয় ও আশংকামুক্ত শান্তির আবাসস্থান করা। দুই, স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে চিরতরে মুক্তি দান করানো।

চিন্তা করলে দেখা যায়, এ দু'টি বিষয়ই হচ্ছে মানুষের সার্বিক কল্যাণের মৌলিক ধারা। কেননা মানুষ যদি বসবাসের জায়গায় ভয়, আশংকা ও শত্রুর আক্রমণ থেকে দুর্ভাবনামুক্ত হতে না পারে, তবে জাগতিক ও বৈষয়িক এবং ধর্মীয় ও আত্মিক কোন দিক দিয়েই তার জীবন সুখী হতে পারে না। জগতের যাবতীয় কর্ম ও সুখ যে শান্তি ও মানসিক স্থিরতার উপর নির্ভরশীল, একথা বলাই বাহুল্য। যে ব্যক্তি শত্রুর হামলা ও বিভিন্ন প্রকার বিপদাশংকায় পরিবেষ্টিত থাকে, তার কাছে জগতের বৃহত্তম নিয়ামত, পানাহার ও নিদ্রা-জাগরণের সর্বোত্তম সুযোগ-সুবিধা, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর দালান-কোঠা ও বাংলো এবং অর্থ সম্পদের প্রাচুর্য---সবই তিক্ত বিস্বাদ মনে হতে থাকে।

ধর্মীয় দিক দিয়েও প্রত্যেক ইবাদত ও আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করা তখনই সম্ভবপর, যখন মানসিক স্থিরতা ও প্রশান্তির পরিবেশ বিরাজমান থাকে।

তাই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম দোয়ায় মানসিক কল্যাণের, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সব প্রয়োজন বোঝান হয়েছে। এই একটি মাত্র বাক্য দ্বারা তিনি সন্তান-সন্ততির জন্য দুনিয়ার সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রার্থনা করেছেন।

এ দোয়া থেকে আরও জানা গেল যে, সন্তানদের প্রতি সহানুভূতি এবং তাদের

অর্থনৈতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সাধ্যানুযায়ী ব্যবস্থা করাও পিতার অন্যতম কর্তব্য। এর চেষ্টা যুহ্দ তথা দুনিয়ার ভালবাসা বর্জনের পরিপন্থী নয়।

দ্বিতীয় দোয়ায়ও অনেক ব্যাপকতা আছে। কেননা, যে পাপের ক্ষমা নেই তা হচ্ছে শিরক ও মূর্তিপূজা। তিনি এ পাপ থেকে মুক্ত থাকার দোয়া করেছেন। এর পর কোন পাপ হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ অন্যান্য আমল দ্বারাও হতে পারে এবং কারও সুপারিশ দ্বারাও মাফ হয়ে যেতে পারে। যদি মূর্তিপূজা শব্দটিকে সূফী বুযুর্গদের ভাষ্য অনুযায়ী ব্যাপকতর অর্থে ধরা হয়, তবে যে বস্তু মানুষকে আল্লাহ্ থেকে গাফিল করে দেয়, তাই তার জন্য মূর্তি বিশেষ এবং এর প্রতি আন্তরিক আকর্ষণে পরাভূত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়া তার জন্য পূজা সমতুল্য। অতএব মূর্তিপূজা থেকে মুক্ত রাখার দোয়ার মধ্যে সর্বপ্রকার পাপ থেকে হিফাযত করার বিষয়বস্তু এসে গেছে। কোন কোন সূফী বুযুর্গ এ অর্থেই নিজের মনকে সম্বোধন করে গোনাহ্ ও গাফিলতির প্রতি ভৎর্সনা করেছেন ঃ

سوده گشت از سجده راه بتان پیشانیم
چند بر خود تهمت دین مسلمانی نهم

সাধক রূমী বলেন ঃ هر خیال شهوتی در ره بتی ست

তৃতীয় আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আরও একটি বিজ্ঞসুলভ দোয়া বর্ণিত হয়েছে ঃ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ الآية হে আমার পালনকর্তা! আমি কিছু সংখ্যক পরিবার-পরিজনকে পাহাড়ের এমন এক পাদদেশে আবাদ করেছি, যেখানে চাষাবাদের সম্ভাবনা নেই (এবং বাহ্যত জীবনধারণের কোন উপকরণ নেই)। পাহাড়ের এ পাদদেশটি আপনার সম্মানিত গৃহের নিকটে অবস্থিত। এখানে আবাদ করার উদ্দেশ্য, যাতে তারা নামায কায়েম করে। এজন্য আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন, যাতে তাদের সম্প্রীতি ও বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। তাদেরকে ফল দান করুন, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়।

ইবরাহীম (আ)-এর এ দোয়ার একটি পটভূমি আছে। তা এই যে, নূহ (আ)-এর আমলে মহা প্লাবনে কা'বা গৃহের প্রাচীর সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর এ পবিত্র ঘর পুনর্নির্মাণের ইচ্ছা করেন, তখন ইবরাহীম (আ)-কে এ কাজের জন্য মনোনীত করেন, এবং তাকে স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে সিরিয়া থেকে হিজরত করে এই শুষ্ক ও অনুর্বর ভূমিতে বসতি স্থাপন করার আদেশ দেন।

সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত আছে, ইসমাঈল (আ) তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন। ইবরাহীম (আ) আদেশ অনুযায়ী তাঁকে ও তাঁর জননী হাজেরাকে বর্তমান কা'বাগৃহ ও যমযম কূপের অদূরে রেখে দিলেন। তখন এ স্থানটি পাহাড় বেষ্টিত জনশূন্য প্রান্তর ছিল। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পানি ও জনবসতির কোন চিহ্ন ছিল না। ইবরাহীম (আ) তাঁদের জন্য একটি পাত্রে কিছু খাদ্য এবং মশকে পানি রেখে দিলেন।

এরপর ইবরাহীম (আ) সিরিয়া প্রত্যাবর্তনের আদেশ পান। যে জায়গায় আদেশটি লাভ করেন, সেখান থেকেই আদেশ পালন করত রওনা হয়ে যান। স্ত্রী ও দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে জনমানবহীন প্রান্তরে ছেড়ে যাওয়ার ফলে তাঁর মধ্যে যে মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত পরবর্তী দোয়ার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্র আদেশ পালনে তিনি এতটুকু বিলম্ব করাও সমীচীন মনে করেন নি যে, হাজেরা-কে সংবাদ দেবেন এবং কিছু সান্ত্বনার বাক্য বলে যাবেন।

ফলে হযরত হাজেরা যখন তাঁকে যেতে দেখলেন, তখন বারবার ডেকে বললেন, আপনি আমাদেরকে কোথায় ছেড়ে যাচ্ছেন? এখানে না আছে কোন মানুষ এবং না আছে জীবনধারণের কোন উপকরণ। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ) পেছনে ফিরে দেখলেন না। সম্ভবত তিনি আল্লাহ্ তা'আলারই আদেশ পেয়েছেন। তাই পুনরায় ডেকে জিজ্ঞেস করলেন: আল্লাহ্ কি আপনাকে এখান থেকে চলে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন? তখন ইবরাহীম (আ) পেছনে তাকিয়ে উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। হযরত হাজেরা একথা শুনে বললেন: إِذًا لَا يُضَيِّعُنَا অর্থাৎ তবে আর কোন চিন্তা নেই। যে মালিক আপনাকে এখান থেকে চলে যওয়ার আদেশ দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বিনষ্ট হতে দেবেন না।

হযরত ইবরাহীম (আ) সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। যখন একটি পাহাড়ের পশ্চাতে পৌঁছলেন এবং হাজেরা ও ইসমাঈল দৃষ্টি থেকে অপসৃত হয়ে গেলেন, তখন বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করে আয়াতে বর্ণিত দোয়াটি করলেন।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এই দোয়া থেকে অনেক দিক নির্দেশ ও মাস'আলা জানা যায়। নিম্নে এগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে।

দোয়ায়ে ইবরাহীমীর রহস্যাবলী: (১) ইবরাহীম (আ) একদিকে আল্লাহ্র দোস্ত হিসেবে তাঁর যা করণীয় ছিল, তা করেছেন। যখন ও যে স্থানে তিনি সিরিয়ায় ফিরে যাওয়ার আদেশ পান, সেই মুহূর্তে সেই স্থান থেকে শুষ্ক জনমানবহীন প্রান্তরে স্ত্রী-পুত্রকে রেখে চলে যাওয়ার ব্যাপারে এবং আল্লাহ্র আদেশ পালনে তিনি বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করেননি। এ আদেশ পালনে তিনি এতটুকু বিলম্বও সহ্য করেননি যে, স্ত্রীর কাছে গিয়ে আল্লাহ্র আদেশের কথা বলবেন এবং তাঁকে দু'কথা বলে সান্ত্বনা দেবেন। বরং আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে তিনি সেখান থেকেই সিরিয়াভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান।

অপরদিকে পরিবার-পরিজন ও তাদের মহব্বতের হক এভাবে পরিশোধ করেছেন যে, পাহাড়ের পশ্চাতে তাদের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়েই আল্লাহ্র দরবারে তাদের হিফাযত ও সুখে-শান্তিতে বাস করার জন্য দোয়া করেছেন। কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, নির্দেশ পালনের সাথে সাথে যে দোয়া করা হবে, তা দয়াময়ের দরবারে অবশ্যই কবুল হবে, হয়েছেও তাই। এই সহায়হীনা ও অবলা মহিলা এবং তাঁর শিশুপুত্র শুধু নিজেরাই পুনর্বাসিত হন নি; বরং তাঁদের উছিলায় একটি শহর স্থাপিত হয়ে গেছে এবং শুধু তাঁরাই জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র পাননি, তাঁদের বরকতে আজ পর্যন্ত মক্কাবাসীদের উপর সর্বপ্রকার নিয়ামতের দ্বার অবারিত রয়েছে।

এ হচ্ছে পয়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা ও সুব্যবস্থা। এখানে এক দিকে লক্ষ্য দেওয়ার সময় অন্যদিক উপেক্ষিত হতো না। পয়গম্বরগণ সাধারণ সূফী-বুযুর্গদের মত ভাবাবেগে হারিয়ে যেতেন না। এ শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ যথার্থ পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

(২) হযরত ইবরাহীম (আ) যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশ পান যে, দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তাঁর জননীকে শুষ্ক প্রান্তরে ছেড়ে আপনি সিরিয়া চলে যান, তখন তাঁর মনে এতটুকু বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আল্লাহ্ তাঁদেরকে বিনষ্ট করবেন না। তাঁদের জন্য পানি অবশ্যই সরবরাহ করা হবে। তাই দোয়ার بِوَادٍ غَيْرِ ذِي مَاءٍ (জলহীন প্রান্তরে) বলেন নি,

غَيْرِ ذِي زَرْعٍ (চাষাবাদহীন) বলে আবেদন করেছেন যে, তাদেরকে ফলমূল দান করুন, যদিও তা অন্য জায়গা থেকে আনা হয়। এ কারণেই মক্কা মুকাররমায় আজ পর্যন্ত চাষাবাদের তেমন ব্যবস্থা না থাকলেও সারা বিশ্বের ফলমূল এত অধিক পরিমাণে সেখানে পৌঁছে থাকে যে, অন্যান্য অনেক শহরেই সেগুলো পাওয়া দুষ্কর।—(বাহ্রে-মুহীত)

(৩) عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের ভিত্তি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল। ইমাম কুরতুবী সূরা বাকারার তফসীরে বিভিন্ন রেওয়ায়েতের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ) বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ করেন। তাঁকে যখন পৃথিবীতে নামানো হয়, তখন মু'জিযা হিসেবে সরন্দ্বীপ পাহাড় থেকে এখানে পৌঁছানো হয় এবং জিবরায়ীল বায়তুল্লাহ্র জায়গা চিহ্নিতও করে দেন। আদম (আ) স্বয়ং এবং তাঁর সন্তানরা এর চতুষ্পার্শ্ব প্রদক্ষিণ করতেন। শেষ পর্যন্ত নূহের মহাপ্লাবনের সময় বায়তুল্লাহ্ উঠিয়ে নেওয়া হয়, কিন্তু তার ভিত্তি সেখানেই থেকে যায়। হযরত ইবরাহীম (আ)-কে এই ভিত্তির উপরই বায়তুল্লাহ্ পুনর্নির্মাণের আদেশ দেওয়া হয়। হযরত জিবরায়ীল প্রাচীন ভিত্তি দেখিয়ে দেন। ইবরাহীম (আ) নির্মিত এই প্রাচীর মূর্খতা-যুগে বিধ্বস্ত হয়ে গেলে কুরায়শরা তা নতুনভাবে নির্মাণ করে। এ নির্মাণ-কাজে আবূ তালিবের সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা)ও নবুয়তের পূর্বে অংশগ্রহণ করেন।

এতে বায়তুল্লাহ্র বিশেষণ مُحَرَّم উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সম্মানিতও হতে পারে এবং সুরক্ষিতও। বায়তুল্লাহ্ শরীফের মধ্যে উভয় বিশেষণ বিদ্যমান আছে। এটি যেমন চিরকাল সম্মানিত, তেমনি চিরকাল শত্রুর কবল থেকে সুরক্ষিত।

(৪) لِيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ হযরত ইবরাহীম (আ) দোয়ার প্রারম্ভে পুত্র ও তার জননীর অসহায়তা ও দুর্দশা উল্লেখ করার পর সর্বপ্রথম তাদেরকে নামায কায়েমকারী করার দোয়া করেন। কেননা, নামায দ্বারা ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় মঙ্গল সাধিত হয়। এ থেকে বোঝা গেল যে, পিতা যদি সন্তানকে নামাযের অনুবর্তী করে দেয় তবে এটাই

সন্তানদের পক্ষে পিতার সর্ববৃহৎ সহানুভূতি ও হিতাকাঙ্ক্ষা হবে। ইবরাহীম (আ) যদিও সেখানে মাত্র একজন মহিলা ও ছেলেকে ছেড়ে ছিলেন, কিন্তু দোয়ায় বহুবচন ব্যবহার করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, ইবরাহীম (আ) জানতেন যে, এখানে শহর হবে এবং ছেলের বংশ বৃদ্ধি পাবে। তাই দোয়ায় সবাইকে শামিল রেখেছেন।

(৫) أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ — أفئدة শব্দটি فؤاد এর বহুবচন। এর অর্থ অন্তর। এখানে أفئدة শব্দটি نكرة এবং তার সাথে من অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে, যা تقليل ও تبعيض এর অর্থে আসে। তাই অর্থ এই যে, কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন। তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন: যদি এ দোয়ায় 'কিছু সংখ্যক' অর্থবোধক অব্যয় ব্যবহার করা না হত, أفئدة الناس বলা হত, তবে সারা বিশ্বের মুসলিম, অমুসলিম, ইহুদী, খৃস্টান এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব মানুষ মক্কায় ভিড় করত, যা তাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াত। এ তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইবরাহীম (আ) দোয়ায় বলেছেন: কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন।

(৬) وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ — ثمرات শব্দটি ثمرة এর বহুবচন। এর অর্থ ফল, যা স্বভাবত খাওয়া হয়। এদিক দিয়ে দোয়ার সারমর্ম এই যে, তাদেরকে খাওয়ার জন্য সর্বপ্রকার ফল দান করুন।

ثمرة শব্দটি কোন সময় ফলশ্রুতি ও উৎপাদনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা খাওয়ার ফলের চেয়ে অনেক ব্যাপক। প্রত্যেক উপকারী বস্তুর ফলাফলকে তার ثمرة বলা যায়। মেশিন ও শিল্প কারখানার ثمرة বলতে তার উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীকে বোঝায়। চাকুরী ও মজুরির ফলশ্রুতিতে যে পারিশ্রমিক ও বেতন পাওয়া যায়, তা চাকুরীর ثمرة। কোরআন পাকের এক আয়াতে এ দোয়ায় ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ বলা হয়েছে। এতে شجر শব্দ ব্যবহার না করে شيء (বস্তু) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ইবরাহীম (আ) তাদের জন্য শুধু খাওয়ার ফলের দোয়াই করেন নি; বরং প্রত্যেক বস্তুর অর্জিত ফলাফলেরও দোয়া করেছেন। সম্ভবত এ দোয়ার প্রভাবেই মক্কা মুকাররমা কোন কৃষিপ্রধান অথবা শিল্পপ্রধান এলাকা না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের দ্রব্যসামগ্রী এখানে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়, যা বোধ হয় জগতের অন্য কোন বৃহত্তম শহরেও পাওয়া যায় না।

(৭) হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর সন্তানদের জন্য এরূপ দোয়া করেন নি যে, মক্কার ভূমিকে চাষাবাদযোগ্য করে দিন। এরূপ করলে মক্কার উপত্যকাকে শস্য-শ্যামলা করে

দেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু তিনি সন্তানদের জন্য কৃষিবৃত্তি পছন্দ করেন নি। তাই কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দেওয়ার জন্য দোয়া করেছেন যাতে তারা পূর্ব-পশ্চিম ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে আগমন করে এবং তাদের এ সমাবেশ সমগ্র বিশ্বের জন্য হিদায়েত ও মক্কাবাসীদের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এই দোয়া কবূল করেছেন। ফলে মক্কার অধিবাসীরা আজ পর্যন্ত চাষাবাদ ও কৃষিকাজের মুখাপেক্ষী না হয়েও জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সব আসবাবপত্রের অধিকারী হয়ে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করছে।

(৮) لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ —এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, সন্তানদের জন্য আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দোয়া এ কারণে করা হয়েছে, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়ে কৃতজ্ঞতার সওয়াবও অর্জন করে। এভাবে নামাযের অনুবর্তিতা দ্বারা দোয়া শুরু করে কৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে শেষ করা হয়েছে। মাঝখানে আর্থিক সুখ-শান্তির প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। এতে শিক্ষা রয়েছে যে, মুসলমানের এরূপই হওয়া উচিত। তার ক্রিয়াকর্ম, ধ্যানধারণা ও চিন্তাধারার ওপর পরকালের কল্যাণ চিন্তা প্রবল থাকা দরকার এবং সংসারের কাজ ততটুকুই করা উচিত, যতটুকু নেহায়েত প্রয়োজন।

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ط وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের প্রসঙ্গ টেনে দোয়া সমাপ্ত করা হয়েছে। কাকুতি-মিনতি ও বিলাপ প্রকাশার্থে رَبَّنَا শব্দটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আপনি আমাদের অন্তরগত অবস্থা ও বাহ্যিক আবেদন-নিবেদন সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

'অন্তরগত অবস্থা' বলে ঐ দুঃখ, মনোবেদনা ও চিন্তা-ভাবনা বোঝানো হয়েছে, যা একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তার জননীকে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিঃসম্বল, ফরিয়াদরত অবস্থায় ছেড়ে আসা এবং তাদের বিচ্ছেদের কারণে স্বাভাবিকভাবে দেখা দিয়েছিল। 'বাহ্যিক আবেদন-নিবেদন' বলে ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া এবং হাজেরার ঐসব বাক্য বোঝানো হয়েছে, যেগুলো আল্লাহর আদেশ শোনার পর তিনি বলেছিলেন অর্থাৎ আল্লাহ্ যখন নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি আমাদেরকে বিনষ্ট করবেন না। আয়াতের শেষে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের বিস্তৃতি আরও বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমাদের বাহ্যিক ও অন্তরগত অবস্থাই কেন বলি, সমস্ত ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে কোন বস্তুই তাঁর অজ্ঞাত নয়।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ط

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ —এ আয়াতের বিষয়বস্তুও পূর্ববর্তী দোয়ার পরিশিষ্ট। কেননা, দোয়ার অন্যতম শিষ্টাচার হচ্ছে দোয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা। ইবরাহীম (আ) এ স্থলে বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'আলার একটি নিয়ামতের শোকর আদায় করেছেন। নিয়ামতটি এই যে, ঘোর বার্ধক্যের বয়সে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করে তাঁকে সুসন্তান হযরত ইসমাঈল ও ইসহাক (আ)-কে দান করেছেন।

এ প্রশংসা বর্ণনায় এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পরিত্যক্ত শিশুটি আপনারই দান। আপনিই তার হেফাযত করুন।

অবশেষে إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ —বলে প্রশংসা-বর্ণনা সমাপ্ত করা হয়েছে অর্থাৎ নিশ্চয় আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণকারী অর্থাৎ কবুলকারী।

প্রশংসা বর্ণনার পর আবার দোয়ায় মশগুল হয়ে যান : رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ —এতে নিজের জন্য ও সন্তানদের জন্য নামায কায়েম রাখার দোয়া করেন। অতঃপর কাকুতি-মিনতি সহকারে আবেদন করেন যে, হে আমার পালনকর্তা, আমার দোয়া কবুল করুন।

সবশেষে একটি ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া করলেন : رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ —অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সব মু'মিনকে ক্ষমা করুন ঐদিন, যেদিন হাশরের ময়দানে সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে।

এতে তিনি মাতাপিতার জন্যও মাগফিরাতের দোয়া করেছেন। অথচ পিতা অর্থাৎ আযর যে কাফির ছিল, তা কোরআন পাকেই উল্লিখিত আছে। সম্ভবত এ দোয়াটি তখন করেছেন, যখন ইবরাহীম (আ)-কে কাফিরদের জন্য দোয়া করতে নিষেধ করা হয়নি। অন্য এক আয়াতেও অনুরূপ উল্লেখ আছে :

وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ●

বিধান ও নির্দেশ : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে দোয়ার যথাবিহিত পদ্ধতি জানা গেল যে, বারবার কাকুতি-মিনতি ও ক্রন্দন সহকারে দোয়া করা চাই এবং সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা চাই। এভাবে প্রবল আশা করা যায় যে, দোয়া কবূল হবে।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ

تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ﴿۴۲﴾ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ

طَرْفُهُمْ ۚ وَ اَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿۴۳﴾ وَ اَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ

الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَاۤ اَخِّرْنَاۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ

دَعْوَتَكَ وَ نَتَّبِعِ الرُّسُلَ ؕ اَوَ لَمْ تَكُوْنُوْۤا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ

زَوَالٍ ﴿۴۴﴾ وَّ سَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَ تَبَيَّنَ لَكُمْ

كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَ ضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ﴿۴۵﴾ وَ قَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ

وَ عِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ؕ وَ اِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿۴۶﴾

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۴۷﴾

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَ السَّمٰوٰتُ وَ بَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ

الْقَهَّارِ ﴿۴۸﴾ وَ تَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَىِٕذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿۴۹﴾

سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّ تَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ﴿۵۰﴾ لِيَجْزِيَ اللّٰهُ

كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۵۱﴾ هٰذَا بَلٰغٌ

لِّلنَّاسِ وَ لِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَ لِيَعْلَمُوْۤا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ لِيَذَّكَّرَ

اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۵۲﴾

---

(৪২) জালিমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহকে কখনও বেখবর মনে করো না। তাদেরকে তো ঐ দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হবে।

(৪৩) তারা মস্তক উপরে তুলে ভীতি-বিহবল চিত্তে দৌড়াতে থাকবে। তাদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরে আসবে না এবং তাদের অন্তর উড়ে যাবে। (৪৪) মানুষকে ঐ দিনের ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন তাদের কাছে আযাব আসবে। তখন জালিমরা বলবে ঃ হে আমাদের পালন-কর্তা, আমাদেরকে সামান্য মেয়াদ পর্যন্ত সময় দিন, যাতে আমরা আপনার আহবানে সাড়া দিতে এবং পয়গম্বরগণের অনুসরণ করতে পারি। তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেতে না যে, তোমাদেরকে দুনিয়া থেকে যেতে হবে না ? (৪৫) তোমরা তাদের বাসভূমিতেই বসবাস করতে, যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে এবং তোমাদের জানা হয়ে গিয়েছিল যে, আমি তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছি এবং আমি তোমাদেরকে ওদের সব কাহিনীই বর্ণনা করেছি। (৪৬) তারা নিজেদের মধ্যে ভীষণ চক্রান্ত করে নিয়েছে এবং আল্লাহ্‌র সামনে রক্ষিত আছে তাদের কু-চক্রান্ত। তাদের কুটকৌশল পাহাড় টলিয়ে দেওয়ার মত হবে না। (৪৭) অতএব আল্লাহ্‌র প্রতি ধারণা করোনা যে, তিনি রসূলগণের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৪৮) যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তিত করা হবে আকাশসমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্‌র সামনে পেশ হবে। (৪৯) তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। (৫০) তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে অগ্নিতে ঢেকে নিবে। (৫১) যাতে আল্লাহ্ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৫২) এটা মানুষের একটি সংবাদনামা এবং যাতে এতদ্বারা ভীত হয় এবং যাতে জেনে নেয় যে, উপাস্য তিনিই—একক; এবং যাতে বুদ্ধিমানরা চিন্তা-ভাবনা করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) জালিমরা (অর্থাৎ কাফিররা) যা কিছু করছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাকে (দ্রুত আযাব না দেওয়ার কারণে) বেখবর মনে করো না। কেননা, তাদেরকে শুধু ঐদিন পর্যন্ত সময় দিয়ে রেখেছেন, যেদিন তাদের নেত্রসমূহ (বিস্ময় ও ভয়ের আতিশয্যে) বিস্ফারিত হয়ে যাবে (এবং তারা হিসাবের ময়দানের দিকে তলব অনুযায়ী) ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে থাকবে (এবং) তাদের দৃষ্টি তাদের দিকে ফিরে আসবে না (অর্থাৎ অনিমেষ নেত্রে সামনে তাকিয়ে থাকবে) এবং তাদের অন্তরসমূহ (ভীষণ আতংকে) অত্যন্ত ব্যাকুল হবে এবং (সেদিন এসে গেলে কাউকে সময় দেওয়া হবে না। অতএব) আপনি তাদেরকে ঐদিনের (আগমনের) ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন তাদের উপর আযাব এসে যাবে। অতঃপর জালিমরা বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, সামান্য মেয়াদ পর্যন্ত আমাদেরকে (আরও) সময় দিন (এবং দুনিয়াতে পুনরায় প্রেরণ করুন) আমরা (এই সময়ের মধ্যে) আপনার সব কথা মেনে নেব এবং পয়গম্বরগণের অনুসরণ করব। (উত্তরে বলা হবে ঃ আমি কি দুনিয়াতে তোমাদেরকে দীর্ঘমেয়াদী সময় দেইনি এবং) তোমরা কি (এ দীর্ঘ সময়ের কারণেই) ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে) কসম খাওনি যে, তোমাদেরকে (দুনিয়া থেকে) কোথাও যেতে হবে না? (অর্থাৎ তোমরা কিয়ামতে অবিশ্বাসী ছিলে এবং

এজন্য কসম খেতে ; যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ

لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ অথচ) অবিশ্বাস থেকে বিরত হওয়ার যাবতীয় কারণ উপস্থিত ছিল। সেমতে তোমরা ঐ (পূর্ববর্তী) লোকদের বাসস্থানে বাস করতে, যারা (কুফর ও কিয়ামত অস্বীকার করে) নিজেদের ক্ষতি করেছিল এবং তোমরা (সংবাদ পরম্পরার মাধ্যমে) একথাও জানতে যে, আমি তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলাম। (অর্থাৎ কুফরী ও অস্বীকারের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। এ থেকে তোমরা জানতে পারতে যে, অস্বীকার করা গযবের কারণ। সুতরাং স্বীকার করে নেওয়া অপরিহার্য। তাদের বাসস্থানে বাস করা সর্বদা তাদের এসব অবস্থা স্মরণ করানোর কারণ হতে পারত। সুতরাং অস্বীকারের অবকাশ মোটেই ছিল না।) এবং এসব ঘটনা শোনা ছাড়াও সেগুলো (শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ছিল) আমি (ও) তোমাদের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। (অর্থাৎ ঐশী গ্রন্থসমূহে আমিও এসব ঘটনাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ণনা করেছি যে, যদি তোমরা এরূপ কর তবে তোমরাও গযবে পতিত ও শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে। অতএব প্রথমে সংবাদ পরম্পরার মাধ্যমে ঘটনাবলী শোনা, অতঃপর আমার বর্ণনা, অতঃপর দৃষ্টান্ত, অতঃপর হুঁশিয়ার করা---এত সব কারণের উপস্থিতিতে তোমরা কিরূপে কিয়ামত অস্বীকার করলে ?) এবং (আমি পূর্ববর্তী যেসব লোককে কুফরী ও অস্বীকারের কারণে শাস্তি দিয়েছি,) তারা (সত্যধর্ম বিলোপ করার কাজে) নিজেদের সাধ্যানুযায়ী বড় বড় কূটকৌশল অবলম্বন করেছিল এবং তাদের (এসব) কূটকৌশল আল্লাহ্র সামনে ছিল। (তাঁর জ্ঞানের পরিধির বাইরে ছিল না---থাকতে পারত না।) এবং বাস্তবিকই তাদের কূটকৌশল এমন ছিল যে, তদ্দ্বারা পাহাড়ও (স্বস্থান থেকে) হটে যায়। (কিন্তু এতদসত্ত্বেও সত্যের জয় হয়েছে এবং তাদের সব কূটকৌশল ব্যর্থ হয়েছে। তারা নিপাত হয়েছে। এ থেকেও জানা গেল যে, পয়গম্বর যা বলেন তাই সত্য এবং তা অস্বীকার করা আযাব ও গযবের কারণ। যখন কিয়ামতে তাদের পর্যুদস্ত হওয়া জানা গেল,) অতএব (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) আল্লাহ্ তা'আলাকে পয়গম্বরগণের সাথে ওয়াদা ভঙ্গকারী মনে করো না। (সেমতে কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি দেওয়ার যে ওয়াদা ছিল তা পূর্ণ হবে ; যেমন উপরে বলা হয়েছে) নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যন্ত পরাক্রমশালী, (এবং) প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (প্রতিশোধ গ্রহণে তাঁকে কেউ বিরত করতে পারে না। সুতরাং শক্তিও অপার, এরপর ইচ্ছার সম্পর্ক উপরে জানা গেল। এমতাবস্থায় ওয়াদা ভঙ্গ করার আশংকা কোথায় ? এ প্রতিশোধ ঐ দিন নেবেন,) যেদিন পৃথিবী পরিবর্তিত হবে এই পৃথিবী ছাড়া এবং আকাশও (পরিবর্তিত হয়ে অন্য আকাশ হবে এসব আকাশ ছাড়া। কেননা, প্রথমবার শিঙ্গা ফুঁকার কারণে সব ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডল ভেঙ্গেচুরে খান খান হয়ে যাবে। এরপর পুনর্বার নতুনভাবে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃজিত হবে) এবং সবাই এক (ও) পরাক্রমশীল আল্লাহ্র সামনে পেশ হবে। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। এই দিন প্রতিশোধ নেওয়া হবে।) এবং (ঐদিন হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) তুমি অপরাধীদেরকে

(অর্থাৎ কাফিরদেরকে) শৃঙ্খলাবদ্ধ দেখবে (এবং) তাদের জামা কাতেরানের হবে। (অর্থাৎ সারা দেহে কাতেরান জড়ানো থাকবে, যাতে দ্রুত আগুন লাগে। 'কাতেরান' এক প্রকার বৃক্ষ নিসৃত তৈল, মতান্তরে আলকাতরা বা গন্ধক।) এবং আগুন তাদের মুখমণ্ডলকে (ও) আবৃত করবে; (এসব এজন্য হবে) যাতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক (অপরাধী) ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের শাস্তি দেন। (এরূপ অপরাধী অগণিত হবে, কিন্তু) নিশ্চয় আল্লাহ্ (-র জন্য তাদের হিসাব-কিতাব নেওয়া মোটেই কঠিন নয়; কেননা তিনি) দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সবার বিচার আরম্ভ করে তৎক্ষণাৎ শেষ করে দেবেন।) এটা (কোরআন) মানুষের জন্য বিধি-বিধানের সংবাদনামা (যাতে প্রচারক অর্থাৎ রসূলকে স্বীকার করে) এবং যাতে এর সাহায্যে (শাস্তির) ভয় প্রদর্শন করা হয় এবং যাতে বিশ্বাস করে যে, তিনিই এক উপাস্য এবং যাতে বুদ্ধিমানরা উপদেশ গ্রহণ করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ইবরাহীমে পয়গম্বর ও তাঁদের সম্প্রদায়ের কিছু কিছু অবস্থার বিবরণ, আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধাচরণকারীদের অশুভ পরিণাম এবং সবশেষে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আলোচনা ছিল। তিনি বায়তুল্লাহ্ পুনর্নির্মাণ করেন, তাঁর সন্তানদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা মুকাররমায় জনবসতি স্থাপন করেন এবং এর অধিবাসীদের সর্বপ্রকার সুখ, শান্তি ও অসাধারণ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দান করেন। তাঁরই সন্তান-সন্ততি বনী-ইসরাইল পবিত্র কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সর্ব প্রথম সম্বোধিত সম্প্রদায়।

সূরা ইবরাহীমের আলোচ্য এ সর্বশেষ রুকূতে সার-সংক্ষেপ হিসেবে মক্কাবাসী-দেরকেই পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের ইতিবৃত্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং এখনও চৈতন্যোদয় না হওয়ার অবস্থায় কিয়ামতের ভয়াবহ শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও প্রত্যেক উৎপীড়িত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এবং জালিমকে কঠোর আযাবের সতর্কবাণী শোনানো হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা অবকাশ দিয়েছেন দেখে জালিম ও অপরাধীদের নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয় এবং এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, তাদের অপরাধ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞাত নন; বরং তারা যা কিছু করছে, সব আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে আছে। কিন্তু তিনি দয়া ও রহস্যের তাগিদে অবকাশ দিচ্ছেন।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا —অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তোমরা আল্লাহ্কে গাফিল মনে করো না। এখানে বাহ্যত প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাকে তার গাফলতি এবং শয়তান এ ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। পক্ষান্তরে যদি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হয়, তবে এর উদ্দেশ্য উম্মতের গাফিলদেরকে শোনানো এবং হুঁশিয়ার করা। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পক্ষ থেকে এরূপ সম্ভাবনাই নেই যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে বেখবর অথবা গাফিল মনে করতে পারেন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, জালিমদের উপর তাৎক্ষণিক আযাব না আসা তাদের জন্য তেমন শুভ নয়। কারণ, এর পরিণতি এই যে, তারা হঠাৎ কিয়ামত ও পরকালের আযাবে ধৃত হয়ে যাবে। অতঃপর সূরার শেষ পর্যন্ত পরকালের আযাবের বিবরণ এবং ভয়াবহ দৃশ্যাবলী উল্লেখ করা হয়েছে।

لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ —অর্থাৎ সেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হয়ে থাকবে। مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُؤُوْسِهِمْ —অর্থাৎ ভয় ও বিস্ময়ের কারণে মস্তক উপরে তুলে প্রাণপণ দৌড়াতে থাকবে। لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ —অর্থাৎ অপলক নেত্রে চেয়ে থাকবে وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ —তাদের অন্তর শূন্য ও ব্যাকুল হবে।

এসব অবস্থা বর্ণনা করার পর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার জাতিকে ঐ দিনের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন জালিম ও অপরাধীরা অপারক হয়ে বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে আরও কিছু সময় দিন। অর্থাৎ দুনিয়াতে কয়েক দিনের জন্য পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার দাওয়াত কবূল করতে পারি এবং আপনার প্রেরিত পয়গম্বরগণের অনুসরণ করে এ আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের আবেদনের জওয়াবে বলা হবে ঃ এখন তোমরা একথা বলছ কেন? তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেয়ে বলনি যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও শান-শওকতের পতন হবে না এবং তোমরা সর্বদাই দুনিয়াতে এমনিভাবে বিলাস-ব্যসনে মত্ত থাকবে? তোমরা পুনর্জীবন ও পরজগত অস্বীকার করেছিলে।

وَسَكَنْتُمْ فِيْ مَسَاكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ۝

এতে বাহ্যত আরবের মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাদেরকে ভয় প্রদর্শন করার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে وَاَنْذِرِ النَّاسَ বলে আদেশ দেওয়া হয়। এতে তাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, অতীত জাতিসমূহের অবস্থা ও উত্থান-পতন তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপদেশদাতা। আশ্চর্যের বিষয়, তোমরা এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর না। অথচ তোমরা এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির আবাসস্থলেই বসবাস ও চলাফেরা কর। কিন্তু

অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং কিছু সংবাদ পরম্পরার মাধ্যমে তোমরা একথাও জান যে, আল্লাহ্ তা'আলা অবাধ্যতার কারণে ওদেরকে কিরূপ কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। এছাড়া আমিও ওদেরকে সৎপথে আনার জন্য অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। কিন্তু এরপরও তোমাদের চৈতন্যোদয় হল না।

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ

لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ---অর্থাৎ তারা সত্যধর্মকে বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে

এবং সত্যের দাওয়াত কবুলকারী মুসলমানদের নিপীড়নের উদ্দেশ্য সাধ্যমত কূটকৌশল করেছে। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাদের সব গুপ্ত ও প্রকাশ্য কূটকৌশল বিদ্যমান রয়েছে। তিনি এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং এগুলোকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম। যদিও তাদের কূটকৌশল এমন মারাত্মক ও গুরুতর ছিল যে, এর মুকাবিলায় পাহাড়ও স্বস্থান থেকে অপসৃত হবে; কিন্তু আল্লাহ্র অপার শক্তির সামনে এসব কূটকৌশল তুচ্ছ ও ব্যর্থ হয়ে গেছে।

আয়াতে বর্ণিত শত্রুতামূলক কূটকৌশলের অর্থ অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের কূটকৌশলও হতে পারে। উদাহরণত নমরূদ, ফেরাউন, কওমে-আদ, কওমে-সামূদ ইত্যাদি। এটাও সম্ভব যে, এতে আরবের বর্তমান মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুকাবিলায় অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত ও কূটকৌশল করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সব ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

অধিকাংশ তফসীরবিদ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ বাক্যের إِنْ শব্দটি নেতিবাচক অব্যয় সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন যে, তারা যদিও অনেক কূটকৌশল ও চালবাজি করেছে; কিন্তু তাতে পাহাড়ের স্বস্থান থেকে হটে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। 'পাহাড়' বলে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সুদৃঢ় মনোবলকে বুঝানো হয়েছে। কাফিরদের কোন চালবাজি এ মনোবলকে বিন্দুমাত্রও টলাতে পারেনি।

এরপর উম্মতকে শোনানোর জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অথবা প্রত্যেক সম্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে : فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ

رُسُلَهُ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ---অর্থাৎ কেউ যেন এরূপ মনে না করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা রসূলগণের সাথে বিজয় ও সাফল্যের যে ওয়াদা করেছেন, তিনি তার খিলাফ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা মহাপরাক্রান্ত এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তিনি পয়গম্বরগণের শত্রুদের কাছ থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং ওয়াদা পূর্ণ করবেন।

অতঃপর আবার কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা ও ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ---অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে বর্তমান পৃথিবী পাল্টে দেওয়া হবে এবং আকাশও। সবাই এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সামনে হাজির হবে।

পৃথিবী ও আকাশ পাল্টে দেওয়ার এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তাদের আকার ও আকৃতি পাল্টে দেওয়া হবে, যেমন কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে আছে যে, সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেওয়া হবে। এতে কোন গৃহের ও বৃক্ষের আড়াল থাকবে না এবং পাহাড়, টিলা, গর্ত গভীরতা কিছুই থাকবে না। এ অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআনে বলা হয়েছে ঃ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا --অর্থাৎ গৃহ ও পাহাড়ের কারণে বর্তমানে রাস্তা ও সড়ক বাঁক ঘুরে ঘুরে চলেছে। কোথাও উচ্চতা এবং কোথাও গভীরতা দেখা যায়। কিয়ামতের দিন এগুলো থাকবে না; বরং সব পরিষ্কার ময়দান হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, সম্পূর্ণত এই পৃথিবীর পরিবর্তে অন্য পৃথিবী এবং এই আকাশের পরিবর্তে অন্য আকাশ সৃষ্টি করা হবে। এ সম্পর্কে বর্ণিত কিছুসংখ্যক হাদীস দ্বারা গুণগত পরিবর্তনের কথা এবং কিছুসংখ্যক হাদীস দ্বারা সত্তাগত পরিবর্তনের কথা জানা যায়।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, হাশরের পৃথিবী হবে সম্পূর্ণ এক নতুন পৃথিবী। তার রং হবে রৌপ্যের মত সাদা। এর উপর কোন গোনাহ্ বা অন্যায় খুনের দাগ থাকবে না। মসনদে-আহমদে ও তফসীরে ইবনে জরীরে উল্লিখিত হাদীসে এই বিষয়বস্তুটিই হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। ---(মাযহারী)

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত সহল ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-বলেন ঃ কিয়ামতের দিন ময়দার রুটির মত পরিষ্কার ও সাদা পৃথিবীর বুকে মানব-জাতিকে পুনরুত্থিত করা হবে। এতে কোন বস্তুর চিহ্ন (গৃহ, উদ্যান, বৃক্ষ, পাহাড়, টিলা ইত্যাদি) থাকবে না। বায়হাকী এই আয়াতের তফসীরে এ তথ্যটি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাকেম নির্ভরযোগ্য সনদসহ হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, চামড়ার কুঞ্চন দূর করার জন্য চামড়াকে যেভাবে টান দেওয়া হয়, কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে সেইভাবে টান দেওয়া হবে। ফলে পৃথিবীর গর্ত, পাহাড় সব সমান হয়ে একটি সটান সমতল ভূমি হয়ে যাবে। তখন সব আদম সন্তান এই পৃথিবীতে জমায়েত

হবে। ভীড় এত হবে যে, একজনের অংশে তাঁর দাঁড়ানোর জায়গাটুকুই পড়বে। এরপর সর্বপ্রথম আমাকে ডাকা হবে। আমি পালনকর্তার সামনে সিজদায় নত হব। অতঃপর আমাকে সুপারিশের অনুমতি প্রদান করা হবে। আমি সবার জন্য সুপারিশ করব যেন তাদের হিসাব-কিতাব দ্রুত নিষ্পন্ন হয়।

শেষোক্ত রেওয়ায়েত থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, পৃথিবীর শুধু গুণগত পরিবর্তন হবে এবং গর্ত, পাহাড়, দালান-কোঠা, বৃক্ষ ইত্যাদি থাকবে না, কিন্তু সত্তা অবশিষ্ট থাকবে। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে জানা গিয়েছিল যে, হাশরের পৃথিবী বর্তমান স্থলে অন্য কোন পৃথিবী হবে। আয়াতে এই সত্তার পরিবর্তনই বোঝানো হয়েছে।

বয়ানুল-কোরআন গ্রন্থে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ) বলেন: এতদুভয়ের মধ্যে কোনরূপ পরস্পরবিরোধিতা নাই। এটা সম্ভব যে, প্রথমে শিঙ্গা ফুঁকার পর পৃথিবীর শুধু গুণগত পরিবর্তন হবে এবং হিসাব-কিতাবের জন্য মানুষকে অন্য পৃথিবীতে স্থানান্তরিত করা হবে।

তফসীর মাযহারীতে মসনদ আবদ ইবনে হুমায়দ থেকে হযরত ইকরামার উক্তি বর্ণিত আছে, যদ্দ্বারা উপরোক্ত বক্তব্য সমর্থিত হয়। উক্তিটি এই: এ পৃথিবী কুঁচকে যাবে এবং এর পার্শ্বে অন্য একটি পৃথিবীতে মানবমণ্ডলীকে হিসাব-কিতাবের জন্য দাঁড় করানো হবে।

মুসলিম শরীফে হযরত সওবানের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট এক ইহুদী এসে প্রশ্ন করল: যেদিন পৃথিবী পরিবর্তন করা হবে, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন: পুলসিরাতের নিকটে একটি অন্ধকারে থাকবে।

এ থেকেও জানা যায় যে, বর্তমান পৃথিবী থেকে পুলসিরাতের মাধ্যমে মানুষকে অন্যদিকে স্থানান্তর করা হবে। ইবনে জারীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এমর্মে একাধিক সাহাবী ও তাবেয়ীর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তখন বর্তমান পৃথিবী ও তার নদ-নদী অগ্নিতে পরিণত হবে। বিশ্বের বর্তমান এলাকাটি যেন তখন জাহান্নামের এলাকা হয়ে যাবে। বাস্তব অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। এ ছাড়া বান্দার উপায় নাই যে,

زہاں تازہ کردن با قرار تو
نینگیختی علت از کار تو

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, অপরাধীদেরকে একটি শিকলে বেঁধে দেওয়া হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক অপরাধের অপরাধীদেরকে পৃথক পৃথকভাবে একত্র করে এক সাথে বেঁধে দেওয়া হবে এবং তাদের পরিধেয় পোশাক হবে আলকাতরার। এটি একটি দ্রুত অগ্নিগ্রাহী পদার্থ।

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে: কিয়ামতের এসব অবস্থা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে হুঁশিয়ার করা, যাতে তারা এখনও বুঝে নেয় যে, উপাসনার যোগ্য সত্তা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা এবং যাতে সামান্য বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও শিরক থেকে বিরত হয়।

سورة حجر

সূরা হিজর

মক্কায় অবতীর্ণ ॥ আয়াত ঃ ৯৯ ॥ রুকূ ঃ ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الۤرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۝ ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝ وَمَاۤ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ۝ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ۝

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আলিফ-লাম-রা ; এগুলো কিতাব ও সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত। (২) কোন সময় কাফিররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, কি চমৎকার হত, যদি তারা মুসলমান হত! (৩) আপনি ছেড়ে দিন তাদেরকে, খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপৃত থাকুক। অতি সত্বর তারা জেনে নেবে। (৪) আমি কোন জনপদ ধ্বংস করিনি ; কিন্তু তার নির্দিষ্ট সময় লিখিত ছিল। (৫) কোন সম্প্রদায় তার নির্দিষ্ট সময়ের অগ্রে যায় না এবং পশ্চাতে থাকে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলিফ-লাম-রা (-এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।) এগুলো পরিপূর্ণ গ্রন্থ ও সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত (অর্থাৎ এর দুই-ই গুণ রয়েছে---পরিপূর্ণ গ্রন্থ হওয়াও এবং সুস্পষ্ট কোরআন হওয়াও। এ বাক্য দ্বারা কোরআন যে সত্য কালাম, তা প্রকাশ করার পর তাদের আক্ষেপ ও আযাব বর্ণিত হয়েছে, যারা কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না অথবা এর নির্দেশাবলী পালন করে না। বলা হয়েছে رُبَمَا يَوَدُّ অর্থাৎ কিয়ামতের ময়দানে যখন নানা রকম আযাবে পতিত হবে, তখন) কাফিররা বারবার

আকাঙ্ক্ষা করবে যে, কি চমৎকার হত, যদি তারা (দুনিয়াতে) মুসলমান হত! (বারবার এজন্য যে, যখনই কোন নতুন বিপদ দেখবে, তখনই মুসলমান না হওয়ার আক্ষেপ নতুন হতে থাকবে।) আপনি (দুনিয়াতে তাদের কুফরীর কারণে দুঃখ করবেন না এবং) তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন---তারা খুব খেয়ে নিক, ভোগ করে নিক এবং কল্পিত আশা তাদেরকে গাফিল করে রাখুক। তারা অতি সত্বর (মৃত্যুর সাথে সাথেই) প্রকৃত সত্য জেনে নিবে। (দুনিয়াতে তারা যে কুফর ও কুকর্মের তাৎক্ষণিক শাস্তি পায় না, এর কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শাস্তির সময় নির্ধারিত করে রেখেছেন। সে সময় এখনও আসেনি।) এবং আমি যতগুলো জনপদ (কুফরীর কারণে) ধ্বংস করেছি, তাদের সবার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় লিখিত থাকত এবং (আমার নীতি এই যে,) কোন উম্মত তার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ধ্বংস হয়নি এবং পেছনে থাকেনি। (বরং নির্দিষ্ট সময় ধ্বংস হয়েছে। এমনিভাবে তাদের সময় যখন এসে যাবে, তাদেরকেও শাস্তি দেওয়া হবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا—থেকে জানা গেল যে, পানাহারকে লক্ষ্য ও আসল বৃত্তি সাব্যস্ত করে নেওয়া এবং সাংসারিক বিলাস-ব্যসনের উপকরণ সংগ্রহে মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়নে মেতে থাকা কাফিরদের দ্বারাই হতে পারে, যারা পরকাল ও তার হিসাব-কিতাবে এবং পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাস করে না। মু'মিনও পানাহার করে, জীবিকার প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা করে এবং ভবিষ্যৎ কাজ-কারবারের পরিকল্পনাও তৈরী করে; কিন্তু মৃত্যু ও পরকালকে ভুলে এ কাজ করে না। তাই প্রত্যেক কাজে হালাল ও হারামের চিন্তা করে এবং অনর্থক পরিকল্পনা প্রণয়নকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে না। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: চারটি বস্তু দুর্ভাগ্যের লক্ষণ: চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহিত না হওয়া (অর্থাৎ গোনাহ্র কারণে অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন না করা), কঠোর প্রাণ হওয়া, দীর্ঘ আশা পোষণ করা এবং সংসারের প্রতি আসক্ত হওয়া।---(কুরতুবী)

দীর্ঘ আশা পোষণ করার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত ও লোভে মগ্ন এবং মৃত্যু ও পরকাল থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনায় মত্ত হওয়া। --(কুরতুবী) ধর্মীয় উদ্দেশ্যের জন্য অথবা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ স্বার্থের জন্য যেসব পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, এগুলোও পরকাল চিন্তারই একটি অংশ।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: এ উম্মতের প্রথম স্তরের মুক্তি পূর্ণ ঈমান ও সংসার নির্লিপ্ততার কারণে হবে এবং সর্বশেষ স্তরের লোক কার্পণ্য ও দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা পোষণের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

হযরত আবুদ্দারদা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একবার দামেশকের জামে মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন: দামেশকবাসিগণ! তোমরা কি একজন সহানুভূতিশীল হিতাকাঙ্ক্ষী ভাইয়ের কথা শুনবে? শুনে নাও, তোমাদের পূর্বে অনেক বিশিষ্ট লোক অতিক্রান্ত হয়েছে। তারা প্রচুর ধন-সম্পদ একত্র করেছিল। সুউচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণ করেছিল

এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তৈরী করেছিল। আজ তারা সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাদের গৃহগুলোই তাদের কবর হয়েছে এবং তাদের দীর্ঘ আশা ধোঁকা ও প্রতারণায় পর্যবসিত হয়েছে। আদি জাতি তোমাদের নিকটেই ছিল। তারা ধন, জন, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্নাদি দ্বারা দেশকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। আজ এমন কেউ আছে কি, যে তাদের উত্তরাধিকার আমার কাছ থেকে দু'দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে সম্মত হয়?

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার জাল তৈরী করে, তার আমল অবশ্যই খারাপ হয়ে যায়।—(কুরতুবী)

وَقَالُوا يَاأَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝ لَوْمَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ۝

(৬) তারা বলল ঃ হে ঐ ব্যক্তি, যার প্রতি কোরআন নাযিল হয়েছে, আপনি তো একজন উন্মাদ। (৭) যদি আপনি সত্যবাদী হন, তবে আমাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে আনেন না কেন? (৮) আমি ফেরেশতাদেরকে একমাত্র ফয়সালার জন্যই নাযিল করি। তখন তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(إِلَّا بِالْحَقِّ — حق বলে আযাবের ফয়সালা বুঝানো হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদের মতে কোরআন অথবা রিসালাত বুঝানো হয়েছে। বয়ানুল কোরআনে প্রথম অর্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এ অর্থটি হযরত হাসান বসরী থেকে বর্ণিত আছে। আয়াতের তফসীর এই ঃ)

এবং (মক্কার) কাফিররা (রসূলুল্লাহ্ [সা]-কে) বলল ঃ হে ঐ ব্যক্তি, যার উপর (তার দাবী অনুযায়ী) কোরআন নাযিল করা হয়েছে, আপনি (নাউযুবিল্লাহ্) একজন উন্মাদ (এবং নবুয়তের মিথ্যা দাবী করেন। নতুবা) যদি আপনি (এ দাবীতে সত্যবাদী হন, তবে আমাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে আনেন না কেন? (যারা আমাদের সামনে আপনার সত্যতার সাক্ষ্য দেবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন, لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا — আল্লাহ্ তা'আলা উত্তর দেন ঃ) আমি ফেরেশতাদেরকে

(যেভাবে তারা চায়,) একমাত্র ফয়সালার জন্যই নাযিল করি এবং (যদি এমন হত) তখন তাদেরকে সময়ও দেওয়া হত না। বরং যখন তাদের আগমনের পরও বিশ্বাস স্থাপন করত না, যেমন তাদের অবস্থাদৃষ্টে এটা নিশ্চিত, তখন তাৎক্ষণিকভাবে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হত, যেমন সূরা আন'আমের প্রথম রুকূর শেষ আয়াতগুলোতে এর কারণ বর্ণিত হয়েছে।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

(৯) আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি কোরআন অবতারণ করেছি এবং (এটা প্রমাণহীন দাবী নয়, বরং এর অলৌকিকত্ব এর প্রমাণ। কোরআনের একটি অলৌকিকত্বের বর্ণনা অন্যান্য সূরায় দেওয়া হয়েছে যে, কোন মানুষ এর একটি সূরার অনুরূপ রচনা করতে পারে না। দ্বিতীয় অলৌকিকত্ব এই যে,) আমি এর (কোরআনের) সংরক্ষক (ও পরিদর্শক। এতে কেউ বেশ-কম করতে পারে না, যেমন অন্যান্য গ্রন্থে করা হয়েছে। এটা এমন একটি সুস্পষ্ট মু'জিযা যা সাধারণ ও বিশেষ নির্বিশেষে সবাই বুঝতে পারে। মু'জিযা এই যে, কোরআনের বিশুদ্ধতা, ভাষালংকার ও সর্বব্যাপকতার মুকাবিলা কেউ করতে পারে না। এ মু'জিযাটি একমাত্র জ্ঞানী ও বিদ্বান্‌রাই বুঝতে পারে। কিন্তু কমবেশী না হওয়ার ব্যাপারটিকে তো একজন অশিক্ষিত মূর্খও দেখতে পারে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মামুনের দরবারের একটি ঘটনা ঃ ইমাম কুরতুবী এ স্থলে মুত্তাসিল সনদ দ্বারা খলীফা মামুনুর রশীদের দরবারের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মামুনের দরবারে মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হত। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পণ্ডিত ব্যক্তিগণের জন্য অংশগ্রহণের অনুমতি ছিল। এমনি এক আলোচনা সভায় জনৈক ইহুদী পণ্ডিত আগমন করল। সে আকার-আকৃতি, পোশাক ইত্যাদির দিক দিয়েও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে হচ্ছিল। তদুপরি তার আলোচনাও ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল, অলংকারপূর্ণ এবং বিজ্ঞসুলভ। সভাশেষে মামুন তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি ইহুদী? সে স্বীকার করল। মামুন পরীক্ষার্থে তাকে বললেন ঃ আপনি যদি মুসলমান হয়ে যান, তবে আপনার সাথে চমৎকার ব্যবহার করব।

সে উত্তরে বলল ঃ আমি পৈতৃক ধর্ম বিসর্জন দিতে পারি না। কথাবার্তা এখানেই শেষ হয়ে গেল। লোকটি চলে গেল। কিন্তু এক বছর পর সে মুসলমান হয়ে আবার দরবারে আগমন করল এবং আলোচনা সভায় ইসলামী ফেকা সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা ও যুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থাপন করল। সভাশেষে মামুন তাকে ডেকে বললেন ঃ আপনি

কি ঐ ব্যক্তিই, যে বিগত বছর এসেছিল? সে বলল ঃ হ্যাঁ, আমি ঐ ব্যক্তিই। মামুন জিজ্ঞেস করলেন ঃ তখন তো আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃত ছিলেন। এরপর এখন মুসলমান হওয়ার কি কারণ ঘটল?

সে বলল ঃ এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর আমি বর্তমান কালের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করার ইচ্ছা করি। আমি একজন হস্তলেখাবিশারদ। স্বহস্তে গ্রন্থাদি লিখে উঁচু দামে বিক্রয় করি। আমি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তওরাতের তিনটি কপি লিপিবদ্ধ করলাম। এগুলোতে অনেক জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে বেশকম করে লিখলাম। কপিগুলো নিয়ে আমি ইহুদীদের উপাসনালয়ে উপস্থিত হলাম। ইহুদীরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে কপিগুলো কিনে নিল। অতঃপর এমনিভাবে ইঞ্জিলের তিন কপি কম-বেশ করে লিখে খৃস্টানদের উপাসনালয়ে নিয়ে গেলাম। সেখানেও খৃস্টানরা খুব খাতির-যত্ন করে কপিগুলো আমার কাছ থেকে কিনে নিল। এরপর কোরআনের বেলায় আমি তাই করলাম। এরও তিনটি কপি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করলাম। এবং নিজের পক্ষ থেকে কম-বেশ করে দিলাম। এগুলো নিয়ে যখন বিক্রয়ার্থে বের হলাম, তখন যেই দেখল, সেই প্রথমে আমার লেখা কপিটি নির্ভুল কিনা, যাচাই করে দেখল। অতঃপর বেশকম দেখে কপিগুলো ফেরত দিয়ে দিল।

এ ঘটনা দেখে আমি এ শিক্ষাই গ্রহণ করলাম যে, গ্রন্থটি হুবহু সংরক্ষিত আছে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজেই এর সংরক্ষণ করছেন। এরপর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। এ ঘটনার বর্ণনাকারী কাযী ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আক্তাম বলেন ঃ ঘটনাক্রমে সে বছরই আমার হজ্জব্রত পালন করার সৌভাগ্য হয়। সেখানে প্রখ্যাত আলিম সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়নার সাথে সাক্ষাৎ হলে ঘটনাটি তাঁর কাছে ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন ঃ নিঃসন্দেহে এরূপ হওয়াই বিধেয়। কারণ, কোরআন পাকে এ সত্যের সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আক্তাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোরআনের কোন আয়াতে আছে ঃ সুফিয়ান বললেন ঃ কোরআনে পাক যেখানে তওরাত ও ইঞ্জিলের আলোচনা করেছে, সেখানে বলেছে ঃ

بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ — ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে আল্লাহ্‌র গ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জিলের হিফাযতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই যখন ইহুদী ও খৃস্টানরা হিফাযতের কর্তব্য পালন করেননি, তখন এ গ্রন্থদ্বয় বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কোরআন পাক সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ অর্থাৎ আমিই এর সংরক্ষক। আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং এর হিফাযত করার কারণে শত্রুরা হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও এর একটি নুক্তা এবং যের ও জবরে পার্থক্য আনতে পারেনি। রিসালতের আমলের পর আজ চৌদ্দ'শ বছর অতীত হয়ে গেছে। ধর্মীয় ও ইসলামী ব্যাপারাদিতে মুসলমানদের ত্রুটি ও অমনোযোগিতা সত্ত্বেও কোরআন পাক

মুখস্থ করার ধারা বিশ্বের পূর্বে ও পশ্চিমে পূর্ববৎ অব্যাহত রয়েছে। প্রতি যুগেই লাখে লাখে বরং কোটি কোটি মুসলমান যুবক-বৃদ্ধ এবং বালক ও বালিকা এমন বিদ্যমান থাকে, যাদের বক্ষ-পাঁজরে আগাগোড়া কোরআন সংরক্ষিত রয়েছে। কোন বড় থেকে বড় আলিমেরও সাধ্য নেই যে, এক অক্ষর ভুল পাঠ করে। তৎক্ষণাৎ বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে অনেক লোক তার ভুল ধরে ফেলবে।

হাদীস সংরক্ষণ ও কোরআন সংরক্ষণের ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত : বিদ্বান মাত্রেই এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন শুধু কোরআনী শব্দাবলীর নাম নয় এবং শুধু অর্থসম্ভারও কোরআন নয়; বরং শব্দাবলী ও অর্থসম্ভার উভয়ের সমষ্টিকে কোরআন বলা হয়। কারণ এই যে, কোরআনের অর্থসম্ভার এবং বিষয়বস্তু তো অন্যান্য গ্রন্থেও বিদ্যমান আছে। বলতে কি, ইসলামী গ্রন্থাবলীতে সাধারণত কোরআনী বিষয়বস্তুই থাকে। তাই বলে এগুলোকে কোরআন বলা হয় না। কেননা, এগুলোতে কোরআনের শব্দাবলী থাকে না। এমনিভাবে যদি কেউ কোরআনের বিচ্ছিন্ন শব্দ ও বাক্যাবলী নিয়ে একটি রচনা অথবা পুস্তিকা লিখে দেয়, তবে একেও কোরআন বলা হবে না; যদি এতে একটি শব্দও কোরআনের বাইরের না থাকে। এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন শুধুমাত্র ঐ আল্লাহর মসহাফ তথা গ্রন্থকেই বলা হয়, যার শব্দাবলী ও অর্থ সম্ভার একসাথে সংরক্ষিত রয়েছে।

এ থেকে এ মাস'আলাটিও জানা গেল যে, উর্দু, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় কোরআনের শুধু অনুবাদ প্রকাশ করে তাকে উর্দু অথবা ইংরেজি কোরআন নাম দেওয়ার যে প্রবণতা প্রচলিত রয়েছে, এটা কিছুতেই জায়েয নয়। কেননা এটা কোরআন নয়। যখন প্রমাণ হয়ে গেল যে, কোরআন শুধু শব্দাবলীর নাম নয় বরং অর্থসম্ভারও এর একটি অংশ, তখন আলোচ্য আয়াতে কোরআন সংরক্ষণের অনুরূপ অর্থসম্ভার সংরক্ষণ তথা কোরআনকে যাবতীয় অর্থগত পরিবর্তন থেকে সংরক্ষিত রাখার দায়িত্বও আল্লাহ্ তা'আলাই গ্রহণ করেছেন।

বলা বাহুল্য, কোরআনের অর্থসম্ভার তা-ই, যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রেরিত হয়েছেন। কোরআনে বলা হয়েছে : لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ অর্থাৎ আপনাকে এজন্য প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে আপনি লোকদেরকে ঐ কালামের মর্ম বলে দেন, যা তাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থও তাই : يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ। একারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে বলেছেন : إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا। অর্থাৎ আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি। রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যখন কোরআনের অর্থ বর্ণনা করা ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, তখন তিনি উম্মতকে যেসব উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন, সেসব উক্তি ও কর্মের নামই হাদীস।

যে ব্যক্তি রসূলের হাদীসকে ভালভাবে অরক্ষিত বলে, প্রকৃতপক্ষে সে কোরআনকেই অরক্ষিত বলে : আজকাল কিছুসংখ্যক লোক সাধারণ মানুষের মধ্যে এধরনের একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সচেষ্ট যে, নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদিতে বিদ্যমান হাদীসের বিরাট ভাণ্ডার গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এগুলো রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সময়কালের অনেক পরে সংগৃহীত ও সংকলিত হয়েছে।

প্রথমত তাদের এরূপ বলাও শুদ্ধ নয়। কেননা হাদীসের সংরক্ষণ ও সংকলন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলদারীতেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে তা পূর্ণতা লাভ করেছে মাত্র। এছাড়া হাদীস প্রকৃতপক্ষে কোরআনের তফসীর ও যথার্থ মর্ম। এর সংরক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। এমতাবস্থায় এটা কেমন করে সম্ভব যে, কোরআনের শুধু শব্দাবলী সংরক্ষিত থাকবে আর অর্থসম্ভার (অর্থাৎ হাদীস) বিনষ্ট হয়ে যাবে ?

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٠ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١١ كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝١٢ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٣ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ۝١٤ لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ۝١٥

---

(১০) আমি আপনার পূর্বে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে রসূল প্রেরণ করেছি। (১১) ওদের কাছে এমন কোন রসূল আসেন নি, যাদের সাথে ওরা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে থাকেনি। (১২) এমনিভাবে আমি এ ধরনের আচরণ পাপীদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দেই। (১৩) ওরা এর প্রতি বিশ্বাস করবে না। পূর্ববর্তীদের এমন রীতি চলে আসছে। (১৪) যদি আমি ওদের সামনে আকাশের কোন দরজাও খুলে দেই আর তাতে ওরা দিনভর আরোহণও করতে থাকে (১৫) তবুও ওরা একথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টিবিভ্রাট ঘটানো হয়েছে না—বরং আমরা জাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।

শব্দার্থ : شِيَعٌ শব্দটি شِيْعَةٌ--এর বহুবচন। এর অর্থ কারও অনুসারী ও সাহায্যকারী। বিশেষ বিশ্বাস ও মতবাদে ঐকমত্য পোষণকারী সম্প্রদায়কেও شِيْعَةٌ বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি। এখানে الى অব্যয়ের পরিবর্তে فِىْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে,

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের রসূল তাদের মধ্য থেকেই প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে তাঁর ওপর আস্থা রাখা লোকদের পক্ষে সহজ হয় এবং রসূল ও তাদের স্বভাব ও মেজায সম্পর্কে ওয়াকিফ-হাল হয়ে তাদের সংশোধনের যথোপযুক্ত কর্মসূচী প্রণয়ন করতে পারেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে মুহাম্মদ, আপনি তাদের মিথ্যারোপের কারণে দুঃখিত হবেন না। কেননা পয়গম্বরগণের সাথে এরূপ আচরণ চিরকাল থেকেই হয়ে আসছে। সেমতে) আমি আপনার পূর্বেও পয়গম্বরগণকে পূর্ববর্তী লোকদের অনেক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রেরণ করেছিলাম এবং ওদের অবস্থা ছিল এই যে) ওদের কাছে এরূপ কোন রসূল আগমন করেন নি যাঁর সাথে ওরা ঠাট্টাবিদ্রূপ করেনি। (এটা মিথ্যারোপের জঘন্যতম রূপ। সুতরাং তাদের অন্তরে যেমন ঠাট্টাবিদ্রূপ সৃষ্টি হয়েছিল) এমনিভাবে আমি এ ঠাট্টাবিদ্রূপের প্রেরণা এই অপরাধীদের (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের) অন্তরেও সৃষ্টি করে দিয়েছি, (যদ্দরুন) ওরা কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করে না আর এ রীতি (নতুন নয়) পূর্ববর্তীদের থেকেই চলে আসছে (যে, তারা পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করে এসেছে। অতএব আপনি দুঃখিত হবেন না।) এবং (ওদের হঠকারিতা এরূপ যে, আকাশ থেকে ফেরেশতাদের আগমন তো দূরের কথা, এ থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে) যদি (স্বয়ং ওদেরকে আকাশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, এভাবে যে) আমি ওদের জন্য আকাশের কোন দরজা খুলে দেই, অতঃপর ওরা দিনভর (যখন তন্দ্রা ইত্যাদির সম্ভাবনা থাকে না) তা দিয়ে (অর্থাৎ দরজা দিয়ে) আকাশে আরোহণ করে, তবুও বলবে যে, আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানো হয়েছে। (ফলে আমরা নিজেদেরকে আকাশে আরোহণরত দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু বাস্তবে আরোহণ করছি না। পরন্তু দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানোর ব্যাপারে শুধু এ ঘটনার কথাই বলি কেন) বরং আমাদেরকে তো পুরোপুরি জাদু করা হয়েছে। (যদি এর চাইতেও বড় কোন মু'জিযা আমাদেরকে দেখানো হয়, তাও বাস্তবে মু'জিযা হবে না।)

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾

---

(১৬) নিশ্চয় আমি আকাশে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে দর্শকদের জন্য সুশোভিত করে দিয়েছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অবিশ্বাসীদের হঠকারিতা ও বিদ্বেষের উল্লেখ ছিল। আলোচ্য আয়াত ও পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, তওহীদ, জ্ঞান, শক্তির সুস্পষ্ট প্রমাণাদি, নভো-মণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে অবস্থিত সৃষ্ট-বস্তুর চাক্ষুষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এগুলো সম্পর্কে সামান্য চিন্তা করলেও কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষেই অস্বীকার করার উপায় থাকে না। বলা হয়েছে ঃ) নিশ্চয় আকাশে বড় বড়

নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং দর্শকদের জন্য আকাশকে (নক্ষত্রপুঞ্জের দ্বারা) সুশোভিত করে দিয়েছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

بُرُوْجٌ শব্দটি بُرْجٌ এর বহুবচন। এটি বৃহৎ প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। মুজাহিদ, কাতাদাহ্, আবু সালেহ্ প্রমুখ তফসীরবিদ এখানে بُرُوْجٌ এর তফসীরে 'বৃহৎ নক্ষত্র' উল্লেখ করেছেন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আকাশে বৃহৎ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি। এখানে 'আকাশ' বলে আকাশের শূন্য পরিমণ্ডলকে বোঝানো হয়েছে, যাকে সাম্প্রতিক কালের পরিভাষায় মহাশূন্য বলা হয়। আকাশগোলক এবং আকাশের অনেক নিচে অবস্থিত শূন্য পরিমণ্ডল—এই উভয় অর্থে سَمَاءٌ শব্দের প্রয়োগ সুবিদিত। কোরআন পাকে শেষোক্ত অর্থেও স্থানে স্থানে سَمَاءٌ শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রহ ও নক্ষত্রসমূহ যে আকাশের অভ্যন্তরে নয়; বরং শূন্য পরিমণ্ডলে অবস্থিত এর চূড়ান্ত আলোচনা কোরআন পাকের আয়াতের আলোকে এবং প্রাচীন ও আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের আলোকে ইনশাআল্লাহ্ সূরা ফোরকানের আয়াত تَبَارَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا الخ এর তফসীরে করা হবে।

وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿١٧﴾ اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٨﴾

---

(১৭) আমি আকাশকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছি; (১৮) কিন্তু যে চুরি করে শুনে পালায়, তার পশ্চাদ্ধাবন করে উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ড।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি আকাশকে (নক্ষত্রপুঞ্জের সাহায্যে) প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছি (অর্থাৎ তারা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না) কিন্তু যে কেউ (ফেরেশতাদের) কোন কথা চুরি করে শুনে পালায়, তার পশ্চাদ্ধাবন করে একটি জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড। (এবং এর প্রভাবে উল্কাবৃষ্টিতে নিক্ষিপ্ত উল্লিখিত শয়তান ধ্বংস প্রাপ্ত হয় কিংবা দিশেহারা হয়ে যায়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্কাপিণ্ড ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে প্রথমত প্রমাণিত হয় যে, শয়তানরা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। আদম সৃষ্টির সময় ইবলীসের আকাশে অবস্থান এবং আদম ও হাওয়াকে প্রলুব্ধ করা ইত্যাদি আদমের পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বেকার ঘটনা। তখন পর্যন্ত জিন ও শয়তানদের আকাশে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল না। আদমের ও ইবলীসের বহিষ্কারের পর এই প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সূরা জিনের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا

এ থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত শয়তানরা আকাশের সংবাদাদি ফেরেশতাদের পারস্পরিক কথাবার্তা থেকে শুনে নিত। এতদ্বারা এটা জরুরী হয় না যে, শয়তানরা আকাশে প্রবেশ করে সংবাদাদি শুনত। نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ বাক্য থেকেও বোঝা যায় যে, এরা চোরের মত শূন্য পরিমণ্ডলে মেঘের আড়ালে বসে সংবাদ শুনে নিত। এ বাক্য থেকে আরও জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বেও জিন ও শয়তানদের প্রবেশাধিকার আকাশে নিষিদ্ধই ছিল, কিন্তু শূন্য পর্যন্ত পৌঁছে তারা কিছু কিছু সংবাদ শুনে নিত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পর ওহীর হিফাযতের উদ্দেশ্যে আরও অতিরিক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে শয়তানদেরকে এ চুরি থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আকাশের অভ্যন্তরে ফেরেশতাদের কথাবার্তা আকাশের বাইরে থেকে শয়তানরা কিভাবে শুনতে পারত? উত্তর এই যে, এটা অসম্ভব নয়। খুব সম্ভব আকাশগাত্র শব্দ শ্রবণের অসম্ভব প্রতিবন্ধক নয়। এছাড়া এটাও নয় যে, ফেরেশতাগণ কোন সময় আকাশ থেকে নিচে অবতরণ করে পরস্পর কথাবার্তা বলত এবং শয়তানরা তা শুনে পালাত। বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা)-র এক হাদীস থেকে এ কথারই সমর্থন পাওয়া যায় যে, মাঝে মাঝে ফেরেশতারা আকাশের নিচে মেঘমালার স্তর পর্যন্ত অবতরণ করত এবং আকাশের সংবাদাদি পরস্পর আলোচনা করত। শয়তানরা শূন্যে আত্মগোপন করে এসব সংবাদ শুনত। পরে উল্কাপাতের মাধ্যমে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সূরা জিনের أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ আয়াতের তফসীরে ইনশাআল্লাহ্ এর পূর্ণ বিবরণ আসবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের দ্বিতীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে উল্কাপিণ্ড। কোরআন পাকের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ওহীর হিফাযতের উদ্দেশ্যে শয়তানদেরকে মারার জন্য উল্কাপিণ্ডের সৃষ্টি হয়। এর সাহায্যে শয়তানদেরকে বিতাড়িত করে দেওয়া হয়, যাতে তারা ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে না পারে।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, শূন্য পরিমণ্ডলে উল্কার অস্তিত্ব নতুন বিষয় নয়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বেও তারকা খসে পড়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করা হত এবং পরেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় একথা কেমন করে বলা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়তের বৈশিষ্ট্য হিসাবে শয়তানদেরকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যেই উল্কার সৃষ্টি? এতে যে প্রকারান্তরে দার্শনিকদের ধারণাই সমর্থিত হয়। তাঁরা বলেন : সূর্যের খরতাপে যেসব বাষ্প মাটি থেকে উত্থিত হয়, তন্মধ্যে কিছু আগ্নেয় পদার্থও বিদ্যমান থাকে। ওপরে পৌঁছার পর এগুলোতে সূর্যের তাপ অথবা অন্য কোন কারণে অতিরিক্ত উত্তাপ পতিত হলে এগুলো প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে এবং দর্শকরা মনে করে যে, কোন তারকাই বুঝি খসে পড়েছে। এটা আসলে তারকা নয়---উল্কা। সাধারণের পরিভাষায় একে 'তারকা খসে যাওয়া' বলেই ব্যক্ত করা হয়। আরবী ভাষায়ও এর জন্য انقضاض كوكب (তারকা খসে যাওয়া) শব্দ ব্যবহার করা হয়।

উত্তর এই যে, উভয় বক্তব্যের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মাটি থেকে উত্থিত বাষ্প প্রজ্বলিত হওয়া এবং কোন তারকা কিংবা গ্রহ থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার পতিত হওয়া উভয়টিই সম্ভবপর। এমনটা সম্ভবপর যে, সাধারণ রীতি অনুযায়ী এরূপ ঘটনা পূর্ব থেকেই অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বে এসব জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা বিশেষ কোন কাজ নেওয়া হতো না। তাঁর আবির্ভাবের পর যেসব শয়তান চুরি-চামারি করে ফেরেশ-তাদের কথাবার্তা শুনতে যায় ওদেরকে বিতাড়িত করার কাজে এসব জ্বলন্ত অঙ্গার ব্যবহার করা হয়।

আল্লামা আলুসী (র) তাঁর রূহুল মা'আনী গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাই করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, হাদীসবিদ যুহ্‌রীকে কেউ জিজ্ঞেস করল : রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বেও কি তারকা খসত? তিনি বললেন : হ্যাঁ। অতঃপর প্রশ্নকারী সূরা জিনের উল্লিখিত আয়াতটি এ তথ্যের বিপক্ষে পেশ করলে তিনি বললেন : উল্কা আগেও ছিল, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পর যখন শয়তানদের ওপর কঠোরতা আরোপ করা হল, তখন থেকে উল্কা ওদেরকে বিতাড়নের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

সহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে আকাশে তারকা খসে পড়ল। তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন : জাহেলিয়াহ যুগে অর্থাৎ ইসলাম পূর্বকালে তোমরা তারকা খসে যাওয়াকে কি মনে করতে? তাঁরা বললেন : আমরা মনে করতাম যে, বিশ্বে কোন ধরনের অঘটন ঘটবে অথবা কোন মহান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ কিংবা জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি বললেন : এটা অর্থহীন ধারণা। কারও জন্মমৃত্যুর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এসব জ্বলন্ত অঙ্গার শয়তানদেরকে বিতাড়নের জন্য নিক্ষেপ করা হয়।

মোটকথা, উল্কা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বক্তব্যও কোরআনের পরিপন্থী নয়। পক্ষান্তরে এটাও অসম্ভব নয় যে, এসব জ্বলন্ত অঙ্গার সরাসরি কোন তারকা থেকে খসে নিক্ষিপ্ত হয়। উভয় অবস্থাতে কোরআনের উদ্দেশ্য প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট।

সূচী-পত্র

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢١﴾ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

(১৯) আমি ভূপৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার ওপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। (২০) আমি তোমাদের জন্য তাতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি এবং তাদের জন্যও যাদের অন্নদাতা তোমরা নও। (২১) আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা অবতারণ করি। (২২) আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর তোমাদেরকে তা পান করাই। বস্তুত তোমাদের কাছে এর ভাণ্ডার নেই। (২৩) আমিই জীবনদান করি, মৃত্যুদান করি এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। (২৪) আমি জেনে রেখেছি তোমাদের অগ্রগামীদেরকে এবং আমি জেনে রেখেছি পশ্চাৎগামীদেরকে। (২৫) আপনার পালনকর্তাই তাদেরকে একত্র করে আনবেন। নিশ্চয় প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তাতে (ভূ-পৃষ্ঠে) ভারী ভারী পাহাড় স্থাপন করে দিয়েছি এবং তাতে সর্বপ্রকার (প্রয়োজনীয় ফল-ফসল) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করেছি। এবং আমি তোমাদের জন্য তাতে (ভূ-পৃষ্ঠে) জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি, (জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সব উপকরণই এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ যেগুলো পানাহার, পরিধান ও বসবাসের সাথে সম্পর্ক রাখে। জীবিকার এসব উপকরণ ও জীবনধারণে প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী শুধু তোমাদেরকেই দেইনি, বরং) তাদেরকেও দিয়েছি, যাদেরকে তোমরা রুযী দাও না (অর্থাৎ ঐসব সৃষ্টজীব, যারা বাহ্যতও তোমাদের হাত

থেকে পানাহার ও জীবনধারণের উপকরণ পায় না। 'বাহ্যত' বলার কারণ এই যে, ছাগল-ভেড়া, গরু-মহিষ, ঘোড়া-গাধা ইত্যাদি গৃহপালিত পশু যদিও প্রকৃতপক্ষে রুযী ও জীবিকার জরুরী উপকরণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই পায়, কিন্তু বাহ্যত তাদের পানাহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা মানুষের হাতে রয়েছে। এগুলো ছাড়া বিশ্বের যাবতীয় স্থলজ ও জলজ জীব-জন্তু এবং পশু-পক্ষী ও হিংস্র জানোয়ার এমন যে, এদের জীবিকার কোন মানুষের কর্ম-ইচ্ছার কোন দখল নেই। এগুলো এত অসংখ্য ও অগণিত যে, মানুষ সবগুলোকে চেনেও না এবং গণনাও করতে পারে না।) আর (জীবনধারণের প্রয়োজনীয় যত বস্তু রয়েছে) আমার কাছে সবগুলোর বিরাট ভাণ্ডার (পরিপূর্ণ) রয়েছে এবং আমি (স্বীয় বিশেষ রহস্য অনুযায়ী সেগুলোকে) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে অবতারণ করতে থাকি। আমি বাতাস প্রেরণ করি, যা মেঘমালাকে জলপূর্ণ করে দেয়। অতঃপর আমিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি। অতঃপর তা তোমাদেরকে পান করতে দেই। তোমরা তা সঞ্চিত করে রাখতে পারতে না (যে, পরবর্তী বৃষ্টি পর্যন্ত ব্যবহার করবে) এবং আমিই জীবিত করি এবং মৃত্যুদান করি এবং (সবার মৃত্যুর পর) আমিই অবশিষ্ট থাকব। আমিই জানি তোমাদের অগ্রগামীদেরকে এবং আমিই জানি তোমাদের পশ্চাৎগামীদেরকে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই তাদের সবাইকে (কিয়ামতে) একত্র করবেন। (একথা বলার কারণ এই যে, ওপরে তওহীদ প্রমাণিত হয়েছে। এতে তওহীদ অবিশ্বাসীদের শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।) নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাবান (প্রত্যেককে তার উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন), সুবিজ্ঞ। (কে কি করে, তিনি পুরোপুরি জানেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্‌র রহস্য, জীবিকার প্রয়োজনাদিতে সমন্বয় ও সামঞ্জস্যতা ঃ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُوْنٍ -এর এক অর্থ অনুবাদে নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ রহস্যের তাকিদ অনুযায়ী প্রত্যেক উৎপন্ন বস্তুর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করেছেন। এরকম হলে জীবন-ধারণ কঠিন হয়ে যেত এবং বেশী হলেও নানা অসুবিধা দেখা দিত। মানবিক প্রয়োজ-নের তুলনায় গম, চাউল ইত্যাদি এবং উৎকৃষ্টতর ফলমূল যদি এত বেশী উৎপন্ন হয়, যা মানুষ ও জন্তুদের খাওয়ার পরও অনেক উদ্বৃত্ত হয়, তবে তা পচা ছাড়া উপায় কি? এগুলো রাখাও কঠিন হবে এবং ফেলে দেওয়ারও জায়গা থাকবে না।

এ থেকে জানা গেল যে, যেসব শস্য ও ফলমূলের উপর মানুষের জীবন নির্ভর-শীল সেগুলোকে এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করার শক্তিও আল্লাহ্ তা'আলার ছিল যে, প্রত্যেকেই সর্বত্র সেগুলো বিনামূল্যে পেয়ে যেত এবং অবাধে ব্যবহার করার পরও বিরাট উদ্বৃত্ত ভাণ্ডার পড়ে থাকত। কিন্তু এটা মানুষের জন্য একটা বিপদ হয়ে যেত। তাই একটি বিশেষ পরিমাণে এগুলো নাযিল করা হয়েছে, যাতে তার মান ও মূল্য বজায় থাকে এবং অনাবশ্যক উদ্বৃত্ত না হয়।

مَوْزُونٍ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ —এর এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, সব উৎপন্ন বস্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা একটি বিশেষ সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের মধ্যে উৎপন্ন করেছেন। ফলে তাতে সৌন্দর্য ও চিত্তাকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, পাতা, ফুল ও ফলকে বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন রঙ ও স্বাদ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার সমন্বয় ও সুন্দর দৃশ্য মানুষ উপভোগ করে বটে, কিন্তু এগুলোর বিস্তারিত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা তাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার।

সব সৃষ্টজীবকে পানি সরবরাহ্ করার অভিনব ব্যবস্থা ঃ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ থেকে مَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ পর্যন্ত আল্লাহ্র কুদরতের ঐ বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যার সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষ, জীব-জন্তু, পশুপক্ষী ও হিংস্র জন্তুর জন্য প্রয়োজনমাফিক পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। এর ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বত্র, সর্বাবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী পান, গোসল ধৌতকরণ এবং ক্ষেত ও উদ্যান সেচের জন্য বিনামূল্যে পানি পেয়ে যায়। কূপ খনন ও পাইপ সংযোজনে কারও কিছু ব্যয় হলে তা সুবিধা অর্জনের মূল্য বৈ নয়। এক ফোঁটা পানির মূল্য পরিশোধ করার ক্ষমতা কারও নেই এবং কারও কাছে তা দাবীও করা হয় না।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র কুদরত কিভাবে সমুদ্রের পানিকে ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র পৌঁছানোর অভিনব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। তিনি সমুদ্রে বাষ্প সৃষ্টি করেছেন। বাষ্প থেকে বৃষ্টির উপকরণ (মৌসুমী বায়ু) সৃষ্টি হয়েছে এবং উপরে বায়ু প্রবাহিত করে একে পাহাড়সম মেঘমালার পানিভর্তি জাহাজে পরিণত করেছেন। অতঃ-পর এসব পানিভর্তি উড়োজাহাজকে পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে দরকার পেঁৗছে দিয়েছেন। এরপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সেখানে যতটুকু পানি দেওয়ার আদেশ হয়েছে, এই স্বয়ংক্রিয় উড়ন্ত মেঘমালা সেখানে সে পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছে।

এভাবে সমুদ্রের পানি পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বসবাসকারী মানুষ ও জীবজন্তু ঘরে বসেই পেয়ে যায়। এ ব্যবস্থায় পানির স্বাদ ও অন্যান্য গুণাগুণের মধ্যে অভিনব পরিবর্তন সৃষ্টি করা হয়। কেননা, সমুদ্রের পানিকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন লবণাক্ত করেছেন যে, তা থেকে হাজার হাজার টন লবণ উৎপন্ন হয়। এর রহস্য এই যে, পৃথি-বীর বিরাট জলভাগে কোটি কোটি প্রকার জীব-জন্তু বাস করে। এরা পানিতেই মরে এবং পানিতেই পচে, গলে। এছাড়া সমগ্র স্থলভাগের ময়লা ও আবর্জনাযুক্ত পানি অবশেষে সমুদ্রের পানিতেই গিয়ে মিশে। এমতাবস্থায় সমুদ্রের পানি মিঠা হলে তা একদিনেই পচে যেত—এর উৎকট দুর্গন্ধে স্থলভাগে বসবাসকারীদের স্বাস্থ্য ও জীবনরক্ষাই দুষ্কর হয়ে যেত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এই পানিকে এমন এসিডযুক্ত লোনা করে দিয়েছেন যে,

সারা বিশ্বের আবর্জনা এখানে পৌঁছে ভস্ম ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মোট কথা, বর্ণিত রহস্যের ভিত্তিতে সমুদ্রের পানিকে লোনা বরং ক্ষারযুক্ত করা হয়েছে, যা পানও করা যায় না এবং পান করলেও পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। আল্লাহ্র ব্যবস্থাধীনে মেঘমালার আকারে পানির যেসব উড়োজাহাজ তৈরী হয়, এগুলো শুধু সামুদ্রিক পানির ভাণ্ডারই নয়, বরং মৌসুমী বায়ু উত্থিত হওয়ার সময় থেকে নিয়ে ভূ-পৃষ্ঠে বর্ষিত হওয়ার সময় পর্যন্ত এগুলোতে বাহ্যিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে যে, লবণাক্ততা দূরীভূত হয়ে তা মিঠাপানিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সূরা মুরসালাতে এ দিকে ইঙ্গিত আছে। وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا—এখানে فُرَات শব্দের অর্থ এমন মিঠা পানি, যদ্দ্বারা পিপাসা নিবৃত্ত হয়। অর্থ এই যে, আমি মেঘমালার প্রাকৃতিক যন্ত্রপাতি অতিক্রম করিয়ে সমুদ্রের লোনা ও ক্ষারযুক্ত পানিকে তোমাদের পান করার জন্য মিঠা করে দিয়েছি।

সূরা ওয়াকেআয় বলা হয়েছে :

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۝ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ۝ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۝

পানিকে দেখ, যা তোমরা পান কর। একে তোমরা মেঘমালা থেকে বর্ষণ করেছ, না আমি বর্ষণকারী? আমি ইচ্ছা করলে একে লোনা করে দিতে পারি। তথাপি তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর না কেন?

এ পর্যন্ত আমরা আল্লাহ্র কুদরতের লীলা দেখলাম যে, সমুদ্রের পানিকে মিঠা পানিতে পরিণত করে সমগ্র ভূপৃষ্ঠে মেঘমালার সাহায্যে কি চমৎকারভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক ভূ-খণ্ডের শুধু মানুষই নয়, অগণিত জীব-জন্তুও ঘরে বসে পানি পেয়েছে এবং সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এমনকি অলংঘনীয় প্রাকৃতিক কারণে অবধারিতভাবেই তাদের কাছে পানি পৌঁছে গেছে।

কিন্তু মানুষ ও জীব-জন্তুর সমস্যার সমাধান এতটুকুতেই হয়ে যায় না। কারণ পানি তাদের এমন একটি প্রয়োজন, যার চাহিদা প্রত্যহ ও প্রতিনিয়ত। তাই তাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন মিটানোর একটি সম্ভাব্য পদ্ধতি ছিল এই যে, সর্বত্র প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক দিনে বৃষ্টিপাত হত। এমতাবস্থায় তাদের পানির প্রয়োজন তো মিটে যেত কিন্তু জীবিকা নির্বাহের অপরাপর প্রয়োজনাদিতে যে কি পরিমাণ ত্রুটি দেখা দিত, তা অনুমান করা অভিজ্ঞজনের পক্ষে কঠিন নয়। বছরের প্রত্যেক দিন বৃষ্টিপাতের ফলে স্বাস্থ্যের অপরিসীম ক্ষতি হত এবং কাজ-কারবার ও চলা-ফেরায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হত।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল এই যে, বছরের বিশেষ বিশেষ মাসে এ পরিমাণ বৃষ্টিপাত হত যে, পানি তার অবশিষ্ট মাসগুলোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন

হত প্রত্যেকের জন্য একটি কোটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং তার অংশের পানির হিফাযত তার দায়িত্বে সমর্পণ করা।

চিন্তা করুন, এরূপ করা হলে প্রত্যেকেই এতগুলো চৌবাচ্চা অথবা পাত্র কোথা থেকে যোগাড় করত, যে গুলোর মধ্যে তিন অথবা ছয় মাসের প্রয়োজনীয় পানি জমা করে রাখা যায়! যদি কোনরূপ বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে এগুলো সংগ্রহ করেও নেওয়া হতো, তবুও দেখা যেত যে, কয়েকদিন অতিবাহিত হলেই এই পানি দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পান করার উপযুক্ত থাকত না। তাই আল্লাহ্‌র কুদরত পানিকে ধরে রাখার এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে সর্বত্র সুলভ করার অপর একটি অভিনব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। তা এই যে, আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করা হয়, তার কিছু অংশ তো তাৎক্ষণিকভাবেই গাছপালা, ক্ষেত-খামার, মানুষ ও জীব-জন্তুকে সিক্ত করার কাজে লেগে যায়, কিছু পানি উন্মুক্ত পুকুর, বিল-ঝিল ও নিম্নভূমিতে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং অতঃপর একটি বৃহৎ অংশকে বরফের স্তূপে পরিণত করে পাহাড়-পর্বতের শৃঙ্গে সঞ্চিত রাখা হয়। সেখানে ধূলাবালি আবর্জনা ইত্যাদি কিছুই পৌঁছতে পারে না। যদি তা পানির মত তরল অবস্থায় থাকত তবে বাতাসের সাহায্যে কিছু ধূলাবালি অথবা অন্য কোন দূষিত বস্তু সেখানে পৌঁছে যাওয়ার আশংকা থাকত। তাতে পশু-পক্ষীদের পতিত হওয়া ও মরে যাওয়ার আশংকা থাকত। ফলে পানি দূষিত হয়ে যেত। কিন্তু প্রকৃতি এ পানিকে জমাট বরফে পরিণত করে পাহাড়ের শৃঙ্গ উঠিয়ে দিয়েছে, সেখান থেকে অল্প পরিমাণে চুইয়ে-চুইয়ে পাহাড়ের শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করে এবং ঝরনার আকারে সর্বত্র পৌঁছে যায়। যেখানে ঝরনা নেই সেখানে মৃত্তিকার স্তরে মানুষের ধমনীর ন্যায় সর্বত্র প্রবাহিত হয় এবং কূপ খনন করলে পানি বের হয়ে আসে।

মোট কথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার এই পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্যে হাজারো নিয়ামত লুক্কায়িত রয়েছে। প্রথমত পানি সৃষ্টি করাই একটি বড় নিয়ামত। অতঃপর মেঘমালার সাহায্যে একে ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র পৌঁছানো দ্বিতীয় নিয়ামত। এরপর একে মানুষের পানের উপযোগী করা তৃতীয় নিয়ামত। এরপর মানুষকে তা পান করার সুযোগ দেওয়া চতুর্থ নিয়ামত। অতঃপর এ পানিকে প্রয়োজনানুযায়ী সংরক্ষিত রাখার অটল ব্যবস্থা পঞ্চম নিয়ামত। এরপর তা থেকে মানুষকে পান ও সিক্ত হওয়ার সুযোগ দান করা ষষ্ঠ নিয়ামত। কেননা পানি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এমন আপদবিপদ দেখা দিতে পারে যদ্দরুন মানুষ পানি পান করতে সক্ষম না হয়। কোরআন পাকের فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ আয়াতে এসব নিয়ামতের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

সৎকাজে এগিয়ে যাওয়া ও পিছিয়ে থাকার মধ্যে মর্তবার পার্থক্য :

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ — এখানে

সাহাবী ও তাবেয়ী তফসীরবিদদের পক্ষ থেকে مُسْتَقْدِمِيْنَ (অগ্রগামী দল) ও

مُسْتَاْخِرِيْنَ (পশ্চাৎগামী দল)-এর তফসীর সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে।

কাতাদাহ্ ও ইকরিমা বলেন : যারা এ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেনি তারা পশ্চাৎগামী। হযরত ইবনে আব্বাস ও যাহ্হাক বলেন : যারা মরে গেছে, তারা অগ্রগামী এবং যারা জীবিত আছে, তারা পশ্চাৎগামী। মুজাহিদ বলেন : পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা অগ্রগামী এবং উম্মতে মুহাম্মদী পশ্চাৎগামী। হাসান ও কাতাদাহ্ বলেন : ইবাদতকারী ও সৎকর্মশীলরা অগ্রগামী, গোনাহ্গাররা পশ্চাৎগামী। হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব, কুরতুবী, শা'বী প্রমুখ তফসীরবিদের মতে যারা নামাযের কাতারে অথবা জিহাদের সারিতে এবং অন্যান্য সৎকাজে এগিয়ে থাকে, তারা অগ্রগামী এবং যারা এসব কাজে পেছনে থাকে এবং দেরী করে, তারা পশ্চাৎগামী। বলা বাহুল্য, এসব উক্তির মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নেই। সবগুলোর সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞান উল্লিখিত সর্বপ্রকার অগ্রগামী ও পশ্চাৎগামীতে পরিব্যাপ্ত।

কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেন : এ আয়াত থেকে নামাযের প্রথম কাতারে এবং আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যদি লোকেরা জানত যে, আযান দেওয়া ও নামাযের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর ফযীলত কতটুকু, তবে সবাই প্রথম কাতারে দাঁড়াতে সচেষ্ট হত এবং প্রথম কাতারে সবার স্থান সংকুলান না হলে লটারী যোগে স্থান নির্ধারণ করতে হত।

কুরতুবী এতদসঙ্গে হযরত কা'বের উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, এ উম্মতের মধ্যে এমন মহাপুরুষও আছে, যারা সিজদায় গেলে পেছনের সবার গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। এ জন্যই হযরত কা'ব পেছনের কাতারে থাকা পছন্দ করতেন যে, সম্ভবত প্রথম কাতারসমূহে আল্লাহ্র কোন এমন নেক বান্দা থাকতে পারে, যার বরকতে আমার মাগফিরাত হয়ে যেতে পারে।

বাহ্যত প্রথম কাতারেই ফযীলত নিহিত, যেমন কোরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু যে ব্যক্তি কোন কারণে প্রথম কাতারে স্থান না পায়, সেও এদিক দিয়ে এক প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে যে, প্রথম কাতারের কোন নেক বান্দার বরকতে তারও মাগফিরাত হয়ে যেতে পারে। উল্লিখিত আয়াতে যেমন নামাযের প্রথম কাতারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি জিহাদের প্রথম কাতারের শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণিত হয়েছে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۝٢٦ وَالْجَآنَّ

خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ۝٢٧ وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ

إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ
أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ
مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ
خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ
رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي
إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَىٰ يَوْمِ
الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ قَالَ
هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ
إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾
لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾

(২৬) আমি মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। (২৭) এবং জিনকে এর আগে লু-এর আগুনের দ্বারা সৃজিত করেছি। (২৮) আর আপনার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেনঃ আমি পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্ট একটি মানব জাতির পত্তন করব। (২৯) অতঃপর যখন তাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁক দেব, তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পড়ে যেয়ো। (৩০) তখন ফেরেশতারা সবাই মিলে সিজদা করল। (৩১) কিন্তু ইবলীস—সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে স্বীকৃত হল না। (৩২) আল্লাহ্ বললেনঃ হে ইবলীস, তোমার কি হলো যে তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না? (৩৩) বললঃ আমি এমন নই যে, একজন মানুষকে সিজদা করব, যাকে আপনি পচা কর্দম থেকে তৈরী ঠনঠনে বিশুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। (৩৪) আল্লাহ্ বললেনঃ তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। তুমি বিতাড়িত (৩৫) এবং তোমার

প্রতি ন্যায় বিচারের দিন পর্যন্ত অভিসম্পাত। (৩৬) সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (৩৭) আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমাকে অবকাশ দেওয়া হল, (৩৮) সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। (৩৯) সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব। (৪০) আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত। (৪১) আল্লাহ্ বললেন ঃ এটা আমা পর্যন্ত সোজা পথ। (৪২) যারা আমার বান্দা, তাদের ওপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই; কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে। (৪৩) তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম। (৪৪) এর সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার জন্য এক-একটি পৃথক দল আছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি মানবকে (অর্থাৎ মানবজাতির আদি পিতা আদমকে) পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছি। (অর্থাৎ প্রথমে কর্দমকে খুব গাঁজ করেছি ফলে তা থেকে গন্ধ আসতে থাকে। অতঃপর তা শুষ্ক হয়েছে। শুষ্ক হওয়ার কারণে তা থেকে খন খন শব্দ হতে থাকে, যেমন মৃৎপাত্রকে আঙুল দ্বারা টোকা দিলে শব্দ হয়। অতঃপর এই বিশুষ্ক কর্দম দ্বারা আদমের পুতুল তৈরী করেছি। এটা অত্যন্ত ক্ষমতার পরিচায়ক।) এবং জিনকে (অর্থাৎ জিন জাতির আদি পিতাকে) এর আগে (অর্থাৎ আদমের আগে) অগ্নি দ্বারা—(অত্যধিক সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে সেটা ছিল তপ্ত বাতাস—) সৃষ্টি করেছিলাম। (উদ্দেশ্য এই যে, এ অগ্নিতে ধোঁয়ার মিশ্রণ ছিল না। তাই সেটা বাতাসের মত দৃষ্টিগোচর হত। কেননা, গাঢ় অংশের মিশ্রণের ফলে অগ্নি দৃষ্টিগোচর হয়। অন্য এক আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে ঃ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ

সে সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাদের বললেন ঃ আমি এক মানবকে (অর্থাৎ তার পুতুলকে) পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করব। অতএব যখন আমি একে (অর্থাৎ এর দেহাবয়বকে) সম্পূর্ণ বানিয়ে নেই এবং তাতে নিজের (পক্ষ থেকে) প্রাণ ঢেলে দেই, তখন তোমরা সবাই তার সামনে সিজদায় পড়ে যাবে। অতঃপর (যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বানিয়ে নিলেন, তখন) সব ফেরেশতাই (আদমকে) সিজদা করল, ইবলীস ব্যতীত। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে স্বীকৃত হল না (অর্থাৎ সিজদা করল না)। আল্লাহ্ বললেন ঃ হে ইবলীস, তোমার কি ব্যাপার যে, তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না? সে বলল ঃ আমি এরূপ নই যে মানবকে সিজদা করব, যাকে আপনি পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। (অর্থাৎ সে অধম ও নিকৃষ্ট উপকরণ দ্বারা তৈরী। আর আমি জ্যোতির্ময় উপকরণ অগ্নি দ্বারা সৃজিত হয়েছি। অতএব জ্যোতির্ময় হয়ে অন্ধকারময়কে কিরূপে সিজদা করি।) আল্লাহ্ বললেন ঃ (আচ্ছা, তা'হলে আসমান

থেকে) বের হয়ে যাও। কেননা নিশ্চয় তুমি (এ কাণ্ড করে) বিতাড়িত হয়ে গেছো এবং নিশ্চয় তোমার প্রতি (আমার) অভিসম্পাত কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। (যেমন, অন্য আয়াতে আছে, عَلَيْكَ لَعْنَتِي—অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত তুমি আমার রহমত থেকে দূরে থাকবে—তওবার তওফীক হবে না এবং প্রিয় ও দয়াপ্রাপ্ত হবে না। বলা বাহুল্য যে কিয়ামত পর্যন্ত দয়া পাবে না, তার কিয়ামতে দয়াপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। এখানে যে পর্যন্ত দয়াপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেই পর্যন্ত দয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং এরূপ সন্দেহ অমূলক যে, এতে তো সময় চাওয়ার পূর্বেই সময় দেওয়ার ওয়াদা করা হয়েছে। আসল ব্যাপার এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত জীবন দান করা উদ্দেশ্য নয় বরং অর্থ এই যে, পার্থিব জীবনে তুমি অভিশপ্ত, যদিও তা কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়।) ইবলীস বলতে লাগল ঃ (আদমের কারণে যখন আমাকে বিতাড়িতই করেছেন) তাহলে আমাকে (মৃত্যুর কবল থেকে) কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবসর দিন (যাতে তার কাছ থেকে এবং তার সন্তানদের কাছ থেকে যথেচ্ছ প্রতিশোধ গ্রহণ করি।) আল্লাহ্ বললেন ঃ (যখন অবসরই চাইলে) তবে (যাও) তোমাকে নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত অবসর দেওয়া হল। সে বলতে লাগল ঃ হে আমার পালনকর্তা, যেহেতু আপনি আমাকে (সৃষ্টিগত বিধান অনুযায়ী) পথভ্রষ্ট করেছেন তাই আমি কসম খাচ্ছি যে, দুনিয়াতে তাদের (অর্থাৎ আদম ও তার সন্তানদের) দৃষ্টিতে গোনাহ্কে সুশোভিত করে দেখাব এবং সবাইকে পথভ্রষ্ট করব আপনার মনোনীত বান্দাদেরকে ছাড়া (অর্থাৎ আপনি তো তাদেরকে আমার প্রভাব থেকে মুক্ত রেখেছেন।) আল্লাহ্ বললেন ঃ (হ্যাঁ) এটা (অর্থাৎ মনোনীত হওয়া যার উপায় হচ্ছে পূর্ণ আনুগত্য ও সৎ কর্ম সম্পাদন করা) একটা সরল পথ যা আমা পর্যন্ত পৌঁছে। (অর্থাৎ এ পথে চলে আমার নৈকট্যশীল হওয়া যায়।) নিশ্চয় আমার (উল্লিখিত) বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা চলবে না কিন্তু পথভ্রষ্টদের মধ্যে যারা তোমাদের পথে চলে (তারা চলবে)। এবং (যারা তোমার পথে চলবে) তাদের সবার ঠিকানা জাহান্নাম। এর সাতটি দরজা রয়েছে। প্রত্যেক দরজার জন্য (অর্থাৎ দরজা দিয়ে প্রবেশ করার জন্য) তাদের পৃথক পৃথক অংশ আছে। (অর্থাৎ কেউ এক দরজা দিয়ে এবং কেউ অন্য দরজা দিয়ে যাবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মানবদেহে আত্মা সঞ্চারিত করা এবং তাকে ফেরেশতাদের সিজদাযোগ্য করা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ঃ রূহ্ (আত্মা) কোন যৌগিক, না মৌলিক পদার্থ—এ সম্পর্কে পণ্ডিত ও দার্শনিকদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই মতভেদ চলে আসছে। শায়খ আবদুর রউফ মানাভী বলেন ঃ এ সম্পর্কে দার্শনিকদের বিভিন্ন উক্তির সংখ্যা এক হাজার পর্যন্ত পৌঁছেছে, কিন্তু এগুলোর সবই অনুমান ভিত্তিক; কোনটিকেই নিশ্চিত বলা যায় না। ইমাম গাযযালী, ইমাম রাযী এবং অধিক সংখ্যক সূফী ও দার্শনিকের উক্তি এই যে, রূহ্ কোন যৌগিক পদার্থ নয়, বরং একটি সূক্ষ্ম মৌলিক পদার্থ। রাযী এ মতের পক্ষে বারটি প্রমাণ উপস্থিত করেছেন।

কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশ আলিমের মতে রূহ্ একটি সূক্ষ্ম দেহবিশিষ্ট বস্তু। نفخ শব্দের অর্থ ফুঁক মারা অথবা সঞ্চার করা। উপরোক্ত উক্তি অনুযায়ী রূহ্ যদি দেহবিশিষ্ট কোন বস্তু হয়ে থাকে, তবে সেটা ফুঁকে দেওয়ার অনুকূল। তাই যদি রূহকে সূক্ষ্ম পদার্থ মেনে নেওয়া হয়, তবে রূহ্ ফুঁকার অর্থ হবে দেহের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন করা।—(বয়ানুল-কোরআন)

রূহ্ ও নফ্‌স সম্পর্কে কাযী সানাউল্লাহ্ (রহ)-র তথ্যানুসন্ধান ঃ এখানে দীর্ঘ আলোচনা ছেড়ে একটি বিশেষ তথ্যের উপর আলোচনা সমাপ্ত করা হচ্ছে। এটি কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী তফসীরে মযহারীতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

কাযী সাহেব বলেন ঃ রূহ্ দুই প্রকার ঃ স্বর্গজাত ও মর্ত্যজাত। স্বর্গজাত রূহ্ আল্লাহ্ তা'আলার একটি একক সৃষ্টি। এর স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মনীষিগণ এর আসল স্থান আরশের উপরে দেখতে পান। কেননা, এটা আরশের চাইতেও সূক্ষ্ম। স্বর্গজাত রূহ্ অন্তর্দৃষ্টিতে উপর-নিচে পাঁচটি স্তরে অনুভব করা হয়। পাঁচটি স্তর এই ঃ কল্‌ব, রূহ্, সির, খফী, আখ্‌ফা—এগুলো আদেশ-জগতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব। এ আদেশ জগতের প্রতি কোরআনে قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মর্ত্যজাত রূহ্ হচ্ছে ঐ সূক্ষ্ম বাষ্প, যা মানবদেহের চার উপাদান অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু থেকে উৎপন্ন হয়। এই মর্ত্যজাত রূহ্‌কেই নফ্‌স বলা হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা মর্ত্যজাত রূহ্‌কে যাকে নফ্‌স বলা হয় উপরোক্ত স্বর্গজাত রূহের আয়নায় পরিণত করে দিয়েছেন। আয়নাকে সূর্যের বিপরীতে রাখলে যেমন অনেক দূরে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাতে সূর্যের ছবি প্রতিফলিত হয়, সূর্য কিরণে আয়নাও উজ্জ্বল হয় এবং তাতে সূর্যের উত্তাপও এসে যায়, যা কাপড়কে জ্বালিয়ে দিতে পারে, তেমনি-ভাবে স্বর্গজাত রূহের ছবি মর্ত্যজাত রূহের আয়নায় প্রতিফলিত হয়, যদিও তা মৌলিকত্বের কারণে অনেক ঊর্ধ্বে ও দূরত্বে অবস্থিত থাকে। প্রতিফলিত হয়ে স্বর্গজাত রূহের গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়া মর্ত্যজাত রূহের মধ্যে স্থানান্তরিত করে দেয়। নফ্‌সে সৃষ্ট এসব প্রতিক্রিয়াকেই আংশিক আত্মা বলা হয়।

মর্ত্যজাত রূহ তথা নফ্‌স স্বর্গজাত রূহ্ থেকে প্রাপ্ত গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়াসহ সর্বপ্রথম মানবদেহের হৃৎপিণ্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। এ সম্পর্কেরই নাম হায়াত ও জীবন। মর্ত্যজাত রূহের সম্পর্কের ফলে সর্বপ্রথম মানুষের হৃৎপিণ্ডে জীবন ও ঐ সব বোধশক্তি সৃষ্টি হয়, যেগুলোকে নফ্‌স স্বর্গজাত রূহ্ থেকে লাভ করে। মর্ত্যজাত রূহ্ সমগ্র দেহে বিস্তৃত সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরায় সংক্রমিত হয়। এভাবে সে মানবদেহের প্রতিটি অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

মানবদেহের মর্ত্যজাত রূহের সংক্রমিত হওয়াকেই نفخ روح তথা আত্মা ফুঁকা বা আত্মা সঞ্চারিত করা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, এ সংক্রমণ কোন বস্তুতে ফুঁক ভরার সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রূহ্‌কে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে مِّن رُّوحِي বলেছেন, যাতে সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠে। কারণ মানবাত্মা উপকরণ ব্যতীত একমাত্র আল্লাহ্‌র আদেশেই সৃষ্ট হয়েছে। এছাড়া তার মধ্যে আল্লাহ্‌র নূর করার এমন যোগ্যতা রয়েছে, যা মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবের আত্মার মধ্যে নেই।

মানব সৃষ্টির মধ্যে মৃত্তিকাই প্রধান উপকরণ। এ জন্যই কোরআন পাকে মানব-সৃষ্টিকে মৃত্তিকার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানব সৃষ্টির উপকরণ দশটি জিনিসের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। তন্মধ্যে পাঁচটি সৃষ্টিজগতের এবং পাঁচটি আদেশ জগতের। সৃষ্টিজগতের চার উপাদান আগুন, পানি, মাটি, বাতাস এবং পঞ্চম হচ্ছে এ চার থেকে সৃষ্ট সূক্ষ্ম বাষ্প যাকে মর্ত্যজাত রূহ্ বা নফ্‌স বলা হয়। আদেশজগতের পাঁচটি উপকরণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কল্‌ব, রূহ্, সির, খফী ও আখ্‌ফা।

এ পরিব্যাপ্তির কারণে মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে এবং মা'রিফতের নূর, ইশক ও মহব্বতের জ্বালা বহনের যোগ্যপাত্র বিবেচিত হয়েছে। এর ফলশ্রুতি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার আকৃতিমুক্ত সঙ্গ লাভ। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: المرء مع من احب অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গ লাভ করবে, যাকে সে মহব্বত করে।

আল্লাহ্‌র দ্যুতির গ্রহণ ক্ষমতা এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গ লাভের কারণেই আল্লাহ্‌র রহস্য দাবী করেছে যে, মানুষকে ফেরেশতাগণ সিজদা করুক। আল্লাহ্ বলেন: فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (তারা সবাই তার প্রতি সিজদায় অবনত হলো)

ফেরেশতাগণ সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েছিল, ইবলীসকে প্রসঙ্গত অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে: সূরা আ'রাফে ইবলীসকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে: مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ —এ থেকে বোঝা যায় যে, ফেরেশতাদের সাথে ইবলীসকেও সিজদার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এ সূরার আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, ফেরেশতাদেরকে বিশেষভাবে সিজদা করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এর অর্থ এরূপ হতে পারে যে, সিজদার আদেশ মূলত ফেরেশতাদেরকে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ইবলীসও যেহেতু ফেরেশতাদের

মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তাই প্রসঙ্গত সে-ও আদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা আদমের সম্মানার্থে যখন আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তখন অন্যান্য সৃষ্টি যে প্রসঙ্গত এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা বলাই বাহুল্য। এ কারণেই ইবলীস উত্তরে একথা বলেনি যে, আমাকে যখন সিজদা করার আদেশ দেওয়াই হয়নি, তখন পালন না করার অপরাধও আমার প্রতি আরোপিত হয় না। কোরআন পাকে أَبَىٰ أَنْ يَسْجُدَ (সে সিজদা করতে অস্বীকৃত হল) বলার পরিবর্তে

أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (সে সিজদাকারীদের সাথে শামিল হতে অস্বীকৃত হল)

বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মূল সিজদাকারী তো ফেরেশতারাই ছিল, কিন্তু ইবলীস যেহেতু তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তাই যুক্তিগতভাবে তারও সিজদাকারী ফেরেশতাদের সাথে শামিল হওয়া অপরিহার্য ছিল। শামিল না হওয়ার কারণে তার প্রতি ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ বান্দাগণ শয়তানের প্রভাবাধীন না হওয়ার অর্থ : إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ—থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত বান্দাদের উপর শয়তানী কারসাজির প্রভাব পড়ে না। কিন্তু বর্ণিত আদম কাহিনীতে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম ও হাওয়ার উপর শয়তানের চক্রান্ত সফল হয়েছে। এমনিভাবে সাহাবায়ে-কিরাম সম্পর্কে কোরআন বলে : إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا—(আলে-এমরান)। এ থেকে জানা যায় যে, সাহাবায়ে-কিরামের উপরও শয়তানের ধোঁকা এ ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে।

তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌র বিশেষ বান্দাদের উপর শয়তানের আধিপত্য না হওয়ার অর্থ এই যে, তাদের মন-মস্তিষ্ক ও জ্ঞান-বুদ্ধির উপর শয়তানের এমন আধিপত্য হয় না যে, তাঁরা নিজ ভ্রান্তি কোন সময় বুঝতেই পারেন না। ফলে তওবা করার শক্তি হয় না কিংবা কোন ক্ষমার অযোগ্য গোনাহ্ করে ফেলেন।

উল্লিখিত ঘটনাবলী এ তথ্যের পরিপন্থী নয়। কারণ, আদম ও হাওয়া তওবা করেছিলেন এবং তা কবুলও হয়েছিল। সাহাবায়ে-কিরামও তওবা করেছিলেন এবং শয়তানের চক্রান্তে যে গুনাহ্ করেছিলেন, তা মাফ করা হয়েছিল।

জাহান্নামের সাত দরজা : لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ—ইমাম আহ্‌মদ, ইবনে জরীর,

তাবারী ও বায়হাকী হযরত আলীর রেওয়ায়েতে লিখেন যে, উপর নিচের স্তরের দিক দিয়ে জাহান্নামের দরজা সাতটি। কেউ কেউ এগুলোকে সাধারণ দরজার মত সাব্যস্ত করেছেন। প্রত্যেক দরজা বিশেষ প্রকারের অপরাধীদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে।—(কুরতুবী)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ۝ ادْخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ءَامِنِينَ ۝ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَٰنًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ۝ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۝ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۝

(৪৫) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ভীরুরা বাগান ও নির্ঝরিণীসমূহে থাকবে। (৪৬) বলা হবে: এগুলোতে নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে প্রবেশ কর। (৪৭) তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল, আমি তা দূর করে দেব। তারা ভাই ভাইয়ের মতো সামনা-সামনি আসনে বসবে। (৪৮) সেখানে তাদের মোটেই কষ্ট হবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হবে না। (৪৯) আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৫০) এবং ইহাও যে, আমার শাস্তিই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আল্লাহ্‌ভীরুরা (অর্থাৎ ঈমানদাররা) উদ্যান ও নির্ঝরিণীবহুল স্থানসমূহে (বসবাস করতে) থাকবে। (যদি গোনাহ্ না থাকে অথবা ক্ষমা করে দেওয়া হয়, তবে প্রথম থেকেই এবং গোনাহ্ থাকলে শাস্তি ভোগের পর থেকে। তাদেরকে বলা হবে:) তোমরা এগুলোতে (অর্থাৎ উদ্যান ও নির্ঝরিণীবহুল স্থানসমূহে) নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে প্রবেশ কর। (অর্থাৎ বর্তমানেও প্রত্যেক অপ্রীতিকর ব্যাপার থেকে নিরাপত্তা আছে এবং ভবিষ্যতেও কোন অনিষ্টের আশংকা নেই।) এবং (দুনিয়াতে স্বভাবগত তাগিদে) তাদের অন্তরে যে ঈর্ষা-দ্বেষ ছিল আমি তা (তাদের অন্তর থেকে) জান্নাতে প্রবেশের পূর্বেই দূর করে দেব। তারা ভাই-ভাইয়ের মতো (ভালবাসা ও সম্প্রীতির সাথে) থাকবে, সিংহাসনে সামনা-সামনি বসবে। সেখানে তাদের মোটেই কষ্ট হবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হবে না। (হে মুহাম্মদ) আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। এবং (আরও) এই যে, আমার শাস্তি (-ও) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (যাতে একথা জেনে তাদের মনে ঈমান ও আল্লাহভীতির প্রতি উৎসাহ এবং কুফর ও গোনাহ্‌র প্রতি ভয় জন্মে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন সর্বপ্রথম তাদের পানির দু'টি নির্ঝরিণী পেশ করা হবে। প্রথম নির্ঝরিণী থেকে পানি পান করতেই তাদের অন্তর থেকে ঐসব পারস্পরিক শত্রুতা বিধৌত হয়ে যাবে যা কোন সময় দুনিয়াতে জন্মেছিল এবং স্বভাবগতভাবে তার প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। অতঃপর সবার অন্তরে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়ে যাবে। কেননা, পারস্পরিক শত্রুতাও এক প্রকার কষ্ট এবং জান্নাত প্রত্যেক কষ্ট থেকেই পবিত্র।

সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে যে, যার অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি বিন্দু পরিমাণও ঈর্ষা ও শত্রুতা থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এর অর্থ ঐ হিংসা ও শত্রুতা, যা জাগতিক স্বার্থের অধীনে এবং নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতাবলে হয় এবং এর কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল ও ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। মানবসুলভ স্বাভাবিক মন কষাকষি অনেকটা অনিচ্ছাকৃত ব্যাপার; এটা এ সাবধান বাণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এমনিভাবে ঐ শত্রুতাও এর অন্তর্ভুক্ত নয়, যা কোন শরীয়ত সম্মত কারণের উপর ভিত্তিশীল। আয়াতে এ ধরনের হিংসা ও শত্রুতার কথাই বলা হয়েছে যে, জান্নাতীদের মন থেকে সর্ব প্রকার হিংসা ও শত্রুতা দূর করে দেওয়া হবে।

এ সম্পর্কেই হযরত আলী (রা) বলেনঃ আমি আশা করি, আমি তালহা ও যুবায়ের ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হব, যাদের মনোমালিন্য জান্নাতে প্রবেশ করার সময় দূর করে দেওয়া হবে। এতে ঐ মতবিরোধ ও বিবাদের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, যা হযরত আলী এবং তালহা ও যুবায়েরের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল।

● لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ —এ আয়াত থেকে জান্নাতের দুটি বৈশিষ্ট্য জানা গেল। এক. সেখানে কেউ কোন ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করবে না। দুনিয়ার অবস্থা এর বিপরীত। এখানে কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজ করলে তো ক্লান্তি হয়ই; বিশেষ আরাম এমনকি চিত্তবিনোদনেও মানুষ কোন না কোন সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং দুর্বলতা অনুভব করে, তা যতই সুখকর কাজ ও বৃত্তি হোক না কেন।

দ্বিতীয়ত জানা গেল যে, জান্নাতের আরাম, সুখ ও নিয়ামত কেউ পেলে তা চিরস্থায়ী হবে। এগুলো কোন সময় হ্রাস পাবে না এবং এগুলো থেকে কাউকে বহিষ্কৃতও করা হবে না। সূরা সাদ-এ বলা হয়েছেঃ إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ —অর্থাৎ এ হচ্ছে আমাদের রিযিক, যা কোন সময় শেষ হবে না। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ —অর্থাৎ তাদেরকে কোন সময় এসব নিয়ামত ও সুখ থেকে বহিষ্কার করা হবে না। দুনিয়ার ব্যাপারাদি এর বিপরীত। এখানে যদি কেউ

কাউকে কোন বিরাট নিয়ামত বা সুখ দিয়েও দেয় তবুও সদাসর্বদা এ আশংকা লেগেই থাকে যে, দাতা কোন সময় নারাজ হয়ে যদি তাকে বের করে দেয়।

একটি তৃতীয় সম্ভাবনা ছিল এই যে, জান্নাতের নিয়ামত শেষ হবে না এবং জান্নাতীকে সেখান থেকে বেরও করা হবে না, কিন্তু সেখানে থাকতে থাকতে সে নিজেই যদি অতিষ্ঠ হয়ে যায় এবং বাইরে চলে যেতে চায়! কোরআন পাক এ সম্ভাবনাকেও একটি বাক্যে নাচক করে দিয়েছে ঃ لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا —অর্থাৎ তারাও সেখান থেকে ফিরে আসার বাসনা কোন সময়ই পোষণ করবে না।

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرٰهِيْمَ ﴿٥١﴾ إِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ط قَالَ
إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ﴿٥٢﴾ قَالُوْا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ﴿٥٣﴾ قَالَ
أَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰٓى أَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ﴿٥٤﴾ قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ
بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ إِلَّا
الضَّآلُّوْنَ ﴿٥٦﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٧﴾ قَالُوْٓا إِنَّآ أُرْسِلْنَآ
إِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٥٨﴾ إِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ط إِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا
امْرَأَتَهٗ قَدَّرْنَآ إِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٦١﴾
قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٦٢﴾ قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ
يَمْتَرُوْنَ ﴿٦٣﴾ وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٦٤﴾ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ
بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَّامْضُوْا
حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ
مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ﴿٦٦﴾ وَجَآءَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٦٧﴾
قَالَ إِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِيْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ ﴿٦٨﴾ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ ﴿٦٩﴾
قَالُوْٓا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٠﴾ قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِيْٓ إِنْ كُنْتُمْ

فَٰعِلِينَ ﴿٧١﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ
مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن
سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ
مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

(৫১) আপনি তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানদের অবস্থা শুনিয়ে দিন। (৫২) যখন তারা তাঁর গৃহে আগমন করল এবং বলল ঃ সালাম। তিনি বললেন ঃ আমরা তোমাদের ব্যাপারে ভীত। (৫৩) তারা বলল ঃ ভয় করবেন না। আমরা আপনাকে একজন জ্ঞানবান ছেলেসন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। (৫৪) তিনি বললেন ঃ তোমরা কি আমাকে এমতাবস্থায় সুসংবাদ দিচ্ছ, যখন আমি বার্ধক্যে পৌঁছে গেছি? এখন কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ? (৫৫) তারা বলল ঃ আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি! অতএব আপনি নিরাশ হবেন না। (৫৬) তিনি বললেন ঃ পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া কে নিরাশ হয়? (৫৭) তিনি বললেন, অতঃপর তোমাদের প্রধান উদ্দেশ্য কি হে আল্লাহ্‌র প্রেরিতগণ? (৫৮) তারা বলল ঃ আমরা একটি অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (৫৯) কিন্তু লূতের পরিবার-পরিজন। আমরা অবশ্যই তাদের সবাইকে বাঁচিয়ে নেব। (৬০) তবে তার স্ত্রী। আমরা স্থির করেছি যে, সে থেকে যাওয়াদের দলভুক্ত হবে। (৬১) অতঃপর যখন প্রেরিতরা লূতের গৃহে পৌঁছল। (৬২) তিনি বললেন ঃ তোমরা তো অপরিচিত লোক। (৬৩) তারা বলল ঃ না, বরং আমরা আপনার কাছে ঐ বস্তু নিয়ে এসেছি, যে সম্পর্কে তারা বিবাদ করত। (৬৪) এবং আমরা আপনার কাছে সত্য বিষয় নিয়ে এসেছি এবং আমরা সত্যবাদী। (৬৫) অতএব আপনি শেষ রাত্রে পরিবারের সকলকে নিয়ে চলে যান এবং আপনি তাদের পশ্চাদনুসরণ করবেন এবং আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পিছন ফিরে না দেখে। আপনারা যেখানে আদেশ প্রাপ্ত হচ্ছেন সেখানে যান। (৬৬) আমি লূতকে এ বিষয় পরিজ্ঞাত করে দেই যে, সকাল হলেই তাদেরকে সমূলে বিনাশ করে দেওয়া হবে। (৬৭) শহরবাসীরা আনন্দ-উল্লাস করতে করতে পৌঁছল। (৬৮) লূত বললেন ঃ তারা আমার মেহমান। অতএব আমাকে লাঞ্ছিত করো না। (৬৯) তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার ইয্‌যত নষ্ট করো না। (৭০) তারা বলল ঃ আমরা কি আপনাকে জগদ্বাসীর সমর্থন করতে নিষেধ করিনি। (৭১) তিনি বললেন ঃ যদি তোমরা একান্ত কিছু করতেই চাও, তবে আমার কন্যারা উপস্থিত আছে। (৭২) আপনার প্রাণের কসম, তারা আপন নেশায় প্রমত্ত ছিল। (৭৩) অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় তাদেরকে প্রচণ্ড একটি শব্দ এসে পাকড়াও করল। (৭৪) অতঃপর আমি জনপদটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর কংকরের প্রস্তর বর্ষণ করলাম। (৭৫) নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য

নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৭৬) জনপদটি সোজা পথে অবস্থিত রয়েছে। (৭৭) নিশ্চয় এতে ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন আছে ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে মুহাম্মদ) আপনি তাদেরকে ইবরাহীম (আ)-এর মেহমানদের (কাহিনীর)-ও সংবাদ দিন। (ঘটনাটি তখন ঘটেছিল) যখন তারা [মেহমানরা—যারা বাস্তবে ফেরেশতা ছিল এবং মানবাকৃতিতে আসার কারণে হযরত ইবরাহীম তাদেরকে মেহ্মান মনে করেন। তাঁর অর্থাৎ ইবরাহীম (আ)-এর] কাছে আগমন করল। অতঃপর (এসে) তারা আসসালামু আলাইকুম বলল। [ইবরাহীম (আ) তাদেরকে মেহমান মনে করে তৎক্ষণাত আহার্য প্রস্তুত করে আনলেন। কিন্তু যেহেতু তারা ছিল ফেরেশতা, তাই তারা আহার করল না। তখন] ইবরাহীম (আ) মনে মনে ভয় পেলেন যে, তারা আহার করে না কেন ? তারা মানবাকৃতিতে ফেরেশতা ছিল বলে তিনি তাদেরকে মানবই মনে করলেন এবং আহার না করায় সন্দেহ করলেন যে তারা শত্রু না হয়ে এবং) বলতে লাগলেন ঃ আমরা আপনাদের ব্যাপারে ভীত। তারা বলল ঃ আপনি ভয় করবেন না। কেননা, আমরা (ফেরেশতা। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি সুসংবাদ নিয়ে আগমন করেছি এবং) আপনাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। সে অত্যন্ত জ্ঞানী হবে। [অর্থাৎ নবী হবে। কেননা, মানব জাতির মধ্যে পয়গম্বরগণই সর্বাধিক জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'পুত্র সন্তান বলে হযরত ইসহাক (আ) কে বোঝানো হয়েছে। অন্যান্য আয়াতে হযরত ইসহাকের সাথে ইয়াকুবের সুসংবাদও বর্ণিত রয়েছে।] ইবরাহীম (আ) বলতে লাগলেন ঃ আপনারা কি এমতাবস্থায় (পুত্রের) সুসংবাদ দিচ্ছেন, যখন আমি বার্ধক্যে পৌঁছে গেছি ? অতএব (এমতাবস্থায় আমাকে) কিসের সুসংবাদ দিচ্ছেন ? (উদ্দেশ্য এই যে, ব্যাপারটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে বিস্ময়কর। এ অর্থ নয় যে, কুদরতের বাইরে।) তারা (ফেরেশতাগণ) বলল ঃ আমরা আপনাকে বাস্তব বিষয়ের সুসংবাদ দিচ্ছি (অর্থাৎ সন্তানের জন্মগ্রহণ নিশ্চিতই হবে)। অতএব আপনি নিরাশ হবেন না। (অর্থাৎ নিজের বার্ধক্যের প্রতি দৃষ্টি দেবেন না। কারণ, প্রচলিত কার্য-কারণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে নৈরাশ্যের চিহ্ন প্রবল হতে থাকে।) ইবরাহীম (আ) বললেন ঃ পালনকর্তার রহমত থেকে কে নিরাশ হয় পথভ্রষ্ট লোকদের ছাড়া ? (অর্থাৎ আমি নবী হয়ে পথভ্রষ্টদের বিশেষণে কিরূপে বিশেষিত হতে পারি ? ব্যাপারটি যে বিচিত্র, আমার এ বক্তব্যের শুধু তাই উদ্দেশ্য। আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য এবং আমি এ বিষয়ে আশাতীত বিশ্বাসী। এরপর নবুয়তের অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তিনি জানতে পারলেন যে, ফেরেশতাদের আগমনের উদ্দেশ্য আরও কোন গুরুতর ব্যাপার হবে। তাই) বলতে লাগলেন ঃ (যখন ইঙ্গিত দ্বারা আমি জানতে পেরেছি যে, আপনাদের আগমনের আরও উদ্দেশ্য রয়েছে, তখন বলুন) এখন আপনাদের সামনে কি গুরুদায়িত্ব আছে হে ফেরেশতাগণ! ফেরেশতাগণ বলল ঃ আমরা একটি অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি (তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য) প্রেরিত হয়েছি (অর্থাৎ লূতের সম্প্রদায়) কিন্তু লূত (আ)-এর পরিবার-পরিজন ছাড়া। আমরা তাদের সবাইকে (আযাব থেকে) বাঁচিয়ে রাখব

(অর্থাৎ তাদেরকে আত্মরক্ষার পদ্ধতি বলে দেব যে, অপরাধীদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাও) তার (অর্থাৎ লূতের) স্ত্রীকে ছাড়া। তার সম্পর্কে আমরা নির্ধারিত করে রেখেছি যে, সে অবশ্যই অপরাধী সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে যাবে (এবং তাদের সাথে আযাবে পতিত হবে)। অতঃপর যখন ফেরেশতারা লূত (আ)-এর পরিবারের কাছে আগমন করল, (তখন যেহেতু তারা মানবাকৃতিতে ছিল, তাই লূত) বলতে লাগলেন : (মনে হয়) আপনারা অপরিচিত লোক (দেখুন, শহরবাসীরা আপনাদের সাথে কি ব্যবহার করে! কারণ, তারা অপরিচিতদেরকে উত্ত্যক্ত করে থাকে।) তারা বলল : না (আমরা মানুষ নই); বরং আমরা (ফেরেশতা) আপনার কাছে ঐ বস্তু (অর্থাৎ ঐ আযাব) নিয়ে এসেছি, যে সম্পর্কে তারা সন্দেহ করত আর আমরা আপনার কাছে অকাট্য বিষয় (অর্থাৎ আযাব) নিয়ে এসেছি এবং আমরা (এ সংবাদ প্রদানে) সম্পূর্ণ সত্যবাদী। অতএব আপনি রাত্রির কোন অংশে পরিবারের সকলকে নিয়ে (এখান থেকে) চলে যান এবং আপনি সবার পেছনে চলুন (যাতে কেউ থেকে না যায় অথবা ফিরে না যায় এবং আপনার ভয়ে কেউ পিছন ফিরে না তাকায়। কারণ পিছন ফিরে তাকানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে।) এবং আপনাদের মধ্যে থেকেও কেউ যেন পিছন ফিরে না তাকায় (অর্থাৎ সবাই দ্রুত প্রস্থান করবে) এবং যেখানে যাওয়ার আদেশ প্রাপ্ত হন, সেখানে যাবেন। (তফসীর দুররে-মনসূরে সুদ্দীর বরাত দিয়ে বর্ণিত রয়েছে যে, তাদেরকে সিরিয়ার দিকে হিজরত করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আমি (এই ফেরেশতাদের মাধ্যমে) লূত (আ) এর কাছে নির্দেশ পাঠাই যে, ভোর হওয়া মাত্রই তাদের সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দেওয়া হবে (অর্থাৎ তারা সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে। ফেরেশতাদের এই কথাবার্তা ঐ ঘটনার পরে হয়েছে, যা পরে বর্ণিত হচ্ছে। কিন্তু অগ্রে উল্লেখ করার কারণ এই যে, ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য যাতে পূর্বেই গুরুত্ব সহকারে জানা হয়ে যায়। ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হল অবাধ্যদের আযাব ও অনুগতদের মুক্তি ও সাফল্য ফুটিয়ে তোলা। পরবর্তী ঘটনা এই) এবং শহরবাসীরা (লূতের গৃহে সুদর্শন কয়েকজন কিশোরের আগমনের সংবাদ শুনে) আনন্দ উল্লাস করতে করতে (মন্দ নিয়ত ও কু-ইচ্ছা সহকারে লূতের গৃহে) পৌঁছল। লূত [(আ) এখন পর্যন্ত তাদেরকে মানব সন্তান ও মেহমানই মনে করছিলেন। তিনি শহরবাসীদের কু-মতলব টের পেয়ে] বললেন : তারা আমার মেহমান। (তাদেরকে উত্ত্যক্ত করে) আমাকে (সাধারণের মধ্যে) লাঞ্ছিত করো না। (কেননা, মেহমানকে অপমান করলে মেজবানের অপমান হয়। যদি এই বিদেশীদের প্রতি তোমাদের করুণা নাও হয়, তবে কমপক্ষে আমার কথা চিন্তা কর। আমি তোমাদের এ জনপদেরই অধিবাসী। এছাড়া তোমরা যে মতলব নিয়ে এসেছো, তা আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও গযবের কারণ। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমাকে (মেহমানদের দৃষ্টিতে) হেয় করো না। (কারণ মেহমানরা মনে করবে যে, নিজের জনপদের লোকদের মধ্যেও তার কোন মানমর্যাদা নেই।) তারা বলতে লাগল : (এ অপমান আমাদের পক্ষ থেকে নয়। আপনি নিজেই তা উপার্জন করেছেন যে, তাদেরকে মেহমান করেছেন।) আমরা কি আপনাকে সারা দুনিয়ার মানুষকে মেহমান করা থেকে (বার বার) নিষেধ করিনি? (আপনি তাদেরকে মেহমান না করলে এ অপমানের মুখ দেখতে হতো না।) লূত (আ) বললেন : (আচ্ছা বল তো) এই ন্যক্কারজনক কাণ্ড করার কি প্রয়োজন, যে কারণে আমার

পক্ষে কাউকে মেহমান করারও অনুমতি দেওয়া হয় না? স্বভাবগত কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য আমার এই (বউ) কন্যারা (যারা তোমাদের গৃহে আছে) বিদ্যমান রয়েছে। যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর, (তবে ভদ্রোচিত পন্থায় নিজ নিজ স্ত্রীর সাথে মতলব পূর্ণ কর। কিন্তু চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী।) আপনার প্রাণের কসম তারা আপন নেশায় প্রমত্ত ছিল। অতএব সূর্যোদয় হতে হতে ভীষণ শব্দ তাদেরকে চেপে ধরল। (এ হচ্ছে مشرقين এর তরজমা। এর আগে مصبحين শব্দ বলা হয়েছে, যার অর্থ 'ভোর হতে হতে'। উভয় অর্থের সমন্বয় এভাবে সম্ভবপর যে, ভোর থেকে শুরু হয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত শেষ হয়েছে।) অতঃপর (এই ভীষণ শব্দের পর) আমি এই জনপদে (যমীন উল্টিয়ে তার) উপরিভাগকে নিচে (এবং নিচের ভাগকে উপরে) করে দিলাম এবং তাদের উপর কংকর প্রস্তর বর্ষণ করতে শুরু করলাম। এ ঘটনায় চক্ষুষ্মানদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। (যেমন প্রথমত মন্দ কাজের পরিণাম অবশেষে মন্দ হয়। কিছু দিনের অবকাশ পেলে তাতে ধোঁকা খাওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, চিরস্থায়ী ও অক্ষয় সুখ এবং ইয্যত একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। তৃতীয়ত, আল্লাহ্‌র কুদরতকে মানুষের শক্তি-সামর্থ্যের নিরিখে বিচার করে ধোঁকায় পড়া উচিত নয়। সব কিছুই আল্লাহ্‌র কুদরতের অধীন। তিনি বাহ্যিক কারণের বিপরীতেও যা ইচ্ছা করতে পারেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিশেষ সম্মান ঃ لَعَمْرُكَ— রূহুল মা'আনীতে অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, لَعَمْرُكَ-এর মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা) কে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আয়ুর কসম খেয়েছেন। বায়হাকী দালায়েলুন্নবুওয়াত গ্রন্থে এবং আবূ নয়ীম ও ইবনে মরদুওয়াইহ্ প্রমুখ তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টজগতের মধ্যে কাউকে মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-র চাইতে অধিক সম্মান ও মর্যাদা দান করেন নি। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা কোন পয়গম্বর অথবা ফেরেশতার আয়ুর কসম খাননি। এবং আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আয়ুর কসম খেয়েছেন। এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়।

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের কসম খাওয়া ঃ আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলী ছাড়া অন্য কোন কিছুর কসম খাওয়া কোন মানুষের জন্য বৈধ নয়। কেননা, কসম এমন জনের খাওয়া হয়, যাকে সর্বাধিক বড় মনে করা হয়। বলা বাহুল্য, সর্বাধিক বড় একমাত্র আল্লাহ্ তা-'আলাই হতে পারেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ পিতামাতা ও দেবদেবীর নামে কসম খেয়ো না এবং আল্লাহ্ ছাড়া কোন কিছুর কসম খেয়ো না। আল্লাহ্‌র কসমও তখনই খেতে পার যখন তুমি নিজ বক্তব্যে সত্যবাদী হও।—(আবূ দাউদ, নাসায়ী)

বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ওমর (রা)-কে পিতার কসম খেতে দেখে বললেনঃ খবরদার, আল্লাহ্ তা'আলা পিতার কসম খেতে নিষেধ করেছেন। কারও কসম করতে হলে আল্লাহ্‌র নামে কসম করবে। নতুবা চুপ থাকবে। —(কুরতুবী-মায়েদা)

কিন্তু এ বিধান সাধারণ সৃষ্টজীবের জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং সৃষ্টজীবের মধ্য থেকে বিভিন্ন বস্তুর কসম খেয়েছেন। এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। এর উদ্দেশ্য কোন বিশেষ দিক দিয়ে ঐ বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহোপকারী হওয়া বর্ণনা করা। যে কারণে সাধারণ মানুষকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কসম খেতে নিষেধ করা হয়েছে, তা এক্ষেত্রে বিদ্যমান নেই। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার কালামে এরূপ কোন সম্ভাবনা নেই যে, তিনি নিজের কোন সৃষ্ট বস্তুকে সর্বাধিক বড় ও শ্রেষ্ঠ মনে করবেন। কারণ, মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র সত্তার জন্য নির্দিষ্ট।

যেসব বস্তির উপর আযাব এসেছে, সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিতঃ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ এতে আল্লাহ্ তা'আলা সেসব জনপদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আরব থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে এসব জনপদ অবস্থিত। এতদসঙ্গে আরও বলেছেন যে, এগুলোতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির বিরাট নিদর্শনাবলী রয়েছে।

অন্য এক আয়াতে এসব জনপদ সম্পর্কে আরও বলেছেন যে, لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ---অর্থাৎ এসব জনপদ আল্লাহ্‌র আযাবের ফলে জনশূন্য হওয়ার পর পুনর্বার আবাদ হয়নি। তবে কয়েকটি জনপদ এর ব্যতিক্রম। এ সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ সব জনপদ ও তাদের ঘর-বাড়ীকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য শিক্ষার উপকরণ করেছেন।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন এসব স্থান অতিক্রম করেছেন, তখন আল্লাহ্‌র ভয়ে তাঁর মস্তক নত হয়ে গেছে এবং তিনি সওয়ারীর উটকে দ্রুত হাঁকিয়ে সেসব স্থান পার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ কর্মের ফলে একটি সুন্নত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তা এই যে, যেসব স্থানে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব এসেছে, সেগুলোকে তামাশার ক্ষেত্রে পরিণত করা খুবই পাষাণ হৃদয়ের কাজ। বরং এগুলো থেকে শিক্ষা লাভ করার পন্থা এই যে, সেখানে পৌঁছে আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির কথা ধ্যান করতে হবে এবং অন্তরে তাঁর আযাবের ভীতি সঞ্চার করতে হবে।

কোরআন পাকের বক্তব্য অনুযায়ী লূত (আ)-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহ আজও আরব থেকে সিরিয়াগামী রাস্তার পার্শ্বে জর্দানের এলাকায় সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে যথেষ্ট

নিচের দিকে একটি বিরাট মরুভূমির আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এর একটি বিরাট পরিধিতে বিশেষ এক প্রকার পানি নদীর আকার ধারণ করে আছে। এ পানিতে কোন মাছ, ব্যাঙ, ইত্যাদি জন্তু জীবিত থাকতে পারে না। এ জন্যই একে 'মৃত সাগর' ও 'লূত সাগর' নামে অভিহিত করা হয়। অনুসন্ধানের পর জানা গেছে যে, এতে পানির অংশ খুব কম এবং তৈল জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। তাই এতে কোন সামুদ্রিক জন্তু জীবিত থাকতে পারে না।

আজকাল প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে এখানে কিছুসংখ্যক আবাসিক দালানকোঠা ও হোটেল নির্মাণ করা হয়েছে। পরকাল থেকে উদাসীন বস্তুবাদী মানুষ একে পর্যটন ক্ষেত্রে পরিণত করে রেখেছে। তারা নিছক তামাশা হিসেবে এ সব এলাকা দেখার জন্য গমন করে। এহেন উদাসীনতার প্রতিকারার্থে কোরআন পাক অবশেষে বলেছে: إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ —অর্থাৎ এসব ঘটনা ও ঘটনাস্থল প্রকৃতপক্ষে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মু'মিনদের জন্য শিক্ষাদায়ক। একমাত্র ঈমানদাররাই এ শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হয় এবং অন্যরা এসব স্থানকে নিছক তামাশার দৃষ্টিতে দেখে চলে যায়।

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ ﴿٧٩﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿٨٢﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾

(৭৮) নিশ্চয় গহীন বনের অধিবাসীরা পাপী ছিল। (৭৯) অতঃপর আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। উভয় বস্তি প্রকাশ্য রাস্তার উপর অবস্থিত। (৮০) নিশ্চয় হিজরের বাসিন্দারা পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। (৮১) আমি তাদেরকে নিজের নিদর্শনাবলী দিয়েছি। অতঃপর তারা এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

(৮২) তারা পাহাড়ে নিশ্চিন্তে ঘর খোদাই করত। (৮৩) অতঃপর এক প্রত্যূষে তাদের উপর একটা শব্দ এসে আঘাত করল। (৮৪) তখন কোন উপকারে আসল না যা তারা উপার্জন করেছিল। (৮৫) আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যা আছে তা তাৎপর্যহীন সৃষ্টি করিনি। কিয়ামত অবশ্যই আসবে। অতএব পরম ঔদাসীন্যের সাথে ওদের ক্রিয়াকর্ম উপেক্ষা করুন। (৮৬) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

বনের অধিবাসী ও হিজরের অধিবাসীদের কাহিনী ঃ এবং বনের অধিবাসীরা [অর্থাৎ শোয়াইব (আ)-এর উম্মতও] বড় যালিম ছিল। অতএব আমি তাদের কাছ থেকে (ও) প্রতিশোধ নিয়েছি (এবং তাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করেছি)। উভয় (সম্প্রদায়ের) জনপদ প্রকাশ্য সড়কের উপর (অবস্থিত) রয়েছে। (সিরিয়া যাওয়ার পড়ে তা দৃষ্টিগোচর হয়।) এবং হিজরের অধিবাসীরা (ও) পয়গম্বরগণকে মিথ্যা বলেছে। [কারণ, সালেহ্ (আ)-কে তারা মিথ্যা বলেছে আর যেহেতু সব পয়গম্বরের ধর্ম এক, কাজেই তারা যেন সব পয়গম্বরকেই মিথ্যা বলে।] আমি তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী দিয়েছি [যেগুলো দ্বারা আল্লাহ্‌র একত্ব এবং সালেহ্ (আ)-এর নবুয়ত প্রমাণিত হত। উদাহরণত তওহীদের প্রমাণাদি এবং সালেহ্ (আ)-এর মু'যিজা তথা উষ্ট্রী।] অতঃপর তারা এগুলো (অর্থাৎ নিদর্শনাবলী) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা পর্বত খোদাই করে তাতে গৃহ নির্মাণ করত, যাতে (এগুলোতে বিপদাপদ থেকে) শান্তিতে বসবাস করতে পারে। অতঃপর তাদেরকে প্রত্যূষে (প্রত্যূষের শুরুতে কিংবা সূর্যোদয়ের পর) বিকট শব্দ এসে পাকড়াও করল। অতঃপর তাদের (পার্থিব) নৈপুণ্য তাদের কোন কাজে লাগল না (মজবুত গৃহের মধ্যেই আযাব দ্বারা ধরাশায়ী হয়ে গেল এবং তাদের গৃহ এ বিপদ থেকে তাদেরকে বাঁচাতে পারল না। তাদের বরং এরূপ বিপদ আসবে বলে কল্পনাই ছিল না। থাকলেও বা কি করতে পারত!)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ايكة —শব্দের অর্থ বন ও ঘন জঙ্গল। কেউ কেউ বলেন ঃ মাদইয়ানের সন্নিকটে একটি বন ছিল। এজন্য মাদইয়ানবাসীদেরই উপাধি হচ্ছে **ايكة**। কেউ কেউ বলেন ঃ আসহাবে-আইকা ও আসহাবে-মাদইয়ান দুটি পৃথক পৃথক সম্প্রদায়। এক সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ার পর শোয়াইব (আ) অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হন।

তফসীর রূহুল মা'আনীতে ইবনে আসাকেরের বরাত দিয়ে নিম্নোক্ত মরফু হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

ان مدين و اصحاب الايكة امتان بعث الله تعالى اليهما شعيبا والله اعلم

'হিজ্‌র' হিজায ও সিরিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি উপত্যকাকে বলা হয়। এখানে সামূদ গোত্রের বসতি ছিল।

সূরার শুরুতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি মক্কার কাফিরদের তীব্র শত্রুতা ও বিরোধিতা বর্ণিত হয়েছিল। এর সাথে সংক্ষেপে তাঁর সান্ত্বনার বিষয়বস্তুও উল্লেখ করা হয়েছিল। এখন সূরার উপসংহারে উপরোক্ত শত্রুতা ও বিরোধিতা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সান্ত্বনার বিস্তারিত বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হচ্ছে। বলা হয়েছে ঃ

অবশিষ্ট তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং [হে মুহাম্মদ (সা) আপনি তাদের শত্রুতার কারণে দুঃখিত হবেন না। কেননা এক দিন এর মীমাংসা হবে। সেদিন হচ্ছে কিয়ামতের দিন, যার আগমন সম্পর্কে আমি আপনাকে বলছি যে,] আমি নভোমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বস্তু-সমূহকে উপকারিতা ছাড়াই সৃষ্টি করিনি, (বরং এই উপকারার্থে সৃষ্টি করেছি যে, এগুলোকে দেখে মানুষ বিশ্ব স্রষ্টার অস্তিত্ব, একত্ব ও মহত্ত্ব সপ্রমাণ করবে এবং তাঁর বিধি-বিধান পালন করবে। পক্ষান্তরে এ প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও যারা এরূপ করবে না, তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।) এবং (দুনিয়াতে সম্পূর্ণ শাস্তি হয় না। কাজেই অন্য কোথাও হওয়া উচিত। এর জন্য কিয়ামত নির্দিষ্ট রয়েছে। সুতরাং) অবশ্যই কিয়া-মত আগমন করবে। (সেখানে সবাইকে ভোগানো হবে। অতএব আপনি মোটেই দুঃখিত হবেন না ; বরং) উত্তম পন্থায় (তাদের অনাচার) মার্জনা করুন। (মার্জনার উদ্দেশ্য এই যে, এ চিন্তায় পড়বেন না এবং এ ব্যাপারে ভাববেন না। উত্তম পন্থা এই যে, অভি-যোগও করবেন না। কেননা) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা (যেহেতু) মহান স্রষ্টা, (এ থেকে প্রমাণিত হয় যে) তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী (ও। সবার অবস্থা তিনি জানেন---আপনার সবরের এবং তাদের অনাচার উভয়টিই। আর ওদের নিকট থেকে পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।)

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ﴿٨٧﴾ لَا تَمُدَّنَّ
عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ
جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾ وَقُلْ اِنِّيْۤ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٩﴾ كَمَاۤ
اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ﴿٩٠﴾ الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ﴿٩١﴾ فَوَرَبِّكَ
لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَاصْدَعْ بِمَا
تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٤﴾ اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ﴿٩٥﴾

الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ﴿٩٩﴾

(৮৭) আমি আপনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কোরআন দিয়েছি। (৮৮) আপনি চক্ষু তুলে ঐ বস্তুর প্রতি দেখবেন না, যা আমি তাদের মধ্যে কয়েক প্রকার লোককে ভোগ করার জন্য দিয়েছি, তাদের জন্য চিন্তিত হবেন না আর ঈমানদারদের জন্য স্বীয় বাহু নত করুন। (৮৯) আর বলুনঃ আমি প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক। (৯০) যেমন আমি নাযিল করেছি যারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত তাদের উপর। (৯১) যারা কোরআনকে খণ্ড খণ্ড করেছে। (৯২) অতএব আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব (৯৩) ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে। (৯৪) অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না। (৯৫) বিদ্রূপকারীদের জন্য আমি আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট। (৯৬) যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে। অতএব অতিসত্বর তারা জেনে নেবে। (৯৭) আমি জানি যে, আপনি তাদের কথাবার্তায় হতোদ্যম হয়ে পড়েন। (৯৮) অতএব আপনি পালনকর্তার সৌন্দর্য স্মরণ করুন এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। (৯৯) এবং পালনকর্তার ইবাদত করুন, যে পর্যন্ত আপনার কাছে নিশ্চিত কথা না আসে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (আপনি তাদের ব্যবহার দেখবেন না। কারণ, তা দুঃখের কারণ হয়। আমার ব্যবহার আপনার সাথে দেখুন যে, আমার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি কিরূপ কৃপা ও অনুকম্পা হয়েছে। সেমতে) আমি আপনাকে (একটি বিরাট নিয়ামত অর্থাৎ) সাতটি আয়াত দিয়েছি, যা (নামাযে) বার বার আবৃত্তি করা হয় এবং (তা মহান বিষয়বস্তু সম্বলিত হওয়ার কারণে এ দেওয়াকে এরূপ বলা যেতে পারে যে,) মহান কোরআন দিয়েছি। (এখানে সূরা ফাতিহা বোঝানো হয়েছে। একটি মহান সূরা হওয়ার কারণে এর নাম উম্মুল কোরআনও অর্থাৎ কোরআনের মূল। সুতরাং এই নিয়ামত ও নিয়ামতদাতার প্রতি দৃষ্টি রাখুন, যাতে আপনার অন্তর প্রফুল্ল ও প্রশান্ত হয়। তাদের শত্রুতা ও বিরোধিতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না এবং) আপনি চক্ষু তুলেও ঐ বস্তুর প্রতি দেখবেন না (না আফসোসের দৃষ্টিতে এবং না অসন্তুষ্টির দৃষ্টিতে) যা আমি বিভিন্ন প্রকার কাফিরদেরকে (যেমন ইহুদী, খৃস্টান, অগ্নিপূজারী ও মুশরিকদেরকে) ভোগ করার জন্য দিয়ে রেখেছি (এবং অতিশীঘ্র তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে) এবং তাদের (কুফরী অবস্থার) কারণে (মোটেই) চিন্তা করবেন না। (অসন্তুষ্টির

দৃষ্টিতে দেখার অর্থ এই যে, তারা আল্লাহ্‌র দুশমন বিধায় 'বুগ্য ফিল্লাহ্' বশত রাগান্বিত হওয়া যে, এরূপ নিয়ামত তাদের কাছে না থাকলে ভাল হত। এর জওয়াবের প্রতি لَاتَمُدَّنَّ বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এটা কোন বিরাট ধনসম্পদ নয় যে, তাদের কাছে না থাকলে ভাল হত। এটা তো ধ্বংসশীল সম্পদ, অতি দ্রুত হাত ছাড়া হয়ে যাবে। আফসোসের দৃষ্টিতে দেখার অর্থ এই যে, আফসোস, এসব বস্তু তাদের ঈমানের পথে বাধা হয়ে রয়েছে। এগুলো না থাকলে সম্ভবত তারা বিশ্বাস স্থাপন করত। لَا تَحْزَنْ-এ এর উত্তর রয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, শত্রুতা এদের স্বভাবধর্ম। এদের কাছ থেকে কোন আশাই করা যায় না। আশার বিপরীত হলে চিন্তা করা হয়। যখন আশাই নেই, তখন চিন্তা অনর্থক। আপনার পক্ষ থেকে লোভ-লালসার দৃষ্টিতে দেখার তো সম্ভাবনা নেই। মোটকথা, আপনি কোন দিক দিয়েই এ কাফিরদের চিন্তা-ভাবনায় পড়বেন না) এবং মুসলমানদের সাথে সদয় ব্যবহার করুন। (অর্থাৎ কল্যাণ চিন্তা ও দয়ার জন্য মুসলমানরা যথেষ্ট। এতে তাদের উপকারও রয়েছে) এবং (কাফিরদের জন্য কল্যাণ চিন্তা করে যেহেতু কোন ফল পাওয়া যাবে না, তাই তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবেন না। তবে প্রচার কাজ আপনার মহান দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে থাকুন এবং এতটুকু) বলে দিন ঃ আমি (তোমাদের আল্লাহ্‌র আযাবের) সুস্পষ্ট ভীতিপ্রদর্শক। (এবং আমি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একথা তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি যে, আমার পয়গম্বর যে আযাবের ভয় দেখান, আমি কোন সময় তোমাদের উপর তা অবশ্যই নাযিল করব) যেমন আমি (এই আযাব) তাদের ওপর (বিভিন্ন সময়ে) নাযিল করেছি, যারা (আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান কে) ভাগ-বাটোয়ারা করে রেখেছিল অর্থাৎ ঐশীগ্রন্থের বিভিন্ন অংশ স্থির করেছিল (তন্মধ্যে যে অংশ মর্জিমাফিক হত তা মেনে নিত এবং যে অংশ মর্জির খিলাফ হত, তা অস্বীকার করত। এখানে পূর্ববর্তী ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে বোঝানো হয়েছে। পয়গম্বরগণের বিরোধিতার কারণে তাদের উপর বিভিন্ন আযাব অবতরণ —যেমন আকৃতি পরিবর্তন করে বানর ও শূকরে পরিণত করা, জেল, হত্যা ইত্যাদি সুবিদিত ছিল। উদ্দেশ্য এই যে, আযাব নাযিল হওয়া অসম্ভব নয়। পূর্বেও নাযিল হয়েছে। তোমাদের উপরেও নাযিল হয়ে গেলে তাতে আশ্চর্যের কি আছে— দুনিয়াতে হোক কিংবা পরকালে। উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, পূর্ববর্তীরা পয়গম্বরগণের বিরোধিতার কারণে যেমন আযাবের যোগ্য হয়েছিল, তেমনি বর্তমান লোকেরাও আযাবের যোগ্য হয়ে গেছে।) অতএব [হে মুহাম্মদ (সা)] আপনার পালনকর্তার (অর্থাৎ আমার নিজের) কসম, আমি সবাই (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী)-কে তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন) অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব (অতঃপর প্রত্যেককে তার উপযুক্ত শাস্তি দেব।) মোটকথা, আপনাকে যে বিষয়ের (অর্থাৎ যে বিষয় পৌঁছানোর) আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা পরিষ্কার করে শুনিয়ে দিন এবং (যদি তারা না মানে, তবে) মুশরিকদের (এ অবাধ্যতার মোটেই) পরওয়া করবেন না (অর্থাৎ দুঃখ করবেন না, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে لَا تَحْزَنْ এবং স্বাভাবিকভাবে ভীত হবেন না যে, শত্রুরা সংখ্যায় অনেক।

কেননা) এরা যারা (আপনার ও আল্লাহ্‌র দুশমন; অতএব আপনার সাথে) বিদ্রূপ করে (এবং) আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্য উপাস্য শরীক করে, তাদের (অনিষ্ট ও পীড়ন) থেকে আপনার জন্য (অর্থাৎ আপনাকে নিরাপদ রাখার জন্য এবং তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য) আমিই যথেষ্ট। অতএব তারা অতিসত্বর জানতে পারবে (যে, বিদ্রূপ ও শিরকের কি পরিণাম হয়। মোটকথা, আমি যখন যথেষ্ট তখন ভয় কিসের?) এবং নিশ্চয় আমি জানি যে, তারা যেসব (কুফরী ও বিদ্রূপের) কথাবার্তা বলে, তাতে আপনার মন ছোট হয়ে যায়। (এটা স্বাভাবিক) অতএব (এর প্রতিকার এই যে,) আপনি পালনকর্তার তসবীহ্ ও প্রশংসা পাঠ করতে থাকুন, নামায আদায়কারীদের মধ্যে থাকুন এবং আপন পালনকর্তার ইবাদতে লেগে থাকুন, যে পর্যন্ত (এ অবস্থার মধ্যেই) আপনার মৃত্যু না এসে যায়। (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত যিকর ও ইবাদতে মশগুল থাকুন। কেননা আল্লাহ্‌র যিকির ও ইবাদতে পরকালের সওয়াব তো পাওয়াই যায়, এর ফলে দুনিয়ার কষ্ট, চিন্তা এবং বিপদাপদও লাঘব হয়ে যায়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ফাতিহা সমগ্র কোরআনের মূল অংশ ও সারমর্ম : আলোচ্য আয়াতসমূহে সূরা ফাতিহাকে 'মহান কোরআন' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সূরা ফাতিহা এক দিক দিয়ে সমগ্র কোরআন। কেননা, ইসলামের সব মূলনীতি এতে ব্যক্ত হয়েছে।

হাশরে কি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হবে? : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ পবিত্র সত্তার কসম খেয়ে বলেছেন যে, সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোককে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

সাহাবায়ে কিরাম রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করলেন যে, এই জিজ্ঞাসাবাদ কি বিষয় সম্পর্কে হবে? তিনি বললেন : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র উক্তি সম্পর্কে। তফসীরে কুরতুবীতে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলা হয়েছে : আমাদের মতে এর অর্থ অঙ্গীকারকে কার্যক্ষেত্রে পূর্ণ করা, যার শিরোনাম হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।' শুধু মৌখিক উচ্চারণ উদ্দেশ্য নয়। কেননা মৌখিক স্বীকারোক্তি তো মুনাফিকরাও করত। হযরত হাসান বসরী (রহ) বলেন, ঈমান কোন বিশেষ বেশভূষা ও আকার-আকৃতি ধারণ করা দ্বারা এবং ধর্ম শুধু কামনা দ্বারা গঠিত হয় না। বরং ঐ বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়, যা অন্তরের অন্তঃস্থলে আসন লাভ করে এবং কর্ম তার সত্যায়ন করে; যেমন যায়েদ ইবনে আরকাম বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আন্তরিকতা সহকারে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উচ্চারণ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ এ বাক্যে আন্তরিকতার অর্থ কি? তিনি বললেন : যখন এ বাক্য মানুষকে আল্লাহ্‌র হারাম ও অবৈধ কর্ম থেকে বিরত রাখবে, তখন তা আন্তরিকতা সহকারে হবে।—(কুরতুবী)

প্রচারকার্যে সাধ্যানুযায়ী ক্রমোন্নতি : فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ —এ

আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম গোপনে গোপনে ইবাদত ও তিলাওয়াত করতেন এবং প্রচারকর্মও সংগোপনে একজন দুইজনের মধ্যে চালু ছিল। কেননা খোলাখুলি প্রচারকার্যে কাফিরদের পক্ষ থেকে উৎপীড়নের আশংকা ছিল। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী ও উৎপীড়নকারী কাফিরদের উৎপীড়ন থেকে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। তাই তখন থেকে নিশ্চিন্তে প্রকাশ্যভাবে তিলাওয়াত, ইবাদত ও প্রচারকার্য শুরু হয়।

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ —বাক্যে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের নেতা ছিল পাঁচ ব্যক্তি : আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে আবদে এয়াগুস, ওলীদ ইবনে মুগীরা এবং হারিস ইবনে তালাতিলা। এই পাঁচ-জনই অলৌকিকভাবে একই সময়ে হযরত জিবরাঈলের হস্তক্ষেপে মৃত্যুবরণ করে। এ ঘটনা থেকে প্রচার ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে এই নীতি জানা গেল যে, যে ক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে সত্যকথা বললে কোন উপকার আশা করা যায় না, পরন্তু বক্তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকে, সেখানে গোপনে সত্য প্রচার করাও দুরস্ত ও বৈধ। তবে যখন প্রকাশ্যভাবে বলার শক্তি অর্জিত হয়, তখন প্রকাশ্যভাবেই বলা উচিত।

শত্রুর উৎপীড়নের কারণে মন ছোট হওয়ার প্রতিকার : وَلَقَدْ نَعْلَمُ

আয়াত থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি শত্রুর অন্যায় আচরণে মনে কষ্ট পায় এবং হতোদ্যম হয়ে পড়ে, তবে এর আত্মিক প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার তসবীহ্ ও ইবাদতে মশগুল হয়ে যাওয়া। আল্লাহ্ স্বয়ং তার কষ্ট দূর করে দেবেন।

—

সূরা নাহ্‌ল

মক্কায় অবতীর্ণ, ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝۱ يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اَنْ اَنْذِرُوْۤا اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ۝۲

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আল্লাহ্‌র নির্দেশ এসে গেছে। অতএব এর জন্য তাড়াহুড়া করো না। ওরা যেসব শরীক সাব্যস্ত করছে সেসব থেকে তিনি পবিত্র ও বহু ঊর্ধ্বে। (২) তিনি স্বীয় নির্দেশে বান্দাদের মধ্যে যার কাছে ইচ্ছা, নির্দেশসহ ফেরেশতাদেরকে এই মর্মে নাযিল করেন যে, হুঁশিয়ার করে দাও, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব আমাকে ভয় কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[এ সূরার নাম সূরা নাহ্‌ল। এরূপ নামকরণের হেতু এই যে, এ সূরায় প্রকৃতির আশ্চর্যজনক কারিগরি বর্ণনা প্রসঙ্গে নাহ্‌ল অর্থাৎ মধু-মক্ষিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর অপর নাম সূরা নিআমও।—(কুরতুবী) نِعَم (নিআম) শব্দটি নিয়ামতের বহুবচন। কারণ এ সূরায় বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'আলার মহান নিয়ামত-সমূহ বর্ণিত হয়েছে।]

আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ (অর্থাৎ কাফিরদের শাস্তির সময় নিকটে) এসে গেছে। অতএব তোমরা একে (অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে) দ্রুত কামনা করো না। (বরং তওহীদ অবলম্বন কর এবং আল্লাহ্‌র স্বরূপ শোন যে) তিনি লোকদের শিরক থেকে পবিত্র ও ঊর্ধ্বে। তিনি ফেরেশতাদেরকে (অর্থাৎ ফেরেশতাদের জাত তথা জিবরাঈলকে) ওহী অর্থাৎ নির্দেশ দিয়ে বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা, (অর্থাৎ পয়গম্বরের প্রতি) নাযিল করেন

(এবং নির্দেশ এই) যে, লোকদেরকে হুঁশিয়ার করে দাও যে, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব আমাকেই ভয় কর। (অর্থাৎ আমার সাথে কাউকে অংশীদার করো না, করলে শাস্তি হবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরাকে বিশেষ কোন ভূমিকা ছাড়াই কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী ও ভয়াবহ শিরোনামে শুরু করা হয়েছে। এর কারণ ছিল মুশরিকদের এই উক্তি যে, মুহাম্মদ (সা) আমাদেরকে কিয়ামত ও আযাবের ভয় দেখায় এবং বলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জয়ী করা এবং বিরোধীদেরকে শাস্তি দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। আমাদের তো এরূপ কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। এর উত্তরে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্র নির্দেশ এসে গেছে। তোমরা তাড়াহুড়া করো না।

'আল্লাহ্র নির্দেশ' বলে এখানে এ ওয়াদা বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা রসূল (সা)-এর সাথে করেছেন যে, তাঁর শত্রুদেরকে পরাভূত করা হবে এবং মুসলমানরা বিজয়, সাহায্য ও সম্মান-প্রতিপত্তি লাভ করবে। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ভীতিপ্রদ স্বরে বলেছেন যে, আল্লাহ্র নির্দেশ এসে গেছে অর্থাৎ আসার পথেই রয়েছে, যা তোমরা অতিসত্বর দেখে নেবে।

কেউ কেউ বলেন যে, এখানে 'আল্লাহ্র নির্দেশ' বলে কিয়ামত বোঝানো হয়েছে। এর এসে যাওয়ার অর্থও এই যে, আসা অতি নিকটবর্তী। সমগ্র জগতের বয়সের দিক দিয়ে দেখলে কিয়ামতের নিকটবর্তী হওয়া কিংবা এসে পৌঁছাও দূরবর্তী বিষয় নয়।

—(বাহ্রে মুহীত)

পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা শিরক থেকে পবিত্র। এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা যে আল্লাহ্র ওয়াদাকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করছে, এটা কুফরী ও শিরক। আল্লাহ্ তা'আলা এ থেকে পবিত্র।—(বাহ্রে-মুহীত)

একটি কঠোর সতর্কবাণীর মাধ্যমে তওহীদের দাওয়াত দেওয়া এই আয়াতের সারমর্ম। দ্বিতীয় আয়াতে ইতিহাসগত দলীল দ্বারা তওহীদ প্রমাণিত হয়েছে যে, আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত দুনিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডে এবং বিভিন্ন সময়ে যে রসূলই আগমন করেছেন। তিনি জনসমক্ষে তওহীদের বিশ্বাসই পেশ করেছেন। অথচ বাহ্যিক উপায়াদির মাধ্যমে এক জনের অবস্থা ও শিক্ষা অন্য জনের মোটেই জানা ছিল না। চিন্তা করুন কমপক্ষে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মহাপুরুষ, যারা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা সবাই যখন একই বিষয়ের প্রবক্তা, তখন স্বভাবতই মানুষ একথা বুঝতে বাধ্য হয় যে, বিষয়টি ভ্রান্ত হতে পারে না। বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এককভাবে এ যুক্তিটিও যথেষ্ট।

আয়াতে روح শব্দ বলে হযরত ইবনে আব্বাসের মতে ওহী এবং অন্যান্য তফসীরবিদের মতে হিদায়েত বোঝানো হয়েছে।—(বাহ্র) এ আয়াতে তওহীদের

ইতিহাসগত প্রমাণ পেশ করার পর পরবর্তী আয়াতসমূহে তওহীদের বিশ্বাসকে যুক্তিগতভাবে আল্লাহ্ তা'আলার বিভিন্ন নিয়ামত বর্ণনা করে প্রমাণ করা হয়েছে।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝ وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ۝ وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ۚ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

(৩) যিনি যথাবিধি আকাশরাজি ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তারা যাকে শরীক করে তিনি তার বহু ঊর্ধ্বে (৪) তিনি মানবকে এক ফোঁটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। এতদসত্ত্বেও সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে গেছে। (৫) চতুষ্পদ জন্তুকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। এতে তোমাদের জন্য শীত বস্ত্রের উপকরণ আছে, আর অনেক উপকার হয়েছে এবং কিছু সংখ্যককে তোমরা আহার্যে পরিণত করে থাক। (৬) এদের দ্বারা তোমাদের সম্মান হয়, যখন বিকালে চারণ ভূমি থেকে নিয়ে আস এবং সকালে চারণ ভূমিতে নিয়ে যাও। (৭) এরা তোমাদের বোঝা এমন শহর পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত পৌঁছতে পারতে না। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু অত্যন্ত দয়ার্দ্র পরম দয়ালু। (৮) তোমাদের আরোহণের জন্য এবং শোভার জন্য তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি এমন জিনিস সৃষ্টি করেন, যা তোমরা জান না।

শব্দার্থ : خَصِيْمٌ শব্দটি خُصُومَةٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ ঝগড়াটে। انعام শব্দটি نَعَمٌ এর বহুবচন। এর অর্থ উট, ছাগল, গরু, ইত্যাদি চতুষ্পদ জন্তু— (মুফরাদাত-রাগিব)

دِفْءٌ -এর অর্থ উত্তাপ ও উত্তাপ লাভ করার বস্তু। অর্থাৎ পশম, যদ্দ্বারা গরম

বস্ত্র তৈরী করা হয়। تُرِيحُونَ শব্দটি رَوَاحٌ থেকে تَسْرَحُونَ শব্দটি سَرَاحٌ থেকে উদ্ভূত। চতুষ্পদ জন্তুর সকাল বেলায় চারণ ক্ষেত্রে গমনকে سَرَاحٌ এবং বিকাল বেলায় গৃহে প্রত্যাবর্তনকে رَوَاحٌ বলা হয়। شِقِّ الْأَنْفُسِ -এর অর্থ প্রাণান্তকর পরিশ্রম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আল্লাহ্ তা'আলা) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলকে রহস্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ওদের শিরক থেকে পবিত্র। তিনি মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সে প্রকাশ্যভাবে (আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে) তর্ক করতে লাগল। (অর্থাৎ কিছু মানুষ এমনও হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমার পক্ষ থেকে নিয়ামত আর মানুষের পক্ষ থেকে অকৃতজ্ঞতা।) এবং তিনিই চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। এগুলোতে তোমাদের শীতেরও উপকরণ আছে। (জন্তুদের পশম ও চামড়া দ্বারা মানুষের পরিধেয় পোশাক এবং কাপড় তৈরী হয়।) এবং আরও অনেক উপকারিতা আছে (দুধ দোহন, সওয়ারী করা, বোঝা পরিবহন ইত্যাদি।) এবং এগুলোর মধ্য থেকে (যেগুলো খাওয়ার যোগ্য, সেগুলোকে) ভক্ষণও কর। এগুলো তোমাদের শোভাও, যখন বিকাল বেলায় (চারণ ভূমি থেকে গৃহে) আন এবং যখন সকাল বেলায় (গৃহ থেকে চারণ ভূমিতে) ছেড়ে দাও। এগুলো তোমাদের বোঝাও (বহন করে,) এমন শহরে নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত পৌঁছতে পার না। নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা অত্যন্ত স্নেহশীল, দয়ালু (তোমাদের সুখের জন্য তিনি কত কিছু সৃষ্টি করেছেন)। ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাও সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা এগুলোয় সওয়ার হও এবং শোভার জন্যও। তিনি এমন এমন বস্তু (তোমাদের যানবাহন ইত্যাদির জন্য) সৃষ্টি করেন, যেগুলো তোমাদের জানাও নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে সৃষ্ট জগতের মহান নিদর্শনাবলী দ্বারা তওহীদ সপ্রমাণ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম সৃষ্টবস্তু নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর মানব সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, যার সেবায় আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্ট জগতকে নিয়োজিত করেছেন। মানবের সূচনা যে এক ফোঁটা নিকৃষ্ট বীর্য থেকে হয়েছে, একথা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে: فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ —অর্থাৎ এই দুর্বল মানবকে যখন বল ও বাকশক্তি দান করা হল, তখন সে আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কেই বিতর্ক উত্থাপন করতে লাগল।

এরপর ঐসব বস্তু সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে, যেগুলো মানুষের উপকারার্থেই বিশেষভাবে সৃজিত হয়েছে। কোরআন সর্বপ্রথম আরববাসীকেই সম্বোধন করেছিল। আরবদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু। তাই প্রথমে এসবের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে: وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا -

অতঃপর চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা মানুষের যেসব উপকার হয়, তন্মধ্যে দু'টি উপকার বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এক. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ—অর্থাৎ এসব জন্তুর পশম দ্বারা মানুষ বস্ত্র এবং চামড়া দ্বারা পরিধেয় ও টুপী তৈরী করে শীতকালে উত্তাপ হাসিল করে।

দুই. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ—অর্থাৎ মানুষ এসব জন্তু যবেহ্ করে খোরাকও তৈরী করতে পারে। যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন দুধ দ্বারা উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে। দুধ, দৈ, মাখন, ঘি এবং দুগ্ধজাত যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য এর অন্তর্ভুক্ত।

অন্যান্য সাধারণ উপকার বোঝার জন্য বলা হয়েছে ঃ وَمَنَافِعُ অর্থাৎ জন্তুগুলোর মাংস, চামড়া, অস্থি ও পশমের মধ্যে আরও অসংখ্য উপকারিতা নিহিত রয়েছে। এ অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে ঐ সব নবাবিষ্কৃত বস্তুর প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে, যেগুলো জৈব উপাদান দ্বারা মানুষের খাদ্য, পোশাক, ঔষধ ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে অথবা ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত হবে।

অতঃপর চতুষ্পদ জন্তুগুলোর আরও একটি উপকার আরববাসীদের রুচি অনুযায়ী বর্ণনা করা হয়েছে যে, এগুলো তোমাদের জন্য শোভা ও সৌন্দর্যের সামগ্রী; বিশেষত চতুষ্পদ জন্তু যখন বিকালে চারণ ভূমি থেকে গোশালায় প্রত্যাবর্তন করে অথবা সকালে গোশালা থেকে চারণক্ষেত্রে গমন করে। কারণ, তখন চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা মালিকদের বিশেষ শান-শওকত ও জাঁকজমক ফুটে উঠে।

পরিশেষে এসব জন্তুর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকার বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, এগুলো তোমাদের ভারী জিনিসপত্র দূর-দূরান্তের শহর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, যেখানে তোমাদের এবং তোমাদের জিনিসপত্রের পৌঁছা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত সম্ভবপর নয়। উট ও গরু বিশেষভাবে মানুষের এ সেবা বিরাটাকারে সম্পন্ন করে থাকে। আজকাল রেলগাড়ী, ট্রাক ও উড়োজাহাজের যুগেও মানুষের কাছে এরা উপেক্ষিত নয়। কারণ, এমনও অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে এসব নবাবিষ্কৃত যানবাহন অকেজো হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ বাধ্য হয়ে এসব জন্তুকে কাজে লাগায়।

أَنْعَامٌ—অর্থাৎ উট, বলদ ইত্যাদির বোঝা বহনের কথা আলোচিত হওয়ার পর ঐ সব জন্তুর কথা প্রসঙ্গত উত্থাপন করা উপযুক্ত মনে হয়েছে, যেগুলো সৃষ্ট হয়েছে সওয়ারী ও বোঝা বহনের উদ্দেশ্যে। এদের দুধ ও গোশতের সাথে মানুষের কোন উপকার সম্পৃক্ত নয়। কেননা বিভিন্ন চারিত্রিক রোগের কারণ বিধায় এগুলো শরীয়তের আইনে নিষিদ্ধ। বলা হয়েছে ঃ

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً —অর্থাৎ আমি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা এগুলোতে সওয়ার হও—বোঝা বহনের কথাও প্রসঙ্গত এর মধ্যে এসে গেছে এবং তোমাদের শোভা ও সৌন্দর্যের উপকরণ হওয়াও এগুলোকে সৃষ্টি করার অন্যতম কারণ। এখানে 'শোভা' বলে ঐ শান-শওকত বোঝানো হয়েছে, যা সর্বসাধারণের মধ্যে মালিকদের জন্য বর্তমান থাকে।

কোরআনে রেল, মোটর ও বিমানের উল্লেখঃ সওয়ারীর তিনটি জন্তু ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করার পর পরিশেষে অন্যান্য যানবাহন সম্পর্কে ভবিষ্যত পদবাচ্য ব্যবহার করে বলা হয়েছেঃ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব বস্তু সৃষ্টি করবেন, যেগুলো তোমরা জান না। এখানে ঐ সব নবাবিষ্কৃত যানবাহন ও গাড়ী বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর অস্তিত্ব প্রাচীনকালে ছিল না। যেমন রেল, মটর, বিমান ইত্যাদি; যেগুলো এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, এ ছাড়া ভবিষ্যতে যেসব যানবাহন আবিষ্কৃত হবে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, প্রকৃতপক্ষে এগুলো সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কাজ। এতে প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের কাজ এতটুকুই যে, বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি প্রদত্ত জ্ঞানবুদ্ধির সাহায্যে প্রকৃতির সৃজিত ধাতব পদার্থসমূহে জোড়াতালি দিয়ে বিভিন্ন কলকব্জা তৈরী করেছে। অতঃপর তাতে প্রকৃতিপ্রদত্ত বায়ু, পানি, অগ্নি ইত্যাদি থেকে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি করেছে, কিংবা প্রকৃতি প্রদত্ত খনি থেকে পেট্রোল বের করে এসব যানবাহনে ব্যবহার করেছে। প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞান একজোট হয়েও কোন লোহা, পিতল সৃষ্টি করতে পারে না এবং এলুমিনিয়াম জাতীয় কোন হালকা ধাতু তৈরী করতে পারে না। এমনিভাবে বায়ু ও পানি সৃষ্টি করাও তার সাধ্যাতীত। প্রকৃতির সৃজিত শক্তিসমূহের ব্যবহার শিক্ষা করাই তার একমাত্র কাজ। জগতের যাবতীয় আবিষ্কার এ ব্যবহারেরই বিস্তারিত বিবরণ। তাই সামান্য চিন্তা করলেই একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না যে, যাবতীয় নতুন আবিষ্কার পরম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলারই সৃষ্টি।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, পূর্বোল্লিখিত সব বস্তুর সৃষ্টির ক্ষেত্রে অতীত পদবাচ্য ব্যবহার করে خَلَقَ বলা হয়েছে এবং প্রসিদ্ধ যানবাহন উল্লেখ করার পর ভবিষ্যত পদবাচ্য ব্যবহার করে يَخْلُقُ বলা হয়েছে। এ পরিবর্তন থেকে ফুটে উঠেছে যে, এ শব্দটি ঐসব যানবাহন সম্পর্কিত যেগুলো এখন পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করেনি এবং আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, ভবিষ্যতে কি কি যানবাহন সৃষ্টি করতে হবে। এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে তিনি সেগুলো উল্লেখ করে দিয়েছেন।

ভবিষ্যতে যেসব যানবাহন আবিষ্কৃত হবে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতে সেগুলোর নামও উল্লেখ করতে পারতেন। কিন্তু তখনকার দিনে যদি রেল, মটর, বিমান ইত্যাদি শব্দ উল্লেখও করতেন, তবে তাতে সম্বোধিতদের মস্তিষ্কের পক্ষে হতবুদ্ধিতা ছাড়া কোন লাভ

হত না। কেননা তখন এমন জিনিসের কল্পনা করাও মানুষের জন্য সহজ ছিল না। উপরোক্ত যানবাহন বোঝানোর জন্য এসব শব্দ তখন কোথাও ব্যবহৃত হত না। ফলে এগুলোর কোন অর্থই বোঝা যেত না।

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসীন সাহেবের মুখে শুনেছি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব নানুতুভী (র) বলতেন : কোরআন পাকে রেলের উল্লেখ রয়েছে। তিনি এর প্রমাণ হিসাবে আলোচ্য আয়াতটি পেশ করতেন। তখন পর্যন্ত মোটর গাড়ীর ব্যাপক প্রচলন ছিল না এবং বিমান আবিষ্কৃতই হয়নি। তাই তিনি শুধু রেলের কথাই বলতেন।

মাস'আলা : কোরআন পাক প্রথমে انعام অর্থাৎ উট, গরু-ছাগল ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছে এবং এদের উপকারিতাসমূহের মধ্যে মাংস ভক্ষণকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা সাব্যস্ত করেছে। এরপর পৃথকভাবে বলেছে : وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ—এসব উপকারিতাসমূহের মধ্যে সওয়ার হওয়া এবং এসবের দ্বারা শোভা অর্জনের কথা তো উল্লেখ হয়েছে ; কিন্তু গোশ্‌ত ভক্ষণের কথা বলা হয়নি। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশ্‌ত হালাল নয়। খচ্চর ও গাধার গোশ্‌ত যে হারাম, এ বিষয়ে জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ একমত। একটি স্বতন্ত্র হাদীসে এগুলোর অবৈধতা পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ; কিন্তু ঘোড়ার ব্যাপারে দু'টি পরস্পর বিরোধী হাদীস বর্ণিত আছে। একটি দ্বারা হালাল ও অপরটি দ্বারা হারাম হওয়া বোঝা যায়। একারণেই এ ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ হয়ে গেছে। কারও মতে হালাল এবং কারও মতে হারাম। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) এই পরস্পরবিরোধী প্রমাণের কারণে ঘোড়ার মাংসকে গাধা ও খচ্চরের মাংসের অনুরূপ হারাম বলেন নি কিন্তু মাকরূহ বলেছেন।

—(আহ্‌কামুল কোরআন—জাসসাস)

মাস'আলা : এ আয়াত থেকে সৌন্দর্য ও শোভার বৈধতা জানা যায় যদিও গর্ব ও অহংকার করা হারাম। পার্থক্য এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যের সারমর্ম হচ্ছে মনের খুশী অথবা আল্লাহ্‌র নিয়ামত প্রকাশ করা। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে মনে নিজেকে নিয়ামতের যোগ্য হকদার মনে করে না এবং অপরকেও নিকৃষ্ট জ্ঞান করে না ; বরং তাঁর দৃষ্টিতে একথাই থাকে যে, এটা আল্লাহ্‌র নিয়ামত। পক্ষান্তরে গর্ব ও অহংকারের মধ্যে নিজেকে নিয়ামতের যোগ্য হকদার গণ্য করা হয় এবং অপরকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করা—এটা হারাম।

—(বয়ানুল কোরআন)

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

(৯) সরল পথ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে এবং পথগুলোর মধ্যে কিছু বক্র পথও রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারতেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (পূর্বাপর প্রমাণাদি দ্বারা ধর্মের যে) সরল পথ প্রমাণিত হয়, তা বিশেষ করে আল্লাহ্ পর্যন্ত পেঁৗছে এবং কিছু (যেগুলো ধর্মের বিপরীত) বক্র পথও আছে (যে, এগুলো দিয়ে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভবপর নয়। অতএব কেউ কেউ সরল পথে চলে এবং কেউ কেউ বক্র পথে।) এবং যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে (মনযিলে) মকসূদে পর্যন্ত পৌঁছে দিতেন। (কিন্তু তিনি তাকেই পৌঁছান, যে সরল পথ অন্বেষণ করে وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا---তাই প্রমাণাদি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং সত্য অন্বেষণ করা তোমাদের কর্তব্য, যাতে তোমরা মনযিলে মকসূদ পর্যন্ত পৌঁছতে পার।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার মহান অবদানসমূহ উল্লেখ করে তওহীদের প্রমাণাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহেও এসব নিয়ামত বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে এ আয়াতটি 'মধ্যবর্তী বাক্য' হিসাবে এনে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব ওয়াদার কারণে মানুষের জন্য সরল পথ প্রতিভাত করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। এ পথ সোজা আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছবে। এ কারণেই আল্লাহ্র অবদানসমূহ পেশ করে আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও তওহীদের প্রমাণাদি সন্নিবেশিত করা হচ্ছে।

কিন্তু এর বিপরীতে কিছুসংখ্যক লোক অন্যান্য বক্র পথও অবলম্বন করে রেখেছে। তারা এসব সুস্পষ্ট আয়াত ও প্রমাণ দ্বারা উপকার লাভ করে না; বরং পথভ্রষ্টতার আবর্তে ঘোরাফেরা করে।

এরপর বলা হয়েছে ঃ যদি আল্লাহ্ চাইতেন তবে সবাইকে সরল পথে চলতে বাধ্য করতে পারতেন; কিন্তু রহস্য ও যৌক্তিকতার তাগিদ ছিল এই যে, জোরজবরদস্তি না করে উভয় প্রকার পথই সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়া, অতঃপর যে যে পথে চলতে চায় চলুক। সরল পথ আল্লাহ্ ও জান্নাত পর্যন্ত পেঁৗছাবে এবং বক্র পথ জাহান্নামে নিয়ে যাবে। এখন মানুষকে তিনি ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন যে, স্বেচ্ছায় যে পথ ইচ্ছা, সে তা বেছে নিতে পারে।

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ۞ يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَ

الْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ
بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ
فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣﴾
وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا
مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا
مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ
بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾ وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ
يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

(১০) তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এই পানি থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশু চারণ কর। (১১) এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্য উৎপাদন করেন ফসল, যয়তুন, খেজুর আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (১২) তিনিই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে। তারকাসমূহ তাঁরই বিধানে কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (১৩) তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যে সব রঙ-বেরঙের বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেগুলোতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তাভাবনা করে। (১৪) তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা মাংস খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় অলংকার। তুমি তাতে জলযানসমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে এবং যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র কৃপা অন্বেষণ কর এবং যাতে তার অনুগ্রহ স্বীকার কর। (১৫) এবং তিনি পৃথিবীর উপর বোঝা রেখেছেন যে, কখনো যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে-দুলে না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা পথ প্রদর্শিত হও। (১৬) এবং তিনি পথনির্ণয়ক বহু চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন, এবং তারকা দ্বারাও মানুষ পথের নির্দেশ পায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনি (আল্লাহ্) এমন, যিনি তোমাদের (উপকারের) জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, যা থেকে তোমরা পান কর এবং যদ্দ্বারা বৃক্ষ (উৎপন্ন) হয়, যার মধ্যে তোমরা (গৃহপালিত জন্তুদেরকে) চরাও (এবং) এই পনি দ্বারা তোমাদের (উপকারের) জন্য ফসল যয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও প্রত্যেক ফল (মাটি থেকে) উৎপাদন করেন। নিশ্চয় এতে (অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়ের মধ্যে) চিন্তাশীলদের জন্য (তওহীদের) প্রমাণ (বিদ্যমান) আছে এবং তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের (উপকারের) জন্য রাত্রি, দিবস, সূর্য ও চন্দ্রকে (স্বীয় কুদরতের) অনুবর্তী করেছেন এবং (এমনিভাবে অন্যান্য) তারকারাজি (ও) তাঁর নির্দেশে (কুদরতের) অনুবর্তী। নিশ্চয় এতে (অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়েও) বুদ্ধিমানদের জন্য (তওহীদের) কতিপয় প্রমাণ (বিদ্যমান) রয়েছে এবং (এমনিভাবে) ঐসব বস্তুকেও (কুদরতের) অনুবর্তী করেছেন, যেগুলোকে তোমাদের (উপকারার্থে) বিভিন্ন প্রকারে (অর্থাৎ জাতে, শ্রেণীতে ও রকমে) সৃষ্টি করেছেন (সব জন্তু, উদ্ভিদ, জড়পদার্থ একক ও মিশ্রিত বস্তু এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে)। নিশ্চয় এতে (অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়েও) সমঝদারদের জন্য (তওহীদের) প্রমাণ (বিদ্যমান) রয়েছে। এবং তিনি (আল্লাহ্) এমন যে, তিনি সমুদ্রকে (-ও কুদরতের) অনুবর্তী করেছেন, যাতে এ থেকে তাজা তাজা গোশত (অর্থাৎ মাছ শিকার করে) খাও এবং (যাতে) এ থেকে (মোতির) অলংকার বের কর, যা তোমরা (নারী-পুরুষ সবাই) পরিধান কর এবং (হে সম্বোধিত ব্যক্তি, সমুদ্রের আরও একটি উপকার এই যে) তুমি নৌকাসমূহকে (ছোট কিংবা বড় জাহাজ হোক) এতে (অর্থাৎ সমুদ্রে) পানি চিরে চলে যেতে দেখ এবং (এ ছাড়া সমুদ্রকে এজন্য কুদরতের অনুবর্তী করেছেন) যাতে তোমরা (এতে পণ্যদ্রব্য নিয়ে সফর কর এবং এর মাধ্যমে) আল্লাহ্র দেওয়া রুযী অন্বেষণ কর এবং যাতে (এসব উপকার দেখে তাঁর) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তিনি পৃথিবীতে পাহাড় স্থাপন করেছেন, যাতে তা (অর্থাৎ পৃথিবী) তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত (ও টলটলায়মান) না হয় এবং তিনি (ছোট ছোট) নদী ও পথ তৈরী করেছেন, যাতে (এসব পথের সাহায্যে) মন্‌যিলে মকসূদ পর্যন্ত পৌঁছতে পার এবং (পথের পরিচয়ের জন্য) বহু চিহ্ন রেখেছেন (যেমন পাহাড়, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদি। এগুলো দ্বারা রাস্তা চেনা যায়। নতুবা ভূপৃষ্ঠ যদি একইরূপ সমতল হত তবে পথ চিনা কিছুতেই সম্ভবপর হত না।) এবং তারকারাজি দ্বারাও মানুষ রাস্তার পরিচয় লাভ করে। (এটা বর্ণনাসাপেক্ষ ও অজানা নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ — شَجَرٍ শব্দটি প্রায়ই বৃক্ষের অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান থাকে। কোন কোন সময় এমন প্রত্যেক বস্তুকেও شَجَر বলা হয় যা ভূপৃষ্ঠে উৎপন্ন হয়। ঘাস, লতা-পাতা ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। আলোচ্য আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। কেননা, এরপরেই জন্তুদের চরার কথা বলা হয়েছে।

ঘাসের সাথেই এর বেশীর ভাগ সম্পর্ক تُسِيمُونَ শব্দটি اسامة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ জন্তুকে চারণক্ষেত্রে চরার জন্য ছেড়ে দেওয়া।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ----এসব আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত এবং অভিনব রহস্য সহকারে জগৎ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। যারা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তারা এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ পায়, যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলার তওহীদ যেন মূর্ত হয়ে চোখের সামনে ফুটে ওঠে। এ কারণেই নিয়ামতগুলো উল্লেখ করে বার বার এ বিষয়ের প্রতি হুঁশিয়ার করা হয়েছে। এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, এতে চিন্তাশীলদের জন্য প্রমাণ রয়েছে। কেননা, ফসল ও বৃক্ষ এবং এ সবের ফল ও ফুলের যে সম্পর্ক আল্লাহ্ তা'আলার কারিগরি ও রহস্যের সাথে রয়েছে তা কিছুটা চিন্তা-ভাবনার দাবী রাখে বৈ কি। মানুষের চিন্তা করা দরকার যে, শস্যকণা কিংবা আঁটি মাটির নিচে ফেলে রাখলে এবং পানি দিলে আপনা-আপনি বিরাট মহীরূহে পরিণত হতে পারে না এবং তা থেকে রঙ-বেরঙের ফুল উৎপন্ন হতে পারে না। যা হয়, তাতে কোন কৃষক ভূস্বামীর কর্মের দখল নেই। বরং সবই সর্বশক্তিমানের কারিগরি ও রহস্য। এরপর বলা হয়েছে যে, দিবারাত্র ও তারকারাজি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের অনুগত হয়ে চলে। শেষে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ—অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য বহু প্রমাণ রয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এসব বস্তু যে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের অনুবর্তী, তা বুঝতে তেমন চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। যার সামান্যও বুদ্ধি আছে, সে বুঝে নিতে পারবে। কেননা, উদ্ভিদ ও বৃক্ষ উৎপাদনের মধ্যে তো কিছু না কিছু মানবীয় কর্মের দখল ছিল, এখানে তাও নেই।

এরপর মাটির অন্যান্য উৎপন্ন ফসলের কথা উল্লেখ করে অবশেষে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ—অর্থাৎ এতে তাদের জন্য প্রমাণ রয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য এই যে, এ ক্ষেত্রেও গভীর চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই। কেননা, এটা সম্পূর্ণ জাজ্বল্যমান সত্য। কিন্তু মনোযোগ সহকারে এদিকে দেখা এবং উপদেশ গ্রহণ করা শর্ত। নতুবা কোন নির্বোধ ও নিশ্চিন্ত ব্যক্তি যদি এ দিকে লক্ষ্যই না করে, তবে তার কি উপকার হতে পারে?

سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ রাত্রি ও দিবসকে অনুবর্তী করার অর্থ এই যে, এগুলোকে মানুষের কাজে নিয়োজিত করার জন্য স্বীয় কুদরতের অনুবর্তী করে দিয়েছেন।

রাত্রি মানুষকে আরামের সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করে এবং দিবস তার কাজকর্মের পথ প্রশস্ত করে। এগুলোকে অনুবর্তী করার অর্থ এরূপ নয় যে, রাত্রি ও দিবস মানুষের নির্দেশ মেনে চলবে।

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا ——নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্ট বস্তু এবং এগুলোতে মানুষের উপকার বর্ণনা করার পর এখন সমুদ্রগর্ভে মানুষের উপকারের জন্য কি কি নিহিত আছে, সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে, সমুদ্রে মানুষের খাদ্যের চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখান থেকে মানুষ মাছের টাটকা গোশত লাভ করে।

لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ——এ বাক্যে মাছকে টাটকা গোশত বলে আখ্যায়িত করায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অন্যান্য জীবের ন্যায় মাছকে যবেহ করা শর্ত নয়। এ যেন আপনা-আপনি তৈরী গোশত।

وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا —এটা সমুদ্রের দ্বিতীয় উপকার। ডুবুরীরা সমুদ্রে ডুব দিয়ে মূল্যবান অলংকার সামগ্রী বের করে আনে। حِلْيَةٌ-এর শাব্দিক অর্থ শোভা, সৌন্দর্য। এখানে ঐ রত্নরাজি ও মণিমুক্তা বোঝানো হয়েছে, যা সমুদ্র-গর্ভ থেকে নির্গত হয় এবং মহিলারা এর দ্বারা অলংকার তৈরী করে গলায় অথবা অন্যান্য পন্থায় ব্যবহার করে। এ অলংকার মহিলারা পরিধান করে থাকে ; কিন্তু কোরআন পুংলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করে تَلْبَسُونَهَا বলেছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, মহিলাদের অলংকার পরিধান করা প্রকৃতপক্ষে পুরুষদের দেখার স্বার্থে। মহিলার সাজসজ্জা করাটা প্রকৃত-পক্ষে পুরুষের অধিকার। সে স্ত্রীকে সাজসজ্জার পোশাক ও অলংকার পরিধান করতে বাধ্যও করতে পারে। এছাড়া পুরুষরাও আংটি ইত্যাদিতে মণিমুক্তা ব্যবহার করতে পারে।

وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ——এটা সমুদ্রের তৃতীয় উপকার। فُلْك শব্দের অর্থ নৌকা। مَوَاخِر শব্দটি مَاخِرَةٌ এর বহুবচন। مَخْر-এর অর্থ পানি ভেদ করা। অর্থাৎ ঐসব নৌকা ও সামুদ্রিক জাহাজ, যেগুলো পানির ঢেউ ভেদ করে পথ অতিক্রম করে।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্রকে দূর-দূরান্তের দেশে সফর করার রাস্তা করেছেন এবং দূর-দূরান্তে সমুদ্রপথেই সফর করা ও পণ্যদ্রব্য আমদানী রফতানী করা সহজ করে দিয়েছেন। একে জীবিকা উপার্জনের একটি উত্তম উপায় সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা সর্বাধিক লাভজনক।

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ—رواسى শব্দটি رَاسِيَةٌ এর বহুবচন। এর অর্থ ভারী পাহাড়। تَمِيدَ শব্দটি مَيْد থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আন্দোলিত হওয়া এবং অস্থিরভাবে টলমল করা।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা অনেক রহস্যের অধীনে ভূ-মণ্ডলকে নিবিড় ও ভারসাম্যবিহীন উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেন নি। তাই এটা কোন দিক দিয়ে ভারী এবং কোন দিক দিয়ে হালকা হয়েছে। অন্যথায় এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল, ভূ-পৃষ্ঠের অস্থির-ভাবে আন্দোলিত হওয়া। সাধারণ বিজ্ঞানীদের ন্যায় পৃথিবীকে স্থিতিশীল স্বীকার করা হোক কিংবা কিছুসংখ্যক প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীর মত একে চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান মনে করা হোক—উভয় অবস্থাতেই এটা জরুরী ছিল। এই অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা এবং পৃথিবীর উৎপাদনকে ভারসাম্য পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে পাহাড়ের ওজন স্থাপন করেন—যাতে পৃথিবী অস্থিরভাবে নড়াচড়া করতে না পারে। এখন পৃথিবী অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের মত চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান কি না, এ সম্পর্কে কোরআন পাকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন কিছুই নেই। প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে ফিসাগোর্সের অভিমত ছিল এই যে, পৃথিবী চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান। আধুনিক বিজ্ঞানীরা সবাই এ ব্যাপারে একমত। নতুন গবেষণা ও অভিজ্ঞতা এ মতবাদকে আরও ভাস্বর করে তুলছে। পাহাড়ের সাহায্যে যে অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা হয়েছে, তা পৃথিবীর জন্য অন্যান্য গ্রহের ন্যায় যে গতি প্রমাণ করা হয়, তার জন্য আরও অধিক সহায়ক হবে।

وَعَلَامَاتٍ ط وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ——ওপরে বাণিজ্যিক সফরের কথা বলা হয়েছে। তাই এসব সুযোগ-সুবিধা উল্লেখ করাও এখানে সমীচীন মনে হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা পথিকদের পথ অতিক্রম ও মনযিলে মকসুদে পৌঁছার জন্য ভূ-মণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন। তাই বলা হয়েছে : وَعَلَامَاتٍ অর্থাৎ আমি পৃথিবীতে রাস্তা চেনার জন্য পাহাড়, নদী, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদির সাহায্যে অনেক চিহ্ন স্থাপন করেছি। বলা বাহুল্য, ভূপৃষ্ঠ যদি একটি চিহ্নবিহীন পরিমণ্ডল হত তবে মানুষ কোন গন্তব্যস্থানে পৌঁছার জন্য পথিমধ্যে কতই না ঘুরপাক খেত।

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ——অর্থাৎ পথিক যেমন ভূ-পৃষ্ঠের চিহ্নের দ্বারা রাস্তা চেনে, তেমনি তারকারাজির সাহায্যেও দিক নির্ণয়ের মাধ্যমে রাস্তা চিনে নেয়। এ বক্তব্যে এদিকে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, তারকারাজি সৃষ্টি করার আসল উদ্দেশ্য অন্য কিছু হলেও রাস্তার পরিচয় লাভ করা এগুলোর অন্যতম উপকারিতা।

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ⑰ وَإِنْ تَعُدُّوا

نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١٨ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا
تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۝١٩ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا
يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔـا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ۝٢٠ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاۗءٍ ۚ وَمَا
يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ۝٢١ اِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۝٢٢ لَا جَرَمَ اَنَّ
اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۭ اِنَّهٗ لَا
يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ۝٢٣

(১৭) যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি সে লোকের সমতুল্য যে সৃষ্টি করতে পারে না? তোমরা কি চিন্তা করবে না? (১৮) যদি আল্লাহ্‌র নিয়ামত গণনা কর, শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৯) আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। (২০) এবং যারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যদের ডাকে, ওরা তো কোন বস্তুই সৃষ্টি করে না; বরং ওরা নিজেরাই সৃজিত। (২১) তারা মৃত—প্রাণহীন এবং কবে পুনরুত্থিত হবে, জানে না। (২২) তোমাদের ইলাহ্ একক ইলাহ্। অনন্তর যারা পরজীবনে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকার প্রদর্শন করেছে। (২৩) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় বিষয়ে অবগত। নিশ্চিতই তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যখন প্রমাণিত হয়ে গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত বস্তুসমূহের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি একক তখন) যিনি সৃষ্টি করেন (অর্থাৎ আল্লাহ্) তিনি কি তার সমতুল্য হয়ে যাবেন, যে সৃষ্টি করতে পারে না? (যে তোমরা উভয়কে উপাস্য মনে করতে থাকবে। এতে করে আল্লাহ্ তা'আলাকে অপমান করা হয়। কেননা, এভাবে তাঁকে মূর্তি-বিগ্রহের সমতুল্য করে দেওয়া হয়।) অতঃপর তোমরা কি (এতটুকুও) বোঝ না? (আল্লাহ্ তা'আলা উপরে তওহীদের প্রমাণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে যেসব নিয়ামতের উল্লেখ করেছেন, তাতেই নিয়ামত শেষ নয়; বরং তা এত অজস্র যে) যদি তুমি আল্লাহ্‌র নিয়ামত গণনা কর, তবে (কখনও) গণনা করতে পারবে না। (কিন্তু মুশরিকরা শোকর ও কদর করে না। এটা এমন গুরুতর অপরাধ ছিল যে, ক্ষমা করলেও ক্ষমা হতো না এবং এ অবস্থা বিদ্যমান

থাকলে পরবর্তীকালে এসব নিয়ামত দেওয়া যেত না। কিন্তু) বাস্তবিকই আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (কেউ শিরক থেকে তওবা করলে তিনি ক্ষমা করে দেন এবং না করলেও জীবদ্দশায় সব নিয়ামত বন্ধ হয়ে যায় না।) এবং (হ্যাঁ, নিয়ামত চালু থাকার কারণে কারও এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, কখনও শাস্তি হবে না ; বরং পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য—সব অবস্থাই জানেন। (সুতরাং তদনুযায়ী শাস্তি দেবেন। এ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা যে স্রষ্টা ও নিয়ামত দাতা—এ বিষয়ের বর্ণনা।) এবং তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের ইবাদত করে, তারা কোন বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না এবং তারা স্বয়ং সৃজিত (উপরে সামগ্রিক নীতি বর্ণিত হয়েছে যে, যে স্রষ্টা নয় এবং যে স্রষ্টা এ দু'সত্তা সমান হতে পারে না। অতএব এরা কিরূপে ইবাদত পাওয়ার যোগ্য হতে পারে ? এবং) তারা (মিথ্যা উপাস্যরা) মৃত, [নিষ্প্রাণ—যেমন মূর্তি চিরকাল তা প্রাণহীন থাকে, না হয় বর্তমানে যারা মরে গেছে তাদের মতন, না হয় যারা ভবিষ্যতে মৃত হবে যেমন জিন ও ঈসা (আ) প্রমুখ তাদের মতন—তারা] জীবিত নয়। (অতএব স্রষ্টা হবে কিরূপে ?) এবং তাদের (অর্থাৎ মিথ্যা উপাস্যদের এতটুকুও) খবর নেই যে, (কিয়ামতে) মৃতরা কখন উত্থিত হবে (কেউ কেউ তো জানই রাখে না এবং কেউ কেউ নির্দিষ্ট করে জানেও না। অথচ উপাস্যের সর্বব্যাপী জ্ঞান থাকা আবশ্যক, বিশেষত কিয়ামতের। কেননা, এতে ইবাদত করা না করার প্রতিদান হবে। অতএব উপাস্যের জন্য এর জ্ঞান থাকা খুবই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং জ্ঞানে আল্লাহ্‌র সমতুল্য কিরূপে হবে ? এ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হল যে) তোমাদের সত্য উপাস্য একই উপাস্য। অতএব (এ সত্য উদ্‌ঘাটনের পরও) যারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে না। (এবং এ কারণেই তারা ভীত হয়ে তওহীদ কবূল করে না ; জানা গেল যে,) তাদের অন্তর (-ই এমন অযোগ্য যে, যুক্তিযুক্ত কথা) অস্বীকার করছে এবং (জানা গেল যে) তারা সত্য গ্রহণে অহংকার করছে। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সত্যি কথা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সবার গোপন ও প্রকাশ্য অবস্থা জানেন (এবং এটাও) নিশ্চিত যে, তিনি অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সুতরাং তাদের অহংকার যখন জানা আছে, তখন তাদেরকেও অপছন্দ করবেন এবং শাস্তি দেবেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত এবং জগত সৃষ্টির কথা বিস্তারিত উল্লেখ করার পর এসব নিয়ামত বিস্তারিত বর্ণনা করার কারণ অর্থাৎ তওহীদের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নন। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে ঃ যখন প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলাই এককভাবে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, পাহাড় ও সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন এবং বৃক্ষলতা ও এর ফল-ফুল সৃষ্টি করেছেন, তখন এ পবিত্র সত্তা, যিনি এগুলোর স্রষ্টা তিনি কি মূর্তি-বিগ্রহের সমতুল্য হয়ে যাবেন, যারা কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না ? অতএব তোমরা কি এতটুকুও বোঝ না ?

وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوٓا أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾
لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ
يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٢٥﴾ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَٰنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ
مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَوْمَ
ٱلْقِيَٰمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَٰٓقُّونَ
فِيهِمْ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْىَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ
عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٧﴾ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ ۖ
فَأَلْقَوُا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓءٍ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ فَٱدْخُلُوٓا أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ
فَلَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩﴾

(২৪) যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ তোমাদের পালনকর্তা কি নাযিল করেছেন? তারা বলেঃ পূর্ববর্তীদের কিস্‌সা-কাহিনী। (২৫) ফলে কিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং পাপভার তাদেরও, যাদেরকে তারা তাদের অজ্ঞাত হেতু বিপথগামী করে। শুনে নাও, খুবই নিকৃষ্ট বোঝা যা তারা বহন করে। (২৬) নিশ্চয় চক্রান্ত করেছে তাদের পূর্ববর্তীরা, অতঃপর আল্লাহ্ তাদের চক্রান্তের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন। এরপর উপর থেকে তাদের মাথায় ছাদ ধসে পড়ে গেছে এবং তাদের উপর আযাব এসেছে যেখান থেকে তাদের ধারণাও ছিল না। (২৭) অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং বলবেনঃ আমার অংশীদাররা কোথায়, যাদের ব্যাপারে তোমরা খুব হঠকারিতা করতে? যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলবেঃ নিশ্চয়ই আজকের দিনে লাঞ্ছনা ও দুর্গতি কাফিরদের জন্য, (২৮) ফেরেশতারা তাদের জান এমতাবস্থায় কবজ করে যে, তারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে। তখন তারা আনুগত্য প্রকাশ করবে যে, আমরা তো কোন মন্দ কাজ করতাম না। হ্যাঁ, নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত আছেন, যা তোমরা করতে। (২৯) অতএব

জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর, এতেই অনন্তকাল বাস কর। আর অহংকারীদের আবাসস্থল কতই নিকৃষ্ট!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন তাদেরকে বলা হয় (অর্থাৎ কোন অজ্ঞ ব্যক্তি জানার জন্য কিংবা ওয়াকিফ-হাল ব্যক্তি পরীক্ষা করার জন্য তাদেরকে জিজ্ঞেস করে ঃ) তোমাদের পালনকর্তা কি নাযিল করেছেন? [অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা) কোরআন সম্পর্কে যা বলেন সেটা আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ---এ কথা কি সত্য?] তখন তারা বলে ঃ (আরে সেটা পালনকর্তা কর্তৃক অবতীর্ণ কোথায়, সেটা তো) ভিত্তিহীন কল্পকাহিনী, যা পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে (বর্ণিত হয়ে) চলে আসছে। (অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা পূর্ব থেকে তওহীদ, নবুয়ত ও পরকালের দাবী করে আসছে। তাদের কাছ থেকেই সে-ও বর্ণনা করতে শুরু করেছে। এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত বাণী নয়।) এর ফল (অর্থাৎ এরূপ বলার ফল) হবে এই যে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন নিজেদের গোনাহ্‌র পূর্ণ বোঝা এবং যাদেরকে তারা তাদের অজ্ঞতাবশত বিপথগামী করছে, তাদের গোনাহেরও কিছু বোঝা বহন করতে হবে। ('পূর্ববর্তীদের কল্পকাহিনী' বলাই বিপথগামী করার অর্থ। কেননা, এতে অন্যদের বিশ্বাস নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি কাউকে বিপথ-গামী করে---বিপথগামিতার কারণ হওয়ার দরুন সেও সমানভাবে গোনাহ্‌গার হবে। গোনাহ্‌র এই কারণজনিত অংশকে 'কিছু পাপভার' বলা হয়েছে। নিজের গোনাহ্ পুরোপুরি বহন করার বিষয়টি বর্ণনাসাপেক্ষ নয়।) খুব মনে রেখ, যে বোঝা তারা বহন করছে, তা মন্দ বোঝা। (অন্যদেরকে এ ধরনের কথা বলে বিপথগামী করার যে কৌশল তারা বের করেছে, তা সত্যের মুকাবিলায় কার্যকরী হবে না, বরং এর অভিশাপ ও শাস্তি তাদের ঘাড়েই চাপবে। সেমতে) যারা তাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে, তারা (পয়গম্বরগণের মুকাবিলা ও বিরোধিতায়) বড় বড় চক্রান্ত করেছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (চক্রান্তের) তৈরী গৃহ সমূলে ভূমিসাৎ করে দিয়েছেন। অতঃপর (তারা এমনভাবে ব্যর্থ হয়েছে যেন) উপর থেকে তাদের মাথায় (ঐ গৃহের) ছাদ ধসে পড়েছে (অর্থাৎ ছাদ ধসে পড়ার কারণে যেমন সবাই চাপা পড়ে যায়, এমনিভাবে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে।) এবং (ব্যর্থতা ছাড়াও) তাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব এমনভাবে এসেছে যে, তাদের ধারণাও ছিল না। (কেননা, তারা চক্রান্তে সফল হওয়ার আশায় ছিল। আশাতীতভাবে তাদের উপর ব্যর্থতা ছাড়াও আযাব এমনভাবে এসে গেছে যে, তাদের মস্তিষ্কে অনেক দূর পর্যন্তও এ ধারণা ছিল না। পূর্ববর্তী কাফিরদের উপর আযাব আসা সুবিদিত। এ হচ্ছে তাদের দুনিয়ার অবস্থা।) অতঃপর কিয়ামতের দিন (তাদের অবস্থা হবে এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং (একটি লাঞ্ছনা হবে এই যে, তাদেরকে) বলবেন ঃ (তোমরা যে) আমার অংশীদার, (ঠাওরে রেখেছিলে) যাদের সম্পর্কে তোমরা (পয়গম্বর ও মু'মিনদের সাথে) ঝগড়া-বিবাদ করতে, (তারা এখন) কোথায়? (এ অবস্থা দেখে সত্যের) জ্ঞান প্রাপ্তরা বলবে ঃ আজ পূর্ণ লাঞ্ছনা ও আযাব কাফিরদের উপর বর্তাবে, যাদের প্রাণ ফেরেশতারা

কুফরী অবস্থায় কবজ করেছিল। (অর্থাৎ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত কাফির ছিল। কাফিরদের লাঞ্ছনা খোলাখুলি ও সর্বসমক্ষে হবে, একথা বোঝানোর জন্য সম্ভবত জ্ঞানীদের উক্তি মাঝখানে বর্ণনা করা হয়েছে।) অতঃপর কাফিররা (শরীকদের জওয়াবে) সন্ধির প্রস্তাব রাখবে এবং বলবে যে, শিরক নিকৃষ্টতর মন্দ কাজ এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণ। আমাদের কি সাধ্য যে, তা করি। আমরা তো কোন খারাপ কাজ (যাতে আল্লাহ্র সামান্যও বিরুদ্ধাচরণ হয়) করতাম না। (একি সন্ধির বিষয়বস্তু বলার কারণ এই যে, শিরক যা একটি নিশ্চিত বিরুদ্ধাচরণ, দুনিয়াতে তারা খুব জোরেশোরে এর স্বীকারোক্তি করত। যেমন, لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكْنَا শিরকের স্বীকারোক্তি মানেই বিরুদ্ধাচরণের স্বীকারোক্তি, বিশেষত পয়গম্বরগণের সাথে তারা প্রকাশ্য বিরোধিতার দাবীদার ছিল। কিয়ামতে এই শিরক অস্বীকার করে বিরোধিতা অস্বীকার করবে। তাই একে সন্ধি বলা হয়েছে। তাদের এই অস্বীকার এমন, যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে : وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ উক্তি খণ্ডন করে বলবেন :) হ্যাঁ (বাস্তবিকই তোমরা বিরুদ্ধাচরণের কাজ করেছ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে সুবিজ্ঞ। অতএব জাহান্নামের দরজায় (অর্থাৎ দরজা দিয়ে জাহান্নামে) প্রবেশ কর (এবং) তাতে চিরকাল বাস কর। অতএব (সত্য থেকে) অহংকার (বিরোধিতা ও মুকাবিলা)-কারীদের আবাস কতই না মন্দ! (এ হচ্ছে পরকালীন আযাবের বর্ণনা। অতএব আয়াতসমূহের সারমর্ম এই যে, তোমরা পূর্ববর্তী কাফিরদের ক্ষতি, ইহকাল ও পরকালের আযাবের অবস্থা শুনেছ। এমনিভাবে সত্যধর্মের মুকাবিলায় তোমরা যে চক্রান্ত করছ এবং মানুষকে বিপথগামী করছ, তোমাদের পরিণাম তাই হবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতরাজি এবং বিশ্ব সৃষ্টিতে তাঁর একক হওয়ার কথা বর্ণনা করে মুশরিকদের নিজেদের বিপথগামিতা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে অপরকে বিপথগামী করা ও তার শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। এর পূর্বে কোরআন সম্পর্কে একটি প্রশ্ন রয়েছে। এ প্রশ্নটি এখানে মুশরিকদেরকে করা হয়েছে এবং তাদেরই মূর্খতাসুলভ উত্তর এখানে উল্লেখ করে তজ্জন্য শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। পাঁচ আয়াত পরে এ প্রশ্নটিই ঈমানদার পরহিযগারদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে এবং তাদের উত্তর ও তজ্জন্য পুরস্কারের ওয়াদা বর্ণিত হয়েছে।

কোরআন পাক এ কথা প্রকাশ করেনি যে, প্রশ্নকারী কে ছিল। তাই এ সম্পর্কে তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কেউ কাফিরদেরকে প্রশ্নকারী ঠাওরিয়েছেন এবং কেউ মু'মিনদেরকে। কেউ এক প্রশ্ন মুশরিকদের এবং অপর প্রশ্ন মু'মিনদের সাব্যস্ত

করেছেন। কিন্তু কোরআন পাক একে অস্পষ্ট রেখে ইঙ্গিত করেছে যে, এ আলোচনায় যাওয়ার প্রয়োজনই বা কি? জওয়াব ও তার ফলাফল দেখা দরকার। কোরআন স্বয়ং তা বর্ণনা করে দিয়েছে।

মুশরিকদের পক্ষ থেকে জওয়াবের সারমর্ম এই যে, তারা একথাই স্বীকার করেনি যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন কালাম অবতীর্ণ হয়েছে। বরং তারা কোরআনকে পূর্ব-বর্তী লোকদের কল্পকাহিনী সাব্যস্ত করেছে। কোরআন পাক এজন্য তাদেরকে শাস্তির সতর্কবাণী শুনিয়েছে যে, জালিমরা কোরআনকে কিস্‌সা-কাহিনী সাব্যস্ত করে অপরকেও বিপথগামী করে। তাদেরকে এর ফলাফল ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তাদের গোনাহ্‌র শাস্তি তো তাদের ওপর পড়বেই, অধিকন্তু যাদেরকে তারা বিপথগামী করেছে, তাদের কিছু শাস্তিও তাদের উপর বর্তাবে। এরপর বলা হয়েছে ঃ গোনাহ্‌র যে বোঝা তারা আপন পিঠে বহন করেছে, তা অত্যন্ত মন্দ বোঝা।

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا خَيْرًا ۗ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا
فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ
الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ
تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ
أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا
ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ
مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٤﴾

(৩০) পরহিযগারদেরকে বলা হয় ঃ তোমাদের পালনকর্তা কি নাযিল করেছেন? তারা বলে ঃ মহাকল্যাণ। যারা এ জগতে সৎকাজ করে, তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে এবং পরকালের গৃহ আরও উত্তম। পরহিযগারদের গৃহ কি চমৎকার? (৩১) সর্বদা বসবাসের উদ্যান, তারা যাতে প্রবেশ করবে! এর পাদদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হয়। তাদের জন্য তাতে তা'ই রয়েছে, যা তারা চায়। এমনিভাবে প্রতিদান দেবেন আল্লাহ্ পরহিযগারদেরকে, (৩২) ফেরেশতা যাদের জান কবজ করেন তাদের পবিত্র

থাকা অবস্থায়। ফেরেশতারা বলে ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমারা যা করতে, তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ কর। (৩৩) কাফিররা কি এখন অপেক্ষা করছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতারা আসবে কিংবা আপনার পালনকর্তার নির্দেশ পৌঁছবে? তাদের পূর্ববর্তীরা এমনই করেছিল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি অবিচার করেন নি; কিন্তু তারা স্বয়ং নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। (৩৪) সুতরাং তাদের মন্দ কাজের শাস্তি তাদেরই মাথায় আপতিত হয়েছে এবং তারা যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাই উল্টে তাদের ওপর পড়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা শিরক থেকে বেঁচে থাকে, তাদেরকে (যখন কোরআন সম্পর্কে) বলা হয় ঃ তোমাদের পালনকর্তা কি বস্তু নাযিল করেছেন? তারা বলে ঃ খুবই উত্তম (ও বরকতের বস্তু) নাযিল করেছেন। যারা সৎকাজ করেছে (উপরোক্ত উক্তি ও যাবতীয় সৎকর্ম এর অন্তর্ভুক্ত) তাদের জন্য (এ দুনিয়াতেও) মঙ্গল রয়েছে (এ মঙ্গল হচ্ছে সওয়াবের ওয়াদা ও সুসংবাদ) এবং পরজগৎ তো (সেখানে এ ওয়াদা বাস্তবায়নের কারণে) অধিক উত্তম (ও আনন্দদায়ক)। নিশ্চয়ই সেটা শিরক থেকে আত্মরক্ষাকারীদের উত্তম গৃহ। (সে গৃহ হলো) চিরকাল বসবাসের উদ্যান, যেখানে তারা প্রবেশ করবে। এসব উদ্যানের (বৃক্ষ ও দালান-কোঠার) পাদদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদের মনে যা চাইবে, সেখানে তারা তা পাবে। (যাদের উক্তি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদেরই বা কি বৈশিষ্ট্য বরং) এ ধরনের প্রতিদান আল্লাহ্ তা'আলা সব শিরক থেকে আত্মরক্ষাকা-রীকে দেবেন, যাদের রূহ ফেরেশতারা এমতাবস্থায় কবজ করেন যে, তারা (শিরক থেকে) পবিত্র (ও স্বচ্ছ। উদ্দেশ্য এই যে, তারা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তওহীদের উপর কায়েম থাকে এবং) তারা (ফেরেশতারা) বলতে থাকে ঃ আসসালামু আলাইকুম। তোমরা (রূহ্ কব-জের পর) জান্নাতে চলে যেয়ো নিজেদের কৃতকর্মের কারণে। তারা (যে কুফর, হঠকারিতা ও মূর্খতাকে আঁকড়ে রয়েছে এবং সত্যের প্রমাণাদি দিবালোকের মত ফুটে ওঠা সত্ত্বেও বিশ্বাস স্থাপন করছে না, মনে হয় যে, তারা শুধু) এ বিষয়ের অপেক্ষা করছে যে, তাদের কাছে (মৃত্যুর) ফেরেশতা এসে যাক কিংবা আপনার পালনকর্তার নির্দেশ (অর্থাৎ কিয়ামত) এসে যাক। (অর্থাৎ তারা কি মৃত্যুর সময় কিংবা কিয়ামতের দিন বিশ্বাস স্থাপন করবে? যখন ঈমান কবুল হবে না, যদিও সত্য প্রকাশিত হওয়ার কারণে তখন সব কাফির তওবা করবে। তারা যেমন কুফরকে আঁকড়ে রয়েছে) তেমনি তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারাও করেছিল (কুফরকে আঁকড়ে ধরেছিল) এবং (আঁকড়ে ধরার কারণে শক্তি পেয়ে-ছিল। অতএব) আল্লাহ্ তাদের প্রতি অবিচার করেন নি; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অবিচার করেছিল। (অর্থাৎ জেনে শুনে শাস্তির কাজ করত।) অবশেষে তাদের কুকর্মের শাস্তি তারা পেয়েছে এবং যে আযাবের (খবর পাওয়ার) প্রতি তারা হাসি-ঠাট্টা করত, তাদেরকেই তাই (অর্থাৎ আযাব) এসে ঘিরে ফেলেছে। (তাই তোমাদের অবস্থাও তদ্রূপই হবে।)

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ
وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا
فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم
مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي
الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾ إِن تَحْرِصْ
عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٣٧﴾
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ
وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ
الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾
إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

(৩৫) মুশরিকরা বলল : যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে আমরা তাঁকে ছাড়া কারও ইবাদত করতাম না এবং আমাদের পিতৃ পুরুষেরাও করত না এবং তাঁর নির্দেশ ছাড়া কোন বস্তুই আমরা হারাম করতাম না। তাদের পূর্ববর্তীরা এমনই করেছে। রসূলের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া। (৩৬) আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ্ হিদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে। (৩৭) আপনি তাদেরকে সুপথে আনতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ্ যাকে বিপথগামী করেন তিনি তাকে পথ দেখান না এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। (৩৮) তারা আল্লাহ্‌র নামে কঠোর শপথ করে যে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। অবশ্যই এর পাকাপোক্ত ওয়াদা হয়ে গেছে। কিন্তু, অধিকাংশ লোক জানে না। (৩৯) তিনি পুনরুজ্জীবিত করবেনই, যাতে যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল তা প্রকাশ করা যায় এবং যাতে কাফিরেরা জেনে নেয় যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল। (৪০) আমি যখন কোন

কিছু করার ইচ্ছা করি; তখন তাকে কেবল এতটুকুই বলি যে, হয়ে যাও। সুতরাং তা হয়ে যায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মুশরিকরা বলেঃ যদি আল্লাহ্ তা'আলা (সন্তুষ্টি হিসাবে) চাইতেন (যে, আমরা অন্যের ইবাদত না করি, যা আমাদের তরিকার মূলনীতি এবং কোন কোন বস্তু হারাম না করি, যা আমাদের তরিকার শাখাগত নীতি। উদ্দেশ্য এই যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের বর্তমান মূলনীতি ও শাখাগত নীতি অপছন্দ করতেন) তবে আল্লাহ্ ছাড়া কোন কিছুর ইবাদত আমরাও করতাম না, আমাদের বাপদাদারাও করত না এবং তাঁর (আদেশ) ছাড়া আমরা কোন বস্তুকে হারাম বলতে পারতাম না। [এতে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের তরিকা পছন্দ করেন। নতুবা আমাদেরকে কেন এরূপ করতে দিতেন? হে মুহাম্মদ (সা) আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, এই অনর্থক তর্ক নতুন ব্যাপার নয়; বরং] যেসব (কাফির) তাদের পূর্বে ছিল, তারাও এরূপ কাণ্ড করেছিল (অর্থাৎ পয়গম্বরদের সাথে অনর্থক তর্ক করেছিল।) অতএব পয়গম্বরদের (তাতে কি ক্ষতি হয়েছে এবং যে পথের দিকে তাঁরা ডাকেন তারই বা কি অনিষ্ট হয়েছে। তাদের) দায়িত্ব শুধু (বিধি-বিধান) পরিষ্কারভাবে পৌঁছিয়ে দেওয়া। ('পরিষ্কারভাবে' এর অর্থ এই যে, দাবী স্পষ্ট এবং প্রমাণ বিশুদ্ধ হতে হবে। এমনিভাবে আপনার দায়িত্বেও এ কাজ ছিল, যা আপনি করছেন। যদি হঠকারিতাবশত দাবী ও প্রমাণের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা না করে, তবে আপনার কি দোষ!) এবং (তাদের ব্যবহার আপনার সাথে অর্থাৎ তর্ক করা যেমন কোন নতুন ব্যাপার নয়, তেমনি আপনার ব্যবহার তাদের সাথে অর্থাৎ তওহীদ ও সত্য ধর্মের দিকে আহবান করা কোন নতুন ব্যাপার নয়। বরং এ শিক্ষাও প্রাচীনকাল থেকে অব্যাহত রয়েছে। সেমতে) আমি প্রত্যেক উম্মতে (পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে) কোন না কোন পয়গম্বর (এ শিক্ষা দেওয়ার জন্য) প্রেরণ করেছি যে, তোমরা (বিশেষভাবে) আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং শয়তান (এর পথ) থেকে (অর্থাৎ শিরক ও কুফর থেকে) বেঁচে থাক। (এতে কোন কোন বস্তুকে হারাম করাও এসে গেছে, যা মুশরিকরা নিজেদের মতে করত। কেননা, এটা শিরক ও কুফরের শাখা ছিল।) অতএব তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন করেছেন (কারণ তারা সত্যকে কবূল করেছে) এবং কিছু সংখ্যকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেছে।

(উদ্দেশ্য এই যে, কাফির ও পয়গম্বরগণের মধ্যে এ ব্যবহার এমনিভাবে চলে আসছে এবং পথ প্রদর্শন ও পথভ্রষ্টকরণ সম্পর্কিত আল্লাহ্র ব্যবহারও চিরকাল থেকে এমনি অব্যাহত রয়েছে। কাফিরদের তর্কবিতর্কও প্রাচীন, পয়গম্বরগণের শিক্ষাও প্রাচীন এবং সবার সৎপথ না পাওয়াও প্রাচীন। অতএব আপনি দুঃখিত হবেন কেন? এ পর্যন্ত সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। এতে সর্বশেষ আলোচ্য বিষয়ে তাদের সন্দেহের জওয়াবও সংক্ষেপে হয়ে গেছে। অর্থাৎ এরূপ কথাবার্তা বলা পথভ্রষ্টতা। পরবর্তী আয়াতে এর সমর্থন ও জওয়াবের ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ পয়গম্বরগণের সাথে তর্ক করা যে পথভ্রষ্টতা,

তা যদি তোমাদের জানা না থাকে তবে) তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, অতঃপর (ধ্বংসাবশেষের সাহায্যে) দেখ যে, (পয়গম্বরগণের প্রতি) মিথ্যারোপকারীদের কেমন (শোচনীয়) পরিণাম হয়েছে। (অতএব এ তারা যদি বিপথগামী না হত, তবে আযাবে কেন পতিত হল ? এগুলোকে আকস্মিক ঘটনা বলা যায় না। কারণ, এগুলো অভ্যাসের বিপরীতে হয়েছে, পয়গম্বরগণের ভবিষ্যদ্বাণী, পরে হয়েছে এবং ঈমানদাররা এগুলো থেকে মুক্ত রয়েছে। এরপরও এটা যে আযাব, এতে সন্দেহ থাকতে পারে কি ? উম্মতের কোন একজন বিপথগামী হলেও রসূলুল্লাহ্ (সা) ভীষণ মর্মাহত হতেন, তাই এরপর আবার তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, যেমন পূর্ববর্তী কিছু সংখ্যক লোকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গিয়েছিল, এমনিভাবে তারাও। অতএব) তাদের সৎপথে আনার বাসনা যদি আপনার থাকে, তবে (কোন লাভ নেই, কারণ) আল্লাহ্ হিদায়ত করেন না, যাকে (তার হঠকারিতার কারণে) বিপথগামী করেন। (তবে সে হঠকারিতা ত্যাগ করলে হিদায়ত করে দেন। কিন্তু তারা হঠকারিতা ত্যাগ করবে না। ফলে তাদের হিদায়তও হবে না।) এবং (বিপথগামিতা ও আযাব সম্পর্কে যদি তাদের এরূপ ধারণা থাকে যে, তাদের উপাস্যরা এ অবস্থায়ও আযাব থেকে বাঁচিয়ে নেবে, তবে তারা বোঝে নিক যে, আল্লাহ্র মুকাবিলায়) তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (এ পর্যন্ত তাদের প্রথম সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় সন্দেহ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।) তারা খুব জোরেশোরে আল্লাহ্র কসম খায় যে, যে ব্যক্তি মরে যায়, আল্লাহ্ তাকে পুনর্বার জীবিত করবেন না (এবং কিয়ামত আসবে না। অতঃপর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে) কেন জীবিত করবেন না ? (অর্থাৎ অবশ্যই জীবিত করবেন!) এ ওয়াদাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দায়িত্বে অপরিহার্য করে রেখেছেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক (বিশুদ্ধ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এতে) বিশ্বাস স্থাপন করে না। (পুনর্বার জীবিত করার কারণ) যাতে (ধর্ম সম্পর্কে) যে ব্যাপারে তারা (দুনিয়াতে) মতবিরোধ করত (এবং পয়গম্বরদের ফয়সালা শুনে পথে আসত না) তাদের সামনে তা (অর্থাৎ তার স্বরূপ চাক্ষুস) প্রকাশ করে দেন এবং যাতে (এ স্বরূপ প্রকাশের সময়) কাফিররা (পুরোপুরি) জেনে নেয় যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল। (এবং পয়গম্বর ও মু'মিনরা সত্যবাদী ছিল। অতএব কিয়ামতের আগমন অবশ্যম্ভাবী এবং আযাব দ্বারা ফয়সালা হওয়া জরুরী

এ হচ্ছে لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ বাক্যের জওয়াব। তারা যে কিয়ামতকে অস্বীকার করত,

এর কারণ ছিল এই যে, তাদের ধারণায় মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া কারও সাধ্যে ছিল না। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি প্রমাণ করে এ সন্দেহের জওয়াব দিচ্ছেন যে, আমার শক্তি এত বিরাট যে,) আমি যে বস্তু (সৃষ্টি করতে) চাই, (তাতে আমার কোনরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হয় না।) তাকে আমার পক্ষ থেকে শুধু এতটুকুই বলা (যথেষ্ট) হয় যে, তুমি (সৃষ্ট) হয়ে যাও, ব্যস তা (মওজুদ) হয়ে যায়। (সুতরাং এমন অপার শক্তির সামনে প্রাণহীন বস্তুর মধ্যে পুনর্বার প্রাণ সঞ্চার করা মোটেই কঠিন নয়, যেমন প্রথমবার তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। এখন উভয় সন্দেহের পূর্ণ জওয়াব হয়ে গেছে। وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কাফিরদের প্রথম সন্দেহ ছিল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কুফর, শিরক ও অবৈধ কাজকর্ম পছন্দ না করলে তিনি সজোরে আমাদেরকে বিরত রাখেন না কেন?

এ সন্দেহ যে অসার, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তাই এর জওয়াব দেওয়ার পরিবর্তে শুধু রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, এহেন অনর্থক ও বাজে প্রশ্ন শুনে আপনি দুঃখিত হবেন না। সন্দেহটি যে অসার, তার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে মূল ভিত্তির উপর এ দৃশ্যজগতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাতে মানুষকে সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন রাখা হয়নি। তাকে এক প্রকার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। এ ক্ষমতাকে সে আল্লাহ্র আনুগত্যে প্রয়োগ করলে পুরস্কার এবং নাফরমানীতে প্রয়োগ করলে আযাবের অধিকারী হয়। কিয়ামত এবং হাশর ও নশরের যাবতীয় হাঙ্গামা এরই ফলশ্রুতি। যদি আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে আনুগত্যে বাধ্য করতে চাইতেন, তবে আনুগত্যের বাইরে যাওয়ার সাধ্য কার ছিল? কিন্তু রহস্যের তাগিদে এরূপ বাধ্য করা সঠিক ছিল না। ফলে মানুষকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখন কাফিরদের একথা বলা যে, আমাদের ধর্মমত আল্লাহ্র কাছে পছন্দ না হলে আমাদের বাধ্য করেন না কেন—একটি বোকামি ও হঠকারিতাপ্রসূত প্রশ্ন বৈ নয়।

উপমহাদেশেও আল্লাহ্র কোন রসূল আগমন করেছেন কি? : لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا —এবং আরও একটি আয়াত وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ থেকে বাহ্যত একথাই জানা যায় যে, উপমহাদেশীয় এলাকাসমূহেও আল্লাহ্ তা'আলার পয়গম্বর অবশ্যই আগমন করে থাকবেন। তিনি হয় এখানকারই অধিবাসী হবেন, না হয় অন্য কোন দেশের হবেন এবং তাঁর প্রতিনিধি ও প্রচারক এখানে এসে থাকবেন। অপর পক্ষে لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ —আয়াত থেকে বোঝা যায়, রসূলুল্লাহ্ (সা) যে উম্মতের কাছে প্রেরিত হয়েছেন, তাদের কাছে তাঁর পূর্বে কোন রসূল আগমন করেননি। এর উত্তর এরূপ হতে পারে যে, এখানে বাহ্যত আরব সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত দ্বারা সর্বপ্রথম সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পর কোন পয়গম্বরের আগমন হয়নি। এজন্যই কোরআন পাকে তাদেরকে أُمِّيِّينَ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এতে অপরিহার্য হয়ে পড়ে না যে, অবশিষ্ট বিশ্বেও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পূর্বে কোন পয়গম্বর আসেন নি।

وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٤٢﴾

(৪১) যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহ্‌র জন্য গৃহ ত্যাগ করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম আবাস দেব এবং পরকালের পুরস্কার তো সর্বাধিক; হায়! যদি তারা জানত। (৪২) যারা দৃঢ়পদ রয়েছে এবং তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করেছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা আল্লাহ্‌র জন্য স্বদেশ (মক্কা) ত্যাগ করেছে (এবং আবিসিনিয়ায় চলে গেছে) তাদের উপর (কাফিরদের পক্ষ থেকে) নির্যাতন হওয়ার পর (কারণ এমন অপারক অবস্থায় দেশ ত্যাগ করা খুবই মনোকষ্টের কারণ হয়) আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম আবাস দেব। (অর্থাৎ তাদেরকে মদীনায় পৌঁছিয়ে খুব শান্তি ও সুখ দেব। সেমতে কিছুদিন পরেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মদীনায় পৌঁছিয়ে দেন এবং একেই আসল দেশ করে দেন। তাই একে আবাস বলা হয়েছে। তারা সেখানে সর্ব প্রকার উন্নতি লাভ করেন। তাই একে حَسَنَةً তথা উত্তম বলা হয়েছে। আবিসিনিয়ায় তাদের অবস্থান ছিল সাময়িক। তাই একে আবাস বলা হয়নি) এবং পরকালের পুরস্কার (এর চাইতে) অনেক গুণে বড় (কারণ, যেমন উত্তম তেমনি চিরস্থায়ী)। আফসোস! যদি (পরকালের এই প্রতিদান) তারা (অর্থাৎ অজ্ঞ কাফিররা) জানত! (এবং তা অর্জন করার আগ্রহে মুসলমান হয়ে যেত!) তারা (অর্থাৎ হিজরতকারীরা এসব ওয়াদার যোগ্য অধিকারী এজন্য যে, তারা) এমন, যারা (অপ্রিয় ঘটনাবলীতে) সবর করে। (সেমতে দেশ ত্যাগ করা যদিও তাদের কাছে অপ্রিয়, কিন্তু এছাড়া ধর্ম-পালন করা সম্ভবপর ছিল না। তাই ধর্মের খাতিরে তারা দেশ ছেড়েছে এবং সবর করেছে।) এবং (তারা সর্বাবস্থায়) পালনকর্তার উপর ভরসা রাখে। (দেশ ত্যাগ করার সময় চিন্তা করে না যে, খাওয়া-দাওয়া করবে কোত্থেকে?)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা: اَلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا —এটি هجرة থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ দেশ ত্যাগ করা। আল্লাহ্‌র জন্য দেশ ত্যাগ করা ইসলামে একটি বড়

ইবাদত। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : الهجرة تهدم ما كان قبلها —অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে মানুষ যেসব গোনাহ্ করে, হিজরত সেগুলোকে খতম করে দেয়।

হিজরত কোন কোন অবস্থায় ফরয, ওয়াজিব এবং কোন কোন অবস্থায় মোস্তাহাব ও উত্তম হয়ে থাকে। এর বিস্তারিত বিধান সূরা নিসার ৯৭ নম্বর আয়াত أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا -এর অধীনে বর্ণিত হয়েছে। এখানে শুধু মুহাজিরদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার কৃত ওয়াদাসমূহ বর্ণিত হবে।

হিজরত দুনিয়াতেও সচ্ছল জীবিকার কারণ হয় কি? : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে কতিপয় শর্তাধীনে মুহাজিরদের সাথে দুটি বিরাট ওয়াদা করা হয়েছে, প্রথম দুনিয়াতেই উত্তম ঠিকানা দেওয়ার এবং দ্বিতীয় পরকালে বেহিসাব সওয়াবের। 'দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা' এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। বসবাসের জন্য গৃহ এবং সৎ প্রতিবেশী পাওয়া, উত্তম রিযিক পাওয়া, শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় ও সাফল্য পাওয়া, সাধারণের মুখে মুহাজিরদের প্রশংসা ও সুখ্যাতি থাকা এবং পুরুষানুক্রমে পারিবারিক ইয্যত ও গৌরব পাওয়া—সবই এর অন্তর্ভুক্ত।—(কুরতুবী)

আয়াতের শানে নুযূল মূলত ঐ প্রথম হিজরত, যা সাহাবায়ে কিরাম আবিসিনিয়া অভিমুখে করেন। এরূপ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, আবিসিনিয়ার হিজরত এবং পরবর্তীকালের মদীনার হিজরত উভয়টি এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই কেউ কেউ বলেন যে, এ ওয়াদা বিশেষ করে ঐ সাহাবায়ে কিরামের জন্য, যাঁরা আবিসিনিয়ায় কিংবা মদীনায় হিজরত করেছিলেন। আল্লাহ্র এ ওয়াদা দুনিয়াতে পূর্ণ হয়ে গেছে। সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা মদীনাকে তাঁদের জন্য কি চমৎকার ঠিকানা করেছিলেন! উৎপীড়নকারী প্রতিবেশীদের স্থলে তাঁরা সহানুভূতিশীল, মহানুভব প্রতিবেশী পেয়েছিলেন। তাঁরা শত্রুদের বিপক্ষে বিজয় ও সাফল্যলাভ করেছিলেন। হিজরতের পর অল্প কিছু দিন অতিবাহিত হতেই তাঁদের সামনে রিযিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। যাঁরা ছিলেন ফকীর মিসকীন, তাঁরা হয়ে যান বিত্তশালী, ধনী। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ বিজিত হয়। তাঁদের চরিত্র মাধুর্য ও সৎকর্মের কীর্তি আবহমানকাল পর্যন্ত শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার মুখে উচ্চারিত হয়। তাঁদেরকে এবং তাঁদের বংশধরকে আল্লাহ্ তা'আলা অসামান্য ইয্যত ও গৌরব দান করেন। এগুলো হচ্ছে পার্থিব বিষয়। পরকালের ওয়াদা পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তফসীরে বাহ্রে মুহীতে আবু হাইয়্যান বলেন :

والذين هاجروا عام فى المهاجرين كائنا ما كانوا فيشمل اولهم واخرهم

অর্থাৎ اَلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا আয়াতটি বিশ্বের সমস্ত মুহাজিরের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য, যে কোন অঞ্চল ও যুগের মুহাজির হোক না কেন। তাই প্রথম যুগের হিজরতকারী মুহাজির এবং কিয়ামত পর্যন্ত আরও যত মুহাজির হবে, সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণ তফসীর বিধির তাগিদও তাই। আয়াতের শানে নুযূল বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ শ্রেণীর লোক হলেও শব্দের ব্যাপকতা ধর্তব্য হয়ে থাকে। তাই সারা বিশ্বের এবং সর্বকালের মুহাজির আলোচ্য ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত। উভয় ওয়াদা সব মুহাজিরের ক্ষেত্রে পূর্ণ হওয়া একটি নিশ্চিত ও অনিবার্য ব্যাপার।

এমনি ধরনের এক ওয়াদা মুহাজিরদের জন্য সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً

এতে বিশেষ করে বাসস্থানের প্রশস্ততা এবং জীবিকার সচ্ছলতার ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোরআন পাক এসব ওয়াদার সাথে মুহাজিরদের কিছু গুণাবলী এবং হিজরতের কিছু শর্তাবলীও বর্ণনা করেছে। তাই এসব ওয়াদার যোগ্য অধিকারী ঐসব মুহাজিরই হতে পারে, যারা এসব গুণের বাহক এবং যারা প্রাথিত শর্তসমূহ পূর্ণ করে।

তন্মধ্যে সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে فِي اللَّهِ—অর্থাৎ হিজরত করার লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন হতে হবে। এতে পার্থিব কাজ-কারবারের মুনাফা, চাকরি এবং প্রবৃত্তিগত উপকারিতা উদ্দেশ্য হতে পারবে না। দ্বিতীয় শর্ত মুহাজিরদের নির্যাতিত হওয়া, যেমন বলা হয়েছে ঃ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا—তৃতীয় গুণ প্রাথমিক কষ্ট ও বিপদাপদে সবর করা ও দৃঢ়পদ থাকা, যেমন বলা হয়েছে ঃ الَّذِينَ صَبَرُوا

চতুর্থ গুণ যাবতীয় বস্তুনিষ্ঠ কলা-কৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভরসা শুধু আল্লাহ্র ওপর রাখা, অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে এরূপ বিশ্বাস রাখা যে, বিজয় ও সাফল্য একমাত্র তাঁরই হাতে, যেমন বলা হয়েছে ঃ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

এ থেকে জানা গেল যে, প্রাথমিক বিপদাপদ ও কষ্ট তো প্রত্যেক কাজে হয়েই থাকে। এগুলো অতিক্রম করার পরও যদি কোন মুহাজির উত্তম ঠিকানা ও উত্তম অবস্থা না পায়, তবে কোরআনের ওয়াদায় সন্দেহ করার পরিবর্তে নিজের নিয়ত, আন্তরিকতা ও কর্মের উৎকর্ষ যাচাই করা দরকার। এগুলোর ভিত্তিতেই এ ওয়াদা করা হয়েছে। যাচাই করার পর সে জানতে পারবে যে, দোষ তার নিজেরই। কোথাও হয়তো নিয়তে ত্রুটি রয়েছে, কোথাও হয়তো সবর, দৃঢ়তা ও ভরসার অভাব আছে।

দেশত্যাগ ও হিজরতের বিভিন্ন প্রকার বিধি-বিধান ঃ ইমাম কুরতুবী এস্থলে হিজরত ও দেশ ত্যাগের প্রকার ও বিধি-বিধান সম্পর্কে একটি উপকারী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। পাঠকবর্গের উপকারার্থে নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হল ঃ

কুরতুবী ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে লিখেন ঃ দেশত্যাগ করা এবং দেশ ভ্রমণ

করা কোন সময় কোন বস্তু থেকে পলায়ন ও আত্মরক্ষার্থে হয় এবং কোন সময় কোন বস্তুর অন্বেষণের জন্য হয়। প্রথম প্রকারকে হিজরত বলে। হিজরত ছয় প্রকার ঃ

প্রথম. দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে যাওয়া। এ প্রকার সফর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলেও ফরয ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত শক্তি-সামর্থ্যের শর্তসহ ফরয, যদি দারুল কুফরে জান, মাল ও আবরুর নিরাপত্তা না থাকে কিংবা ধর্মীয় কর্তব্য পালন সম্ভব না হয়। এরূপরও যদি কেউ দারুল কুফরে অবস্থান করে, তবে সে গোনাহ্গার হবে।

দ্বিতীয়. বিদ'আতের স্থান থেকে চলে যাওয়া। ইবনে কাসেম বলেন ঃ আমি ইমাম মালেকের মুখে শুনেছি, এমন জায়গায় কোন মুসলমানের বসবাস করা হালাল নয়, যেখানে পূর্ববর্তী মনীষীদেরকে গালিগালাজ করা হয়। এই উক্তি উদ্ধৃত করে ইবনে আরাবী লিখেন ঃ এটা সম্পূর্ণ নির্ভুল। কেননা, যদি তুমি কোন গর্হিত কাজ বন্ধ করতে না পার, তবে নিজে সেখান থেকে দূরে সরে যাও। এটা তোমার জন্য জরুরী ; যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ

তৃতীয় যেখানে হারামের প্রাধান্য, সেখান থেকে চলে যাওয়া। কেননা হালাল অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

চতুর্থ. দৈহিক নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার্থে সফর করা। এরূপ সফর জায়েয ; বরং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত। যেস্থানে শত্রুদের পক্ষ থেকে দৈহিক নির্যাতনের আশংকা থাকে, সেস্থান ত্যাগ করা উচিত ; যাতে আশংকা মুক্ত হওয়া যায়। সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ) এই প্রকার সফর করেন। তিনি কওমের নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ইরাক থেকে সিরিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হন এবং বলেন ঃ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ তারপর হযরত মূসা (আ) এমনি এক সফর মিসর থেকে মাদইয়ান অভিমুখে করেন। যেমন কোরআন বলে ঃ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ

পঞ্চম. দূষিত আবহাওয়া ও রোগের আশংকা থেকে আত্মরক্ষার্থে সফর করা। ইসলামী শরীয়ত এরও অনুমতি দেয়, যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েকজন রাখালকে মদীনার বাইরে বনভূমিতে অবস্থান করার আদেশ দেন। কেননা, শহরের আবহাওয়া তাদের অনুকূলে ছিল না। এমনিভাবে হযরত ওমর ফারূক (রা) আবূ ওবায়দাকে রাজধানী জর্দান থেকে স্থানান্তরিত করে কোন মালভূমিতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন, যেখানে আবহাওয়া দূষিত নয়।

কিন্তু এটা তখন, যখন কোন স্থানে প্লেগ অথবা মহামারী ছড়িয়ে না থাকে। যেখানে কোন মহামারী ছড়িয়ে পড়ে, সেখানে নির্দেশ এই যে, পূর্ব থেকে যারা সেখানে

বিদ্যমান রয়েছে, তারা সেখান থেকে পলায়ন করবে না এবং যারা সেই এলাকার বাইরে রয়েছে তারা এলাকার ভিতরে যাবে না। সিরিয়ার সফরে হযরত ওমর (রা) এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি সিরিয়া সীমান্তে পৌঁছার পর জানতে পারেন যে, সিরিয়ায় প্লেগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় তিনি সিরিয়ায় প্রবেশ করবেন কিনা এ ব্যাপারে ইতস্তত করতে থাকেন। সাহাবায়ে কিরামের সাথে অবিরাম পরামর্শের পর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাঁকে একটি হাদীস শোনান। হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

اذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها واذا وقع بارض ولستم بها فلا تهبطوا عليها -

যখন কোন ভূখণ্ডে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে এবং তোমরা সেখানে বিদ্যমান থাক, তবে সেখান থেকে বের হয়ো না এবং যেখানে তোমরা পূর্ব থেকে বিদ্যমান না থাক, প্লেগ ছড়িয়ে পড়ার সংবাদ শুনে সেখানে প্রবেশ করো না।—(তিরমিযী)

খলীফা ওমর (রা) তখন হাদীসের নির্দেশ পালন করে সমগ্র কাফেলাকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেন।

কোন কোন আলিম বলেন : হাদীসের এই নির্দেশের একটি বিশেষ রহস্য এই যে, যারা মহামারীর এলাকায় পূর্ব থেকে অবস্থান করছে, তাদের মধ্যে মহামারীর জীবাণু থাকার সম্ভাবনা প্রবল। তারা যদি সেখান থেকে পলায়ন করে, তবে যে ব্যক্তির মধ্যে এই জীবাণু অনুপ্রবেশ করেছে, সে তো মরবেই এবং যেখানে সে যাবে, সেখানকার লোকও তার দ্বারা প্রভাবিত হবে। তাই ইহা হাদীসের বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা।

ষষ্ঠ ধনসম্পদ হিফাযতের জন্য সফর করা। কোন স্থানে চোর-ডাকাতের উপদ্রব দেখলে সেস্থান ত্যাগ করার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। কেননা, মুসলমানের ধনসম্পদও তার জানের ন্যায় সম্মানার্হ। এই ছয় প্রকার তো ছিল ঐ দেশ ত্যাগের যা কোন বস্তু থেকে পলায়ন ও আত্মরক্ষার্থে হয় আর শেষোক্ত প্রকার অর্থাৎ কোন বস্তুর অন্বেষণে যে সফর করা হয়, তা নয় ভাগে বিভক্ত।

(১) শিক্ষার সফর অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সৃষ্টজগত, অপার শক্তি ও বিগত জাতি-সমূহের অবস্থা সরেযমীনে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিশ্ব-পর্যটন করা। কোরআন পাক এরূপ সফরে উৎসাহিত করে বলেছে :

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

—হযরত যুলকারনাইনের সফরও কোন কোন আলিমের মতে এ ধরনের সফর ছিল। কেউ কেউ বলেন : তাঁর সফর পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র আইন প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে ছিল।

(২) হজ্জের সফর। কতিপয় শর্তসহ এ সফর যে ইসলামী ফরয, তা সুবিদিত।

(৩) জিহাদের সফর। এটাও যে ফরয, ওয়াজিব অথবা মোস্তাহাব, তা সব মুসলমানের জানা রয়েছে।

(৪) জীবিকার অন্বেষণে সফর। স্বদেশে জীবিকার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগৃহীত না হলে অন্যত্র সফর করে জীবিকা অন্বেষণ করা অপরিহার্য।

(৫) বাণিজ্যিক সফর অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পদ অর্জন করার জন্য সফর করা। শরীয়তে এটাও জায়েয। আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ —আয়াতে ابتغاء فضل (কৃপা অন্বেষণ) বলে বাণিজ্য বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা হজ্জের সফরেও বাণিজ্যের অনুমতি দান করেছেন। অতএব বাণিজ্যের জন্য সফর করা আরও উত্তম-রূপে বৈধ হবে।

(৬) জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর। ধর্ম পালনের জন্য যতটুকু জরুরী, ততটুকু জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর করা ফরযে আইন এবং এর বেশির জন্য ফরযে কেফায়া।

(৭) কোন স্থানকে পবিত্র মনে করে সেদিকে সফর করা। তিনটি মসজিদ ব্যতীত এরূপ সফর বৈধ নয় ঃ মসজিদে হারাম (মক্কা), মসজিদে নববী (মদীনা) এবং মসজিদে আকসা (বায়তুল মোকাদ্দাস)। এ হচ্ছে কুরতুবী ও ইবনে আরাবীর অভিমত। অন্যান্য আলিমের মতে সাধারণ পবিত্র স্থানসমূহের দিকে সফর করাও জায়েয। —(মোঃ শফী)

(৮) ইসলামী সীমান্ত সংরক্ষণের জন্য সফর। একে 'রিবাত' বলা হয়। বহু হাদীসে রিবাতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত রয়েছে।

(৯) স্বজন ও বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সফর। হাদীসে একেও পুণ্যকাজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সফর করে, তার জন্য ফেরেশতাদের দোয়া করার কথা উল্লিখিত রয়েছে। এটা তখন, যখন কোন বৈষয়িক স্বার্থের জন্য নয়, বরং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে সাক্ষাত করা হয়। والله اعلم

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

(৪৩) আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে; (৪৪) প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে নির্দেশাবলী ও অবতীর্ণ গ্রন্থসহ এবং আপনার কাছে আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐ সব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (অবিশ্বাসীরা আপনার রিসালত ও নবুয়ত এ কারণে স্বীকার করে না যে, আপনি মানব। তাদের মতে রসূল মানব না হওয়া উচিত। এটা তাদের মূর্খতা-প্রসূত ধারণা। কেননা) আমি আপনার পূর্বেও শুধু মানবকেই রসূল করে মু'জিযা ও গ্রন্থাদি দিয়ে প্রেরণ করেছি। আমি তাদের কাছে নির্দেশ প্রেরণ করতাম। অতএব (হে মক্কার অধিবাসীরা) যদি তোমাদের জানা না থাকে, তবে যারা জানে, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখ (অর্থাৎ এমন লোকদেরকে জিজ্ঞেস কর, যারা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের অবস্থা জানে এবং তোমাদের ধারণা মতেও তারা মুসলমানদের পক্ষপাতিত্ব না করে। এমনিভাবে আপনাকেও রসূল করে) আপনার প্রতিও এ কোরআন নাযিল করেছি, যাতে (আপনার মাধ্যমে) যে হিদায়ত মানুষের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে আপনি সেগুলো স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন এবং যাতে তারা তাতে চিন্তা-ভাবনা করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মক্কার মুশরিকরা মদীনার ইহুদীদের কাছে তথ্যানুসন্ধানের জন্য দূত প্রেরণ করল। তারা জানতে চাইল যে, বাস্তবিকই পূর্বেও সব পয়গম্বর মানব জাতির মধ্য থেকে প্রেরিত হয়েছেন কি না।

أَهْلَ الذِّكْرِ —শব্দটি গ্রন্থধারী সম্প্রদায় ও মুসলমান সবাইকে বোঝায়; কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, মুশরিকরা অমুসলমানদের বর্ণনা দ্বারাই তুষ্ট হতে পারত। কারণ তারা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বর্ণনায় সন্তুষ্ট ছিল না। এমতাবস্থায় মুসলমানদের বর্ণনা তারা কিরূপে মানতে পারত। أَهْلَ الذِّكْرِ—ذكر শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে এক অর্থ জ্ঞান। এ অর্থের সাথে সম্পর্ক রেখে কোরআন পাকে তওরাতকে ذكر বলা হয়েছে:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ এবং কোরআনকেও ذكر শব্দ

দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, যেমন এর পরের আয়াতে أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে। অতএব أَهْلُ الذِّكْرِ-এর শাব্দিক অর্থ দাঁড়াল বিদ্বান, জ্ঞানবান। এখানে স্পষ্টতই বিদ্বান বলে গ্রন্থধারী ইহুদী ও খৃস্টান পণ্ডিতদেরকে বোঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস, হাসান, সুদ্দী প্রমুখ তাই বলেছেন। কেউ কেউ এখানেও ذِكْر—এর অর্থ কোরআন ধরে أَهْلُ الذِّكْرِ-এর তফসীরে 'কোরআনধারী' বলেছেন। এ ব্যাপারে বাহ্‌রে মুহীত ও মাযহারীর বক্তব্য অধিক স্পষ্ট। তাঁরা বলেন :

المراد باهل الذكر علماء اخبار الامم الماضية كائنا من كان فالذكر بمعنى الحفظ كانه قيل اسألوا المطلعين على اخبار الامم يعلموكم بذلك -

এ ভাষ্য অনুযায়ী গ্রন্থধারী ও কোরআনধারী সবাই أَهْلُ الذِّكْرِ-এর অন্তর্ভুক্ত।

بَيِّنَات—এর অর্থ সুবিদিত। এখানে মু'জিযা বোঝানো হয়েছে। زُبُر শব্দটি আসলে زُبْرَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ লোহার বড় খণ্ড ; যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে, آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ—খণ্ডসমূহকে সংযোজন করার সাথে সম্পর্ক রেখে লেখাকে زَبْر বলা হয় এবং লিখিত গ্রন্থকে زَبُورٌ و زُبُرٌ বলা হয়। এখানে زُبُر বলে তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর ও কোরআনসহ ঐশীগ্রন্থসমূহ বোঝানো হয়েছে।

মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণ করা অন্যদের উপর ওয়াজিব : আলোচ্য আয়াতের فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ—বাক্যটি যদিও বিশেষ বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক হওয়ার কারণে এ জাতীয় সব ব্যাপারকে শামিল করে। তাই কোরআনী বর্ণনাভঙ্গির দিক দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিগত ও ইতিহাসগত বিধি যে, যারা বিধি-বিধানের জ্ঞান রাখে না, তারা যারা জানে, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে নেবে এবং তাদের কথামত কাজ করা জ্ঞানহীনদের উপর ফরয হবে। একেই তকলীদ (অনুসরণ) বলা হয়। এটা কোরআনের স্পষ্ট নির্দেশ এবং যুক্তিগতভাবেও এ পথ ছাড়া আমল অর্থাৎ কর্মকে ব্যাপক করার আর কোন উপায় নেই। সাহাবীগণের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোনরূপ মতানৈক্য ছাড়াই এ বিধি পালিত হয়ে আসছে। যারা তকলীদ অস্বীকার করে, তারাও এ তকলীদ অস্বীকার করে না যে, যারা আলিম নয়, তারা আলিমদের কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে কাজ করবে। বলা বাহুল্য, আলিমরা

যদি অজ্ঞ জনসাধারণকে কোরআন ও হাদীসের প্রমাণাদি বলেও দেন, তবে তারা এগুলোকে আলিমদের উপর আস্থার ভিত্তিতেই গ্রহণ করবে। কারণ, তাদের মধ্যে প্রমাণাদিকে বোঝা ও পরখ করার যোগ্যতা কোথায়? জ্ঞানীদের উপর আস্থা রেখে কোন নির্দেশকে শরীয়তের নির্দেশ মনে করে পালন করার নামই তো তকলীদ। এ তকলীদ যে বৈধ বরং জরুরী, তাতে কোনরূপ মতবিরোধের অবকাশ নেই। তবে যেসব আলিম কোরআন, হাদীস ও ইজমার ক্ষেত্রসমূহ বোঝার যোগ্যতা রাখে, তারা কারও তকলীদ না করে এমন বিধি-বিধানে সরাসরি কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী কাজ করতে পারে, যেগুলো কোরআন ও হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত রয়েছে এবং যেগুলোতে সাহাবী ও তাবেয়ী আলিমদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু যেসব বিধান পরিষ্কারভাবে কোরআন ও হাদীসে উল্লিখিত নেই অথবা যেগুলোতে কোরআনী আয়াত ও হাদীসের মধ্যে বাহ্যত পরস্পর বিরোধিতা দৃষ্টিগোচর হয় অথবা যেগুলোতে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে আয়াত কিংবা হাদীসের অর্থ নির্ধারণে মতভেদ রয়েছে, সেসব বিধি-বিধান ইজতিহাদী বিষয়-রূপে গণ্য হয় এবং পরিভাষায় এগুলোকে 'মুজতাহাদ ফিহ্ মাস'আলা' বলে। নিজে মুজতাহিদ নয়, এমন প্রত্যেক আলিমের পক্ষেও এ জাতীয় মাস'আলায় কোন একজন মুজতাহিদ ইমামের তকলীদ করা জরুরী। ব্যক্তিগত অভিমতের ভিত্তিতে এক আয়াত কিংবা হাদীসকে অগ্রগণ্য মনে করে অবলম্বন করা এবং অন্য আয়াত কিংবা হাদীসকে অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করে ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে বৈধ নয়।

এমনিভাবে কোরআন ও সুন্নতে যেসব বিধানের পরিষ্কার উল্লেখ নেই, সেগুলো কোরআন ও সুন্নাহ্ বর্ণিত মূলনীতি অনুসরণ করে বের করা এবং সেগুলোর শরীয়ত-সম্মত নির্দেশ নির্ধারণ করাও এমন মুজতাহিদদের কাজ, যারা আরবী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি রাখেন; কোরআন ও সুন্নাহ্ সম্পর্কিত যাবতীয় শাস্ত্রে দক্ষতা রাখেন এবং আল্লাহ্‌ভীতি ও পরহিযগারীতে উচ্চ মর্তবায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন। যেমন ইমাম আযম আবূ হানীফা, শাফেয়ী, মালিক, আহমদ ইবনে হাম্বল, আওযায়ী, ফকীহ আবুল্লাইস প্রমুখ। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নবুয়ত যুগের নৈকট্য এবং সাহাবী ও তাবেয়ী-গণের সংসর্গের বরকতে শরীয়তের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য বোঝার বিশেষ রুচি এবং বর্ণিত বিধানের ওপর অবর্ণিত বিধানকে অনুমান করে শরীয়তসম্মত নির্দেশ বের করার অসাধারণ দক্ষতা দান করেছিলেন। এ জাতীয় ইজতিহাদী মাস'আলায় সাধারণ আলিম-দের পক্ষেও কোন না কোন একজন মুজতাহিদ ইমামের তকলীদ করা অপরিহার্য। মুজতাহিদ ইমামদের মতের বিরুদ্ধে কোন নতুন মত অবলম্বন করা ভুল।

এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায়ের আলিম, মুহাদ্দিস ও ফিকাহবিদগণ, ইমাম গাযযালী, রাযী, তিরমিযী, তাহাভী, মুযানী, ইবনে হুমাম, ইবনে কুদামা এবং এই শ্রেণীর আরও লক্ষ লক্ষ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিম আরবী ভাষা ও শরীয়ত সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইজতিহাদী মাস'আলাসমূহে সর্বদা মুজতাহিদ ইমামদের তকলীদ করে গেছেন। তাঁরা সব ইমামের বিপরীতে নিজমতে কোন ফতোয়া দেওয়াকে বৈধ মনে করেন নি।

তবে উল্লিখিত মনীষীবৃন্দ জ্ঞান ও আল্লাহ্‌ভীতিতে অনন্যসাধারণ মর্তবার অধিকারী ছিলেন। ফলে তাঁরা মুজতাহিদ ইমামগণের উক্তি ও মতামতসমূহকে কোরআন ও সুন্নতের আলোকে যাচাই-বাছাই করতেন। অতঃপর তাঁরা যে ইমামের উক্তিকে কোরআন ও সুন্নতের অধিক নিকটবর্তী দেখতেন, সেই ইমামের উক্তি গ্রহণ করতেন। কিন্তু ইমামগণের মত ও পথের বাইরে, তাঁদের সবার বিরুদ্ধে কোন মত আবিষ্কার করাকে তাঁরা কখনও বৈধ মনে করতেন না। তকলীদের আসল স্বরূপ এতটুকুই।

এরপর দিন দিন জ্ঞানের মাপকাঠি সংকুচিত হতে থাকে এবং তাকওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতির পরিবর্তে মানবিক স্বার্থপরতা প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে যদি কোন মাস'আলায় যে-কোন ইমামের উক্তি গ্রহণ করার এবং অন্য মাস'আলায় অন্য ইমামের উক্তি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে মানুষ শরীয়ত অনুসরণের নামে প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যাবে। যে ইমামের উক্তিতে সে নিজ প্রবৃত্তির স্বার্থ পূর্ণ হতে দেখবে সেই ইমামের উক্তিকেই গ্রহণ করবে। বলা বাহুল্য, এরূপ করার মধ্যে ধর্ম ও শরীয়তের অনুসরণ হবে কম এবং স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ হবে বেশী। অথচ দীন ও শরীয়তের অনুসরণ না করে স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করা উম্মতের ইজমা দ্বারা হারাম। আল্লামা শাতেবী 'মুয়াফাকাত' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাধারণ তকলীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইবনে তাইমিয়া এ ধরনের অনুসরণকে স্বীয় ফতোয়া গ্রন্থে ইজমা দ্বারা হারাম বলেছেন। এ কারণে পরবর্তী ফিকাহবিদগণ এটা জরুরী মনে করেছেন যে, আমলকারীদের ওপর কোন একজন ইমামেরই তকলীদ করা বাধ্যতামূলক করে দেওয়া উচিত। এখান থেকেই ব্যক্তিভিত্তিক তকলীদের সূচনা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে একটি শৃংখলামূলক ব্যবস্থা। এর উদ্দেশ্য দীনী ক্ষেত্রে শৃংখলা কায়েম রাখা এবং মানুষকে দীনের আড়ালে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। হযরত উসমান গনী (রা)-র একটি কীর্তি হুবহু এর দৃষ্টান্ত। তিনি সাহাবায়ে কিরামের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে কোরআনের সাতটি কির'আতের মধ্য থেকে মাত্র একটিকে বহাল রেখেছেন। অথচ কোরআন সাত কির'আতেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বাসনা অনুযায়ী জিবরাঈলের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু বহির্বিশ্বে প্রচারিত হওয়ার পর সাত কির'আতে কোরআন পাঠ করার ফলে তাতে পরিবর্তনের আশংকা দেখা দেয়। তখন সাহাবীগণের সর্বসম্মতিক্রমে একই কির'আতে কোরআন লেখা ও পড়া বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়। খলীফা হযরত উসমান (রা) সেই এক কির'আতে কোরআনের অনেক কপি লিখিয়ে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন এবং আজ পর্যন্তও সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় তা অনুসরণ করে যাচ্ছেন। এর অর্থ এরূপ নয় যে, অন্য কির'আত সঠিক ছিল না। বরং দীনের শৃংখলা বিধান এবং কোরআনের হিফাযতের কারণে একটি মাত্র কির'আত অবলম্বন করা হয়েছে। এমনিভাবে সকল মুজতাহিদ ইমামই সত্য। তাদের মধ্যে কোন একজনকে তকলীদের জন্য নির্দিষ্ট করার অর্থ কখনও এরূপ নয় যে, যে ব্যক্তি যে ইমামের তকলীদ করেছে তাকে ছাড়া অন্য ইমাম তার কাছে তকলীদের যোগ্য নয়। বরং যে ইমামের মধ্যে নিজের মতাদর্শ ও সুবিধা দেখতে পায় তারই তকলীদ করে এবং অন্য ইমামদেরকেও এমনিভাবে সম্মানিত মনে করে।

উদাহরণত রোগী হাকীম ও ডাক্তারদের মধ্য থেকে কোন একজনকেই চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট করাকে জরুরী মনে করে। কারণ, সে যদি নিজ মতে এক সময় এক ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করে ওষুধ পান করে এবং অন্য সময় অন্য ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করে ওষুধ পান করে, তবে এটা তার ধ্বংসের কারণ হয়। অতএব সে যখন একজন ডাক্তারকে চিকিৎসার জন্য মনোনীত করে, তখন এর অর্থ কখনও এরূপ হয় না যে, অন্য ডাক্তার পারদর্শী নয় কিংবা চিকিৎসা করার যোগ্যতা রাখে না।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীর যে বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার স্বরূপ এর চাইতে বেশী কিছু ছিল না। একে দলাদলির রঙ দেওয়া এবং পারস্পরিক কলহ ও মতানৈক্য সৃষ্টিতে মেতে ওঠা দীনের কাজ নয় এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলিমগণ কোন সময় একে সুনজরে দেখেন নি। কোন কোন আলিমের আলোচনা পারস্পরিক বিতর্কের রূপ ধারণ করে, যা পরে তিরস্কার ও ভর্ৎসনার সীমা পর্যন্ত পেঁৗছে যায়। এরপর মূর্খতাসুলভ লড়াই ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে, যা আজকাল সাধারণত ধর্মপরায়ণতা ও মাযহাবপ্রীতির চিহ্ন হয়ে গেছে। অতএব আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই আমাদের অভিযোগ। ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ তকলীদ ও ইজতিহাদ সম্পর্কে এখানে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা এ বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সার। সাধারণ মুসলমানদের বোঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। পণ্ডিতসুলভ বিস্তারিত আলোচনা উসূলে ফিকাহ্‌র কিতাবাদিতে বিশেষ করে আল্লামা শাতেবীকৃত 'কিতাবুল মুয়াফাকাত' ৪র্থ খণ্ড, ইজতিহাদ অধ্যায়ে, আল্লামা সাইফুদ্দীন আমেদীকৃত 'আহকামুল আহকাম' ৩য় খণ্ড, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভীকৃত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' ও 'ইকদুল জীদ' এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানভীকৃত 'আল ইসতিসাদ ওয়াল ইজতিহাদ' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

কোরআন বোঝার জন্য হাদীস জরুরী ; হাদীস অস্বীকার কোরআন অস্বীকারের নামান্তর ঃ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ এ আয়াতে ذكر এর অর্থ সর্বসম্মতভাবে কোরআন পাক। আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদের কাছে কোরআনের আয়াত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে দিন। এতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন পাকের তত্ত্ব, তথ্য ও বিধানাবলী নির্ভুলভাবে বোঝা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু আরবী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান-লাভ করেই কোরআনের বিধানাবলী আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত পন্থায় বোঝাতে সক্ষম হত, তবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব অর্পণ করার কোন অর্থ থাকত না।

আল্লামা শাতেবী 'মুয়াফাকাত' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, হাদীস আগাগোড়া কোরআনের ব্যাখ্যা। কেননা, কোরআন রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে বলেছে ঃ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ—হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) এই মহান চরিত্রের

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ كان خلقه القران এর সারমর্ম এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে যে কোন উক্তি ও কার্য বর্ণিত রয়েছে, তা সব কোরআনেরই বক্তব্য। কোন কোনটি বাহ্যত কোন আয়াতের তফসীর ও ব্যাখ্যা, যা সাধারণ আলিমরা জানেন এবং কোন কোনটি বাহ্যত কোরআনে নেই, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অন্তরে তা ওহী হিসাবে প্রক্ষিপ্ত করা হয়। এটাও একদিক দিয়ে কোরআনই। কেননা, কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কোন কথাই মনগড়া নয়; বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী হিসাবে প্রক্ষিপ্ত। وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى

এতে জানা গেল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইবাদত, লেনদেন, চরিত্র ও অভ্যাস সবই আল্লাহ্ তা'আলার ওহী ও কোরআনী নির্দেশের অনুসৃতি। তিনি যেখানেই নিজ ইজতিহাদ দ্বারা কোন কাজ করেছেন, সেখানে ওহী কিংবা নিষেধ না করার মাধ্যমে সত্যায়ন ও সমর্থন করা হয়েছে। ফলে তাও ওহীরই অনুসৃতি।

মোটকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কোরআনের ব্যাখ্যা ও বর্ণনাকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়তের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছে; যেমন সূরা জুম'আ ও অন্যান্য সূরার কতিপয় আয়াতে গ্রন্থ শিক্ষাদান বলে এ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে।

অপরদিকে সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগের হাদীসবিদ পর্যন্ত প্রতিভাধর মনীষীবৃন্দ প্রাণের চাইতেও অধিক হিফাযত করে হাদীসের একটি বিশাল ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরা এর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সারাজীবন ব্যয় করে হাদীস বর্ণনার কিছু স্তর নির্ধারণ করেছেন। তাঁরা যেসব হাদীসকে সনদের দিক দিয়ে শরীয়তের বিধানাবলীর ভিত্তি হওয়ার যোগ্য পান নি, সেগুলোকে পৃথক করে এমন হাদীসসমূহ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন যেগুলো সারা জীবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার পর বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে।

যদি আজ কেউ হাদীসের এই ভাণ্ডারকে কোন ছলছুতায় অনির্ভরযোগ্য আখ্যায়িত করে, তবে এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কোরআনী নির্দেশ অমান্য করে কোরআনের বিষয়বস্তু বর্ণনা করেন নি; কিংবা তিনি বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু তা অব্যাহত ও সংরক্ষিত থাকেনি। উভয় অবস্থাতেই অর্থগতভাবে কোরআন সংরক্ষিত রইল না। অথচ এর সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা একথা বলে গ্রহণ করেছিলেন ঃ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ অতএব উপরোক্ত দাবী কোরআনের এ আয়াতের পরিপন্থী হবে। এতে প্রমাণিত হল যে, যে ব্যক্তি হাদীস অস্বীকার করে, সে প্রকৃতপক্ষে কোরআনই অস্বীকার করে। نعوذ بالله

اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ

أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ۝ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

(৪৫) যারা কুচক্র করে, তারা কি এ বিষয়ে ভয় করে না যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন কিংবা তাদের কাছে এমন জায়গা থেকে আযাব আসবে, যা তাদের ধারণাতীত ? (৪৬) কিংবা চলাফেরার মধ্যেই তাদেরকে পাকড়াও করবে, তারা তো তা ব্যর্থ করতে পারবে না। (৪৭) কিংবা ভীতি প্রদর্শনের পর তাদেরকে পাকড়াও করবেন ? তোমাদের পালনকর্তা তো অত্যন্ত নম্র, দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা (সত্য ধর্মকে পর্যুদস্ত করার জন্য) জঘন্য চক্রান্ত করে (কোথাও অমূলক সন্দেহ ও আপত্তি উত্থাপন করে এবং সত্যকে অস্বীকার করে; এটা নিজেদের বিপথ-গামিতা এবং কোথাও অপর লোকদেরকে বাধা দান করে; এটা অপরকে বিপথগামী করা।) তারা কি (কুফরের এসব কর্মকাণ্ড করে) এ বিষয় থেকে নিশ্চিন্তে (বসে) রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (কুফরের শাস্তিতে) ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন কিংবা এমন জায়গা থেকে তাদের ওপর আযাব আসবে যে, তারা কল্পনাও করেতে পারবে না (যেমন বদর যুদ্ধে নিরস্ত্র মুসলমানদের হাতে তারা মার খেয়েছে। অথচ তারা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারত না যে, এরা জয়ী হয়ে যাবে।) কিংবা তাদেরকে চলাফেরার মধ্যে (কোন বিপদ দ্বারা) পাকড়াও করবে (যেমন অকস্মাৎ কোন রোগ আক্রমণ করে বসে) অতএব (এগুলোর মধ্যে যদি কোনটি সংঘটিত হয়ে যায়, তবে) তারা আল্লাহ্‌কে পরাভূত (-ও) করতে পারবে না কিংবা তাদেরকে ক্রমহ্রাস করত পাকড়াও করে ফেলবে (যেমন দুর্ভিক্ষ ও মহামারী শুরু হয়ে আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ তাদের নিশ্চিন্ত না হওয়া উচিত। আল্লাহ্ সবই করতে পারেন, কিন্তু তিনি অবকাশ দিয়ে রেখেছেন;) অতএব (এর কারণ এই যে) তোমাদের পালনকর্তা অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু। (তাই সময় দিয়েছেন যে, এখনও তোমাদের সুমতি ফিরে আসুক এবং তোমরা সাফল্য ও মুক্তির পথ অবলম্বন কর।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيهِمْ —বলে কাফিরদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে ভয়

প্রদর্শনার্থে বলা হয়েছে যে, পরকালের শাস্তির পূর্বে দুনিয়াতেও আল্লাহর আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করতে পারে। তোমরা যে মাটির ওপর বসে আছ, তার অভ্যন্তরেই তোমাদেরকে বিলীন করে দেওয়া যেতে পারে ; কিংবা কোন ধারণাতীত জায়গা থেকে তোমরা আযাবে পতিত হতে পার ; যেমন বদর যুদ্ধে এক হাজার অস্ত্রসজ্জিত বীরযোদ্ধা কয়েকজন নিরস্ত্র মুসলমানের হাতে এমন মার খেয়েছে, যার কল্পনাও তারা করতে পারত না। কিংবা এটাও হতে পারে যে, চলাফেরার মধ্যেই তোমরা কোন আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাও ; যেমন কোন দুরারোগ্য প্রাণঘাতী ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে অথবা উচ্চস্থান থেকে পতিত হয়ে অথবা শক্ত জিনিসের সাথে টক্কর লেগে মৃত্যুমুখে পতিত হতে পার কিংবা এরূপ শাস্তিও হতে পারে যে, অকস্মাৎ আযাব না এসে টাকা-পয়সা, স্বাস্থ্য এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সামগ্রী আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকবে এবং এভাবে হ্রাস পেতে পেতে গোটা সম্প্রদায়ই একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

আয়াতে ব্যবহৃত تَخَوُّف শব্দটি خَوْف—ভয় করা থেকে উদ্ভূত। এ অর্থের দিক দিয়ে কেউ কেউ তফসীর করেছেন যে, একদলকে আযাবে ফেলে অপর দলকে ভয় প্রদর্শন করা হবে। এভাবে দ্বিতীয় দলকে আযাবে গ্রেফতার করে তৃতীয় দলকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা হবে। এমনিভাবে ভয় প্রদর্শন করতে করতে সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

কিন্তু তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ প্রমুখ এখানে تَخَوُّف এর অর্থ নিয়েছেন تَنَقُّص অর্থাৎ হ্রাস পাওয়া। এদিক দিয়েই ক্রমহ্রাসপ্রাপ্তি তরজমা করা হয়েছে।

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেন : হযরত উমর ফারূক (রা)-ও تَخَوُّف শব্দের অর্থ বুঝাতে সক্ষম হন নি। ফলে তিনি প্রকাশ্য মিম্বরে সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন : আপনারা تَخَوُّف শব্দের কি অর্থ বুঝেছেন ? সবাই নিশ্চুপ, কিন্তু হুযায়ল গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলল : আমীরুল মু'মিনীন, এটি আমাদের গোত্রের বিশেষ ভাষা। আমাদের ভাষায় এর অর্থ تَنَقُّص অর্থাৎ আস্তে আস্তে হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়া। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন : আরব কাব্যে এই শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কি ? জবাবে বলা হল : হ্যাঁ। অতঃপর তিনি স্বগোত্রের কবি আবু কবীর হুযায়লীর একটি কবিতা পেশ করলেন। তাতে تَخَوُّف শব্দটি আস্তে আস্তে হ্রাস করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। তখন খলীফা বললেন : তোমরা অন্ধকার যুগের কাব্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন কর। কারণ, তা দ্বারা কোরআনের তফসীর ও তোমাদের কথাবার্তার অর্থের ফয়সালা হয়।

কোরআন বোঝার জন্য যেনতেন আরবী জানা যথেষ্ট নয় : এ থেকে প্রথমত জানা গেল যে, আরবী ভাষা বলা ও লেখার মামুলী যোগ্যতা কোরআন বোঝার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং এতে এতটুকু দক্ষতা অর্জন করা জরুরী, যদ্দ্বারা প্রাচীন যুগের আরবদের কবিতাও পুরোপুরি বোঝা যায়। কেননা, কোরআন তাদেরই ভাষায় এবং তাদেরই

বাকপদ্ধতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই ঐ স্তরের আরবী সাহিত্য শিক্ষা করা মুসলমানদের জন্যে অপরিহার্য।

আরবী সাহিত্য শিক্ষার জন্য অন্ধকার যুগের কবিদের কাব্য পাঠ করা জায়েয; যদিও তাতে অশ্লীল কথাবার্তা আছে: এ থেকে আরও জানা গেল যে, কোরআন বোঝার জন্য অন্ধকার যুগের আরবী সাহিত্য পাঠ করা জায়েয এবং সেই যুগের শব্দার্থ ও পড়ানো জায়েয; যদিও একথা সুপরিজ্ঞাত যে, তাদের কবিতায় জাহিলিয়াসুলভ আচরণবিধি এবং ইসলাম বিরোধী ক্রিয়াকর্ম বর্ণিত হবে। কিন্তু কোরআন বোঝার প্রয়োজনে এগুলো পড়া ও পড়ানো বৈধ করা হয়েছে।

দুনিয়ার আযাবও এক প্রকার রহমত: আলোচ্য আয়াতসমূহে দুনিয়ার বিভিন্ন আযাব বর্ণনা করার পর সবশেষে বলা হয়েছে إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ এতে প্রথমে رب শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে হুঁশিয়ার করার জন্য দুনিয়ার আযাব হচ্ছে প্রতিপালকত্বের তাকিদ। এরপর তাকিদের لَام সহকারে আল্লাহর দয়ালু হওয়া ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার হুঁশিয়ারি প্রকৃতপক্ষে স্নেহ ও দয়ার কারণেই হয়ে থাকে, যাতে গাফিল মানুষ হুঁশিয়ার হয়ে স্বীয় কর্মকাণ্ড সংশোধন করে নেয়।

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٥١﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُونَ

لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٥٧﴾

(৪৮) তারা কি আল্লাহ্‌র সৃজিত বস্তু দেখে না, যার ছায়া আল্লাহ্‌র প্রতি বিনীত-ভাবে সিজদাবনত থেকে ডান ও বাম দিকে ঝুঁকে পড়ে। (৪৯) আল্লাহ্‌কে সিজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে আছে এবং ফিরিশতাগণ; তারা অহংকার করে না। (৫০) তারা তাদের ওপর পরাক্রমশালী তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং তারা যা আদেশ পায়, তা করে। (৫১) আল্লাহ্ বললেনঃ তোমরা দুই উপাস্য গ্রহণ করো না —উপাস্য তো মাত্র একজনই। অতএব আমাকেই ভয় কর। (৫২) যা কিছু নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আছে তা তাঁরই এবং তাঁরই ইবাদত করা শাশ্বত কর্তব্য। তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে ভয় করবে? (৫৩) তোমাদের কাছে যে সমস্ত নিয়ামত আছে, তা আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে। অতঃপর তোমরা যখন দুঃখ-কষ্টে পতিত হও তখন তাঁরই নিকট কান্নাকাটি কর। (৫৪) এরপর যখন আল্লাহ্ তোমাদের কষ্ট দূরীভূত করে দেন, তখনই তোমাদের একদল স্বীয় পালনকর্তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করতে থাকে, (৫৫) যাতে ঐ নিয়ামত অস্বীকার করে, যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। অতএব মজা ভোগ করে নাও—সত্বরই তোমরা জানতে পারবে। (৫৬) তারা আমার দেওয়া জীবনোপকরণ থেকে তাদের জন্য একটি অংশ নির্ধারিত করে, যাদের কোন খবরই তারা রাখে না। আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা যে অপবাদ আরোপ করছ, সে সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। (৫৭) তারা আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে—তিনি পবিত্র মহিমান্বিত এবং নিজেদের জন্য ওরা তাই স্থির করে যা ওরা চায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা কি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুসমূহ দেখেনি, (এবং দেখে তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করেনি) যাদের ছায়া কখনও একদিকে, কখনও অন্যদিকে এমতাবস্থায় ঝুঁকে পড়ে যে, তারা আল্লাহ্‌র (আদেশের সম্পূর্ণ) অধীন? (অর্থাৎ ছায়ার কারণসমূহ, যেমন সূর্যের ঔজ্জ্বল্য ও ছায়াবিশিষ্ট দেহের ঘনত্ব এবং ছায়ার গতির কারণ অর্থাৎ সূর্যের গতি, এরপর ছায়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ, এগুলো সব আল্লাহ্‌র আজ্ঞাধীন) এবং (ছায়াবিশিষ্ট) সেসব বস্তুও (আল্লাহ্‌র সামনে) অক্ষম (ও তাঁরই আজ্ঞাবহ)। এবং (উল্লিখিত বস্তু-সমূহের গতিবিধি তাদের ইচ্ছাধীন নয়। ظلال শব্দের দিকে) يتفيؤ-এর اسناد থেকে তা বোঝা যায়। কেননা ইচ্ছাগত গতিশীল বস্তুর মধ্যে ছায়ার গতি স্বয়ং সে বস্তুর গতি থেকে সৃষ্টি হয়। এসব বস্তু যেমন আল্লাহ্‌র আজ্ঞাধীন, তেমনি) আল্লাহ্ তা'আলারই আজ্ঞাধীন (ইচ্ছায়) চলমান যত বস্তু আকাশসমূহে (যেমন, ফেরেশতা) এবং পৃথিবীতে (যেমন, জীবজন্তু) বিদ্যমান রয়েছে এবং (বিশেষভাবে) ফেরেশতারা। বস্তুত তারা (ফেরেশতারা) উচ্চ স্থান ও উচ্চ মর্তবায় (অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র

আনুগত্যের ব্যাপারে) অহংকার করে না (এবং একারণেই বিশেষভাবে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও তারা مَا فِى السَّمٰوٰتِ—এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।) তারা স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় করে, যিনি সর্বোপরি এবং তাদেরকে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) যে আদেশ দেওয়া হয় তারা তা পালন করে। আল্লাহ্ তা'আলা (সবাইকে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে) বলেছেন, দুই (অথবা অধিক) উপাস্য সাব্যস্ত করো না। অতএব একজনই উপাস্য। (কাজেই) তোমরা বিশেষভাবে আমাকেই ভয় কর (কারণ, আমিই যখন বিশেষভাবে উপাস্য, তখন এর যেসব অত্যাবশ্যকীয় শর্ত রয়েছে—যেমন, অপার শক্তির অধিকারী হওয়া ইত্যাদি, সেগুলোও আমারই বৈশিষ্ট্য হবে। সুতরাং প্রতিশোধ ইত্যাদির ভয় আমার প্রতিই করা উচিত। শিরক প্রতিশোধস্পৃহার উন্মেষ ঘটায়। সুতরাং শিরক থেকে বেঁচে থাকা উচিত।) এবং তাঁরই (মালিকানায়) রয়েছে যাবতীয় বস্তুনিচয়, যা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে রয়েছে এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য (অর্থাৎ তিনিই যোগ্য যে, সবাই তাঁর আনুগত্য করবে। যখন একথা প্রমাণিত) অতঃপর তবুও কি আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে ভয় করছ? (এবং অপরকে ভয় করে তার পূজা করছ?) এবং (ভয়ের যোগ্য যেমন আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ নেই, তেমনি নিয়ামতদাতা ও আশার যোগ্য আল্লাহ্ ছাড়া কেউ নেই। সেমতে) তোমাদের কাছে যা কিছু (এবং যে কোন প্রকার) নিয়ামত রয়েছে, তা সবই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। অতঃপর তোমরা যখন (সামান্য) কষ্ট পাও, তখন (তা দূরীভূত হওয়ার জন্য) তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র) কাছেই ফরিয়াদ কর (তখন কোন বিগ্রহ-প্রতিমার কথা মনে থাকে না)। (সে সময় তোমাদের কর্মজনিত স্বীকারোক্তির দ্বারাও জানা যায় যে, তওহীদই সত্য। কিন্তু) এরপর যখন (আল্লাহ্) তোমাদের উপর থেকে কষ্টকে অপসারিত করেন, তখন তোমাদের এক (বড়) দল পালনকর্তার সাথে (পূর্ববৎ) শিরক করতে থাকে। (এর সারমর্ম এই যে) আমার দেওয়া নিয়ামতের (অর্থাৎ কষ্ট অপসারণের) নাশোকরী করে। (এটা যুক্তিগতভাবেও মন্দ।) যাক, ক্ষণিক মজা লুটে নাও (দেখ) অতিসত্বর (মৃত্যুর পরই) তোমরা জানতে পারবে। ('একদল' বলার কারণ এই যে, কিছুসংখ্যক লোক এ অবস্থা স্মরণে রেখে তাওহীদ ও ঈমানের ওপর কায়েম হয়ে যায় যেমন, বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ এবং (তারা যেসব শিরক করে, তন্মধ্যে একটি এই যে) তারা আমার দেওয়া বস্তুসমূহের মধ্যে তাদের (অর্থাৎ উপাস্যদের) অংশ স্থির করে, যাদের (উপাস্য হওয়া) সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান (এবং প্রমাণ ও সনদ) নেই। এর বিস্তারিত বিবরণ ৮ম পারার তৃতীয় রুকুতে وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের এসব মিথ্যা অপবাদ সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন) অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে। (তাদের অপর একটি শিরক এই যে)

তারা আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সাব্যস্ত করে। (সোবহানাল্লাহ্, কেমন বাজে কথা)! এবং (উপরোক্ত) নিজেদের পছন্দসই (অর্থাৎ পুত্র পছন্দ করে)।

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾

(৫৮) যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কাল হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। (৫৯) তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে। শুনে রাখ, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট। (৬০) যারা পরকাল বিশ্বাস করে না তাদের উদাহরণ নিকৃষ্ট এবং আল্লাহ্‌র উদাহরণই মহান, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের অর্থাৎ কন্যা জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হয়, (যা তারা আল্লাহ্‌র জন্য সাব্যস্ত করে) তখন (এতই অসন্তুষ্ট হয় যে,) সারা দিন তার মুখ বিবর্ণ হয়ে থাকে এবং সে মনে মনে জ্বলতে থাকে এবং যে বিষয়ের সংবাদ দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ কন্যা জন্মগ্রহণ) তার লজ্জায় মানুষের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে ফেরে (এবং মনে মনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয় যে) তাকে (নবজাতকে) অপমান সহ্য করে রেখে দেবে, না (জীবিত অবস্থায় অথবা মেরে) মাটিতে পুঁতে ফেলবে। মনে রেখো, তাদের এ ফয়সালা খুবই মন্দ। (প্রথমত আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা—এটা কতই না মন্দ! এরপর সন্তানও কোনটি? যাকে তারা নিজেদের জন্য এতটুকু লজ্জা ও অপমানের বিষয় বলে মনে করে।) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অভ্যাস মন্দ (দুনিয়াতেও—কারণ, তারা এ ধরনের মূর্খতায় লিপ্ত রয়েছে এবং পরকালেও—কারণ, এজন্য তাদেরকে শাস্তি ও অপমানে পতিত হতে হবে।) এবং আল্লাহ্‌র জন্য সর্বোচ্চ গুণাবলী প্রমাণিত রয়েছে (মুশরিকরা যা বলে তা নয়) এবং তিনি পরাক্রমশালী (যদি তাদেরকে দুনিয়াতে শিরকের শাস্তি দিতে চান, তবে তার পক্ষে মোটেই তা কঠিন নয়, কিন্তু

সাথে সাথেই) প্রজ্ঞাময় (-ও বটে। তাঁর অপরিমেয় প্রজ্ঞাহেতু তিনি মৃত্যুর পর পর্যন্ত শাস্তি পিছিয়ে দিয়েছেন)।

•

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফিরদের দু'টি বদ অভ্যাসের নিন্দা করা হয়েছে। প্রথম, তারা নিজেদের ঘরে কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণকে এত খারাপ মনে করে যে, লজ্জায় মানুষের সামনে দেখা পর্যন্ত দেয় না এবং চিন্তা করতে থাকে যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণের কারণে তার যে বেইয্যতি হয়েছে, তা মেনে নিয়ে সবর করবে, না একে জীবিত কবরস্থ করে এ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে। উপরন্তু মূর্খতা এই যে, যে সন্তানকে তারা নিজেদের জন্য পছন্দ করে না, তাকেই আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলে যে, ফেরেশতারা হল আল্লাহ্ তা'আলার কন্যা।

দ্বিতীয় আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ তফসীরে বাহ্‌রে-মুহীতে ইবনে আতিয়্যার বরাত দিয়ে এ বাক্যের মর্ম উপরোক্ত দু'টি বদ অভ্যাসকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমত তাদের এ ফয়সালাটিই মন্দ যে, কন্যা সন্তান শাস্তি ও বেইয্যতির কারণ। দ্বিতীয়ত যে বস্তুকে তারা নিজেদের জন্য বেইয্যতি মনে করে, তাকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে।

তৃতীয় আয়াতের শেষে وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ বাক্যেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণকে বিপদ ও অপমান মনে করা এবং মুখ লুকিয়ে ফেরা আল্লাহ্‌র রহস্যের মুকাবিলা করার নামান্তর। কেননা, নর ও নারীর সৃষ্টি আল্লাহ্‌র একটি সাক্ষাত প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধি।—(রূহুল বয়ান)

মাস'আলা : আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে, কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণকে বিপদ ও অপমান মনে করা বৈধ নয়। এটা কাফিরদের কাজ। তফসীর রূহুল বয়ানে উল্লিখিত রয়েছে যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে মুসলমানদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত, যাতে অন্ধকার যুগের কুপ্রথার খণ্ডন হয়ে যায়। এক হাদীসে বলা হয়েছে, ঐ মহিলা পুণ্যময়ী, যার প্রথম গর্ভের সন্তান কন্যা হয়। কোরআন পাকের يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ —আয়াতে কন্যার কথা অগ্রে উল্লেখ করায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রথম গর্ভ থেকে কন্যা জন্মগ্রহণ করা উত্তম।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, কন্যা সন্তানদের সাথে যে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে, অতঃপর সে যদি তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তাহলে তার ও জাহান্নামের মধ্যে সেই সন্তানেরা প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে।—(রূহুল বয়ান)

সূচী-পত্র

মোটকথা, কন্যা সন্তানকে খারাপ মনে করা জাহিলিয়াত যুগের কুপ্রথা। এ থেকে মুসলমানদের বেঁচে থাকা উচিত এবং এর বিপরীতে আল্লাহ্র ওয়াদায় মুসলমানদের আনন্দিত ও সন্তুষ্ট থাকা কর্তব্য।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ
وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ
لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝٦١ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ
مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ؕ
لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ۝٦٢ تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ
اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ
وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٦٣ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝٦٤ وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۝٦٥

(৬১) যদি আল্লাহ্ লোকদেরকে তাদের অন্যায় কাজের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূ-পৃষ্ঠে চলমান কোন কিছুকেই ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুত সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের মৃত্যু এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তও বিলম্বিত কিংবা ত্বরান্বিত করতে পারবে না। (৬২) যা নিজেদের মন চায় না তাই তারা আল্লাহ্র জন্য সাব্যস্ত করে এবং তাদের জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে যে, তাদের জন্য রয়েছ কল্যাণ। স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, তাদের জন্য রয়েছে আগুন এবং তাদেরকেই সর্বাগ্রে নিক্ষেপ করা হবে। (৬৩) আল্লাহ্র কসম, আমি আপনার পূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে রসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর শয়তান তাদেরকে কর্মসমূহ শোভনীয় করে দেখিয়েছে। আজ সে-ই তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৬৪) আমি আপনার প্রতি এ জন্যই গ্রন্থ নাযিল করেছি, যাতে আপনি সরল পথ প্রদর্শনের জন্য তাদেরকে পরিষ্কার বর্ণনা করে দেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে

এবং ঈমানদারকে ক্ষমা করার জন্য। (৬৫) আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তদ্দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেছেন। নিশ্চয় এতে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা শ্রবণ করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যদি আল্লাহ্ তা'আলা (অন্যায়কারী) লোকদেরকে তাদের অন্যায় কর্মের (শিরক ও কুফরের) কারণে (তাৎক্ষণিকভাবে দুনিয়াতে পুরোপুরি) পাকড়াও করতেন, তবে ভূ-পৃষ্ঠের উপর (চেতনাশীল ও) চলমান কাউকে ছাড়তেন না (বরং সবাইকে ধ্বংস করে দিতেন) কিন্তু (তিনি তাৎক্ষণিকভাবে পাকড়াও করেন না বরং) একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন (যাতে কেউ তওবা করতে চাইলে তা করতে পারে)। অতঃপর যখন তাদের (ঐ) নির্দিষ্ট সময় (নিকটে) এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তও (তা থেকে) পিছু সরতে পারবে না এবং এগিয়ে আসতেও পারবে না (বরং তৎক্ষণাৎ শাস্তি হয়ে যাবে।) তারা আল্লাহ্‌র জন্য সেসব বিষয় সাব্যস্ত করে যেগুলো স্বয়ং (নিজেদের জন্য) অপছন্দ করে—(যেমন, পূর্বে বর্ণিত হয়েছে وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ) এবং মুখে মিথ্যা দাবী করতে থাকে যে, তাদের (অর্থাৎ আমাদের) জন্য যদি কিয়ামত হবে বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে তাতে সর্বপ্রকার মঙ্গল (নিহিত) রয়েছে। (আল্লাহ্ বলেন, মঙ্গল আসবে কোথেকে? বরং) অনিবার্য কথা এই যে, কিয়ামতের দিন। তাদের জন্য রয়েছে দোযখ এবং নিশ্চয়ই তারা (দোযখে) সর্বপ্রথম নিক্ষিপ্ত হবে। হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি তাদের কুফর ও মূর্খতার কারণে দুঃখিত হবেন না। কেননা, আল্লাহ্‌র কসম, আপনার (যুগের) পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের কাছেও আমি রসূল প্রেরণ করেছিলাম, (যেমন আপনাকে তাদের কাছে পাঠিয়েছি) অতঃপর (এরা যেমন নিজেদের কুফরী কর্মসমূহকে পছন্দ করে এগুলোকে আঁকড়ে রয়েছে, তেমনি) শয়তানও তাদেরকে তাদের (কুফরী) কাজকর্ম শোভনীয় করে দেখিয়েছে। সুতরাং সে-ই (শয়তানই) আজ তাদের সহচর (যেমন দুনিয়াতে সহচর ছিল এবং তাদেরকে বিপথগামী করত। এ হচ্ছে তাদের দুনিয়ার ক্ষতি) এবং (কিয়ামতে) তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (মোট কথা এই পরবর্তীরাও পূর্ববর্তীদের মত কুফর করছে এবং তাদের মতই এদেরও শাস্তি হবে। আপনি কেন চিন্তা করবেন?) আমি আপনার প্রতি এ গ্রন্থ (কোরআন এজন্য নাযিল করিনি যে, সবাইকে সৎপথে আনা আপনার দায়িত্ব হবে, যাতে কেউ কেউ সৎপথে না আসলে আপনি দুঃখিত হবেন; বরং) শুধু এজন্য নাযিল করেছি, যাতে যে (ধর্মীয়) বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে (যেমন, তওহীদ, পরকাল ও হালাল-হারামের বিষয়) তা আপনি (সাধারণ) লোকদের কাছে প্রকাশ করে দেন। (কোর-আনের এ উপকারটি ব্যাপক।) এবং বিশ্বাসীদের (বিশেষ) হিদায়ত ও রহমতের জন্য (নাযিল করেছেন। অতএব আল্লাহ্‌র ফযলে এসব বিষয় অর্জিত হয়েছে।) আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর তদ্দ্বারা যমীনকে মৃত হওয়ার

পর জীবিত করেছেন (অর্থাৎ শুষ্ক হয়ে তার উৎপাদন শক্তি দুর্বল হওয়ার পর তাকে সতেজ করেছেন।) এতে (উল্লিখিত বিষয়ে) তাদের জন্য (তওহীদ ও নিয়ামতদাতা হওয়ার) বড় প্রমাণ রয়েছে, যারা (মনোযোগ দিয়ে এসব কথাবার্তা) শ্রবণ করে।

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾

---

(৬৬) তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তুসমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুগ্ধ যা পানকারীদের জন্য উপাদেয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (এছাড়া) চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও তোমাদের চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। (দেখ) তাদের পেটে যে গোবর ও রক্ত (অর্থাৎ রক্তের উপকরণ) রয়েছে, তার মাঝখান দিয়ে (দুধের উপকরণ, যা রক্তেরই এক অংশ—হজমের পর পৃথক করে স্তনের প্রকৃতি অনুযায়ী বড় পরিবর্তন করে, তাকে) পরিষ্কার ও সহজে গলাধঃকরণযোগ্য দুধ (করে) আমি তোমাদেরকে পান করতে দেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

بُطُونِهِ শব্দের সর্বনামটি انعام কে বোঝায়। انعام বহুবচন, স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ার কারণে بُطُونِهَا বলা ব্যাকরণসম্মত ছিল। যেমন, সূরা মু'মিনুনে এভাবেই نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا বলা হয়েছে।

কুরতুবী এর কারণ বর্ণনা করে বলেন : সূরা মু'মিনুনে বহুবচনের অর্থের দিকে লক্ষ্য করে সর্বনাম স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সূরা নাহ্‌লে বহুবচনের রেয়াত করে সর্বনাম পুংলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবদের বাচন পদ্ধতিতে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। তারা বহুবচন শব্দের জন্য একবচন সর্বনাম ব্যবহার করে।

গোবর ও রক্তের মাঝখান দিয়ে পরিষ্কার দুধ বের করা সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন : জন্তুর ভক্ষিত ঘাস তার পাকস্থলীতে একত্রিত হলে পাকস্থলী তা সিদ্ধ করে। পাকস্থলীর এই ক্রিয়ার ফলে খাদ্যের বিষ্ঠা নিচে বসে যায় এবং দুধ

উপরে থেকে যায়। দুধের উপরে থাকে রক্ত। এরপর যকৃত এই তিন প্রকার বস্তুকে পৃথকভাবে তাদের স্থানে ভাগ করে দেয়, রক্ত পৃথক করে রগের মধ্যে চালায় এবং দুধ পৃথক করে জন্তুর স্তনে পৌঁছে দেয়। এখন পাকস্থলীতে শুধু বিষ্ঠা থেকে যায়, যা গোবর হয়ে বের হয়ে আসে।

মাস'আলা ঃ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য ব্যবহার করা দীনদারীর পরিপন্থী নয়। তবে শর্ত এই যে, হালাল পথে উপার্জন করতে হবে এবং অপব্যয় যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। হযরত হাসান বসরী (র.) তাই বলেছেন।—(কুরতুবী)

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা আহারের সময় এরূপ দোয়া করবে---- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ —অর্থাৎ হে আল্লাহ্। আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং ভবিষ্যতে আরও উত্তম খাদ্য দিন। তিনি আরও বলেছেন ঃ দুধ পান করার সময় এরূপ দোয়া করবে— اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ---অর্থাৎ হে আল্লাহ্। আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং আরও বেশি দান করুন। এর চাইতে উত্তম খাদ্য চাওয়া হয়নি। কারণ, মানুষের খাদ্য তালিকায় দুধের চাইতে উত্তম কোন খাদ্য নেই। তাই আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর প্রথম খাদ্য করেছেন দুধ, যা মায়ের স্তন থেকে সে লাভ করে।—(কুরতুবী)

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّ
رِزْقًا حَسَنًا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

---

(৬৭) এবং খেজুর বৃক্ষ ও আঙুর ফল থেকে তোমরা মদ্য ও উত্তম খাদ্য তৈরী করে থাক, এতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (এছাড়া) খেজুর ও আঙুরের (ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত যে, এসব) ফল-সমূহ থেকে তোমরা নেশাকর দ্রব্যাদি ও উত্তম খাদ্যসামগ্রী (যেমন শুকনো খুর্মা, কিশমিশ শরবত ও সির্কা ইত্যাদি) তৈরী করে থাক। নিঃসন্দেহে এতে (-ও তওহীদ এবং তাঁর মহান ও উদার হওয়া সম্পর্কে) সে সব লোকদের জন্য বড় দলীল রয়েছে, যারা (সুস্থ) বোধশক্তিসম্পন্ন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার সেসব নিয়ামতের উল্লেখ ছিল, যা মানুষের খাদ্য দ্রব্যাদির প্রস্তুতিতে আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর আল্লাহ্র নৈপুণ্য ও কুদরতের প্রকাশক।

এ প্রসঙ্গে প্রথমে দুধের কথা উল্লিখিত হয়েছে, আল্লাহ্‌র কুদরত যা চতুষ্পদ জীব-জন্তুর উদরস্থিত রক্ত ও আবর্জনা জঞ্জালের মলিনতা থেকে পৃথক করে মানুষের জন্য স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন খাদ্যের আকারে প্রদান করেছে, যার প্রস্তুতিতে মানুষের অতিরিক্ত নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় না। এজন্যই পূর্ববর্তী আয়াতে نُسْقِيكُمْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, আমরা দুধ পান করিয়েছি।

এরপরে ইরশাদ করেছেন, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহের মধ্য থেকেও মানুষ তার খাদ্য ও লাভজনক সামগ্রী তৈরী করে। এই বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহ থেকে নিজেদের খাদ্যোপকরণ ও লাভজনক দ্রব্যসামগ্রীর প্রস্তুতিতে মানবীয় নৈপুণ্যেরও কিছুটা অবদান রয়েছে। আর এই নৈপুণ্যের ফলেই দু'ধরনের দ্রব্যসামগ্রী তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এর একটি হলো---মাদক দ্রব্য, যাকে মদ্য ও শরাব বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো---উত্তম জীবনোপকরণ অর্থাৎ উত্তম রিযিক। যেমন, খেজুর ও আঙ্গুরকে তাজা খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায় অথবা শুকিয়ে তাকে মজুতও করে নেওয়া যায়। সুতরাং মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার শক্তিবলে খেজুর ও আঙ্গুর ফল মানুষকে দান করেছেন এবং তদ্দ্বারা খাদ্য ইত্যাদি প্রস্তুত করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। এখন এটা তাদের নিজের অভিরুচি যে, কি প্রস্তুত করবে---মাদকদ্রব্য তৈরী করে বুদ্ধি-বিবেক নষ্ট করবে, না খাদ্য তৈরী করে শক্তি অর্জন করবে ?

এ তফসীর অনুযায়ী আলোচ্য আয়াত থেকে মাদকদ্রব্য অর্থাৎ মদ হালাল হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেননা, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বশক্তিমানের দান এবং সেগুলো ব্যবহার করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা। এগুলো সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র নিয়ামত ; যেমন যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী এবং উপাদেয় বস্তুসমূহ। অনেক মানুষ এগুলোকে অবৈধ পন্থায়ও ব্যবহার করে। কিন্তু ভ্রান্ত ব্যবহারের ফলে আসল নিয়ামতের পর্যায় থেকে তা বিয়োজিত হয়ে যায় না। তবে এখানে কোন্ ব্যবহারটি হালাল ও কোন্‌টি হারাম, তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। এতদসত্ত্বেও এখানে سكر-এর বিপরীত رزق حسن আনার কারণে জানা গেছে যে, سكر ভাল রিযিক নয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে سكر--এর অর্থ মাদকদ্রব্য, যা নেশা সৃষ্টি করে। ---(রূহুল মা'আনী, কুরতুবী, জাস্সাস)

(কোন কোন আলিমের মতে এর অর্থ সির্কা ও এমন নবীয, যা নেশা সৃষ্টি করে না। কিন্তু এখানে এ মতবিরোধ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।)

আলোচ্য আয়াতটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ। মদের নিষেধাজ্ঞা এর পরে মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময় মদ হালাল ছিল এবং মুসলমানরা সাধারণভাবে তা পান করত। কিন্তু তখনও এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মদ্যপান

ভাল নয়। পরবর্তীকালে স্পষ্টত শরাবকে কঠোরভাবে হারাম করার জন্য কোরআনে বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়।—(জাস্‌সাস, কুরতুবী—সংক্ষেপিত)

وَ اَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٦٩﴾

(৬৮) আপনার পালনকর্তা মধুমক্ষিকাকে আদেশ দিলেন: পর্বতগাত্রে, বৃক্ষ এবং উঁচু চালে গৃহ তৈরী কর, (৬৯) এরপর সর্বপ্রকার ফল থেকে ভক্ষণ কর এবং আপন আপন পালনকর্তার উন্মুক্ত পথসমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে,) আপনার পালনকর্তা মৌমাছির মনে একথা ঢেলে দিলেন যে, তুমি পাহাড়সমূহে গৃহ (অর্থাৎ মধুচক্র) তৈরী করে নাও এবং বৃক্ষসমূহে (-ও) এবং লোকেরা যে, দালানকোঠা নির্মাণ করে, তাতে (-ও চাক বানিয়ে নাও। সেমতে মৌমাছি এসব স্থানেই মধুচক্র তৈরী করে।) অতঃপর সর্বপ্রকার (বিভিন্ন) ফল থেকে (যা তোমার পছন্দসই হয়) চুষে খাও। এরপর (চুষে চাকের দিকে ফিরে আসার জন্য) স্বীয় পালনকর্তার পথসমূহে চল, যা (তোমার জন্য চলার ও মনে রাখার দিক দিয়ে) সহজ। (সেমতে মৌমাছি অনেক অনেক দূর থেকে রাস্তা না ভুলে চাকে ফিরে আসে। রস চুষে যখন চাকের দিকে ফিরে আসে, তখন) তার পেট থেকে এক-প্রকার পানীয় (অর্থাৎ মধু) নির্গত হয় যার রঙ বিভিন্ন। তাতে মানুষের (অনেক রোগের) জন্য প্রতিষেধক রয়েছে। এতে (-ও) তাদের জন্য (তওহীদ ও নিয়ামত দাতা হওয়ার) বড় প্রমাণ আছে যারা চিন্তা করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَوْحٰى—এখানে وحى শব্দটি পারিভাষিক অর্থে নয়, আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কাউকে কোন বিশেষ কথা গোপনে এমনভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যে, অন্য ব্যক্তি তা বুঝতে না পারে।

النحل—জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সুকৌশলের দিক দিয়ে মৌমাছি সমস্ত জন্তুর মধ্যে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সম্বোধনও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে করেছেন। অন্য জন্তুদের ব্যাপারে সামগ্রিক নীতি হিসাবে أعطى كل شيء خلقه ثم هدى বলেছেন, কিন্তু এই ছোট্ট প্রাণীটির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে أوحى ربك বলেছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটি অন্য জন্তুদের তুলনায় জ্ঞানবুদ্ধি, চেতনা ও বোধশক্তিতে একটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

মৌমাছিদের বোধশক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাদের শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে সুন্দররূপে অনুমান করা যায়। এই দুর্বল প্রাণীর জীবন ব্যবস্থা মানুষের রাজনীতি ও শাসননীতির সাথে চমৎকার খাপ খায়। সমগ্র আইন-শৃঙ্খলা একটি বড় মৌমাছির হাতে থাকে এবং সে-ই হয় মৌমাছিকুলের শাসক। তার চমৎকার সংগঠন ও কর্মবন্টনের ফলে গোটা ব্যবস্থা বিশুদ্ধ সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত হয়ে থাকে। তার অভাবনীয় ব্যবস্থা ও অলংঘনীয় আইন ও বিধিমালা দেখে মানব-বুদ্ধি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। স্বয়ং এই 'রাণী মৌমাছি' তিন সপ্তাহ সময়ের মধ্যে ছয় হাজার থেকে বার হাজার পর্যন্ত ডিম দেয়। দৈহিক গড়ন ও অঙ্গসৌষ্ঠবের দিক দিয়ে সে অন্য মৌমাছিদের চাইতে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সে কর্মবন্টন পদ্ধতি অনুসারে প্রজাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত করে। তাদের কেউ দ্বার রক্ষকের কর্তব্য পালন করে এবং অজ্ঞাত ও বাইরের জনকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় না। কেউ কেউ ডিমের হিফাযত করে। কেউ কেউ অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের লালন-পালনে নিয়োজিত। কেউ স্থাপত্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক কর্ম সমাধা করে। তাদের নির্মিত অধিকাংশ চাকে বিশ হাজার পর্যন্ত ঘর থাকে। কেউ কেউ মোম সংগ্রহ করে স্থপতিদের কাছে পৌঁছাতে থাকে। তারা মোম দ্বারা নিজেদের গৃহ নির্মাণ করে। তারা বিভিন্ন উদ্ভিদের উপর জমে থাকা সাদা ধরনের গুঁড়া থেকে মোম সংগ্রহ করে। আখের গায়ে এই সাদা গুঁড়া প্রচুর পরিমাণ বিদ্যমান থাকে। কোন কোন মৌমাছি বিভিন্ন প্রকার ফুল ও ফলের উপর বসে রস চুষে। এই রস তাদের পেটে পৌঁছে মধুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মধু মৌমাছি ও তাদের সন্তানদের খাদ্য এবং এটি আমাদের সবার জন্য সুস্বাদু খাদ্যনির্যাস এবং নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র। মৌমাছিদের এই বিভিন্ন দল অত্যন্ত তৎপরতা সহকারে নিজ নিজ কর্তব্য পালন এবং সম্রাজ্ঞীর প্রত্যেকটি আদেশ মনেপ্রাণে শিরোধার্য করে নেয়। যদি কোন মৌমাছি আবর্জনার স্তুপে বসে যায়, তবে চাকের দারোয়ান তাকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দান করে এবং সম্রাজ্ঞীর আদেশে তাকে হত্যা করা হয়। তাদের এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা ও কর্মকুশলতা দেখে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।—(আল জাওয়াহের)

اَوْحٰى رَبُّكَ—اِتَّخِذِىْ—বলে যেসব নির্দেশ বোঝানো হয়েছে, তন্মধ্যে এটা হচ্ছে প্রথম নির্দেশ। এতে নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, বসবাসের জন্য প্রত্যেক জন্তু অবশ্যই গৃহ নির্মাণ করে কিন্তু মৌমাছিদেরকে এমন গুরুত্ব সহকারে নির্মাণের আদেশ দানের বৈশিষ্ট্য কি? এছাড়া এখানে শব্দও بُيُوْت ব্যবহার করা হয়েছে, যা সাধারণত মানুষের বাসগৃহের অর্থে আসে। এতে প্রথমত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মৌমাছিদেরকে মধু তৈরী করতে হবে। এর জন্য প্রথম থেকেই তারা একটি সুরক্ষিত গৃহ নির্মাণ করে নিক। দ্বিতীয়ত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা যে গৃহ নির্মাণ করবে, তা সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের গৃহের মত হবে না, বরং তার গঠন ও নির্মাণ হবে অনন্যসাধারণ। সেমতে তাদের গৃহ সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের গৃহ থেকে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, যা দেখে মানব-বুদ্ধি বিস্ময়াভিভূত হয়ে যায়। তাদের গৃহ ছয় কোণাকৃতির হয়ে থাকে। স্কেল ও রুলার দিয়ে পরিমাপ করলেও তাতে চুল বরাবরও পার্থক্য ধরা পড়ে না। কোণাকৃতি ছাড়া অন্য কোন আকৃতি যেমন চতুর্ভুজ ও পঞ্চভুজ ইত্যাদি আকৃতি অবলম্বন না করার কারণ এই যে, এগুলোর কোন কোন বাহু অকেজো থেকে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা মৌমাছিদেরকে শুধু গৃহ নির্মাণেরই নির্দেশ দেননি, বরং গৃহের অবস্থানস্থলও নির্দেশ করেছেন যে, তা কোন উচ্চস্থানে হওয়া উচিত। কারণ, উঁচুস্থানে মধু টাটকা ও স্বচ্ছ বাতাস পায় এবং দূষিত বায়ু থেকে মুক্ত থাকে। এছাড়া ভাঙনের আশংকা থেকেও নিরাপদ থাকে। বলা হয়েছে ঃ

مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ—অর্থাৎ এসব গৃহ পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং সুউচ্চ দালানকোঠায় নির্মিত হওয়া উচিত, যাতে সুরক্ষিত পদ্ধতিতে মধু তৈরী হতে পারে।

ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ—এটা দ্বিতীয় নির্দেশ। এতে বলা হয়েছে যে, নিজেদের পছন্দমত ফল ও ফুল থেকে রস চুষে নাও। مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ দ্বারা বাহ্যত সারা বিশ্বের ফল-ফুল বোঝানো হয়নি, বরং যেসব ফল ও ফুল পর্যন্ত তারা অনায়াসে পৌঁছাতে পারে, সেগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। সাবার রাণীর ঘটনায়ও كُلّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ—বলা বাহুল্য, সেখানেও সারা বিশ্বের বস্তুসামগ্রী বোঝানো হয়নি, যদ্দরুন রাণীর কাছে উড়োজাহাজ, রেল, মোটর ইত্যাদি থাকাও জরুরী হয়ে পড়ে। বরং তখনকার সব রকমারি জিনিসপত্র বোঝানো হয়েছে।

এখানেও مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ বলে তাই বোঝানো হয়েছে। মৌমাছিরা এমন সব সুক্ষ্ম ও মূল্যবান নির্যাস আহরণ করে যে, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে মেশিনের সাহায্যেও এরূপ নির্যাস বের করা সম্ভবপর নয়।

فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا——এটা মৌমাছিকে প্রদত্ত তৃতীয় নির্দেশ। অর্থাৎ স্বীয় পালনকর্তার প্রস্তুতকৃত পথে চলমান হও। মৌমাছিরা যখন রস চুষে নেওয়ার জন্য গৃহ থেকে দূর-দূরান্তের কোথাও চলে যায়, তখন বাহ্যত তার গৃহে ফিরে আসা সুকঠিন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য পথ সহজ করে দিয়েছেন। সেমতে কয়েক মাইল দূরে গিয়েও কোনরূপ ভুল না করে নিজ গৃহে ফিরে আসে। আল্লাহ্ তা'আলা শূন্যে তার জন্য পথ করে দিয়েছেন। কেননা, ভূপৃষ্ঠের আঁকাবাঁকা পথে বিপথগামী হওয়ার আশংকা থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা শূন্যকে এই নগণ্য মাছির জন্য অনুবর্তী করে দিয়েছেন, যাতে সে বিনা বাধায়, অনায়াসে গৃহে আসা-যাওয়া করতে পারে।

এরপর ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত এই নির্দেশের যথাযথ ফলশ্রুতি বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ——অর্থাৎ তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়। এতে মানুষের জন্য রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। খাদ্য ও ঋতুর বিভিন্নতার কারণে মধুর রঙও বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণেই কোন বিশেষ অঞ্চলে কোন বিশেষ ফল-ফুলের প্রাচুর্য থাকলে সেই এলাকার মধুতে তার প্রভাব ও স্বাদ অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়। মধু সাধারণত তরল আকারে থাকে, তাই একে পানীয় বলা হয়েছে। এ বাক্যেও আল্লাহ্র একত্ব ও অপার শক্তির অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান। একটি ছোট্ট প্রাণীর পেট থেকে কেমন উপাদেয় ও সুস্বাদু পানীয় বের হয়! অথচ প্রাণীটি স্বয়ং বিষাক্ত। বিষের মধ্যে এই বিষ-প্রতিষেধক বাস্তবিকই আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির অভাবনীয় নিদর্শন। এরপর সর্বশক্তিমানের আশ্চর্যজনক কারিগরি দেখুন, অন্যান্য দুধের জন্তর দুধ ঋতু ও খাদ্যের পরিবর্তনে লাল ও হলদে হয় না, কিন্তু মৌমাছির মধু বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে।

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ——মধু যেমন বলকারক খাদ্য এবং রসনার জন্য আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক, তেমনি রোগ-ব্যাধির জন্যও ফলদায়ক ব্যবস্থাপত্র। কেন হবে না, স্রষ্টার ভ্রাম্যমাণ মেশিন সর্বপ্রকার ফল-ফুল থেকে বলকারক রস ও পবিত্র নির্যাস বের করে সুরক্ষিত গৃহে সঞ্চিত রাখে। যদি গাছ-গাছড়ার মধ্যে আরোগ্যলাভের উপাদান নিহিত থাকে, তবে এসব নির্যাসের মধ্যে কেন থাকবে না? কফজনিত রোগে সরাসরি এবং অন্যান্য রোগে অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশ্রিত হয়ে মধু ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসকরা মাজুন তৈরী করতে গিয়ে বিশেষভাবে একে অন্তর্ভুক্ত করেন। এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, নিজেও

নষ্ট হয় না এবং অন্যান্য বস্তুকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নষ্ট হতে দেয় না। এ কারণেই হাজারো বছর ধরে চিকিৎসকরা একে এলকোহল (Alcohol)-এর স্থলে ব্যবহার করে আসছেন। মধু বিরেচক এবং পেট থেকে দূষিত পদার্থ অপসারক। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে কোন এক সাহাবী তাঁর ভাইয়ের অসুখের বিবরণ দিলে তিনি তাকে মধু পান করানোর পরামর্শ দেন। দ্বিতীয় দিনও এসে আবার সাহাবী বললেনঃ অসুখ পূর্ববৎ বহাল রয়েছে। তিনি আবারও একই পরামর্শ দিলেন। তৃতীয় দিনও যখন সংবাদ এল যে, অসুখে কোন পার্থক্য হয়নি, তখন তিনি বললেনঃ صدق الله وكذب بطن اخيك—অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উক্তি নিঃসন্দেহে সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যাবাদী। উদ্দেশ্য এই যে, ওষুধের দোষ নেই। রোগীর বিশেষ মেযাজের কারণে ওষুধ দ্রুত কাজ করেনি। এরপর রোগীকে আবার মধু পান করানো হয় এবং সে সুস্থ হয়ে উঠে।

আলোচ্য আয়াতে شفاء শব্দটি نكرة تحت الاثبات—এতে মধু যে প্রত্যেক রোগের ওষুধ, তা বুঝা যায় না। কিন্তু شفاء শব্দের তানভীন যা تعظيم এর অর্থ দিচ্ছে, তা থেকে অবশ্যই বোঝা যায় যে, মধুর নিরাময়শক্তি বিরাট ও স্বতন্ত্র ধরনের। কিছুসংখ্যক আল্লাহ্‌ওয়ালা বুযুর্গ এমনও রয়েছেন, যাঁরা মধু সর্বরোগের প্রতিষেধক হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ। তাঁরা মহান পালনকর্তার উক্তির বাহ্যিক অর্থেই এমন প্রবল ও অটল বিশ্বাস রাখেন যে, তাঁরা ফোঁড়া ও চোখের চিকিৎসাও মধুর মাধ্যমে করেন এবং দেহের অন্যান্য রোগেরও। হযরত ইবনে ওমর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁর শরীরে ফোঁড়া বের হলেও তিনি তাতে মধুর প্রলেপ দিয়ে চিকিৎসা করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনে কি মধু সম্পর্কে বলেননি যে, فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ—(কুরতুবী)।

বান্দার সাথে আল্লাহ্ তদ্রূপ ব্যবহারই করেন, যেরূপ বান্দা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে। হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছেঃ انا عند ظن عبدى بى অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেনঃ বান্দা আমার প্রতি যে ধারণা পোষণ করে, আমি তার কাছেই থাকি (অর্থাৎ ধারণার অনুরূপ করে দেই)।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ—আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তির উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করার পর মানুষকে পুনরায় চিন্তা-ভাবনার আহবান জানিয়েছেন যে, তোমরা শক্তির এসব দৃষ্টান্ত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখ, আল্লাহ্ মৃত যমীনকে পানি বর্ষণের মাধ্যমে জীবিত করে দেন। তিনি ময়লা ও অপবিত্র বস্তুর মাঝখান দিয়ে তোমাদের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুপেয় দুধের নালি প্রবাহিত করেন। তিনি আঙুর ও খেজুর বৃক্ষে মিষ্ট ফল সৃষ্টি করেন, যদ্দ্বারা তোমরা সুস্বাদু শরবত ও মোরব্বা তৈরী কর। তিনি একটি ছোট্ট বিষাক্ত প্রাণীর মাধ্যমে তোমাদের জন্য মুখ-

রোচক খাদ্য ও নিরাময়ের চমৎকার উপাদান সরবরাহ করেন। এরপরও কি তোমরা দেব-দেবীরই আরাধনা করবে? এরপরও কি তোমাদের ইবাদত ও আনুগত্য স্রষ্টা ও মালিকের পরিবর্তে পাথর ও কাঠের নিষ্প্রাণ মূর্তিদের জন্য নিবেদিত হবে? ভালোভাবে বুঝে নাও, এ বিষয়টিও কি তোমাদের বোধগম্য হতে পারে যে, এগুলো সব কোন অন্ধ, বধির, চেতনাহীন বস্তুর লীলাখেলা হবে? শিল্প-কারিগরির এই অসংখ্য উজ্জ্বল নিদর্শন, জ্ঞান ও কৌশলের এই বিস্ময়কর কীর্তি এবং বুদ্ধি-বিবেকের এই চমৎকার ফয়সালা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করছে, আমাদের একজন স্রষ্টা—অদ্বিতীয় ও প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা। তিনিই ইবাদত ও আনুগত্যের যোগ্য। তিনিই বিপদ বিদূরণকারী এবং শোকর ও হামদ তাঁর জন্যই শোভনীয়।

কতিপয় বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ (১) আয়াত থেকে জানা গেল যে, বুদ্ধি-বিবেক ও চেতনা মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও আছে। وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ তবে বুদ্ধির স্তর বিভিন্নরূপ। মানুষের বুদ্ধি সবচাইতে পূর্ণাঙ্গ। এ কারণেই সে শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করার আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে। উন্মাদনার কারণে যদি মানুষের বুদ্ধিবিভ্রম ঘটে, তবে অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষও বিধি-বিধান পালনের দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করে।

(২) মৌমাছির আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: الذباب كلها في النار يجعلها عذابا لأهل النار إلا النحل—অর্থাৎ অন্যান্য ইতর প্রাণীর ন্যায় মাছিদের সব প্রকারও জাহান্নামে যাবে এবং জাহান্নামীদের আযাবের হাতিয়ার করা হবে, কিন্তু মৌমাছি জাহান্নামে যাবে না।—(কুরতুবী) অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) মৌমাছিকে মারতে নিষেধ করেছেন।—(আবূ দাউদ)

(৩) চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, মধু মৌমাছির বিষ্ঠা, না মুখের লালা। দার্শনিক এরিস্টটল কাঁচের একটি উৎকৃষ্ট পাত্রে চাক তৈরী করে তাতে মৌমাছিদেরকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি তাদের কর্মপদ্ধতি নিরীক্ষণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মৌমাছিরা সর্বপ্রথম পাত্রের অভ্যন্তরভাগে মোম ও কাদার একটি মোটা প্রলেপ বসিয়ে দেয় এবং অভ্যন্তরভাগ পূর্ণরূপে আবৃত না হওয়া পর্যন্ত কাজই শুরু করেনি।

হযরত আলী (রা) দুনিয়ার নিকৃষ্টতার উদাহরণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন:

أشرف لباس بني آدم فيه لعاب دودة وأشرف شرابه رجيع نحلة

অর্থাৎ মানুষের সর্বোত্তম বস্ত্র রেশম হচ্ছে একটি ছোট্ট কীটের থুথু এবং সর্বোৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু পানীয় হচ্ছে মৌমাছির বিষ্ঠা।

(৪) فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ আয়াতের মর্ম অনুযায়ী আরও জানা গেল যে, ওষুধের মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা করা বৈধ। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা একে নিয়ামত হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

অন্যত্র বলা হয়েছে : وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةٌ

الْمُؤْمِنِينَ হাদীসে ওষুধ ব্যবহার ও চিকিৎসার প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে। কেউ কেউ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করেন : আমরা কি ওষুধ ব্যবহার করব? তিনি বললেন : হ্যাঁ, রোগের চিকিৎসা করবে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা যত রোগ সৃষ্টি করেছেন, তার ওষুধও সৃষ্টি করেছেন। তবে একটি রোগের চিকিৎসা নেই। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন : সেটি কোন্ রোগ? তিনি বললেন : বার্ধক্য।—(আবূ দাউদ, কুরতুবী)

এক রেওয়ায়েতে হযরত খুযায়মা (রা) বলেন : একবার আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম : আমরা ঝাড়-ফুঁক করি কিংবা ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করি। এ ধরনের আত্মরক্ষা ও হিফাযতের ব্যবস্থা আল্লাহ্র তকদীরকে পাল্টে দিতে পারে কি? তিনি বললেন : এগুলোও তো তকদীরেরই প্রকারভেদ।

মোটকথা, চিকিৎসা করা ও ওষুধ ব্যবহার করা যে বৈধ এ বিষয়ে সকল আলিমই একমত এবং এ সম্পর্কে বহু হাদীস ও রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইবনে ওমরের পরিবারে কাউকে বিচ্ছু দংশন করলে তাকে তিরইয়াক (বিষনাশক ওষুধ) পান করানো হত এবং ঝাড়-ফুঁক দ্বারা তার চিকিৎসা করা হত। তিনি একবার কাঁপুনির রোগীকে দাগ লাগিয়ে তার চিকিৎসা করেন। —(কুরতুবী)

কোন কোন সূফী বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা চিকিৎসা পছন্দ করতেন না। সাহাবীগণের মধ্যেও কারও কারও কার্যক্রম থেকে তা প্রকাশ পায়। যেমন হযরত ইবনে মসউদ (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লে হযরত উসমান (রা) তাঁকে দেখতে যান এবং জিজ্ঞেস করেন : আপনার অসুখটা কি? তিনি উত্তর দিলেন : আমি নিজ গোনাহের কারণে চিন্তিত। হযরত উসমান (রা) বললেন : তাহলে কি চান? উত্তর হল : আমি পালনকর্তার রহমত প্রার্থনা করি। হযরত উসমান (রা) বললেন : আপনি পছন্দ করলে চিকিৎসক ডেকে আনি। তিনি উত্তর দিলেন : চিকিৎসকই তো আমাকে শয্যাশায়ী করেছেন। (এখানে রূপক অর্থে চিকিৎসক বলে আল্লাহ্ তা'আলাকে বোঝানো হয়েছে)।

কিন্তু এ ধরনের ঘটনা প্রমাণ নয় যে, তাঁরা চিকিৎসাকে মকরূহ্ মনে করতেন। সম্ভবত এটা তখন তাঁদের রুচিবিরুদ্ধ ছিল। তাই তাঁরা একে পছন্দ করেন নি। এটা প্রবল আল্লাহ্ভীতি ও আল্লাহ্প্রেমে মত্ত থাকার ফলে বান্দার একটা সাময়িক অবস্থা মাত্র। কাজেই একে চিকিৎসা অবৈধ অথবা মকরূহ্ হওয়ার প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করানো যায়

না। হযরত উসমান (রা) কর্তৃক চিকিৎসক ডেকে আনার অনুরোধ স্বয়ং চিকিৎসা বৈধ হওয়ার প্রমাণ। বরং কোন কোন অবস্থায় চিকিৎসা ওয়াজিবও হয়ে যায়।
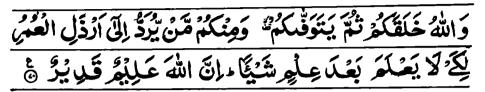
(৭০) আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এরপর তোমাদের মৃত্যুদান করেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পেঁৗছে যায় জরাগ্রস্ত অকর্মণ্য বয়সে, ফলে যা কিছু তারা জানত সে সম্পর্কে তারা সজ্ঞান থাকবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিজ্ঞ সর্বশক্তিমান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (নিজ অবস্থাও প্রণিধানযোগ্য যে) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে (প্রথম) সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর (বয়স শেষ হয়ে গেলে) তোমাদের জান কবজ করেন (তন্মধ্যে কেউ কেউ তো পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ চৈতন্যসহ সে অবস্থায় কার্যক্ষম হাত-পা নিয়ে বিদায় হয়ে যায়) এবং তোমাদের কেউ অকর্মণ্য বয়স পর্যন্ত পেঁৗছে যায় (তার মধ্যে শারীরিক ও জ্ঞানগত শক্তি বলতে কিছুই থাকে না) এর ফলে যে কোন বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান হওয়ার পর অজ্ঞান হয়ে যায় (যেমন, কোন কোন বৃদ্ধকে দেখা যায় যে, কোন কথা বলা হলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা তা ভুলে যায় এবং সে সম্পর্কে পুনরায় জিজ্ঞেস করতে থাকে।) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত জ্ঞানী, অত্যন্ত শক্তিমান (জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেকটি উপযোগিতা জেনে নেন এবং শক্তিবলে তদ্রূপই করে দেন। তাই জীবন ও মরণের অবস্থা বিভিন্নরূপ করে দিয়েছেন। এটাও তওহীদের একটি প্রমাণ।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা পানি, উদ্ভিদ, জন্তু ও মৌমাছির বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করে স্বীয় অপার শক্তি এবং সৃষ্ট জীবের প্রতি তাঁর নিয়ামতরাজির কথা মানুষকে অবহিত করেছেন। এখন আলোচ্য আয়াতে মানুষকে নিজের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্ক চিন্তা-ভাবনা করার দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে যে, মানুষ কিছুই ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অস্তিত্বের সম্পদ দ্বারা ভূষিত করেছেন। এরপর যখন ইচ্ছা করেন মৃত্যু প্রেরণ করে এ নিয়ামত খতম করে দেন। কোন কোন লোককে মৃত্যুর পূর্বেই বার্ধক্যের এমন স্তরে পেঁৗছে দেন যে, তাদের জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে যায়, হাত-পা হীনবল ও নিঃসাড় হয়ে পড়ে এবং তারা কোন বিষয় বুঝতে পারে না, কিংবা বুঝেও স্মরণ রাখতে পারে না। বিশ্বজোড়া এই পরিবর্তন থেকে বোঝা যায় যে, যিনি স্রষ্টা ও প্রভু, তাঁর ভাণ্ডারেই যাবতীয় জ্ঞান ও শক্তি সংরক্ষিত।

وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ—এখানে مَن يُرَدُّ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্বেও মানুষের উপর দিয়ে এক প্রকার দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। সেটা ছিল তার প্রাথমিক শৈশবের যুগ। তখন সে কোনরূপ জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী ছিল না। তার হস্তপদ ছিল দুর্বল ও অক্ষম। সে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করতে এবং উঠাবসা করতে অপরের মুখাপেক্ষী ছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যৌবন দান করেছেন এটা ছিল তার উন্নতির যুগ। এরপর ক্রমান্বয়ে তাকে বার্ধক্যের স্তরে পৌঁছে দেন। এ স্তরে তাকে দুর্বলতা, শক্তিহীনতা ও ক্ষয়ের ঐ সীমায় প্রত্যাবর্তিত করা হয়, যা শৈশবে ছিল।

أَرْذَلِ الْعُمُرِ বলে বার্ধক্যের সে বয়স বোঝানো হয়েছে, যাতে মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ্ (সা) এ বয়স থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেন ঃ

اللهم انى اعوذبك من سوء العمر وفى رواية من ان ارد الى...

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি মন্দ বয়স থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। এক রেওয়ায়েতে আছে, অকর্মণ্য বয়সে ফিরিয়ে দেওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

ارذل العمر—এর নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। তবে উল্লিখিত সংজ্ঞাটি অগ্রগণ্য মনে হয়। কোরআনও এর প্রতি لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا বলে ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ যে বয়সে হুশ-জ্ঞান অবশিষ্ট না থাকে। ফলে সে সব জানা বিষয়ও ভুলে যায়।

أَرْذَلُ الْعُمُرِ—এর সংজ্ঞা সম্পর্কে আরও অনেক উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কেউ ৮০ বছর বয়সকে এবং কেউ ৯০ বছর বয়সকে ارذل العمر বলেছেন। হযরত আলী (রা) থেকে ৭৫ বছর বয়সের কথা বর্ণিত আছে।—(মাযহারী)

لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا—বার্ধক্যের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছার পর মানুষের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। ফলে সে এক বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার পর পুনরায় অজ্ঞ হয়ে যায়। সে আদ্যোপান্ত স্মৃতিভ্রমে পতিত হয়ে প্রায় সদ্যপ্রসূত শিশুর মত হয়ে যায়, আর কোন কিছুর খবর থাকে না। হযরত ইকরামা (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াত করে সে এরূপ অবস্থায় পতিত হবে না।

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ—নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিশালী। তিনি জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেকের বয়স জানেন এবং শক্তি দ্বারা যা চান, করেন। তিনি ইচ্ছা করলে

শক্তিশালী যুবকের ওপর অকর্মণ্য বয়সের লক্ষণাদি চাপিয়ে দেন এবং ইচ্ছা করলে এক শ' বছরের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকেও শক্ত সমর্থ যুবক করে রাখেন। এসবই লা-শরীক সত্তার ক্ষমতাধীন।

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ۭ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٧١﴾

(৭১) আল্লাহ্ তা'আলা জীবনোপকরণে তোমাদের একজনকে অন্যজনের চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। অতএব যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে স্বীয় জীবিকা থেকে এমন কিছু দেয় না, যাতে তারা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যাবে। তবে কি তারা আল্লাহ্র নিয়ামত অস্বীকার করে?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (তওহীদ প্রমাণের সাথে শিরকের দোষ এক প্রকার পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে শোন,) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের একজনকে অন্যজনের চাইতে জীবিকায় (অর্থাৎ জীবিকার ক্ষেত্রে) শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন (উদাহরণত একজনকে ধনী এবং অনেকের উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন, তার হাতে তার অধীনস্ত লোকেরা রিযিক প্রাপ্ত হয়। আবার অন্যজনকে তার মুখাপেক্ষী করেছেন। সে কর্তাব্যক্তির হাত দিয়েই রিযিক পায়। পক্ষান্তরে কাউকে এমন ধনী করেন নি যে, অধীনস্থ বা অসহায়দের দিতে পারে এবং অসহায় অধিনস্থও করেন নি যে, সে কোন কর্তৃত্বকারীর হাত থেকে পাবে) অতএব যাদেরকে (জীবিকার বিশেষ) শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে (যে, তাদের কাছে ধন ও অধীনস্থ লোক সবই আছে) তারা স্বীয় অংশের ধন অধীনদেরকে এভাবে কখনও দেয় না যে, তারা (ধনবান ও নির্ধন) সবাই এতে সমান হয়ে যায়। (কেননা, যদি কোন দাসকে দাসত্ব বজায় রেখে ধন দেয়, তবে সে দাস ধনের মালিকই হবে না বরং দাতাই পূর্ববৎ মালিক থাকবে। পক্ষান্তরে মুক্ত করার পর সমতা সম্ভবপর, কিন্তু সে তখন দাস থাকবে না। সুতরাং বোঝা গেল যে, সমতা ও দাসত্ব সম্ভবপর নয়। এমনিভাবে প্রতিমা বিগ্রহ ইত্যাদি যখন মুশরিকদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানাধীন দাস, তখন দাস হওয়া সত্ত্বেও উপাস্যতায় আল্লাহ্র সমতুল্য কেমন করে হয়ে যাবে? এতে শিরকের চরম দোষ বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তোমাদের দাস রিযিকে তোমাদের অংশীদার হতে পারে না, তখন আল্লাহ্ তা'আলার দাস উপাস্যতায় তার অংশিদার কিরূপে হতে পারবে?) এরপর (অর্থাৎ এসব বিষয়বস্তু শোনার পরও) কি (তারা আল্লাহ্র শিরক করে, যদ্দরুন যুক্তিগতভাবে জরুরী হয়ে পড়ে যে, তারা) আল্লাহ্র নিয়ামত (অর্থাৎ আল্লাহ্ নিয়ামত দিয়েছেন বলেই) অস্বীকার করে?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইতিপূর্বেকার আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় জ্ঞান ও শক্তির বিশেষ বিশেষ প্রতীক এবং মানুষকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করে তওহীদের প্রকৃতিগত প্রমাণাদি বর্ণনা করেছেন। এসব প্রমাণ দেখে সামান্য জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও কোন সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তাঁর জ্ঞান ও শক্তি ইত্যাদি গুণাবলীতে অংশীদার মেনে নিতে পারে না। আলোচ্য আয়াতে তওহীদের এ বিষয়বস্তুকেই একটি পারস্পরিক আদান-প্রদানের দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। দৃষ্টান্তটি এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ তাৎপর্যবশতই মানুষের উপকারার্থে জীবিকার ক্ষেত্রে সব মানুষকে সমান করেন নি, বরং একজনকে অপরজনের চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি করেছেন। কাউকে এমন ধনাঢ্য করেছেন যে, সে বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম, চাকর-নওকর ও দাসদাসীর অধিকারী। নিজেও ইচ্ছামত ব্যয় করে এবং গোলাম ও চাকর-নকররাও তার হাত থেকে রিযিক পায়। অপরপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে গোলাম ও খাদেম করেছেন। সে অন্যের জন্য ব্যয় করা দূরের কথা, নিজের ব্যয়ও অন্যের হাত থেকে পায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে মধ্যবিত্ত করেছেন। সে অপরের জন্য ব্যয় করার মত ধনীও নয় এবং নিজ প্রয়োজনের ব্যাপারে অপরের মুখাপেক্ষী হওয়ার মত নিঃস্বও নয়।

এই প্রাকৃতিক বন্টনের ফলশ্রুতি সবার চোখের সামনে। যাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে ধনাঢ্য করা হয়েছে, সে কখনও এটা পছন্দ করে না যে, নিজের ধন-সম্পত্তি গোলাম ও খাদেমের মধ্যে বিলি বন্টন করে দেবে, যার ফলে তারাও ধনসম্পত্তিতে তার সমান হয়ে যাবে।

এ দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা দরকার যে, মুশরিকদের স্বীকারোক্তি মতেই যখন প্রতিমা ও অন্যান্য উপাস্য সৃষ্টজীব আল্লাহ্ তা'আলার সৃজিত ও মালিকানাধীন, তখন তারা এটা কিরূপে পছন্দ করে যে, এসব সৃষ্ট ও মালিকানাধীন বস্তু স্রষ্টা ও মালিকের সমান হয়ে যাবে? তারা কি এসব নিদর্শন দেখে এবং বিষয়বস্তু শুনেও আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক ও সমতুল্য সাব্যস্ত করে? এরূপ করার অনিবার্য পরিণতি এই যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতরাজি অস্বীকার করে। কেননা, তারা যদি স্বীকার করত যে, এসব নিয়ামত একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার দান, স্বকল্পিত প্রতিমা অথবা কোন মানুষ ও জিনের কোন হাত নেই, তবে এগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলার সমতুল্য কিরূপে সাব্যস্ত করত?

এ বিষয়বস্তুই সূরা রূমের নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে:

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ

شُرَكَاءَ فِيْمَا رَزَقْنَاكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ -

তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই একটি উদাহরণ দিচ্ছেন, যারা তোমাদের মালিকানাধীন গোলাম, তারা কি আমার দেওয়া রিযিকে তোমাদের অংশীদার যে, তোমরা তাতে তাদের সমান হয়ে যাও?

এ আয়াতের সারকথাও তাই যে, তোমরা স্বীয় মালিকানাধীন গোলাম ও খাদেম-দেরকে নিজেদের সমতুল্য করা পছন্দ কর না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার জন্য কিরূপে পছন্দ কর যে, তাঁর সৃজিত ও মালিকানাধীন বস্তুসমূহ তাঁর সমান হয়ে যাবে।

জীবিকার শ্রেণী-বিভেদ মানুষের জন্য রহমতস্বরূপ ঃ আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট-ভাবে এ কথা বলা হয়েছে যে, দারিদ্র্য, ধনাঢ্যতা এবং জীবিকায় মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া যেমন, কারো দরিদ্র হওয়া কিংবা ধনী ও মধ্যবিত্ত হওয়া কোন আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং এটা আল্লাহ্র অপার রহস্য ও মানবিক উপকারিতার তাগিদ এবং মানব জাতির জন্য রহমতস্বরূপ। যদি এরূপ না হয় এবং ধন-দৌলতে সব মানুষ সমান হয়ে যায়, তবে বিশ্ব-ব্যবস্থায় ত্রুটি ও অনর্থ দেখা দেবে। তাই যেদিন থেকে পৃথিবীতে জনবসতি স্থাপিত হয়েছে, সেদিন থেকে কোন যুগে ও কোন সময়ে সব মানুষ ধন-সম্পদের দিক দিয়ে সমান হয়নি এবং হতে পারে না। যদি কোথাও জোর জবরদস্তিমূলকভাবে এরূপ সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে কিছু দিনের মধ্যে মানবিক কাজ-কারবারে ত্রুটি ও অনর্থ দৃষ্টি-গোচর হবে। আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানবজাতিকে বুদ্ধি, মেধা, বল, শক্তি ও কর্মদক্ষতায় বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন এবং তাদের মধ্যে উচ্চ, নীচ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিদ্যমান রয়েছে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা অস্বীকার করতে পারে না। এরই অপরিহার্য পরিণতি হিসাবে ধনসম্পদেও বিভিন্ন শ্রেণী থাকা বাঞ্ছনীয়, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ প্রতিভা ও যোগ্যতার যথোপযুক্ত প্রতিদান পেতে পারে। যদি প্রতিভাবান যোগ্য ব্যক্তিকে অযোগ্যের সমান করে দেওয়া হয়, তবে যোগ্য ব্যক্তির মনোবল ভেঙ্গে যাবে। যদি জীবিকায় তাকে অযোগ্যদের সমপর্যায়েই থাকতে হয়, তবে কিসে তাকে অধ্যবসায়, গবেষণা ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে? এর অনিবার্য পরিণতিতে কর্মদক্ষতায় বন্ধ্যাত্ব নেমে আসবে।

সম্পদ পুঞ্জীভূত করার বিরুদ্ধে কোরআনের বিধান ঃ তবে সৃষ্টিকর্তা যেখানে বুদ্ধিগত ও দেহগত শক্তিতে একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এর অধীনে রিযিক ও ধনসম্পদে তারতম্য করেছেন, যেখানে এই অটল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, সম্পদের ভাণ্ডার এবং জীবিকা উপার্জনের কেন্দ্রসমূহ যেন কতিপয় ব্যক্তি অথবা বিশেষ শ্রেণীর অধিকারভুক্ত না হয়ে পড়ে, ফলে অন্যান্য যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির কাজ করার ক্ষেত্রই অবশিষ্ট না থাকে। অথচ সুযোগ পেলে তারা দৈহিক শক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন করতে পারে। কোরআন পাক সূরা হাশরে বলে ঃ

كَيْلَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ — অর্থাৎ আমি সম্পদ বন্টনের আইন এজন্য তৈরী করেছি, যাতে ধনসম্পদ পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে পড়ে।

আজকাল বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে হাহাকারপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান, তা এই আল্লাহ্র আইন উপেক্ষা করারই ফলশ্রুতি। একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এতে সুদ ও জুয়ার সাথে ধনসম্পদের কেন্দ্রসমূহের উপর কতিপয় ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে অবশিষ্ট জনগণকে তাদের অর্থনৈতিক দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য করে। তাদের জন্য নিজেদের অভাব মেটানোর জন্য দাসত্ব ও মজুরী

ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা থাকে না। তারা যোগ্যতা সত্ত্বেও শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে পা রাখতে পারে না।

পুঁজিপতিদের এই অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিক্রিয়া হিসাবে একটি পরস্পর বিরোধী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কম্যুনিজম বা সোশ্যালিজম নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ শ্লোগান হচ্ছে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য মেটানো এবং সর্বস্তরে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। পুঁজিবাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ জনগণ এ শ্লোগানের পেছনে ধাবিত হয়েছে। কিন্তু কিছু-দিন যেতে না যেতেই তারা উপলব্ধি করেছে যে, এ শ্লোগানটি নিছক একটি প্রতারণা। অর্থনৈতিক সাম্যের স্বপ্ন কোনদিনই বাস্তবায়িত হয়নি। দরিদ্র নিজ দারিদ্র্য, অনাহার ও উপবাস সত্ত্বেও একটি মানবিক সম্মানের অধিকারী ছিল, অর্থাৎ সে নিজ ইচ্ছার মালিক ছিল। কম্যুনিজমে এ মানবিক সম্মানও হাতছাড়া হয়ে গেল। এ ব্যবস্থায় মেশিনের কলকব্জার চাইতে অধিক মানুষের কোন মূল্য নেই। এতে কোন সম্পত্তির মালিকানা কল্পনাও করা যায় না। একজন শ্রমিকের অবস্থা এই যে, সে কোন কিছুর মালিক নয়। তার সন্তান ও স্ত্রীও তার নিজের নয়; বরং সবই রাষ্ট্ররূপী মেশিনের কল-কব্জা। মেশিন চালু হওয়ার সাথে সাথে এদের কাজে লেগে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কল্পিত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছাড়া তার না আছে কোন বিবেক আর না আছে কোন বাকস্বাধীনতা। রাষ্ট্রযন্ত্রের জোর-জুলুম ও অসহনীয় পরিশ্রমে কাতর হয়ে উহঃ আহঃ করাও প্রাণদণ্ডযোগ্য বিদ্রোহ বলে পরিগণিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ও ধর্মের বিরোধিতা এবং খাঁটি জড়বাদী ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তিস্তম্ভ।

কোন সমাজতন্ত্রী এসব সত্য অস্বীকার করতে পারবে না। সমাজতন্ত্রের কর্ণ-ধারদের গ্রন্থাবলী এবং আমলনামা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাদের এসব বরাত একত্রিত করার জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হবে।

কোরআন পাক উৎপীড়নমূলক পুঁজিবাদ এবং নির্বোধসুলভ সমাজতন্ত্রের মাঝা-মাঝি, স্বল্পতা ও বাহুল্য বিবর্জিত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রদান করেছে। এতে রিযিক ও অর্থ-সম্পদের প্রাকৃতিক পার্থক্য সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী সাধারণ জনগণকে গোলামে পরিণত করতে পারে না এবং কৃত্রিম দুর্মূল্য ও দুর্ভিক্ষে নিক্ষেপ করতে পারে না। সুদ ও জুয়াকে হারাম সাব্যস্ত করে অবৈধ পুঁজি সঞ্চয়ের ভিত্তি ভূমিস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর প্রত্যেক মুসলমানের ধনসম্পদে দরিদ্রদের প্রাপ্য নির্ধারিত করে তাদেরকে তাতে অংশীদার করা হয়েছে। এটা দরিদ্রদের প্রতি দয়া নয়, বরং কর্তব্য সম্পা-দন মাত্র। فِىٓ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ — আয়াতটি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির ধনসম্পত্তি পরিবারের লোকজনের মাঝে বন্টন করে সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়ার মূলোৎপাটন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক নদ-নদী, সমুদ্র, পাহাড় ও বন-জঙ্গলের নিজে নিজে গজিয়ে ওঠা সম্পদকে সমগ্র জাতির যৌথ সম্পত্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে। এগুলোতে কোন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর মালিকসুলভ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা

বৈধ নয়। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এসব বস্তুর উপর পুঁজিপতিদের মালিকানা স্বীকার করা হয়।

জ্ঞানগত ও কর্মগত যোগ্যতার বিভিন্নতা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার এবং জীবিকা উপার্জন এসব যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। তাই ধনসম্পদের মালিকানার বিভিন্নতাও যথার্থ তাৎপর্যের তাকাদা। সামান্যতম জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিও একথা অস্বীকার করতে পারে না। সাম্যের ধ্বজাধারীরাও কয়েক পা এগুতে না এগুতেই সাম্যের দাবী পরিত্যাগ করতে এবং জীবিকায় তারতম্য ও পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়েছে।

তদানীন্তন রুশ প্রধানমন্ত্রী ১৯৬০ সনের ৫ই মে তারিখে সুপ্রীম সোভিয়েটের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিল ঃ

"আমরা মজুরির পার্থক্য বিলুপ্ত করার আন্দোলনের ঘোর বিরোধী। আমরা মজুরির ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার এবং সবার মজুরি এক পর্যায়ে আনার প্রকাশ্যে বিরোধিতা করি। এটা লেনিনের শিক্ষা। তার শিক্ষা ছিল এই যে, সমাজে সমাজবাদী বৈষয়িক কারণাদির প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখা হবে।"—(সোভিয়েট —ওয়ার্ল্ড, ৩৪৬ পৃঃ)

অর্থনৈতিক সাম্যের বাস্তবায়ন যে অসাম্যের মাধ্যমে হয়েছিল, তা প্রথম থেকেই সবার চোখে ধরা পড়েছিল। কিন্তু দেখতে দেখতে এ অসাম্য এবং ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়াতে সাধারণ পুঁজিবাদী দেশের চাইতেও অধিক প্রকট হয়ে পড়ে।

লিউন শিডো লিখেন ঃ

"এমন কোন উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী দেশ থাকলে থাকতেও পারে, যেখানে রাশিয়ার ন্যায় মজুরিতে বিরাট ব্যবধান রয়েছে।"

উল্লিখিত কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ অবিশ্বাসীদের মুখে وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ আয়াতের সত্যায়ন তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও করিয়ে দিয়েছে।

وَاللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ——আলোচ্য আয়াতের অধীনে এখানে এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য ছিল যে, ধনসম্পদে তারতম্য হওয়া একটি স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক এবং মানবিক উপকারিতার সাথে সঙ্গতিশীল ব্যাপার। অতঃপর সম্পদ বন্টনে ইসলামী মূলনীতি এবং পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের সাথে তার পার্থক্য ইনশাআল্লাহ্ সূরা যুখরুফের نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হবে।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ
بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ
وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا
لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٧٣﴾
فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٧٤﴾
ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ
مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ؕ هَلْ يَسْتَوٗنَ ؕ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ
اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ
اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ
بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٦﴾

(৭২) আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য তোমাদেরই শ্রেণী থেকে জোড়া পয়দা করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও পৌত্রাদি দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। অতএব তারা কি মিথ্যা বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করে? (৭৩) তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত করে, যে তাদের জন্যে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল থেকে সামান্য রুযী দেওয়ারও অধিকার রাখে না এবং শক্তিও রাখে না। (৭৪) অতএব আল্লাহ্‌র কোন সদৃশ সাব্যস্ত করো না, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ জানেন এবং তোমরা জান না। (৭৫) আল্লাহ্‌ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, অপরের মালিকানাধীন গোলামের, যে কোন কিছুর ওপর শক্তি রাখে না এবং এমন একজন যাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে চমৎকার রুযী দিয়েছি। অতএব সে তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে। উভয়ে কি সমান হয়? সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র কিন্তু অনেক মানুষ জানে না। (৭৬) আল্লাহ্‌ আরেকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, দু'ব্যক্তির একজন বোবা কোন কাজ করতে পারে না। সে মালিকের ওপর বোঝা। যে দিকে তাকে পাঠায়, কোন সঠিক কাজ করে আসে না। সে কি সমান হবে ঐ ব্যক্তির, যে ন্যায়বিচারের আদেশ করে এবং সরল পথে কায়েম রয়েছে?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (কুদরতের প্রমাণাদি ও বিভিন্ন প্রকার নিয়ামতের মধ্য থেকে একটি বড় নিয়ামত ও আল্লাহ্র কুদরতের প্রমাণ হচ্ছে স্বয়ং তোমাদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব যে,) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরই মধ্য থেকে (অর্থাৎ তোমাদের জাতি ও শ্রেণী থেকে) তোমাদের জন্য স্ত্রী তৈরী করেছেন এবং (অতঃপর) স্ত্রীদের থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্র পয়দা করেছেন (কারণ, এটা হচ্ছে তোমাদের শ্রেণীগত স্থায়িত্ব) এবং তোমাদেরকে ভাল ভাল বস্তু খেতে (ও পান করতে) দিয়েছেন। (এটা ব্যক্তিগত স্থায়িত্ব। যেহেতু স্থায়িত্ব অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল, তাই এতে অস্তিত্বের প্রতিও ইঙ্গিত হয়ে গেছে।) তারা কি (এসব প্রমাণ ও নিয়ামত সম্পর্কে শুনে) তবুও অমূলক বিষয়ের প্রতি (অর্থাৎ প্রতিমা ইত্যাদির প্রতি, যাদের উপাস্য হওয়ার কোন প্রমাণ নেই, বরং না হওয়ারই প্রমাণ রয়েছে ---) ঈমান রাখবে এবং আল্লাহ্র নিয়ামতের না-শোকরী (তথা অবমূল্যায়ন) করতে থাকবে? এবং (এই না-শোকরীর অর্থ এই যে,) আল্লাহ্কে ছেড়ে এমন বস্তুসমূহের ইবাদত করতে থাকবে, যারা তাদেরকে না আসমান থেকে রুযী পৌঁছানোর ক্ষমতা রাখে, আর না যমিন থেকে। (অর্থাৎ না তারা বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষমতা রাখে এবং না মাটি থেকে কিছু পয়দা করার) এবং তারা (ক্ষমতা লাভেরও) শক্তি রাখে না। (এই না বোধক বাক্য দ্বারা বিষয়-বস্তু আরও জোরদার হয়ে গেছে। কেননা, মাঝে মাঝে দেখা যায়, এক ব্যক্তি কার্যত ক্ষমতাশালী নয়, কিন্তু চেষ্টাচরিত্র করে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা অর্জন করে নেয়। এজন্য এ বিষয়টিও 'না' করে দেওয়া হয়েছে।) অতএব (যখন শিরকের অসারতা প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন) তোমরা আল্লাহ্র কোন সদৃশ তৈরী করো না (যে, আল্লাহ্ হচ্ছেন জাগতিক রাজা-বাদশাহ্দের মত। প্রত্যেকেই তাঁর কাছে আবেদন নিবেদন করতে পারে না। এজন্য তাঁর প্রতিনিধি রয়েছেন। জনগণ তাদের কাছে আবেদন-নিবেদন করবে। এরপর তারা বাদশাহ্র কাছে আবেদন-নিবেদন পেশ করবে। এরূপ তফসীরে কবীরে বলা হয়েছে

(ويؤخذ من قوله ما نعبدهم الا ليقربونا وهؤلاء شفعاؤنا عند الله)

আল্লাহ্ তা'আলা (খুব জানেন যে, এসব দৃষ্টান্ত অনর্থক) এবং তোমরা (অবিবেচনার কারণে) জান না। (তাই মুখে যা আসে, তাই বলে ফেল এবং) আল্লাহ্ তা'আলা (শিরকের অসারতা প্রকাশ করার জন্য) একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, (মনে কর) এক হচ্ছে গোলাম (কারও) মালিকানাধীন (অর্থকরি ও ব্যবহারাদির মধ্য থেকে) কোন বস্তুর (মালিকের অনুমতি ব্যতীত) ক্ষমতা রাখে না এবং (দ্বিতীয়) এক ব্যক্তি, যাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে ঢের রুযী দিয়েছি। সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে (যেভাবে চায়, যেখানে চায়) ব্যয় করে (তাকে বাধাদানকারী কেউ নেই)। এ ধরনের ব্যক্তিরা কি পরস্পর সমান হতে পারে? যখন কৃত্রিম মালিক ও কৃত্রিম গোলাম সমান হতে পারে না, তখন সত্যিকার মালিক ও সত্যিকার গোলাম কেমন করে সমান হতে পারে? (ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা সমান হওয়ার উপর নির্ভরশীল। তা নেই।) সব প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যই উপযুক্ত। (কেননা, পূর্ণাঙ্গ সত্তা ও গুণাবলীর অধিকারী তিনিই। তাই উপাস্যও তিনিই হতে পারেন, কিন্তু মুশরিকরা এরপরও অন্যের ইবাদত ত্যাগ করে না।) বরং তাদের অধিকাংশ (অবিবেচনার কারণে

তা) জানেই না। (না জানার কারণ যেহেতু স্বয়ং তাদের অবিবেচনা, তাই তাদের ক্ষমা হবে না।) আল্লাহ্ তা'আলা (এর ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে) আরও একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, (মনে কর—) দু'ব্যক্তি রয়েছে। তাদের একজন তো (গোলাম হওয়া ছাড়া) বোবা, (ও কালা। আর কালা, অন্ধ ও নির্বোধ হওয়ার কারণে) কোন কাজ করতে পারে না, এবং (এ কারণে) সে মালিকের গলগ্রহ। (কারণ, মালিকই তার সব কাজ করে এবং) সে (অর্থাৎ মালিক) তাকে যেখানে পাঠায়, কোন সঠিক কাজ করে আসে না। (অতএব) এ ব্যক্তি এবং সে ব্যক্তি কি পরস্পর সমান হতে পারে, যে ভাল কথা শিক্ষা দেয় (যদ্দ্বারা তার বাক, বুদ্ধি ও জ্ঞানবান হওয়া বোঝা যায়) এবং নিজেও (প্রত্যেক কাজে) সুষম পথে (ধাবমান) থাকে, (যদ্দ্বারা সুশৃংখল কর্মশক্তি জানা যায়। সত্তা ও গুণাবলীতে অভিন্নতা সত্ত্বেও যখন মানুষে মানুষে এমন পার্থক্য তখন মানুষ ও স্রষ্টার মধ্যে কতটুকু পার্থক্য হতে পারে? পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে لا يقدر বাক্যের তরজমায় 'মালিকের অনুমতি ব্যতীত' কথাটি যুক্ত করায় ফিকাহ্ সংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেছে। আর কেউ যেন এরূপ ধারণায় লিপ্ত না হয় যে, সম্ভবত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্যকেও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। জওয়াব এই যে, প্রতিপালকত্বের জন্য কাউকে অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং তা সম্ভবও নয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا—আয়াতে একটি প্রধান নিয়ামত বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরই স্বজাতি থেকে তোমাদের স্ত্রী নির্ধারণ করেছেন, যাতে পরস্পর ভালবাসাও পূর্ণরূপে হয় এবং মানব জাতির আভিজাত্য এবং মাহাত্ম্যও অব্যাহত থাকে।

وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً—অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্র পয়দা করেছেন।

এখানে প্রণিধানযোগ্য এই যে, সন্তান-সন্ততি পিতামাতা উভয়ের সহযোগে জন্মগ্রহণ করে। আলোচ্য আয়াতে তা শুধু জননী থেকে পয়দা করার কথা বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সন্তান প্রসব ও সন্তান প্রজননে পিতার তুলনায় মাতার দখল বেশি। পিতা থেকে শুধু নিষ্প্রাণ একটি বীর্যবিন্দু নির্গত হয়। এ বিন্দুর উপর দিয়ে বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রান্ত হয়ে মানবাকৃতিতে পরিণত হওয়া, তাতে প্রাণ সঞ্চার হওয়া, সর্বশক্তিমানের এসব সৃষ্টিজনিত ক্রিয়াকর্মের স্থান মাতার উদরেই। এ জন্যই হাদীসে মাতার হককে পিতার হক থেকে অগ্রে রাখা হয়েছে।

এ বাক্যে পুত্রদের সাথে পৌত্রদের কথা উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ দম্পতি সৃষ্টির আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব বংশের স্থায়িত্ব, যাতে সন্তান ও সন্তানের সন্তান হয়ে মানব জাতির স্থায়িত্বের ব্যবস্থা হয়।

অতঃপর وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ—বলে মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িত্বের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জন্মের পর মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িত্বের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাও সরবরাহ করছেন। আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের আসল অর্থ সাহায্যকারী, সেবক। সন্তানদের জন্যে এ শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পিতামাতার সেবক হওয়া সন্তানের কর্তব্য। —(কুরতুবী)

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ—বাক্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ সত্যের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনই কাফিরসুলভ সন্দেহ ও প্রশ্নের জন্ম দেয়। সত্যটি এই যে, সাধারণভাবে মানুষ আল্লাহ্ তা'আলাকে মানবজাতির অনুরূপ মনে করে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, যেমন রাজা-বাদশাহ্কে আল্লাহ্র সদৃশরূপে পেশ করে। অতঃপর এই ভ্রান্ত দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ্র কুদরতের ব্যবস্থাকেও রাজা-বাদশাহ্দের ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে বলতে থাকে যে, কোন রাষ্ট্রে একা বাদশাহ যেমন সমগ্র দেশের আইন-শৃংখলা পরিচালনা করতে পারেন না, অধীনস্থ মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদেরকে ক্ষমতা অর্পণ করে তাদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়, তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার অধীনে আরও কিছুসংখ্যক উপাস্যও থাকা প্রয়োজন, যারা আল্লাহ্র কাজে তাঁকে সাহায্য করবে। মূর্তি পূজারী ও মুশরিকদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা তাই। আলোচ্য বাক্যটি তাদের সন্দেহের মূল কেটে দিয়ে বলেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সৃষ্টজীবের দৃষ্টান্ত পেশ করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা। তিনি দৃষ্টান্ত, উদাহরণ এবং আমাদের ধারণা-কল্পনার অনেক উর্ধ্বে।

শেষের দু'আয়াতে মানুষের দু'টি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। প্রথম আয়াতে প্রভু ও গোলাম অর্থাৎ মালিক ও মালিকানাধীনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা উভয়েই যখন একই জাতি ও একই শ্রেণীভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সমান হতে পারে না, তখন কোন সৃষ্টজীবকে আল্লাহ্র সমান কিরূপে সাব্যস্ত কর?

দ্বিতীয় উদাহরণে একদিকে এমন লোক রয়েছে, যে লোকদেরকে ন্যায়, সুবিচার ও ভাল কথা শিক্ষা দেয়। এটা তার জ্ঞানশক্তির পরাকাষ্ঠা। সে নিজেও সুষম ও সরল পথে চলে। এটা তার কর্মশক্তির পরাকাষ্ঠা। এহেন কর্মগত ও জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠার অধিকারী ব্যক্তির বিপরীতে এমন একজন লোক রয়েছে, যে নিজের কাজ করতে সক্ষম নয় এবং অন্যের কাজও ঠিকমত করতে পারে না। এই উভয় প্রকার মানুষ একই জাতি, একই শ্রেণী এবং একই সমাজভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর সমান হতে পারে না। অতএব সৃষ্ট জগতের স্রষ্টা ও প্রভু যিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান, তাঁর সাথে কোন সৃষ্টবস্তু কিরূপে সমান হতে পারে।

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَآ أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ

الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم

مِّنْۢ بُطُونِ أُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ

الْأَبْصٰرَ وَالْأَفْـِٔدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ

مُسَخَّرٰتٍ فِى جَوِّ السَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۗ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَءَايٰتٍ

لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْۢ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ

لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعٰمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ

إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثٰثًا وَمَتٰعًا

إِلٰى حِينٍ ﴿٨٠﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ

الْجِبَالِ أَكْنٰنًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرٰبِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرٰبِيلَ

تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِينُ ﴿٨٢﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ

ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُونَ ﴿٨٣﴾

(৭৭) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। কিয়ামতের ব্যাপারটি তো এমন, যেমন চোখের পলক অথবা তার চাইতেও নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর ওপর শক্তিমান। (৭৮) আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর। (৭৯) তারা কি উড়ন্ত পাখীকে দেখে না? এগুলো আকাশের অন্তরীক্ষে আজ্ঞাধীন রয়েছে। আল্লাহ্ ছাড়া কেউ এগুলোকে আগলে রাখে না। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৮০) আল্লাহ্ করে দিয়েছেন তোমাদের গৃহকে অবস্থানের জায়গা এবং চতুষ্পদ জন্তুর চামড়া দ্বারা করেছেন তোমার জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা। তোমরা এগুলোকে সফরকালে ও অবস্থানকালে হালকা পাও। ভেড়ার পশম, উটের বাবরি চুল ও ছাগলের লোম দ্বারা কত আসবাবপত্র ও

ব্যবহারের সামগ্রী তৈরী করেছেন এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। (৮১) আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে সৃজিত বস্তু দ্বারা ছায়া করে দিয়েছেন এবং পাহাড়সমূহে তোমাদের জন্যে আত্ম-গোপনের জায়গা করেছেন এবং তোমাদের জন্যে পোশাক তৈরী করে দিয়েছেন, যা তোমা-দেরকে গ্রীষ্ম এবং বিপদের সময় রক্ষা করে। এমনিভাবে তিনি তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহের পূর্ণতা দান করেন, যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর। (৮২) অতঃপর যদি তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তবে আপনার কাজ সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া মাত্র। (৮৩) তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ চিনে, এরপর অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোপন রহস্য (যা কেউ জানে না ; জানার দিক দিয়ে) আল্লাহ্ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য (অতএব জ্ঞানগুণে তিনি পরিপূর্ণ) এবং (শক্তিতে এমন পরিপূর্ণ যে, এসব গোপন রহস্যের মধ্যে যে একটা বিরাট কাজ রয়েছে অর্থাৎ) কিয়ামতের কাজ (তা) এমন (ত্বরিত গতিতের সম্পন্ন) হবে, যেমন চোখের পলক, বরং তার চাইতেও দ্রুত। (কিয়ামতের কাজের অর্থ মৃতদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়া। এটা যে চোখের পলকের চাইতেও দ্রুত হবে, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কেননা, চোখের পলক একটি গতি। গতি কালের অধীন। কিন্তু প্রাণ সঞ্চারিত হওয়া মুহূর্তের ব্যাপার। মুহূর্ত কালের চাইতে দ্রুত। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ) নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। (ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্য বিশেষভাবে কিয়ামত উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, কিয়ামত বিশেষ শ্রেণীর গোপন রহস্যেরও অন্যতম। তাই এটি জ্ঞান ও ক্ষমতার উভয়ের প্রমাণ—সংঘটিত হওয়ার পূর্বে জ্ঞানের এবং সংঘ-টিত হওয়ার পর ক্ষমতার প্রমাণ।) এবং (কুদরত ও বিভিন্ন নিয়ামতের প্রমাণাদির মধ্যে একটি এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে এমতাবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জানতে না (দার্শনিকদের পরিভাষায় এই স্তরের নাম 'আকলে হাইউলানী' তথা জড় জ্ঞান) এবং তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা শোকর কর। (কুদরত সপ্রমাণ করার জন্যে) তারা কি পক্ষীসমূহকে দেখে না যে, আসমানের (নিচে) অন্তরীক্ষে (কুদরতের) আজ্ঞাধীন হয়ে আছে, (অর্থাৎ) তাদেরকে (সেখানে) কেউ আগলে রাখে না, আল্লাহ্ ছাড়া। (নতুবা তাদের দেহের ঘনত্ব এবং বাতাসের বায়বীয়তার কারণে নিচে পড়ে যাওয়াই সঙ্গত ছিল। তাই উল্লিখিত বিষয়ে) ঈমানদারদের জন্য (আল্লাহ্র কুদরতে) কতিপয় প্রমাণ (বিদ্যমান) রয়েছে। (কতিপয় প্রমাণ বলার কারণ এই যে, পাখীদেরকে বিশেষ আকারে সৃষ্টি করা, যাতে উড়তে পারে, একটি প্রমাণ ; অতঃপর শূন্যমার্গকে উড়ার উপযোগী ও সম্ভবপর করে সৃষ্টি করা দ্বিতীয় প্রমাণ এবং কার্যত উড়া সংঘটিত হওয়া তৃতীয় প্রমাণ। উড়ার মধ্যে যেসব কারণের দখল রয়েছে, সেগুলো আল্লাহ্ তা'আলারই সৃজিত। এরপর এসব কারণের ভিত্তিতে উড়া বিদ্যমান হয়ে যাওয়াও আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা। নতুবা প্রায়ই কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ঘটনা অস্তিত্বলাভ করে না। তাই

সূচী-পত্র

مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا বলা হয়েছে। বিভিন্ন নিয়ামত ও কুদরতের প্রমাণাদির মধ্যে একটি এই যে) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য (গৃহে অবস্থান কালে) তোমাদের গৃহে বসবাসের জায়গা করেছেন এবং (সফর অবস্থায়) তোমাদের জন্য জন্তুদের চামড়ার ঘর (অর্থাৎ তাঁবু তৈরী করেছেন, সেগুলোকে তোমরা সফর কালে এবং গৃহে অবস্থান কালে) হালকা পাও। (তাই একে বহন করা এবং স্থাপন করা সহজ মনে হয়)। এবং তাদের (জন্তুদের) পশম, তাদের লোম এবং তাদের কেশ (তোমাদের) গৃহের আসবাবপত্র এবং কাজের জিনিস এক সময়ের জন্য তৈরী করেছেন ('এক সময়ের জন্য' বলার কারণ এই যে, এসব আসবাবপত্র সুতার কাপড়ের তুলনায় অধিক টেকসই হয়। বিভিন্ন নিয়ামত ও কুদরতের প্রমাণাদির মধ্যে একটি এই যে) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য সৃজিত বস্তুর ছায়া করে দিয়েছেন (যেমন বৃক্ষ, ঘর-দরজা ইত্যাদি) এবং তোমাদের জন্য পাহাড়সমূহে আশ্রয়স্থল করেছেন (অর্থাৎ গুহা ইত্যাদি, যেগুলোতে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায়, ইতর প্রাণী—মানুষ ও জন্তু শত্রু থেকে নিরাপদে থাকতে পারে।) এবং তোমাদের জন্য এমন জামা তৈরী করেছেন, যা গ্রীষ্ম থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করে এবং এমন জামা (-ও) তৈরী করেছেন, যা তোমাদেরকে পারস্পরিক যুদ্ধ থেকে (অর্থাৎ যুদ্ধে জখম লাগা থেকে) রক্ষা করে। (এখানে লৌহবর্ম বোঝানো হয়েছে। 'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি এ ধরনের নিয়ামতসমূহ পূর্ণ করেন, যাতে তোমরা (এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ) অনুগত থাক। (উল্লিখিত নিয়ামতসমূহের মধ্যে কিছুসংখ্যক মানব নির্মিতও রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর মূল উপকরণ এবং নির্মাণ-কৌশল আল্লাহ্ তা'আলারই সৃজিত। তাই প্রকৃত নিয়ামতদাতা তিনিই। অতঃপর এসব নিয়ামতের পরও) যদি তারা ঈমান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (তবে আপনি দুঃখিত হবেন না—এতে আপনার কোন ক্ষতি নেই। কেননা) আপনার দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া। তাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণ এটা নয় যে, তারা এসব নিয়ামত চেনে না; (বরং তারা) আল্লাহ্‌র নিয়ামত চেনে, কিন্তু চেনার পর (ব্যবহারে) তা অস্বীকার করে (অর্থাৎ নিয়ামতদাতার সাথে যেরূপ ব্যবহার করা উচিত ছিল, অর্থাৎ ইবাদত ও আনুগত্য—তা অন্যের সাথে করে) এবং তাদের অধিকাংশ এমনি অকৃতজ্ঞ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জ্ঞান লাভ মানুষের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য নয়। জন্মের সময় তার কোন জ্ঞান ও নৈপুণ্য থাকে না। অতঃপর মানবিক প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে কিছু কিছু জ্ঞান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সরাসরি শিক্ষা দেওয়া হয়। এসব জ্ঞান শিক্ষায় পিতামাতা ও ওস্তাদের কোন ভূমিকা নেই। সর্বপ্রথম তাকে কান্না শিক্ষা দেওয়া হয়। তার এ গুণটিই তখন তার যাবতীয় অভাব মেটায়। ক্ষুধা বা তৃষ্ণা পেলে সে কান্না জুড়ে দেয়, শীত-উত্তাপ লাগলে কান্না জুড়ে দেয়। অনুরূপ অন্য যে কোন কষ্ট অনুভব করলেই

কান্না জুড়ে দেয়। সর্বশক্তিমান তার অভাব মেটানোর জন্য পিতামাতার অন্তরে বিশেষ স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করে দেন। শিশুর আওয়াজ শুনতেই তাঁরা তার কষ্ট বুঝতে ও তা দূর করতে সচেষ্ট হয়ে যায়। যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শিশুকে এ কান্না শিক্ষা দেওয়া না হত, তবে কে তাকে শিক্ষা দিত যে, কোন অসুবিধা দেখা দিলেই এভাবে শব্দ করতে হবে? এর সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ইলহামের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে, মায়ের স্তন থেকে খাদ্যলাভ করার জন্য মাড়ি ও ঠোঁটকে কাজে লাগাতে হবে। এ শিক্ষা স্বভাবত ও সরাসরি না হলে কোন্ ওস্তাদের সাধ্য ছিল এ সদ্যজাত শিশুকে মুখ চালনা ও স্তন চোষা শিক্ষা দেওয়া! এমনিভাবে তার প্রয়োজন যতই বাড়তে থাকে, সর্বশক্তিমান তাকে পিতামাতার মধ্যস্থতা ছাড়াই আপনা-আপনি শিক্ষাদান করেন। কিছুদিন পর তার মধ্যে এমন নৈপুণ্য সৃষ্টি হতে থাকে যে, পিতামাতা ও নিকটস্থ অন্যান্য লোকের কথাবার্তা শুনে কিংবা কোন কোন বস্তু দেখে কিছু শিখতে থাকে। অতঃপর শ্রুত শব্দ ও দেখা বিষয় নিয়ে চিন্তা করার ও বোঝার নৈপুণ্য সৃষ্টি হয়।

তাই আয়াতে لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا-এর পরে বলা হয়েছে : وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ---অর্থাৎ জন্মের শুরুতে যদিও কোন কিছুর জ্ঞান মানুষের মধ্যে ছিল না, কিন্তু সর্বশক্তিমান তার অস্তিত্বের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের অভিনব উপকরণ স্থাপন করে দিয়েছেন। এসব উপকরণের মধ্যে সর্বপ্রথম سمع অর্থাৎ শ্রবণ-শক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। একে অগ্রে আনার কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষের সর্বপ্রথম জ্ঞান এবং সর্বাধিক জ্ঞান কানের পথেই আগমন করে। সূচনাভাগে চক্ষু বন্ধ থাকে, কিন্তু কান শ্রবণ করে। এরপরও চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানুষ সারা জীবনে যত জ্ঞান অর্জন করে, তন্মধ্যে কানে শ্রুত জ্ঞান সর্বাধিক। চোখে দেখা জ্ঞান তুলনামূলকভাবে কম।

এতদুভয়ের পর ঐসব জ্ঞানের পালা আসে, যেগুলো মানুষ শোনা ও দেখা বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করে অর্জন করে। কোরআনের উক্তি অনুযায়ী এ-কাজ মানুষের অন্তরের। তাই তৃতীয় পর্যায়ে أَفْئِدَةَ বলা হয়েছে। এটা فُؤَادٌ-এর বহুবচন। অর্থ অন্তর। দার্শনিকরা সাধারণভাবে মানুষের মস্তিষ্ককে জ্ঞানবুদ্ধি ও বোধশক্তির কেন্দ্র সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু কোরআনের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, কোন কিছু বোঝার ব্যাপারে যদিও মস্তিষ্কের প্রভাব রয়েছে, কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধির আসল কেন্দ্র হচ্ছে অন্তর।

এ স্থলে আল্লাহ্ তা'আলা শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি ও বোধশক্তির উল্লেখ করেছেন; বাকশক্তি ও জিহ্‌বার কথা উল্লেখ করেন নি। কেননা, জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বাকশক্তির প্রভাব নেই; বাকশক্তি বরং জ্ঞান প্রকাশের উপায়। এছাড়া ইমাম কুরতুবী বলেন : শ্রবণশক্তির সাথে বাকশক্তির উল্লেখও প্রসঙ্গত হয়ে গেছে। কেননা, অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, যে ব্যক্তি কানে শোনে, সে মুখে কথাও বলে। বোবা কথা বলতে অক্ষম, সে কানের দিক থেকেও বধির। সম্ভবত তার কথা না বলার কারণই হচ্ছে কানে কোন শব্দ না শোনা। শব্দ শুনলে হয়তো সে তা অনুসরণ করে বলাও শিখত।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا—এখানে بُيُوْت শব্দটি بَيْت -এর বহুবচন। রাত্রিযাপন করা যায় এমন গৃহকে بَيْت বলা হয়। ইমাম কুরতুবী স্বীয় তফসীরে বলেন :

كل ما علاك فاظلك فهو سقف و سماء و كل ما اقلك فهو ارض و كل ما سترك من جهاتك الاربع فهو جدار فاذا انتظمت و اتصلت فهو بيت -

অর্থাৎ "যে বস্তু তোমার মাথার উপরে রয়েছে এবং তোমাকে ছায়া দান করে, তা ছাদ ও আকাশ বলে কথিত হয়। যে বস্তু তোমার অস্তিত্বকে বহন করছে তা যমীন এবং যে বস্তু চতুর্দিক থেকে তোমাকে আবৃত করে রাখে, তা প্রাচীর। এগুলো সব কাছাকাছি একত্রিত হয়ে গেলে তাই بَيْت তথা গৃহে পরিণত হয়।"

গৃহ নির্মাণের আসল লক্ষ্য অন্তর ও দেহের শান্তি : আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানবগৃহকে শান্তির জায়গা বলে অভিহিত করে গৃহ নির্মাণের দর্শন ও রহস্য ফুটিয়ে তুলেছেন। অর্থাৎ এর আসল লক্ষ্য হচ্ছে দেহ ও অন্তরের শান্তি। মানুষ অভ্যাসগতভাবে গৃহের বাইরে পরিশ্রমলব্ধ উপার্জন ও কাজকর্ম করে। তখন পরিশ্রান্ত হয়ে গৃহে পৌঁছে বিশ্রাম ও শান্তি অর্জন করাই গৃহের আসল উদ্দেশ্য। যদিও মাঝে মাঝে মানুষ গৃহেও কাজকর্মে মশগুল থাকে, কিন্তু এটা সাধারণত খুব কমই হয়।

এ ছাড়া আসল শান্তি হচ্ছে মন ও মস্তিষ্কের শান্তি। এটা মানুষ গৃহের মধ্যেই পায়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, গৃহের প্রধান গুণ হচ্ছে তাতে শান্তি পাওয়া। বর্তমান বিশ্বের গৃহনির্মাণ কাজ চরম উন্নতির পথে রয়েছে। এতে বাহ্যিক সাজ-সজ্জার জন্য বেহিসাব খরচও করা হয়, কিন্তু দেহ ও মনের শান্তি পাওয়া যায়, এরূপ গৃহের সংখ্যা খুবই কম। কোন কোন ক্ষেত্রে বরং কৃত্রিম লৌকিকতাই আরাম ও শান্তির মূলে কুঠারাঘাত হানে। এটা না হলে গৃহে যাদের সাথে ওঠাবসা করতে হয়, তারা শান্তি বরবাদ করে দেয়। এহেন সুরম্য অট্টালিকার চাইতে এমন কুড়েঘরও উত্তম, যার বাসিন্দারা দেহ ও মনের শান্তি পায়।

কোরআন পাক প্রত্যেক বস্তুর প্রাণ ও মূল বর্ণনা করে। শান্তিকে মানব গৃহের প্রকৃত লক্ষ্য এবং সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এমনিভাবে কোরআন দাম্পত্য জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যও শান্তি সাব্যস্ত করে বলেছে : لِّتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا— অর্থাৎ "তোমরা যেন তার নিকট গিয়ে শান্তি লাভ করতে পার।" যে দাম্পত্য জীবন থেকে এ লক্ষ্য অর্জিত হয় না, তা প্রকৃত উপকারিতা থেকে বঞ্চিত। সাম্প্রতিক বিশ্বে এসব বিষয়ে আনুষ্ঠানিকতা ও অনানুষ্ঠানিক লৌকিকতা এবং বাহ্যিক সাজ-সজ্জার অন্ত নেই এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা এসব বিষয়ে বাহ্যিক সাজ-সজ্জার যাবতীয় উপকরণ উপস্থিত করে দিয়েছে, কিন্তু দেহ ও মনের শান্তি সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নিয়েছে।

مِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا এবং مِنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ থেকে প্রমাণিত হল যে, জীব-জন্তুর চামড়া, লোম ও পশম ব্যবহার করা মানুষের জন্য হালাল। এতে জন্তুটি যবেহকৃত হওয়া অথবা মৃত হওয়ারও কোন শর্ত নেই। এমনিভাবে যে জন্তুর পশম বা চামড়া আহরণ করা হবে, সেটির গোশত হালাল কি হারাম সেটা বিচার করারও কোন শর্ত নেই। সব রকম জন্তুর চামড়াই লবণ দিয়ে শুকানোর পর ব্যবহার করা হালাল। লোম ও পশমের উপর জন্তুর মৃত্যুর কোন প্রভাবই পড়ে না। তাই সেটি যথারীতি শুকিয়ে ব্যবহারোপ-যোগী করে নিলেই তা পাক হয়ে যায় এবং সেটি ব্যবহার করা হালাল ও জায়েয হয়ে যায়। ইমাম আযম আবূ হানিফা (র)-র মযহাব তাই। তবে শূকরের চামড়া ও যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও লোম-পশম অপবিত্র ও ব্যবহারের অযোগ্য।

سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ—এখানে গ্রীষ্মের উত্তাপ থেকে রক্ষা করাকে মানুষের জামার উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। অথচ জামা মানুষকে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুর প্রভাব থেকেই রক্ষা করে। ইমাম কুরতুবী ও অন্যান্য তফসীরবিদের এ প্রশ্নের জওয়াবে বলেন যে, কোরআন পাক আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সর্বপ্রথম এতে আরবদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই এতে আরবদের অভ্যাস ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বক্তব্য রাখা হয়েছে। আরব গ্রীষ্ম প্রধান দেশ। সেখানে বরফ জমা ও শীতের কল্পনা করা কঠিন। তাই শুধু গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। হযরত থানভী (র) বয়ানুল কোরআনে বলেন ঃ কোরআন পাক এ সূরার শুরুতে لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ বলে পোশাকের সাহায্যে শীত থেকে আত্মরক্ষা ও উত্তাপ হাসিল করার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছিল। তাই এখানে শুধু উত্তাপ প্রতিহত করার কথা বলা হয়েছে।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝٨٤ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝٨٥ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝٨٦ وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ ِۨ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝٨٧ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ۝ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۭ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ۝

(৮৪) যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন বর্ণনাকারী দাঁড় করাব, তখন কাফিরদেরকে অনুমতি দেওয়া হবে না এবং তাদের কাছ থেকে তওবাও গ্রহণ করা হবে না। (৮৫) যখন জালিমরা আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন তাদের থেকে তা লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে কোন অবকাশ দেওয়া হবে না। (৮৬) মুশরিকরা যখন ঐ সব বস্তুকে দেখবে, যেসবকে তারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছিল, তখন বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, এরাই তারা যারা আমাদের শিরক-এর উপাদান, তোমাকে ছেড়ে আমরা যাদেরকে ডাকতাম। তখন ওরা তাদেরকে বলবে ঃ তোমরা মিথ্যাবাদী। (৮৭) সেদিন তারা আল্লাহ্‌র সামনে আত্মসমর্পণ করবে এবং তারা যে মিথ্যা অপবাদ দিত তা বিস্মৃত হবে। (৮৮) যারা কাফির হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আমি তাদেরকে আযাবের পর আযাব বাড়িয়ে দেব। কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত। (৮৯) সেদিন প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে আমি একজন বর্ণনাকারী দাঁড় করাব তাদের বিপক্ষে তাদের মধ্য থেকেই এবং তাদের বিষয়ে আপনাকে সাক্ষীস্বরূপ আনয়ন করব। আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে, তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়ত, রহমত এবং আত্মসমর্পণকারীদের জন্য সুসংবাদ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (সে দিনটি স্মরণযোগ্য) যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে এক-একজন সাক্ষী (যে সে উম্মতের পয়গম্বর হবেন) দাঁড় করাব (সে তাদের মন্দ কর্মের সাক্ষ্য দেবে) অতঃপর কাফিরদেরকে (ওযর-আপত্তি করার) অনুমতি দেওয়া হবে না কিংবা তাদেরকে আল্লাহ্‌কে রাযী করারও নির্দেশ দেওয়া হবে না। (অর্থাৎ তাদেরকে বলা হবে না যে, তোমরা তওবা অথবা কোন কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করে নাও। এর কারণ সুস্পষ্ট---পরকাল হচ্ছে প্রতিদান জগত, কর্মজগত নয়।) যখন জালিমরা (অর্থাৎ কাফিররা) আযাব প্রত্যক্ষ করবে (অর্থাৎ তাতে পতিত হবে), আযাব তখন তাদের শিথিল করা হবে না এবং তারা (তাতে) অবকাশপ্রাপ্ত হবে না (যেমন, কিছুদিন পরে জারি করা)। যখন মুশরিকরা তাদের অবলম্বনকৃত শরীকদের (আল্লাহ্ ব্যতীত তারা যাদের ইবাদত করত) দেখবে, তখন (অপরাধ স্বীকার করার ভঙ্গিতে) বলবে ঃ হে আমাদের পালন কর্তা, আমাদের অবলম্বনকৃত শরীক এরাই---আপনাকে ছেড়ে আমরা যাদের ইবাদত করতাম। অতঃপর তারা (শরীকরা

ভয় করবে যে, কোথাও না তাদের বিপদ এসে যায়, তাই) তাদের (প্রতি কথা ফিরিয়ে) বলবে যে, তোমরা মিথ্যাবাদী। (তাদের আসল উদ্দেশ্য এই, তোমাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। এভাবে তারা নিজেদের হিফাযত করতে চাইবে। তাদের এই উদ্দেশ্য সত্য হোক, যেমন আল্লাহ্র প্রিয়জন ফেরেশতা ও পয়গম্বরগণ একথা বললে, তা সত্য হবে كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ —অথবা মিথ্যা হোক, যেমন স্বয়ং শয়তানরা বললে মিথ্যা হবে, কিংবা সত্য না মিথ্যা বক্তারা তা জানেই না, যেমন মূর্তি, বৃক্ষ ইত্যাদি শরীক যদি একথা বলে) এবং মুশরিক ও কাফিররা সেদিন আল্লাহ্র সামনে আনুগত্যের কথাবার্তা বলতে থাকবে এবং দুনিয়াতে যেসব মিথ্যা অপবাদ রটনা করত (তখন) তা সব ভুলে যাবে (এবং তাদের মধ্যে) যারা (নিজেরাও) কুফরী করত এবং (অপরকেও) আল্লাহ্র পথ (অর্থাৎ দীন) থেকে ফিরিয়ে রাখত, তাদের জন্য আমি এক শাস্তির উপর (যা কুফরীর বিনিময়ে হবে) অন্য শাস্তি তাদের অনাচারের কারণে (অর্থাৎ আল্লাহ্র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার কারণে) বাড়িয়ে দেব। আর (সে দিনটিও স্মরণীয় ও ভয় করার যোগ্য) যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের এক একজন সাক্ষী তাদের মধ্য থেকে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাব। (এখানে উম্মতের নবীকে বোঝানো হয়েছে। 'তাদেরই মধ্য থেকে'—এটা বংশ ভিত্তিক এবং দেশ ভিত্তিক উভয় প্রকারেই হতে পারে।) এবং তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে সাক্ষী করে আনব। [সাক্ষ্যের এ সংবাদ থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়তের সংবাদ বোঝা যায়। এ নবুয়তের প্রমাণ এই যে,] আমি আপনার প্রতি কোরআন নাযিল করেছি, যা (রিসালত প্রমাণের যে ভিত্তি অলৌকিকত্ব, সে অলৌকিক হওয়া ছাড়া এসব গুণের আধার যে,) সব (দীনি) বিষয় (প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সর্বসাধারণের জন্য) বর্ণনাকারী এবং (বিশেষভাবে) মুসলমানদের জন্য প্রকৃষ্ট হিদায়ত, অফুরন্ত রহমত এবং (ঈমানের কারণে) সুসংবাদদাতা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ —এতে কোরআনকে প্রত্যেক বস্তুর বর্ণনাকারী বলা হয়েছে। 'প্রত্যক বস্তু' বলে প্রধানত দীনের যাবতীয় বিষয় বোঝানো হয়েছে। কেননা, ওহী ও নবুয়তের লক্ষ্য এগুলোর সাথেই সম্পৃক্ত। তাই মানুষের আয়াসসাধ্য অন্যান্য বিজ্ঞান ও উদ্ভূত দৈনন্দিন সমস্যাদির তৈরী সমাধান কোরআন পাকে অনুসন্ধান করা ভুল। প্রসঙ্গত এসব সমস্যাদির সমাধানের ব্যাপারে যেসব ইঙ্গিত রয়েছে, মানবীয় মেধার সংযোগে সেসব থেকেই সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব। এখন প্রশ্ন থাকে যে, কোরআন পাকে অনেক দীনি খুঁটিনাটি বিষয়ও সবিস্তারে বর্ণিত হয়নি। এমতাবস্থায় কোরআনকে تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ —বলা যথার্থ হবে কিরূপ?

এর উত্তর এই যে, কোরআন পাকে সব বিষয়েরই মূলনীতি বিদ্যমান রয়েছে। সেসব মূলনীতির আলোকেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাদীস মাস'আলা বর্ণনা করে। কিছু কিছু বিবরণ ইজমা ও কিয়াসের আওতায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস থেকে যেসব মাস'আলা নির্গত হয়েছে, সেগুলোও পরোক্ষভাবে কোরআনেরই বর্ণিত মাস'আলা।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

(৯০) আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি লজ্জাহীনতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন—যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা (কোরআনে) ভারসাম্য, অনুগ্রহ এবং নিকটাত্মীয়দেরকে দান-খয়রাত করার আদেশ দেন এবং প্রকাশ্য বা যে কোন মন্দ কাজ এবং (কারও প্রতি) অত্যাচার (ও নিপীড়ন) করতে নিষেধ করেন। (উল্লিখিত আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ কাজসমূহের মধ্যে যাবতীয় সৎকর্ম ও কুকর্ম এসে গেছে। বিষয়বস্তুর এ ব্যাপকতার কারণে কোরআন যে প্রত্যেক বস্তুর বর্ণনাকারী তা বলার অপেক্ষা রাখে না এবং) আল্লাহ্ তোমাদেরকে (উল্লিখিত বিষয়বস্তুর) এজন্য উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর (এবং সে মত কাজ কর। কেননা, 'হিদায়তকারী', 'রহমত'ও সুসংবাদদাতা হওয়া এরই উপর নির্ভরশীল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতটি কোরআন পাকের একটি ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত। এর কয়েকটি শব্দের মধ্যেই ইসলামী শিক্ষার যাবতীয় বিষয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের আমল থেকে আজ পর্যন্ত জুম'আ ও দুই ঈদের খুতবার শেষ দিকে এ আয়াতটি পাঠ করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : সূরা নাহ্‌লের إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ আয়াতটি হচ্ছে কোরআন পাকের ব্যাপকতর অর্থবোধক আয়াত।—(ইবনে কাসীর)

হযরত আকসাম ইবনে সায়ফী (রা) এ আয়াতের কারণেই মুসলমান হয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাসীর হাফিযে হাদীস আবু ইয়ালার গ্রন্থ মারেফাতুস্‌সাহাবা থেকে সনদসহ এ ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আকসাম ইবনে সায়ফী স্বীয় গোত্রের সর্দার ছিলেন। রসূলুল্লাহ্

(সা)-এর নবুয়ত দাবী ও ইসলাম প্রচারের সংবাদ পেয়ে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আগমন করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু গোত্রের লোকেরা বলল: আপনি সবার প্রধান। আপনার স্বয়ং যাওয়া সমীচীন নয়। আকসাম বললেন: তবে গোত্র থেকে দু'ব্যক্তিকে মনোনীত কর। তারা সেখানে যাবে এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমাকে জানাবে। মনোনীত দু'ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল: আমরা আকসাম ইবনে সায়ফীর পক্ষ থেকে দু'টি বিষয় জানতে এসেছি। আকসামের প্রশ্ন দু'টি এই:

مَنْ أَنْتَ وَمَا أَنْتَ আপনি কে এবং কি?

রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন: প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আবদুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মদ। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রসূল। এরপর তিনি সূরা নাহ্লের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন: إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ---উভয় দূত অনুরোধ করল: এ বাক্যগুলো আমাদেরকে আবার শোনানো হোক। রসূলুল্লাহ্ (সা) আয়াতটি একাধিকবার তিলাওয়াত করেন। ফলে শেষ পর্যন্ত আয়াতটি তাদের মুখস্থ হয়ে যায়।

দূতদ্বয় আকসাম ইবনে সায়ফীর কাছে ফিরে এসে উল্লিখিত আয়াত শুনিয়ে দিল। আয়াতটি শুনেই আকসাম বলল: এতে বোঝা যায় যে, তিনি উত্তম চরিত্রের আদেশ দেন এবং মন্দ ও অপকৃষ্ট চরিত্র অবলম্বন করতে নিষেধ করেন। তোমরা সবাই তাঁর ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, যাতে তোমরা অন্যদের অগ্রে থাক এবং পেছনে অনুসারী হয়ে না থাক।—(ইবনে কাসীর)

এমনিভাবে হযরত উসমান ইবনে মযউন (রা) বলেন: শুরুতে আমি লোকমুখে শুনে ঝোঁকের মাথায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম, আমার অন্তরে ইসলাম বদ্ধমূল ছিল না। একদিন আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত ছিলাম, হঠাৎ তাঁর উপর ওহী অবতরণের লক্ষণ প্রকাশ পেল। কতিপয় বিচিত্র অবস্থার পর তিনি বললেন: আল্লাহ্র দূত এসেছিল এবং এই আয়াত আমার প্রতি নাযিল হয়েছে। হযরত উসমান ইবনে মযউন বলেন: এই ঘটনা দেখে এবং আয়াত শুনে আমার অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল ও অটল হয়ে গেল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মহব্বত আমার মনে আসন পেতে বসল। ইবনে কাসীর এ ঘটনা বর্ণনা করে এর সনদকে হাসান ও নির্ভুল বলেছেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) এ আয়াত ওলীদ ইবনে মুগীরার সামনে তিলাওয়াত করলে সে-ও প্রভাবান্বিত হয় এবং কুরায়শদের সামনে ভাষণ দেয় যে:

والله ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اصله لمورق واعلاه لمثمر وما هو بقول بشر

আল্লাহ্‌র কসম, এতে একটি বিশেষ মাধুর্য রয়েছে। এর মধ্যে একটি বিশেষ রওনক ও ঔজ্জ্বল্য রয়েছে। এর মূল থেকে শাখা ও পাতা গজাবে এবং শাখা ফলন্ত হবে। এটা কখনও কোন মানুষের বাক্য হতে পারে না।

তিনটি বিষয়ের আদেশ ও তিনটি বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন ঃ সুবিচার, অনুগ্রহ ও আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে তিন প্রকার কাজ করতে নিষেধ করেছেন ঃ নির্লজ্জ কাজ, প্রত্যেক মন্দ কাজ এবং জুলুম ও উৎপীড়ন। আয়াতে ব্যবহৃত ছয়টি শব্দের পারিভাষিক অর্থ ও সংজ্ঞার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

عدل —শব্দের আসল ও আভিধানিক অর্থ সমান করা। এর সাথে সম্বন্ধ রেখেই বিচারকদের জনগণের বিরোধ সংক্রান্ত মোকদ্দমায় সুবিচারমূলক ফয়সালা করাকে عدل বলা হয়। أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ আয়াতে এ অর্থই বিধৃত হয়েছে। এ অর্থের দিক দিয়েই স্বল্পতা ও বাহুল্যের মাঝামাঝি সমতাকেও عدل বলা হয়। কোন কোন তফসীরবিদ এ অর্থের সাথে সম্বন্ধ রেখেই আলোচ্য আয়াতে বাইরে ও ভিতরে সমান হওয়া দ্বারা عدل শব্দের তফসীর করেছেন। অর্থাৎ عدل এমন উক্তি অথবা কর্ম, যা মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে প্রকাশ পায় এবং অন্তরেও তদ্রূপ বিশ্বাস থাকে। বাস্তব সত্য এই যে, এখানে عدل শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এতে উপরোক্ত সব অর্থই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তফসীরবিদদের কাছ থেকে বর্ণিত এসব অর্থের মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই।

ইবনে আরাবী বলেন ঃ 'আদল' শব্দের আসল অর্থ সমান করা। এরপর বিভিন্ন সম্পর্কের কারণে এর অর্থ বিভিন্ন হয়ে যায়। উদাহরণত প্রথম আদল হচ্ছে মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে আদল করা। এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার হককে নিজের ভোগ-বিলাসের উপর এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে নিজের কামনা-বাসনার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া, আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পালন করা এবং নিষিদ্ধ ও হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা।

দ্বিতীয় আদল হচ্ছে মানুষের নিজের সাথে আদল করা। তা এই যে, দৈহিক ও আত্মিক ধ্বংসের কারণাদি থেকে নিজেকে বাঁচানো, নিজের এমন কামনা পূর্ণ না করা যা পরিণামে ক্ষতিকর হয় এবং সবর ও অল্পে তুষ্টি অবলম্বন করা, নিজের উপর অহেতুক বেশি বোঝা না চাপানো।

তৃতীয় আদল হচ্ছে নিজের এবং সমগ্র সৃষ্টজীবের সাথে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করা, ছোটবড় ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা না করা, সবার জন্য নিজের মনের কাছে সুবিচার দাবী করা এবং কোন মানুষকে কথা অথবা কার্য দ্বারা প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে কোনরূপ কষ্ট না দেওয়া।

এমনিভাবে বিচারে রায় দেওয়ার সময় পক্ষপাতিত্ব না করে সত্যের অনুকূলে রায় দেওয়া এক প্রকার আদল এবং প্রত্যেক কাজে স্বল্পতা ও বাহুল্যের পথ বর্জন করে মধ্যবর্তিতা

অবলম্বন করাও এক প্রকার আদল। আবূ আবদুল্লাহ্ রাযী এ অর্থ গ্রহণ করেই বলেছেন যে, আদল শব্দের মধ্যে বিশ্বাসের সমতা, কার্যের সমতা, চরিত্রের সমতা—সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।—(বাহরে মুহীত)

ইমাম কুরতুবী আদলের অর্থ প্রসঙ্গে উপরোক্ত বিবরণ উল্লেখ করে বলেছেন যে, এ বিবরণ খুবই চমৎকার। এ থেকে আরও জানা গেল যে, আয়াতের আদল শব্দটিই যাবতীয় উত্তম কর্ম ও চরিত্র অনুসরণ এবং মন্দ কর্ম ও চরিত্র থেকে বেঁচে থাকার অর্থে পরিব্যাপ্ত রয়েছে।

اَلْاِحْسَانُ—এর আসল আভিধানিক অর্থ সুন্দর করা। তা দু'প্রকার। এক. কর্ম, চরিত্র, ও অভ্যাসকে সুন্দর ও ভাল করা। দুই. কোন ব্যক্তির সাথে ভাল ব্যবহার ও উত্তম আচরণ করা। দ্বিতীয় অর্থের জন্য আরবী ভাষায় احسان শব্দের সাথে الى অব্যয় ব্যবহৃত হয়, যেমন এক আয়াতে اَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ বলা হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী বলেন : আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই উপরোক্ত উভয় প্রকার অর্থই এতে শামিল রয়েছে। প্রথম প্রকার ইহ্সান অর্থাৎ কোন কাজকে সুন্দর করা—এটাও ব্যাপক; অর্থাৎ ইবাদত, কর্ম, চরিত্র, পারস্পরিক লেনদেন ইত্যাদিকে সুন্দর করা।

প্রসিদ্ধ 'হাদীসে-জিবরায়ীলে' স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) ইহ্সানের যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে ইবাদতের ইহ্সান। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্র ইবাদত এভাবে করা দরকার, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি আল্লাহ্র উপস্থিতির এমন স্তর অর্জন করতে না পার, তবে এতটুকু বিশ্বাস তো প্রত্যেক ইবাদতকারীরই থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার কাজ দেখছেন। কেননা, আল্লাহ্র জ্ঞান ও দৃষ্টির বাইরে কোন কিছু থাকতে পারে না—এটা ইসলামী বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় নির্দেশ ইহ্সান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এতে ইবাদতের ইহ্সান এবং যাবতীয় কর্ম, চরিত্র ও অভ্যাসের ইহ্সান অর্থাৎ এগুলোকে প্রাথিত উপায়ে বিশুদ্ধ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করা বোঝানো হয়েছে। এছাড়া মুসলমান, কাফির মানুষ ও জন্তু নির্বিশেষে সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করার বিষয়টিও এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম কুরতুবী বলেন : যে ব্যক্তির গৃহে তার বিড়াল খোরাক ও অন্যান্য দরকারী বস্তু না পায় এবং যার পিঞ্জরায় আবদ্ধ পাখীর পুরোপুরি দেখাশোনা করা না হয়, সে যত ইবাদতই করুক, ইহ্সানকারী গণ্য হবে না।

আয়াতে প্রথম আদল ও পরে ইহ্সানের আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : আদল হচ্ছে অন্যের অধিকার পুরোপুরি দেওয়া এবং নিজের

অধিকার পুরোপুরি নেওয়া—কমও নয়, বেশিও নয়। তোমাকে কেউ কষ্ট দিলে তুমি তাকে ততটুকুই কষ্ট দাও, যতটুকু সে দিয়েছে। পক্ষান্তরে ইহ্‌সান হচ্ছে অপরকে তার প্রাপ্য অধিকারের চাইতে বেশি দেওয়া এবং নিজের অধিকার নেয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি না করা এবং কিছু কম হলেও কবুল করে নেওয়া। এমনিভাবে কেউ তোমাকে হাতে কিংবা মুখে কষ্ট দিলে তুমি তার কাছ থেকে সমান প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে ক্ষমা করে দাও। বরং সৎ কাজের মাধ্যমে মন্দকাজের প্রতিদান দাও। এমনিভাবে আদলের আদেশ হল ফরয ও ওয়াজিবের স্তরে এবং ইহ্‌সানের আদেশ হল কর্মের স্তরে।

إِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى—এ হচ্ছে তৃতীয় আদেশ। إِيتَاء শব্দের অর্থ কোন কিছু দেওয়া এবং قُرْبَى শব্দের অর্থ আত্মীয়তা ذِي الْقُرْبَى শব্দের অর্থ আত্মীয়-স্বজন। অতএব إِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى -এর অর্থ হল আত্মীয়-স্বজনকে কিছু দেওয়া। কি বস্তু দেওয়া, এখানে তা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু অন্য এক আয়াতে তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ —অর্থাৎ আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দান কর। বাহ্যত আলোচ্য আয়াতেও তাই বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দিতে হবে। অর্থ দিয়ে আর্থিক সেবা করা, দৈহিক সেবা করা, অসুস্থ হলে দেখাশোনা করা, মৌখিক সান্ত্বনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা ইত্যাদি সবই উপরোক্ত প্রাপ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহ্‌সান শব্দের মধ্যে আত্মীয়ের প্রাপ্য দেওয়ার কথাও অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু অধিক গুরুত্ব বোঝাবার জন্য একে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ তিনটি ছিল ইতিবাচক নির্দেশ: অতঃপর তিনটি নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হচ্ছে।

وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ—অর্থাৎ আল্লাহ্ অশ্লীলতা, অসৎ কর্ম ও সীমালংঘন করতে নিষেধ করেছেন। প্রকাশ্য মন্দকর্ম অথবা কথাকে অশ্লীলতা বলা হয়, যাকে প্রত্যেকেই মন্দ মনে করে। 'মুনকার' তথা অসৎ কর্ম এমন কথা অথবা কাজ যা হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ একমত। তাই ইজতেহাদী মতবিরোধের কারণে কোন পক্ষকে 'মুনকার' বলা যায় না। প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, কর্মগত ও চরিত্রগত যাবতীয় গোনাহ্ মুনকারের অন্তর্ভুক্ত। بَغْي শব্দের আসল অর্থ সীমালংঘন করা। এখানে জুলুম ও উৎপীড়ন বোঝানো হয়েছে। মুনকার শব্দের যে অর্থ বর্ণিত হয়েছে, তাতে فَحْشَاء- ও بَغْي- -ও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু চূড়ান্ত মন্দ হওয়ার কারণে فَحْشَاء -কে পৃথক এবং অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। بَغْي—কে পৃথক উল্লেখ করার কারণ এই যে, এর প্রভাব অপরাপর লোক পর্যন্ত সংক্রমিত হয়।

মাঝে মাঝে এই সীমালংঘন পারস্পরিক যুদ্ধ পর্যন্ত অথবা আরও অধিক সারা বিশ্বেও অশান্তি সৃষ্টির পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: জুলুম ব্যতীত এমন কোন গোনাহ্ নেই, যার বিনিময় ও শাস্তি দ্রুত দেওয়া হবে। এতে বোঝা যায় যে, জুলুমের কারণে পরকালীন কঠোর শাস্তি তো হবেই; এর আগে দুনিয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা জালিমকে শাস্তি দেন; যদিও সে বুঝতে পারে না যে, এটা অমুক জুলুমের শাস্তি। আল্লাহ্ তা'আলা মজলুমের সাহায্য করার অঙ্গীকার করেছেন।

আলোচ্য আয়াত যে ছয়টি ইতিবাচক ও নেতিবাচক নির্দেশ দান করেছে, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এগুলো মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সাফল্যের অমোঘ প্রতিকার। رزقنا الله تعالى اتباعه

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٩١﴾ وَلَا
تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ؕ تَتَّخِذُوْنَ
اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ؕ
اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ؕ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ
فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٩٢﴾ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ
يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾
وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا
وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ
عَظِيْمٌ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٥﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ
اللّٰهِ بَاقٍ ؕ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾

(৯১) আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহ্কে জামিন করেছ। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা জানেন। (৯২) তোমরা ঐ মহিলার মত হয়ো না, যে পরিশ্রমের পর পাকানো সূতা খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলে, তোমরা নিজেদের কসমসমূহকে পারস্পরিক প্রবঞ্চনার বাহানারূপে গ্রহণ কর এজন্যে যে, অন্য দল অপেক্ষা একদল অধিক ক্ষমতাবান হয়ে যায়। এতদ্বারা তো আল্লাহ্ শুধু তোমাদের পরখ করেন। আল্লাহ্ অবশ্যই কিয়ামতের দিন প্রকাশ করে দেবেন, যে বিষয়ে তোমরা কলহ করতে। (৯৩) আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে এক জাতি করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। (৯৪) তোমরা স্বীয় কসমসমূহকে পারস্পরিক কলহদ্বন্দ্বের বাহানা করো না। তা হলে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পা ফসকে যাবে এবং তোমরা শাস্তির স্বাদ আস্বাদ করবে এ কারণে যে, তোমরা আমার পথে বাধাদান করেছ এবং তোমাদের কঠোর শাস্তি হবে। (৯৫) তোমরা আল্লাহ্র অঙ্গীকারের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্র কাছে যা আছে তা উত্তম তোমাদের জন্য, যদি তোমরা জ্ঞানী হও। (৯৬) তোমাদের কাছে যা আছে নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্র কাছে যা আছে, কখনও তা শেষ হবে না। যারা সবর করে, আমি তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিদান দেব তাদের উত্তম কর্মের প্রতিদানস্বরূপ যা তারা করত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের নিন্দা ঃ) তোমরা আল্লাহ্র অঙ্গীকার (অর্থাৎ আল্লাহ্ যে অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাকে) পূর্ণ কর। (এর ফলে শরীয়তবিরোধী অঙ্গীকার এর আওতা বহির্ভূত হয়ে গেছে। অবশিষ্ট যাবতীয় অঙ্গীকার---আল্লাহ্র হক সম্পর্কিত হোক অথবা বান্দার হক সম্পর্কিত —এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।) যখন তোমরা তা (বিশেষভাবে অথবা সাধারণভাবে) নিজ দায়িত্বে করে নাও (বিশেষভাবে এই যে, স্পষ্টকৃত কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ কর এবং সাধারণভাবে এই যে, ঈমান আনার পর যাবতীয় ফরয বিধানের দায়িত্ব প্রসঙ্গক্রমে নেওয়া হয়ে গেছে) এবং (বিশেষত যেসব অঙ্গীকারে কসমও খাওয়া হয়, সেগুলো অধিকতর পালনীয়। অতএব এসবের মধ্যে) কসমসমূহকে পাকা করার পর (অর্থাৎ আল্লাহ্র নাম নিয়ে কসম খাওয়ার পর তা) ভঙ্গ করো না এবং তোমরা (এসব কসমের কারণে অঙ্গীকারসমূহে) আল্লাহ্কে সাক্ষীও করেছ قَدْ جَعَلْتُمْ এবং بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا —এগুলো বাস্তব শর্ত; অঙ্গীকার পূরণে হুঁশিয়ার করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।) নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা কর (অঙ্গীকার পূর্ণ কর কিংবা ভঙ্গ কর—তদনুযায়ী তোমাদের প্রতিদান দেবেন।) তোমরা (অঙ্গীকার ভঙ্গ করে) ঐ

(মক্কার জনৈকা পাগলিনি) মহিলার মত হয়ো না, যে সুতা কাটার পর খণ্ড-বিখণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলে, যাতে (তার মত) তোমরা (-ও) কসমসমূহকে (পাকা করার পর ভঙ্গ করে সেগুলোকে) পারস্পরিক কলহের অজুহাত গ্রহণ কর (কেননা কসম ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে মিত্রদের মধ্যে অনাস্থা এবং শত্রুদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এটা অশান্তির মূল। ভঙ্গ করাও শুধু) এ কারণে যে, একদল অন্য দলের চাইতে (সংখ্যাধিক্য অথবা ধনাঢ্যতায়) বেড়ে যায়। (উদাহরণত কাফিরদের দু'দলের মধ্যে শত্রুতা রয়েছে এবং তাদের একদলের সাথে তোমাদের মৈত্রী স্থাপিত হয়ে যায়। অতঃপর অপর দলকে অধিক ক্ষমতাবান দেখে মিত্রদলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে অপর দলের সাথে তোমরা চক্রান্তে লিপ্ত হও। অথবা কেউ অমুসলমানদের দলভুক্ত হয়ে গেল। অতঃপর কাফিরদের অধিক জোর দেখে ইসলামের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। আর এই যে, একদল অন্যদলের চাইতে অধিক ক্ষমতাবান হয় অথবা অন্য কোন দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে বেড়ে যায়, তবে) এতদ্বারা (অর্থাৎ বেড়ে যাওয়া দ্বারা) আল্লাহ্ তা'আলা শুধু তোমাদের পরীক্ষা করেন (যে, কে অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং কে অধিক জোর দেখে সেদিকে ঝুঁকে পড়ে।) আর যেসব বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে (এবং বিভিন্ন পথে চলতে) কিয়ামতের দিন তিনি সব (-গুলোর স্বরূপ) তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দেবেন (ফলে সত্যপন্থীরা পুরস্কার এবং মিথ্যা পন্থীরা শাস্তি পাবে। অতঃপর মধ্যবর্তী বাক্য হিসাবে এ মতবিরোধের রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে —) এবং (যদিও মত-বিরোধ হতে না দেওয়ার শক্তিও আল্লাহ্‌র ছিল, সে মতে) আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে একদল করে দিতে পারতেন, কিন্তু (রহস্যের তাগিদে যা বর্ণনা করা ও নির্দিষ্ট করা এখানে জরুরী নয়—তিনি) যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন (সেমতে পথ প্রদর্শনের অন্যতম হচ্ছে অঙ্গীকার পূর্ণ করা এবং বিপথ-গামিতার অন্যতম হচ্ছে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, বিপথগামীরা দুনিয়াতে যেমন পূর্ণ শাস্তি পায় না, তেমনি পরকালেও জবাবদিহীন থাকবে। তা কখনই নয়, বরং কিয়ামতে) তোমরা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে এবং (অঙ্গী-কার ভঙ্গ করার কারণে যেমন বাহ্যিক ক্ষতি হয় যা উপরে বর্ণিত হয়েছে, তেমনিভাবে এর ফলে অভ্যন্তরীণ ক্ষতিও হয়। অতঃপর তাই উল্লেখ করা হচ্ছে। অর্থাৎ তোমরা স্বীয় কসমসমূহকে পারস্পরিক অনাসৃষ্টির কারণ করো না। (অর্থাৎ তোমরা অঙ্গীকার ও কসমসমূহ ভঙ্গ করো না)। কখনো (তা দেখে) অন্য কারও পা ফসকে না যায় দৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। (অর্থাৎ অন্যরাও তোমাদের অনুসরণ করবে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে থাকবে) অতঃপর তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে (অপরকে) বাধাদান করার কারণে কষ্ট ভোগ করতে হবে। (কেননা, অঙ্গীকার পালন করা হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথ। অথচ তোমরা তা ভঙ্গ করার কারণ হয়েছো। এটাই হচ্ছে পূর্বোক্ত অভ্যন্তরীণ ক্ষতি, অর্থাৎ অপরকেও অঙ্গীকার ভঙ্গকারী করেছ।) এবং (কষ্ট এই যে, এমতাবস্থায়) তোমাদের কঠোর শাস্তি হবে। আর শক্তিশালী দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা যেমন নিষিদ্ধ যা উপরে বর্ণিত হল; তেমনি অর্থকড়ি উপার্জনের উদ্দেশ্যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হচ্ছে: তোমরা

আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারের বিনিময়ে (দুনিয়ার) কিঞ্চিৎ উপকার গ্রহণ করো না (আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারের অর্থ শুরুতে জানা হয়েছে। 'যৎকিঞ্চিৎ উপকার' বলে দুনিয়া বোঝানো হয়েছে। কারণ, দুনিয়া অনেক হওয়া সত্ত্বেও অল্পই। এর স্বরূপ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,) আল্লাহ্‌র কাছে যা (অর্থাৎ পরকালের ভাণ্ডার তা তোমাদের জন্য পার্থিব সামগ্রীর চাইতে) অনেকগুণে উত্তম যদি তোমরা বুঝতে চাও। (অতএব পরকালের সামগ্রী বেশি এবং পার্থিব সামগ্রী যতই কম হোক।) এবং (কম-বেশির তফাৎ ছাড়া আরও তফাৎ এই যে,) যা কিছু তোমাদের কাছে (দুনিয়াতে) আছে, তা (একদিন) নিঃশেষ হয়ে যাবে (হাত-ছাড়া হওয়ার কারণে কিংবা মৃত্যুর কারণে) এবং যা কিছু আল্লাহ্‌র কাছে আছে, তা চিরকাল থাকবে। যারা (অঙ্গীকার পূর্ণ করা ইত্যাদি ধর্মীয় বিধানে) দৃঢ়পদ আছে, আমি ভাল কাজের বিনিময়ে তাদের পুরস্কার (অর্থাৎ উল্লিখিত চিরস্থায়ী নিয়ামত) অবশ্যই তাদেরকে দেব। (সুতরাং অঙ্গীকার পূর্ণ করে প্রচুর অক্ষয় ধন অর্জন কর এবং অল্প ধ্বংসশীল সামগ্রীর জন্য অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম ঃ যেসব লেনদেন ও চুক্তি মুখে জরুরী করে নেওয়া হয় অর্থাৎ দায়িত্ব নেওয়া হয়, কসম খাওয়া হোক বা না হোক, কাজ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক বা না করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক, সবগুলোই عهد শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

এই আয়াতসমূহ প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ও পূর্ণতা প্রদান। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ন্যায়বিচার ও ইহসানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। عدل শব্দের মর্মার্থের মধ্যে প্রতিজ্ঞা পূরণও অন্তর্ভুক্ত। —(কুরতুবী)

কারও সাথে অঙ্গীকার করার পর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা খুব বড় গোনাহ্। কিন্তু এ ভঙ্গ করার কারণে কোন নির্দিষ্ট কাফ্ফারা দিতে হয় না ; বরং পরকালে শাস্তি হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পিঠে একটি পতাকা খাড়া করা হবে, যা হাশরের মাঠে তার অপমানের কারণ হবে।

এমনিভাবে যে কাজের কসম খাওয়া হয়, তার বিপরীত করাও কবীরা গোনাহ্। পরকালে বিরাট শাস্তি হবে এবং দুনিয়াতেও কোন কোন অবস্থায় কাফ্ফারা জরুরী হয়। —(কুরতুবী)

أَنْ تَكُوْنَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبٰى مِنْ أُمَّةٍ —এ আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোন দলের সাথে তোমাদের চুক্তি হয়ে গেলে, জাগতিক স্বার্থ ও উপকারের জন্য সে চুক্তি ভঙ্গ করো না। উদাহরণত তোমরা অনুভব কর যে, যে দল অথবা পার্টির সাথে চুক্তি হয়েছে, তারা দুর্বল ও সংখ্যায় কম কিংবা আর্থিক দিক দিয়ে নিঃস্ব। তাদের বিপক্ষীতে অপর দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, শক্তিশালী অথবা ধনাঢ্য। এমতাবস্থায় শুধু এই লোভে যে, শক্তিশালী ও ধনাঢ্য দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে মুনাফা অধিক হবে,

প্রথম পার্টির সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা জায়েয নয়; বরং তোমরা অঙ্গীকারে অটল থাকবে এবং লাভ ও ক্ষতি আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ করবে। তবে যে দল অথবা পার্টির সাথে অঙ্গীকার করা হয়, তারা যদি শরীয়তবিরোধী কাজকর্ম করে বা করায় তবে তাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করা জায়েয। শর্ত এই যে, পরিষ্কার ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে যে, আমরা এখন থেকে আর এ চুক্তি পালন করব না। فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ আয়াতে তাই বলা হয়েছে।

আয়াতের শেষে উপরোক্ত পরিস্থিতিকে মুসলমানদের পরীক্ষার উপায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে পরীক্ষা নেন যে, তারা মানসিক স্বার্থ ও বাসনার বশবর্তী হয়ে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, না আল্লাহ্র আদেশ পালনার্থে মানসিক প্রেরণাকে বিসর্জন দেয়?

ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কসম খেলে ঈমান থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা রয়েছে:

لَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا — এ আয়াতে আরও একটি বিরাট শাস্তি ও গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, যদি কেউ কসম খাওয়ার সময়ই কসমের খেলাফ করার ইচ্ছা রাখে এবং শুধু অপরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য কসম খায়, তবে এটা সাধারণ কসম ভঙ্গ করার চাইতে অধিক বিপজ্জনক গোনাহ্। এর পরিণতিতে ঈমান থেকেই বঞ্চিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। اَنْ تَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا বাক্যের উদ্দেশ্য তাই।

ঘুষ নেওয়া কঠোর হারাম এবং আল্লাহ্র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা:

وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا — অর্থাৎ আল্লাহ্র অঙ্গীকার সামান্য মূল্যের বিনিময়ে ভঙ্গ করো না। এখানে 'সামান্য মূল্য' বলে দুনিয়ার মুনাফাকে বোঝানো হয়েছে। এগুলো পরিমাণে যত বেশিই হোক না কেন, পরকালের মুনাফার তুলনায় দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত ধনসম্পদ সামান্যই বটে। যে ব্যক্তি পরকালের বিনিময়ে দুনিয়া গ্রহণ করে, সে অত্যন্ত লোকসানের কারবার করে। কারণ, অনন্তকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট নিয়ামত ও ধনসম্পদকে ক্ষণভঙ্গুর ও অপকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করা কোন বুদ্ধিমান পছন্দ করতে পারে না।

ইবনে আতিয়্যা বলেন: যে কাজ সম্পন্ন করা কারো দায়িত্বে ওয়াজিব, সেটাই তার জন্য আল্লাহ্র অঙ্গীকার। এরূপ কাজ সম্পন্ন করার জন্য কারও কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা এবং বিনিময় না নিয়ে কাজ না করার অর্থই আল্লাহ্র অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। এমনিভাবে যে কাজ না করা ওয়াজিব, কারও কাছ থেকে বিনিময় নিয়ে তা সম্পাদন করার অর্থও আল্লাহ্র অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।

এতে বোঝা গেল, প্রচলিত সবরকম ঘুষই হারাম। উদাহরণত সরকারী কর্মচারী কোন কাজের বেতন সরকার থেকে পায়, সে বেতনের বিনিময়ে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে আল্লাহ্র কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এখন যদি সে একাজ করার জন্য কারও কাছে বিনিময় চায় এবং বিনিময় ছাড়া কাজ করতে টালবাহানা করে, তবে সে আল্লাহ্র অঙ্গীকার ভঙ্গ করছে। এমনিভাবে কর্তৃপক্ষ তাকে যে কাজ করার ক্ষমতা দেয়নি, ঘুষ নিয়ে তা করাও আল্লাহ্র অঙ্গীকার ভঙ্গ করার শামিল।---(বাহ্‌রে মুহীত)

ঘুষের সংজ্ঞা ঃ ইবনে আতিয়্যার এ আলোচনায় ঘুষের সংজ্ঞাও এসে গেছে। তফসীর বাহ্‌রে মুহীতের ভাষায় তা এই ঃ

اخذ الاموال على ما يجب على الاخذ فعله او فعل ما يجب عليه تركه

অর্থাৎ যে কাজ করা তার দায়িত্বে ওয়াজিব, তা করার জন্য বিনিময় গ্রহণ করা অথবা যে কাজ না করা তার জন্য ওয়াজিব, তা করার জন্য বিনিময় গ্রহণ করাকে ঘুষ বলে। ---(বাহ্‌রে মুহীত, ৫৩৩ পৃঃ, ৫ম খণ্ড)

সমগ্র বিশ্বের সমগ্র নিয়ামত যে অল্প, তা পরবর্তী আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ---অর্থাৎ যা কিছু তোমাদের কাছে রয়েছে (এতে পার্থিব মুনাফা বোঝানো হয়েছে) তা সবই নিঃশেষ ও ধ্বংস হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে (এতে পরকালের সওয়াব ও আযাব বোঝানো হয়েছে) তা চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে।

দুনিয়ার সুখ-দুঃখ বন্ধুত্ব-শত্রুতা সবই ধ্বংসশীল এবং এগুলোর ফলাফল ও পরিণতি, যা আল্লাহ্র কাছে রয়েছে, যা চিরকাল বাকী থাকবে ঃ مَا عِنْدَكُمْ শব্দ বলতে সাধারণত ধনসম্পদের দিকে মন যায়। শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা সৈয়দ আসগর হুসাইন সাহেব মরহুম বলেন ঃ ما শব্দটি আভিধানিকভাবে ব্যাপক অর্থবহ। এখানে ব্যাপক অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে কোন শরীয়তসম্মত বাধা নেই। তাই এতে পার্থিব ধনসম্পদ তো অন্তর্ভুক্ত আছেই, এছাড়া দুনিয়াতে মানুষ আনন্দ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ, সুস্থতা, অসুস্থতা, লাভ-লোকসান, বন্ধুত্ব-শত্রুতা ইত্যাদি যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়, সেগুলোও এতে শামিল রয়েছে। এগুলো সবই ধ্বংসশীল। তবে এসব অবস্থা ও ব্যাপারের যে প্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং কিয়ামতের দিন যেগুলোর কারণে সওয়াব ও আযাব হবে, সেগুলো সব অক্ষয় হয়ে থাকবে। অতএব ধ্বংসশীল অবস্থা ও কাজ-কারবারে মগ্ন হয়ে থাকা এবং জীবন ও জীবনের কর্মক্ষমতা এতেই নিয়োজিত করে চিরস্থায়ী আযাব ও সওয়াবের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

دوران بقا چو باد صحرا بگذشت
تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت
پنداشت ستمگر کہ جفا بر ما کرد
بر گردن وے بماند و بر ما بگذشت

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾

(৯৭) যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অঙ্গীকার পালনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের নিন্দা বর্ণিত হয়েছিল। এটা ছিল একটি বিশেষ কাজ। আলোচ্য আয়াতে যাবতীয় সৎকর্ম এবং সৎকর্মীদের ব্যাপক বর্ণনা রয়েছে। আয়াতের বিষয়বস্তু এই যে, পরকালের পুরস্কার ও সওয়াব এবং দুনিয়ার বরকত শুধু অঙ্গীকার পালনের মধ্যে সীমিত নয় এবং কোন কর্মীরও কোন বৈশিষ্ট্য নেই; বরং সামগ্রিক নীতি এই যে,) যে কেউ কোন সৎ কাজ করে, পুরুষ হোক কিংবা নারী—শর্ত এই যে, সে যদি ঈমানদার হয় (কেননা কাফিরের সৎ কর্ম গ্রহণীয় নয়), তবে আমি তাকে (দুনিয়াতে তো) আনন্দময় জীবন দেব এবং (পরকালে) তাদের উত্তম কাজের বিনিময়ে তাদের পুরস্কার দেব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

'হায়াতে তাইয়্যেবা' কি? সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদগণের মতে এখানে 'হায়াতে তাইয়্যেবা' বলে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদের মতে পারলৌকিক জীবন বোঝানো হয়েছে। প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ীও এরূপ অর্থ নয় যে, সে কখনও অনাহার-উপবাস ও অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হবে না। বরং অর্থ এই যে, মু'মিন ব্যক্তি কোন সময় আর্থিক অভাব-অনটন কিংবা কষ্টে পতিত হলেও দু'টি বিষয় তাকে উদ্বিগ্ন হতে দেয় না। এক. অল্পেতুষ্টি এবং অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের অভ্যাস, যা দারিদ্র্যের মাঝেও কেটে যায়। দুই. তার এ বিশ্বাস যে, এ অভাব-অনটন ও অসুস্থতার বিনিময়ে পরকালে সুমহান, চিরস্থায়ী নিয়ামত পাওয়া যাবে। কাফির ও পাপাচারী ব্যক্তির অবস্থা এর বিপরীত। সে অভাব-অনটন ও অসুস্থতার সম্মুখীন হলে

তার জন্য সান্ত্বনার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। প্রায়শ আত্ম-হত্যা করে। পক্ষান্তরে সে যদি সচ্ছল জীবনেরও অধিকারী হয়, তবে লোভের আতিশয্য তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। সে কোটিপতি হয়ে গেল অর্বপতি হওয়ার চিন্তায় জীবনকে বিড়ম্বনাময় করে তোলে।

ইবনে আতিয়্যা বলেনঃ ঈমানদার সৎকর্মশীলদের আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেও প্রফুল্লতা ও আনন্দঘন জীবন দান করেন, যা কোন অবস্থাতেই পরিবর্তিত হয় না। সুস্থতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময় যে জীবন আনন্দময় হয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না; বিশেষত একারণে যে, অনাবশ্যক সম্পদ বাড়ানোর লোভ তাদের মধ্যে থাকে না। এটাই সর্বাবস্থায় উদ্বেগের কারণ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে তারা যদি অভাব-অনটন অথবা অসুস্থতারও সম্মুখীন হয়, তবে আল্লাহ্‌র ওয়াদার উপর তাদের পরিপূর্ণ আস্থা এবং কষ্টের পরেই সুখ পাওয়ার দৃঢ় আশা তাদের জীবনকে নিরানন্দ হতে দেয় না। যেমন কৃষক ক্ষেতে শস্য বপনের পর তার নিড়ানি-বাছানি ও জল সেচনের সময় যত কষ্টই করুক, সব তার কাছে সুখ বলে অনুভূত হয়। কেননা, কিছু দিন অতিবাহিত হলেই সে এর বিরাট প্রতিদান পাবে। ব্যবসায়ী নিজের ব্যবসায়ে, চাকরিজীবী তার দায়িত্ব পালনে কতই না পরিশ্রম করে, এমনকি মাঝে মাঝে অপমানও সহ্য করে, কিন্তু একারণে আনন্দিত থাকে যে, কয়েক দিন পর সে ব্যবসায়ে বিরাট মুনাফা অথবা চাকরির বেতন পাবে বলে বিশ্বাস রাখে। মু'মিনও বিশ্বাস রাখে যে, প্রত্যেক কষ্টের জন্য সে প্রতিদান পাচ্ছে এবং পরকালে এর প্রতিদান চিরস্থায়ী নিয়ামতের আকারে পাওয়া যাবে। পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের কোন মূল্য নেই। তাই এখানে সে সুখ-দুঃখ এবং ঠাণ্ডা-গরম সব কিছুই হাসিমুখে সহ্য করে যায়। এমতাবস্থায়ও তার জীবন উদ্বেগজনক ও নিরানন্দ হয় না। এটাই হচ্ছে 'হায়াতে তাইয়্যেবা', যা মু'মিন দুনিয়াতে নগদ পায়।

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾

---

(৯৮) অতএব যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করুন। (৯৯) তার আধিপত্য চলে না তাদের উপর, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আপন পালনকর্তার ভরসা রাখে। (১০০) তার আধিপত্য তো তাদের উপরই চলে, যারা তাকে বন্ধু মনে করে এবং যারা তাকে অংশীদার মানে।

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি এবং সৎ কর্ম সম্পাদনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও উৎসাহিত করা হয়েছে। শয়তানের প্ররোচনায়ই মানুষ এসব বিধি-বিধানে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। তাই আলোচ্য আয়াতে বিতাড়িত শয়তান

থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি সৎকর্মের বেলায় এর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে কোরআন পাঠের সাথে এর উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিশেষত্বের কারণ এটাও হতে পারে যে, কোরআন তিলাওয়াত এমন একটি কাজ, যদ্দ্বারা শয়তান পলায়ন করে, دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند

যারা কোরআন পাঠ করে, তাদের কাছ থেকে দৈত্যদানব লেজ গুটিয়ে পালায়। এ ছাড়া কোন কোন বিশেষ আয়াত ও সূরা শয়তানী প্রভাব দূর করার জন্য পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র। এগুলোর কার্যকারিতা ও উপকারিতা হাদীস ও কোরআন দ্বারাই প্রমাণিত। (বয়ানুল-কোরআন)

এ সত্ত্বেও যখন কোরআন তিলাওয়াতের সাথে শয়তান থেকে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তখন অন্যান্য কাজের বেলায় এটা আরও জরুরী হয়ে যায়।

এ ছাড়া স্বয়ং কোনআন তিলাওয়াতের মধ্যে শয়তানী কুমন্ত্রণারও আশংকা থাকে। ফলে তিলাওয়াতের আদব-কায়দা কম হয়ে যায় এবং চিন্তা-ভাবনা ও বিনয়-নম্রতা থাকে না। এ জন্যও কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা জরুরী মনে করা হয়েছে। (ইবনে কাসীর, মাযহারী)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ইতিপূর্বে সৎ কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব জানা গেল। শয়তান মাঝে মাঝে এতে ত্রুটি সৃষ্টি করে। কোন সময় অঙ্গীকার পালনে এবং কোন সময় অন্য কাজ যেমন কোরআন তিলাও-য়াতেও ত্রুটি সৃষ্টি করে) অতএব (হে মুহাম্মদ, আপনি এবং আপনার মাধ্যমে আপনার উম্মতের লোকগণ শুনে নিন) যখন আপনি কোরআন পাঠ করতে চান, তখন বিতাড়িত শয়তান (এর অনিষ্ট) থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করুন। (আসলে তো মনেপ্রাণে আল্লাহ্‌র প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। আশ্রয় প্রার্থনার ব্যাপারে এটাই ওয়াজিব। মুখে পড়ে নেওয়াও সুন্নত। আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ আমি এজন্য দেই যে,) নিশ্চয় তার জোর তাদের উপর চলে না, যারা ঈমানদার এবং পালনকর্তার উপর ভরসা রাখে। তার জোর শুধু তাদের উপরই চলে, যারা তার সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তাদের উপর (চলে), যারা আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেনঃ মানুষের শত্রু দু'রকম। এক. স্বয়ং মানবজাতির মধ্য থেকে; যেমন সাধারণ কাফির। দুই. জিনদের মধ্য থেকে অবাধ্য শয়তানের দল। ইসলাম প্রথম প্রকার শত্রুকে জিহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিহত করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার শত্রুর জন্য শুধু আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ দিয়েছে। কারণ প্রথম প্রকার শত্রু স্বজাতীয়। তার আক্রমণ প্রকাশ্যভাবে হয়। তাই তার সাথে জিহাদ ও লড়াই ফরয করে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তানের শত্রুতা

দৃষ্টিগোচর হয় না। তার আক্রমণও মানুষের উপর সামনাসামনি হয় না। তাই তাকে প্রতিহত করার জন্য এমন সত্তার আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য করা হয়েছে, যিনি মানুষ ও শয়তান কারও দৃষ্টিগোচর নয়। আর শয়তানকে প্রতিহত করার বিষয়টি আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করার যথার্থতা এই যে, যে ব্যক্তি শয়তানের কাছে পরাজিত হবে, সে আল্লাহ্‌র দরবার থেকে বিতাড়িত এবং আযাবের যোগ্য হবে। মানবশত্রুর বেলায় এমন নয়। কাফিরদের সাথে যুদ্ধে কেউ পরাজিত হলে কিংবা নিহত হলে সে শহীদ ও সওয়াবের অধিকারী হবে। তাই দেহ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা মানবশত্রুর মুকাবিলা করা সর্বাবস্থায় লাভজনক—জয়ী হলে শত্রুর শক্তি নিশ্চিহ্ন হবে এবং পরাজিত হলে শহীদ হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে সওয়াবের অধিকারী হবে।

মাস'আলাঃ কোরআন তিলাওয়াতের সময় 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' পাঠ করা আলোচ্য আয়াতের আদেশ পালনকল্পে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে প্রমাণিত রয়েছে। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে তা পাঠ করেন নি বলেও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। তাই অধিক সংখ্যক আলিম এ আদেশকে ওয়াজিব নয়—সুন্নত বলেছেন। ইবনে জরীর তাবারী এ বিষয়ে সবার ইজমা বর্ণনা করেছেন। —এ সম্পর্কে উক্তিগত ও কর্মগত যত হাদীস রয়েছে, তিলাওয়াতের পূর্বে 'আউযুবিল্লাহ্' অধিকাংশ অবস্থায় পড়ার এবং কোন অবস্থায় না পড়ার—সব বিবরণ ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থের শুরুতে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

নামাযে আউযুবিল্লাহ শুধু প্রথম রাক'আতের শুরুতে, না প্রত্যেক রাক'আতের শুরুতে পড়তে হবে, এ সম্পর্কে ফিকাহ্‌বিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইমাম আবূ হানীফার মতে শুধু প্রথম রাক'আতে পড়া উচিত। ইমাম শাফেয়ীর মতে প্রত্যেক রাক'আতের শুরুতে পড়া মোস্তাহাব। উভয়পক্ষের প্রমাণাদি তফসীরে মাযহারীতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

কোরআন তিলাওয়াত নামাযে হোক কিংবা নামাযের বাইরে—উভয় অবস্থাতেই তিলাওয়াতের পূর্বে আউযুবিল্লাহ্ পাঠ করা সুন্নত। তবে একবার পড়ে নিলে পরে যত বারই তিলাওয়াত হবে প্রথম আউযুবিল্লাহই যথেষ্ট হবে। মাঝখানে তিলাওয়াত বাদ দিয়ে কোনো সাংসারিক কাজে মশগুল হলে পুনর্বার তিলাওয়াতের সময় আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ্ পড়ে নেওয়া উচিত।

কোরআন তিলাওয়াত ছাড়া অন্য কোন কালাম অথবা কিতাব পাঠ করার পূর্বে আউযুবিল্লাহ পড়া সুন্নত নয়। সেক্ষেত্রে শুধু বিসমিল্লাহ্ পড়া উচিত।—(দুররে মুখতার)

তবে বিভিন্ন কাজ ও অবস্থায় আউযুবিল্লাহ্‌র শিক্ষা হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। উদাহরণত কারও অধিক ক্রোধের উদ্রেক হলে হাদীসে আছে যে, আউযুবিল্লাহ্ পাঠ করলে ক্রোধ দমিত হয়ে যায়।—(ইবনে কাসীর)

হাদীসে আরও বলা হয়েছে, পায়খানায় প্রবেশ করার পূর্বে 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবসে ওয়াল খাবায়েসে' পাঠ করা মোস্তাহাব।—(শামী)

আল্লাহ্র প্রতি ঈমান ও ভরসা শয়তানের আধিপত্য থেকে মুক্তির পথ ঃ এ আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানকে এমন শক্তি দেননি যাতে সে যে কোন মানুষকে মন্দ কাজে বাধ্য করতে পারে। মানুষ স্বয়ং নিজের ক্ষমতা ও শক্তি অসাবধানতা-বশত কিংবা কোন স্বার্থের কারণে প্রয়োগ না করলে সেটা তার দোষ। তাই বলা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং যাবতীয় অবস্থা ও কাজকর্মে স্বীয় ইচ্ছাশক্তির পরিবর্তে আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখে, কেননা তিনিই সৎ কাজের তওফীক-দাতা এবং প্রত্যেকটি অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী, এ ধরনের লোকের উপর শয়তান আধি-পত্য বিস্তার করতে পারে না। হ্যাঁ, যারা আত্মস্বার্থের কারণে শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব করে, তার কথাবার্তা পছন্দ করে এবং আল্লাহ্র সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে তাদেরকে কোন সৎ কাজের দিকে যেতে দেয় না এবং তারা সমস্ত মন্দ কাজের অগ্রভাগে থাকে।

সূরা হিজরের আয়াতে উল্লিখিত বিষয়বস্তুও তাই। তাতে শয়তানের দাবীর বিপ-রীতে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তর দিয়েছেন إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ —অর্থাৎ আমার বিশেষ বান্দাদের উপর কোন জোর চালাতে পারবে না। তবে তার উপর চলবে, যে নিজেই বিপথগামী হয় এবং তোর অনুসরণ করতে থাকে।

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۙ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۗ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۙ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

(১০১) এবং যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল জানেন; তখন তারা বলেঃ আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন, বরং তাদেরই অধিকাংশ লোক জানে না। (১০২) বলুন, একে পবিত্র ফেরেশতা পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিশ্চিত সত্যসহ নাযিল করেছেন, যাতে মু'মিনদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এটা মুসলমানদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ-স্বরূপ। (১০৩) আমি তো ভালভাবেই জানি যে, তারা বলেঃ তাকে জনৈক ব্যক্তি শিক্ষা দেয়। যার দিকে তারা ইঙ্গিত করে, তার ভাষা তো আরবী নয় এবং এ কোরআন পরিষ্কার আরবী ভাষায়। (১০৪) যারা আল্লাহ্র কথায় বিশ্বাস করে না, তাদেরকে আল্লাহ্ পথপ্রদর্শন করেন না এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (১০৫) মিথ্যা কেবল তারা রচনা করে, যারা আল্লাহ্র নিদর্শনে বিশ্বাস করে না। এবং তারাই মিথ্যাবাদী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পূর্বাপর সম্পর্কঃ পূর্ববর্তী আয়াতে কোরআন তিলাওয়াতের সময় আউযুবিল্লাহ্ পড়ার নির্দেশ ছিল। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শয়তান কোরআন তিলাওয়াতের সময় মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতসমূহে শয়তানের এমনি ধরনের কুমন্ত্রণার জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

নবুয়ত সম্পর্কে কাফিরদের সন্দেহের তিরস্কারপূর্ণ জওয়াবঃ যখন আমি কোন আয়াত অন্য আয়াতের স্থলে পরিবর্তন করি, (অর্থাৎ এক আয়াতকে শব্দগত অথবা অর্থগতভাবে রহিত করে তৎস্থলে অন্য আদেশ দেই) অথচ আল্লাহ্ তা'আলা যে আদেশ (প্রথমবার অথবা দ্বিতীয়বার) প্রেরণ করেন (তার উপযোগিতা ও তাৎপর্য) তিনিই ভাল জানেন (যে, যাদেরকে এ আদেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের অবস্থা অনুযায়ী এক সময়ে এক উপযোগিতা ছিল, অতঃপর অবস্থার পরিবর্তনে উপযোগিতা ও তাৎপর্য অন্যরূপ হয়ে গেছে) তখন তারা বলেঃ (নাউযুবিল্লাহ্।) আপনি (আল্লাহ্র বিরুদ্ধে) মনগড়া উক্তি করেন [নিজের কথাকে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেন। তা না হলে আল্লাহ্র আদেশ হলে তা পরিবর্তন করার কি প্রয়োজন ছিল? আল্লাহ্ কি পূর্বে জানতেন না? তারা এ বিষয়ে চিন্তা করে না যে, মাঝে মাঝে সব অবস্থা জানা থাকা সত্ত্বেও প্রথম অবস্থায় প্রথম আদেশ দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় অবস্থা দেখা দেওয়ার কথা যদিও তখন জানা থাকে, কিন্তু উপযোগিতার তাগিদে তখন দ্বিতীয় অবস্থার আদেশ বর্ণনা করা হয় না, বরং অবস্থাটি যখন দেখা দেয়, তখনই তা বর্ণনা করা হয়। উদাহরণত ডাক্তার এক ওষুধ মনোনীত করে এবং সে জানে যে, এটা ব্যবহার করলে অবস্থা পরিবর্তিত হবে এবং অন্য ওষুধ দেওয়া হবে। কিন্তু রোগীকে প্রথমেই সব বিবরণ বলে না। কোরআন ও হাদীসেও বিধি-বিধান রহিত করার স্বরূপ তাই। যে ব্যক্তি এ স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নয়, সে শয়তানের প্ররোচনায় নসখ অর্থাৎ রহিতকরণকে অস্বীকার করে। এ জন্যই এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) মনগড়া কথা বলেন না] বরং তাদেরই অধিকাংশ লোক মূর্খ (ফলে বিধি-বিধানের রহিতকরণকে যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই

আল্লাহ্র কালাম হওয়ার পরিপন্থী মনে করে।), আপনি (তাদের জওয়াবে) বলে দিন ঃ (এই কালাম আমার রচিত নয়, বরং) একে পবিত্র আত্মা (অর্থাৎ জিবরাঈল) পালন-কর্তার পক্ষ থেকে তাৎপর্যের প্রেক্ষাপটে আনয়ন করেছেন, (তাই এটা আল্লাহ্র কালাম। বস্তুত বিধানের পরিবর্তন তাৎপর্য ও উপযোগিতার তাগিদে হয়। এই কালাম এজন্য প্রেরিত হয়েছে) যাতে ঈমানদারদেরকে (ঈমানের উপর) দৃঢ়পদ রাখেন এবং মুসল-মানদের জন্য হিদায়ত ও সুসংবাদ (-এর উপায়) হয়ে যায়। (এরপর কাফিরদের আরও একটি অনর্থক সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে) আমি জানি, তারা (অন্য একটি ভ্রান্ত কথা) আরও বলে যে, তাকে তো জনৈক ব্যক্তি শিক্ষা দান করে [এতে একজন অনারব, রোমের অধিবাসী কর্মকারকে বোঝানো হয়েছে। তার নাম বাল'আম অথবা মকীস। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনত। তাই সে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে বসত। সে ইঞ্জীল ইত্যাদি গ্রন্থও কিছু কিছু জানত। এ থেকেই কাফিররা রটিয়ে দেয় যে, এ ব্যক্তিই মুহাম্মদকে কোরআনের কালাম শিক্ষা দেয়।—(দুররে মনসুর) আল্লাহ্ তা'আলা এর জওয়াব দিয়েছেন যে, কোরআন শব্দ ও অর্থের সমষ্টিকে বলা হয়। তোমরা যদি কোরআনের অর্থ ও তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম না হও, তবে কমপক্ষে আরবী ভাষার উচ্চমান অলংকার সম্পর্কে তো অনবগত নও। অতএব তোমাদের এতটুকু বোঝা উচিত যে, যদি ধরে নেওয়া যায়, কোরআনের অর্থ-ভাণ্ডার এই ব্যক্তি শিখিয়ে দিয়েছে, তবে কোরআনের ভাষা ও তার অনুপম অলংকার, যার মোকাবিলা করতে সমগ্র আরব অক্ষম—কোত্থেকে এসে গেল ? কেননা] যার দিকে তারা ইঙ্গিত করে, তার ভাষা অনারব এবং এ কোরআনের ভাষা সুস্পষ্ট আরবী। [কোন অনারব ব্যক্তি এমন বাক্যাবলী কিরূপে রচনা করতে পারে ? যদি বলা হয় যে, বাক্যাবলী রসূলুল্লাহ্ (সা) রচনা করে থাকবেন, তবে ঐ চ্যালেঞ্জ দ্বারা এর পুরোপুরি জওয়াব হয়ে গেছে, যা সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র আদেশে স্বীয় নবুয়ত ও কোরআনের সত্যতার মাপকাঠি এ বিষয়কেই স্থির করেছিলেন যে, তোমাদের বক্তব্য অনুযায়ী কোরআন মানবরচিত কালাম হলে তোমরাও তো মানুষ এবং অনুপম ভাবালংকারের দাবীদার। অতএব তোমরা তদনুরূপ কালাম বেশি না হোক এক আয়াত পরিমাণেই লিখে আন। কিন্তু সমগ্র আরব তাঁর বিরুদ্ধে যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহস পায়নি। এরপর নবুয়ত অস্বীকারকারী এবং কোরআনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনকারীদেরকে কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে,] যারা আল্লাহ্র আয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদেরকে আল্লাহ্ কখনো সুপথে আনবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (এরা যে আপনাকে, নাউযুবিল্লাহ —মিথ্যা কালাম রচয়িতা বলছে) মিথ্যা রচনাকারী তো তারাই ; যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস রাখে না এবং এরা পুরোপুরি মিথ্যাবাদী।

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ

بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝١٠٦ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝١٠٧ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝١٠٨ لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝١٠٩

(১০৬) যার উপর জোরজবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহ্‌র গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি। (১০৭) এটা এ জন্য যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে এবং আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (১০৮) এরাই তারা, আল্লাহ্ তা'আলা এদেরই অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরাই কাণ্ডজ্ঞানহীন। (১০৯) বলা বাহুল্য, পরকালে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপনের পর আল্লাহ্‌র সাথে কুফ্‌রী করে (এতে রসূলের সাথে কুফ্‌রী এবং কিয়ামত অস্বীকার ইত্যাদি সবই বোঝানো হয়েছে।) কিন্তু যার উপর (কাফিরদের পক্ষ থেকে) জবরদস্তি করা হয় (যে, যদি তুমি অমুক কুফ্‌রী কাজ না কর বা কথা না বল তবে আমরা তোমাকে হত্যা করব এবং অবস্থাদৃষ্টে বোঝাও যায় যে, তারা এরূপ করতে পারে তবে,) শর্ত এই যে, যদি তার অন্তর ঈমানে অটল থাকে (অর্থাৎ বিশ্বাসে কোনরূপ ত্রুটি না আসে এবং একথা ও কাজকে বিরাট গোনাহ্ ও মন্দ মনে করে, তবে সে বর্ণিত ধর্মত্যাগের শাস্তির যোগ্য হবে না এবং বাহ্যত তার কুফ্‌রী বাক্যে অথবা কাজে লিপ্ত হওয়া একটি ওযরের কারণে হবে। তাই পরবর্তী বাক্যে ধর্ম ত্যাগের যে শাস্তি বর্ণিত হচ্ছে, তা এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না)। অবশ্য যে ব্যক্তি মন খুলে (অর্থাৎ এ কুফরকে বিশুদ্ধ ও উত্তম মনে করে) কুফ্‌রী করে, এরূপ লোকদের উপর আল্লাহ্‌র গযব আপতিত হবে এবং তাদের বিরাট শাস্তি হবে (এবং) এই (গযব ও শাস্তি) এই কারণে হবে যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে এবং এই কারণে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ অবিশ্বাসী লোকদেরকে (যারা ইহকালকে পরকালের উপর সবসময় অগ্রাধিকার দেয়) পথ প্রদর্শন করেন না। (এ দু'টি কারণ পৃথক

পৃথক নয়; বরং একই কারণের সমষ্টি। এর সারমর্ম এই যে, কাজের সংকল্প করার পর আল্লাহ্র রীতি অনুযায়ী কাজের সৃষ্টি হয়। এর উপর ভিত্তি করে কাজের বিকাশ ঘটে। আয়াতে اسْتَحَبُّوا দ্বারা সংকল্প এবং لَا يَهْدِي দ্বারা কাজ সৃষ্টির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতদুভয়ের সমষ্টির উপর ভিত্তি করে সমস্ত কাজের বিকাশ ঘটেছে।) এরা তারা যে, (দুনিয়াতে তাদের কুফর প্রীতির অবস্থা এই যে,) আল্লাহ্ তাদের অন্তরের উপর, কর্ণের উপর এবং চক্ষুর উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা (পরিণাম থেকে) সম্পূর্ণ গাফিল। (তাই) নিশ্চিত কথা এই যে, পরকালে তারা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মাস'আলা : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তিকে হত্যার হুমকি দিয়ে কুফ্রী কালাম উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়, যদি প্রবল বিশ্বাস থাকে যে, হুমকিদাতা তা কার্যে পরিণত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে, তবে এমন জবরদস্তির ক্ষেত্রে সে যদি মুখে কুফ্রী কালাম উচ্চারণ করে, তবে তাতে কোন গোনাহ্ নেই এবং তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হবে না। তবে শর্ত এই যে, তার অন্তর ঈমানে অটল থাকতে হবে এবং কুফ্রী কালামকে মিথ্যা ও মন্দ বলে বিশ্বাস করতে হবে।—(কুরতুবী, মাযহারী)

আলোচ্য আয়াতটি কতিপয় সাহাবী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যাদেরকে মুশরিকরা গ্রেফতার করেছিল এবং হত্যার হুমকি দিয়ে কুফ্রী অবলম্বন করতে বলেছিল।

যাঁরা গ্রেফতার হয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন হযরত আম্মার, তদীয় পিতা ইয়াসির, মাতা সুমাইয়্যা, সুহায়েব, বেলাল এবং খাব্বাব (রা)। তাঁদের মধ্যে হযরত ইয়াসির ও তদীয় সহধর্মিণী সুমাইয়্যা কুফ্রী কালাম উচ্চারণ করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। হযরত ইয়াসিরকে হত্যা করা হয় এবং হযরত সুমাইয়্যাকে দু' উটের মাঝখানে বেঁধে উট দু'টিকে দু'দিকে হাঁকিয়ে দেওয়া হয়। ফলে তিনি দ্বিখণ্ডিত হয়ে শহীদ হন। এ দু'জন মহাত্মাই ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম শাহাদত বরণ করেন। এমনিভাবে হযরত খাব্বাবও কুফ্রী কালাম উচ্চারণ করতে অস্বীকার করে হাসিমুখে শাহাদত বরণ করে নেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আম্মার প্রাণের ভয়ে কুফ্রীর মৌখিক স্বীকারোক্তি করলেও তাঁর অন্তর ঈমানে অটল ছিল। শত্রুর কবল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হন, তখন অত্যন্ত দুঃখের সাথে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি যখন কুফ্রী কালাম বলেছিলে, তখন তোমার অন্তরের অবস্থা কি ছিল? তিনি আরয করলেন : আমার অন্তর ঈমানের উপর স্থির এবং অটল ছিল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে আশ্বাস দেন যে, তোমাকে এজন্য কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এ সিদ্ধান্তের সত্যায়নে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

জোর-জবরদস্তির সংজ্ঞা ও সীমা ঃ اكراه--এর শাব্দিক অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তিকে এমন কথা বলতে অথবা এমন কাজ করতে বাধ্য করা, যা বলতে বা করতে সে সম্মত নয়। এরূপ জোর-জবরদস্তির দু'টি পর্যায় রয়েছে। এক, মনে-প্রাণে তাতে সম্মত নয়, কিন্তু এমন অক্ষম ও অবশও নয় যে, অস্বীকার করতে পারে না। ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় এ স্তরকে اكراه غير ملجى বলা হয়। এরূপ জবরদস্তির কারণে কুফ্‌রী বাক্য অথবা কোন হারাম কাজ করা জায়েয নয়। তবে কোন কোন খুঁটিনাটি বিধানে এর কারণেও কিছু প্রতিক্রিয়া প্রমাণিত হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহ্ শাস্ত্রে বর্ণিত রয়েছে।

জোর-জবরদস্তির দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে এমন অক্ষম ও অপারক করে দেওয়া যে, সে যদি জোর-জবরদস্তিকারীদের কথামত কাজ না করে, তবে তাকে হত্যা করা হবে কিংবা তার কোন অঙ্গহানি করা হবে। ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় এ পর্যায়কে اكراه ملجى বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে এমন জোর-জবরদস্তি, যা মানুষকে ক্ষমতাহীন ও অক্ষম করে দেয়। এমন জবরদস্তির অবস্থায় অন্তর ঈমানের উপর স্থির ও অটল থাকার শর্তে মুখে কুফ্‌রী কলিমা উচ্চারণ করা জায়েয। এমনিভাবে কাউকে হত্যা করা ছাড়া অন্য কোন হারাম কাজ করতে বাধ্য করলে তা করলেও কোন গোনাহ্ নেই।

কিন্তু উভয় প্রকার জোর-জবরদস্তির মধ্যে শর্ত এই যে, হুমকিদাতা যে বিষয়ের হুমকি দেয়, তা বাস্তবায়নের শক্তিও তার থাকতে হবে এবং যাকে হুমকি দেওয়া হয়, তার প্রবল ধারণা থাকতে হবে যে, সে যদি তার কথা না মানে, তবে যে বিষয়ের হুমকি দিচ্ছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত করে ফেলবে।—(মাযহারী)

লেনদেন দু'প্রকার। এক. যাতে আন্তরিকভাবে সম্মতি অপরিহার্য ; যেমন কেনা-বেচা, দান-খয়রাত ইত্যাদি। এগুলোতে আন্তরিকভাবে সম্মত হওয়া শর্ত। কোরআন বলে ঃ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ—অর্থাৎ অপরের মাল হালাল হয় না যে পর্যন্ত উভয়পক্ষের সম্মতিতে ব্যবসা ইত্যাদির আদান-প্রদান না হয়। হাদীসে আছে, لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه—অর্থাৎ কোন মুসলমানের মাল হালাল হয় না, যে পর্যন্ত সে মনের খুশিতে তা দিতে সম্মত না হয়।

এ জাতীয় লেনদেন যদি জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে করা হয়, তবে শরীয়তের আইনে তা অগ্রাহ্য হবে। জোর-জবরদস্তির অবস্থা কেটে গেলে যখন সে স্বাধীন হবে—জোর-জবরদস্তির অবস্থায় কৃত কেনা-বেচা অথবা দান-খয়রাত ইচ্ছা করলে সে বহালও রাখতে পারে, না হয় বাতিলও করে দিতে পারে।

কিছু কাজ ও বিষয় এমনও রয়েছে যেগুলো শুধু মুখের কথার উপর নির্ভরশীল। ইচ্ছা, সম্মতি, খুশি ইত্যাদি শর্ত নয় ; যেমন বিয়ে, তালাক, তালাক প্রত্যাহার, গোলাম মুক্তকরণ ইত্যাদি। এ জাতীয় ব্যাপার সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة - رواه ابوداود والترمذى

অর্থাৎ দু'ব্যক্তি যদি মুখে বিয়ের ইজাব-কবূল শর্তানুযায়ী করে নেয় অথবা কোন স্বামী স্ত্রীকে মুখে তালাক দিয়ে দেয় অথবা তালাকের পর মুখে তা প্রত্যাহার করে নেয় হাসি-ঠাট্টার ছলে হলেও এবং অন্তরে বিয়ে, তালাক ও তালাক প্রত্যাহারের ইচ্ছা না থাকলেও মুখের কথা দ্বারা বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যাবে, তালাক হয়ে যাবে এবং প্রত্যাহারও শুদ্ধ হবে।—(মাযহারী)

ইমাম আযম আবূ হানীফা, শা'বী, যুহরী, নখয়ী ও কাতাদাহ্ (রহ) প্রমুখ বলেন ঃ জবরদস্তির অবস্থায় যদিও সে তালাক দিতে আন্তরিকভাবে সম্মত ছিল না, অক্ষম হয়ে তালাক শব্দ বলে দিয়েছে, তবুও তালাক হয়ে যাবে। কারণ, তালাক হওয়ার সম্পর্ক শুধু তালাক শব্দ বলে দেওয়ার সাথে—মনের ইচ্ছা ও মনন শর্ত নয়; যেমন পূর্বোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী, হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে জবরদস্তি অবস্থায় তালাক হবে না। কেননা হাদীসে আছে,— رفع عن امتى الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه —অর্থাৎ আমার উম্মত থেকে ভুল, বিস্মৃতি এবং যে কাজে তাদেরকে বাধ্য করা হয়, সব তুলে নেওয়া হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফার মতে এ হাদীসটি পরকালীন বিধানের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ ভুল-বিস্মৃতির কারণে অথবা জবরদস্তির অবস্থায় কোন কথা অথবা কাজ শরীয়তের বিরুদ্ধে করে বা বলে ফেললে সেজন্য কোন গোনাহ্ হবে না। দুনিয়ার বিধান এবং এ কাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, এগুলোর প্রতিফলন অনুভূত ও চাক্ষুস। এর প্রতিফলনের কারণে দুনিয়ার যেসব বিধান হওয়া সম্ভব, সেগুলো অবশ্যই হবে। উদাহরণত একজন অন্য জনকে ভুলবশত হত্যা করল। এখানে হত্যার গোনাহ্ এবং পরকালের শাস্তি নিশ্চয়ই হবে না। কিন্তু হত্যার চাক্ষুস পরিণতি অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ যেমন অবশ্যই হয়, তেমনি এর শরীয়তগত পরিণতিও সাব্যস্ত হবে যে, তার স্ত্রী ইদ্দতের পর পুনর্বিবাহ করতে পারবে এবং তার ধন-সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। এমনিভাবে যখন তালাক, তা প্রত্যাহার ও বিবাহের শব্দ মুখে বলে দেয়, তখন তার শরীয়তগত পরিণতিও প্রতিফলিত হয়ে যাবে।—(মাযহারী, কুরতুবী)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَٰهَدُوا وَصَبَرُوٓا ۙ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٠﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ

نَفۡسٍ تُجَادِلُ عَنۡ نَّفۡسِهَا وَتُوَفّٰی کُلُّ نَفۡسٍ مَّا عَمِلَتۡ وَهُمۡ لَا یُظۡلَمُوۡنَ ﴿۱۱۱﴾ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرۡیَۃً کَانَتۡ اٰمِنَۃً مُّطۡمَئِنَّۃً یَّاۡتِیۡهَا رِزۡقُهَا رَغَدًا مِّنۡ کُلِّ مَکَانٍ فَکَفَرَتۡ بِاَنۡعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الۡجُوۡعِ وَالۡخَوۡفِ بِمَا کَانُوۡا یَصۡنَعُوۡنَ ﴿۱۱۲﴾ وَلَقَدۡ جَآءَهُمۡ رَسُوۡلٌ مِّنۡهُمۡ فَکَذَّبُوۡهُ فَاَخَذَهُمُ الۡعَذَابُ وَهُمۡ ظٰلِمُوۡنَ ﴿۱۱۳﴾

(১১০) যারা দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর দেশত্যাগী হয়েছে অতঃপর জিহাদ করেছে নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা এসব বিষয়ের পরে অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১১১) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মসমর্থনে সওয়াল-জওয়াব করতে করতে আসবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ ফল পাবে এবং তাদের উপর জুলুম করা হবে না। (১১২) আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, তথায় প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে মজা আস্বাদন করালেন, ক্ষুধা ও ভীতির। (১১৩) তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল আগমন করেছিলেন। অনন্তর ওরা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করল। তখন আযাব এসে ওদেরকে পাকড়াও করল এবং নিশ্চিতই ওরা ছিল পাপাচারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কুফরের শাস্তি বর্ণিত হয়েছিল, আসল কুফর হোক কিংবা ধর্ম ত্যাগের কুফর। এর পর আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, যে কাফির কিংবা ধর্ম-ত্যাগী সত্যিকার ঈমান আনে, তার বিগত সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। ঈমান এমনি এক অমূল্য সম্পদ।

দ্বিতীয় আয়াতে কিয়ামতের কথা এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, এসব প্রতিদান ও শাস্তি কিয়ামতের পরেই হবে। তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুফর ও গোনাহ্‌র আসল শাস্তি কিয়ামতের পরেই পাওয়া যাবে, কিন্তু কোন কোন গোনাহ্‌র কিছু কিছু শাস্তি দুনিয়া-তেও পাওয়া যায়। আয়াতের সংক্ষিপ্ত তফসীর এইরূপ ঃ

এর পর (যদি কুফরের পরে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে তবে) নিশ্চয় আপনার পালন-কর্তা তাদের জন্য, যারা কুফরে লিপ্ত হওয়ার পর (ঈমান আনয়ন করে) হিজরত করেছে, অতঃপর জিহাদ করেছে এবং (ঈমানে) অবিচল রয়েছে, আপনার পালনকর্তা (তাদের জন্য) এ সবের (অর্থাৎ এসব আমলের) পর অত্যন্ত ক্ষমাকারী, দয়ালু। (অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কর্মের বরকতে অতীতের যাবতীয় গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলার রহমতে তারা জান্নাতে উচ্চ উচ্চ শ্রেণী পাবে। কুফর ও পূর্ববর্তী গোনাহ্ তো শুধু ঈমান দ্বারাই মাফ হয়ে যায়--- জিহাদ ইত্যাদি সৎ কর্ম গোনাহ্ মাফ হওয়ার জন্য শর্ত নয়—কিন্তু সৎ কর্ম জান্নাতে উচ্চ শ্রেণী পাওয়ার কারণ। তাই এরই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রতিদান ও শাস্তি সেদিন হবে) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পক্ষে কথা বলবে (এবং অন্যান্যের ব্যাপারে কিছু বলবে না) এবং প্রত্যেকেই স্বীয় কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান পাবে। (অর্থাৎ সৎ কাজের প্রতিদান কম হবে না, যদিও আল্লাহ্র রহমতে কিছু বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে মন্দ কাজের বিনিময় বেশি হবে না, যদিও আল্লাহ্র রহমতে কিছু কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটাই পরবর্তী বাক্যের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ) তাদের উপর জুলুম করা হবে না (এর পর বলা হয়েছে যে, কুফর ও গোনাহ্র পূর্ণ শাস্তি হাশরের পরে হবে, কিন্তু কোন সময় দুনিয়াতেও এর শাস্তি আযাব আকারে এসে যায়।) আল্লাহ্ তা'আলা একটি জনপদের অধিবাসীদের বিচিত্র অবস্থা বর্ণনা করেন। তারা (খুব) সুখ ও শান্তিতে বসবাস করত (এবং) তাদের আহার্যও প্রচুর পরিমাণে চতুর্দিক থেকে তাদের কাছে পৌঁছাত। (আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় না করে বরং) তারা আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহের না-শোকরী করল (অর্থাৎ কুফর, শিরক ও গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ল।) ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের কর্মের কারণে একটি সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ ও ভীতির স্বাদ আস্বাদন করালেন (অর্থাৎ তারা ধন-দৌল-তের প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধায় পতিত হল এবং শত্রুর ভয় চাপিয়ে দিয়ে তাদের সে জনপদের শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যাহত করা হল।) এবং (এ শাস্তি প্রদানে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি করা হয়নি, বরং প্রথমে তাদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্য) তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূলও (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) আগমন করল (যাঁর সততা ও ধর্মপরায়ণতার অবস্থা তাদের স্বজাতিভুক্ত হওয়ার কারণে তাদের খুব ভাল করে জানা ছিল।) তাঁকে (রসূলকেও) তাহারা মিথ্যাবাদী বলল। তখন তাদেরকে আযাব এসে ধৃত করল এমতাবস্থায় যে, তারা জুলুমে বদ্ধপরিকর ছিল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শেষ আয়াতে ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ আস্বাদনের জন্য 'লেবাস' শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক আস্বাদন করানো হয়েছে। অথচ পোশাক আস্বাদন করার বস্তু নয়। কিন্তু এখানে লেবাস শব্দটি পুরোপুরি পরিবেষ্টনকারী হওয়ার কারণে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ক্ষুধা ও ভীতি তাদের সবাইকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে নিয়েছে, যেমন পোশাক দেহের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যায়। ক্ষুধা এবং ভীতিও তাদের উপর তেমনিভাবে চেপে বসে।

আয়াতে বর্ণিত দৃষ্টান্তটি কোন কোন তফসীরবিদের মতে একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। এর সম্পর্ক বিশেষ কোন বস্তির সাথে নয়। অধিকাংশ তফসীরবিদ একে মক্কা মুকাররমার ঘটনা সাব্যস্ত করেছেন। মক্কাবাসীরা সাত বছর পর্যন্ত নিদারুণ দুর্ভিক্ষে পতিত ছিল। এমনকি, মৃত জন্তু, কুকুর ও ময়লা-আবর্জনা পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়ে পড়েছিল। এছাড়া মুসলমানদের ভয়ও তাদেরকে পেয়ে বসেছিল। অবশেষে মক্কার সরদাররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করল যে, কুফর ও অবাধ্যতার দোষে তো পুরুষরা দোষী হতে পারে। কিন্তু শিশু ও মহিলারা তো নির্দোষ। এর পর রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের জন্য মদীনা থেকে খাদ্যসম্ভার পাঠিয়ে দেন। —(মাযহারী)

আবূ সুফিয়ান কাফির অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনুরোধ করে যে, আপনি তো আত্মীয় তোষণ, দয়া-দাক্ষিণ্য ও মার্জনা শিক্ষা দেন। আপনারই স্বজাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষ দূর করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের জন্য দোয়া করেন এবং দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে যায়।—(কুরতুবী)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ
كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ
الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا
عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ
أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَعَلَى
الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا
ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ
لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ
وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٩﴾

(১১৪) অতএব আল্লাহ্ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা তোমরা আহার কর এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাক। (১১৫) অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা জবাই কালে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। অতঃপর কেউ সীমালংঘনকারী না হয়ে নিরুপায় হয়ে পড়লে তবে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১১৬) তোমাদের মুখ থেকে সাধারণত যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে সেভাবে তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, তাদের মঙ্গল হবে না। (১১৭) যৎ সামান্য সুখ-সম্ভোগ ভোগ করে নিক। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (১১৮) ইহুদীদের জন্য আমি তো কেবল তাই হারাম করেছিলাম যা ইতিপূর্বে আপনার নিকট উল্লেখ করেছি। আমি তাদের প্রতি কোন জুলুম করিনি, কিন্তু তারাই নিজেদের উপর জুলুম করত। (১১৯) অনন্তর যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে, অতঃপর তওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে, আপনার পালনকর্তা এসবের পরে তাদের জন্য অবশ্যই ক্ষমাকারী, দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফিরদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্র নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও তাঁর আযাবের উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে প্রথমে মুসলমানদেরকে অকৃতজ্ঞ না হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যেসব হালাল নিয়ামত দিয়েছেন, সেগুলো কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। এর পর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার হালাল করা অনেক বস্তুকে নিজেদের পক্ষ থেকে হারাম বলা এবং আল্লাহ্ তা'আলার হারাম করা অনেক বস্তুকে হালাল বলা---এটা ছিল কাফির ও মুশরিকদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার অন্যতম পদ্ধতি। মুসলমানদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে, তারা যেন এরূপ না করে। কোন বস্তুকে হালাল অথবা হারাম করার অধিকার একমাত্র সে সত্তারই রয়েছে, যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। নিজেদের পক্ষ থেকে এরূপ করা আল্লাহ্র ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ এবং তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপেরই নামান্তর।

অবশেষে আরো বলা হয়েছে যে, যারা অজ্ঞতাবশত এ জাতীয় অপরাধ করেছে, তারাও যেন আল্লাহ্র অনুকম্পা থেকে নিরাশ না হয়। যদি তারা তওবা করে নেয় এবং বিশুদ্ধ ঈমান অবলম্বন করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দেবেন। আয়াতগুলোর সংক্ষিপ্ত তফসীর নিম্নরূপঃ

আল্লাহ্ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, সেগুলোকে (হারাম মনে করো না, কেননা এটা মুশরিকদের মূর্খতাসুলভ প্রথা। বরং সেগুলোকে) খাও এবং আল্লাহ্র নিয়ামতের শোকর আদায় কর, যদি তোমরা (দাবী অনুযায়ী) তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাক। (তোমরা যেসব বস্তুকে হারাম বল, সেগুলোর মধ্য থেকে তো) তোমাদের

প্রতি (আল্লাহ্ তা'আলা) শুধু মৃত জন্তুকে হারাম করেছেন এবং (হারাম করেছেন) রক্ত ও শূকরের মাংস (ইত্যাদি) এবং যে বস্তু অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। অতঃপর যে ব্যক্তি (ক্ষুধায়) একেবারে অস্থির হয়ে যায়—স্বাদ অন্বেষণকারী ও (প্রয়োজনের) সীমালংঘনকারী না হয়, আল্লাহ্ তা'আলা (তার জন্য, যদি সেগুলো খেয়ে ফেলে) ক্ষমাকারী, দয়ালু। যেসব বস্তু সম্পর্কে তোমরা শুধু মৌখিক মিথ্যা দাবী কর (অথচ তার কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই), সেগুলো সম্পর্কে বলে দিয়ো না যে, অমুক বস্তু হালাল এবং অমুক বস্তু হারাম (যেমন, অষ্টম পারার চতুর্থাংশের কাছাকাছি وَجَعَلُوا لِلّٰهِ আয়াতে তাদের এসব মিথ্যা দাবী বর্ণিত হয়েছে। এর সারমর্ম হবে এই যে) তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ আরোপ করবে? (কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ করেন নি; বরং এর বিপরীত বলেছেন)। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তারা সফল হবে না (হয় ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে, না হয় শুধু পরকালে) এটা ক্ষণস্থায়ী (পার্থিব) আয়েশ মাত্র। (সামনে মৃত্যুর পর) তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং মুশরিকরা ইব্রাহীমী দীনের অনুসারী হওয়ার দাবী করে, অথচ হযরত ইব্রাহীমের শরীয়তে যেসব বস্তু হারাম ছিল না, সেগুলোকে তারা হারাম সাব্যস্ত করেছে। তবে (অনেক দিন পর সেগুলোর মধ্য থেকে) শুধু ইহুদীদের জন্য আমি ঐসব বস্তু হারাম করেছিলাম, যেগুলো ইতিপূর্বে (সূরা আন'আমে) আপনার কাছে বর্ণনা করেছি। (এগুলোকে হারাম করার ব্যাপারে) আমি তাদের প্রতি (দৃশ্যতও) কোন জুলুম করিনি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি (পয়গম্বরগণের বিরোধিতা করে জুলুম করত। সুতরাং জানা গেল যে, পবিত্র বস্তুসমূহকে ইচ্ছাকৃতভাবে তো কোন সময় হারাম করা হয়নি এবং ইব্রাহীমী শরীয়তে কোন সাময়িক প্রয়োজনেও হয়নি। এমতাবস্থায় তোমরা এগুলো কোথা থেকে গড়ে নিয়েছ?)

অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদের জন্য, যারা মূর্খতাবশত মন্দ কাজ করে ফেলে (তা যাই হোক) অতঃপর সেজন্য তওবা করে নেয় এবং (ভবিষ্যতের জন্য) স্বীয় কাজকর্ম সংশোধন করে নেয়, আপনার পালনকর্তা এসবের পর অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত চারের মধ্যেই হারাম বস্তু সীমাবদ্ধ নয়ঃ এ আয়াতে ব্যবহৃত اِنَّمَا শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, হারাম বস্তু আয়াতে উল্লিখিত চারটিই। এর চাইতে আরও অধিক স্পষ্টভাবে قُلْ لَّا اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا আয়াত থেকে জানা যায় যে, এগুলো ছাড়া অন্য কোন বস্তু হারাম নয়। অথচ কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী ইজমা দ্বারা আরও অনেক বস্তু হারাম। এ সংশয়ের জওয়াব আলোচ্য আয়াতসমূহের বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে চিন্তা করলেই খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে সাধারণ হালাল ও হারাম বস্তুসমূহের তালিকা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য নয়; বরং জাহিলিয়াত আমলের মুশরিকরা

নিজেদের পক্ষ থেকে যে অনেক বস্তু হারাম করে নিয়েছিল অথচ, আল্লাহ্ তদ্রূপ কোন নির্দেশ দেন নি, সেগুলো বর্ণনা করাই এখানে উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাদের হারাম করা বস্তুসমূহের মধ্যে আল্লাহ্র কাছে শুধু এগুলোই হারাম। এ আয়াতের পুরোপুরি তফসীর এবং চারটি হারাম বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা মা'আরেফুল-কোরআন প্রথম খণ্ডে সূরা বাক্বারার ১৭৩ আয়াতের তফসীরে দ্রষ্টব্য।

যে গোনাহ্ বুঝে-সুঝে করা হয় এবং যে গোনাহ্ না বুঝে করা হয় সবই তওবা দ্বারা মাফ হতে পারে : আয়াতে إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ -এর جهل শব্দ নয় বরং جهالة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। جهل শব্দটি علم -এর বিপরীতে অজ্ঞানতা ও বোধহীনতা অর্থে আসে। পক্ষান্তরে جهالة -এর অর্থ হয় মূর্খতাসুলভ কাণ্ড, যদিও তা বুঝে-সুঝে করা হয়। এতে বোঝা গেল যে, তওবা দ্বারা শুধু না বুঝে অথবা অনিচ্ছায় করা গোনাহ্ই মাফ হয় না; বরং যে গোনাহ্ সচেতনভাবে করা হয়, তাও মাফ হয়।

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾

(১২০) নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিলেন এক সম্প্রদায়ের প্রতীক, সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহ্রই অনুগত এবং তিনি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (১২১) তিনি তাঁর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে মনোনীত করে-ছিলেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন। (১২২) আমি তাঁকে দুনিয়াতে দান করেছি কল্যাণ এবং তিনি পরকালেও সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। (১২৩) অতঃপর আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছি যে, ইব্রাহীমের দীন অনুসরণ করুন, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (১২৪) শনিবার দিন পালন

যে নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা তাদের জন্যই যারা এতে মতবিরোধ করেছিল। আপনার পালনকর্তা কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত।

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে শির্ক ও কুফরের মূল অর্থাৎ তওহীদ ও রিসালতের অস্বীকৃতি খণ্ডন এবং কুফর ও শির্কের কতিপয় শাখা অর্থাৎ হারামকে হালাল করা ও হালালকে হারাম করার বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে বাতিল করা হয়েছিল। কোরআন পাকের সম্বোধনের প্রথম ও প্রত্যক্ষ লক্ষ্য মক্কার মুশরিক সম্প্রদায়। মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও এরা দাবী করত যে, তারা ইব্রাহীম (আ)-এর ধর্মের অনুসারী এবং তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ইব্রাহীম (আ)-এরই শিক্ষা। তাই আলোচ্য চারটি আয়াতে তাদের এ দাবী খণ্ডন করা হয়েছে এবং তাদেরই স্বীকৃত নীতি দ্বারা তাদের মূর্খতাসুলভ চিন্তাধারা বাতিল প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বাতিল এভাবে করা হয়েছে যে, উল্লিখিত পাঁচ আয়াতের মধ্য থেকে প্রথম আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আ) বিশ্বের জাতিসমূহের সর্বজন স্বীকৃত অনুসৃত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এটা নবুয়ত ও রিসালতের সর্বোচ্চ স্তর। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন মহান পয়গম্বর ছিলেন। এর সাথেই مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি একজন নিষ্কলুষ একত্ববাদী ছিলেন।

দ্বিতীয় আয়াতে তিনি যে কৃতজ্ঞ এবং সরল পথের অনুসারী ছিলেন, একথা বর্ণনা করে মুশরিকদের হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়েও নিজেদেরকে কোন্ মুখে ইব্রাহীমে (আ)-এর অনুসারী বলে দাবী করছ ?

তৃতীয় আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে যে, ইব্রাহীম (আ) ইহকাল ও পরকালে সফলকাম ছিলেন। চতুর্থ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত প্রমাণ করার সাথে সাথে তিনি যে যথার্থ মিল্লাতে-ইব্রাহীমীর অনুসারী, একথা বর্ণনা করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি নিজেদের দাবীতে সত্যবাদী হও, তবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁর আনুগত্য ব্যতীত এ দাবী সত্য হতে পারে না।

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ—এই পঞ্চম আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মিল্লাতে ইব্রাহীমীতে পবিত্র বস্তুসমূহ হারাম ছিল না। তোমরা এগুলোকে নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছ। আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত তফসীর নিম্নরূপ ঃ

নিঃসন্দেহে ইব্রাহীম [(আ) যাকে তোমরাও মান] একান্ত অনুসরণযোগ্য (অর্থাৎ দৃঢ়চেতা পয়গম্বর ও মহান উম্মতের অনুসরণযোগ্য নেতা), আল্লাহ্র পুরোপুরি আনুগত্যশীল ছিলেন (তাঁর কোন বিশ্বাস অথবা কর্ম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ছিল না। এমতাবস্থায় তোমরা তার বিপরীতে নিছক প্রবৃত্তির অনুসরণ করে আল্লাহ্র হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম সাব্যস্ত কর কেন ? তিনি) সম্পূর্ণ এক (আল্লাহ্)-মুখী ছিলেন। (একমুখী হওয়ার অর্থ এই যে) তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। [এমতাবস্থায় কেমন করে তোমরা

শিরক কর ? মোটকথা, ইব্রাহীম (আ)-এর এই ছিল অবস্থা ও আদর্শ। তিনি আল্লাহ্র এমন প্রিয় ছিলেন যে] আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মনোনীত করে নিয়েছিলেন এবং তাঁকে সরল পথ প্রদর্শন করেছিলেন। আমি তাঁকে ইহকালেও (নবুয়ত ও রিসালতের জন্য মনোনয়ন ও সরল পথপ্রদর্শন ইত্যাদির মত) বৈশিষ্ট্য দান করেছিলাম এবং তিনি পরকালেও (উচ্চ মর্তবার) পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (তাই তাঁর আদর্শ অনুসরণ করাই তোমাদের সবার কর্তব্য। বর্তমানে সেই অনুপম আদর্শ দীনে মুহাম্মদীর মধ্যে সীমিত। এর বর্ণনা এই যে) অতঃপর আমি আপনার কাছে ওহী প্রেরণ করেছি যে, আপনি ইব্রাহীমের দীন, যিনি সম্পূর্ণ এক (আল্লাহ্)-মুখী ছিলেন, অনুসরণ করুন (যেহেতু সেকালে দীনে ইব্রাহীমীর দাবীদাররা কিছু না কিছু শিরকে লিপ্ত ছিল, তাই পুনশ্চ বলেছেন যে) তিনি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না (যাতে মূর্তি পূজারীদের সাথে সাথে ইহুদী ও খৃস্টানদের বর্তমান পন্থারও খণ্ডন হয়ে যায়। কারণ, তাদের পন্থা শিরক থেকে মুক্ত নয়। যেহেতু তারা পবিত্র বস্তুসমূহকে হারাম সাব্যস্ত করার মত মূর্খতাসুলভ ও মুশরিকসুলভ কুকাণ্ড ও কুপ্রথায় লিপ্ত ছিল, তাই বলা হয়েছে যে) শনিবারের সম্মান (অর্থাৎ শনিবার দিন মৎস্য শিকারের নিষেধাজ্ঞা, যা পবিত্র বস্তু হারাম করার অংশবিশেষ, তা তো) শুধু তাদের জন্যই অপরিহার্য করা হয়েছিল, যারা এতে (কার্যত) বিরুদ্ধাচরণ করেছিল অর্থাৎ কেউ মেনে নিয়ে তদনুরূপ কাজ করে-ছিল এবং কেউ বিপরীত কাজ করেছিল। এখানে ইহুদী সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। কেননা, পবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করার অন্যান্য প্রকারের মত এ প্রকারটি শুধু ইহুদীদের বৈশিষ্ট্য ছিল। দীনে-ইব্রাহীমীতে এসব বস্তু হারাম ছিল না। এরপর আল্লাহ্র বিধানা-বলীতে মতবিরোধ করা সম্পর্কে বলা হয়েছে—নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা কিয়ামতের দিন (কার্যত) তাদের পরস্পরের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন, যে ব্যাপারে তারা (দুনিয়াতে) মতবিরোধ করত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أُمَّةً (উম্মত) শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর প্রসিদ্ধ অর্থ দল ও সম্প্রদায়। হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) থেকে এখানে এ অর্থই বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আ) একাই এক ব্যক্তি, এক সম্প্রদায় ও কওমের গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। 'উম্মত' শব্দের আরেক অর্থ হচ্ছে জাতির অনুসৃত নেতা ও গুণাবলীর আধার। কোন কোন তফসীরকারক এখানে এ অর্থই নিয়েছেন। قانت শব্দের অর্থ আজ্ঞাবহ। হযরত ইব্রাহীম (আ) উভয় গুণে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। অনুসৃত এ কারণে যে, সমগ্র বিশ্বের প্রসিদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সবাই এক বাক্যে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর দীনের অনুসরণকে সম্মান ও গৌরবের বিষয় মনে করে। ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলমানরা তো তাঁর প্রতি অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখেই, আরবের মুশরিকরা মূর্তি পূজা সত্ত্বেও এ মূর্তি সংহার-কের প্রতি ভক্তিতে গদগদ এবং তাঁর ধর্মের অনুসরণকে গর্বের বিষয় গণ্য করে। হযরত ইব্রাহীম (আ) যে আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ ও অনুগত ছিলেন, এর বিশেষ স্বাতন্ত্র্য সেসমস্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ফুটে উঠে, যেগুলোতে আল্লাহ্র এ দোস্ত উত্তীর্ণ হন। নমরূদের অগ্নি, পরিবার-

পরিজনকে জনশূন্য প্রান্তরে ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ, অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার পর পাওয়া পুত্রকে কুরবানী করতে উদ্যত হওয়া—এসব স্বাতন্ত্র্যের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে উল্লিখিত উপাধিসমূহে সম্মানিত করেন।

রসূলুল্লাহ (সা)-র প্রতি দীনে ইব্রাহীমীর অনুসরণের নির্দেশঃ আল্লাহ্ তা'আলা যে শরীয়ত ও বিধানাবলী হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে দান করেছিলেন, শেষ নবী (সা)-র শরীয়তও কতিপয় বিশেষ বিধান ছাড়া তদ্রূপ রাখা হয়েছে। যদিও রসূলুল্লাহ্ (সা) পয়গম্বর ও রসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর ; কিন্তু এখানে শ্রেষ্ঠতরকে স্বল্পশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অনুসরণ করার নির্দেশ দানের পেছনে দু'টি তাৎপর্য কার্যকর। এক. সেই শরীয়ত পূর্বে দুনিয়াতে এসে গেছে এবং সর্বজনবিদিত ও প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। সর্বশেষ শরীয়তও যেহেতু তদ্রূপ হবার ছিল, তাই একে অনুসরণ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই. আল্লামা যমখশরীর ভাষায় অনুসরণের এ নির্দেশও হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সম্মানসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ সম্মান। এর বৈশিষ্ট্যের প্রতি ثُمَّ (অতঃপর) শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইব্রাহীম (আ)-এর গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব একদিকে এবং এগুলোর মধ্যে সর্বোপরি গুণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ও হাবীবকে তাঁর দীনের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۭ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٢٥﴾ وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ۭ وَلَىِٕنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ﴿١٢٦﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿١٢٧﴾ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ﴿١٢٨﴾

---

(১২৫) আপন পালনকর্তার পথের পানে আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত আছেন, যে তাঁর পথ থেকে

বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে। (১২৬) আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়। যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্য উত্তম। (১২৭) আপনি সবর করবেন। আপনার সবর আল্লাহ্‌র জন্য ব্যতীত নয়, তাদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না। (১২৮) নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহিযগার এবং যারা সৎ কর্ম করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উম্মত তাঁর বিধানাবলী বাস্তবায়িত করে রিসালতের কর্তব্য পালন করুক, এ উদ্দেশ্যেই পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রিসালত ও নবুয়ত সমান করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রিসালতের দায়িত্ব পালন ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপক শিক্ষার আওতায় সমস্ত মু'মিন মুসলমান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংক্ষিপ্ত তফসীর নিম্নরূপ ঃ

আপনি পালনকর্তার পথের (অর্থাৎ দীন ইসলামের) পানে (লোকদেরকে) জ্ঞানের কথা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত দিন। ('হিকমত' বলে দাওয়াতের সে পন্থা বোঝানো হয়েছে, যাতে সম্বোধিত ব্যক্তির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে অন্তরে ক্রিয়াশীল হতে পারে—এমন কৌশল অবলম্বন করা হয়। উপদেশের অর্থ এই যে, শুভাকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কথা বলতে হবে। উত্তম উপদেশের মর্ম এই যে, কথার ভাষাও যেন নরম হয়, মর্মবিদারক ও অপমানকর না হয়।) এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন (অর্থাৎ যদি তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাও কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা, প্রতি-পক্ষের প্রতি দোষারোপ এবং অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্ত হতে হবে। বস্তুত আপনার কর্তব্য এতটুকুই। এরপর এ খোঁজাখুঁজির পেছনে পড়বেন না যে, কে মানল এবং কে মানল না—এ কাজ আল্লাহ্ তা'আলার) আপনার পালনকর্তা সে সম্পর্কে খুব জ্ঞাত রয়েছেন যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই সঠিক পথের অনুগামীদেরও খুব জানেন আর যদি (কোন সময় প্রতিপক্ষ শিক্ষা বিষয়ক তর্ক-বিতর্কের সীমা অতিক্রম করে কার্যত ঝগড়া এবং হাত অথবা মুখের মাধ্যমে কষ্ট দিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে এক্ষেত্রে আপনার এবং আপনার অনুসারীদের জন্য প্রতিশোধ নেওয়া এবং সবর করা উভয়টি জায়েয। অতঃপর যদি প্রথমোক্ত পথ অবলম্বন করেন, অর্থাৎ) প্রতিশোধ নাও, তবে ততটুকুই প্রতিশোধ নেবে, যতটুকু তোমা-দের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে (এর বেশি কিছু করো না) আর যদি (শেষোক্ত পথ অবলম্বন কর, অর্থাৎ নিপীড়নের পর) সবর কর, তবে তা (সবর করা) সবরকারীদের পক্ষে খুবই উত্তম। কারণ, প্রতিপক্ষ ও দর্শক সবার উপরই এর উত্তম প্রভাব প্রতিফলিত হয় এবং পরকালেও বিরাট সওয়াব পাওয়া যায়। আর (সবর করা যদিও সবার পক্ষেই উত্তম, কিন্তু আপনার মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে বিশেষভাবে আপনাকে আদেশ করা হচ্ছে যে, আপনি প্রতিশোধের পথ বেছে নেবেন না; বরং) আপনি সবর করুন। আপনার সবর করা আল্লাহ্ তা'আলারই বিশেষ তওফীকের বদৌলতে হয়ে থাকে (তাই আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন

যে, সবর করা আপনার পক্ষে কঠিন হবে না) এবং তাদের (অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণে অথবা মুসলমানদেরকে কণ্ট দেওয়ার) কারণে আপনি দুঃখ করবেন না, এবং তারা যেসব চক্রান্ত করে, তজ্জন্য মন ছোট করবেন না। (তাদের বিরোধী চক্রান্ত দ্বারা আপনার কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, আপনি সৎ কর্ম ও আল্লাহ্‌ভীতির গুণে গুণান্বিত এবং) আল্লাহ্ এমন লোকদের সঙ্গে রয়েছেন (অর্থাৎ তাদের সাহায্য করেন) যারা আল্লাহ্-ভীরু এবং সৎকর্মপরায়ণ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি এবং পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম ঃ আলোচ্য আয়াতে দাওয়াত ও প্রচারের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম, মূলনীতি ও শিষ্টাচারের পূর্ণ বিবরণ অল্প কথায় বিধৃত হয়েছে। তফসীর কুরতুবীতে রয়েছে, হযরত হরম ইবনে হাইয়ানের মৃত্যুর সময় তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা অনুরোধ করল ঃ আমাদেরকে কিছু ওসীয়ত করুন। তিনি বললেন ঃ মানুষ সাধারণত অর্থসম্পদের ব্যাপারে ওসীয়ত করে। অর্থসম্পদ আমার কাছে নেই। কিন্তু আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহ বিশেষত সূরা নাহ্‌লের সর্বশেষ আয়াতসমূহের ব্যাপারে ওসীয়ত করছি! এগুলোকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকবে। উল্লিখিত আয়াতসমূহই হচ্ছে সে আয়াত।

دعوة -এর শাব্দিক অর্থ ডাকা, আহবান করা। পয়গম্বরগণের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে মানবজাতিকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করা। এরপর নবী ও রসূলের সমস্ত শিক্ষা হচ্ছে এ দাওয়াতেরই ব্যাখ্যা। কোরআন পাকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিশেষ পদবী হচ্ছে আল্লাহ্‌র দিকে আহবানকারী হওয়া। সূরা আহ্‌যাবের ৪৬তম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا এবং সূরা আহকাফের ৩১ আয়াতে

বলা হয়েছে ঃ يَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেওয়া উম্মতের উপরও ফরয করা হয়েছে। সূরা আলে ইমরানে আছে ঃ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ

يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

তোমাদের মধ্যে একটি দল এমন থাকা উচিত, যারা মানুষকে মঙ্গলের প্রতি দাওয়াত দেবে (অর্থাৎ) সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে।

অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ — অর্থাৎ কথা-বার্তার দিক দিয়ে সে ব্যক্তির চাইতে উত্তম কে হবে, যে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয়?

বর্ণনায় বিষয়টিকে কোন সময় دعوت الى الله কোন সময় دعوت الى الخير এবং কোন কোন সময় دعوت الى سبيل الله শিরোনাম দেওয়া হয়। সবগুলোর সারমর্ম এক। কেননা, আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেওয়ার দ্বারা তাঁর দীন এবং সরল পথের দিকেই দাওয়াত দেওয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ—এতে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণ رب (পালনকর্তা) উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি এর সম্বন্ধ করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, দাওয়াতের কাজটি লালন ও পালনের সাথে সম্পর্ক রাখে। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন তাঁকে পালন করেছেন, তেমনি তাঁরও প্রতিপালনের ভঙ্গিতে দাওয়াত দেওয়া উচিত। এতে প্রতিপক্ষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে এমন পন্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে, তার উপর বোঝা না চাপে এবং অধিকতর ক্রিয়াশীল হয়। স্বয়ং দাওয়াত শব্দটিও এই কর্ম প্রকাশ করে। কেননা, পয়গম্বরের দায়িত্ব শুধু বিধি-বিধান পৌঁছিয়ে দেওয়া ও শুনিয়ে দেওয়াই নয়; বরং লোকদেরকে তা পালন করার দাওয়াত দেওয়াও বটে। বলা বাহুল্য। যে ব্যক্তি কাউকে দাওয়াত দেয়, সে তাকে এমন সম্বোধন করে না, যাতে তার মনে বিরক্তি ও ঘৃণা জন্মে অথবা তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও তামাশা করে না।

بِالْحِكْمَةِ—'হিকমত' শব্দটি কোরআন পাকে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এস্থলে কোন কোন তফসীরবিদ হিকমতের অর্থ কোরআন, কেউ কেউ কোরআন ও সুন্নাহ্ এবং কেউ কেউ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ স্থির করেছেন। রূহুল মা'আনী বাহ্‌রে মুহীতের বরাত দিয়ে হিকমতের তফসীর নিম্নরূপ করেছেন: انها الكلام الصواب الواقع من النفس اجمل موقع—অর্থাৎ ঐ বিশুদ্ধ বাক্যকে হিকমত বলা হয়, যা মানুষের মনে আসন করে নেয়। এ তফসীরের মধ্যে সব উক্তি সন্নিবেশিত হয়ে যায়। রূহুল বয়ানের গ্রন্থকারও প্রায় এই অর্থটিই এরূপ ভাষায় বর্ণনা করেছেন: "হিকমত বলে সে অন্তর্দৃষ্টিকে বোঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে মানুষ অবস্থার তাগিদ জেনে নিয়ে তদনুযায়ী কথা বলে। এমন সময় ও সুযোগ খুঁজে নেয় যে, প্রতিপক্ষের উপর বোঝা হয় না। নম্রতার স্থলে নম্রতা এবং কঠোরতার স্থলে কঠোরতা অবলম্বন করে। যেখানে মনে করে যে, স্পষ্টভাবে বললে প্রতিপক্ষ লজ্জিত হবে সেখানে ইঙ্গিতে কথা বলে কিংবা এমন ভঙ্গি অবলম্বন করে, যদ্দরুন প্রতিপক্ষ লজ্জার সম্মুখীন হয় না এবং তার মনে একগুঁয়েমিভাবও সৃষ্টি হয় না।"

الْمَوْعِظَةُ—وعظ ও موعظة—এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন শুভেচ্ছামূলক কথা এমনভাবে বলা, যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবুল করার জন্য নরম হয়ে যায়। উদাহরণত তার কাছে কবুল করার সওয়াব ও উপকারিতা এবং কবুল না করার শাস্তি ও অপকারিতা বর্ণনা করা—(কামুস, মুফরাদাতে-রাগিব)।

الْمَوْعِظَةُ-এর অর্থ বর্ণনা ও শিরোনাম এমন হওয়া যে, প্রতিপক্ষের অন্তর নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং অনুভব করে যে, এতে আপনার কোন স্বার্থ নেই—শুধু তার শুভেচ্ছার খাতিরে বলছেন।

موعظة শব্দ দ্বারা শুভেচ্ছামূলক কথা কার্যকরী ভঙ্গিতে বলার বিষয়টি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু শুভেচ্ছামূলক কথা মাঝে মাঝে মর্মবিদারক ভঙ্গিতে কিংবা এমনভাবে বলা হয় যে, প্রতিপক্ষ অপমানবোধ করে।—(রূহুল মা'আনী)

এ পন্থা পরিত্যাগ করার জন্য حَسَنَة শব্দটি সংযুক্ত করা হয়েছে।

جَادِل—وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ শব্দটি مجادلة ধাতু থেকে উদ্ভূত। এখানে مجادلة বলে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক বোঝানো হয়েছে। بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ-এর অর্থ এই যে, যদি দাওয়াতের কাজে কোথাও তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তর্ক-বিতর্কও উত্তম পন্থায় হওয়া দরকার। রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, উত্তম পন্থার মানে এই যে, কথা-বার্তায় নম্রতা ও কমনীয়তা অবলম্বন করতে হবে। এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়। বহুল প্রচলিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বাক্যাবলীর মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষের সন্দেহ বিদূরিত হয় এবং সে হঠকারিতার পথ অবলম্বন না করে। কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, 'উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক' শুধু মুসলমানদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং আহ্‌লে কিতাব সম্পর্কে বিশেষভাবে কোরআন বলে যে,

অন্য আয়াতে—وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

হযরত মূসা ও হারূন (আ)-কে قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا নির্দেশ দিয়ে আরও বলা হয়েছে যে, ফিরাউনের মত অবাধ্য কাফিরের সাথেও নম্র আচরণ করা উচিত।

দাওয়াতের মূলনীতি ও শিষ্টাচার ঃ আলোচ্য আয়াতে দাওয়াতের জন্য তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে—এক. হিকমত। দুই. সদুপদেশ এবং তিন. উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক। কোন কোন তফসীরকারক বলেন ঃ এ তিনটি বিষয় তিন প্রকার প্রতিপক্ষের জন্য বর্ণিত হয়েছে। হিকমতের মাধ্যমে দাওয়াত জ্ঞানী ও সুধীজনের জন্য, উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত জনসাধারণের জন্য এবং বিতর্কের মাধ্যমে দাওয়াত তাদের জন্য যাদের অন্তরে সন্দেহ ও দ্বিধা রয়েছে অথবা যারা হঠকারিতা ও একগুঁয়েমির কারণে কথা মেনে নিতে সম্মত হয় না।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানভী (র) বয়ানুল কোরআনে বলেন ঃ এ তিনটি বিষয় পৃথক পৃথক তিন প্রকার প্রতিপক্ষের জন্য হওয়া আয়াতের বর্ণনা পদ্ধতির দিক দিয়ে অযৌক্তিক মনে হয়।

বাহ্যিক অর্থ এই যে, দাওয়াতের এই সুষ্ঠু পন্থাগুলো প্রত্যেকের জন্যই ব্যবহার্য। কেননা, দাওয়াতে সর্বপ্রথম হিকমতের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের অবস্থা যাচাই করে তদনুযায়ী শব্দ চয়ন করতে হবে। এরপর এসব বাক্যে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা দ্বারা প্রতিপক্ষ নিশ্চিত হতে পারে। বর্ণনাভঙ্গি ও কথাবার্তা সহানুভূতিপূর্ণ ও নরম রাখতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষ নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে যে, সে যা কিছু বলছে, আমারই উপকারার্থে এবং হিতাকাঙ্ক্ষাবশত বলছে—আমাকে শরমিন্দা করা অথবা আমার মর্যাদাকে আহত করা তার লক্ষ্য নয়।

অবশ্য রাহুল মা'আনীর গ্রন্থকার এ স্থলে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বর্ণনা করে বলেছেন যে, আয়াতের বর্ণনা পদ্ধতি থেকে জানা যায় আসলে দু'টি বিষয়ই দাওয়াতর মূলনীতি—হিকমত ও উপদেশ। তৃতীয় বিষয় বিতর্ক মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে দাওয়াতের পথে কোন কোন সময় এরও প্রয়োজন দেখা দেয়।

এ ব্যাপারে উপরোক্ত গ্রন্থকারের যুক্তি এই যে, যদি তিনটি বিষয়ই মূলনীতি হত, তবে স্থানের তাগিদ অনুসারে তিনটি বিষয়কেই عطف যোগে এভাবে বর্ণনা করা হত بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال الاحسن কিন্তু কোরআন পাক হিকমত ও উপদেশকে عطف যোগে একই পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছে কিন্তু বিতর্কের জন্য আলাদা বাক্য جادلهم بالتي هي احسن অবলম্বন করেছে। এতে জানা যায় যে, শিক্ষা বিষয়ক বিতর্ক আসলে দাওয়াতের স্তম্ভ অথবা শর্ত নয়; বরং দাওয়াতের পথে সংঘটিত ব্যাপারাদি সম্পর্কে একটি নির্দেশ মাত্র। যেমন, এর পরবর্তী আয়াতে সবর করার কথা বলা হয়েছে। কেননা, দাওয়াতের পথে মানুষ যে জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়, তজ্জন্য সবর করা অপরিহার্য।

মোটকথা, দাওয়াতের মূলনীতি দু'টি—হিকমত ও উপদেশ। এগুলো থেকে কোন দাওয়াত খালি থাকা উচিত নয়, আলিম ও বিশেষ শ্রেণীর লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়া হোক কিংবা সর্বসাধারণকে দাওয়াত দেওয়া হোক। তবে দাওয়াতের কাজে মাঝে মাঝে এমন লোকদেরও সম্মুখীন হতে হয়, যারা সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত থাকে এবং দাওয়াতদানকারীর সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় তর্ক-বিতর্ক করার শিক্ষা দান করা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে بالتي هي احسن এর শর্ত জুড়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে, যে তর্ক-বিতর্ক এ শর্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, শরীয়তে তার কোন মর্যাদা নেই।

দাওয়াতের পয়গম্বরসুলভ শিষ্টাচার ঃ দাওয়াত প্রকৃতপক্ষে পয়গম্বরগণের দায়িত্ব। আলিমরা যেহেতু তাঁদের স্থলাভিষিক্ত, তাই তাঁরা এ পদমর্যাদা ব্যবহার করেন। অতএব দাওয়াতের আদব ও রীতিনীতি তাঁদের কাছ থেকেই শিক্ষা করা অপরিহার্য। যে দাওয়াত তাঁদের কর্মপদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, সেটি দাওয়াতের পরিবর্তে 'আদাওয়াত' (শত্রুতা) এবং কলহ-বিবাদের কারণ হয়ে যায়।

পয়গম্বরসুলভ দাওয়াতের মূলনীতি সম্পর্কে কোরআন পাকে হযরত মূসা ও হারূন (আ)-এর প্রতি নির্দেশ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে ঃ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ —অর্থাৎ ফিরাউনের সাথে নম্র কথা বল ; সম্ভবত সে বুঝে নেবে কিংবা ভীত হবে। প্রত্যেক দাওয়াতদাতার সম্মুখে সর্বক্ষণ এ নীতিটি থাকা জরুরী। ফিরাউনের মত পাষণ্ড কাফির সম্পর্কে আল্লাহ্ জানতেন যে, তার মৃত্যুও কুফর অবস্থাতেই হবে, তবুও তার নিকট যখন দাওয়াতদাতা প্রেরণ করলেন, তখন নম্র কথা বলার নির্দেশ দিয়েই প্রেরণ করলেন। আজ আমরা যাদেরকে দাওয়াত দেই, তারা ফিরাউনের চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট নয় এবং আমাদের মধ্যে কেউ মূসা ও হারূন (আ)-এর সমতুল্য হিদায়তকারী ও দাওয়াতদাতা নয়। অতএব প্রতিপক্ষকে কটু কথা বলা, বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি দেওয়া এবং অপমান করার যে অধিকার আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরগণকে দিলেন না, সে অধিকার আমরা কোথা থেকে পেলাম ?

কোরআন পাক পয়গম্বরগণের দাওয়াত ও প্রচার এবং কাফিরদের বিতর্কে পরিপূর্ণ। এতে কোথাও দেখা যায় না যে, আল্লাহ্‌র কোন রসূল সত্যের বিরুদ্ধে ভর্ৎসনাকারীদের জওয়াবে কোন কটু কথা বলেছেন। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন ঃ

সূরা আ'রাফের সপ্তম রুকূতে ৫৯ থেকে ৬৭ আয়াত পর্যন্ত দু'জন পয়গম্বর হযরত নূহ ও হযরত হুদ (আ)-এর সাথে তাঁদের সম্প্রদায়ের তর্ক-বিতর্ক এবং গুরুতর অভিযোগের জওয়াবে তাঁরা কি বলেছিলেন, তা লক্ষ্য করার মত।

হযরত নূহ (আ) ছিলেন আল্লাহ্ তা'আলার একজন দৃঢ়চেতা পয়গম্বর। সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী তাঁর প্রচারকার্য পরিচালনার কথা সুবিদিত। তিনি সাড়ে নয়শ বছর পর্যন্ত স্বজাতির মধ্যে আল্লাহ্‌র দীনের কথা প্রচার, তাদের সংস্কার ও পথ প্রদর্শনে ব্যাপৃত থাকেন। কিন্তু এই হতভাগা জাতির মধ্য থেকে গুণাগুণ্তি কয়েকজন ছাড়া কেউ তাঁর কথার প্রতি কর্ণপাত করেনি। অন্যের কথা দূরে থাক, স্বয়ং তাঁর এক পুত্র ও স্ত্রী কাফিরদের দলে ভীড়ে যায়। তাঁর স্থলে আজকের কোন দাওয়াত ও সংশোধনের দাবীদার থাকলে অনুমান করুন, এ সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর কথা বলার ভঙ্গি কিরূপ হত। আরও দেখুন, তাঁর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত শুভেচ্ছা ও হিতাকাঙ্ক্ষামূলক দাওয়াতের জওয়াবে সম্প্রদায়ের লোকেরা কি বলল। إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ — আমরা তো আপনাকে প্রকাশ্য গোমরাহীতে দেখতে পাচ্ছি।

এদিক থেকে আল্লাহ্‌র পয়গম্বর অবাধ্য জাতির পথভ্রষ্টতা ও দুষ্কর্মের রহস্য উন্মোচন করার পরিবর্তে জওয়াবে কি বলেন দেখুন ঃ

يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ হে আমার

জাতি! আমার মধ্যে কোন পথভ্রষ্টতা নেই। আমি তো বিশ্ব পালনকর্তার তরফ থেকে প্রেরিত রসূল ও দূত। (তোমাদের উপকারের জন্যই আমার সকল প্রচেষ্টা।)

তাঁর পরবর্তী আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় রসূল হযরত হুদ (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায় মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও হঠকারিতা করে বলল: আপনি নিজ দাবীর পক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করেন নি। আমরা আপনার কথায় আমাদের উপাস্য দেবমূর্তিগুলোকে পরিত্যাগ করতে পারি না। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে, আপনি আমাদের উপাস্যদের প্রতি যে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছেন, তার কারণে আপনার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে।

হযরত হুদ (আ) এসব কথা শুনে জওয়াব দিলেন:

إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ○ অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক, আমি ঐসব মূর্তি থেকে মুক্ত ও বিমুখ, যেগুলোকে তোমরা আমার আল্লাহ্‌র অংশীদার সাব্যস্ত করেছ।—(সূরা হুদ)

সূরা আ'রাফে আছে যে, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে বলল:

إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ —আমরা তো আপনাকে নির্বোধ মনে করি এবং আমাদের ধারণা এই যে, আপনি একজন মিথ্যাবাদী।

স্বজাতির এ ধরনের পীড়াদায়ক সম্বোধনের জওয়াবে আল্লাহ্‌র রসূল (সা) না তাদের প্রতি কোন বিদ্রূপবাক্য উচ্চারণ করেন এবং না তাদের বিপথগামিতা, মিথ্যা ও আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা ভাষণের কোন কথা বলেন; শুধু এতটুকু জওয়াব দেন যে,

يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ —হে আমার সম্প্রদায়, আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নেই। আমি তো রাব্বুল 'আলামীনের তরফ থেকে প্রেরিত একজন রসূল।

হযরত শোয়াইব (আ) পয়গম্বরগণের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী স্বজাতিকে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেন এবং ওজন ও মাপে কম দেওয়ার যে একটি বড় দোষ তাদের মধ্যে ছিল, তা থেকে বিরত হওয়ার উপদেশ দেন। জওয়াবে তাঁর সম্প্রদায় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং তাঁকে অপমানকর সম্বোধন করে বলে:

يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ○

হে শোয়াইব, আপনার নামায কি আপনাকে আদেশ দেয় যে, আমরা বাপদাদার উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করি এবং আমরা যেসব ধনসম্পদের মালিক, সেগুলোতে নিজেদের ইচ্ছামত যা খুশী, তা না করি? বাস্তবিকই আপনি বড় জ্ঞানী ও ধার্মিক।

প্রথমে তো তারা এরূপ ভর্ৎসনা করল যে, আপনার নামাযই আপনাকে নির্বুদ্ধিতা শিক্ষা দেয়। দ্বিতীয় এই যে, ধনসম্পদ আমাদের। এগুলোর লেন-দেন এবং ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে আপনার অথবা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে হস্তক্ষেপ করার অধিকার জন্মায় কিভাবে? বরং এগুলো যদৃচ্ছা ব্যবহার করার অধিকার তো আমাদেরই। তৃতীয় বাক্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বলা হয়েছে যে, আপনি বড়ই বুদ্ধিমান, বড়ই ধার্মিক।

জানা গেল যে, ধর্মবিবর্জিত অর্থনীতির পূজারি কেবলমাত্র আমাদের এ যুগেই জন্মগ্রহণ করেনি, তাদেরও কিছু সংখ্যক পূর্ববর্তী মনীষী রয়েছে, যাদের মতবাদ তাই ছিল, যা আজকের কতিপয় নামধারী মুসলমান বলছে। তাদের বক্তব্য এই যে, আমরা মুসলমান। ইসলাম আমাদের ধর্ম, কিন্তু অর্থনীতিতে আমরা সমকালীন বিজ্ঞানসম্মত পন্থা যথা ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র অনুসরণ করব। এতে ইসলামের কি আসে যায়? মোটকথা, জালিম কওমের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও পীড়াদায়ক বাক্যবাণের জওয়াবে আল্লাহ্‌র রসূল কি বলেন, দেখুন ঃ

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَمَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَاۤ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ؕ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ؕ وَمَا تَوْفِيْقِىْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝

হে আমার সম্প্রদায়, আচ্ছা বল তো যদি আমি পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রমাণের উপর কায়েম থাকি। তিনি আমাকে নিজের পক্ষ থেকে উত্তম ধন অর্থাৎ নবুয়ত দান করে থাকেন। এমতাবস্থায় আমি কিরূপে তা প্রচার করব না এবং আমি নিজেও তো তোমাদেরকে যা বলি, তার বিরুদ্ধে কাজ করি না। আমি শুধু সংশোধন চাই যতটুকু আমার সাধ্যে রয়েছে। সংশোধন ও কর্মের যে তওফীক আমার হয়, তা একমাত্র আল্লাহ্‌র সাহায্যে। আমি তাঁর উপরই ভরসা করি এবং সব ব্যাপারে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।

হযরত মূসা (আ)-কে ফিরাউনের কাছে প্রেরণ করার সময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নম্র কথা বলার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা পুরোপুরি পালিত হওয়া সত্ত্বেও মূসা (আ)-র সাথে ফিরাউনের সম্বোধন ছিল এরূপ ঃ

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ۙ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِىْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ -

ফিরাউন বলল : আমরা কি শৈশবে তোমাকে লালন-পালন করিনি? তুমি বছরের পর বছর আমাদের মধ্যে অবস্থান করেছ এবং তুমি এমন কাণ্ড করেছিলে, বা করছিলে। (অর্থাৎ কিবতীকে হত্যা করেছিলে) তুমি বড় অকৃতজ্ঞ!

এতে মূসা (আ)-র কাছে এ অনুগ্রহও প্রকাশ করেছে যে, আমরা শৈশবে তোমাকে লালন-পালন করেছি। বড় হয়ে যাওয়ার পরও বেশ অনেক দিন তুমি আমাদের কাছে অবস্থান করেছ। মূসা (আ)-র হাতে জনৈক কিবতী অনিচ্ছাকৃতভাবে নিহত হয়েছিল। ফিরাউন সে ঘটনার কথা উল্লেখ করে স্বীয় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এ কথাও বলেছে যে, তুমি কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ।

এখানে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আভিধানিক অর্থ অকৃতজ্ঞও হতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তো তোমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছি, কিন্তু তুমি আমাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ। এটা অকৃতজ্ঞতা। ফিরাউনের বক্তব্য পারিভাষিক অর্থেও হতে পারে। কেননা, ফিরাউন স্বয়ং খোদায়ী দাবী করত। সুতরাং যে ব্যক্তি তার খোদায়ী অস্বীকার করত, তার দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি তো কাফিরই হয়ে যেতো।

এখন এস্থলে হযরত মূসা (আ)-র জওয়াব শুনুন, যা পয়গম্বরসুলভ নীতি-নিয়ম এবং চরিত্রের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এতে সর্বপ্রথম তিনি নিজের ত্রুটি ও দুর্বলতা স্বীকার করে নেন; অর্থাৎ এক সময় তিনি জনৈক ইসরাঈলী ব্যক্তিকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণরত জনৈক কিবতীকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে একটি ঘুষি মেরেছিলেন। ফলে তার প্রাণ-বায়ু বের হয়ে যায়। এ হত্যাকাণ্ড যদিও মূসার ইচ্ছাকৃত ছিল না, কিন্তু এর পক্ষে কোন ধর্মীয় তাগিদও ছিল না। মূসা (আ)-র শরীয়তের আইনেও কিবতী হত্যাযোগ্য ছিল না।

তাই প্রথমে স্বীকার করেন যে, فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ

অর্থাৎ আমি একাজটি তখন করেছিলাম, যখন আমি অবোধ ছিলাম।—(সূরা শু'আরা)

উদ্দেশ্য এই যে, এ কাজটি নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে ঘটে গিয়েছিল। তখন এ সম্পর্কে আল্লাহর কোন নির্দেশ আমার জানা ছিল না। এরপর বলেন :

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ

এরপর আমি ভীত হয়ে তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেলাম। অতঃপর আমার পালনকর্তা আমাকে বুদ্ধিমত্তা দান করলেন এবং আমাকে পয়গম্বরগণের অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন।—(সূরা শু'আরা)

অতঃপর ফিরাউনের অনুগ্রহ প্রকাশের উত্তরে বললেন যে, তোমার অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করা যথার্থ নয়। কেননা, আমার লালন-পালনের ব্যাপারটি তোমারই জুলুম ও উৎপীড়নের ফলশ্রুতি ছিল। তুমি ইসরাঈল বংশের ছেলে-সন্তানদেরকে হত্যার আদেশ জারি করে রেখেছিলে। তাই আমার জননী বাধ্য হয়ে আমাকে নদীতে নিক্ষেপ করেন

এবং তোমার গৃহে পৌঁছার ঘটনা ঘটে। বলেছেন ঃ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ — (আমাকে লালন-পালন করার) যে নিয়ামতের ঋণভার তুমি আমার উপর রাখছ, তার কারণ এই যে তুমি ইসরাঈল বংশীয়দেরকে দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করে রেখেছিলে।

এরপর ফিরাউন যখন প্রশ্ন করল ঃ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ বিশ্বপালক কে এবং কি? তখন তিনি উত্তরে বললেন ঃ তিনি আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুর পালনকর্তা। এতে ফিরাউন বিদ্রূপের স্বরে উপস্থিত লোকদেরকে বলল ঃ أَلَا تَسْتَمِعُونَ —অর্থাৎ তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ না সে কিরূপ বোকার মত কথাবার্তা বলে যাচ্ছে? তখন মূসা (আ) বললেন ঃ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ অর্থাৎ তোমাদের এবং তোমাদের বাপদাদাদেরও তিনিই পালনকর্তা রব।

ফিরাউন বিরক্ত হয়ে বলল ঃ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ অর্থাৎ এই ব্যক্তি যে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র রসূল হওয়ার দাবী করছে, সে বদ্ধ পাগল।

পাগল উপাধি দেওয়া সত্ত্বেও প্রতিপক্ষের পাগলামি এবং নিজের বুদ্ধিমত্তা প্রমাণ করার পরিবর্তে মূসা (আ) সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নি, বরং আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীনের আরও একটি গুণ প্রকাশ করে বললেন ঃ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ —তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছুর পালনকর্তা, যদি তোমরা বুঝ!—(সূরা শু‘আরা)

সূরা শু‘আরার তিন রুকূতে পরিব্যাপ্ত এটি হচ্ছে হযরত মূসা (আ) ও ফিরাউনের মধ্যকার ফিরাউনের দরবারে অনুষ্ঠিত একটি দীর্ঘ কথোপকথন। আল্লাহ্র প্রিয় রসূল মূসা (আ)-র এই কথোপকথনটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন, এতে না কোন ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, না কটু কথার জওয়াব আছে এবং না তার কটু কথার জওয়াবে কোন কটুকথা বলা হয়েছে, বরং আগা-গোড়া আল্লাহ্ তা‘আলার গুণাবলী ঐ প্রচার কাজ ব্যক্ত হয়েছে।

এ হচ্ছে একগুঁয়ে ও হঠকারী সম্প্রদায়ের সাথে পয়গম্বরগণের তর্ক-বিতর্কের সংক্ষিপ্ত নমুনা এবং এ হচ্ছে কোরআন বর্ণিত উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্কের বাস্তব ব্যাখ্যা।

তর্ক-বিতর্ক ছাড়া দাওয়াত ও প্রচারের কাজে পয়গম্বরগণ প্রত্যেক ব্যক্তি ও স্থানোপযোগী কথা বলার ব্যাপারে যে সব বিজ্ঞজনোচিত নীতি, ভঙ্গি, হিকমত ও উপযোগিতার

প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন এবং দাওয়াতকে জনপ্রিয়, কার্যকরী ও স্থায়ী করার জন্য যেসব কর্ম-পন্থা গ্রহণ করেছেন, সেগুলোই আসলে দাওয়াতের প্রাণ। এর বিস্তারিত বিবরণ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সমগ্র শিক্ষার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। নমুনা হিসাবে কয়েকটি বিষয় দেখুন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) দাওয়াত, প্রচার ও ওয়াজ-নসীহতে শ্রোতাদের উপর যাতে বোঝা না চাপে, সেদিকে খুব খেয়াল রাখতেন। সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন তাঁর আশিক। তাঁরা তাঁর কথা-বার্তা শুনে বিরক্তিবোধ করবেন এরূপ সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু তাঁদের বেলায়ও তাঁর অভ্যাস ছিল এই যে, প্রত্যহ ওয়াজ-নসীহত করতেন না—সপ্তাহের কোন কোন দিন করতেন, যাতে শ্রোতাদের কাজ-কারবারে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় এবং তাদের মনের উপর বোঝা না চাপে।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) সপ্তাহের কোন কোন দিনই ওয়াজ করতেন, যাতে আমরা বিরক্ত না হয়ে পড়ি। তিনি অন্যদেরকেও এ নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন।

হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا—সহজ কর, কঠিন করো না। মানুষকে আল্লাহ্র রহমতের সুসংবাদ শোনাও, নিরাশ কিংবা পালিয়ে যেতে বাধ্য করো না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : তোমাদের রব্বানী দার্শনিক আলিম ও ফকীহ্ হওয়া উচিত। সহীহ্ বুখারীতে এ উক্তি উদ্ধৃত করে 'রব্বানী' শব্দের তফসীর করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি দাওয়াত প্রচার ও শিক্ষাদানে লালন-পালনের নীতি অনুযায়ী প্রথমে সহজ সহজ বিষয় বর্ণনা করে, অতঃপর লোকেরা এসব বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেলে অন্যান্য কঠিন বিষয় বর্ণনা করে, তাকে 'আলিমে-রাব্বানী' বলা হয়। আজকাল ওয়াজ ও প্রচারের প্রভাব খুব কম প্রতিফলিত হয়। এর বড় কারণ এই যে, সাধারণত এ কাজে যারা ব্রতী, তারা এসব নীতি-রীতির প্রতি বড় একটা লক্ষ্য রাখে না। সুদীর্ঘ বক্তৃতা সময়ে-অসময়ে উপদেশ, প্রতিপক্ষের অবস্থা জানা ব্যতিরেকেই তাকে কোন কাজ করতে বাধ্য করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) দাওয়াত ও সংশোধনের কাজে এ দিকটির প্রতিও সযত্ন লক্ষ্য রাখতেন যে, প্রতিপক্ষ যেন লজ্জিত ও অপমানিত না হয়। এ জন্যই যখন কোন ব্যক্তিকে কোন ভুল মন্দ কাজে লিপ্ত দেখতেন, তখন তাকে সরাসরি সম্বোধন করার পরিবর্তে উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করে বলতেন : ما بال اقوام يفعلون كذا—লোকদের কি হয়েছে যে, তারা অমুক কাজ করে?

এই ব্যাপক সম্বোধনে যাকে শোনানো আসল লক্ষ্য হত, সে-ও শুনে নিত এবং মনে মনে লজ্জিত হয়ে সংশ্লিষ্ট কাজটি পরিত্যাগ করতে যত্নবান হতো।

প্রতিপক্ষকে লজ্জা থেকে বাঁচানোই ছিল পয়গম্বরগণের সাধারণ অভ্যাস। এ কারণেই তাঁরা মাঝে মাঝে প্রতিপক্ষের কাজকে নিজের কাজ বলে প্রকাশ করে সংশোধনের চেষ্টা করতেন। সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে :

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي — অর্থাৎ আমার কি হল যে, আমি আমার সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করব না? বলা বাহুল্য, রসূলের এ দূতটি সদাসর্বদাই ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তবে যে প্রতিপক্ষ ইবাদতে মশগুল ছিল না, তাকে শোনানোই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তিনি কাজটিকে নিজের কাজ বলে জাহির করেছেন।

দাওয়াতের অর্থ অপরকে নিজের কাছে ডাকা—শুধু তার দোষ বর্ণনা করা নয়। এ ডাকা তখনই হতে পারে, যখন বক্তা ও তার সম্বোধিতদের মধ্যে কোন যোগসূত্র থাকে। এজন্যই কোরআন পাকে পয়গম্বরগণের দাওয়াতের শিরোনাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে يَا قَوْمِ বলে শুরু করা হয়েছে। এতে ভ্রাতৃসুলভ অভিন্নতা প্রথমে প্রকাশ করে পরে সংশোধনমূলক কথা-বার্তা বলা হয়। অর্থাৎ আমরা তো একই সমাজভুক্ত লোক। কাজেই একের মনে অন্যের প্রতি কোনরূপ ঘৃণা থাকা উচিত নয়। এ কথা বলে পয়গম্বরগণ সংশোধনের কাজ আরম্ভ করেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) দাওয়াতের যে চিঠি রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, তাতে প্রথমে রোম সম্রাটকে عظيم الروم (রোমের মহান অধিপতি) উপাধিতে ভূষিত করেন। এতে তার বৈধ সম্মান রয়েছে। কেননা, এতে মহান হওয়ার স্বীকারোক্তিও আছে, কিন্তু রোমকদের জন্য—নিজের জন্য নয়। অতঃপর নিম্নোক্ত ভাষায় তাকে ঈমানের দাওয়াত দেওয়া হয়ঃ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ

হে আহ্লে-কিতাবগণ! আহ্বানের প্রতিটি বাক্যের দিকে এস, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত করব না।
—(সূরা আলে ইমরান)

এতে প্রথমে পারস্পরিক ঐক্যের একটি অভিন্ন কেন্দ্রবিন্দু উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো এই যে, একত্ববাদের বিশ্বাস আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। এরপর খৃস্টানদের ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করলে প্রত্যেক শিক্ষা ও দাওয়াতের মধ্যে এমনি ধরনের আদব ও নীতি পাওয়া যাবে। আজকাল প্রথমে তো দাওয়াত ও সংশোধন এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের প্রতি লক্ষ্যই করা হয় না। যারা এ কাজে নিয়োজিত তারা শুধু তর্কবিতর্ক, বিপক্ষের প্রতি দোষারোপ, বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি এবং অপমানিত ও লাঞ্ছিত করাকেই দাওয়াত ও প্রচার মনে করে নিয়েছে। এটা সুন্নতবিরোধী হওয়ার কারণে কখনও কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয় না। তারা মনে করতে থাকে যে, তারা

ইসলামের জন্য খুব কাজ করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা লোকদেরকে ইসলাম থেকে বিমুখ করার কারণ হচ্ছে।

প্রচলিত তর্ক-বিতর্কের ধর্মীয় ও পার্থিব অনিষ্ট : আলোচ্য আয়াতের তফসীরে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শরীয়তের আসল উদ্দেশ্য হল দাওয়াত। এর দু'টি মূলনীতি—হিকমত ও উত্তম উপদেশ। যদি কখনও তর্ক-বিতর্কে জড়িত হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে احسن তথা উত্তম পন্থার শর্তসাপেক্ষে তারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটা প্রকৃতপক্ষে দাওয়াতের কোন পন্থা নয়, বরং এর নেতিবাচক দিকের একটি কৌশল মাত্র।

এতে কোরআন পাক بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ--এর শর্ত লাগিয়ে যেমন ব্যক্ত করেছে যে, এটা নম্রতা, শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে করা উচিত, এতে প্রতিপক্ষের অবস্থা অনুযায়ী সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং প্রতিপক্ষের অপমান ও ঘৃণা থেকে পুরোপুরি বিরত থাকা উচিত, তেমনি স্বয়ং বক্তার জন্য ক্ষতিকর না হওয়াও এর উৎকর্ষের জন্য জরুরী। অর্থাৎ বক্তার মধ্যে চরিত্রহীনতা, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, আড়ম্বরপ্রীতি ইত্যাদি দোষ সৃষ্টি না হওয়া উচিত। এগুলো কঠিন আত্মিক পাপ। আজকালকার আলোচনা ও বিতর্কযুদ্ধে ঘটনাক্রমে আল্লাহ্র কোন বান্দা এগুলো থেকে মুক্ত থাকলে থাকতেও পারে। নতুবা স্বভাবত এগুলো থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন।

ইমাম গাযালী (র) বলেন : মদ যেমন যাবতীয় দুষ্কর্মের মূল—নিজেও মহাপাপ এবং অন্যান্য বড় বড় দৈহিক পাপের উপায়ও বটে, তেমনি তর্ক-বিতর্কে প্রতিপক্ষের উপর প্রাধান্য লাভ এবং মানুষের কাছে স্বীয় শিক্ষাগত শ্রেষ্ঠত্ব ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য হলে এটা যাবতীয় আধ্যাত্মিক দোষের মূল। এর ফলে অনেক আত্মিক অপরাধ জন্মলাভ করে। উদাহরণত হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, পরনিন্দা, অপরের ছিদ্রান্বেষণ, পরশ্রীকাতরতা, সত্যগ্রহণে অনীহা, অন্যের উক্তি নিয়ে ন্যায় পথে চিন্তা করার পরিবর্তে প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় কোরআন ও সুন্নাহ্র ভিন্ন অর্থ বর্ণনা করতে হলেও তা করতে দ্বিধান্বিত না হওয়া।

এসব মারাত্মক দোষে মর্যাদাসম্পন্ন আলিমগণও লিপ্ত হন। কিন্তু ব্যাপারটি যখন তাদের অনুসারীদের কাছে পৌঁছে, তখন ধস্তাধস্তি, মারামারি ও লড়াইয়ের বাজার গরম হয়ে যায়। ইন্না লিল্লাহ ... ...।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন :

জ্ঞান হচ্ছে শিক্ষিত ও জ্ঞানীদের মধ্যে একটি পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। এখন যারা জ্ঞানকেই শত্রুতার রূপ দান করছে, তারা বিজাতিকে নিজেদের ধর্ম অনুসরণের দাওয়াত কিভাবে দিতে পারে। অন্যদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করাই যখন তাদের লক্ষ্য তখন তাদের কাছ থেকে পারস্পরিক সম্প্রীতি, ভালবাসা ও মানবতাবোধের কল্পনা কেমন করে করা যেতে পারে? একজন মানুষের জন্য এর চাইতে বড় অনিষ্ট আর কি হতে পারে যে, তাকে ঈমানদার ও পরহিযগারের চরিত্র থেকে বঞ্চিত করে মুনাফিকের চরিত্রে রূপান্তরিত করে দেয়।

ইমাম গাযালী (র) বলেন ঃ ধর্মীয় শিক্ষা ও দাওয়াতের কাজে ব্রতী ব্যক্তি হয় নির্ভুল নীতি অনুসরণ করে এবং মারাত্মক বিপদ থেকে বিরত থেকে চিরন্তন সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে যায়, না হয় এ স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে সীমাহীন দুর্ভাগ্যের দিকে ধাবিত হয়। মধ্যস্থলে অবস্থান করা তার পক্ষে অসম্ভব। কেননা, যে শিক্ষা উপকারী হয় না, তা আযাব বৈ কিছু নয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه —কিয়ামতের দিন সর্বাধিক কঠোর আযাবে সে আলিম ব্যক্তি পতিত হবে, যার ইল্ম দ্বারা আল্লাহ্ তাকে কোন উপকার দেন নি।

অন্য এক সহীহ্ হাদীসে আছে ঃ

لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس اليكم فمن فعل ذلك فهو فى النار -

ধর্মীয় শিক্ষা এ উদ্দেশ্যে অর্জন করো না যে, তার মাধ্যমে অন্য আলিমদের মোকাবিলায় গৌরব ও সম্মান অর্জন করবে কিংবা স্বল্প শিক্ষিতদের সাথে ঝগড়া করবে অথবা এর মাধ্যমে অন্যের দৃষ্টি নিজের দিকে আকর্ষণ করবে। যে এরূপ করে, সে জাহান্নামে যাবে।—(ইবনে মাজা)

এ কারণেই ফিকাহ্শাস্ত্রের ইমামগণ ও সত্যপন্থী মনীষীবৃন্দ শিক্ষণীয় ব্যাপারাদিতে ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্ক কোন কালেই জায়েয মনে করতেন না। দাওয়াতের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যাকে ভ্রান্তিতে লিপ্ত মনে কর, তাকে নম্রতা ও শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে যুক্তিসঙ্গতভাবে বিষয়টি বুঝিয়ে দাও। এরপর সে গ্রহণ করে নিলে উত্তম। নতুবা চুপ থাক এবং ঝগড়া কটুকথা থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাক। হযরত ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ

كان مالك يقول المراء والجدال فى العلم يذهب بنور العلم من قلب العبد وقيل له رجل له علم بالسنة فهل يجادل عنها قال لا ولكن يخبر بالسنة فان قبل منه والا سكت -

ইল্ম সম্পর্কে ঝগড়া ও বিতর্ক, ইল্মের ঔজ্জ্বল্যকে মানুষের অন্তর থেকে নিঃশেষ করে দেয়। কেউ বলল ঃ এক ব্যক্তি সুন্নাহ্র শিক্ষায় শিক্ষিত। সে কি সুন্নাহ্র হিফাযতের জন্য তর্ক করতে পারে? তিনি বললেন ঃ না, তার উচিত প্রতিপক্ষকে বিশুদ্ধ কথাটি বলে দেওয়া। এরপর যদি সে গ্রহণ করে, তবে উত্তম। নতুবা সে চুপ থাকবে।—(আওজাযুল মাসালেক শরহে মুয়াত্তা মালেক, ১ম খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা)

বর্তমান যুগে দাওয়াত ও সংস্কার প্রচেষ্টা পুরোপুরি কার্যকর না হওয়ার কারণ দ্বিবিধ।

এক. যুগের অধঃপতন ও হারাম বস্তুসমূহের আধিক্যের কারণে সাধারণভাবে মানুষের অন্তর কঠোর ও পরকাল সম্পর্কে উদাসীন হয়ে গেছে এবং সত্য গ্রহণের তওফীক

হ্রাস পেয়েছে। কেউ কেউ আল্লাহ্‌র সে গজবে পতিত রয়েছে, যার সংবাদ রসূলুল্লাহ্ (সা) দিয়েছিলেন যে, শেষ যমানায় অধিকাংশ মানুষের অন্তর অধোমুখী হয়ে যাবে এবং ভাল-মন্দের পরিচয় এবং জায়েয-নাজায়েযের পার্থক্য তাদের অন্তর থেকে উঠে যাবে।

দুই. সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এবং দাওয়াতের কর্তব্যের প্রতি অমনোযোগিতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। সর্বসাধারণের কথা না-ই বললাম, আলিম ও সজ্জনদের মধ্যেও এ প্রয়োজনের অনুভূতি খুবই কম। এটা বুঝে নেওয়া হয়েছে যে, নিজের কাজকর্ম সংশোধন করতে পারলেই যথেষ্ট। তাদের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, ভাই, বন্ধু-বান্ধব যত গোনাহেই লিপ্ত থাকুক না কেন, তাদের সংশোধনের চিন্তা যেন তাদের দায়িত্বই নয়। অথচ কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বাক্যাবলী প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্বে তার পরিবার-পরিজন ও সংশ্লিষ্টদের সংশোধন প্রচেষ্টা ফরয করে দিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا নিজেকে এবং পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। যদি কিছু সংখ্যক লোক দাওয়াত ও সংশোধনের কাজের প্রতি দৃষ্টি দেয়ও, তবে তারা কোরআনের শিক্ষা এবং পয়গম্বরসুলভ দাওয়াতের রীতিনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ। চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই যাকে যখন ইচ্ছা বলে দেয় এবং ধরে নেয়, তারা তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে ফেলেছে। অথচ এ কর্মপদ্ধতি পয়গম্বরগণের সুন্নতের খেলাফ হওয়ার কারণে মানুষকে ধর্ম ও ধর্মের বিধানাবলী পালন থেকে অনেক দূরে নিক্ষেপ করে দেয়।

বিশেষ করে যেখানে অপরের সমালোচনা করা হয়, সেখানে সমালোচনার আড়ালে অপরকে হেয় প্রতিপন্ন এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ পর্যন্ত করা হয়। হযরত ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ

যে ব্যক্তিকে তার কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করতে হয়, সে বিষয়টা যদি তুমি তাকে নির্জনে নম্রভাবে বুঝিয়ে দাও, তবে তা হবে উপদেশ। পক্ষান্তরে যদি প্রকাশ্যভাবে জনসমক্ষে তাকে লজ্জা দাও, তবে তাই হবে তাকে অপদস্থ করা।

আজকাল অপরের দোষত্রুটির ব্যাপারে পত্র-পত্রিকা ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরাকে দীনের কাজ মনে করে নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে দীন ও দীনের দাওয়াতের বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং নীতি অনুযায়ী দীনের কাজ করার তওফীক দান করুন।

এ পর্যন্ত দাওয়াতের নীতি ও আদব বর্ণিত হল। এরপর বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ এ

বাক্যটি দীনের প্রতি দাওয়াতদাতাদের সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে। কেননা, পূর্বোল্লিখিত নীতি ও আদবের অনুসরণ সত্ত্বেও যখন প্রতিপক্ষ সত্য গ্রহণ না করে, তখন স্বভাবত মানুষ দারুণ ব্যথা অনুভব করে এবং মাঝে মাঝে এর এমন প্রতিক্রিয়াও হতে পারে যে, দাওয়াতের কোন উপকার না দেখে দাওয়াতদাতা নিরাশ হয়ে তা বর্জনও করে বসতে পারে। তাই এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, আপনার কর্তব্য শুধু নির্ভুল নীতি অনুযায়ী দাওয়াতের কাজ করে

যাওয়া। দাওয়াত কবূল করা বা না করা, এতে আপনার কোন দখল নেই এবং এটা আপনার দায়িত্বও নয়। এটা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার কাজ। তিনিই জানেন, কে পথভ্রষ্ট থাকবে এবং কে সুপথ প্রাপ্ত হবে। আপনি এ চিন্তায় পড়বেন না। নিজের কাজ করে যান। সাহস হারাবেন না এবং নিরাশ হবেন না। এতে বোঝা গেল যে, এ বাক্যটিও দাওয়াতের আদবেরই পরিশিষ্ট।

দাওয়াতদাতাকে কেউ কষ্ট দিলে প্রতিশোধ গ্রহণ করা জায়েয, কিন্তু সবর করা উত্তম ঃ বিগত আয়াতের পরবর্তী তিন আয়াতে দাওয়াতদাতাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, দাওয়াতের কাজে মাঝে মাঝে এমন কঠোর-প্রাণ মূর্খদের সাথেও পালা পড়ে যায় যে, তাদেরকে যতই নম্রতা ও শুভেচ্ছা সহকারে বোঝানো হোক না কেন, তারা উত্তেজিত হয়ে যায় কটুকথা বলে কষ্ট দেয় এবং কোন কোন সময় আরও বাড়াবাড়ি করে দাওয়াতদাতাদের উপর দৈহিক নির্যাতন চালায়, এমনকি তাদেরকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। এমতাবস্থায় দাওয়াতদাতাদের কি করা উচিত ?

এ সম্পর্কে وَإِنْ عَاقَبْتُمْ الخ বাক্যে প্রথমত তাদেরকে আইনগত অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, যারা নির্যাতন চালায়, তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা আপনার জন্য বৈধ, কিন্তু এই শর্তে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্যাতনের সীমা অতিক্রম করা যাবে না। যতটুকু জুলুম প্রতিপক্ষের তরফ থেকে করা হয়, প্রতিশোধ ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে; বেশি হতে পারবে না।

আয়াতের শেষে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, যদিও প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার রয়েছে কিন্তু সবর করা উত্তম।

আয়াতের শানে নুযূল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবীদের পক্ষ থেকে নির্দেশ পালন ঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদগণের মতে এ আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ। ওহুদ যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবীর শাহাদাত বরণ এবং হযরত হামযা (রা)-কে হত্যার পর তাঁর লাশের নাক-কান কর্তনের ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েত তদ্রূপই। দারা-কুতুনী হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে ঃ

ওহুদের যুদ্ধ-ময়দান থেকে মুশরিকরা ফিরে যাওয়ার পর সত্তর জন সাহাবীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো। তাঁদের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য হযরত হামযা (রা)-র মৃতদেহও ছিল। তাঁর প্রতি মুশরিকদের প্রচণ্ড ক্রোধ ছিল। তাই তাঁকে হত্যা করার পর মনের ঝাল মিটাতে গিয়ে তাঁর নাক, কান ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে এবং পেট চিরে দিয়েছিল। এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে রসূলুল্লাহ্ (সা) দারুণভাবে মর্মাহত হলেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম, আমি হামযার পরিবর্তে মুশরিকদের সত্তর জনের মৃতদেহ বিকৃত করব। এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য وَإِنْ عَاقَبْتُمْ শীর্ষক তিনটি আয়াত নাযিল হয়েছে।—(তফসীর কুরতুবী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, কাফিররা অন্যান্য সাহাবীর মৃতদেহও বিকৃত করেছিল।—(তিরমিযী, আহমদ, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হাব্বান)

এক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (সা) সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই দুঃখের আতিশয্যে বিকৃতদেহ সাহাবীদের পরিবর্তে সত্তর জন মুশরিকের মৃতদেহ বিকৃত করার সংকল্প করেছিলেন। এটা আল্লাহ্র কাছে সে সমতা ও সুবিচারের অনুকূল ছিল না, যা তাঁর মাধ্যমে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার আপনার রয়েছে বটে, কিন্তু সে পরিমাণেই, যে পরিমাণ জুলুম হয়েছে। সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখে কয়েক জনের প্রতিশোধ সত্তর জনের উপর শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ন্যায়ানুগ আচরণ উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি যদিও রয়েছে, কিন্তু তাও ছেড়ে দিন এবং অপরাধীদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। এটা অধিক শ্রেয়।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এখন আমরা সবরই করব। একজনের উপরও প্রতিশোধ নেব না। এরপর তিনি কসমের কাফফারা আদায় করে দেন। —(মাযহারী)

মক্কা বিজয়ের সময় এসব মুশরিক পরাজিত হয়ে যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের হস্তগত হয়, তখন ওহুদ যুদ্ধের সময় কৃত সংকল্প পূর্ণ করার এটা উত্তম সুযোগ ছিল। কিন্তু উল্লিখিত আয়াত নাযিল হওয়ার সময়ই রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় সংকল্প পরিত্যাগ করে সবর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাই মক্কা বিজয়ের সময় তিনি আয়াত অনুযায়ী সবর অবলম্বন করেন। সম্ভবত এ কারণেই কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতগুলো মক্কা বিজয়ের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। এটাও সম্ভব যে, আয়াতগুলো বারবার নাযিল হয়েছে। প্রথমে ওহুদ যুদ্ধের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে এবং পরে মক্কা বিজয়ের সময় পুনর্বার অবতীর্ণ হয়েছে। —(মাযহারী)

মাস'আলা ঃ আলোচ্য আয়াতটি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমতার আইন ব্যক্ত করেছে। এ কারণেই ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে, তার বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। আহত করলে আহতকারীকে জখমের পরিমাণে জখম করা হবে। কেউ কাউকে হাত-পা কেটে হত্যা করলে নিহতের ওলীকে অধিকার দেওয়া হবে, সেও প্রথমে হত্যাকারীর হাত-পা কর্তন করবে, অতঃপর হত্যা করবে।

তবে কেউ যদি কাউকে পাথর মেরে কিংবা তীর দ্বারা আহত করে হত্যা করে, তাহলে এতে হত্যার প্রকারভেদের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভবপর নয় যে, কি পরিমাণ আঘাত দ্বারা হত্যা সংঘটিত হয়েছে এবং নিহত ব্যক্তি কি পরিমাণ কষ্ট পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে সত্যিকার সমতার কোন মাপকাঠি নেই। তাই হত্যাকারীকে তরবারি দ্বারাই হত্যা করা হবে।—(জাস্সাস)

মাস'আলা ঃ আয়াতটি যদিও দৈহিক কষ্ট ও দৈহিক ক্ষতি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক এবং এতে আর্থিক ক্ষতিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একারণেই ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারও অর্থসম্পদ ছিনতাই করে, প্রতিপক্ষেরও অধিকার রয়েছে

সেই পরিমাণ অর্থসম্পদ তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার কিংবা অপহরণ করার। তবে শর্ত এই যে, অর্থসম্পদ সে ছিনিয়ে নেবে কিংবা অপহরণ করবে, তা ছিনতাইকৃত অর্থ-সম্পদের অভিন্ন প্রকার হতে হবে। উদাহরণত নগদ টাকা-পয়সা ছিনতাই করলে বিনিময়ে সেই পরিমাণ নগদ টাকা-পয়সা তার কাছ থেকে ছিনতাই কিংবা অপহরণের মাধ্যমে নিতে। খাদ্যশস্য, বস্ত্র ইত্যাদি ছিনতাই করলে, সেই রকম খাদ্যশস্য ও বস্ত্র নিতে পারে। কিন্তু এক প্রকার সামগ্রীর বিনিময়ে অন্য প্রকার সামগ্রী নিতে পারবে না। উদাহরণত টাকা-পয়সার বিনিময়ে বস্ত্র অথবা অন্য কোন ব্যবহারিক বস্তু জোরপূর্বক নিতে পারবে না। কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ সর্বাবস্থায় অনুমতি দিয়েছেন—এক প্রকার হোক কিংবা ভিন্ন প্রকার। এ মাস'আলার কিছু বিবরণ কুরতুবী স্বীয় তফসীরে লিপিবদ্ধ করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা ফিকাহ্‌গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ—আয়াতে সাধারণ আইন বর্ণিত হয়েছিল। এতে সব মুসলমানের জন্য সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করা বৈধ, কিন্তু সবর করা শ্রেয় বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিশেষভাবে সম্বোধন করে সবর করতে উৎসাহ দান করা হয়েছে। কেননা তাঁর মহত্ত্ব ও উচ্চপদ হেতু অন্যের তুলনায় এটাই ছিল তাঁর পক্ষে অধিকতর উপযোগী। তাই বলা হয়েছে : وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

—অর্থাৎ আপনি তো প্রতিশোধের ইচ্ছাই করবেন না—সবরই করুন। সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, আপনার সবর আল্লাহ্‌র সাহায্যে হবে। অর্থাৎ সবর করা আপনার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে।

শেষ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য অর্জিত হওয়ার একটি সাধারণ কায়দা বলে দেওয়া হয়েছে যে,

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ—এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য তাদের সাথে থাকে, যারা দু'টি গুণে গুণান্বিত। এক. তাকওয়া, ইহ্‌সান। তাকওয়ার অর্থ সৎকর্ম করা এবং ইহ্‌সানের অর্থ এখানে সৃষ্ট জীবের সাথে সদ্ব্যবহার করা। অর্থাৎ যারা শরীয়তের অনুসারী হয়ে নিয়মিত সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং অপরের সাথে সদ্ব্যবহার করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সঙ্গে আছেন। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গ (সাহায্য) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তার অনিষ্ট সাধন করার সাধ্য কার?

وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا

সূরা বনী ইসরাঈল

মক্কায় অবতীর্ণ ॥ ১১১ আয়াত, ১২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ①

পরম মেহেরবান দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত—যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি—যাতে আমি তাকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পবিত্র সে সত্তা, যিনি স্বীয় বান্দা মুহাম্মদ (সা)-কে রাত্রিবেলায় সফর করিয়েছেন মসজিদে হারাম (অর্থাৎ কাবার মসজিদ) থেকে মসজিদে-আকসা (অর্থাৎ বায়তুল-মুকাদ্দাস) পর্যন্ত যার আশেপাশে (এ ফিলিস্তীনে) আমি (ধর্মীয় ও পার্থিব) বরকতসমূহ রেখেছি। (ধর্মীয় বরকত এই যে, সেখানে বহু সংখ্যক পয়গম্বর সমাহিত রয়েছেন এবং পার্থিব বরকত এই যে, সেখানে বাগ-বাগিচা, নদ-নদী, ঝরণা ও ফসলের প্রাচুর্য রয়েছে। মোটকথা, সে মসজিদ পর্যন্ত বিস্ময়করভাবে এজন্য) নিয়ে গেছি, যাতে আমি তাঁকে স্বীয় কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিতে পারি। (তন্মধ্যে কিছু সংখ্যকের সম্পর্ক তো স্বয়ং সে জায়গার সাথে ঃ উদাহরণত এত দীর্ঘ পথ খুব অল্প সময়ে অতিক্রম করা, সব পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাত করা এবং তাঁদের কথাবার্তা শোনা ইত্যাদি এবং কিছু সংখ্যকের সম্পর্ক পরবর্তী পর্যায়ের সাথে। যেমন, আকাশে যাওয়া এবং সেখানকার অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ নিরীক্ষণ করা।) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। (যেহেতু তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কথা শুনতেন এবং অবস্থা দেখতেন, তাই তাঁকে এতদসম্পৃক্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও সম্মান দান করেছেন এবং এমন নৈকট্য দিয়েছেন, যা কেউ লাভ করেনি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে মি'রাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা আমাদের রসূল (সা)-এর একটি বিশেষ সম্মান ও স্বাতন্ত্র্যমূলক মু'জিযা। اسراء শব্দটি اسرى ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ রাত্রে নিয়ে যাওয়া। এরপর لَيْلًا শব্দটি স্পষ্টত এ অর্থ ফুটিয়ে তুলেছে। لَيْلًا শব্দটি نكرة ব্যবহার করে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমগ্র ঘটনায় সম্পূর্ণ রাত্রি নয়; বরং রাত্রির একটা অংশ ব্যয়িত হয়েছে। আয়াতে উল্লিখিত মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরকে 'ইসরা' বলা হয় এবং সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত যে সফর হয়েছে, তার নাম মি'রাজ। ইসরা অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর মি'রাজ সূরা নজমে উল্লিখিত রয়েছে এবং অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সম্মান ও গৌরবের স্তরে بِعَبْدِهٖ শব্দটি একটি বিশেষ প্রেমময়তার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং কাউকে 'আমার বান্দা' বললে এর চাইতে বড় সম্মান মানুষের জন্য আর হতে পারে না। হযরত হাসান দেহলভী চমৎকার বলেছেন:

بندہ حسن بصد زباں گفت کہ بندہ تو ام
تو بزبان خود بگو بندہ نواز کیستی

অর্থ: তোমার বান্দা হাসান তো শত মুখে বলে থাকে যে, আমি তোমার বান্দা, তুমি তোমার নিজের মুখে একবার বলনা যে, আমি তোমারই দাস !!

আল্লাহ্র তরফ থেকে বান্দাদের প্রতি এরূপ সম্বোধন একটা অতুলনীয় মর্যাদা। যেমন অন্য এক আয়াতে عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ বলে স্বীয় মকবুল বান্দাদের সম্মান বৃদ্ধি করা লক্ষ্য রয়েছে। এতে আরও জানা গেল যে, আল্লাহ্র পরিপূর্ণ বান্দা হয়ে যাওয়াই মানুষের সর্বরৃহৎ গুণ। কেননা, বিশেষ সম্মানের স্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনেক গুণের মধ্য থেকে দাসত্ব গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে। এ শব্দ দ্বারা আরও একটি বড় উপকার সাধন লক্ষ্য। তা এই যে, আগাগোড়া অলৌকিক ঘটনাবলীতে পূর্ণ এই সফর থেকে কারও মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টি না হয়ে যায় যে, এ অলৌকিক ঊর্ধ্বাকাশ ভ্রমণের ব্যাপারটি একটি আল্লাহ্র গুণের অংশবিশেষ। যেমন ঈসা (আ)-র আকাশে উত্থিত হওয়ার ঘটনা থেকে খৃস্টান জাতি ধোঁকায় পড়েছে। তাই عبد (বান্দা) শব্দ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এসব গুণ, চরম পরাকাষ্ঠা ও মু'জিযা সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র বান্দাই—স্বয়ং আল্লাহ্ বা আল্লাহ্র কোন অংশীদার নন।

কোরআন ও হাদীস থেকে দৈহিক মি'রাজের প্রমাণাদি ও ইজমা: ইসরা ও মি'রাজের সমগ্র সফর যে শুধু আত্মিক ছিল না, বরং সাধারণ মানুষের সফরের মত দৈহিক

ছিল, একথা কোরআন পাকের বক্তব্য ও অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আলোচ্য আয়াতের প্রথম سُبْحٰنَ শব্দের মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, এ শব্দটি আশ্চর্যজনক ও বিরাট বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। মি'রাজ যদি শুধু আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নজগতে সংঘটিত হত তবে তাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? স্বপ্নে তো প্রত্যেক মুসলমান, বরং প্রত্যেক মানুষ দেখতে পারে যে, সে আকাশে উঠেছে, অবিশ্বাস্য বহু কাজ করেছে।

عَبْد শব্দ দ্বারা এদিকেই দ্বিতীয় ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, শুধু আত্মাকে দাস বলে না ; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টিকেই দাস বলা হয়। এছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মি'রাজের ঘটনা হযরত উম্মে হানী (রা)-র কাছে বর্ণনা করলেন, তখন তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কারও কাছে একথা প্রকাশ করবেন না ; প্রকাশ করলে কাফিররা আপনার প্রতি আরও বেশি মিথ্যারোপ করবে। ব্যাপারটি যদি নিছক স্বপ্নই হত, তবে মিথ্যারোপ করার কি কারণ ছিল?

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ঘটনা প্রকাশ করলেন, তখন কাফিররা মিথ্যারোপ করল এবং ঠাট্টা বিদ্রূপ করল। এমনকি, কতক নও-মুসলিম এ সংবাদ শুনে ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। ব্যাপারটি স্বপ্নের হলে এতসব তুলকালাম কাণ্ড ঘটার সম্ভাবনা ছিল কি? তবে, এ ঘটনার আগে এবং স্বপ্নের আকারে কোন আত্মিক মি'রাজ হয়ে থাকলে তা এর পরিপন্থী নয়। وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنٰكَ আয়াতে সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদদের মতে رُؤْيَا (স্বপ্ন) বলে رُؤْيَت (দেখা) বোঝানো হয়েছে, কিন্তু একে رُؤْيَا শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই হতে পারে যে, এ ব্যাপারটিকে রূপক অর্থে رُؤْيَا বলা হয়েছে। অর্থাৎ এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কেউ স্বপ্ন দেখে। পক্ষান্তরে যদি رُؤْيَا শব্দের অর্থ স্বপ্নই নেওয়া হয়, তবে এমনটিও অসম্ভব নয়। কারণ, মিরাজের ঘটনাটি দৈহিক হওয়া ছাড়া এবং আগে কিংবা পরে আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নযোগেও হয়ে থাকবে এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এবং হযরত আয়েশা (রা) থেকে যে স্বপ্নযোগে মি'রাজ হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে, তাও যথাস্থানে নির্ভুল। কিন্তু এতে শারীরিক মি'রাজ না হওয়া প্রমাণিত হয় না।

তফসীর কুরতুবীতে আছে, ইসরার হাদীসসমূহ সব মুতাওয়াতির। নাক্কাশ এ সম্পর্কে বিশ জন সাহাবীর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন এবং কাযী আয়ায শেফা গ্রন্থে আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত পূর্ণরূপে যাচাই-বাছাই করে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর পঁচিশ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁদের কাছ থেকে এসব রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। নামগুলো এই ঃ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব আলী মর্তুজা, ইবনে মসউদ, আবু যর গিফারী, মালেক ইবনে ছা'ছা, আবু হোরায়রা, আবু সায়ীদ,

ইবনে আব্বাস, শাদ্দাদ ইবনে আউস, উবাই ইবনে কা'ব, আবদুর রহমান ইবনে কুর্য, আবূ হাইয়্যা, আবূ লায়লা, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান, বুরায়দাহ, আবূ আইউব আনসারী, আবূ উমামা, সামুরা ইবনে জুনদুব, আবুল হামরা, সোহায়ব রুমী, উম্মে হানী, আয়েশা, আসমা বিনতে আবূ বকর (রা)।

এরপর ইবনে কাসীর বলেন : فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون وأعرض عنه الزنادقة والملحدون সম্পর্কে সব মুসলমানের ঐকমত্য রয়েছে। শুধু ধর্মদ্রোহী যিন্দীকরা একে মানেনি।

মি'রাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা ইবনে কাসীরের রেওয়ায়েত থেকে

ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে আলোচ্য আয়াতের তফসীর এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করার পর বলেন : সত্য কথা এই যে, নবী করীম (সা) ইসরা সফর জাগ্রত অবস্থায় করেন; স্বপ্নে নয়। মক্কা মোকাররমা থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত এ সফর বোরাকযোগে করেন। বায়তুল মোকাদ্দাসের দ্বারে উপনীত হয়ে তিনি বোরাকটি অদূরে বেঁধে দেন এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদে প্রবেশ করেন এবং কেবলার দিকে মুখ করে দু'রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করেন। অতঃপর সিঁড়ি আনা হয়, যাতে নিচ থেকে উপরে যাওয়ার জন্য ধাপ বানানো ছিল। তিনি সিঁড়ির সাহায্যে প্রথমে প্রথম আকাশে, অতঃপর অবশিষ্ট আকাশসমূহে গমন করেন। এ সিঁড়িটি কি এবং কিরূপ ছিল, তার প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। ইদানিং কালেও অনেক প্রকার সিঁড়ি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে। স্বয়ংক্রিয় লিফটের আকারে সিঁড়িও আছে। এই অলৌকিক সিঁড়ি সম্পর্কে সন্দেহ ও দ্বিধার কারণ নেই। প্রত্যেক আকাশে সেখানকার ফেরেশতারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় এবং প্রত্যেক আকাশে সে সমস্ত পয়-গম্বরগণের সাথে সাক্ষাত হয়, যাঁদের অবস্থান কোন নির্দিষ্ট আকাশে রয়েছে। উদাহরণত ষষ্ঠ আকাশে হযরত মূসা (আ) এবং সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। অতঃপর তিনি পয়গম্বরগণের স্থানসমূহও অতিক্রম করে যান এবং এক ময়দানে পৌঁছেন, যেখানে ভাগ্যলিপি লেখার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তিনি 'সিদরাতুল মুন্তাহা' দেখেন, যেখানে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে স্বর্ণের প্রজাপতি এবং বিভিন্ন রঙ-এর প্রজাপতি ইতস্তত ছোটাছুটি করছিল। ফেরেশতারা স্থানটিকে ঘিরে রেখেছিল। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিবরাঈলকে তাঁর স্বরূপে দেখেন। তাঁর ছয় শত পাখা ছিল। সেখানেই তিনি একটি দিগন্তবেষ্টিত সবুজ রঙের রফরফ দেখতে পান। সবুজ রঙের গদি বিশিষ্ট পাল্কীকে রফরফ বলা হয়। তিনি বায়তুল-মা'মূরও দেখেন। বায়তুল-মা'মুরের নিকটেই কা'বার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম (আ) প্রাচীরের সাথে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এই বায়তুল মা'মুরে দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের পুনর্বার প্রবেশ করার পালা আসবে না। রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বচক্ষে জান্নাত ও দোযখ পরিদর্শন করেন। সে সময় তাঁর উম্মতের জন্য প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্তের নামায ফরয হওয়ার নির্দেশ হয়। অতঃপর তা হ্রাস করে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেওয়া হয়। এ দ্বারা সব ইবাদতের মধ্যে নামাযের বিশেষ গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

অতঃপর তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন আকাশে যেসব পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল তাঁরাও তাঁর সাথে বায়তুল মোকাদ্দাসে অবতরণ করেন। তাঁরা (যেন) তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত আগমন করেন। তখন নামাযের সময় হয়ে যায় এবং তিনি পয়গম্বরগণের সাথে নামায আদায় করেন। সেটা সেদিনকার ফজরের নামাযও হতে পারে। ইবনে কাসীর বলেন: নামাযে পয়গম্বরগণের ইমাম হওয়ার এ ঘটনাটি কারও কারও মতে আকাশে যাওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়। কিন্তু বাহ্যত এ ঘটনাটি প্রত্যাবর্তনের পর ঘটে। কেননা, আকাশে পয়গম্বর-গণের সাথে সাক্ষাতের ঘটনায় একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল সব পয়-গম্বরগণের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন। ইমামতির ঘটনা প্রথমে হয়ে থাকলে এখানে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া সফরের আসল উদ্দেশ্য ছিল ঊর্ধ্ব জগতে গমন করা। কাজেই এ কাজটি প্রথমে সেরে নেওয়াই অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত মনে হয়। আসল কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সব পয়গম্বর বিদায় দানের জন্য তাঁর সাথে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত আসেন এবং জিবরাঈলের ইঙ্গিতে তাঁকে সবার ইমাম বানিয়ে কার্যত তাঁর নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেওয়া হয়।

এরপর তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে বিদায় নেন এবং বোরাকে সওয়ার হয়ে অন্ধকার থাকতে থাকতেই মক্কা মোকাররমা পৌঁছে যান।

والله سبحانه وتعالى اعلم

মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে একজন অমুসলিমের সাক্ষ্য: তফসীর ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে: হাফেয আবূ নায়ীম ইস্পাহানী দালায়েলুন্নবুওয়ত গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে ওমর ওয়াকেদীর (১) সনদে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরযীর বাচনিক নিম্নোক্ত ঘটনা বর্ণনা করছেন:

"রসূলুল্লাহ্ (সা) রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পত্র লিখে হযরত দেহ্ইয়া ইবনে খলীফাকে প্রেরণ করেন। এরপর দেহ্ইয়ার পত্র পৌঁছানো, রোম সম্রাট পর্যন্ত পৌঁছা এবং তিনি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সম্রাট ছিলেন, এসব কথা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, যা সহীহ্ বুখারী এবং হাদীসের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। এ বর্ণনার উপসংহারে বলা হয়েছে যে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস পত্র পাঠ করার পর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অবস্থা জানার জন্য আরবের কিছুসংখ্যক লোককে দরবারে সমবেত করতে চাই-লেন। আবু সুফিয়ান ইবনে হরব ও তাঁর সঙ্গীরা সে সময় বাণিজ্যিক কাফিলা নিয়ে সে দেশে গমন করেছিল। নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে দরবারে উপস্থিত করা হল। হিরাক্লি-য়াস তাদেরকে যেসব প্রশ্ন করেন, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সহীহ্ বুখারী মুসলিম

---

(১) ওয়াকেদীকে হাদীস বর্ণনায় হাদীসবিদগণ দুর্বল বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু ইবনে কাসীরের মত সাবধানী মুহাদ্দিস তাঁর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। কারণ, ব্যাপারটি আকীদা কিংবা হালাল-হারামের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এ ধরনের ঐতিহাসিক ব্যাপারে তাঁর রেওয়ায়েত ধর্তব্য।

প্রভৃতি গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। আবূ সুফিয়ানের আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে এই সুযোগে রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে এমন কিছু কথাবার্তা বলবে যাতে, সম্রাটের সামনে তাঁর ভাবমূর্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আবূ সুফিয়ান নিজেই বলে যে, আমার এই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার পথে একটিমাত্র অন্তরায় ছিল। তা এই যে, আমার মুখ দিয়ে কোন সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা বের হয়ে পড়লে সম্রাটের দৃষ্টিতে হেয় পতিপন্ন হব এবং আমার সঙ্গীরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে ভর্ৎসনা করবে। তখন আমার মনে মি'রাজের ঘটনাটি বর্ণনা করার ইচ্ছা জাগে। এটা যে মিথ্যা ঘটনা তা সম্রাট নিজেই বুঝে নেবেন। আমি বললাম ঃ আমি তাঁর ব্যাপারটি আপনার কাছে বর্ণনা করছি। আপনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটি কি? আবূ সুফিয়ান বলল ঃ নবুয়তের এই দাবীদারের উক্তি এই যে, সে এক রাত্রিতে মক্কা মোকাররমা থেকে বের হয়ে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত পেঁৗছেছে এবং সে রাত্রেই প্রত্যুষের পূর্বে মক্কায় আমাদের কাছে ফিরে গেছে।

ইলিয়ার (বায়তুল মোকাদ্দাসের) সর্বপ্রধান যাজক ও পণ্ডিত তখন রোম সম্রাটের পেছনেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন ঃ আমি সে রাত্রি সম্পর্কে জানি। রোম সম্রাট তার দিকে ফিরলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি এ সম্পর্কে কিরূপে জানেন? সে বলল ঃ আমার অভ্যাস ছিল যে, বায়তুল মোকাদ্দাসের সব দরজা বন্ধ না করা পর্যন্ত আমি শয্যা গ্রহণ করতাম না। সে রাত্রে আমি অভ্যাস অনুযায়ী সব দরজা বন্ধ করে দিলাম, কিন্তু একটি দরজা আমার পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব হল না। আমি আমার কর্মচারীদের ডেকে আনলাম। তারা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা চালাল। কিন্তু দরজাটি তাদের পক্ষেও বন্ধ করা সম্ভব হল না। (দরজার কপাট স্বস্থান থেকে মোটেই নড়ছিল না)। মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোন পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগাচ্ছি। আমি অপারক হয়ে কর্মকার ও মিস্ত্রীদেরকে ডেকে আনলাম। তারা পরীক্ষা করে বলল ঃ কপাটের উপর দরজার প্রাচীরের বোঝা চেপে বসেছে। এখন ভোর না হওয়া পর্যন্ত দরজা বন্ধ করার কোন উপায় নেই। সকালে আমরা চেষ্টা করে দেখব, কি করা যায়। আমি বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম এবং দরজার কপাট খোলাই থেকে গেল। সকাল হওয়া মাত্র আমি সে দরজার নিকট উপস্থিত হয়ে দেখি যে, মসজিদের দরজার কাছে ছিদ্র করা একটি প্রস্তর খণ্ড পড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছিল যে, ওখানে কোন জন্তু বাঁধা হয়েছিল। তখন আমি সঙ্গীদেরকে বলেছিলাম ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ দরজাটি সম্ভবত একারণে বন্ধ হতে দেননি যে, কোন নবী এখানে আগমন করেছিলেন। অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন যে, ঐ রাত্রে তিনি আমাদের মসজিদে নামায পড়েন। অতঃপর তিনি আরও বিশদ বর্ণনা দিলেন।—(ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ২৪ পৃঃ)

ইসরা ও মি'রাজের তারিখ ঃ ইমাম কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেন ঃ মি'রাজের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। মূসা ইবনে ওকবার রেওয়ায়েত এই যে, ঘটনাটি হিজরতের ছয় মাস পূর্বে সংঘটিত হয়। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ হযরত খাদীজা (রা)-র ওফাত নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল। ইমাম যুহরী বলেন ঃ হযরত খাদীজা (রা.)-র ওফাত নবুয়তপ্রাপ্তির সাত বছর পরে হয়েছিল।

(সা)-র আমলে তারা তাঁর বিরোধিতা করলে পুনরায় নিহত, বন্দী ও লাঞ্ছিত হয়েছে। এটা হল ইহকালের শাস্তি এবং (পরকালে) আমি জাহান্নামকে (এমন) কাফিরদের জেলখানা করেই রেখেছি।

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ ইতিপূর্বেকার جَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ আয়াতে শরীয়তের বিধি-বিধান এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী অনুসরণের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এগুলোর বিরুদ্ধাচরণের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন ও সাবধান বাণী উচ্চারণের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আয়াতগুলোতে শিক্ষা ও উপদেশের জন্য বনী-ইসরাঈলের দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমবার আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হলে আল্লাহ্ তা'আলা শত্রুদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন। ওরা তাদেরকে চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়। এরপর তারা কিছুটা হুঁশিয়ার হলে এবং অনাচারের অভ্যাস কিছুটা কমে আসলে তাদের অবস্থার উন্নতি হয়। কিন্তু কিছু দিন পর আবার তাদের মধ্যে অনাচার ও কুকর্ম মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় শত্রুদের হাতে লাঞ্ছিত করেন। কোরআন পাকে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু ইতিহাসে এ ধরনের ছয়টি ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

প্রথম ঘটনা ঃ বর্তমান মসজিদে আকসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত সোলায়মান (আ)-এর ওফাতের কিছু দিন পরে সংশ্লিষ্ট প্রথম ঘটনাটি সংঘটিত হয়। বায়তুল মোকাদ্দাসের শাসনকর্তা ধর্মদ্রোহিতা ও কুকর্মের পথ অবলম্বন করলে মিসরের জনৈক সম্রাট তার উপর চড়াও হয় এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের স্বর্ণ ও রৌপ্যের আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়, কিন্তু নগরী ও মসজিদকে বিধ্বস্ত করেনি।

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ এর প্রায় চারশত বছর পর সংঘটিত হয় দ্বিতীয় ঘটনাটি। বায়তুল মোকাদ্দাসে বসবাসকারী কতিপয় ইহুদী মূর্তি পূজা শুরু করে দেয় এবং অবশিষ্টরা অনৈক্যের শিকার হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়। পরিণামে পুনরায় মিসরের জনৈক সম্রাট তাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং নগরী ও মসজিদ প্রাচীরেরও কিছুটা ক্ষতিসাধন করে। এরপর তাদের অবস্থার যৎকিঞ্চিত উন্নতি হয়।

তৃতীয় ঘটনা ঃ এর কয়েক বছর পর তৃতীয় ঘটনাটি সংঘটিত হয়, যখন বাবেল সম্রাট বুখতা নছর বায়তুল মোকাদ্দাস আক্রমণ করে এবং শহরটি পদানত করে প্রচুর ধনসম্পদ লুট করে নেয়। সে অনেক লোককে বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যায় এবং সাবেক সম্রাট পরিবারের জনৈক ব্যক্তিকে নিজের প্রতিনিধিরূপে নগরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে।

চতুর্থ ঘটনা ঃ এর কারণ এই যে, উপরোক্ত নতুন সম্রাট ছিল মূর্তিপূজক ও অনাচারী। সে বুখতা নছরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে বুখতা নছর পুনরায় বায়তুল মোকাদ্দাস আক্রমণ করে। এবার সে হত্যা ও লুটতরাজের চূড়ান্ত করে দেয়। আগুন লাগিয়ে সমগ্র শহরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। এ দুর্ঘটনাটি সোলায়মান (আ) কর্তৃক মসজিদ নির্মাণের প্রায় ৪১৫ বছর পর সংঘটিত হয়। এরপর ইহুদীরা এখান থেকে নির্বাসিত হয়ে বাবেলে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে চরম অপমান, লাঞ্ছনা ও দুর্গতির

মাঝে সত্তর বছর অতিবাহিত হয়। অতঃপর ইরান সম্রাট বাবেলেও চড়াও হয়ে বাবেল অধিকার করে নেয়। ইরান সম্রাট নির্বাসিত ইহুদীদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনরায় সিরিয়ায় পৌঁছে দেয় এবং তাদের লুন্ঠিত দ্রব্য-সামগ্রীও তাদের হাতে প্রত্যর্পণ করে। এ সময় ইহুদীরা নিজেদের কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং নতুনভাবে বসতি স্থাপন করে ইরান সম্রাটের সহযোগিতায় পূর্বের নমুনা অনুযায়ী মসজিদে আকসা পুনর্নির্মাণ করে।

পঞ্চম ঘটনা ঃ ইহুদীরা এখানে পুনরায় সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করে অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। তারা আবার ব্যাপকভাবে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-র জন্মের ১৭০ বছর পূর্বে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়। আন্তাকিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট ইহুদীদের উপর চড়াও হয়। সে চল্লিশ হাজার ইহুদীকে হত্যা এবং চল্লিশ হাজারকে বন্দী ও গোলাম বানিয়ে সঙ্গে নিয়ে যায়। সে মসজিদেরও অবমাননা করে, কিন্তু মসজিদের মূল ভবনটি রক্ষা পেয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে এ সম্রাটের উত্তরাধিকারীরা শহর ও মসজিদকে সম্পূর্ণ ময়দানে পরিণত করে দেয়। এর কিছু দিন পর বায়তুল মোকাদ্দাস রোম সম্রাটদের দখলে চলে যায়। তারা মসজিদের সংস্কার সাধন করে এবং এর আট বছর পর হযরত ঈসা (আ) দুনিয়াতে আগমন করেন।

ষষ্ঠ ঘটনা ঃ হযরত ঈসা (আ)-র সশরীরে আকাশে উত্থিত হওয়ার চল্লিশ বছর পর ষষ্ঠ ঘটনাটি ঘটে। ইহুদীরা রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে রোমকরা শহর ও মসজিদ পুনরায় বিধ্বস্ত করে পূর্বের ন্যায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। তখনকার সম্রাটের নাম ছিল তাইতিস। সে ইহুদীও ছিল না এবং খৃস্টানও ছিল না। কেননা তার অনেক দিন পর কনস্টানটাইন প্রথম খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। এরপর থেকে খলীফা হযরত ওমর (রা)-এর আমল পর্যন্ত মসজিদটি বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। হযরত ওমর (রা) এটি পুনর্নির্মাণ করান। এ ছয়টি ঘটনা তফসীরে হক্কানীর বরাত দিয়ে তফসীরে বয়ানুল কোরআনে লিখিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই ছয়টি ঘটনার মধ্যে কোরআনে উল্লিখিত দু'টি ঘটনা কোন্ গুলো? এর চূড়ান্ত ফয়সালা করা কঠিন। তবে বাহ্যত এগুলোর মধ্যে যে ঘটনাগুলো অধিক গুরুতর ও প্রধান এবং যেগুলোর মধ্যে ইহুদীদের নষ্টামিও অধিক হয়েছে এবং শাস্তিও কঠোরতর পেয়েছে, সেগুলোই বোঝা দরকার। বলা বাহুল্য, সেগুলো হচ্ছে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনা। তফসীরে কুরতুবীতে এ প্রসঙ্গে সাহাবী হযরত হোযায়ফার বাচনিক একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতেও নির্ধারিত হয় যে, এখানে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। দীর্ঘ হাদীসটির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

হযরত হোযায়ফা বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে আরয করলাম, বায়তুল মোকাদ্দাস আল্লাহ্ তা'আলার কাছে একটি বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ। তিনি বললেন ঃ দুনিয়ার সব গৃহের মধ্যে এটি একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মহান গৃহ। এটি আল্লাহ্ তা'আলা সোলায়মান ইবনে দাউদ (আ)-এর জন্য স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তা ইয়াকূত ও যমররদ দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন। সোলায়মান (আ) যখন এর নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন,

وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِي الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ
مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا
عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ
وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ
وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ۝ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ۗ
وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ۗ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْٓءٗا وُجُوْهَكُمْ
وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا
تَتْبِيْرًا ۝ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا
جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ۝

(৪) আমি বনী-ইসরাঈলকে কিতাবে পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীর বুকে দু'বার অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং অত্যন্ত বড় ধরনের অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে। (৫) অতঃপর যখন প্রতিশ্রুত সেই প্রথম সময়টি এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। অতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল। (৬) অতঃপর আমি তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুরিয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম। (৭) তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তাও নিজেদের জন্যই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এল, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকে ছিল এবং যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংস যজ্ঞ চালায়। (৮) হয়ত তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। কিন্তু যদি পুনরায় তদ্রূপ কর, আমিও পুনরায় তাই করব। আমি জাহান্নামকে কাফিরদের জন্য কয়েদখানা করেছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি বনী-ইসরাঈলকে (তওরাত অথবা ইসরাঈল বংশীয় অন্যান্য পয়গম্বরের সহীফা) গ্রন্থে একথা (ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে) বলে দিয়েছিলাম, যে তোমরা (শাম) দেশে দু'বার (প্রচুর গোনাহ্ করে) অনর্থ সৃষ্টি করবে [একবার মূসা (আ)-র শরীয়তের বিরোধিতা করে।] এবং অন্যদের উপরও খুব বল প্রয়োগ করতে থাকবে (অর্থাৎ অত্যাচার-উৎপীড়ন করবে لَتُفْسِدُنَّ বলে আল্লাহ্র হক নষ্ট করার প্রতি এবং لَتَعْلُنَّ বলে বান্দার হক নষ্ট করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একথাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, উভয়বার তোমরা ভীষণ আযাবে পতিত হবে)। অতঃপর যখন প্রথমবারের ওয়াদা আসবে, তখন আমি তোমাদের উপর এমন বান্দাদেরকে চাপিয়ে দেব, যারা অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় হবে। অতঃপর তারা (তোমাদের) গৃহসমূহে প্রবেশ করবে (এবং তোমাদেরকে হত্যা, বন্দী ও লুটতরাজ করবে)। এটা (শাস্তির এমন) এক ওয়াদা, যা অবশ্যই পূর্ণ হবে। অতঃপর (যখন তোমরা স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হবে এবং তওবা করবে, তখন) আমি পুনরায় ওদের উপর তোমাদেরকে প্রাধান্য দান করব (যদিও তা হবে পরোক্ষভাবে। অর্থাৎ যে জাতি তাদের বিরুদ্ধে প্রাধান্য লাভ করবে, তারা তোমাদের মিত্র হয়ে যাবে)। এভাবে তোমাদের শত্রু সে জাতির কাছে এবং তোমাদের কাছে পরাভূত হয়ে যাবে। এবং অর্থসম্পদ ও পুত্র-সন্তান দ্বারা (যেগুলো বন্দী ও লুট করা হয়েছিল) আমি তোমাদের সাহায্য করব অর্থাৎ এসব বস্তু-সামগ্রী তোমরা ফেরত পেয়ে যাবে। ফলে তোমরা শক্তিশালী হবে এবং আমি তোমাদের দল (অর্থাৎ অনুসারীদের)-কে বৃদ্ধি করব। (সুতরাং জাঁক-জমক, ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও অনুসারী সব কিছুতেই উন্নতি হবে। আর সে গ্রন্থে এ উপদেশও লিখেছিলাম যে) যদি (ভবিষ্যতে) ভাল কাজ কর, তবে নিজেদের উপকারার্থেই তা করবে (অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালে এর উপকার পাবে) এবং যদি (পুনরায়) তোমরা মন্দ কাজ কর তবে, তাও নিজেদের জন্যই করবে। (অর্থাৎ আবার শাস্তি ভোগ করবে। সেমতে তাই হয়েছে। যেমন, অতঃপর বর্ণনা করা হয়েছে যে) এরপর যখন (উপরোক্ত দু'বার অনর্থ সৃষ্টির মধ্য থেকে) শেষবারের সময় আসবে [তখন তোমরা ঈসা (আ)-র শরীয়তের বিরোধিতা করবে] তখন আমি পুনরায় তোমাদের উপর অপরকে জয়ী করে দেব, যাতে (তারা পিটিয়ে) তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেয় এবং যেভাবে তারা (পূর্ববর্তী লোকেরা বায়তুল মোকাদ্দাসের) মসজিদে (লুটতরাজ করতে করতে) ঢুকেছিল, এরাও (অর্থাৎ পরবর্তী লোকেরাও) তাতে ঢুকে পড়বে এবং যে বস্তু তাদের হস্তগত হবে সেগুলোকে (ধ্বংস ও) বরবাদ করে দেবে। [এবং সে গ্রন্থে একথাও লিখেছিলাম যে, এই দ্বিতীয়বারের পর যখন মুহাম্মদ (সা)-এর আমল আসবে, তখন তোমরা বিরোধিতা ও অবাধ্যতা না করে তাঁর শরীয়তের অনুসরণ কর। তাতে] আশ্চর্য নয় (অর্থাৎ ওয়াদার অর্থে আশা রয়েছে) যে, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি রহমত করবেন (এবং তোমাদেরকে পুনরায় অপমানের হাত থেকে মুক্তি দেবেন) এবং যদি তোমরা পুনরায় সে (অপ) কর্ম কর, তবে আমিও পুনরায় সে (শাস্তি) ব্যবহার করব। (সুতরাং রসূলুল্লাহ্

কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে, মি'রাজের ঘটনা নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পরে ঘটেছে। ইবনে ইসহাক বলেন : মি'রাজের ঘটনা তখন ঘটেছিল, যখন ইসলাম আরবের সাধারণ গোত্রসমূহে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এ সব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, মি'রাজের ঘটনাটি হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

হরবী বলেন : ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা রবিউসসানী মাসের ২৭ তম রাত্রিতে হিজরতের এক বছর পূর্বে ঘটেছে। ইবনে কাসেম সাহাবী বলেন : নবুয়তপ্রাপ্তির আঠার মাস পর এ ঘটনা ঘটেছে। মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ করার পরে কোন সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেন নি। কিন্তু সাধারণভাবে খ্যাত এই যে, রজব মাসের ২৭তম রাত্রি মি'রাজের রাত্রি। والله سبحانه اعلم

মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসা : হযরত আবূযর গিফারী (রা) বলেন : আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম : বিশ্বের সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? তিনি বললেন : মসজিদে হারাম। অতঃপর আমি আরয করলাম : এরপর কোনটি? তিনি বললেন : মসজিদে আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম : এতদুভয়ের নির্মাণের মধ্যে কত দিনের ব্যবধান রয়েছে? তিনি বললেন : চল্লিশ বছর। তিনি আরও বললেন : এ তো হচ্ছে মসজিদদ্বয়ের নির্মাণক্রম। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকেই মসজিদ করে দিয়েছেন। যেখানে নামাযের সময় হয়, সেখানেই নামায পড়ে নাও।—(মুসলিম)

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল্লাহ্র স্থানকে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং এর ভিত্তি স্তর সপ্তম যমীনের অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। মসজিদে আকসা হযরত সোলায়মান (আ) নির্মাণ করেছেন।—(নাসায়ী, তফসীর কুরতুবী, ১২৭ পৃ, ৪র্থ খণ্ড)

বায়তুল্লাহ্র চারপাশে নির্মিত মসজিদকে মসজিদে হারাম বলা হয়। মাঝে মাঝে সমগ্র হরমকেও মসজিদে হারাম বলে দেওয়া হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে দু'টি রেওয়ায়েতের এ বৈপরিত্যও দূর হয়ে যায় যে, এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হযরত উম্মে হানীর গৃহ থেকে ইসরার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে কা'বার হাতীম থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে। মসজিদে হারামের শেষোক্ত অর্থ নেওয়া হলে এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি প্রথমে উম্মে হানীর গৃহে ছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে কা'বার হাতীমে আগমন করেন এবং সেখান থেকে সফরের সূচনা হয়। والله اعلم

মসজিদে আকসা ও সিরিয়ার বরকত : আয়াতে بَارَكْنَا حَوْلَهُ বলা হয়েছে। এখানে حول বলে সমগ্র সিরিয়াকে বুঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা আরশ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত বরকতময় ভূ-পৃষ্ঠকে বিশেষ পবিত্রতা দান করেছেন।—(রূহুল মা'আনী)

এর বরকতসমূহ দ্বিবিধ ঃ ধর্মীয় ও জাগতিক। ধর্মীয় বরকত এই যে, এ ভূ-ভাগটি পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের কেবলা, বাসস্থান এবং সমাধিস্থান। জাগতিক বরকত হচ্ছে যে, এর উর্বর ভূমি, অসংখ্য ঝরণা ও বহমান নদ-নদী এবং অফুরন্ত ফল-ফসলের বাগানাদি। বিভিন্ন ধরনের সুমিষ্ট ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটির তুলনা সত্যই বিরল।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রেওয়ায়েতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, হে শাম ভূমি! শহরসমূহের মধ্যে তুমি আমার মনোনীত ভূ-ভাগ। আমি তোমার কাছেই স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে পৌঁছে দেব। —(কুরতুবী) মসনদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, দাজ্জাল সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করবে, কিন্তু চারটি মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না—(১) মদীনার মসজিদ (২) মক্কার মসজিদ (৩) মসজিদে আকসা এবং (৪) মসজিদে তূর।

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ۝ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝

(২) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং সেটিকে বনী ইসরাঈলের জন্য হিদায়েতে পরিণত করেছি যে, তোমরা আমাকে ছাড়া কাউকে কার্যনির্বাহী স্থির করো না। (৩) তোমরা তাদের সন্তান, যাদেরকে আমি নূহের সাথে সওয়ার করিয়েছিলাম। নিশ্চয় সে ছিল কৃতজ্ঞ বান্দা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি মূসা (আ)-কে (তওরাত) গ্রন্থ দিয়েছি এবং আমি সেটিকে বনী-ইসরাঈলের জন্য হিদায়েত (অর্থাৎ হিদায়তের উপায়) করেছি (তাতে অন্যান্য বিধানসহ তওহীদের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধানও ছিল) যে, তোমরা আমাকে ছাড়া (নিজেদের) কোন কার্যনির্বাহী স্থির করো না। হে সেই সব লোকের বংশধরেরা, যাদেরকে আমি নূহ (আ)-র সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম, (আমি তোমাদেরকে বলছি, যাতে সে নিয়ামতের কথা স্মরণ করে। আমি যদি তাদেরকে নৌকায় আরোহণ করিয়ে রক্ষা না করতাম, তবে কিরূপে আজ তোমরা তাদের বংশধর হতে? নিয়ামতটি স্মরণ করে তার শোকর কর এবং শোকরের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে তওহীদ। আর নূহ (আ) খুবই শোকর-গুযার বান্দা ছিলেন। (সুতরাং পয়গম্বরগণ যখন শোকর করেছেন, তখন তোমরা তা কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পার)?

তখন আল্লাহ্ তা'আলা জিনদের তাঁর আজ্ঞাবহ করে দেন। জিনরা এসব মণি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য সংগ্রহ করে মসজিদ নির্মাণ করে। হযরত হোযায়ফা বললেন : আমি আরয করলাম, এরপর বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে মণি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য কোথায় এবং কিভাবে উধাও হয়ে গেল? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : বনী ইসরাঈলরা যখন আল্লাহর নাফরমানী করে, গোনাহ্ ও কুকর্মে লিপ্ত হল এবং পয়গম্বরগণকে হত্যা করল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঘাড়ে বুখতা নছরকে চাপিয়ে দিলেন। বুখতা নছর ছিল অগ্নি উপাসক। সে সাতশ' বছর বায়তুল মোকাদ্দাস শাসন করে। কোরআন পাকের فَاِذَا جَاۤءَ وَعْدُ اُولٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَاۤ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ আয়াতে এ ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। বুখতা নছরের সৈন্যবাহিনী মসজিদে আকসায় ঢুকে পড়ে, পুরুষদের হত্যা, মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের সমস্ত ধনসম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণি-মুক্তা এক লক্ষ সত্তর হাজার গাড়িতে বহন করে নিয়ে যায় এবং স্বদেশ বাবেলে সংরক্ষিত রাখে। সে বনী ইসরাঈলকে একশ' বছর পর্যন্ত লাঞ্ছনা সহকারে নানারকম কষ্টকর কাজে নিযুক্ত করে রাখে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরানের এক সম্রাটকে তার মুকাবেলার জন্য তৈরী করে দেন। সে বাবেল জয় করে এবং অবশিষ্ট বনী ইসরাঈলকে বুখতা নছরের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে। বুখতা নছর যেসব ধনসম্পদ বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে নিয়ে গিয়েছিল, ইরানী বাদশাহ্ সেগুলোও বায়তুল মোকাদ্দাসে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেন, যদি তোমরা আবারও নাফরমানী কর এবং গোনাহ্র দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও পুনরায় হত্যা ও বন্দীত্বের আযাব তোমাদের উপর চাপিয়ে দেব। আয়াত عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا বলে একথাই বোঝানো হয়েছে।

বনী ইসরাঈলরা যখন বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিরে এল এবং সমস্ত ধনসম্পদ ও আসবাবপত্র তাদের হস্তগত হয়ে গেল, তখন আবারও পাপ ও কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা রোম সম্রাটকে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। فَاِذَا جَاۤءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْۤءٗا وُجُوْهَكُمْ আয়াতে এ ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। রোম সম্রাট জলে ও স্থলে উভয় ক্ষেত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করে অগণিত লোককে হত্যা ও বন্দী করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের সমস্ত ধনসম্পদ এক লক্ষ সত্তর হাজার গাড়িতে বোঝাই করে নিয়ে যায়। এসব ধনসম্পদ রোমের স্বর্ণ মন্দিরে এখনো পর্যন্ত সংরক্ষিত রয়েছে এবং থাকবে। শেষ যমানায় হযরত মাহ্দী আবির্ভূত হয়ে এগুলোকে আবার এক লক্ষ সত্তর হাজার নৌকা বোঝাই করে বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিরিয়ে আনবেন

এবং এখানেই আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষকে একত্র করবেন। (এ দীর্ঘ হাদীসটি কুরতুবী স্বীয় তফসীরে উদ্ধৃত করেছেন)।

বয়ানুল কোরআনে বলা হয়েছে, কোরআনে উল্লিখিত ঘটনাদ্বয়ের অর্থ দুইটি শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ। এক. মূসা (আ)-র শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ এবং দুই. ঈসা (আ)-র নবুয়ত লাভের পর তাঁর শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ। উপরোল্লিখিত ঘটনাবলী প্রথমে বিরুদ্ধাচরণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ঘটনাবলীর বিবরণের পর আলোচ্য আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত ঘটনাবলীর সারমর্ম এই যে, বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালা ছিল এই ঃ তারা যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্র আনুগত্য করবে, ততদিন ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষেত্রে কৃতকার্য ও সফলকাম থাকবে এবং যখনই ধর্মের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়বে, তখনই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং শত্রুদের হাতে পিটুনি খাবে। শত্রুরা তাদের উপর প্রবল হয়ে শুধু তাদের জান ও মালেরই ক্ষতি করবে না, বরং তাদের পরম প্রিয় কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসও শত্রুর কবল থেকে নিরাপদ থাকবে না। তাদের কাফির শত্রু বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদে ঢুকে এর অবমাননা করবে এবং একে পর্যুদস্ত করে ফেলবে। এটাও হবে বনী ইসরাঈলের শাস্তির একটি অংশবিশেষ। কোরআন পাক তাদের দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছে। প্রথম ঘটনা মূসা (আ)-র শরীয়ত চলাকালীন এবং দ্বিতীয় ঘটনা ঈসা (আ)-র আমলের। উভয় ক্ষেত্রেই বনী ইসরাঈল সমকালীন শরীয়তের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। ফলে প্রথম ঘটনায় জনৈক অগ্নিপূজক সম্রাটকে তাদের উপর এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। সে অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা চালায়। দ্বিতীয় ঘটনায় জনৈক রোম সম্রাটকে তাদের উপর চাপানো হয়। সে হত্যা ও লুটতরাজ করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসকে বিধ্বস্ত মৃত্যুর পুরীতে পরিণত করে দেয়। সাথে সাথে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উভয়ক্ষেত্রে বনী ইসরাঈলরা যখন স্বীয় কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দেশ, ধনসম্পদ এবং জনবল ও সন্তান-সন্ততিকে পুনর্বহাল করে দেন।

এ ঘটনাদ্বয় উল্লেখ করার পর পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা এসব ব্যাপারে স্বীয় বিধি বর্ণনা করে বলেছেন ঃ وَإِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا — অর্থাৎ তোমরা পুনরায় নাফরমানীর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে আমিও পুনরায় এমনি ধরনের শাস্তি ও আযাব চাপিয়ে দেব। বর্ণিত এ বিধিটি কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এতে বনী ইসরাঈলের সেসব লোককে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে বিদ্যমান ছিল। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রথমবার মূসা (আ)-র শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে এবং দ্বিতীয় বার ঈসা (আ)-র শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে যেভাবে তোমরা শাস্তি

النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ
الْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۝ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ
طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝
اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝ مَّنِ اهْتَدَىٰ
فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ
وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝

(১২) আমি রাত্রি ও দিনকে দু'টি নিদর্শন করেছি। অতঃপর নিষ্প্রভ করে দিয়েছি রাতের নিদর্শন এবং দিনের নিদর্শনকে দেখার উপযোগী করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা স্থির করতে পার বছরসমূহের গণনা ও হিসাব এবং আমি সব বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। (১৩) আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কিয়ামতের দিন বের করে দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। (১৪) পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট। (১৫) যে কেউ সৎ পথে চলে, তারা নিজের মঙ্গলের জন্যই সৎ পথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কোন রসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি রাত ও দিনকে স্বীয় কুদরতের নিদর্শন করেছি। অতঃপর রাতের নিদর্শন (অর্থাৎ স্বয়ং রাত্রি)-কে আমি নিষ্প্রভ করে দিয়েছি এবং দিনের নিদর্শনকে উজ্জ্বল করেছি (যেন এতে যাবতীয় বস্তুসামগ্রী সহজেই দেখা যায়), যাতে (তোমরা দিনের বেলায়) পালনকর্তার রুষী অন্বেষণ কর এবং (দিবারাত্রির গমনাগমন, উভয়ের রঙের পার্থক্য—একটি উজ্জ্বল ও অপরটি অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং উভয়ের পরিমাণের বিভিন্নতা দ্বারা) বছরসমূহের গণনা এবং (অন্যান্য ছোটখাট) হিসাব জেনে নাও। (যেমন সূরা ইউনুসের প্রথম রুকূতে বর্ণিত হয়েছে)। আমি প্রত্যেক বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। (লওহে মাহ্ফূযে সমগ্র সৃষ্টবস্তুর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ কোন রকম ব্যতিক্রম ছাড়াই লিপিবদ্ধ রয়েছে। কোরআন পাকেও প্রয়োজনীয় বিবরণ রয়েছে। কাজেই এ বর্ণনা উভয়টির সাথেই সম্পর্কযুক্ত হতে পারে)। এবং আমি প্রত্যেক (আমলকারী) মানুষের আমলকে (সৎ হোক কিংবা অসৎ) তার গলার হার বানিয়ে রেখেছি (অর্থাৎ প্রত্যেক আমল তার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত)।

এবং (অতঃপর) আমি কিয়ামতের দিন তার আমলনামা তার (দেখার) জন্য বের করে সামনে দেব, যা সে উম্মুক্ত অবস্থায় দেখবে। (এবং তাকে বলা হবে যে) নিজের আমলনামা (নিজেই) পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাব পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট। (অর্থাৎ তোমার আমল অন্য কেউ গণনা করবে, এর প্রয়োজন নেই, বরং তুমি নিজেই নিজের আমলনামা পড়ে যাও এবং হিসাব করে যাও যে, তোমার কি পরিমাণ শাস্তি ও প্রতিদান হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য এই যে, এখনও আযাব সামনে না এলেও তা টলবে না। এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ নিজের সব কাজকর্ম খোলা চোখে দেখতে পাবে এবং আযাবের যুক্তিযুক্ত প্রমাণ তার বিরুদ্ধে কায়েম হয়ে যাবে এবং) যে ব্যক্তি (দুনিয়ার সোজা) সরল পথে চলে, সে নিজের উপকারার্থেই চলে এবং যে ব্যক্তি বিপথগামী হয় সে-ও নিজেরই ক্ষতির জন্য বিপথগামী হয়। (সে তখন এর সাজা ভোগ করবে। এতে অন্যের কোন ক্ষতি নেই। কেননা, আমার আইন এই যে) কারও (পাপের) বোঝা অন্য কেউ বহন করবে না (এবং যাকে কোন শাস্তি দেওয়া হয়, তা তার কাছে সপ্রমাণ করার পর দেওয়া হয়। কেননা, আমার আইন এই যে) আমি (কখনও) শাস্তি দান করি না, যে পর্যন্ত না (তার হিদায়তের জন্য) কোন রসূল প্রেরণ না করি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহকে প্রথমে দিবারাত্রির পরিবর্তনকে আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিনকে উজ্জ্বল করার মধ্যে বহুবিধ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করার তাৎপর্য এখানে বর্ণনা করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাত্রির অন্ধকার নিদ্রা ও আরামের জন্য উপযুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, রাত্রির অন্ধকারেই প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর ঘুম আসে। সমগ্র জগত একই সময়ে ঘুমায়। যদি বিভিন্ন লোকের ঘুমের জন্য বিভিন্ন সময় নির্ধারিত থাকত, তবে জাগ্রতদের হট্টগোলে ঘুমন্তদের ঘুমেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হত।

এখানে দিনকে ঔজ্জ্বল্যময় করার দু'টি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। এক. দিনের আলোতে মানুষ রুযী অন্বেষণ করতে পারে। মেহনত, মজুরি, শিল্প ও কারিগরি সব কিছুর জন্য আলো অত্যাবশ্যক। দুই. দিবারাত্রির গমনাগমনের দ্বারা সন-বছরের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। উদাহরণত ৩৬০ দিন পূর্ণ হলে একটি সন পূর্ণতা লাভ করে।

এমনিভাবে অন্যান্য হিসাব-নিকাশও দিবারাত্রির গমনাগমনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দিবারাত্রির এই পরিবর্তন না হলে মজুরের মজুরি, চাকুরের চাকুরি এবং লেন-দেনের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা সুকঠিন হয়ে যাবে।

আমলনামা গলার হার হওয়ার মর্মার্থ : মানুষ যে কোন জায়গায় যে কোন অবস্থায় থাকুক, তার আমলনামা তার সাথে থাকে এবং তার আমল লিপিবদ্ধ হতে থাকে। মৃত্যুর পর তা বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়। কিয়ামতের দিন এ আমলনামা প্রত্যেকের হাতে হাতে দিয়ে দেওয়া হবে, যাতে নিজে পড়ে নিজেই মনে মনে ফয়সালা করে নিতে পারে যে, সে পুরস্কারের

নাম অথবা কোন বিশেষ বর্ণনা করার পরিবর্তে শুধু عبد (বান্দা) বলে ব্যক্ত করেছে যে, মানুষের সর্বশেষ উৎকর্ষ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক তাকে বান্দা বলে আখ্যায়িত করা। বনী ইসরাঈলকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যেসব লোককে ব্যবহার করা হয়েছিল, তারা ছিল কাফির। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে عبادنا শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার পরিবর্তে اضافت তথা সম্বন্ধ পদ পরিহার করে عِبَادًا لَّنَا বলেছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৃষ্টিগতভাবে তো সমগ্র মানবমণ্ডলীই আল্লাহ্র বান্দা; কিন্তু ঈমান ব্যতীত প্রিয় বান্দা হয় না যে, তাদের اضافت তথা সম্বন্ধ আল্লাহ্র দিকে হতে পারে।

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝

---

(৯) এই কোরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে। (১০) এবং যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি। (১১) মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে, সেইভাবেই অকল্যাণ কামনা করে। মানুষ তো খুবই দ্রুততাপ্রিয়।

পূর্বাপর সম্পর্ক : সূরার প্রারম্ভে মি'রাজের মু'জিযার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালত প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে কোরআনের মু'জিযার মাধ্যমে তা প্রমাণ করা হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় কোরআন এমন পথ নির্দেশ করে, যা সম্পূর্ণ সরল (অর্থাৎ ইসলাম) এবং এ পথ মান্যকারী ও অমান্যকারীদের প্রতিদান ও শাস্তিও ব্যক্ত করে) সৎ কর্ম সম্পাদনকারী মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তারা বিরাট সওয়াব পাবে এবং আরও বলে যে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি। কিন্তু মানুষ (যেমন, কাফিররা) অমঙ্গলের (অর্থাৎ আযাবের) এমন দোয়া করে, যেমন মঙ্গলের দোয়া (করা হয়)। মানুষ (স্বভাবতই) কিছুটা দ্রুততাপ্রিয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

'আকওয়াম' পথ: কোরআন পাক যে পথ নির্দেশ করে, তাকে 'আকওয়াম' বলা হয়েছে। 'আকওয়াম' সে পথ, যা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে নিকটবর্তী, সহজ এবং বিপদাপদমুক্তও।—(কুরতুবী) এ থেকে বোঝা গেল যে, কোরআন পাক মানব-জীবনের জন্য যেসব বিধি-বিধান দান করে, সেগুলোতে এ তিনটি গুণই বিদ্যমান রয়েছে। যদিও মানুষ স্বল্পবুদ্ধির কারণে মাঝে মাঝে এ পথকে দুর্গম ও বিপদসংকুল মনে করতে থাকে; কিন্তু রাব্বুল আলামীন সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে সমান। একমাত্র তিনিই এ সত্য জানতে পারেন যে, মানুষের উপকার কোন কাজে ও কিভাবে বেশি। স্বয়ং মানুষ যেহেতু সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, তাই সে নিজের ভাল-মন্দও পুরোপরি জানতে পারে না।

সম্ভবত এদিকে লক্ষ্য রেখেই আলোচ্য আয়াতসমূহের সর্বশেষ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ তো মাঝে মাঝে তাড়াহুড়া করে নিজের জন্য এমন দোয়া করে বসে, যা পরিণামে তার জন্য ধ্বংস ও বিপর্যয় ডেকে আনে। আল্লাহ্ তা'আলা এমন দোয়া কবূল করে নিলে সে নিশ্চিতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা অধিকাংশ সময় এমন দোয়া তাৎক্ষণিকভাবে কবূল করেন না। শেষ পর্যন্ত মানুষ নিজেই বুঝতে পারে যে, তার এ দোয়া ভ্রান্ত এবং তার জন্য ভীষণ ক্ষতিকর ছিল। আয়াতের সর্বশেষ বাক্যে মানুষের একটি স্বভাবগত দুর্বলতা বিধির আকারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ স্বভাবের তাড়নায়ই দ্রুততাপ্রিয়। সে বাহ্যিক লাভ-লোকসানের দিকে দৃষ্টি রাখে, অথচ পরিণাম-দর্শিতায় ভুল করে; তাৎক্ষণিক সুখ অল্প হলেও তাকে বড় ও স্থায়ী সুখের উপর অগ্রাধিকার দান করে। এ বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, আলোচ্য আয়াতে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা বর্ণিত হয়েছে।

কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতটিকে একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনাটি এই যে, নযর ইবনে হারেস একবার ইসলামের বিরোধিতায় দোয়া করে বসে যে,

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -

অর্থাৎ হে আল্লাহ্, যদি আপনার কাছে ইসলামই সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রেরণ করুন। এমতাবস্থায় 'ইনসান' শব্দ দ্বারা এই বিশেষ ব্যক্তি অথবা তার সমস্বভাবযুক্তদের বুঝাতে হবে।

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ

ও আযাবে পতিত হয়েছিলে, এখন তৃতীয় যুগ হচ্ছে শরীয়তে-মুহাম্মদীর যুগ যা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এর বিরুদ্ধাচরণ করলেও তোমাদেরকে পূর্বের পরিণতিই ভোগ করতে হবে। আসলে তাই হয়েছে। তারা শরীয়তে-মুহাম্মদী ও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হলে মুসলমানদের হাতে নির্বাসিত লাঞ্ছিত ও অপমানিত তো হয়েছেই, শেষ পর্যন্ত তাদের পবিত্র কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসও মুসলমানদের করতলগত হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, পূর্ববর্তী সম্রাটরা তাদেরকেও অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছিল এবং তাদের পবিত্র কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসেরও অবমাননা করেছিল। কিন্তু মুসলমানরা বায়তুল মোকাদ্দাস জয় করার পর শত শত বছর যাবত বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত মসজিদটি নতুনভাবে পুনর্নির্মাণ করেন এবং পয়গম্বরগণের এ কিবলার যথাযথ সম্মান পুনর্বহাল করেন।

বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী মুসলমানদের জন্য শিক্ষাপ্রদ ॥ বায়তুল মোকাদ্দাসের বর্তমান ঘটনা, এ ঘটনা পরম্পরার একটি অংশ ঃ বনী ইসরাঈলদের এসব ঘটনা কোরআন পাকে বর্ণনা করা এবং মুসলমানদেরকে শোনানোর উদ্দেশ্য বাহ্যত এই যে, মুসলমানগণ এ আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি-ব্যবস্থা থেকে আলাদা নয়। তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব সম্মান, শান-শওকত, অর্থসম্পদ ও আল্লাহ্র আনুগত্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন তারা আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, তখন তাদের শত্রু ও কাফির-দেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, তাদের হাতে তাদের উপাসনালয় ও মসজিদ-সমূহেরও অবমাননা হবে।

সাম্প্রতিককালে বায়তুল মোকাদ্দাসের উপর ইহুদীদের অধিকার এবং তাতে অগ্নি-সংযোগের হৃদয়বিদারক ঘটনা সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে উদ্বেগাকুল করে রেখেছে। সত্য বলতে কি, এতে করে কোরআনের উপরোক্ত বক্তব্যেরই সত্যায়ন হচ্ছে। মুসলমানগণ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে বিস্মৃত হয়েছে, পরকাল থেকে গাফিল হয়ে পার্থিব শান-শওকতে মনোনিবেশ করেছে এবং কোরআন ও সুন্নাহ্র বিধি-বিধান থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে নিয়েছে। ফলে আল্লাহ্র কুদরতের সেই বিধানই আত্মপ্রকাশ করেছে যে, কোটি কোটি আরবের বিরুদ্ধে কয়েক লাখ ইহুদী যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। তারা আরবদের ধনসম্পদের বিস্তর ক্ষতি সাধান করেছে এবং ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে বিশ্বের তিনটি শ্রেষ্ঠতম মসজিদের একটি মসজিদ—যা সব সময়ই পয়গম্বরগণের কিবলা ছিল—আরবদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। যে জাতি বিশ্বে সর্বাধিক ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত বলে গণ্য হত, আজ সে ইহুদী জাতিই আরবদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তদুপরি দেখা যায়, এ জাতি সংখ্যায় মুসলমানদের মুকাবিলায় কোন ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না এবং মুসল-মানদের সমষ্টিগত সমরাস্ত্রের মুকাবিলায়ও ওদের কোন গুরুত্ব নেই। এতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, এ ঘটনাটি ইহুদীদেরকে কোন সম্মানের আসন দান করে না। তবে এটা মুসলমানদের অবাধ্যতার শাস্তি অবশ্যই। এ থেকে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে যে, যা কিছু ঘটেছে, তা আমাদের কুকর্মের শাস্তি হিসাবেই ঘটেছে। এর একমাত্র প্রতিকার হিসাবে যদি আমরা স্বীয় দুষ্কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে খাঁটি মনে তওবা করি, আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করি, সাচ্চা মুসলমান হয়ে যাই, বিজাতির অনুকরণ

ও বিজাতির উপর ভরসা করা থেকে বিরত হই, তবে ওয়াদা অনুযায়ী ইনশাআল্লাহ্ বায়তুল মোকাদ্দাস ও ফিলিস্তীন আবার আমাদের অধিকারভুক্ত হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজকালকার আরব শাসকবর্গ এবং সেখানকার মুসলমান জনগণ এখনও এ সত্য অনু-ধাবন করতে সক্ষম হয়নি। তারা এখন বিজাতির সাহায্যের উপর ভরসা করে বায়তুল মোকাদ্দাস উদ্ধার করার পরিকল্পনা ও নকশা তৈরী করছে। অথচ বাহ্যত এর কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। فا لله ا لمشتكى

যে অস্ত্র-শস্ত্র ও সমরোপকরণ দ্বারা বায়তুল মোকাদ্দাস ও ফিলিস্তীন পুনরায় মুসল-মানদের অধিকারে আসতে পারে, তা হচ্ছে শুধু আল্লাহ্‌র প্রতি প্রত্যাবর্তন, পরকালে বিশ্বাস, শরীয়তের বিধি-বিধানের অনুসরণ, নিজেদের সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনীতিতে বিজাতির উপর ভরসা ও তাদের অনুকরণ থেকে আত্মরক্ষা এবং পুনরায় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে খাঁটি ইসলামী জিহাদ। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের আরব শাসকবর্গকে এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকে এর তওফীক দান করুন।

একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠে ইবাদতের জন্য দু'টি স্থানকে ইবাদতকারীদের কেবলা করেছেন। একটি বায়তুল মোকাদ্দাস আর অপরটি বায়তুল্লাহ্। কিন্তু আল্লাহ্‌র আইন উভয় ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। বায়তুল্লাহ্‌র রক্ষণাবেক্ষণ এবং কাফিরদের হাত থেকে একে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। এরই পরিণতি হস্তী বাহিনীর সে ঘটনা, যা কোরআন পাকের সূরা ফীলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়ামানের খৃস্টান বাদশাহ্ বায়তুল্লাহ্ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অভিযান করলে আল্লাহ্ তা'আলা বিরাট হস্তী বাহিনীসহ তাকে বায়তুল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বেই পাখীদের মাধ্যমে বিধ্বস্ত ও বরবাদ করে দেন।

কিন্তু বায়তুল মোকাদ্দাসের ক্ষেত্রে এ আইন নেই। বরং আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, মুসলমানরা যখন পথভ্রষ্টতা ও গোনাহে লিপ্ত হবে, তখন শাস্তি হিসাবে তাদের কাছ থেকে এ কিবলাও ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং কাফিররা এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে।

কাফির আল্লাহ্‌র বান্দা, কিন্তু প্রিয় বান্দা নয় ঃ উল্লিখিত প্রথম ঘটনায় কোরআন পাক বলেছে, আল্লাহ্‌র দীনের অনুসারীরা যখন ফিতনা ও ফাসাদে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর এমন বান্দাদেরকে চাপিয়ে দেবেন, যারা তাদের ঘরে প্রবেশ করে তাদের উপর হত্যা ও লুটতরাজ চালাবে। এ স্থলে কোরআন পাক عِبَادًا لَّنَا শব্দ ব্যবহার করেছে— عِبَادُنَا বলেনি। অথচ এটাই ছিল সংক্ষিপ্ত। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্‌র দিকে কোন বান্দার সম্বন্ধ হয়ে যাওয়া তার জন্য পরম সম্মানের বিষয়। যেমন, এ সূরার প্রারম্ভে أَسْرَىٰ بِعَبْدِهٖ -এর অধীনে এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, শবে মি'রাজে রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সম্মান ও অসাধারণ নৈকট্য লাভ করেছিলেন। কোরআন পাক এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র

যোগ্য, না আযাবের যোগ্য। হযরত কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত আছে, সেদিন লেখাপড়া না জানা ব্যক্তিও আমলনামা পড়ে ফেলবে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইস্পাহানী হযরত আবূ উমামার একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: কিয়ামতের দিন কোন কোন লোকের আমলনামা যখন তাদের হাতে দেওয়া হবে, তখন তারা নিজেদের কিছু কিছু সৎ কর্ম তাতে অনুপস্থিত দেখে আরয করবে: পরওয়ারদিগার! এতে আমার অমুক অমুক সৎ কর্ম লেখা হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে উত্তর হবে: —আমি সে সব সৎ কর্ম নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। কারণ, তোমরা অন্যদের গীবত করতে।—(মাযহারী)

পয়গম্বর প্রেরণ ব্যতীত আযাব না হওয়ার ব্যাখ্যা: এ আয়াতদৃষ্টে কোন কোন ফিকাহ্বিদের মতে যাদের কাছে কোন নবী ও রসূলের দাওয়াত পৌঁছেনি কাফির হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোন আযাব হবে না। কোন কোন ইমামের মতে ইসলামের যেসব আকীদা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বোঝা যায়। যেমন, আল্লাহ্র অস্তিত্ব, তওহীদ প্রভৃতি—সেগুলো যারা অস্বীকার করে, কুফরের কারণে তাদের আযাব হবে; যদিও তাদের কাছে নবী ও রসূলের দাওয়াত না পৌঁছে থাকে। তবে পয়গম্বরগণের দাওয়াত ও তবলীগ ব্যতীত সাধারণ গোনাহ্র কারণে আযাব হবে না। কেউ কেউ এখানে রসূল শব্দের ব্যাপক অর্থ নিয়েছেন। রসূল ও নবী অথবা তাদের কোন প্রতিনিধিও হতে পারেন কিংবা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও হতে পারে। কেননা, বিবেক-বুদ্ধিও এক দিক দিয়ে আল্লাহ্র রসূল বটে।

মুশরিকদের সন্তান-সন্ততির আযাব হবে না: لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَىٰ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীর মাযহারীতে লেখা রয়েছে, এতে প্রমাণিত হয় যে, মুশরিক ও কাফিরদের যেসব সন্তান বালেগ হওয়ার পূর্বে মারা যায়, তাদের আযাব হবে না। কেননা, পিতামাতার কুফরের কারণে তারা শাস্তির যোগ্য হবে না। এ প্রশ্নে ফিকাহ্বিদের উক্তি বিভিন্নরূপ। এর বিস্তারিত বিবরণ এখানে অনাবশ্যক।

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنۢ بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا ﴿١٧﴾

(১৬) যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার অবস্থাপন্ন লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করি অতঃপর তারা পাপাচারে মেতে উঠে। তখন সে জনগোষ্ঠীর নূহের পর আমি অনেক উম্মতকে ধ্বংস করেছি। আপনার পালনকর্তাই বান্দাদের পাপাচারের সংবাদ জানা ও দেখার জন্যে যথেষ্ট।

পূর্বাপর সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছিল যে, যে পর্যন্ত পয়গম্বরগণের মাধ্যমে কোন সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহ্ তা'আলার হিদায়ত সম্বলিত বাণী না পৌঁছাত

এবং এরপরও তারা আনুগত্য প্রকাশ না করত, সে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি আযাব প্রেরণ করতেন না। এটা আল্লাহ্র চিরন্তন রীতি। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর বিপরীত দিকটি বিধৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্র রসূল ও তাঁর পয়গম্বর পৌঁছে যাওয়ার পর যখন কোন সম্প্রদায় অবাধ্য আচরণ প্রদর্শন করে, তখন সে সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যাপক-ভাবে আযাব প্রেরণ করা হয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন আমি কোন জনপদকে (যা কুফরী ও অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ্র রহস্যের তাগিদ অনুযায়ী ধ্বংস করার যোগ্য হয়) ধ্বংস করতে চাই, তখন সেদিকে পয়গম্বর প্রেরণের পূর্বে ধ্বংস করি না, (বরং কোন রসূল মারফত) সে জনপদের সম্পন্ন (অর্থাৎ ধনী ও নেতৃ-স্থানীয়) লোকদেরকে (বিশেষ করে এবং জনগণকে সাধারণভাবে ঈমান ও আনুগত্যের) নির্দেশ দেই। অতঃপর (যখন) তারা (আদেশ মান্য না করে, বরং) সেখানে পাপাচারে মেতে উঠে, তখন তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যায়। অতঃপর আমি সেই জনপদকে নাস্তানাবুদ করে দেই। (এ রীতি অনুযায়ী) অনেক উম্মতকে নূহ (আ)-র (যুগের) পর (তাদের কুফরী ও গোনাহ্র কারণে) ধ্বংস করেছি, [যেমন, 'আদ', সামূদ ইত্যাদি। কওমে নূহের বন্যায় নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া তো সুবিদিত। তাই শুধু مِنْ بَعْدِ نُوحٍ বলা হয়েছে এবং স্বয়ং কওমে নূহের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

এ কথাও বলা যায় যে, সূরার প্রারম্ভে ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ আয়াতে حَمَلْنَا শব্দের মধ্যে নূহ (আ)-র মহাপ্লাবনের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। সেটাকে কওমে নূহের ধ্বংসপ্রাপ্তির বর্ণনা সাব্যস্ত করে এখানে নূহের পরবর্তী যুগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।] আপনার পালনকর্তা বান্দাদের গোনাহ্ জানা ও দেখার জন্য যথেষ্ট। (সেমতে কোন সম্প্রদায়ের যে ধরনের গোনাহ্ হয়, তিনি সে ধরনের সাজাই দান করেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াবঃ أَرَدْنَا إِذَا এবং অতঃপর أَمَرْنَا বাক্যদ্বয়ের বাহ্যিক অর্থ থেকে এরূপ সন্দেহের অবকাশ ছিল যে, তাদেরকে ধ্বংস করাই ছিল আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য। তাই প্রথমে তাদেরকে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে ঈমান ও আনুগত্যের আদেশ দেওয়া অতঃপর তাদের পাপাচারকে আযাবের কারণ বানানো ঐ সব তো আল্লাহ্ তা'আলারই পক্ষ থেকে হয়। এমতাবস্থায় বেচারাদের দোষ কি? তারা তো অপারক ও বাধ্য। এর জওয়াবের প্রতি তরজমা ও তফসীরের সার-সংক্ষেপে ইঙ্গিত করা

হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন এবং আযাব ও সওয়াবের পথ সুস্পষ্টভাবে বাতলে দিয়েছেন। কেউ যদি স্বেচ্ছায় আযাবের পথে চলারই ইচ্ছা ও সংকল্প গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ্র রীতি এই যে, তিনি তাকে সেই আযাবের উপায়-উপকরণাদি সরবরাহ করে দেন। কাজেই আযাবের আসন্ন কারণ স্বয়ং তাদের কুফরী ও গোনাহের সংকল্প—আল্লাহ্র ইচ্ছাই একমাত্র কারণ নয়। তাই তারা ক্ষমার যোগ্য হতে পারে না।

আয়াতের অন্য একটি তফসীর ঃ أَمَرْنَا শব্দের প্রচলিত অর্থ তাই, যা উপরে বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ আমি আদেশ দেই। কিন্তু এ আয়াতে এ শব্দের বিভিন্ন কিরা'আত হয়েছে। আবূ ওছমান নাহ্দী, আবূ রাজা, আবুল আলিয়া ও মুজাহিদ অবলম্বিত এক কিরা'আতে এ শব্দটি মীমের তাশদীদযোগে পঠিত হয়েছে। এর অর্থ আমি অবস্থাপন্ন বিত্তশালী লোকদেরকে প্রতাপশালী ও শাসক করে দেই। তারা পাপাচারে মেতে উঠে এবং গোটা জাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়।

হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর এক কিরা'আত শব্দটিকে أَمَّرْنَا পাঠ করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে এর তফসীর أَكْثَرْنَا বর্ণিত আছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন জাতির উপর আযাব প্রেরণ করেন, তখন তার প্রাথমিক লক্ষণ এই প্রকাশ পায় যে, সে জাতির মধ্যে অবস্থাপন্ন ধনী লোকদের প্রাচুর্য সৃষ্টি করা হয়। তারা পাপাচারের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে আযাবে পতিত করার কারণ হয়ে যায়।

প্রথম কিরা'আতের সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, জাতির মধ্যে অবস্থাপন্ন ভোগবিলাসী লোকদের শাসনকার্য অথবা এ ধরনের লোকের প্রাচুর্য মোটেই আনন্দের বিষয় নয়, বরং আল্লাহ্র আযাবের লক্ষণ। আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন জাতির প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে আযাবে পতিত করতে চান, তখন এর প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে জাতির শাসনকর্তা ও নেতৃপদে এমন লোকদেরকে অধিষ্ঠিত করে দেন, যারা বিলাসপ্রিয় ও ইন্দ্রিয়সেবী। অথবা শাসনকর্তা না হলেও জাতির মধ্যে এ ধরনের লোকের আধিক্য সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। উভয় অবস্থার পরিণতি দাঁড়ায় এই যে, তারা ইন্দ্রিয়সেবা ও বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে আল্লাহ্র না ফরমানী নিজেরাও করে এবং অন্যদের জন্যও ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। অবশেষে তাদের ওপর আল্লাহ্র আযাব নেমে আসে।

ধনীদের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ঃ আয়াতে বিশেষ-ভাবে অবস্থাপন্ন ধনীদের কথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জনসাধারণ স্বাভাবিক-ভাবেই বিত্তশালী ও শাসক শ্রেণীর চরিত্র ও কর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এরা কুকর্মপরায়ণ হয়ে গেলে সমগ্র জাতি কুকর্মপরায়ণ হয়ে যায়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে ধন দৌলত দান করেন, কর্ম ও চরিত্রের সংশোধনের প্রতি তাদের অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। এমন হওয়া উচিত নয় যে, তারা বিলাসিতায় পড়ে কর্তব্য

ভুলে যাবে এবং তাদের কারণে সমগ্র জাতি ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবে। এমতাবস্থায় সমগ্র জাতির কুকর্মের শাস্তিও তাদেরকে ভোগ করতে হবে।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿١٩﴾ كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ﴿٢٠﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۚ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ﴿٢١﴾

(১৮) যে কেউ ইহকাল কামনা করে, আমি সে সব লোককে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে দেই। অতঃপর তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি। ওরা তাতে নিন্দিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে। (১৯) আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মু'মিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। (২০) এদেরকে এবং ওদেরকে প্রত্যেককে আমি আপনার পালনকর্তার দান পৌঁছে দেই এবং আপনার পালনকর্তার দান অবধারিত। (২১) দেখুন, আমি তাদের একদলকে অপরের উপর কিভাবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিলাম। পরকাল তো নিশ্চয়ই মর্তবায় শ্রেষ্ঠ এবং ফযীলতে শ্রেষ্ঠতম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে ব্যক্তি (স্বীয় সৎ কর্ম দ্বারা শুধু) ইহকালের (উপকারের) নিয়ত রাখবে (হয় এ কারণে যে, সে পরকালে বিশ্বাসী নয়, না হয় এ কারণে যে, সে পরকাল সম্পর্কে গাফিল) আমি তাকে ইহকালেই যতটুকু ইচ্ছা (তাও সবার জন্য নয়, বরং) যাকে ইচ্ছা নগদ দিয়ে দেব। (অর্থাৎ ইহকালেই সে কিছু প্রতিদান পেয়ে যাবে)। অতঃপর (পরকালে কিছুই পাবে না, বরং সেখানে) আমি তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করব। সে তাতে দুর্দশাগ্রস্ত বিতাড়িত হয়ে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি (স্বীয় কৃতকর্মে) পরকালের (সওয়াবের) নিয়ত রাখবে এবং এর জন্য যেরূপ চেষ্টা করা দরকার, তদ্রূপ চেষ্টা করবে (উদ্দেশ্য এই যে, যে কোন চেষ্টা উপকারী নয়, বরং যে চেষ্টা শরীয়ত ও সুন্নতের অনুসারী, শুধু তাই উপকারী। কেননা, এরূপ চেষ্টারই আদেশ করা হয়েছে। যে কর্ম ও প্রচেষ্টা শরীয়ত ও সুন্নতের পরিপন্থী তা গ্রহণযোগ্য নয়। শর্ত এই যে, সে ঈমানদারও হবে) এমন লোকদের

চেষ্টাই গ্রহণীয় হবে। (মোট কথা, আল্লাহ্র কাছে সফলকাম হওয়ার শর্ত চারটি। এক. নিয়ত শুদ্ধ করা অর্থাৎ খাঁটি পরকালীন সওয়াবের নিয়ত করা—মানসিক স্বার্থ অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। দুই. নিয়তের জন্য না করার প্রয়াস। শুধু নিয়ত ও ইচ্ছা দ্বারা কার্যসিদ্ধি হয় না, যে পর্যন্ত তাঁর জন্য কাজ না করা হয়। তিন. কর্মসিদ্ধ করা। অর্থাৎ শরীয়ত ও সুন্নত অনুযায়ী কর্মপ্রয়াস পরিচালনা। কেননা, অভীষ্ট লক্ষ্যের বিপরীত দিকে দৌড়ানো ও এতদুদ্দেশ্যে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উপকারী হওয়ার পরিবর্তে অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয়। চার. বিশ্বাস। অর্থাৎ ঈমান শুদ্ধ করা। এ শর্তটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সবগুলোর মূল ভিত্তি। এসব শর্ত ব্যতীত কোন কর্মই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কাফিরদের জন্য পার্থিব নিয়ামতসমূহ অর্জিত হওয়া তাদের কর্মের গ্রহণীয়তার লক্ষণ নয়। কেননা, পার্থিব নিয়ামত আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং) আপনার পালনকর্তার (পার্থিব) দান থেকে আমি তাদেরকেও (অর্থাৎ প্রিয় বান্দাদেরকেও) সাহায্য করি (এবং তাদেরকেও। অর্থাৎ অপ্রিয় বান্দাদেরকেও সাহায্য করি)। আপনার পালনকর্তার (পার্থিব) দান (কারও জন্য) বন্ধ নয়। দেখুন আমি (পার্থিব দানে ঈমান ও কুফরের শর্ত ব্যতিরেকে) একজনকে অপরের ওপর কিরূপ শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি! (এমনকি, অধিকাংশ কাফির অধিকাংশ মু'মিনের তুলনায় অধিক ধনসম্পদের মালিক। কেননা, এসব বস্তু গুরুত্বপূর্ণ নয়)। অবশ্যই পরকাল (যা প্রিয় বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট, তা) মর্তবা ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে বিরাট। (তাই এর জন্য যত্নবান হওয়া উচিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যারা স্বীয় আমল দ্বারা শুধু ইহকাল লাভ করার ইচ্ছা করে, আলোচ্য আয়াতে তাদের এবং তাদের শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ বর্ণনায় مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ —বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। এটা استمرار و دوام ক্রমাগত বলতে থাকা ও স্থায়ী হওয়া বুঝায়। উদ্দেশ্য এই যে, এই জাহান্নামের শাস্তি শুধু তখন হবে, যখন তার প্রত্যেক কর্মকে ক্রমাগতভাবে ও সদাসর্বদা শুধু ইহকালের উদ্দেশ্যেই আচ্ছন্ন করে রাখে—পরকালের প্রতি কোন লক্ষ্য না থাকে। পক্ষান্তরে পরকালের ইচ্ছা করা এবং তার প্রতিপাদনের বর্ণনায় اَرَادَ الْاٰخِرَةَ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ এই যে, মু'মিন যখনই যে কাজে পরকালের ইচ্ছা ও নিয়ত করবে, তার সেই কাজ গ্রহণযোগ্য হবে; যদিও তার কোন কোন কাজের নিয়তে মন্দ মিশ্রিত হয়ে যায়।

প্রথমোক্ত অবস্থাটি শুধু কাফির বা পরকালে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরই হতে পারে। তাই তার কোন কর্মই গ্রহণযোগ্য নয়। শেষোক্ত অবস্থাটি হল মু'মিনের। তার যে কর্ম খাঁটি নিয়ত সহকারে অন্যান্য শর্তানুযায়ী হবে, তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং যে কর্ম এরূপ হবে না, তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

বিদ'আত ও মনগড়া আমল যতই ভাল দেখা যাক—গ্রহণযোগ্য নয় ঃ এ আয়াতে চেষ্টা ও কর্মের সাথে سعيها শব্দ যোগ করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কর্ম ও চেষ্টা কল্যাণ-কর ও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না, বরং সেটিই ধর্তব্য হয়, যা (পরকালের) লক্ষ্যের উপযোগী। উপযোগী হওয়া না হওয়া শুধু আল্লাহ্ ও রসূলের বর্ণনা দ্বারাই জানা যেতে পারে। কাজেই যে সৎ কর্ম মনগড়া পন্থায় করা হয়—সাধারণ বিদ'আতী পন্থাও এর অন্তর্ভুক্ত, তা দৃশ্যত যতই সুন্দর ও উপকারী হোক না কেন—পরকালের জন্য উপযোগী নয়। তাই সেটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং পরকালেও কল্যাণকর নয়।

তফসীর রূহুল মা'আনী سعيها শব্দের ব্যাখ্যায় সুন্নত অনুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে এ কথা ও অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, কর্মেও দৃঢ়তা থাকতে হবে। অর্থাৎ কর্মটি সুন্নত অনুযায়ী এবং দৃঢ় অর্থাৎ সার্বক্ষণিকও হতে হবে। বিশৃঙ্খলভাবে কোন সময় করল কোন সময় করল না—এতে পূর্ণ উপকার পাওয়া যায় না।

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ﴿٢٢﴾ وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿٢٤﴾ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿٢٥﴾

(২২) স্থির করো না আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য। তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে। (২৩) তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ্' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা। (২৪) তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল ঃ হে পালনকর্তা, তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। (২৫) তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল।

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কর্ম গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, ঈমানসহ এবং শরীয়ত ও সুন্নত অনুযায়ী যে কর্ম করা হয়, তাই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এমনি ধরনের বিশেষ বিশেষ কর্ম সম্পাদনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেগুলো শরীয়ত বর্ণিত। এসব নির্দেশের বাস্তবায়ন পরকালের সাফল্য এবং তার বিরুদ্ধাচরণ পরকালের ধ্বংসের কারণ। যেহেতু উল্লিখিত শর্তসমূহের মধ্যে ঈমানের শর্তটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাই সর্বপ্রথম সে নির্দেশ ও তওহীদের বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর বান্দার হক সম্পর্কিত নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(প্রথম নির্দেশ তওহীদ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ — হে সম্বোধিত ব্যক্তি) আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না। (অর্থাৎ শিরক করো না)। তাহলে তুমি দুর্দশাগ্রস্ত অসহায় হয়ে পড়বে। (অতঃপর এই তাগিদ করা হয়েছে যে) তোমার পালনকর্তা নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি সত্য উপাস্য তাঁকে ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। (এটা পরকালের চেষ্টার পন্থা সংক্রান্ত বিবরণ)।

(দ্বিতীয় নির্দেশ পিতামাতার হক আদায় করা وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا) তোমরা পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। যদি (তারা) তোমার কাছে (থাকে এবং) তাদের একজন অথবা উভয়েই বার্ধক্যে (অর্থাৎ বার্ধক্যের বয়সে) উপনীত হয় এবং সে কারণে সেবা-যত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং যখন স্বভাবতই তাদের সেবাযত্ন করা কঠিন মনে হয়, তবে (তখনও এতটুকু আদব কর যে) তাদেরকে (হাঁ থেকে) হুঁ-ও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে খুব আদব সহকারে কথা বল। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে সবিনয়ে ইযযত-সম্মান করে দাও এবং (তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে) এরূপ দোয়া কর ঃ হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন। (শুধু এই বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শন-কেই যথেষ্ট মনে করো না। অন্তরেও তাদের প্রতি আদব ও আনুগত্যের ইচ্ছা পোষণ করবে। কেননা) তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনের কথা খুব জানেন। (একারণেই এর বাস্তবায়ন সহজ করার জন্য একটি হাল্কা আদেশও শুনাচ্ছেন যে) যদি তোমরা (প্রকৃতই আন্তরিকভাবে) সৎ হও, (এবং ভুলক্রমে, মেযাজের সংকীর্ণতাহেতু কিংবা বিরক্তিবশত কোন বাহ্যিক ত্রুটি হয়ে যায়, অতঃপর অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে নাও) তবে তওবাকারীদের অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পিতামাতার আদব, সম্মান ও আনুগত্যের গুরুত্ব ঃ ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পিতামাতার আদব, সম্মান এবং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার

করাকে নিজের ইবাদতের সাথে একত্র করে করয করেছেন। যেমন সূরা লোকমানে নিজের শোকরের সাথে পিতামাতার শোকরকে একত্র করে অপরিহার্য করেছেন। বলা হয়েছে ঃ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ অর্থাৎ আমার শোকর কর এবং পিতামাতারও। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের পর পিতামাতার আনুগত্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও ওয়াজিব। সহীহ্ বুখারীর একটি হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হাদীসে রয়েছে, কোন এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করল ঃ আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ (মুস্তাহাব) সময় হলে নামায পড়া। সে আবার প্রশ্ন করল ঃ এরপর কোন্ কাজটি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন ঃ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার।—(কুরতুবী)

হাদীসের আলোকে পিতামাতার আনুগত্য ও সেবাযত্নের ফযীলত ঃ মসনদে আহমদ। তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, মুস্তাদরাক হাকেমে বিশুদ্ধ সনদসহ হযরত আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হিফাযত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও। (মাযহারী) (১) তিরমিযী ও মুস্তাদরাক হাকেমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হিফাযত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও। (মাযহারী) (২) তিরমিযী ও মুস্তাদরাক হাকেমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।

(৩) হযরত আবূ উমামার বাচনিক ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ সন্তানের উপর পিতামাতার হক কি? তিনি বললেন ঃ তাঁরা উভয়েই তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁদের আনুগত্য ও সেবাযত্ন জান্নাতে নিয়ে যায় এবং তাঁদের সাথে বেআদবি ও তাঁদের অসন্তুষ্টি জাহান্নামে পৌঁছে দেয়।

(৪) বায়হাকী শোয়াবুল-ঈমান গ্রন্থে এবং ইবনে অসাকির হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে পিতামাতার আনুগত্য করে, তার জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খোলা থাকবে এবং যে ব্যক্তি তাদের অবাধ্য হবে, তার জন্য জাহান্নামের দু'টি দরজা খোলা থাকবে। যদি পিতামাতার মধ্য থেকে একজনই ছিল, তবে জান্নাত অথবা জাহান্নামের এক দরজা খোলা থাকবে। একথা শুনে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল ঃ জাহান্নামের এই শাস্তিবাণী কি তখনও প্রযোজ্য যখন পিতামাতা এই ব্যক্তির প্রতি জুলুম করে? তিনি তিনবার বললেন ঃ وَإِنْ ظَلَمَا وَإِنْ ظَلَمَا وَإِنْ ظَلَمَا অর্থাৎ যদি পিতামাতা সন্তানের প্রতি জুলুমও

করে তবু পিতামাতার অবাধ্যতার কারণে সন্তান জাহান্নামে যাবে। এর সারমর্ম এই যে, পিতামাতার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার সন্তানের নেই। তাঁরা জুলুম করলে সন্তান সেবা-যত্ন ও আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিতে পারে না।

(৫) বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে সেবাযত্নকারী পুত্র পিতামাতার দিকে দয়া ও ভালবাসা সহকারে দৃষ্টি-পাত করে, তার প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি মকবুল হজ্জের সওয়াব পায়। লোকেরা আরয করল ঃ সে যদি দিনে একশ'বার এভাবে দৃষ্টিপাত করে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, একশ'বার দৃষ্টিপাত করলেও প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে এই সওয়াব পেতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ্। তাঁর ভাণ্ডারে কোন অভাব নেই।

পিতামাতার হক নষ্ট করার শাস্তি দুনিয়াতেও পাওয়া যায় ঃ

(৬) বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে আবু বকরার বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সমস্ত গোনাহের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা যেগুলো ইচ্ছা করেন কিয়ামত পর্যন্ত পিছিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু পিতামাতার হক নষ্ট করা এবং তাঁদের প্রতি অবাধ্য আচরণ করা এর ব্যতিক্রম। এর শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেও দেওয়া হয়। (এ সবগুলো রেওয়ায়েত তফসীরে মাযহারী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে)।

কোন কোন বিষয়ে পিতামাতার আনুগত্য ওয়াজিব এবং কোন কোন বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণের অবকাশ আছে ঃ এ ব্যাপারে আলিম ও ফিকাহ্‌বিদগণ একমত যে, পিতামাতার আনুগত্য শুধু বৈধ কাজে ওয়াজিব। অবৈধ ও গোনাহর কাজে আনুগত্য ওয়াজিব তো নয়ই, বরং জায়েযও নয়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق —অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীর কাজে কোন সৃষ্ট-জীবের আনুগত্য জায়েয নয়।

পিতামাতার সেবাযত্ন ও সদ্ব্যবহারের জন্য তাঁদের মুসলমান হওয়া জরুরী নয় ঃ ইমাম কুরতুবী এ বিষয়টির সমর্থনে বুখারী থেকে হযরত আসমা (রা)-র একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত আসমা (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন ঃ আমার জননী মুশরিকা। তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করা জায়েয হবে কি? তিনি বললেন ঃ صلى امك অর্থাৎ "তোমার জননীকে আদর-আপ্যায়ন কর।" কাফির পিতামাতা সম্পর্কে স্বয়ং কোরআন পাক বলে ঃ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا —অর্থাৎ যার পিতামাতা কাফির এবং তাকেও কাফির হওয়ার আদেশ করে এ ব্যাপারে তাদের আদেশ পালন করা জায়েয নয়, কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। বলা বাহুল্য, আয়াতে মারূফ' বলে তাদের সাথে আদর-আপ্যায়নমূলক ব্যবহার বুঝানো হয়েছে।

মাস'আলা ঃ যে পর্যন্ত জিহাদ ফরযে আইন না হয়ে যায়, ফরযে কিফায়ার স্তরে থাকে, সে পর্যন্ত পিতামাতার অনুমতি ছাড়া সন্তানের জন্য জিহাদে যোগদান করা জায়েয নয়। সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে জিহাদের অনুমতি নেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল ঃ জী হ্যাঁ, জীবিত আছেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ففيهما فجاهد অর্থাৎ তাহলে তুমি পিতা-মাতার সেবাযত্নে আত্মনিয়োগ করেই জিহাদ কর। অর্থাৎ তাঁদের সেবাযত্নের মাধ্যমেই তুমি জিহাদের সওয়াব পেয়ে যাবে। অন্য রেওয়ায়েতে এর সাথে একথাও উল্লিখিত রয়েছে যে, লোকটি বলল ঃ আমি পিতামাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ যাও, তাঁদের হাসাও, যেমন কাঁদিয়েছ। অর্থাৎ তাঁদেরকে গিয়ে বল ঃ এখন আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জিহাদে যাব না।—(কুরতুবী)

মাস'আলা ঃ এ রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, কোন কাজ ফরযে আইন না হলে এবং ফরযে-কিফায়ার স্তরে থাকলে সন্তানের জন্য পিতামাতার অনুমতি ছাড়া সে কাজ করা জায়েয নয়। দীনী শিক্ষা অর্জন করা এবং তবলীগের কাজে সফর করাও এর অন্তর্ভুক্ত। ফরয পরিমাণ দীনী জ্ঞান যার অর্জিত আছে, সে যদি বড় আলিম হওয়ার জন্য সফর করে কিংবা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজে সফর করে, তবে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত তা জায়েয নয়।

মাস'আলা ঃ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার যে নির্দেশ কোরআন ও হাদীসে উক্ত হয়েছে, পিতামাতার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করাও এর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে পিতামাতার মৃত্যুর পর। সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ পিতার সাথে সদ্ব্যবহার এই যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুদের সাথেও সদ্ব্যবহার করতে হবে। হযরত আবু উসায়দ বদরী (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে বসেছিলাম, ইতিমধ্যে এক আনসার এসে প্রশ্ন করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পিতামাতার ইন্তিকালের পরও তাদের কোন হক আমার যিম্মায় আছে কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ তাঁদের জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করা, তাঁরা কারো সাথে কোন অঙ্গীকার করে থাকলে তা পূরণ করা, তাঁদের বন্ধুবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের এমন আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখা, যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু তাঁদেরই মাধ্যমে। পিতামাতার এসব হক তাঁদের ইন্তিকালের পরও তোমার যিম্মায় অবশিষ্ট রয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অভ্যাস ছিল যে, হযরত খাদীজা (রা)-র ওফাতের পর তিনি তাঁর বান্ধবীদের কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করতেন। এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হযরত খাদীজা (রা)-র হক আদায় করা।

পিতামাতার আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা, বিশেষত বার্ধক্যে ঃ পিতামাতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য পিতামাতা হওয়ার দিক দিয়ে কোন সময়ও বয়সের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়।

সর্বাবস্থায় এবং সব বয়সেই পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব। কিন্তু ওয়াজিব ও ফরয কর্তব্যসমূহ পালনের ক্ষেত্রে স্বভাবত সেসব অবস্থা প্রতিবন্ধক হয়, কর্তব্য পালন সহজ করার উদ্দেশ্যে কোরআন পাক সেসব অবস্থায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে চিন্তাধারার লালন-পালনও করে এবং এর জন্য অতিরিক্ত তাকিদও প্রদান করে। এটাই কোরআন পাকের সাধারণ নীতি।

বার্ধক্যে উপনীত হয়ে পিতামাতা সন্তানের সেবা-যত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবন সন্তানের দয়া ও কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন যদি সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্যও বিমুখতা প্রকাশ পায়, তবে তাঁদের অন্তরে তা ক্ষত হয়ে দেখা দেয়। অপরদিকে বার্ধক্যের উপসর্গসমূহ স্বভাবগতভাবে মানুষকে খিটখিটে করে দেয়। তৃতীয়ত বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে যখন বুদ্ধি-বিবেচনাও অকেজো হয়ে পড়ে, তখন পিতামাতার বাসনা এবং দাবীদাওয়াও এমনি ধরনের হয়ে যায়, যা পূর্ণ করা সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়। কোর-আন পাক এসব অবস্থায় পিতামাতার মনো-তুষ্টি ও সুখ-শান্তি বিধানের আদেশ দেওয়ার সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকাল স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, আজ পিতামাতা তোমার যতটুকু মুখাপেক্ষী, এক সময় তুমিও তদাপেক্ষা বেশী তাঁদের মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তাঁরা যেমন নিজেদের আরাম-আয়েশ ও কামনা-বাসনা তোমার জন্য কুরবান করেছিলেন এবং তোমার অবুঝ কথাবার্তাকে স্নেহ-মমতার আবরণ দ্বারা ঢেকে নিয়েছিলেন, তেমনি মুখাপেক্ষিতার এই দুঃসময়ে বিবেক ও সৌজন্যবোধের তাগিদ এই যে, তাঁদের পূর্ব ঋণ শোধ করা কর্তব্য। كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا —বাক্যে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে পিতামাতার বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার সময় সম্পর্কিত কতিপয় আদেশ দান করা হয়েছে।

এক. তাঁদেরকে 'উফ'-ও বলবে না। এখানে 'উফ' শব্দটি বলে এমন শব্দ বুঝানো হয়েছে, যদ্দ্বারা বিরক্তি প্রকাশ পায়। এমনকি, তাঁদের কথা শুনে বিরক্তিবোধক দীর্ঘশ্বাস ছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত আলী (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ পীড়া দানের ক্ষেত্রে 'উফ' বলার চাইতেও কম কোন স্তর থাকলেও তাও অবশ্য উল্লেখ করা হত। (মোট কথা, যে কথায় পিতামাতার সামান্য কষ্ট হয়, তাও নিষিদ্ধ।)

দ্বিতীয়, وَلَا تَنْهَرْهُمَا —نَهر শব্দের অর্থ ধমক দেওয়া। এটা যে কষ্টের কারণ তা বলাই বাহুল্য।

তৃতীয় আদেশ, وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا প্রথমোক্ত দু'টি আদেশ ছিল নেতিবাচক তাতে পিতামাতার সামান্যতম কষ্ট হতে পারে, এমন সব কাজেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তৃতীয় আদেশে ইতিবাচক ভঙ্গিতে পিতামাতার সাথে কথা বলার আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তাঁদের সাথে সম্প্রীতি ও ভালবাসার সাথে নম্র স্বরে কথা বলতে হবে। হযরত

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব বলেনঃ যেমন কোন গোলাম তার রূঢ়স্বভাব অপরাধ প্রভুর সাথে কথা বলে।

চতুর্থ আদেশ, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ —এর সারমর্ম এই যে, তাদের সামনে নিজেকে অক্ষম ও হেয় করে পেশ করবে; যেমন গোলাম প্রভুর সামনে। جَنَاحَ শব্দের অর্থ পাখা। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পিতামাতার জন্য নিজ নিজ পাখা নম্রতা সহকারে নত করে দেবে। শেষে مِنَ الرَّحْمَةِ বলে প্রথমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, পিতামাতার সাথে এই ব্যবহার যেন নিছক লোক দেখানো না হয় বরং আন্তরিক মমতা ও সম্মানের ভিত্তিতে হওয়া কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, এ দিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, পিতামাতার সামনে নম্র ও হেয় হয়ে পেশ হওয়া সত্যিকার ইয্যতের পটভূমি। কেননা এরূপ করা বাস্তব অর্থে হেয় হওয়া নয়, বরং এর কারণ মহব্বত ও অনুকম্পা।

পঞ্চম আদেশ, وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا -এর সারমর্ম এই যে, পিতামাতার যোল আনা সুখশান্তি বিধান মানুষের সাধ্যাতীত। কাজেই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে তাঁদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করবে যে, তিনি যেন করুণাবশত তাঁদের সব মুশকিল আসান করেন এবং কষ্ট দূর করেন। সর্বশেষ আদেশটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। পিতামাতার মৃত্যুর পরও দোয়ার মাধ্যমে সর্বদা পিতামাতার খিদমত করা যায়।

মাস'আলা ঃ পিতামাতা মুসলমান হলে তো তাঁদের জন্য রহমতের দোয়া করা যাবেই; কিন্তু মুসলমান না হলে তাঁদের জীবদ্দশায় এ দোয়া জায়েয হবে এবং নিয়ত থাকবে এই যে, তাঁরা পার্থিব কষ্ট থেকে মুক্ত থাকুন এবং ঈমানের তওফীক লাভ করুন। মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য রহমতের দোয়া করা জায়েয নয়।

একটি আশ্চর্য ঘটনা ঃ কুরতুবী জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করল যে, আমার পিতামাতা আমার ধনসম্পদ নিয়ে গেছেন। তিনি বললেনঃ তোমার পিতাকে ডেকে আন। এমন সময়ই জিবরাঈল আগমন করলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেনঃ তার পিতা এসে গেলে আপনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন, ঐ বাক্যগুলো কি, যেগুলো সে মনে মনে বলেছে এবং স্বয়ং তার কানও শুনতে পায়নি। যখন লোকটি তার পিতাকে নিয়ে হাযির হল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ ব্যাপার কি, আপনার পুত্র আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল কেন? আপনি কি তার আসবাবপত্র ছিনিয়ে নিতে চান? পিতা বলল ঃ আপনি তাকে এ প্রশ্ন করুন। আমি তার ফুফু, খালা এবং নিজের জীবন রক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত কোথায় ব্যয় করি? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ إِيهِ (অর্থাৎ ব্যস! আসল ব্যাপার জানা হয়ে গেছে। এখন আর কোন বলার শোনার দরকার নেই।) এরপর তার পিতাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ ঐ বাক্যগুলো কি, যেগুলো এখন পর্যন্ত স্বয়ং আপনার কানও

শোনেনি। লোকটি আরয করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ প্রত্যেক ব্যাপারেই আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও ঈমান বৃদ্ধি করে দেন। (যে কথা কেউ শোনেনি, তা আপনার জানা হয়ে গেছে। এটা একটা মু'জিযা) অতঃপর সে বলল ঃ এটা ঠিক যে, আমি মনে মনে কয়েক লাইন কবিতা বলেছিলাম, যেগুলো আমার কানও শোনেনি। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ কবিতাগুলো আমাকে শোনান। তখন সে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করল ঃ

غذوتك مولودا ومنتك يافعا
تعل بما اجنى عليك وتنهل

ঃ আমি তোমাকে শৈশবে খাদ্য দিয়েছি এবং যৌবনেও তোমার দায়িত্ব বহন করেছি। তোমার যাবতীয় খাওয়া-পরা আমারই উপার্জন থেকে ছিল।

اذا ليلة ضافتك بالسقم لم ابت
لسقمك الا ساهرا اتململ

ঃ কোন রাতে যখন তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ, তখন আমি সারা রাত তোমার অসুস্থতার কারণে জেগে কাটিয়েছি।

كانى انا المطروق دونك بالذى
طرقت به دونى فعينى تهمل

ঃ যেন তোমার রোগ আমাকেই স্পর্শ করেছে—তোমাকে নয়। ফলে আমি সারা রাত ক্রন্দন করেছি।

تخاف الردى نفسى عليك وانها
لتعلم ان الموت وقت مؤجل

ঃ আমার অন্তর তোমার মৃত্যুর ভয়ে ভীত হত, অথচ আমি জানতাম যে, মৃত্যুর জন্য দিন নির্দিষ্ট রয়েছে—আগেপিছে হতে পারবে না।

فلما بلغت السن والغاية التى
اليها مدى ما كنت فيك اؤمل

ঃ অতঃপর যখন তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছ এবং আমার আকাঙ্ক্ষিত বয়সের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছ।

جعلت جزائى غلظة وفظاظة
كانك انت المنعم المتفضل

ঃ তখন তুমি কঠোরতা ও রূঢ় ভাষাকে আমার প্রতিদান করে দিয়েছ, যেন তুমিই আমার প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা না করতে।

فليتك اذ لم ترع حق ابوتى
فعلت كما الجار المجاور يفعل

ঃ আফসোস, যদি তোমার দ্বারা আমার পিতৃত্বের হক আদায় না হয়, তবে কম-পক্ষে ততটুকুই করতে যতটুকু একজন ভদ্র প্রতিবেশী করে থাকে।

فـاوليتنى حق الجوار ولم تكن
على بمال دون مالك تبخل

ঃ তুমি কমপক্ষে আমাকে প্রতিবেশীর হক তো দিতে এবং স্বয়ং আমারই অর্থ-সম্পদে আমার বেলায় কৃপণতা না করতে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) কবিতাগুলো শোনার পর পুত্রের জামার কলার চেপে ধরলেন এবং বললেনঃ انت ومالك لابيك অর্থাৎ যাও, তুমি এবং তোমার ধনসম্পদ সবই তোমার পিতার। (কুরতুবী, ষষ্ঠ খণ্ড, ২৪ পৃঃ) কবিতাগুলো আরবী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ 'হামাসা'তেও উদ্ধৃত রয়েছে, কিন্তু কবির নাম লেখা হয়েছে উমাইয়া ইবনে আবুস্সলত। কেউ কেউ বলেনঃ এগুলো আবদুল আ'লার কবিতা এবং কারও কারও মতে কবিতাগুলো আলি আব্বাস অন্ধের।—(হাশিয়া—কুরতুবী)

পিতার আদব ও সম্মান সম্পর্কিত উল্লিখিত আদেশসমূহের কারণে সন্তানদের মনে এমন একটা আশঙ্কা দেখা দিতে পারে যে, পিতামাতার সাথে সদাসর্বদা থাকতে হবে তাঁদের এবং নিজেদের অবস্থাও সব সময় সমান যায় না। কোন সময় মুখ দিয়ে এমন কথাও বের হয়ে যেতে পারে, যা উপরোক্ত আদবের পরিপন্থী। এর জন্য জাহান্নামের শাস্তির কথা শোনানো হয়েছে। কাজেই গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন হবে। আলোচ্য সর্বশেষ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ —আয়াতে মনের এই সংকীর্ণতা দূর করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বেআদবীর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন সময় কোন পেরেশানী অথবা অসাবধানতার কারণে কোন কথা বের হয়ে গেলে এবং এজন্য তওবা করলে আল্লাহ্ তা'আলা মনের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন যে, কথাটি বেআদবী অথবা কষ্টদানের জন্য বলা হয়নি। সুতরাং তিনি ক্ষমা করবেন। أوابين শব্দের অর্থ تَوَّابِينَ অর্থাৎ তওবাকারী। হাদীসে বাদ মাগরিবের ছয় রাক'আত এবং ইশরাকের নফল নামাযকে صلوة الاوابين বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই নামাযগুলো পড়ার তওফীক তাদেরই হয়, যারা أَوَّابِينَ অর্থাৎ تَوَّابِينَ (তওবাকারী)।

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۝٢٦ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۭ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۝٢٧

(২৬) আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। (২৭) নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আলোচ্য দু'টি আয়াতে বান্দার হক সম্পর্কে আরও দু'টি নির্দেশ উল্লেখ করা হয়েছে। এক. পিতামাতা ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম জনগণের হক। দুই. অপব্যয় সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা। এর সংক্ষিপ্ত তফসীর এরূপঃ) আত্মীয়কে তার (আর্থিক ও অন্যান্য) হক দান কর এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরকে (তাদের হক দাও)। (অর্থসম্পদ) অযথা ব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই (অর্থাৎ শয়তানের মতই) আর শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। (আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিবেক-বুদ্ধিতে সমৃদ্ধ করেছেন, কিন্তু সে এই সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানীর কাজে ব্যয় করেছে। এমনিভাবে অপব্যয়কারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা অর্থসম্পদ দান করেছেন। কিন্তু তারা সেগুলো আল্লাহ্র নাফরমানীতে ব্যয় করে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সকল আত্মীয়ের হক দিতে হবেঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পিতামাতার হক এবং তাঁদের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা ছিল। আলোচ্য আয়াতে সকল আত্মীয়ের হক বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক আত্মীয়ের হক আদায় করতে হবে। অর্থাৎ কমপক্ষে তাদের সাথে সুন্দরভাবে জীবন-যাপন ও সদ্ব্যবহার করতে হবে। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের আর্থিক সাহায্যও এর অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেকের ওপরই তার সাধারণ আত্মীয়দেরও হক রয়েছে। সে হক কি এবং কতটুকু তার বিশদ বর্ণনা আয়াতে নেই। তবে সাধারণ-ভাবে আত্মীয়তা বজায় রাখা এবং সুন্দরভাবে জীবন যাপন করা যে এর অন্তর্ভুক্ত, তা না বললেও চলে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেনঃ যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ—এমন আত্মীয় মহিলা কিংবা বালক-বালিকা হয়, নিঃস্ব হয় এবং উপার্জন করতেও সক্ষম না হয়; এমনিভাবে সে যদি বিকলাঙ্গ কিংবা অন্ধ হয়, জীবন ধারনের মত ধনসম্পদের অধিকারী না হয়, তবে তার ভরণ-পোষণ করা সক্ষম আত্মীয়দের ওপর ফরয। যদি একই স্তরের কয়েকজন আত্মীয় সক্ষম হয়, তবে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে কয়েকজনকেই বহন করতে হবে। সূরা বাকারার আয়াতঃ

وعلى الوارث مثل ذلك দ্বারাও এ বিধানটি প্রমাণিত হয়।—(তফসীরে মাযহারী)

এ আয়াতে আত্মীয়, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের আর্থিক সাহায্যদানকে তাদের হক হিসাবে গণ্য করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের প্রতি দাতার অনুগ্রহ প্রকাশ করার কোন কারণ নেই। কেননা, তাদের হক তার যিম্মায় ফরয। দাতা সে ফরযই পালন করছে মাত্র; কারও প্রতি অনুগ্রহ করছে না।

تبذير অর্থাৎ অপব্যয়ের নিষেধাজ্ঞা: কোরআন পাক অপব্যয়কে দু'টি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। একটি تبذير এবং অপরটি اسراف —আলোচ্য আয়াতে تبذير নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং وَلَا تُسْرِفُوا আয়াতে اسراف নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন: উভয় শব্দ সমার্থবোধক। গোনাহর কাজে কিংবা অযথা অস্থানে ব্যয় করাকে تبذير ও اسراف বলা হয়। কেউ কেউ বলেন: গোনাহর কাজে কিংবা সম্পূর্ণ অযথা ও অস্থানে ব্যয় করাকে تبذير বলা হয় আর বৈধ স্থানে প্রয়োজনের চাইতে অধিক ব্যয় করাকে اسراف বলা হয়। তাই تبذير اسراف -এর চাইতে গুরুতর। تبذير -কারীদেরকে শয়তানের ভাই বলে অভিহিত করা হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ বলেন: কেউ নিজের সমস্ত মাল হক আদায় করার জন্য ব্যয় করে দিলে তা অযথা ব্যয় হবে না। পক্ষান্তরে যদি অন্যায়-অহেতুক কাজে এক মুদও (অর্ধসের) ব্যয় করে, তবে তা অযথা ব্যয় বলে গণ্য হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন: হক নয় এমন অস্থানে ব্যয় করাকে تبذير বলা হয় (মাযহারী)। ইমাম মালিক (রহ) বলেন: হক পথে অর্থ উপার্জন করে নাহক পথে ব্যয় করাকে تبذير বলা হয়। একে اسراف -ও বলে। এটা হারাম। —(কুরতুবী)

ইমাম কুরতুবী বলেন: হারাম ও অবৈধ কাজে এক দিরহাম খরচ করাও تبذير এবং বৈধ ও অনুমোদিত কাজে সীমাতিরিক্ত খরচ করা, যদ্দরুন ভবিষ্যতে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয়—এটাও تبذير -এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য যদি কেউ আসল মূলধন ঠিক রেখে তার মুনাফাকে বৈধ কাজে মুক্ত হস্তে ব্যয় করে, তবে তা تبذير -এর অন্তর্ভুক্ত নয়।—(কুরতুবী)

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۝

(২৮) এবং তোমার পালনকর্তার করুণার প্রত্যাশায় অপেক্ষমাণ থাকাকালে যদি কোন সময় তাদেরকে বিমুখ করতে হয়, তখন তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এ আয়াতে বান্দার হক সম্পর্কে পঞ্চম আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি কোন সময় অভাবগ্রস্তদেরকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করার ব্যবস্থা না হয় তবে তখনও তাদেরকে যেন রূঢ় ভাষায় জওয়াব না দেওয়া হয়, বরং সহানুভূতির সাথে ভবিষ্যৎ সুবিধার আশা দেওয়া হয়। তফসীর এরূপ ঃ)

এবং যদি (কোন সময় তোমার কাছে তাদেরকে দেওয়ার মত অর্থ-সম্পদ না থাকে এবং এজন্য) তোমাকে ঐ রিযিকের প্রতীক্ষায়, যা পাওয়ার আশা পালনকর্তার কাছে কর, (তা না আসা পর্যন্ত) তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরাতে হয়, তবে (এতটুকু খেয়াল রাখবে যে) তাদেরকে নরম কথা বলে দেবে। (অর্থাৎ হৃষ্টচিত্ততার সাথে তাদেরকে এরূপ ওয়াদা দেবে যে, ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতে কোনখান থেকে এলে দেব। পীড়াদায়ক উত্তর দেবে না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর মাধ্যমে সমগ্র উম্মতকে অভূতপূর্ব নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, কোন সময় যদি অভাবগ্রস্ত লোকেরা সওয়াল করে এবং আপনার কাছে দেওয়ার মত কিছু না থাকার দরুন আপনি তাদের তরফ থেকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হন, তবে এ মুখ ফিরানো আত্মম্ভরিতাযুক্ত অথবা প্রতিপক্ষের জন্য অপমানজনক না হওয়া উচিত, বরং তা অপারকতা ও অক্ষমতা প্রকাশ সহকারে হওয়া কর্তব্য।

এ আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে ইবনে যায়েদ রেওয়ায়েত করেন যে, কিছু সংখ্যক লোক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে অর্থকড়ি চাইত। তিনি জানতেন যে, এদেরকে অর্থকড়ি দিলে তা দুষ্কর্মে ব্যয় করবে। তাই তিনি এদেরকে কিছু দিতে অস্বীকার করতেন এবং এটা ছিল তাদেরকে দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখার একটি উপায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

মসনদে সাঈদ ইবনে মনসুর সাবা ইবনে হাকামের বাচনিক উল্লিখিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে কিছু বস্ত্র আসলে তিনি তা হকদারদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। বণ্টন শেষ হওয়ার পর আরও কিছু লোক আসলে তাদেরকে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাদের সম্পর্কেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ﴿٢٩﴾ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ
اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ﴿٣٠﴾

(২৯) তুমি একেবারে ব্যয়-কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে। (৩০) নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা অধিক জীবনোপকরণ দান করেন এবং তিনিই তা সংকুচিতও করে দেন। তিনিই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত,—সব কিছু দেখছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তুমি নিজের হাত গর্দানের সাথে বেঁধে রেখো না (যে, চূড়ান্ত কৃপণতার কারণে ব্যয় করা থেকে হাত গুটিয়ে নেবে) এবং সম্পূর্ণ খুলেও দিয়ো না (যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করে অপব্যয় করবে) নতুবা তিরস্কৃত (ও) রিক্ত হস্ত হয়ে বসে থাকতে হবে। (কারও অভাব-অনটন দেখে নিজেকে বিপদের সম্মুখীন করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা) নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা বেশী রিযিক দান করেন এবং তিনিই (যার জন্য ইচ্ছা) সংকুচিত করে দেন। নিশ্চয় তিনি স্বীয় বান্দাদের (অবস্থা ও উপযোগিতা) সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানেন, দেখেন। (সমগ্র বিশ্বের অভাব দূর করা রাব্বুল আলামীনেরই কাজ। তুমি এ চিন্তা কেন করবে যে, নিজেকে বিপদে ফেলে সবার অভাব-অনটন দূর করবে। এটা এজন্য অর্থহীন যে, সবকিছু করার পরও কারও অভাব দূর করা তোমার সাধ্যে কুলাবে না। এর অর্থ এরূপ নয় যে, কেউ কারও দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করবে না বরং উদ্দেশ্য এই যে, সবার অভাব দূর করার সাধ্য কোন মানুষের নেই, যদিও সে নিজেকে যত বিপদে ফেলতেই সম্মত হোক। এ কাজ একমাত্র সৃষ্ট জগতের প্রভুর। তিনি সবার অভাব ও চাহিদা সম্পর্কে জানেন এবং সবার কল্যাণ সম্পর্কেও জ্ঞাত রয়েছেন। কখন, কোন্ ব্যক্তির, কোন্ অভাব কি পরিমাণ দূর করা উচিত তা তাঁরই জানা আছে। মানুষের কাজ শুধু মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা—খরচ করার জায়গায় কৃপণতা না করা এবং এত বেশী খরচ না করা যে, আগামীকাল নিজেই ফকীর হয়ে যায়, পরিবার-পরিজনের হক আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, আর পরে আক্ষেপ করতে হয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

খরচ করার ব্যাপারে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ ঃ আলোচ্য আয়াতে সরাসরি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় সমগ্র উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এমন মিতাচার শিক্ষা দেওয়া, যা অপরের সাহায্যে প্রতিবন্ধকও না হয় এবং নিজের জন্যও বিপদ ডেকে না আনে। এ আয়াতের শানে-নুযূলে ইবনে মারদওয়াইহ্ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে

মাসউদের রেওয়ায়েতে এবং বগভী হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে একটি বালক উপস্থিত হয়ে আরয করল : আমার আম্মা আপনার কাছে একটি কোর্তা প্রদানের প্রার্থনা করেছেন। তখন গায়ের কোর্তাটি ছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে অন্য কোন কোর্তা ছিল না। তিনি বালকটিকে বললেন : অন্য সময় যখন তোমার আম্মার সওয়াল পূর্ণ করার সামর্থ্য আমার থাকে, তখন এসো। ছেলেটি ফিরে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল : আম্মা বলছেন যে, আপনার গায়ের কোর্তাটিই অনুগ্রহ করে দিয়ে দিন। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ শরীর থেকে কোর্তা খুলে ছেলেটিকে দিয়ে দিলেন। ফলে তিনি খালি গায়েই বসে রইলেন। নামাযের সময় হল। হযরত বেলাল (রা) আযান দিলেন। কিন্তু তিনি অন্য দিনের মত বাইরে এলেন না। সবার মুখমণ্ডলে চিন্তার রেখা দেখা দিল। কেউ কেউ ভেতরে গিয়ে দেখল যে, তিনি কোর্তা ছাড়া খালি গায়ে বসে আছেন। তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ্র পথে বেশি ব্যয় করে নিজে পেরেশান হওয়ার স্তর : এ আয়াত থেকে বাহ্যত এ ধরনের ব্যয় করার নিষেধাজ্ঞা জানা যায়, যার পর নিজেকেই অভাবগ্রস্ত হয়ে পেরেশানী ভোগ করতে হয়। ইমাম কুরতুবী বলেন : সাধারণ অবস্থায় যেসব মুসলমান ব্যয় করার পর কষ্টে পতিত হয় এবং পেরেশান হয়ে বিগত ব্যয়ের জন্য অনুতাপ ও আফসোস করে, আয়াতে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোরআন পাকের مَّحْسُورًا শব্দের মধ্যে এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু যারা এতটুকু সৎ-সাহসী যে, পরবর্তী কষ্টের জন্য মোটেই ঘাবড়ায় না এবং হকদারদের হকও আদায় করতে পারে, তাদের জন্য এ নিষেধাজ্ঞা নয়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাধারণ অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি আগামীকালের জন্য কিছুই সঞ্চয় করতেন না। যেদিন যা আসিত, সেদিনই তা নিঃশেষে ব্যয় করে দিতেন। প্রায়ই তাঁকে ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্টও ভোগ করতে হত এবং পেটে পাথর বাঁধার প্রয়োজনও দেখা দিত। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও এমন অনেক রয়েছেন, যাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে স্বীয় ধনসম্পদ নিঃশেষে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে দিয়েছেন; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে নিষেধ বা তিরস্কার কোন কিছুই করেন নি। এ থেকে বোঝা গেল যে, আয়াতের নিষেধাজ্ঞা তাদের জন্য, যারা ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্ট সহ্য করতে পারে না এবং খরচ করার পর 'খরচ না করলেই ভাল হত' বলে অনুতাপ করে। এরূপ অনুতাপ তাদের বিগত সৎকাজকে নষ্ট করে দেয়। তাই তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিশৃংখল খরচ নিষিদ্ধ : আসল কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতটি বিশৃংখলভাবে খরচ করতে নিষেধ করেছে। ভবিষ্যৎ অবস্থা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যা কিছু হাতে আছে তৎক্ষণাৎ তা খরচ করে ফেলা এবং আগামীকাল কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি এলে অথবা কোন ধর্মীয় প্রয়োজন দেখা দিলে অক্ষম হয়ে পড়া এটাই বিশৃংখলা (কুরতুবী)। কিংবা খরচ করার পর পরিবার-পরিজনের ওয়াজিব হক আদায় করতে অপারক হয়ে পড়াও

বিশৃংখলা। (মাযহারী) مَلُومًا مَحْسُورًا শব্দদ্বয় সম্পর্কে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, مَلُوم শব্দটি প্রথম অবস্থা অর্থাৎ কৃপণতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ কৃপণতার কারণে হাত গুটিয়ে রাখলে মানুষের কাছে তিরস্কৃত হতে হবে। مَحْسُورًا শব্দটি দ্বিতীয় অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ বেশী ব্যয় করে নিজে ফকীর হয়ে গেলে সে مَحْسُور অর্থাৎ শ্রান্ত, অক্ষম অথবা অনুতপ্ত হয়ে যাবে।

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

(৩১) দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সন্তানদের দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না। (কেননা) সবার রিযিকদাতাই আমি। তাদেরকেও রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। (রিযিকদাতা তোমরা হলে এরূপ চিন্তা করতে পারতে) নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একের পর এক মানবিক অধিকার সংক্রান্ত নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই ষষ্ঠ নির্দেশটি জাহিলিয়ত যুগের একটি নিপীড়নমূলক অভ্যাস সংশোধনের নিমিত্তে উল্লিখিত হয়েছে। জাহেলিয়ত যুগে কেউ কেউ জন্মের পরপরই সন্তানদেরকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করত, যাতে তাদের ভরণপোষণের বোঝা বহন করতে না হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই কর্মপন্থাটি যে অত্যন্ত জঘন্য ও ভ্রান্ত তাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। অনুধাবন করতে বলেছেন যে, রিযিকদানের তোমরা কে? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কাজ। তোমাদেরকেও তো তিনিই রিযিক দিয়ে থাকেন। যিনি তোমাদেরকে দেন, তিনিই তাদেরকেও দেবেন। তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হচ্ছ? বরং এ ক্ষেত্রে রিযিক দেওয়ার বর্ণনায় সন্তানদের কথা অগ্রে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি আগে তাদেরকে ও পরে তোমাদেরকে দেব। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্-তা'আলা যে বান্দাকে নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ ও অন্য দরিদ্রদের সাহায্য

করতে দেখেন, তাকে সে হিসাবেই দান করেন, যাতে সে নিজের প্রয়োজনও মেটাতে পারে এবং অন্যকেও সাহায্য করতে পারে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ انما تنصرون وترزقون بضعفائكم অর্থাৎ তোমাদের দুর্বল শ্রেণীর জন্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং তোমাদেরকে রিযিক দেওয়া হয়। এতে জানা গেল যে, পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণকারী পিতামাতা যা কিছু পায়, তা দুর্বল চিত্ত নারী ও শিশু সন্তানের ওসিলাতেই পায়।

মাস'আলা ঃ কোরআন পাকের এই বক্তব্য থেকে সে বিষয়ের উপরও আলোকপাত হয় যাতে বর্তমান বিশ্ব আপ্টে-পৃষ্ঠে জড়িত হয়ে পড়েছে। আজকাল জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার-পরিকল্পনাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। নিজেদেরকে রিযিকদাতা মনে করে নেওয়ার এই ভ্রান্ত ও জাহেলিয়ত সুলভ দর্শনের উপরই এর ভিত্তি রাখা হয়েছে। সন্তান হত্যার সমান গোনাহ্ না হলেও এটা যে গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۭ وَسَاۗءَ سَبِيْلًا ۝

---

(৩২) আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না (অর্থাৎ এর প্রাথমিক কারণাদি থেকেও বেঁচে থাক)। নিশ্চয় এটা (নিজেও) নিতান্ত অশ্লীল কাজ এবং (অন্যান্য অনিষ্টের দিক দিয়েও) মন্দ পথ! (কেননা, এর পরিণতিতে শত্রুতা, গোলযোগ এবং বংশবিকৃতি দেখা দেয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ব্যভিচারের অবৈধতা সম্পর্কে এটি সপ্তম নির্দেশ। এতে ব্যভিচার হারাম হওয়ার দু'টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এক. এটি একটি অশ্লীল কাজ। মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরম না থাকলে সে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অতঃপর তার দৃষ্টিতে ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায়। এ অর্থেই হাদীসে বলা হয়েছে اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت অর্থাৎ তোমার লজ্জাই যখন লোপ পাবে, তখন যা খুশী তাই করতে পার। এজন্যই রসূলুল্লাহ্ (সা) লজ্জাকে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সাব্যস্ত করেছেন। বলেছেন ঃ الحياء شعبة من الايمان (বুখারী)। দ্বিতীয় কারণ সামাজিক অনাসৃষ্টি। ব্যভিচারের কারণে এটা এত প্রসার লাভ করে যে, এর কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না। এর অশুভ পরিণাম অনেক সময় সমগ্র গোত্র ও সম্প্রদায়কে বরবাদ করে দেয়।

বর্তমান বিশ্বে গোলযোগ, চুরি-ডাকাতি ও হত্যার যে ছড়াছড়ি, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, তার অর্ধেকের চাইতে বেশী ঘটনার কারণ কোন পুরুষ ও নারী যারা এ অপকর্মে লিপ্ত। এ অপরাধটি যদিও সরাসরি বান্দার হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়; কিন্তু এখানে বান্দার হক সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এ অপরাধটি এমন অনেকগুলো অপরাধ সঙ্গে নিয়ে আসে, যার দ্বারা বান্দার হক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং হত্যা ও লুটতরাজের হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। একারণেই ইসলাম এ অপরাধটিকে সব অপরাধের চাইতে গুরুতর বলে সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তিও সব অপরাধের শাস্তির চাইতে কঠোর বিধান করেছে। কেননা, এই একটি অপরাধ অন্যান্য শত শত অপরাধকে নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: সপ্ত আকাশ এবং সপ্ত পৃথিবী বিবাহিত যিনাকারদের প্রতি অভিসম্পাত করে। জাহান্নামে এদের লজ্জাস্থান থেকে এমন দুর্গন্ধ ছড়াবে যে, জাহান্নামীরাও তা থেকে অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে। আগুনের আযাবের সাথে সাথে জাহান্নামে তাদের লাঞ্ছনাও হতে থাকবে।—(বাযযার)

হযরত আবূ হোরায়রা (রা)-র বাচনিক অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: যিনাকার ব্যক্তি যিনা করার সময় মু'মিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মু'মিন থাকে না। মদ্যপায়ী মদ্য পান করার সময় মুমিন থাকে না। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে। আবূ দাউদের রেওয়ায়েতে এর ব্যাখ্যা এই যে, এসব অপরাধী যখন অপরাধে লিপ্ত হয়, তখন ঈমান তাদের অন্তর থেকে বাইরে চলে আসে। এরপর যখন অপরাধ থেকে ফিরে আসে, তখন ঈমানও ফিরে আসে।—(মাযহারী)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ۝٣٣

(৩৩) সে প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন; কিন্তু ন্যায়ভাবে। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দান করি। অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমা লংঘন না করে। নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যে ব্যক্তির হত্যাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে (হত্যা করা জায়েয। অর্থাৎ যখন কোন শরীয়তসম্মত বিধানের কারণে হত্যা করা ওয়াজিব কিংবা জায়েয হয়ে যায়, তখন তা আর হারামের আওতায় থাকে না।)

যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, আমি তার (সত্যিকার অথবা নিয়োজিত) উত্তরাধিকারীকে (কিসাস গ্রহণের) ক্ষমতা দান করেছি। অতএব হত্যার ব্যাপারে তার (শরীয়তের) সীমা লংঘন করা উচিত হবে না। [অর্থাৎ হত্যার নিশ্চিত প্রমাণ ব্যতিরেকে হত্যাকারীকে হত্যা করবে না। হত্যাকারীর যেসব আত্মীয়-স্বজন হত্যাকাণ্ডে জড়িত নয়, শুধু প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে তাদেরকে হত্যা করবে না। এছাড়া হত্যাকারীকেও শুধু হত্যাই করবে, নাক, কান অথবা হাত-পা কেটে 'মুসলা' (অঙ্গবিকৃত) করবে না কেননা] সে ব্যক্তি (কিসাসের সীমালংঘন না করলে শরীয়তের আইনে) আল্লাহ্‌র সাহায্যের যোগ্য। (আর সে যদি বাড়াবাড়ি করে থাকে তবে অপর পক্ষ উৎপীড়িত হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র সাহায্যযোগ্য হওয়ার কদর করা এবং সীমালংঘন করে এ নিয়ামতকে বিনষ্ট না করা।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অন্যায় হত্যার অবৈধতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এটা অষ্টম নির্দেশ। অন্যায় হত্যা যে মহা অপরাধ, তা বিশ্বের দলমত ও ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছে স্বীকৃত। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : একজন মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চাইতে আল্লাহ্‌র কাছে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেওয়া লঘু অপরাধ। কোন কোন রেওয়ায়েতে এতৎসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলার সপ্ত আকাশ ও সপ্ত ভূমণ্ডলের অধিবাসীরা সম্মিলিতভাবে কোন মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।—(ইবনে মাজা, মসনদ হাসান, বায়হাকী-মাযহারী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের হত্যাকাণ্ডে একটি কথা দ্বারা হত্যাকারীর সাহায্য করে, হাশরের মাঠে সে যখন আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হবে, তখন তার কপালে লেখা থাকবে آئس من رحمة الله অর্থাৎ এই লোকটিকে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ করে দেওয়া হয়েছে।—(মাযহারী, ইবনে মাজা হইতে)

বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও হযরত মুয়াবিয়ার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : প্রত্যেক গোনাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়; কিন্তু যে ব্যক্তি কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা যে ব্যক্তি জেনেশুনে ইচ্ছাপূর্বক কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তার গোনাহ্ ক্ষমা করা হবে না।

অন্যায় হত্যার ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে মুসলমান আল্লাহ্ এক এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল বলে সাক্ষ্য দেয়, তার রক্ত হালাল নয়; কিন্তু তিনটি কারণে তা হালাল হয়ে যায়। এক. বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সে যদি যিনা করে, তবে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করাই তার শরীয়তসম্মত শাস্তি। দুই. সে যদি অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করে, তবে তার শাস্তি এই যে, নিহত ব্যক্তির ওলী তাকে কিসাস হিসাবে হত্যা করতে পারে। তিন. যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তার শাস্তিও হত্যা।

কিসাস নেওয়ার অধিকার কার? আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই অধিকার নিহত ব্যক্তির ওলীর। যদি রক্ত সম্পর্কিত ওলী না থাকে, তবে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার-প্রধান এ অধিকার পাবে। কারণ, সরকারও এক দিক দিয়ে সব মুসলমানের ওলী। তাই তফসীরের সার-সংক্ষেপে 'সত্যিকার অথবা নিয়োজিত ওলী' লেখা হয়েছে।

অন্যায়ের জওয়াব অন্যায় নয়—ইনসাফ। অপরাধীর শাস্তির বেলায়ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে : فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ এটা ইসলামী আইনের একটা বিশেষ নির্দেশ। এর সারমর্ম এই যে, অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মাধ্যমে নেওয়া জায়েয নয়। প্রতিশোধের বেলায়ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। যে পর্যন্ত নিহত ব্যক্তির ওলী ইনসাফ সহকারে নিহতের প্রতিশোধ কিসাস নিতে চাইবে, সেই পর্যন্ত শরীয়তের আইন তার পক্ষে থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা তার সাহায্যকারী হবে পক্ষান্তরে সে যদি প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে কিসাসের সীমালংঘন করে, তবে সে মযলুমের পরিবর্তে জালিমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এবং জালিম মযলুম হয়ে যাবেন। আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর আইন এখন তার সাহায্য করার পরিবর্তে প্রতিপক্ষের সাহায্য করবে এবং তাকে জুলুম থেকে বাঁচাবে।

মূর্খতা যুগের আরবে সাধারণত এক ব্যক্তির হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারীর পরিবার অথবা সঙ্গী-সাথীদের মধ্য থেকে যাকেই পাওয়া যেত, তাকেই হত্যা করা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি গোত্রের সরদার অথবা বড়লোক হলে তার পরিবর্তে শুধু এক ব্যক্তিকে কিসাস হিসাবে হত্যা করা যথেষ্ট মনে করা হত না, বরং এক খুনের পরিবর্তে দু-তিন কিংবা আরও বেশি মানুষের প্রাণ সংহার করা হত। কেউ কেউ প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে হত্যাকারীকে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হত না, বরং তার নাক, কান ইত্যাদি কেটে অঙ্গ বিকৃত করা হত। ইসলামী কিসাসের আইনে এগুলো সব অতিরিক্ত ও হারাম। তাই فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ আয়াতে এ ধরনের বাড়াবাড়িকে প্রতিরোধ করা হয়েছে।

একটি স্মরণীয় গল্প : একজন মুজাহিদ ইমামের সামনে জনৈক ব্যক্তি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইসলামী ইতিহাসের সর্বাধিক জালিম এবং কুখ্যাত ব্যক্তি। সে হাজারো সাহাবী ও তাবেয়ীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তাই সাধারণভাবে তাকে মন্দ বলা যে মন্দ, সেদিকে কারও লক্ষ্য থাকে না। যে বুযুর্গ ব্যক্তির সামনে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে দোষারোপ করা হয়, তিনি দোষা-রোপকারীকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কাছে এই অভিযোগের পক্ষে কোন সনদ অথবা সাক্ষ্য রয়েছে কি? সে বলল : না। তিনি বললেন : যদি আল্লাহ্ তা'আলা জালিম হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কাজ থেকে হাজারো নিরপরাধ নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ নেন, তবে মনে রেখ, যে ব্যক্তি হাজ্জাজের উপর কোন জুলুম করে, তাকেও প্রতিশোধের কবল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা তার কাছ থেকেও হাজ্জাজের প্রতিশোধ গ্রহণ

করবেন। তাঁর আদালতে কোন অবিচার নেই যে, অসৎ ও পাপী বান্দাদেরকে যা ইচ্ছা, তা দোষারোপ ও অপবাদ আরোপের জন্য অন্যদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হবে।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

(৩৪) আর, এতীমের মালের কাছেও যেয়ো না, একমাত্র তার কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা ছাড়া ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (৩৫) মেপে দেওয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। এটা উত্তম এর পরিণাম শুভ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এতীমের মালের কাছে যেয়ো না (অর্থাৎ তাতে হস্তক্ষেপ করো না) কিন্তু এমন পন্থায়, যা (শরীয়তের আইনে) উত্তম, যে পর্যন্ত সে প্রাপ্তবয়স্ক না হয়ে যায়। এবং (বৈধ) অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় (কিয়ামতে) অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (বান্দা আল্লাহ্‌র সাথে যেসব অঙ্গীকার করেছে এবং মানুষের সাথে যেসব অঙ্গীকার করে থাকে, সবই এর অন্তর্ভুক্ত।) এবং (পরিমেয় বস্তুকে) যখন মেপে দাও তখন পুরোপুরি মেপে দাও এবং (ওজনের বস্তুকে) সঠিক দাঁড়িপাল্লা দ্বারা ওজন করে দাও। এটা (প্রকৃতই) উত্তম এবং এর পরিণাম শুভ। (পরকালে সওয়াব এবং দুনিয়াতে সুখ্যাতি, যা ব্যবসা ক্ষেত্রে উন্নতির উপায়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আর্থিক হক সম্পর্কিত তিনটি নির্দেশ যথা—নবম, দশম ও একাদশতম নির্দেশে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দৈহিক ও শারীরিক হক উল্লেখ করা হয়েছিল। এখানে আর্থিক হক বর্ণিত হয়েছে।

এতীমদের মাল সম্পর্কে সাবধানতা : প্রথম আয়াতে এতীমদের মালের রক্ষণাবেক্ষণ এবং এ ব্যাপারে সাবধানতা সম্পর্কে নবম নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এতে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এতীমদের মালের কাছেও যেয়ো না। অর্থাৎ এতে যেন শরীয়তবিরোধী অথবা এতীমদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না হয়। এতীমদের মালের হিফাযত ও ব্যবস্থাপনা যাদের দায়িত্বে অর্পিত হয় এ ব্যাপারে তাদের খুব সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। তারা শুধু এতীমদের স্বার্থ দেখে ব্যয় করবে। নিজেদের খেয়াল-খুশীতে অথবা কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে ব্যয় করবে না। এ কর্মধারা ততদিন

অব্যাহত থাকবে, যতদিন এতীম শিশু যৌবনে পদার্পণ করে নিজের মালের হিফাযত নিজেই করতে সক্ষম না হয়। এর সর্বনিম্ন বয়স পনর বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স আঠার বছর।

অবৈধ পন্থায় যে কোন ব্যক্তির মাল খরচ করা জায়েয নয়। এখানে বিশেষ করে এতীমের কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, সে নিজে কোন হিসাব নেওয়ার যোগ্য নয়। অন্যেরাও এ সম্পর্কে জানতে পারে না। যেখানে মানুষের পক্ষ থেকে হক দাবী করার কেউ না থাকে সেখানে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দাবী কঠোরতর হয়ে যায়। এতে ত্রুটি হলে সাধারণ মানুষের হকের তুলনায় গোনাহ্ অধিক হয়।

অঙ্গীকার পূর্ণ ও কার্যকরী করার নির্দেশ ঃ অঙ্গীকার পূর্ণ করার তাকীদ হচ্ছে দশম নির্দেশ। অঙ্গীকার দুই প্রকার। এক. যা বান্দা ও আল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে; যেমন সৃষ্টির সূচনাকালে বান্দা অঙ্গীকার করেছিল যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের পালনকর্তা। এ অঙ্গীকারের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া এই যে, তাঁর নির্দেশাবলী মানতে হবে এবং সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। এ অঙ্গীকার তো সে সময় প্রত্যেকেই করেছে—দুনিয়াতে সে মু'মিন হোক কিংবা কাফির। এছাড়া মু'মিনের একটি অঙ্গীকার রয়েছে যা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্যের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এর সারমর্ম আল্লাহ্‌র বিধানাবলীর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন।

দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকার যা এক মানুষ অন্য মানুষের সাথে করে। এতে ব্যক্তিবর্গ অথবা গোষ্ঠিবর্গের মধ্যে সম্পাদিত সমস্ত রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও লেন-দেন সম্পর্কিত চুক্তি অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করা মানুষের জন্য ওয়াজিব এবং দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে যেসব চুক্তি শরীয়তবিরোধী নয়, সেগুলো পূর্ণ করা ওয়াজিব। শরীয়তবিরোধী হলে প্রতিপক্ষকে জাত করে তা খতম করে দেওয়া ওয়াজিব। যে চুক্তি পূর্ণ করা ওয়াজিব, যদি কোন এক পক্ষ তা পূর্ণ না করে, তবে আদালতে উত্থাপন করে তাকে পূর্ণ করতে বাধ্য করার অধিকার প্রতিপক্ষের রয়েছে। চুক্তির স্বরূপ হচ্ছে দুই পক্ষ সম্মত হয়ে কোন কাজ করা বা না করার অঙ্গীকার করা। যদি কোন লোক এক তরফাভাবে কারও সাথে ওয়াদা করে যে, অমুক বস্তু তাকে দেব অথবা অমুক কাজ করে দেব, তবে তা পূর্ণ করাও ওয়াজিব। কেউ কেউ একেও উল্লিখিত অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন; কিন্তু পার্থক্য এই যে, দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলে ব্যাপারটি আদালতে উত্থাপন করে তাকে চুক্তি পালনে বাধ্য করা যায়; কিন্তু এক তরফা চুক্তিকে আদালতে উত্থাপন করে পূর্ণ করতে বাধ্য করা যায় না। হ্যাঁ শরীয়তসম্মত ওজর ব্যতিরেকে কারও সাথে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করলে সে গোনাহ্গার হবে। হাদীসে একে কার্যত নিফাক বলা হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا —অর্থাৎ কিয়ামতে অন্যান্য ফরয, ওয়াজিব কর্ম এবং আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পালন করা বা না করা সম্পর্কে

যেমন জিজ্ঞাসাবাদ হবে, তেমনি পারস্পরিক চুক্তি সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হবে। এখানে শুধু 'প্রশ্ন করা হবে' বলে বক্তব্য শেষ করে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন করার পর কি হবে, সেটাকে অব্যক্ত রাখার মধ্যে বিপদ যে গুরুতর হবে, সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

একাদশতম নির্দেশ হচ্ছে লেন-দেনের ক্ষেত্রে মাপ ও ওজন পূর্ণ করার আদেশ এবং কম মাপার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে। এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা মুতাফ্‌ফিফীনে উল্লিখিত আছে।

মাস'আলা ঃ ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন ঃ আয়াতে মাপ ও ওজন সম্পর্কে যে নির্দেশ আছে, তার সারমর্ম এই যে, যার যতটুকু হক, তার চাইতে কম দেওয়া হারাম। কাজেই কর্মচারী যদি তার নির্দিষ্ট ও অর্পিত কাজের চাইতে কম কাজ করে অথবা নির্ধারিত সময়ের চাইতে কম সময় দেয় অথবা শ্রমিক যদি কাজ চুরি করে, তবে তাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে।

কম মাপ দেওয়া ও কম ওজন করার নিষেধাজ্ঞা ঃ মাস'আলা— أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ তফসীর বাহ্‌রে মুহীতে আবূ হাইয়ান বলেন ঃ এ আয়াতে মাপ পূর্ণ করার দায়িত্ব বিক্রেতার উপর অর্পিত হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, মাপ ও ওজন পূর্ণ করার জন্য বিক্রেতা দায়ী।

আয়াতের শেষে মাপ ও ওজন পূর্ণ করা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا —এতে মাপ ও ওজন সমান করা সম্পর্কে দুটি বিষয় বলা হয়েছে।

এক. এর উত্তম হওয়া। অর্থাৎ এরূপ করা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম। শরীয়তের আইন ছাড়াও যুক্তি ও স্বভাবগতভাবেও কোন বিবেকবান ব্যক্তি কম মাপা ও কম ওজন করাকে ভাল মনে করতে পারে না। দুই. এর পরিণতি শুভ। এতে পরকালের পরিণতি তথা সওয়াব ও জান্নাত ছাড়াও দুনিয়ার নিকৃষ্ট পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত আছে। কোন ব্যবসা ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না, যে পর্যন্ত জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে না পারে। বিশ্বাস ও আস্থা উপরোক্ত বাণিজ্যিক সততা ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾

---

(৩৬) যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। (৩৭) পৃথিবীতে দম্ভভরে পদ-চারণ করো না। নিশ্চয় তুমি তো ভূ-পৃষ্ঠকে কখনই বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না। (৩৮) এ সবের মধ্যে যেগুলো মন্দ কাজ সেগুলো তোমার পালনকর্তার কাছে অপছন্দনীয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, তাকে কার্যে পরিণত করো না। (কেননা) কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ—এদের প্রত্যেকটিকেই (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞেস করা হবে (যে কান ও চক্ষুকে কি কি কাজে ব্যবহার করা হয়েছে? সেই কাজ ভাল ছিল, না মন্দ? প্রমাণহীন বিষয়ের কল্পনা অন্তরে কেন স্থান দিয়েছে?) এবং ভূ-পৃষ্ঠে গর্বভরে বিচরণ করো না। (কেননা) তুমি (ভূ-পৃষ্ঠে সজোরে পদক্ষেপ করে পদভারে) ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং (দেহকে উঁচু করে) পাহাড়ের উচ্চতায় পৌঁছতে পারবে না। (উল্লিখিত) এসব মন্দ কাজ তোমার পালনকর্তার কাছে (সম্পূর্ণ) অপছন্দনীয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে দ্বাদশতম ও ত্রয়োদশতম নির্দেশ সাধারণ সামাজিকতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। দ্বাদশতম নির্দেশে জানা ব্যতীত কোন বিষয়কে কার্যে পরিণত করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এখানে এ বিষয়ে সচেতন রাখা জরুরী যে, জানার স্তর বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। এক প্রকার জানা হচ্ছে পুরোপুরি নিশ্চয়তার স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া এবং বিপরীত দিকের কোন সন্দেহও অবশিষ্ট না থাকা। দ্বিতীয় জানা হচ্ছে প্রবল ধারণার স্তরে পৌঁছা। এতে বিপরীত দিকের সম্ভাবনাও থাকে। এমনিভাবে বিধানাবলীও দু'প্রকার। এক. অকাট্য ও নিশ্চিত বিধানাবলী; যেমন আকায়েদ ও ধর্মের মূলনীতিসমূহ। এগুলোতে প্রথম স্তরের জ্ঞান বাঞ্ছনীয়। এ ছাড়া আমল করা জায়েয নয়। দুই. ظنيات অর্থাৎ ধারণা প্রসূত বিধানাবলী, যেমন শাখাগত কর্ম সম্পর্কিত বিধান। এই বর্ণনার পর আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, নিশ্চিত ও অকাট্য বিধানাবলীতে প্রথম স্তরের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ আকায়েদ ও ইসলামী মূলনীতিসমূহে এরূপ জ্ঞান না হলে তার কোন মূল্য নেই। শাখাগত ধারণা প্রসূত বিষয়াদিতে দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ প্রবল ধারণাই যথেষ্ট। —(বয়ানুল কোরআন)

কান চক্ষু ও অন্তর সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ: إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا —এ আয়াতে বলা হয়েছে

যে, কিয়ামতের দিন কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে ঃ কানকে প্রশ্ন করা হবে ঃ তুমি সারা জীবন কি কি শুনেছ ? চক্ষুকে প্রশ্ন করা হবে ঃ তুমি সারা জীবনে কি কি দেখছ ? অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে ঃ সারা জীবনে মনে কি কি কল্পনা করেছ এবং কি কি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ ? যদি কান দ্বারা শরীয়ত বিরোধী কথাবার্তা শুনে থাকে, যেমন কারও গীবত এবং হারাম গানবাদ্য কিংবা চক্ষু দ্বারা শরীয়তবিরোধী বস্তু দেখে থাকে; যেমন ভিন্ন স্ত্রী সুশ্রী বালকের প্রতি কুদৃষ্টি করা কিংবা অন্তরে কোরআন ও সুন্নাহ্বিরোধী বিশ্বাসকে স্থান দিয়ে থাকে অথবা কারও সম্পর্কে প্রমাণ ছাড়া কোন অভিযোগ মনে কায়েম করে থাকে, তবে এ প্রশ্নের ফলে আযাব ভোগ করতে হবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ প্রদত্ত সব নিয়ামত সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হবে। لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে সব নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এসব নিয়ামতের মধ্যে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে বিশেষভাবে এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে।

তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে এরূপ অর্থও বর্ণিত হয়েছে যে, পূর্ববর্তী বাক্যে বলা হয়েছিল لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ —অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, তা কার্যে পরিণত করো না। এর সাথে সাথে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি জানা-শোনা ছাড়াই উদাহরণত কাউকে দোষারোপ করল কিংবা কোন কাজ করল, যদি তা কানে শোনার বস্তু হয়ে থাকে, তবে কানকে প্রশ্ন করা হবে, যদি চোখে দেখার বস্তু হয়, তবে চোখকে প্রশ্ন করা হবে এবং অন্তর দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করার বস্তু হলে অন্তরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, অন্তরে প্রতিষ্ঠিত অভিযোগ ও কল্পনাটি সত্য ছিল, না মিথ্যা ? প্রত্যেক ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এ ব্যাপারে স্বয়ং সাক্ষ্য দেবে। এটা হাশরের ময়দানে ভিত্তিহীন অভিযোগকারী এবং না জেনে আমলকারীদের জন্য অত্যন্ত লাঞ্ছনার কারণ হবে।

সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে ঃ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

অর্থাৎ আজ (কিয়ামতের দিন) আমি এদের (অপরাধীদের) মুখ মোহর করে দেব। ফলে তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের চরণসমূহ সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের।

এখানে কান, চক্ষু ও অন্তরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ স্বভাবত এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে এসব ইন্দ্রিয়চেতনা ও অনুভূতি এজন্যই দান করেছেন, যাতে মনে যেসব কল্পনা ও বিশ্বাস আসে, সেগুলোকে এসব ইন্দ্রিয় ও চেতনা দ্বারা পরীক্ষা করে নেয়। বিশুদ্ধ হলে তা কার্যে পরিণত করবে এবং ভ্রান্ত হলে তা থেকে বিরত থাকবে।

যে ব্যক্তি এগুলোকে কাজে না লাগিয়ে অজানা বিষয়াদির পেছনে লেগে পড়ে, সে আল্লাহ্র এই নিয়ামতসমূহের নাশোকরী করে।

অতঃপর পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় দ্বারা মানুষ বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান লাভ করে—কর্ণ চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা এবং সমস্ত দেহে ছড়ানো ঐ অনুভূতি, যদ্দ্বারা উত্তাপ ও শৈত্য উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু স্বভাবগতভাবে মানুষ অধিকতর জ্ঞান কর্ণ ও চক্ষু দ্বারা লাভ করে। নাকে ঘ্রাণ নিয়ে, জিহবা দ্বারা আস্বাদন করে এবং হাতে স্পর্শ করে যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা হয়, সেগুলো শোনা ও দেখার বিষয়াদির তুলনায় অনেক কম। এখানে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত তাই। এতদুভয়ের মধ্যেও কান অগ্রে উল্লিখিত হয়েছে। কোরআন পাকের অন্যত্র যেখানেই এ দুটি ইন্দ্রিয় এক সাথে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে কানকেই অগ্রে রাখা হয়েছে। এর কারণও সম্ভবত এই যে, মানুষের জানা বিষয়াদির মধ্যে কানে শোনার বিষয়াদির সংখ্যাই বেশি। এগুলোর তুলনায় চোখে দেখার বিষয়াদি অনেক কম।

দ্বিতীয় আয়াতে ত্রয়োদশতম নির্দেশ এই ঃ ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে পদচারণ করো না। অর্থাৎ এমন ভঙ্গিতে চলো না, যদ্দ্বারা অহংকার ও দম্ভ প্রকাশ পায়। এটা নির্বোধসুলভ কাজ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেন এভাবে চলে ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করে দিতে চায় এটা তার সাধ্যাতীত। বুক টানকরে চলার উদ্দেশ্য যেন অনেক উঁচু হওয়া। আল্লাহ্র সৃষ্ট পাহাড় তার চাইতে অনেক উঁচু। অহংকার প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তরের একটি কবীরা গোনাহ্। মানুষের ব্যবহার ও চালচলনে যেসব বিষয় থেকে অহংকার ফুটে ওঠে, সেগুলোও অবৈধ। অহং-কারের অর্থ হচ্ছে নিজেকে অন্যের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং অন্যকে নিজের তুলনায় হেয় ও ঘৃণ্য মনে করা। হাদীসে এর জন্য কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

ইমাম মুসলিম হযরত আয়ায ইবনে আম্মার (রা)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করে-ছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে, নম্রতা ও হেয়তা অবলম্বন কর। কেউ যেন অন্যের উপর গর্ব ও অহং-কারের পথ অবলম্বন না করে এবং কেউ যেন কারও উপর জুলুম না করে।—(মাযহারী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার থাকে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। —(মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রার এক রেওয়ায়েতে হাদীসে কুদসীতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন যে, আল্লাহ্ বলেন ঃ বড়ত্ব আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুঙ্গি। যে ব্যক্তি আমার কাছ থেকে এগুলো কেড়ে নিতে চায়, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (চাদর ও লুঙ্গি বলে পোশাক বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা দেহীও নন বা দৈহিক অবয়ব বিশিষ্টও নন যে, পোশাক দরকার হবে। তাই এখানে আল্লাহ্র মহত্ত্বগুণ বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি এ গুণে আল্লাহ্র শরীক হতে চায় সে জাহান্নামী।)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যারা অহংকার করে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে ক্ষুদ্র পিপিলিকার সমান মানবাকৃতিতে উত্থিত করা হবে। তাদের উপর

চতুর্দিক থেকে অপমান ও লাঞ্ছনা বর্ষিত হতে থাকবে। তাদেরকে জাহান্নামের একটি কারা প্রকোষ্ঠের দিকে হাঁকানো হবে, যার নাম বুলস। তাদের উপর প্রখরতর অগ্নি প্রজ্বলিত হবে এবং তাদেরকে পান করার জন্য জাহান্নামীদের দেহ থেকে নির্গত পুঁজ রক্ত ইত্যাদি দেওয়া হবে।—(তিরমিযী)

খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা) একবার এক ভাষণে বলেন : আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে শুনেছি, যে ব্যক্তি বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে উচ্চ করে দেন। ফলে সে নিজের দৃষ্টিতে ছোট, কিন্তু অন্য সবার দৃষ্টিতে বড় হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অহংকার করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হেয় করে দেন। ফলে সে নিজের দৃষ্টিতে বড় এবং অন্য সবার দৃষ্টিতে কুকুর ও শূকরের চাইতেও নিকৃষ্ট হয়।—(মাযহারী)

উল্লিখিত নির্দেশাবলী বর্ণনা করার পর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا —অর্থাৎ উল্লিখিত সব মন্দ কাজ আল্লাহ্র কাছে মকরূহ ও অপছন্দনীয়।

উল্লিখিত নির্দেশাবলীর মধ্যে যেগুলো হারাম ও নিষিদ্ধ, সেগুলো যে মন্দ ও অপছন্দ-নীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কিছু করণীয় আদেশও আছে; যেমন পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা ইত্যাদি; যেহেতু এগুলোর মধ্যেও উদ্দেশ্য এদের বিপরীত কর্ম থেকে বেঁচে থাকা; অর্থাৎ পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়া থেকে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা থেকে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করা থেকে বেঁচে থাকা, তাই এসবগুলোও হারাম ও অপছন্দনীয়।

হুঁশিয়ারি : পূর্বোল্লিখিত পনেরটি আয়াতে বর্ণিত নির্দেশাবলী একদিক দিয়ে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় সাধনা ও কর্মেরই ব্যাখ্যা, যা আঠারো আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল : وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا এতে ব্যক্ত করা হয়েছিল যে, প্রত্যেক চেষ্টা ও কর্মই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় নয়। বরং যে চেষ্টা ও কর্ম রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সুন্নত ও শিক্ষার সাথে সঙ্গতিশীল, শুধু সেগুলোই গ্রহণীয়। এসব নির্দেশে গ্রহণীয় চেষ্টা ও কর্মের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো বর্ণিত হয়ে গেছে। তন্মধ্যে প্রথমে আল্লাহ্র হক ও পরে বান্দার হক বর্ণিত হয়েছে।

এই পনেরটি আয়াত সমগ্র তওরাতের সার-সংক্ষেপ : হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : সমগ্র তওরাতের বিধানাবলী সূরা বনী ইসরাঈলের পনের আয়াতে সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে।—(মাযহারী)

ذٰلِكَ مِمَّآ أَوْحٰىٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا

اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿٣٩﴾ اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ

وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ؕ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ

صَرَّفْنَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ؕ وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ﴿٤١﴾ قُلْ

لَّوْ كَانَ مَعَهٗۤ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ

سَبِيْلًا ﴿٤٢﴾ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ﴿٤٣﴾ تُسَبِّحُ لَهُ

السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ

بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿٤٤﴾

(৩৯) এটা ঐ হিকমতের অন্তর্ভুক্ত, যা আপনার পালনকর্তা আপনাকে ওহী মারফত দান করেছেন। আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করবেন না। তাহলে অভিযুক্ত ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন। (৪০) তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন এবং নিজের জন্য ফেরেশতাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয় তোমরা গুরুতর কথাবার্তা বলছ। (৪১) আমি এই কোরআনে নানাভাবে বুঝিয়েছি, যাতে তারা চিন্তা করে। অথচ এতে তাদের কেবল বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। (৪২) বলুন ঃ তাদের কথামত যদি তাঁর সাথে অন্যান্য উপাস্য থাকত ; তবে তারা আরশের মালিক পর্যন্ত পৌঁছার পথ অন্বেষণ করত। (৪৩) তিনি নেহায়েত পবিত্র ও মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে থাকে তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে (৪৪) সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এবং এমন কিছু নেই যা তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে মুহাম্মদ (সা), এগুলো অর্থাৎ উল্লিখিত নির্দেশাবলী] ঐ হিকমতের অংশ, যা আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন। (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না। নতুবা তুমি অভিযুক্ত, বিতাড়িত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (উল্লিখিত নির্দেশাবলী প্রদানের সূচনাও তওহীদের বিষয়বস্তু দ্বারা করা হয়েছিল এবং শেষও এর মাধ্যমেই করা হয়েছে। এরপরও তওহীদের বিষয়বস্তু

বর্ণিত হচ্ছে যে, পূর্বে যখন শিরকের মন্দ ও বাতিল হওয়া জানা গেল, তখন এরপরও কি তোমরা তওহীদের পরিপন্থী বিষয়াদিতে বিশ্বাস কর? উদাহরণত) তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং নিজে ফেরেশতা-দেরকে (নিজের) কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? (আরবের মূর্খরা ফেরেশতাদেরকে আল্লা-হ্‌র কন্যারূপে আখ্যায়িত করত। এটা দু'কারণে বাতিল। আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান সাব্যস্ত এবং দুই, সন্তান ও কন্যাসন্তান যাদেরকে কেউ নিজের জন্য পছন্দ করে না—অকেজো বলে মনে করে। এর ফলে আল্লাহ্‌কে আরও একটি দোষে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।) নিশ্চয়ই তোমরা গুরুতর কথা বলছ। (পরিতাপের বিষয় যে, শিরকের খণ্ডন ও তওহীদের বিষয়বস্তুকে) আমি এই কোরআনে নানাভাবে বর্ণনা করেছি, যাতে তারা বুঝে নেয়। (বিভিন্ন পন্থায় বারাবর তওহীদের বিষয়বস্তু সপ্রমাণ এবং শিরক বাতিল করা সত্ত্বেও তওহীদের প্রতি) তাদের অনীহাই কেবল বৃদ্ধি পায়। আপনি (শিরক বাতিল করার জন্য তাদেরকে) বলুন ঃ যদি তাঁর (সত্য উপাস্যের) সাথে অন্য উপাস্যও (অংশীদার) হত, যেমন তারা বলে; তবে তদবস্থায় আরশের মালিক (সত্যিকার আল্লাহ্) পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা তারা (অর্থাৎ অন্য উপাস্যরা কবে) বের করে নিত। (অর্থাৎ যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার সাব্যস্ত কর, যদি তারা বাস্তবিকই অংশীদার হত, তবে আর-শের মালিক আল্লাহ্‌কে আক্রমণ করে বসত এবং পথ খুঁজে নিত। যখন কথিত উপাস্য শক্তিগুলোর মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ বেঁধে যেত, তখন পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা কিভাবে চলতে পারত। অথচ দুনিয়া যে একটি অটল ব্যবস্থার অধীনে চালু রয়েছে, তা প্রত্যেকের দৃষ্টির সামনে বর্তমান আছে। তাই দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা বিশুদ্ধভাবে চালু থাকাই এ বিষয়ের প্রমাণ হল যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ তাঁর অংশীদার নেই। এ থেকে প্রমাণিত হল যে) তারা যা কিছু বলে, আল্লাহ্ তা'আলা তা থেকে পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে। (তিনি এমন পবিত্র যে) সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু (ফেরেশতা, মানুষ ও জিন) রয়েছে সবাই (ব্যক্তরূপে অথবা অবস্থাগতভাবে) তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছে এবং (এই পবিত্রতা বর্ণনা) শুধু বিবেকবান মানুষ ও জিনরাই করে না, কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ্ (অর্থাৎ পবিত্রতা বর্ণনাকে) বোঝ না। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِذًا لَّابْتَغَوْا আয়াতে তওহীদের প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে যে, যদি সমগ্র সৃষ্ট জগতের স্রষ্টা, মালিক ও পরিচালক এক আল্লাহ্ না হন, বরং তাঁর আল্লাহ্‌তে অন্যরাও শরীক হয়, তবে অবশ্যই তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্যও হবে। মতানৈক্য হলে সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা, তাদের সবার মধ্যে চিরস্থায়ী সন্ধি হওয়া এবং অনন্তকাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকা স্বভাবগতভাবে অসম্ভব। এ প্রমাণটি এখানে নেতিবাচক ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু কালাম শাস্ত্রের গ্রন্থাদিতে এ প্রমাণটির

ইতিবাচক যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক হওয়াও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শিক্ষিত পাঠকবর্গ সেখানে দেখে নিতে পারেন।

যমিন, আসমান ও এতদুভয়ের সব বস্তুর তসবীহ্ পাঠ করার অর্থ ঃ ফেরেশতারা সবাই এবং ঈমানদার মানব ও জিনদের তসবীহ্ পাঠ করার বিষয়টি জাজ্বল্যমান—সবারই জানা। কাফির মানব ও জিন বাহ্যত তসবীহ্ পাঠ করে না। এমনিভাবে জগতের অন্যান্য বস্তু, যেগুলোকে বিবেক ও চেতনাহীন বলা হয়ে থাকে, তাদের তসবীহ্ পাঠ করার অর্থ কি? কোন কোন আলিম বলেন ঃ তাদের তসবীহ্ পাঠের অর্থ অবস্থাগত তসবীহ্। অর্থাৎ তাদের অবস্থার সাক্ষ্য। কেননা আল্লাহ্ ব্যতীত সব বস্তুর সমষ্টিগত অবস্থা ব্যক্ত করেছে যে, তারা স্বীয় অস্তিত্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; বরং স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় কোন বৃহৎ শক্তির মুখাপেক্ষী। অবস্থার এই সাক্ষ্যই হচ্ছে তাদের তসবীহ্।

কিন্তু অন্য চিন্তাবিদদের উক্তি এই যে, ইচ্ছাগত তসবীহ্ তো শুধু ফেরেশতা এবং ঈমানদার জিন ও মানবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ্ তা'আলা জগতের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুকে তসবীহ্ পাঠকারী বানিয়ে রেখেছেন। কাফিররাও সাধারণভাবে আল্লাহ্‌কে মানে এবং তাঁর মহত্ত্ব স্বীকার করে। যেসব বস্তুবাদী নাস্তিক এবং আজকালকার কম্যুনিস্ট বাহ্যত আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব মুখে স্বীকার করে না তাদের অস্তিত্বের প্রত্যেকটি অংশও বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহ্‌র তসবীহ্ পাঠ করছে; যেমন বৃক্ষ, প্রস্তর, মৃত্তিকা ইত্যাদি সব বস্তু আল্লাহ্‌র তসবীহ্ পাঠে মশগুল রয়েছে। কিন্তু তাদের এই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলক তসবীহ্ সাধারণ মানুষের শ্রুতিগোচর হয় না। কোরআন পাকের وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ উক্তি একথা প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিগত তসবীহ্ এমন জিনিস, যা সাধারণ মানুষ বুঝতে সক্ষম নয়। অবস্থাগত তসবীহ্ তো বিবেকবান ও বুদ্ধিমানরা বুঝতে পারে। এ থেকে জানা গেল যে, এই তসবীহ্ পাঠ শুধু অবস্থাগত নয়—সত্যিকারের; কিন্তু আমাদের বোধশক্তি ও অনুভূতির ঊর্ধ্বে।—(কুরতুবী)

হাদীসে একটি মু'জিযা উল্লিখিত আছে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাতের তালুতে কংকরের তসবীহ্ পাঠ সাহাবায়ে কিরাম নিজ কানে শুনেছেন। এটা যে মু'জিযা, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু 'খাসায়েসে-কুবরা' গ্রন্থে শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) বলেন ঃ কংকরসমূহের তসবীহ্ পাঠ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মু'জিযা নয়। তারা তো যেখানে থাকে, সেখানেই তসবীহ্ পাঠ করে; বরং মু'জিযা এই যে, তাঁর পবিত্র হাতে আসার পর তাদের তসবীহ্ কানেও শোনা গেছে।

ইমাম কুরতুবী এ বক্তব্যকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এর পক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে অনেক যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছেন। উদাহরণত সূরা সাদে হযরত দাউদ (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ

—অর্থাৎ আমি পাহাড়সমূহকে আজ্ঞাবহ করে দিয়েছি। তারা দাউদের সাথে সকাল-বিকাল তসবীহ্ পাঠ করে। সূরা বাক্বারায় পাহাড়ের পাথর সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ —অর্থাৎ কতক পাথর আল্লাহ্র ভয়ে নীচে পড়ে যায়। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, পাথরের মধ্যেও চেতনা, অনুভূতি ও আল্লাহ্র ভয় রয়েছে। সূরা মারিয়মে খৃস্টান সম্প্রদায় কর্তৃক হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র আখ্যায়িত করার প্রতিবাদে বলা হয়েছে :

وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا —অর্থাৎ এরা আল্লাহ্র জন্য পুত্র সাব্যস্ত করে। তাদের এই কুফ্রী বাক্যের কারণে পাহাড় ভীত হয়ে পতিত হয়। বলা বাহুল্য, এই ভয়-ভীতি তাদের চেতনা ও অনুভূতির পরিচায়ক। চেতনা ও অনুভূতি থাকলে তসবীহ্ পাঠ করা অসম্ভব নয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন : এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে ডেকে জিজ্ঞেস করে, আল্লাহ্কে স্মরণ করে—এমন কোন বান্দা তোমার উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করেছে কি? যদি সে উত্তরে হ্যাঁ বলে, তবে প্রশ্নকারী পাহাড় তাতে আনন্দিত হয়। এর প্রমাণ হিসাবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এ আয়াতটি পাঠ করেন : وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا —অতঃপর বলেন : এ আয়াত থেকে যখন প্রমাণিত হল যে, পাহাড় কুফ্রী বাক্য শুনে প্রভাবান্বিত হয় এবং ভীত হয়ে যায়, তখন তুমি কি মনে কর যে, তারা বাতিল কথাবার্তা শোনে; কিন্তু সত্য কথা ও আল্লাহ্র যিকর শোনে না এবং তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না? (কুরতুবী) রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : কোন জিন, মানব, পাথর ও টিলা এমন নেই, যে মুয়াযযিনের আওয়াজ শুনে কিয়ামতের দিন তার ঈমানদার ও সৎ হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য না দেয়।—(মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ইবনে মাজা)

ইমাম বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন : আমরা খাওয়ার সময় খাদ্যের তসবীহ্র শব্দ শুনতাম। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে খানা খেলে খাদ্যের তসবীহ্র শব্দ শুনতাম। মুসলিমে হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আমি মক্কার ঐ পাথরটিকে চিনি, যে নবুয়ত লাভের পূর্বে আমাকে সালাম করত। আমি এখনও তাকে চিনি। কেউ কেউ বলেন : এই পাথরটি হচ্ছে "হাজরে-আসওয়াদ।"

ইমাম কুরতুবী বলেন : এ বিষয়াবলী সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা প্রচুর। হান্নানা স্তম্ভের কাহিনী তো সকল মুসলমানদের মুখে মুখে প্রচলিত। মিম্বর তৈরী হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন একে ছেড়ে মিম্বরে খুতবা দেওয়া শুরু করেন, তখন এর কান্নার শব্দ সাহাবায়ে কিরামও শুনেছিলেন।

এসব রেওয়ায়েত দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, আসমান ও জমিনের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি রয়েছে এবং প্রত্যেক বস্তু সত্যিকারভাবে আল্লাহ্‌র তসবীহ্ পাঠ করে। ইব্রাহীম (আ) বলেন ঃ প্রাণীবাচক ও অপ্রাণীবাচক সব বস্তুর মধ্যেই এই তসবীহ্ বিদ্যমান আছে। এমন কি, দরজার কপাটে যে আওয়াজ হয়, তাতেও তসবীহ আছে। ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ তসবীহ্‌র অর্থ অবস্থাগত তসবীহ হলে উপরোক্ত আয়াতে হযরত দাউদের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। অবস্থাগত তসবীহ প্রত্যেক চেতনাশীল মানুষ প্রত্যেক বস্তু থেকে জানতে পারে। তাই বাহ্যিক অর্থেই এটা ছিল উক্তিগত তসবীহ। খাসায়েসে কুবরা গ্রন্থের বরাত দিয়ে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কংকরদের তসবীহ পাঠে মু'জিযা ছিল না। ওরা তো সর্বত্র, সর্বাবস্থায় এবং সব সময় তসবীহ পাঠ করে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মু'জিযা ছিল এই যে, তাঁর পবিত্র হাতে আসার পর তাদের তসবীহ এমন শব্দময় হয়ে ওঠে, যা সাধারণ মানুষেরও শ্রুতিগোচর হয়। এমনিভাবে পাহাড়-সমূহের তসবীহ্ পাঠও হযরত দাউদ (আ)-এর মু'জিযা এ হিসাবেই ছিল যে, তাঁর মু'জিযার ঐ তসবীহ্ কানে শোনার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল।

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿٤٥﴾ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٤٧﴾ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾

(৪৫) যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার মধ্যে ও পরকালে অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দেই। (৪৬) আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দেই, যাতে তারা একে উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদের কর্ণ কুহরে বোঝা চাপিয়ে দেই। যখন আপনি কোরআনে পালনকর্তার একত্ব আবৃত্তি করেন, তখনও অনীহাবশত পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়। (৪৭) যখন তারা কান পেতে আপনার কথা শোনে, তখন তারা কেন কান পেতে তা শোনে, তা আমি ভাল জানি এবং এও জানি গোপনে আলোচনাকালে যখন জালিমরা বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ। (৪৮) দেখুন ওরা আপনার জন্য কেমন উপমা দেয়। ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, অতএব ওরা পথ পেতে পারে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, কোরআনে তওহীদের বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিভিন্ন যুক্তিপ্রমাণসহ বারবার উল্লেখ করা সত্ত্বেও হতভাগা মুশরিকরা তা মানে না। আলোচ্য আয়াতসমূহে ওদের না মানার কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ওরা এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনাই করে না, বরং এগুলোকে ঘৃণা ও বিদ্রূপ করে। ফলে ওদেরকে সত্যের জ্ঞান থেকে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপ এরূপ ঃ)

যখন আপনি (তবলীগের জন্য) কোরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার ও ওদের মধ্যে একটি পর্দা আড়াল করে দেই, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না। (পর্দা এই যে) আমি ওদের অন্তরের ওপর আবরণ ফেলে দেই, যাতে ওরা একে (অর্থাৎ কোরআনের উদ্দেশ্যকে) না বোঝে এবং ওদের কানের উপর বোঝা চাপিয়ে দেই। (যাতে ওরা একে হিদায়ত অর্জনের জন্য না শুনে। উদ্দেশ্য এই যে, সেই পর্দাটি হচ্ছে ওদের না বোঝার এবং বোঝার ইচ্ছাই না করার। বোঝার ইচ্ছা করলে ওরা আপনার নবুয়ত চিনতে পারত)। যখন আপনি কোরআনে শুধু স্বীয় পালনকর্তার (গুণাবলী) উল্লেখ করেন (এবং ওরা যেসব উপাস্যের উপাসনা করে, তাদের মধ্যে সেইসব গুণ নেই) তখন তারা (নির্বুদ্ধিতা বরং বক্র বুদ্ধিতার কারণে) ঘৃণাভরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। (অতঃপর তাদের এই কুকর্মের জন্য শাস্তির খবর বর্ণিত হয়েছে যে) যখন তারা আপনার দিকে কান লাগায়, তখন আমি ভালভাবেই জানি, যে নিয়তে তারা শুনে (সেই নিয়ত হচ্ছে, আপত্তি উত্থাপন করা, দোষারোপ করা এবং সমালোচনা করা) এবং যখন ওরা (কোরআন শুনার পর) পরস্পর কানাকানি করে (আমি তাও ভালভাবেই জানি) যখন জালিমরা বলে ঃ তোমরা তো [অর্থাৎ ওদের মধ্য থেকে যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনুসরণে আত্মনিয়োগ করেছে] এমন এক ব্যক্তির অনুসরণ করছ, যার উপর যাদুর (বিশেষ) ক্রিয়া [অর্থাৎ পাগলামির ক্রিয়া) হয়েছে। অর্থাৎ তার অদ্ভুত কথাবার্তা সবই মস্তিষ্কবিকৃতির ফল। হে মুহাম্মদ (সা)] দেখুন, তারা আপনার জন্যে কেমন উপাধি বের করেছে। অতএব ওরা (সম্পূর্ণই) পথভ্রান্ত হয়ে গেছে। এখন ওরা (সত্য) পথ পেতে পারবে না। (কেননা, এ ধরনের হঠকারিতা ও জেদ, বিশেষত আল্লাহ্র রসূলের সাথে এ রকম ব্যবহারের কারণে মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা ও হিদায়তপ্রাপ্তির যোগ্যতা লোপ পায়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পয়গম্বরের ওপর যাদুর ক্রিয়া হতে পারে ঃ পয়গম্বরগণ মানবিক বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত নন। তাঁরা যেমন রোগাক্রান্ত হতে পারেন, জ্বর ও ব্যথায় ভুগতে পারেন, তেমনি তাঁদের ওপর যাদুর ক্রিয়াও সম্ভবপর। কেননা, যাদুর ক্রিয়াও বিশেষ স্বভাবগত কারণে, জিন ইত্যাদির প্রভাবে হয়ে থাকে। হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওপরও যাদুর ক্রিয়া হয়েছিল। শেষ আয়াতে কাফিররা তাঁকে যাদুগ্রস্ত বলেছে এবং কোরআন তা খণ্ডন করেছে। এর সারমর্ম তাই, যার প্রতি তফসীরের সার-সংক্ষেপ-

ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাদুগ্রস্ত বলে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পাগল বলা। কোরআন তা'ই খণ্ডন করেছে। অতএব যাদুর হাদীসটি এই আয়াতের পরিপন্থী নয়।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি বিশেষ শানে নুযূল আছে। কুরতুবী সাঈদ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণনা করেন : কোরআনে যখন সূরা লাহাব নাযিল হয়, যাতে আবূ লাহাবের স্ত্রীরও নিন্দা উল্লেখ করা হয়েছে, তখন তার স্ত্রী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মজলিসে উপস্থিত হয়। হযরত আবূ বকর (রা) তখন মজলিসে বিদ্যমান ছিলেন। তাকে দূর থেকে আসতে দেখে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন : আপনি এখান থেকে সরে গেলে ভাল হয়। কারণ, সে অত্যন্ত কটুভাষিণী। সে এমন কটু কথা বলবে, যার ফলে আপনি কষ্ট পাবেন। তিনি বললেন : না, তার ও আমার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা পর্দা ফেলে দেবেন। অতঃপর সে মজলিসে উপস্থিত হলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখতে পেল না। সে হযরত আবূ বকর (রা)-কে সম্বোধন করে বলতে লাগল : আপনার সঙ্গী আমার 'হিজু' (কবিতার মাধ্যমে নিন্দা) করেছেন। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম, তিনি তো কবিতাই বলেন না। অতঃপর সে একথা বলতে বলতে প্রস্থান করল যে, আপনিও তো তাকে সত্য বলে বিশ্বাসকারীদের অন্যতম। তার প্রস্থানের পর হযরত আবূ বকর আরয করলেন : সে কি আপনাকে দেখেনি? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : যতক্ষণ সে এখানে ছিল, ততক্ষণ একজন ফেরেশতা আমাকে তার দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছিল।

শত্রুর দৃষ্টি থেকে গোপন থাকার একটি আমল : হযরত কা'ব বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মুশরিকদের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করতে চাইতেন, তখন কোর-আনের তিনটি আয়াত পাঠ করতেন। এর প্রভাবে শত্রুরা তাঁকে দেখতে পেত না। আয়াতত্রয় এই : এক আয়াত—সূরা কাহাফের إنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا দ্বিতীয় আয়াত সূরা নাহলের— أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ এবং তৃতীয় আয়াত সূরা জাসিয়ার

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً

হযরত কা'ব বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই ব্যাপারটি আমি সিরিয়ার জনৈক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করি। তিনি কোন প্রয়োজনবশত রোম দেশে গমন করেন। বেশ

কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার পর তিনি রোমীয় কাফিরদের নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়লে প্রাণের ভয়ে সেখান থেকে পলায়ন করেন। শত্রুরা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে। এহেন সংকট মুহূর্তে হঠাৎ হাদীসটি তাঁর মনে পড়ে গেল। তিনি কালবিলম্ব না করে আয়াত তিনটি পাঠ করতেই শত্রুদের দৃষ্টির সামনে পর্দা পড়ে গেল। যে রাস্তায় তিনি চলছিলেন, শত্রুরাও সেই রাস্তায় চলা-ফিরা করছিল, কিন্তু তারা তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল না।

ইমাম সা'লাবী বলেন ঃ হযরত কা'ব থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতটি আমি 'রায়' অঞ্চলের জনৈক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করেছিলাম। ঘটনাক্রমে সায়লামের কাফিররা তাঁকে গ্রেফতার করে। তিনি কিছুদিন কয়েদে থাকার পর সুযোগ পেয়ে পলায়ন করেন। শত্রুরা তাঁকে পেছনে ধাওয়া করে। তিনি উল্লিখিত আয়াতত্রয় পাঠ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের চোখের ওপর পর্দা ফেলে দেন। ফলে তাদের দৃষ্টি থেকে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান অথচ তারা পাশাপাশি চলছিল এবং তাদের কাপড় তাঁর কাপড় স্পর্শ করছিল।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ উপরোক্ত আয়াতত্রয়ের সাথে সূরা ইয়াসীনের ঐ আয়াতগুলোও মেলানো উচিত, যেগুলো রসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরতের সময় পাঠ করেছিলেন। তখন মক্কার মুশরিকরা তাঁর বাসগৃহ ঘেরাও করে রেখেছিল। তিনি আয়াতগুলো পাঠ করে তাদের মাঝখান দিয়ে চলে যান, বরং তাদের মাথায় ধূলা নিক্ষেপ করতে করতে যান, কিন্তু তাদের কেউ টেরও পায়নি। সূরা ইয়াসীনের আয়াতগুলো এই ঃ

يٰسٓ ـ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ـ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ـ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ـ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اُنْذِرَ اٰبَاۤؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ○ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰۤى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○ اِنَّا جَعَلْنَا فِىْۤ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِىَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ○ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ○

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ আমি স্বদেশ আন্দালুসে কর্ডোভার নিকটবর্তী মনসুর দুর্গে নিজেই এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম। অবশেষে নিরুপায় অবস্থায় আমি শত্রুদের সম্মুখ দিয়ে দৌড়ে এক জায়গায় বসে গেলাম। শত্রুরা দু'জন অশ্বারোহীকে আমার পশ্চাদ্ধাবন করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। আমি সম্পূর্ণ খোলা মাঠেই ছিলাম। আড়াল করার মত কোন বস্তুই ছিল না। আমি তখন বসে বসে সূরা ইয়াসীনের আয়াতগুলো পাঠ করছিলাম। অশ্বারোহী ব্যক্তিদ্বয় আমার সম্মুখ দিয়ে "লোকটি কোন শয়তান হবে"

বলতে বলতে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে গেল। বলা বাহুল্য তারা আমাকে অবশ্যই দেখেনি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আমার দিক থেকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। (কুরতুবী)

وَقَالُوٓا۟ أَءِذَا كُنَّا عِظَـٰمًا وَرُفَـٰتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝٤٩ ۞ قُلْ كُونُوا۟ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝٥٠ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِى صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۖ قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ۝٥١ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِۦ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۝٥٢

(৪৯) তারা বলেঃ যখন আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি নতুন করে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব? (৫০) বলুনঃ তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহা। (৫১) অথবা এমন কোন বস্তু, যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন; তথাপি তারা বলবেঃ আমাদেরকে পুনর্বার কে সৃষ্টি করবে? বলুনঃ যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃজন করেছেন। অতঃপর তারা আপনার সামনে মাথা নাড়বে এবং বলবেঃ এটা কবে হবে? বলুনঃ হবে, সম্ভবত শীঘ্রই। (৫২) যে দিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন, অতঃপর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে চলে আসবে। এবং তোমরা অনুমান করবে যে, সামান্য সময়ই অবস্থান করেছিল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা বলেঃ তখন আমরা (মৃত্যুর পর) অস্থি এবং (অস্থি থেকেও অতঃপর) চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি (এরপর কিয়ামতে) নতুনভাবে সৃজিত ও জীবিত হব? (অর্থাৎ প্রথমত মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াই কঠিন। কারণ দেহে জীবন-ধারণের যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকে না। এরপর দেহও যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন এর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার বিষয়টি কে মেনে নিতে পারে)? আপনি (উত্তরে) বলে দিনঃ (তোমরা তো অস্থি জীবিত হওয়াকেই অসম্ভব মনে করছ; কিন্তু আমি বলি যে তাহলে) তোমরা পাথর কিংবা এমন ধরনের কোন বস্তু হয়ে দেখে নাও, যা তোমাদের মনে (জীবন ধারণের উপযুক্ততা থেকে) অনেক দূরবর্তী। (এরপর দেখ যে, জীবিত হও কিনা! বলা বাহুল্য, পাথর ও লোহা জীবন থেকে দূরবর্তী হওয়ার কারণ এই যে, এদের

মধ্যে কোন সময়ই জৈব জীবন সঞ্চারিত হয়নি। অস্থি এর বিপরীত। কারণ, এর মধ্যে পূর্বে জীবন ছিল। অতএব পাথর ও লোহাকে জীবিত করা যখন আল্লাহর জন্যে কঠিন নয়, তখন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পুনর্বার জীবন দান করা কিরূপে কঠিন হবে? আয়াতে كُونُوا আদেশ সূচক পদ বলে- شرط ও تعليق বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যদি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে তোমরা পাথর কিংবা লোহাও হয়ে যাও, তবে এমতাবস্থায়ও আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে পুনর্বার জীবিত করতে সক্ষম)। অতঃপর তারা জিজ্ঞেস করবে, কে আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবে? আপনি বলে দিন: যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। (প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কোন বস্তুর অস্তিত্ব লাভের জন্যে দু'টি জিনিস জরুরী। এক, উপকরণ ও পাত্রে অস্তিত্ব লাভের যোগ্যতা। দুই, তাকে অস্তিত্ব দানকারী শক্তি। প্রথম প্রশ্নটি ছিল পাত্রের যোগ্যতা সম্পর্কে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর দেহ জীবন ধারণের যোগ্য থাকে না। এর উত্তর দিয়ে পাত্রের যোগ্যতা সপ্রমাণ করা হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল জীবন দানকারী শক্তি সম্পর্কে; অর্থাৎ কোন কর্তা স্বীয় কর্তৃত্বের বলে এই আশ্চর্যজনক কাজটি করবে? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, যিনি প্রথমে তোমাদেরকে এমন উপকরণ থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, যার মধ্যে জীবন ধারণের যোগ্যতা আছে বলে কারও ধারণাও ছিল না। অতএব তার জন্যে পুনর্বার সৃষ্টি করা কিরূপে কঠিন হবে? যখন পাত্র ও কর্তা সম্পর্কিত উভয় প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেল, তখন পুনর্জীবনের ঘটনাটি কখন ঘটবে, তা জানার জন্যে) তারা আপনার সামনে মাথা নেড়ে নেড়ে বলবে: (আচ্ছা বলুন তো) এটা (অর্থাৎ জীবিত হওয়া) কবে হবে? আপনি বলে দিন, সম্ভবত এটা নিকটবর্তী (অতঃপর ঐসব অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে, যেগুলো নতুন জীবন লাভের সময় দেখা দেবে)। এটা ঐদিন হবে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে (জীবিত করা ও হাশরের ময়দানে একত্রিত করার জন্যে ফেরেশতার মাধ্যমে) ডাক দেবেন এবং তোমরা (বাধ্যতামূলকভাবে) তাঁর প্রশংসা করতে করতে আদেশ পালন করবে। (অর্থাৎ জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিতও হয়ে যাবে)। এবং (ঐ দিনের ভয়ভীতি দেখে তোমাদের অবস্থা হবে এই যে, দুনিয়ার গোটা বয়স ও কবরে অবস্থানের সময় সম্পর্কে) তোমারা অনুমান করবে যে, খুব কম সময়ই (দুনিয়াতে) অবস্থান করেছ। (কেননা আজকের ভয়ংকরতার তুলনায় দুনিয়া ও কবরে কিছু না কিছু সুখ ছিল। বলা বাহুল্য, বিপদে পড়ার পর সুখের যমানা মানুষের কাছে খুব সংক্ষিপ্ত মনে হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ - يَوْمَ يَدْعُوكُمْ শব্দটি دعاء থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আওয়াজ দিয়ে ডাকা। আয়াতের অর্থ এই যে, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সবাইকে হাশরের ময়দানের দিকে ডাকবেন। এই ডাকা ফেরেশতা ইসরাফীলের মাধ্যমে হবে। তিনি যখন দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন, তখন সব মৃত জীবিত হয়ে

হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। এ ছাড়া জীবিত হওয়ার পর হাশরের ময়দানে একত্রিত করার জন্য আওয়াজ দেওয়াও সম্ভবপর।—(কুরতুবী)

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নিজের এবং পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। কাজেই ভাল নাম রাখবে। (অর্থহীন নাম রাখবে না)।

হাশরে কাফিররাও আল্লাহ্র প্রশংসা করতে করতে উত্থিত হবে ঃ

فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ۔ اِسْتِجَابَت শব্দের অর্থ ডাকার পর আদেশ পালন করা এবং উপস্থিত হওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, হাশরের ময়দানে যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে, তখন তোমরা সবাই ঐ আওয়াজ অনুসরণ করে একত্রিত হয়ে যাবে।

بِحَمْدِهِ অর্থাৎ ময়দানে আসার সময় তোমরা সবাই আল্লাহ্র প্রশংসা করতে করতে উপস্থিত হবে।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে জানা যায় যে, তখন মু'মিন ও কাফির সবারই এই অবস্থা হবে। কেননা আয়াতে আহলে কাফিরদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কেই বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সবাই প্রশংসা করতে করতে উত্থিত হবে। তফসীরবিদদের মধ্যে হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেন ঃ কাফিররাও কবর থেকে বের হওয়ার সময় سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ বলতে বলতে বের হবে। কিন্তু তখনকার প্রশংসা ও গুণকীর্তন তাদের কোন উপকারে আসবে না—(কুরতুবী) কেননা, তারা মৃত্যুর পর যখন জীবন দেখবে, তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের মুখ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসাও গুণবাচক বাক্য উচ্চারিত হবে। এটা প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য আমল হবে না।

কোন কোন তফসীরবিদ একে বিশেষভাবে মু'মিনদের অবস্থা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি এই যে, কাফিরদের সম্পর্কে কোরআন পাকে বলা হয়েছে, যখন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তখন তারা একথা বলবে ঃ يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا হায় আফসোস, কে আমাদেরকে কবর থেকে জীবিত করে উত্থিত করেছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, তারা বলবে يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ হায় আফসোস, আমরা আল্লাহ্র ব্যাপারে বিরাট ত্রুটি করেছি।

কিন্তু সত্য এই যে, উভয় তফসীরের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। শুরুতে সবাই প্রশংসা করতে করতে ওঠবে। পরে কাফিরদেরকে মু'মিনদের কাছ থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে; যেমন সূরা ইয়াসীনের আয়াতে রয়েছে—وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ অপরাধীরা, আজ তোমরা সবাই পৃথক হয়ে যাও। তখন কাফিরদের মুখ থেকে উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বাক্যাবলী উচ্চারিত হবে। কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলে মানুষের অবস্থা বিভিন্নরূপ হবে। ইমাম কুরতুবী বলেন: হাশরে পুনরুত্থানের শুরু হাম্দ দ্বারা হবে। সবাই হাম্দ করতে করতে উত্থিত হবে এবং সব ব্যাপারে সমাপ্তিও হাম্দের মাধ্যমে হবে। যেমন বলা হয়েছে: وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ হাশরবাসীদের ফয়সালা হক অনুযায়ী করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র জন্য।

وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُوا الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ۝ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ؕ اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ ؕ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ۝ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۝

---

(৫৩) আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (৫৪) তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন। তিনি যদি চান, তোমাদের প্রতি রহম করবেন কিংবা যদি চান, তোমাদেরকে আযাব দিবেন। আমি আপনাকে ওদের সবার তত্ত্বাবধায়ক রূপে প্রেরণ করিনি। (৫৫) আপনার পালনকর্তা তাদের সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন, যারা আকাশসমূহে ও ভূপৃষ্ঠে রয়েছে। আমি তো কতক পয়গম্বরকে কতক পয়গম্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি এবং দাউদকে যবুর দান করেছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি আমার (মুসলমান) বান্দাদেরকে বলে দিন, (যদি কাফিরদেরকে জওয়াব দেয় তবে) তারা যেন ঐ কথাই বলে, যা (নৈতিক দিক দিয়ে) উত্তম (অর্থাৎ গালি-গালাজ, কঠোরতা ও উত্তেজনাপূর্ণ কথা না হওয়া চাই। কেননা) শয়তান (কড়া কথা বলিয়ে) লোকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (এ শিক্ষাদানের কারণ এই যে, কঠোরতা দ্বারা কোন সময় কার্যোদ্ধার হয় না। হিদায়ত ও পথভ্রষ্টতা আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুসারী)। তোমাদের সবার অবস্থা তোমাদের পালনকর্তা ভালভাবেই জানেন (যে, কে কিসের যোগ্য)। তিনি যদি চান, তোমাদের (মধ্য থেকে যা)-কে (ইচ্ছা) রহম করবেন (অর্থাৎ হিদায়ত করবেন)। অথবা তিনি যদি চান তোমাদের (মধ্য থেকে যা)-কে (ইচ্ছা) আযাব দেবেন (অর্থাৎ তাকে তওফীক ও হিদায়ত দেবেন না)। আমি আপনাকে (পর্যন্ত) তাদের (হিদায়তের) জন্য দায়ী করে প্রেরণ করিনি। নবী (হওয়া সত্ত্বেও যখন আপনাকে দায়ী করা হয়নি, তখন অন্যের কি সাধ্য? কাজেই পীড়াপীড়ি ও কঠোরতা করা নিষ্প্রয়োজন)। আপনার পালনকর্তা ভালভাবেই জানেন তাদেরকে (ও), যারা আকাশসমূহে রয়েছে এবং (তাদেরকেও, যারা) ভূপৃষ্ঠে রয়েছে। (আকাশের অধিবাসী বলে ফেরেশতাদেরকে এবং ভূপৃষ্ঠের অধিবাসী বলে মানব ও জিন জাতিকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি ভালভাবেই জানি, তাদের মধ্যে কে নবী ও রসূল হওয়ার যোগ্য এবং কে অযোগ্য। তাই আমি যে আপনাকে নবী বানিয়েছি, এতে আশ্চর্যের কি রয়েছে?) এবং (এমনিভাবে যদি আমি আপনাকে অন্য পয়গম্বরদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে থাকি, তবে আশ্চর্যের কি আছে? কেননা) আমি (পূর্বেও) কতক পয়গম্বরকে কতক পয়গম্বরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (এবং এমনিভাবে আমি যদি আপনাকে কোরআন দিয়ে থাকি, তবে তা আশ্চর্যের বিষয় হল কিরূপে? কেননা আপনার পূর্বে) আমি দাউদকে যবুর দান করছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কটুভাষা ও কড়া কথা কাফিরদের সাথেও জায়েয নয়ঃ প্রথম আয়াতে মুসলমানদেরকে কাফিরদের সাথে কড়া কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিনা প্রয়োজনে কঠোরতা করা যাবে না এবং প্রয়োজন হলে হত্যা পর্যন্ত করার অনুমতি রয়েছে।

که بی حکم شرع آب خوردن خطاست
وگر خون بفتوی بریزی رواست

হত্যা ও যুদ্ধের মাধ্যমে কুফরের শান-শওকত এবং ইসলামের বিরোধিতাকে নির্মূল করা যায়। তাই এর অনুমতি রয়েছে। গালি-গালাজ ও কটুকথা দ্বারা কোন দুর্গ জয় করা যায় না এবং কারও হিদায়ত হয় না। তাই এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম-কুরতুবী বলেনঃ আলোচ্য আয়াত হযরত উমর (রা)-এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়।

ঘটনা ছিল এই ঃ জনৈক ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-কে গালি দিলে প্রত্যুত্তরে তিনিও তার বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাকে হত্যা করতেও মনস্থ করেন। ফলে দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

কুরতুবীর বক্তব্য এই যে, এই আয়াতে মুসলমানদেরকে পারস্পরিক কথাবার্তা বলা সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক মতানৈক্যের সময় কঠোর ভাষা প্রয়োগ করো না। এর মাধ্যমে শয়তান তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ ও কলহ সৃষ্টি করে দেয়।

وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا —এখানে বিশেষভাবে যবুরের কথা উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, যবুর গ্রন্থে রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি পয়গম্বর হওয়ার সাথে সাথে দেশ ও সাম্রাজ্যের অধিকারীও হবেন। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ বর্তমান প্রচলিত যবুরেও কেউ কেউ এ কথার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। (তফসীরে হক্কানী)

ইমাম বগভী স্বীয় তফসীরে এ স্থানে লেখেন ঃ যবুর আল্লাহ্র গ্রন্থ, যা হযরত দাউদের প্রতি অবতীর্ণ হয়। এতে একশো পঞ্চাশটি সূরা রয়েছে এবং প্রত্যেকটি সূরা দোয়া, হাম্‌দ ও গুণকীর্তনে পরিপূর্ণ। এগুলোতে হালাল, হারাম এবং ফরয কর্তব্যাদির বর্ণনা নেই।

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝

(৫৬) বলুন ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে কর, তাদেরকে আহ্বান কর। অথচ ওরা তো তোমাদের কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে না এবং তা পরিবর্তনও করতে পারে না। (৫৭) যাদেরকে তারা আহ্বান করে, তারা নিজেরাই

তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থ তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্যশীল। তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ (৫৮) এমন কোন জনপদ নেই, যাকে আমি কিয়ামত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করব না অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না। এটা তো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (তাদেরকে) বলে দিন ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা (উপাস্য) মনে করছ, যেমন ফেরেশতা ও জিন) তাদেরকে (নিজেদের কষ্ট দূর করার জন্য) ডাক। অতএব তারা না তোমাদের কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে এবং না তা পরিবর্তন করার (উদাহরণত কষ্ট সম্পূর্ণ দূর করতে না পারলে তা কিছুটা হালকা করে দেবে)। মুশরিকরা যাদেরকে (অভাব পূরণ এবং বিপদ দূর করার জন্য) ডাকে, তারা স্বয়ং পালনকর্তার দিকে (পৌঁছার জন্য) মধ্যস্থতা তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে অধিক নৈকট্যশীল হয় (অর্থাৎ তারা স্বয়ং ইবাদত ও আনুগত্যে মশগুল—যাতে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জিত হয় এবং তারা চায় যে, নৈকট্যের স্তর আরও উন্নীত হোক।) তারা তাঁর রহমত প্রার্থনা করে এবং (অবাধ্যতা করলে) তাঁর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার আযাব ভয় করার মতই। (উদ্দেশ্য এই যে, তারা যখন স্বয়ং ইবাদতকারী, তখন মাবুদ কিরূপে হতে পারে? তারা নিজেরাই যখন কোন অভাব অনটন ও কষ্ট দূর করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী, তখন তারা অপরের অভাব-অনটন কিরূপে দূর করতে পারবে?) এবং (কাফিরদের) এমন কোন জনপদ নেই, যাকে আমি কিয়ামতের পূর্বে ধ্বংস করে দেব না অথবা (কিয়ামতের দিন) তাকে (অর্থাৎ তার অধিবাসীদেরকে দোযখের) কঠোর শাস্তি দেব না। এ বিষয়টি গ্রন্থে (অর্থাৎ লওহে মাহ্‌ফুযে) লিখিত আছে। (সুতরাং কোন কাফির এখানে ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেলেও কিয়ামত দিবসের ভীষণ শাস্তি থেকে বাঁচবে না। স্বাভাবিক মৃত্যু দ্বারা তো শুধু কাফিররাই ধ্বংস হয় না—সবাই মৃত্যুবরণ করে। তাই জনপদ ধ্বংস করার কথা বলে এখানে আযাব ও বিপর্যয় দ্বারা ধ্বংস করা বোঝানো হয়েছে। মোটকথা এই যে, কাফিরদের উপর তো কোন কোন সময় দুনিয়াতেও আযাব প্রেরণ করা হয় এবং পরকালের আযাব এরও অতিরিক্ত হবে। আবার কোন সময় দুনিয়াতে কোন আযাবই আসে না। কিন্তু পরকালের আযাব থেকে সর্বাবস্থায় মুক্তি নেই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ — وسيلة শব্দের অর্থ এমন বস্তু যাকে অন্য কারও কাছে পেঁছার উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়। আল্লাহ্‌র জন্য ওসিলা হচ্ছে কথায় ও কাজে আল্লাহ্‌র মর্জির প্রতি সব সময় লক্ষ্য রাখা এবং শরীয়তের বিধিবিধান অনুসরণ

করা। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা সবাই সৎ কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অন্বেষণে মশগুল আছেন।

يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ —হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেনঃ আল্লাহ্‌র রহমতের আশা করতে থাকা এবং ভয়ও করতে থাকা—মানুষের এ দু'টি ভিন্নমুখী অবস্থা যে পর্যন্ত সমান সমান পর্যায়ে থাকে, সেই পর্যন্ত মানুষ সঠিক পথে অনুগমন করে। পক্ষান্তরে যদি কোন একটি অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে সেই পরিমাণে সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।—(কুরতুবী)

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَاٰتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِىٓ أَرَيْنٰكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِى الْقُرْاٰنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيٰنًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾

(৫৯) পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার ফলেই আমাকে নিদর্শনাবলী প্রেরণ থেকে বিরত থাকতে হয়েছে। আমি তাদেরকে বোঝাবার জন্য সামূদকে উষ্ট্রী দিয়েছিলাম। অতঃপর তারা তার প্রতি জুলুম করেছিল। আমি ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই নিদর্শনাবলী প্রেরণ করি। (৬০) এবং স্মরণ করুন, আমি আপনাকে বলে দিয়েছিলাম যে, আপনার পালনকর্তা মানুষকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং যে দৃশ্য আমি আপনাকে দেখিয়েছি তাও কোরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি। কিন্তু এতে তাদের অবাধ্যতাই আরও বৃদ্ধি পায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমার পক্ষ থেকে বিশেষ (ফরমায়েশী) মু'জিযাসমূহ প্রেরণে এটাই প্রতিবন্ধক যে, (তাদের সমধর্মী) পূর্ববর্তী লোকেরা এগুলোকে (অর্থাৎ ফরমায়েশী মু'জিযাসমূহকে মিথ্যারোপ করেছে। সব কাফিরের মেযাজ ও স্বভাব এক-রকম। তাই বাহ্যত বোঝা যায় যে, এরাও মিথ্যারোপ করবে)। এবং (নমুনা হিসাবে একটি কাহিনীও শুনে নাও যে) আমি সামূদ সম্প্রদায়কে [তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী সালেহ্ (আ)-এর মু'জিযা হিসাবে] উষ্ট্রী দিয়েছিলাম, (যা উদ্ভূত উপায়ে পয়দা হয়েছিল এবং) যা (মু'জিযা হওয়ার কারণে) জ্ঞানলাভের উপায় ছিল। অতঃপর তারা (এ থেকে জ্ঞান অর্জন করেনি,

বরং) তার প্রতি জুলুম করেছে (অর্থাৎ তাকে হত্যা করেছে। কাজেই বর্তমান (লোক-দেরকে ফরমায়েশী মু'জিযা দেখানো হলে তারাও তদ্রূপ করবে)। আমি মু'জিযাসমূহ শুধু (এ বিষয়ে) ভয় প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করি (যে যদি এই মু'জিযা দেখেও বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে অনতিবিলম্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। বাস্তবেও তাই হয়েছে। যাদেরকে ফরমায়েশী মু'জিযা দেখানো হয়েছে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি। ফলে এটাই তাদের ধ্বংস ও আযাবের কারণ হয়ে গেছে। তবে এদেরকে এই মুহূর্তে ধ্বংস না করাই আল্লাহর রহস্যের তাগিদ। তাই তাদের ফরমায়েশী মু'জিযা প্রকাশ করা হয়নি। সে ঘটনা থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়, যার সম্মুখীন তারা পূর্বে হয়েছে। এর বর্ণনা এরূপ ঃ) আপনি স্মরণ করুন, যখন আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, আপনার পালনকর্তা (স্বীয় জ্ঞান দ্বারা) সব মানুষকে (অর্থাৎ তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থাসমূহকে) পরিবেষ্টিত করে রয়েছেন। (ভবিষ্যতে তাদের বিশ্বাস স্থাপন না করাও আল্লাহ্ তা'আলার জানা আছে, যার এক প্রমাণ তাদেরই এ ঘটনা যে) আমি (মি'রাজের ঘটনায়) যে দৃশ্যা-বলী (জাগ্রত অবস্থায়) আপনাকে দেখিয়েছিলাম এবং যে বৃক্ষের কোরআনে নিন্দা করা হয়েছে (অর্থাৎ কাফিরদের খাদ্য যাক্কুম বৃক্ষ) আমি এই উভয় বস্তুকে তাদের জন্য গোমরাহীর কারণ করে দিয়েছি। (অর্থাৎ তারা উভয় ব্যাপার শুনে মিথ্যারোপ করেছে। মি'রাজকে মিথ্যারোপ করার কারণ ছিল এই যে, এক রাত্রিতে সিরিয়ায় গমন করা, অতঃ-পর আকাশে যাওয়া তাদের কাছে সম্ভবপর ছিল না। যাক্কুম বৃক্ষকে মিথ্যারোপ করার কারণ ছিল এই যে, বৃক্ষটি দোযখে রয়েছে বলা হয়। অথচ আগুনের মধ্যে বৃক্ষ থাকা অসম্ভব। থাকলেও তা আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। অথচ এক রাত্রিতে সুদীর্ঘ পথ সফর করা যুক্তিগতভাবে যেমন অসম্ভব নয় তেমনি আকাশে যাওয়াও অসম্ভব নয়। এমনিভাবে কোন বৃক্ষের প্রকৃতি যদি আল্লাহ্ তা'আলা এমন করে দেন যে, সে পানির পরিবর্তে আগুনে লালিত-পালিত হয়, তবে এটা অসম্ভব হবে কিরূপে)? আমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি, কিন্তু তাদের অবাধ্যতা বৃদ্ধিই পেতে থাকে। (যাক্কুম বৃক্ষ অস্বীকার করার সাথে সাথে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপও করত। সূরা সাফফাত-এ এ সম্পর্কে আরও বর্ণনা আসবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ —অর্থাৎ শবে-মি'রাজে যে দৃশ্যাবলী আমি আপনাকে দেখিয়েছিলাম, তা মানুষের জন্য একটি ফিতনা ছিল। আরবী ভাষায় 'ফিতনা' শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর এক অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে; অর্থাৎ গোমরাহী। এর এক অর্থ পরীক্ষাও হয় এবং অন্য এক অর্থ হাঙ্গামা ও গোলযোগ। এখানে সব অর্থের সম্ভাবনা বিদ্যমান। হযরত আয়েশা, সুফিয়া হাসান, মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীরবিদ এখানে শেষোক্ত অর্থ নিয়েছেন। তাঁরা বলেন ঃ এটা ছিল ধর্মত্যাগের ফিতনা। রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন শবে মি'রাজে বায়তুল-মুকাদ্দাস, সেখান থেকে আকাশে যাওয়ার এবং প্রত্যুষের পূর্বে ফিরে আসার কথা

প্রকাশ করলেন, তখন কোন কোন অপক্ক নওমুসলিম এ কথাকে মিথ্যা মনে করে মুরতাদ হয়ে গেল।—(কুরতুবী)

এ ঘটনা থেকে একথাও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, رُؤْيَا শব্দটি আরবী ভাষায় যদিও স্বপ্নের অর্থেও আসে, কিন্তু এখানে স্বপ্নের কিস্‌সা বোঝানো হয়নি। কারণ, এরূপ হলে কিছু লোকের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কোন কারণ ছিল না। স্বপ্ন তো প্রত্যেকেই দেখতে পারে। বরং এখানে رُؤْيَا শব্দ দ্বারা জাগ্রত অবস্থায় অভিনব ঘটনা দেখানো বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের তফসীরে কোন কোন তফসীরবিদ মি'রাজের ঘটনা ছাড়া অন্যান্য ঘটনা বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু সেগুলো এখানে খাপ খায় না। একারণেই অধিক সংখ্যক তফসীরবিদ মি'রাজের ঘটনাকেই আয়াতের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছেন। —(কুরতুবী)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦١﴾ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿٦٣﴾ وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾

(৬১) স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম ঃ আদমকে সিজদা কর তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদায় পড়ে গেল। কিন্তু সে বলল ঃ আমি কি এমন ব্যক্তিকে সিজদা করব, যাকে আপনি মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? (৬২) সে বলল ঃ দেখেন তো, এ না সে ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার চাইতেও উচ্চমর্যাদা দিয়ে দিয়েছেন। যদি আপনি আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সময় দেন, তবে আমি সামান্যসংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে নষ্ট করে দেব। (৬৩) আল্লাহ্ বলেন ঃ চলে যা, অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যে তোর অনুগামী হবে, জাহান্নামই হবে তাদের সবার শাস্তি— ভরপুর শাস্তি। (৬৪) তুই সত্যচ্যুত করে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস স্বীয় আওয়াজ দ্বারা, স্বীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ কর, তাদের অর্থসম্পদ ও

সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। ছলনা ছাড়া শয়তান তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না। (৬৫) আমার বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই। আপনার পালনকর্তা যথেষ্ট কার্যনির্বাহী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (সে সময়টি স্মরণযোগ্য) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম : আদমকে সিজদা কর, তখন সবাই সিজদা করল, কিন্তু ইবলিস (করেনি এবং) বলল : আমি কি এমন ব্যক্তিকে সিজদা করব, যাকে আপনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? (এ কারণে সে বিতাড়িত হয়ে গেল। তখন) বলতে লাগল : এ ব্যক্তিকে যে আপনি আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন (এবং এ কারণেই তাকে সিজদা করার আদেশ দিয়েছেন), আচ্ছা বলুন তো (এর মধ্যে কি শ্রেষ্ঠত্ব আছে, যে কারণে আমি বিতাড়িত হয়েছি?) যদি আপনি (আমার প্রার্থনা অনুযায়ী) আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত (মৃত্যু থেকে) সময় দেন তবে আমি (ও) অল্প কয়েকজন ছাড়া (যারা খাঁটি হবে, অবশিষ্ট) তার সব সন্তানকে নিজের বশীভূত করে নেব (অর্থাৎ গোমরাহ্ করে দেব) আল্লাহ্ বললেন : যা (তুই যা করতে পারিস, করে নে), তাদের মধ্যে যে তোর সঙ্গী হবে, তাদের সবার শাস্তি জাহান্নাম—ভরপুর শাস্তি। তাদের মধ্য থেকে যার উপর তোর আধিপত্য চলে স্বীয় আওয়াজ দ্বারা (অর্থাৎ কুমন্ত্রণা ও অপহরণ দ্বারা) তার পা (সৎ পথ থেকে) উপড়িয়ে দে এবং তাদের উপর স্বীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে যা (অর্থাৎ তোর গোটা বাহিনী সম্মিলিতভাবে পথভ্রষ্ট করার কাজে শক্তি নিয়োজিত করুক) এবং তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানাদিতে নিজের অংশ স্থাপন করে নে (অর্থাৎ ধনসম্পদ ও সন্তানাদিতে পথভ্রষ্টতার উপায় করে নে; যেমন তাই হতে দেখা যায়) এবং তাদের সাথে (মিছামিছি) ওয়াদা করে নে (যে, কিয়ামতে গোনাহ্র হিসাব হবে না। হুমকি-হুঁশিয়ারির ছলে শয়তানকে এসব কথা বলা হয়েছে।) শয়তান তাদের সাথে সম্পূর্ণ মিথ্যা ওয়াদা করে। (এ কথাটি মধ্যবর্তী বাক্য হিসাবে বলা হয়েছে।) অতঃপর আবার শয়তানকে বলা হচ্ছে :) আমার খাঁটি বান্দাদের উপর তোর ক্ষমতা চলবে না। (হে মুহাম্মদ, খাঁটি বান্দাদের উপর তার ক্ষমতা কিভাবে চলতে পারে) আপনার পালনকর্তা (তাদের) যথেষ্ট কার্যনির্বাহী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَأَحْتَنِكَنَّ — احتناك শব্দের অর্থ কোন বস্তুর মূলোৎপাটন করা, ধ্বংস করা অথবা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করা। اِسْتَفْزِزْ — استفزاز শব্দের আসল অর্থ বিচ্ছিন্ন

করা। এখানে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা বোঝানো হয়েছে। صَوْتِ ـــ بِصَوْتِكَ শব্দের অর্থ আওয়াজ। শয়তানের আওয়াজ কি? এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ গান, বাদ্যযন্ত্র ও রং তামাশার আওয়াজই শয়তানের আওয়াজ। এর মাধ্যমে সে মানুষকে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এ থেকে জানা গেল যে, বাদ্যযন্ত্র ও গান-বাজনা হারাম। —(কুরতুবী)

ইবলীস হযরত আদমকে সিজদা না করার সময় দু'টি কথা বলেছিল। এক. আদম মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছে এবং আমি অগ্নি দ্বারা সৃজিত। আপনি মাটিকে অগ্নির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন কেন? এ প্রশ্নটি আল্লাহ্র আদেশের বিপরীতে, নির্দেশের রহস্য জানার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কোন আদিষ্ট ব্যক্তির এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আদিষ্ট ব্যক্তির যে রহস্য অনুসন্ধানের অধিকার নেই, এ কথা বলাই বাহুল্য। কারণ, দুনিয়াতে স্বয়ং মানুষ তার চাকরকে এ অধিকার দেয় না যে, সে তার চাকরকে কোন কাজ করতে বলবে এবং চাকর সেই কাজটি করার পরিবর্তে প্রভুকে প্রশ্ন করবে যে, এর রহস্য কি? তাই ইবলীসের এই প্রশ্নটিকে উত্তরের অযোগ্য সাব্যস্ত করে আয়াতে তার উত্তর দেওয়া হয়নি। এছাড়া বাহ্যিক উত্তর এটাই যে, এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অধিকার একমাত্র সে সত্তার, যিনি সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি যখন যে বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন, তখন তাই শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে।

ইবলীসের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, যদি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত জীবন দান করা হয়, তবে আমি আদমের গোটা বংশধরকে অবশ্য তাদের কয়েকজন ছাড়া পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এর উত্তরে বলেছেন ঃ আমার খাঁটি বান্দা যারা, তাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা চলবে না, যদিও তোর গোটা বাহিনী ও সর্বশক্তি এ কাজে নিয়োজিত হয়। অবশিষ্ট অখাঁটি বান্দারা তোর বশীভূত হয়ে গেলে তাদেরও দুর্দশা তাই হবে, যা তোর জন্য নির্ধারিত, অর্থাৎ জাহান্নামের আযাবে তোদের সবাই গ্রেফতার হবে। আয়াতের أَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ বাক্যে শয়তানের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে করে বাস্তবেও শয়তানের কিছু অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিক বাহিনী জরুরী বিবেচিত হয় না, বরং এই বাকপদ্ধতিটি পূর্ণ বাহিনী তথা পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাস্তবে যদি এরূপ থেকেও থাকে, তবে তাও অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ যারা কুফরের সমর্থনে যুদ্ধ করতে যায়, সেসব অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী শয়তানেরই অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী। এখন প্রশ্ন রইল, শয়তান কিরূপে জানতে পারল যে, সে আদমের বংশধরগণকে কুমন্ত্রণা দিয়ে পথভ্রান্ত করতে সক্ষম হবে? সম্ভবত সে মানুষের গঠনপ্রকৃতি দেখে বুঝে নিয়েছে যে, এর মধ্যে কুপ্রবৃত্তির প্রাবল্য হবে। তাই কুমন্ত্রণার ফাঁদে পড়ে যাওয়া কঠিন হবে না। এছাড়া এটা যে মিছামিছি দাবীই ছিল, তাও অবান্তর নয়।

وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ - মানুষের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে শয়তানের শরীকানার অর্থ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে এই যে, ধনসম্পদকে অবৈধ হারাম পন্থায় উপার্জন করা অথবা হারাম কাজে ব্যয় করাই হচ্ছে ধনসম্পদে শয়তানের শরীকানা। সন্তান-সন্ততির মধ্যে শয়তানের শরীকানা কয়েক-ভাবে হতে পারে : সন্তান অবৈধ ও জারজ হলে, সন্তানের মুশরিকসুলভ নাম রাখা হলে তাদের লালন-পালনে অবৈধ পন্থায় উপার্জন করলে।---(কুরতুবী)

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا
إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾ أَفَأَمِنتُمْ
أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا
لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ
عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا
بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

---

(৬৬) তোমাদের পালনকর্তা তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযান চালনা করেন, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পারো। নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (৬৭) যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর বিপদ আসে, তখন শুধু আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা আহবান করে থাক তাদেরকে তোমরা বিস্মৃত হয়ে যাও। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে স্থলে ভিড়িয়ে উদ্ধার করে নেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। (৬৮) তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছে যে, তিনি তোমাদিগকে স্থলভাগে কোথাও ভূগর্ভস্থ করবেন না। অথবা তোমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী ঘূর্ণিঝড় প্রেরণ করবেন না, তখন তোমরা নিজেদের জন্য কোন কর্মবিধায়ক পাবে না। (৬৯) অথবা তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, তিনি তোমাদেরকে আরেকবার

সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না, অতঃপর তোমাদের জন্য মহা ঝটিকা প্রেরণ করবেন না, অতঃপর অকৃতজ্ঞতার শাস্তিস্বরূপ তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেন না, তখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে এ বিষয়ে সাহায্যকারী কাউকে পাবে না। (৭০) নিশ্চয় আমি আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদের স্বপক্ষে এবং অংশীবাদের বাতিল প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ বিষয়ের উপরই এক বিশেষ ভঙ্গিতে আলোকপাত করা হয়েছে। এ আলোচনার সার হলো, আল্লাহ্ তা'আলার যে অগণন ও মহান নিয়ামতরাজি মানবসমাজকে সর্বক্ষণ পরিবেষ্টিত করে রয়েছে তা বর্ণনার মাধ্যমে এ কথা ব্যক্ত করাই উদ্দেশ্য ছিল যে, এ সকল নিয়ামতরাজি দানকারী একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ব্যতীত আর কেউই হতে পারে না। সমগ্র নিয়ামতরাজিই একমাত্র মহান রাব্বুল আলামীনের। সুতরাং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক কিংবা অংশীদার করা অপরিমেয় পথভ্রষ্টতা। ইরশাদ করেছেন ঃ) তোমাদের পালনকর্তা এমন (নিয়ামত-দাতা) যে, তোমাদের (কল্যাণের) জন্য সমুদ্রে জলযান পরিচালনা করেন, যাতে তোমরা তার মাধ্যমে রিযিক সন্ধান করতে পার। (এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সমুদ্র-সফর ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সাধারণত যথেষ্ট পরিমাণ লাভের কারণ হয়ে থাকে।) নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। এবং সমুদ্রে যখন তোমাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয়, (যেমন সমুদ্রতরঙ্গ ও ঝড়-তুফানের কারণে নিমজ্জিত হবার আশংকা) এক আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা অন্যান্য যাদের উপাসনা করে থাকো, তারা সব উধাও হয়ে যায়। (তখন ওদের কথা তোমাদের নিজেদেরই যেমন মনে থাকে না, তেমনি ওদেরকে আহবানও কর না। যদিও বা তাদেরকে আহবান করে থাকো, তো তাদের কাছ থেকে বিন্দুমাত্র সাহায্য প্রাপ্তির প্রত্যাশাও তোমাদের মনে জাগরূক হয় না। এ হলো স্বয়ং তোমাদের নিজেদের পক্ষ থেকেই তওহীদের স্বীকৃতি এবং শিরকের মিথ্যা হওয়ার অনুমোদন। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে দিয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ (যে, এত অল্প সময়ের মধ্যেই তারা আল্লাহ্র প্রতিদান ও নিজের আহাজারি এবং কান্নাকাটির কথা ভুলে যায়। এবং তোমরা যারা স্থলে পৌঁছে নিজেদের মুখ ফিরিয়ে রাখো) তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, তোমাদের স্থলে এনেই ভূগর্ভস্থ করবেন না? (সারকথা এই যে, আল্লাহ্র কাছে স্থল ও সমুদ্রের মধ্যে কোন বিশেষ তফাত নেই। তিনি যেমন সমুদ্রে নিমজ্জিত করতে পারেন, তেমনি স্থলেও তোমাদেরকে ভূগর্ভস্থ করে ফেলতে পারেন।) অথবা (তোমরা কি নিশ্চিন্ত রয়েছ যে) তোমাদের উপর কংকর বর্ষণকারী ঝটিকা প্রেরণ করবেন না? (যেমন আদ জাতির জন্য এ রকম বায়ু ঝড় প্রেরণ করেই তোমাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল।)

তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্মবিধায়ক পাবে না। অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত রয়েছ যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে আরেকবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝটিকা পাঠাবেন না এবং তোমাদের কুফরের জন্য তোমাদেরকে নিমজ্জিত করে দেবেন না? তখন এ বিষয়ে (অর্থাৎ নিমজ্জিত করার ব্যাপারে) তোমরা আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারীই পাবে না (যিনি এজন্য তোমাদের বদলা নিতে পারেন)। এবং আমি তো আদম সন্তানকে (বিশেষ গুণাবলীতে অভিষিক্ত করে) মর্যাদা দান করেছি এবং আমরা তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে (জানোয়ার ও জলযানের উপর) সওয়ার করিয়েছি, তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং আমি তাদেরকে আমার সৃষ্ট অনেকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম-সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব কেন? ঃ সর্বশেষ আয়াতে অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম সন্তানদের শ্রেষ্ঠত্ব উল্লিখিত হয়েছে। এ ব্যাপারে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এক. এই শ্রেষ্ঠত্ব কি গুণাবলী ও কি কারণের উপর নির্ভরশীল? দুই. অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের কথা বলে কি বোঝানো হয়েছে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদম সন্তানকে বিভিন্ন দিক দিয়ে এমন সব বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যেগুলো অন্যান্য সৃষ্টজীবের মধ্যে নেই! উদাহরণত সুশ্রী চেহারা, সুষম দেহ, সুষম প্রকৃতি এবং অঙ্গসৌষ্ঠব। এগুলো মানুষকে দান করা হয়েছে—যা অন্য কোন জীবের মধ্যে নেই। এ ছাড়া বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছে। এর সাহায্যে সে সমগ্র উর্ধ্ব-জগত ও অধঃজগতকে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিভিন্ন সৃষ্টবস্তুর সংমিশ্রণে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করার শক্তি দিয়েছেন, সেগুলো তার বসবাস, চলাফেরা, আহার্য ও পোশাক-পরিচ্ছদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাকশক্তি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার যে নৈপুণ্য মানুষ প্রাপ্ত করেছে, তা অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। ইঙ্গিতের মাধ্যমে মনের কথা অন্যকে বলে দেওয়া, লেখা ও চিঠির মাধ্যমে গোপন ভেদ অন্যজন পর্যন্ত পেঁছানো—এগুলো সব মানুষেরই স্বাতন্ত্র্য। কোন কোন আলিম বলেন ঃ হাতের অঙ্গুলি দ্বারা আহার করাও মানুষেরই বিশেষ গুণ। মানুষ ব্যতীত সব জন্তু মুখে আহার্য গ্রহণ করে। বিভিন্ন জিনিসের সংমিশ্রণে খাদ্যবস্তুকে সুস্বাদু করাও মানুষেরই কাজ। অন্যান্য সব প্রাণী একক বস্তু আহার্য করে। কেউ কাঁচা মাংস, কেউ মাছ এবং কেউ ফল আহার করে। মানুষই কেবল সংমিশ্রিত খাদ্য প্রস্তুত করে। বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা মানুষের সর্বপ্রধান শ্রেষ্ঠত্ব। এর মাধ্যমে সে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও প্রভুর পরিচয় এবং তাঁর পছন্দ ও অপছন্দ জেনে পছন্দের অনুগমন করে এবং অপছন্দ থেকে বিরত থাকে। বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনার দিক দিয়ে সৃষ্টজীবকে এভাবে ভাগ করা যায় যে, সাধারণ জীবজন্তুর মধ্যে কামভাব ও কামনা-বাসনা আছে, কিন্তু বুদ্ধি ও চেতনা নেই। ফেরেশতাদের মধ্যেই বুদ্ধি ও চেতনা আছে, কিন্তু কামভাব

ও বাসনা নেই। একমাত্র মানুষের মধ্যেই বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা আছে এবং কামভাব ও কামনা-বাসানাও আছে। এ কারণেই সে বুদ্ধি ও চেতনার সাহায্যে কামভাব ও বাসনাকে পরাভূত করে দেয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। ফলে তার স্থান ফেরেশতার চাইতেও ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন আদম-সন্তানকে অনেক সৃষ্টজীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অর্থ কি? এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই যে, সমগ্র ঊর্ধ্ব ও অধঃ-জগতের সৃষ্টজীব এবং সমস্ত জীবজন্তুর চাইতেও আদম-সন্তান শ্রেষ্ঠ। এমনিভাবে বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষের সমতুল্য জিন জাতির চাইতেও আদম-সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব সবার কাছে স্বীকৃত। এখন শুধু ফেরেশতাদের ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, মানুষ ও ফেরেশতা-দের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এ ব্যাপারে সুচিন্তিত কথা এই যে, মানুষের মধ্যে যাঁরা সাধারণ ঈমানদার ও সৎকর্মী; যেমন আওলিয়া-দরবেশ, তাঁরা সাধারণত ফেরেশতাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিশেষ শ্রেণীর ফেরেশতা; যেমন জিবরাঈল মীকাঈল প্রমুখ, তাঁরা সাধারণ সৎকর্মী মু'মিনদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। বিশেষ শ্রেণীর মু'মিন, যেমন পয়গম্বর শ্রেণী, তাঁরা বিশেষ শ্রেণীর ফেরেশতাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ। এখন রইল কাফির ও পাপিষ্ঠ মানুষের কথা। বলা বাহুল্য, এরা ফেরেশতাদের চাইতে উত্তম হওয়া তো দূরের কথা, আসল লক্ষ্য সাফল্য ও মুক্তির দিক দিয়ে জন্তু-জানোয়ারের চাইতেও অধম। এদের সম্পর্কে কোরআনের ফয়সালা এই : أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ — অর্থাৎ এরা চতুষ্পদ জন্তুদের ন্যায়; বরং তাদের চাইতেও পথভ্রান্ত।—(মাযহারী)

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧١﴾ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

---

(৭১) স্মরণ কর, যেদিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের নেতাসহ আহবান করব, অতঃপর যাদেরকে ডানহাতে তাদের আমলনামা দেওয়া হবে, তারা নিজেদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম হবে না। (৭২) যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ ছিল, সে পরকালেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রান্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সে দিনটি স্মরণ করা উচিত) যেদিন আমি সব মানুষকে তাদের আমলনামাসহ (হাশরের ময়দানে) আহবান করব। (আমলনামাগুলো উড়িয়ে দেওয়া হবে, অতঃপর তা

কারও ডান হাতে এবং কারও বাম হাতে এসে পড়বে) অতঃপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে (তারা হবে ঈমানদার), এমন লোকেরাই নিজেদের আমলনামা (সন্তুষ্টচিত্তে) পাঠ করবে এবং তাদের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ঈমান ও সৎ কর্মসমূহের পুরস্কার পুরোপুরি দেওয়া হবে —বিন্দুমাত্রও কম দেওয়া হবে না ; বরং বেশি দেওয়া যেতে পারে। তারা আযাব থেকে মুক্তিও পাবে, প্রথম পর্যায়েই কিংবা গোনাহ্‌র শাস্তি ভোগ করার পর) এবং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে (মুক্তির পথ প্রাপ্তি থেকে) অন্ধ ছিল, সে পরকালেও (মুক্তির মনযিলে পৌঁছা থেকে) অন্ধ থাকবে এবং (বরং সেখানে দুনিয়ার চাইতেও) অধিক পথভ্রান্ত হবে। (কেননা দুনিয়াতে পথভ্রষ্টতার প্রতিকার সম্ভবপর ছিল, সেখানে তাও হবে না। এরাই তারা, যাদের আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ—এখানে امام শব্দের অর্থ গ্রন্থ ; যেমন সূরা ইয়াসীনে রয়েছে, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ এখানে امام مبين অর্থ সুস্পষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থকে ইমাম বলার কারণ এই যে, ভুলভ্রান্তি ও দ্বিমত দেখা দিলে গ্রন্থেরই আশ্রয় নেওয়া হয় ; যেমন কোন অনুসৃত ইমামের আশ্রয় নেওয়া হয়।—(কুরতুবী)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে তিরমিযীর হাদীস থেকেও জানা যায় যে, আয়াতে ইমাম শব্দের অর্থ গ্রন্থ। হাদীসের ভাষা এরূপ ঃ

يوم ندعوا كل اناس باما مهم قال يدعى احدهم فيعطى كتابه بيمينه

অর্থাৎ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ —আয়াতের তফসীরে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে, এক এক ব্যক্তিকে ডাকা হবে এবং তার আমলনামা তার ডানহাতে দেওয়া হবে।

এ হাদীস থেকে নির্ণীত হয়ে গেল যে, ইমাম শব্দের অর্থ গ্রন্থ এবং গ্রন্থ অর্থ, আমলনামা করা হয়েছে।

হযরত আলী (রা) ও মুজাহিদ থেকে এখানে ইমাম শব্দের অর্থ নেতাও বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেতার নাম নিয়ে ডাকা হবে—এই নেতা পয়গম্বর ও তাঁদের নায়েব মাশায়েখ ও ওলামা হোক কিংবা পথভ্রষ্টতার প্রতি আহবানকারী নেতা হোক।—(কুরতুবী)

এ অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেতার নাম দ্বারা ডাকা হবে এবং সবাইকে এক জায়গায় জমায়েত করা হবে। উদাহরণত

ইবরাহীম (আ)-এর অনুসারী দল, মূসা (আ)-র অনুসারী দল, ঈসা (আ)-র অনুসারী দল এবং মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারী দল। এ প্রসঙ্গে এসব অনুসারীর প্রত্যেক নেতাদের নাম নেওয়াও সম্ভবপর।

আমলনামা : কোরআন পাকের একাধিক আয়াত থেকে জানা যায় যে, শুধু কাফিরদেরকেই বামহাতে আমলনামা দেওয়া হবে; যেমন এক আয়াতে রয়েছে إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ অন্য এক আয়াতে রয়েছে, إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ — প্রথম আয়াতে স্পষ্টভাবে ঈমান না থাকার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে পরকালে অবিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও কুফরই। এ থেকে জানা গেল যে, ডানহাতে আমলনামা ঈমানদারদেরকে দেওয়া হবে; পরহিযগার হোক কিংবা গোনাহ্গার। তারা আনন্দচিত্তে আমালনামা পাঠ করবে এবং অন্যদেরকেও পাঠ করতে দেবে। এ আনন্দ ঈমান ও চিরস্থায়ী আযাব থেকে মুক্তির হবে; যদিও কোন কোন কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তিও ভোগ করতে হবে।

কোরআন পাকে আমলনামা ডান অথবা বামহাতে অর্পণের অবস্থা বর্ণিত হয়নি, কিন্তু কোন কোন হাদীসে تطاير الكتب শব্দটি উল্লিখিত আছে; অর্থাৎ আমলনামা উড়ে এসে হাতে পড়বে। কোন কোন হাদীসে আছে, সব আমলনামা আরশের নীচে একত্রিত হবে। অতঃপর বাতাস প্রবাহিত হবে এবং সবগুলোকে উড়িয়ে মানুষের হাতে পৌঁছে দেবে—কারও ডান হাতে এবং কারও বাম হাতে। ---(বয়ানুল কোরআন)

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۖ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾

---

(৭৩) তারা তো আপনাকে হটিয়ে দিতে চাচ্ছিল যে বিষয় আমি আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে যা প্রেরণ করেছি তা থেকে আপনার পদস্খলন ঘটানোর জন্য তারা চূড়ান্ত চেষ্টা

করছে ; যাতে আপনি আমার প্রতি কিছু মিথ্যা সম্বন্ধযুক্ত করেন। এতে সফল হলে তারা আপনাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিত। (৭৪) আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখলে আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন। (৭৫) তখন আমি অবশ্যই আপনাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তির আস্বাদন করাতাম। এ সময় আপনি আমার মুকাবিলায় কোন সাহায্যকারী পেতেন না। (৭৬) তারা তো আপনাকে এ ভূখণ্ড থেকে উৎখাত করে দিতে চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল যাতে আপনাকে এখান থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া যায়। তখন তারাও আপনার পর সেখানে অল্পকালই মাত্র টিকে থাকত। (৭৭) আপনার পূর্বে আমি যত রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম ছিল। আপনি আমার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম পাবেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং এ কাফিররা (শক্তিশালী কৌশলের মাধ্যমে) আপনাকে সে বিষয় থেকে পদস্খলন ঘটাতে চাচ্ছিল, যা আমি ওহীর মাধ্যমে আপনার প্রতি প্রেরণ করেছি (অর্থাৎ আপনার দ্বারা আল্লাহ্র নির্দেশের বিপরীত কাজ করাবার চেষ্টায় মেতেছিল এবং) যাতে আপনি এছাড়া (অর্থাৎ আল্লাহ্র নির্দেশ ছাড়া) আমার প্রতি (কার্যক্ষেত্রে) মিথ্যা বিষয় সম্বন্ধযুক্ত করে দেন। [কেননা নবীর কাজ শরীয়তের বিরুদ্ধে হয় না। কাজেই নাউযুবিল্লাহ্ রসূলুল্লাহ্ (সা) যদি শরীয়তের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতেন, তবে এর অর্থ এই দাঁড়াত যে, তিনি যেন শরীয়তবিরুদ্ধ কাজটি আল্লাহ্র প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করছেন।] এমতাবস্থায় তারা আপনাকে অকৃত্রিম বন্ধু বানিয়ে নিত। (তাদের এই অপচেষ্টা এত তীব্র ছিল যে) যদি আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না বানাতাম (অর্থাৎ নিষ্পাপ না করতাম) তবে আপনি তাদের দিকে কিছুটা ঝুঁকে যেতেন। এরূপ হলে (অর্থাৎ তাদের প্রতি আপনার কিছুটা ঝোঁক হলে) আমি আপনাকে (নৈকট্যশীলদের উচ্চ মর্তবার কারণে) জীবনে ও মরণে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম। অতঃপর আপনি আমার মুকাবিলায় কোন সাহায্যকারীও পেতেন না। (কিন্তু যেহেতু আমি আপনাকে নিষ্পাপ ও দৃঢ়পদ করেছি, তাই তাদের প্রতি আপনার বিন্দুমাত্রও ঝোঁক হয়নি এবং আপনি শাস্তির কবল থেকে বেঁচে গেছেন।) এবং তারা (অর্থাৎ কাফিররা) এ দেশ (মক্কা অথবা মদীনা) থেকে আপনার পা-ই উপড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, যাতে আপনাকে এখান থেকে বহিষ্কার করে দেয়। এরূপ হলে আপনার পর তারাও খুব কমই (এখানে) টিকতে পারত ; যেমন পয়গম্বরদের সম্পর্কে (আমার) এই নীতি ছিল, যাদেরকে আপনার পূর্বে রসূল করে প্রেরণ করেছিলাম। (তাঁদের সম্প্রদায় যখন তাঁদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে, তখন তাদেরও সেখানে বাস করার ভাগ্য হয়নি।) আপনি আমার নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম তিন আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। তফসীর মাযহারীতে ঘটনাটি নির্ণয় করার ব্যাপারে কয়েকটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হয়েছে।

তন্মধ্যে যুবায়ের ইবনে নুফায়র (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত ঘটনাটি সত্যের অধিক নিকটবর্তী এবং কোরআনের ইঙ্গিত দ্বারা সমর্থিত। ঘটনাটি এই যে, কতিপয় কুরায়শ সরদার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল : আপনি যদি বাস্তবিকই আমাদের জন্য প্রেরিত হয়ে থাকেন, তবে আপনার মজলিস থেকে সে সব দুর্দশাগ্রস্ত ছিন্নমূল লোককে বের করে দিন, যাদের সাথে একত্রে বসা আমাদের জন্য অপমানকর। এরূপ করলে আমরাও আপনার সাহাবী ও বন্ধু হয়ে যাব। তাদের এই আবদার শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মনেও কিছুটা কল্পনা জাগে যে এদের দাবী পূরণ করা হলে সম্ভবত এরা মুসলমান হয়ে যাবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খবরদার করা হয়েছে যে, তাদের আবদার একটি ফিতনা এবং তাদের বন্ধুত্বও ফিতনা। আপনি তাদের কথা মেনে নেবেন না। এরপর বলা হয়েছে : যদি আমার পক্ষ থেকে আপনার প্রশিক্ষণ এবং আপনাকে দৃঢ়পদ রাখার ব্যবস্থা না হত, তবে তাদের আবদারের দিকে ঝুঁকে পড়ার কিছু কাছাকাছি হয়ে যাওয়া আপনার কাছে অসম্ভব ছিল না।

তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে, এ আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, কাফিরদের অনর্থক আবদারের দিকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ঝুঁকে পড়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। হ্যাঁ, ঝুঁকে পড়ার কাছাকাছি হওয়ার সামান্য পরিমাণে সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিষ্পাপ করে এ থেকেও বাঁচিয়ে রেখেছেন। চিন্তা করলে এ আয়াতটি পয়গম্বরদের সুউচ্চ ও পবিত্রতম চরিত্র ও স্বভাবের একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। পয়গম্বর-সুলভ পাপমুক্ততা না থাকলেও কাফিরদের অনর্থক আবদারের দিকে ঝুঁকে পড়া পয়-গম্বরের স্বভাবের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। হ্যাঁ, ঝুঁকে পড়ার কিছু কাছাকাছি হওয়ার সামান্য পরিমাণে সম্ভাবনা ছিল। পয়গম্বরসুলভ নিষ্পাপ চরিত্রের কারণে তাও দূর করে দেওয়া হয়েছে।

إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ — অর্থাৎ যদি অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে আপনি তাদের ভ্রান্ত কার্যক্রমের দিকে ঝুঁকে পড়ার কাছাকাছি হয়ে যেতেন, তবে আপনার শাস্তি ইহকালেও দ্বিগুণ হত এবং মৃত্যুর পর কবর অথবা পরকালেও দ্বিগুণ হত। কেননা, নৈকট্যশীলদের মামুলি ভ্রান্তিকেও বিরাট মনে করা হয়। এ বিষয়বস্তুটি সে বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ, যা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পত্নীদের সম্পর্কে কোরআনে বর্ণিত হয়েছে—

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ

অর্থাৎ হে নবী পত্নীরা, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে নির্লজ্জ কাজ করে, তবে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে।

وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ — اِسْتِفْزَاز-এর শাব্দিক অর্থ, কর্তন করা। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বীয় বাসভূমি মক্কা অথবা মদীনা থেকে বের করে দেওয়া বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কাফিররা আপনাকে নিজ দেশ থেকে বের করে দেওয়ার উপক্রম করেছিল। তারা যদি এরূপ করত, তবে এর শাস্তি ছিল এই যে, তারাও আপনার পরে বেশি দিন এ শহরে বাস করতে পারত না। এটি অপর একটি ঘটনার বর্ণনা, যার নির্ণয়েও দু'রকম রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। একটি মদীনা তাইয়েবার ঘটনা এবং অপরটি মক্কা মোকাররমার। মদীনার ঘটনা এই যে, একদিন মদীনার ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল : হে আবুল কাসেম (সা) যদি আপনি নবুওয়তের দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তবে সিরিয়ায় গিয়ে বসবাস করাই আপনার পক্ষে সমীচীন। কেননা, সিরিয়াই হবে হাশরের মাঠ এবং সেটাই পয়গম্বরদের বাসভূমি। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মনে তাদের একথা কিছুটা রেখাপাত করে। তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি যখন সিরিয়া সফর করেন, তখন সিরিয়াকে অন্যতম বাসস্থান করার ইচ্ছা তাঁর মনে জাগ্রত হয়। কিন্তু আলোচ্য وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ আয়াতটি নাযিল করে, এতে তাঁকে এ ইচ্ছা বাস্তবায়ন নিষেধ করে দেওয়া হয়। ইবনে কাসীর রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করে একে অসন্তোষজনক আখ্যা দিয়েছেন।

তিনি অপর একটি ঘটনার প্রতিও আয়াতের ইঙ্গিত বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি মক্কায় সংঘটিত হয়। সূরাটির মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষে শক্তিশালী ইঙ্গিত। ঘটনাটি এই যে, একবার কোরায়েশরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মক্কা থেকে বের করে দেওয়ার ইচ্ছা করে। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে কাফিরদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যদি তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মক্কা থেকে বহিষ্কার করে দেয়, তবে নিজেরাও মক্কায় বেশি দিন সুখে-শান্তিতে টিকতে পারবে না। ইবনে কাসীর আয়াতের ইঙ্গিত হিসাবে এ ঘটনাটিকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন এবং বলেছেন, কোরআন পাকের এই হুঁশিয়ারিও মক্কার কাফিররা খোলা চোখে দেখে নিয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন, তখন মক্কা ওয়ালারা একদিনও মক্কায় আরামে থাকতে পারেনি। মাত্র দেড় বছর পর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বদরের ময়দানে উপস্থিত করে দেন, যেখানে তাদের সত্তর জন সরদার নিহত হয় এবং গোটা শক্তি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর ওহুদ যুদ্ধের শেষ পরিণতিতে তাদের উপর আরও ভয়ভীতি চড়াও হয়ে যায় এবং খন্দক যুদ্ধের সর্বশেষ সংঘর্ষ তো তাদের মেরুদণ্ডই ভেঙে দেয়। হিজরী অষ্টম বর্ষে রসূলুল্লাহ্ (সা) সমগ্র মক্কা মোকাররমা জয় করে নেন।

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا — এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার সাধারণ নিয়ম পূর্ব থেকেই এরূপ চালু রয়েছে যে, যখন কোন জাতি তাদের পয়গম্বরকে তাঁর

মাতৃভূমি থেকে বের করে দেয়, তখন সেই জাতিকেও সেখানে বেশি দিন টিকিয়ে রাখা হয় না। তাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হয়।

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۞ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰى أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۞ وَقُلْ رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّي مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيرًا ۞ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۖ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۞

(৭৮) সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করুন এবং ফজরের কোরআন পাঠও। নিশ্চয় ফযরের কোরআন পাঠ মুখোমুখি হয়। (৭৯) রাত্রির কিছু অংশ কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত। হয়ত বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মোকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন। (৮০) বলুন ঃ হে পালনকর্তা আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে এবং দান করুন আমাকে নিজের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য। (৮১) বলুন ঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল। (৮২) আমি কোরআনে এমন বিষয় নাযিল করি, যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য রহমত। গোনাহ্‌-গারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত নামায আদায় করুন (এতে যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা—এই চার ওয়াক্তের নামায এসে গেছে ; যেমন হাদীসে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে) এবং ফজরের নামাযও (আদায় করুন)। নিশ্চয় ফজরের নামায (ফেরেশতাদের) হাজির হওয়ার সময়। ফজরের সময়টি নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার সময়। এতে অলসতার আশংকা ছিল, তাই একে আলাদাভাবে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। সাথে সাথে এর একটি অতিরিক্ত ফযীলতও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সময়

ফেরেশতারা জমায়েত হয়। হাদীসে এর বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, মানুষের হিফাযত ও আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করার ফেরেশতা, দিনের বেলার আলাদা এবং রাত্রি বেলার আলাদা রয়েছে। ফজরের নামাযের সময় ফেরেশতাদের উভয় দল একত্রিত হয়। রাত্রির ফেরেশতারা নিজেদের কাজ শেষ করা এবং দিনের ফেরেশতারা নিজেদের কাজ শুরু করার জন্য একত্রিত হয়। এমনিভাবে বিকালে আসরের নামাযে উভয় দল একত্রিত হয়। বলা বাহুল্য, ফেরেশতাদের সমাবেশ বরকতের কারণ। এবং রাত্রির কিছু অংশেও (নামায আদায় করুন) অর্থাৎ তাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়ুন, যা আপনার জন্য (পাঁচ ওয়াক্তের নামায ছাড়া) অতিরিক্ত [এই অতিরিক্তের অর্থ, কারও কারও মতে অতিরিক্ত ফরয, যা বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি ফরয করা হয়েছে এবং কারও কারও মতে এর অর্থ নফল]। আশা (অর্থাৎ ওয়াদা) এই যে, আপনার পালনকর্তা আপনাকে 'মকামে মাহমুদে' স্থান দেবেন। ['মকামে মাহমুদের' অর্থ, শাফায়াতে কুবরা বা প্রধান শাফায়েতের মর্তবা—যা হাশরের মাঠে সমগ্র মানব জাতির জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দান করা হবে]। আপনি দোয়া করুনঃ হে আমার পালনকর্তা, (মক্কা থেকে যাওয়ার পর) আমাকে (যেখানে দাখিল করবেন) উত্তমরূপে (অর্থাৎ আরামের সাথে) দাখিল করুন এবং (যখন মক্কা থেকে বের করেন, তখন) আমাকে উত্তমরূপে (অর্থাৎ আরামের সাথে) বের করুন এবং আমাকে নিজের কাছ থেকে (কাফিরদের বিরুদ্ধে) এমন বিজয় দান করুন, যার সাথে (আপনার) সাহায্য থাকে, যদ্দরুন সে বিজয় দীর্ঘস্থায়ী ও উন্নত হয়। নতুবা সাময়িক বিজয় তো কোন সময় কাফিররাও লাভ করে। কিন্তু তার সাথে আল্লাহ্র সাহায্য থাকে না। ফলে দীর্ঘস্থায়ীও হয় না)। বলে দিনঃ (ব্যস এখন) সত্য (ধর্ম বিজয়ের পথে) এসে গেছে (এবং বাতিল বিলীন হওয়ার পথে। বাস্তবিক বাতিল তো ক্ষণভঙ্গুরই হয়। হিজরতের পর মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে এসব ওয়াদা পূর্ণ হয়ে যায়)। আমি এমন বস্তু অর্থাৎ কোরআন নাযিল করি, যা ঈমানদারদের জন্য রোগের সুচিকিৎসা ও রহমত। (কেননা তারা একে মানে ও এর নির্দেশমত কাজ করে। ফলে তাদের প্রতি রহমত হয় এবং তারা মিথ্যা বিশ্বাস এবং দুষ্ট কল্পনার কবল থেকে আরোগ্য লাভ করে)। জালিমদের তো এর দ্বারা ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়। (কেননা তারা যখন কোরআনকে অমান্য করে, তখন আল্লাহ্ ক্রোধ ও গযবের যোগ্য হয়ে যায়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শত্রুদের দুরভিসন্ধি থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার নামাযঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে শত্রুদের বিরোধিতা, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিভিন্ন প্রকার কষ্টে পতিত করার অপচেষ্টা এবং এর জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নামায কায়েম করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শত্রুদের দুরভিসন্ধি ও উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার হচ্ছে নামায কায়েম করা। সূরা হিজরের আয়াতে আরও স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছেঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ ـ

অর্থাৎ আমি জানি যে, কাফিরদের পীড়াদায়ক কথা-বার্তা শুনে আপনার অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়। অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।—(কুরতুবী)

এ আয়াতে আল্লাহ্র যিক্র, প্রশংসা, তসবীহ্ ও নামাযে মশগুল হয়ে যাওয়াকে শত্রুদের উৎপীড়নের প্রতিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্র যিকর ও নামায বিশেষভাবে এ থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার। এ ব্যাখ্যাও অবান্তর নয় যে, শত্রুদের উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করা আল্লাহ্র সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এবং আল্লাহ্র সাহায্য লাভ করার উত্তম পন্থা হচ্ছে নামায ; যেমন কোরআন পাক বলে : وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ অর্থাৎ সবর ও নামায দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর।

পাঞ্জেগানা নামাযের নির্দেশ : সাধারণ তফসীরবিদের মতে এ আয়াতটি পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ। কেননা, دلوك শব্দের অর্থ, আসলে ঝুঁকে পড়া। সূর্যের ঝুঁকে পড়া তখন শুরু হয় যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে, সূর্যাস্তকেও دلوك বলা যায়। কিন্তু সাধারাণ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এ স্থলে শব্দের অর্থ সূর্যের ঢলে পড়াই নিয়েছেন।—(কুরতুবী, মাযহারী, ইবনে কাসীর)

غسق—اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ শব্দের অর্থ রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া। ইমাম মালিক হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এ তফসীর বর্ণনা করেছেন।

এভাবে دُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ -এর মধ্যে চারটি নামায এসে গেছে : যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। এদের মধ্যে দু'নামাযের প্রথম ওয়াক্তও বলে দেওয়া হয়েছে যে, যোহরের প্রথম ওয়াক্ত সূর্য ঢলার সময় থেকে শুরু হয় এবং এশার সময় غسق ليل অর্থাৎ অন্ধকার পূর্ণ হয়ে গেলে হয়। একারণেই ইমাম আযম আবূ হানীফা সে সময়কে এশার ওয়াক্তের শুরু সাব্যস্ত করেছেন, যখন সূর্যাস্তের লাল আভার পর সাদা আভাও অস্তমিত হয়। এটা সবারই জানা যে, সূর্যাস্তের পর পর পশ্চিম দিগন্তে লাল আভা দেখা দেয়। এরপর এক প্রকার সাদা আভা দিগন্তে ছড়িয়ে থাকে। এরপর এই সাদা আভাও অস্তমিত হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, দিগন্তের শুভ্র আভা শেষ

হয়ে গেলেই রাত্রির অন্ধকার পূর্ণতা লাভ করে। তাই আয়াতের এই শব্দের মধ্যে ইমাম আবূ হানিফার মাযহাবের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। অন্য ইমামগণ লাল আভা অস্তমিত হওয়াকে এশার ওয়াক্তের শুরু সাব্যস্ত করেছেন এবং একই غسق الليل-এর তফসীর স্থির করেছেন।

وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ—এখানে قرآن শব্দ বলে নামায বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআন নামাযের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ইবনে কাসীর, কুরতুবী, মাযহারী প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ এ অর্থই লিখেছেন। কাজেই আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, دُلُوكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ বাক্যে চার নামাযের বর্ণনা ছিল এবং এতে পঞ্চম নামাযের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। একে আলাদা করে বর্ণনা করার মধ্যে এই নামাযের বিশেষ গুরুত্ব ও ফযীলতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

كَانَ مَشْهُوْدًا—شهادة ধাতু থেকে এর উৎপত্তি। অর্থ, উপস্থিত হওয়া সহীহ্ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী এ সময় দিবা-রাত্রির উভয় দল ফেরেশতা নামাযে উপস্থিত হয়। তাই একে مشهود বলা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে পাঞ্জেগানা নামাযের নির্দেশ সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ণ তফসীর ও ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ্ (সা) কথা ও কাজ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নামায আদায়ই করতে পারে না। জানিনা, যারা কোরআনকে হাদীস ও রসূলের বর্ণনা ছাড়াই বোঝার দাবী করে তারা নামায কিভাবে পড়ে? এমনিভাবে এ আয়াতে নামাযে কোরআন পাঠের কথাও সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। এর বিবরণ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কথা ও কাজ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে; অর্থাৎ ফজরের নামাযে সামর্থ্যানুযায়ী দীর্ঘ কিরাআত করতে হবে। মাগরিবে দীর্ঘ কিরাআত এবং ফজরে সংক্ষিপ্ত কিরাআতের কথা কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু তা কার্যত পরিত্যক্ত। সহীহ্ মুসলিমের যে রেওয়ায়েতে মাগরিবের নামাযে সূরা আ'রাফ, মুর-সালাত ইত্যাদি দীর্ঘ সূরা পাঠ করা এবং ফজরের নামাযে শুধু 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস' পাঠ করার কথা বর্ণিত আছে, ইমাম কুরতুবী সেই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেছেন:

فمتروك بالعمل و لانكاره على معاذ التطويل و باصره الائمة بالتخفيف—অর্থাৎ মাগরিবে দীর্ঘ কিরাআত ও ফজরে সংক্ষিপ্ত কিরাআতের এসব কদাচিৎ ঘটনা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সার্বক্ষণিক আমল ও মৌখিক উক্তি দ্বারা পরি-ত্যক্ত।

তাহাজ্জুদ নামাযের সময় ও বিধানাবলী : وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ

تَهَجُّدٌ—শব্দটি هُجُوْد থেকে উদ্ভূত। নিদ্রা যাওয়া ও জাগ্রত হওয়া এই পরস্পর-বিরোধী দুই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, রাত্রির কিছু অংশে কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। কেননা, بِهٖ- এর সর্বনাম দ্বারা কোরআন বোঝানো হয়েছে। (মাযহারী) কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকার অর্থ নামায পড়া। এ কারণেই শরীয়তের পরিভাষায় রাত্রিকালীন নামাযকে 'নামাযে তাহাজ্জুদ' বলা হয়। সাধারণত এর অর্থ এরূপ নেওয়া হয় যে, কিছুক্ষণ নিদ্রা হওয়ার পর যে নামায পড়া হয় তাই তাহাজ্জুদের নামায। কিন্তু তফসীর মাযহারীতে রয়েছে, আয়াতের অর্থ এতটুকুই যে, রাত্রির কিছু অংশ নামায পড়ার জন্য নিদ্রা ত্যাগ কর। কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর জাগ্রত হয়ে নামায পড়লে যেমন এই অর্থ ঠিক থাকে, তেমনি প্রথমেই নামাযের জন্য নিদ্রাকে পিছিয়ে নিলেও এ অর্থের ব্যতিক্রম হয় না। তাই তাহাজ্জুদের জন্য প্রথমে নিদ্রা যাওয়ার শর্ত কোরআনের অভিপ্রেত অর্থ নয়। এরপর কোন কোন হাদীস দ্বারা তাহাজ্জুদের এই সাধারণ অর্থ প্রমাণ করা হয়েছে।

ইবনে কাসীর হযরত হাসান বসরী (রহ) থেকে তাহাজ্জুদের যে সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন, তাও এই ব্যাপক অর্থের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে কাসীর লেখেন :

قال الحسن البصرى هو ما كان بعد العشاء ويحمل على ما كان بعد النوم অর্থাৎ হযরত হাসান বসরী বলেন : এশার পরে পড়া হয় এমন প্রত্যেক নামাযকে তাহাজ্জুদ বলা যায়। তবে প্রচলিত পদ্ধতির কারণে কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর পড়ার অর্থে বোঝা দরকার।

এর সারমর্ম এই যে, তাহাজ্জুদের আসল অর্থে নিদ্রার পরে হওয়ার শর্ত নেই এবং কোরআনের ভাষায়ও এরূপ শর্তের অস্তিত্ব নেই ; কিন্তু সাধারণত রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম শেষরাত্রে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। তাই এভাবে পড়াই উত্তম হবে।

তাহাজ্জুদ ফরয না নফল ? : نافلة نفل—نَافِلَةً لَّكَ শব্দের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত। একারণেই যেসব নামায ও সদকা-খয়রাত ওয়াজিব ও জরুরী নয়—করলে সওয়াব পাওয়া যায় এবং না করলে গোনাহ্ নাই, সেগুলোকে নফল বলা হয়। আয়াতে নামাযে তাহাজ্জুদের সাথে نافلة لك শব্দ সংযুক্ত হওয়ায় বাহ্যত বোঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামায বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য নফল। অথচ এটা সমগ্র উম্মতের জন্যও নফল। এজন্যই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে نافلة শব্দটিকে فريضة- এর বিশেষণ সাব্যস্ত করে অর্থ এরূপ স্থির করেছেন যে, সাধারণ

উম্মতের ওপর তো শুধু পাঞ্জেগানা নামাযই ফরয; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) র ওপর তাহাজ্জুদও একটি অতিরিক্ত ফরয। অতএব এখানে نافلة শব্দের অর্থ, অতিরিক্ত ফরয ---নফলের সাধারণ অর্থে নয়।

এ ব্যাপারে সুচিন্তিত বক্তব্য এই যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন সূরা মুযাম্মেল অবতীর্ণ হয়, তখন পাঞ্জেগানা নামায ফরয ছিল না, শুধু তাহাজ্জুদের নামায সবার ওপর ফরয ছিল। সূরা মুযাম্মেলে এর উল্লেখ রয়েছে। এরপর শবে মি'রাজে যখন পাঞ্জেগানা নামায ফরয করা হয়, তখন তাহাজ্জুদের ফরয নামায সাধারণ উম্মতের পক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে রহিত হয়ে যায় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পক্ষেও রহিত হয় কি না, সে ব্যাপারে মতভেদ থেকে যায়। আলোচ্য আয়াতের نافلة لك বাক্যের অর্থ তাই এই যে, তাহাজ্জুদের নামায রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পক্ষে একটি অতিরিক্ত ফরয। কিন্তু তফসীরে কুরতুবীতে কয়েক কারণে এ বক্তব্যকে অশুদ্ধ বলা হয়েছে। এক. ফরযকে নফল শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কোন কারণ নেই। যদি রূপক অর্থ বলা হয়, তবে এটি এমন একটি রূপক অর্থ হবে, যার কোন প্রকৃত অর্থ নেই। দুই. সহীহ্ হাদীসসমূহে শুধু পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এক হাদীসের শেষে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, শবে মি'রাজে প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর তা হ্রাস করে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেওয়া হয়। এখানে যদিও সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে; কিন্তু সওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই পাওয়া যাবে। এরপর বলা হয়েছে ঃ

لا يبدل القول لدى — অর্থাৎ আমার কথা পরিবর্তিত হয় না। যখন পঞ্চাশ ওয়াক্তের নির্দেশ দিয়েছিলাম, তখন সওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই দেওয়া হবে, যদিও কাজ হালকা করে দেওয়া হয়েছে।

এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, সাধারণ উম্মত এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর পাঞ্জেগানা নামায ছাড়া কোন নামায ফরয ছিল না। আরও এক কারণ এই যে, نافلة শব্দটি যদি এখানে অতিরিক্ত ফরযের অর্থে হত, তবে এর পরে لك শব্দের পরিবর্তে عليك হওয়া উচিত ছিল, যা ওয়াজিব হওয়ার অর্থ দেয়। لك তো শুধু জায়েয হওয়া ও অনুমতির অর্থ বুঝায়।

তফসীর মাযহারীতে এ ব্যাখ্যাকেই বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ফরয নামায যখন উম্মতের পক্ষে রহিত হয়ে যায়, তখন তা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পক্ষেও রহিত হয়ে যায় এবং সবার জন্য নফল থেকে যায়। কিন্তু এমতাবস্থায় প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তাহলে نافلة لك বলার কি মানে হবে? তাহাজ্জুদ তো সবার জন্যই নফল। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বৈশিষ্ট্য কি? উত্তর এই যে, হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী সমগ্র উম্মতের নফল ইবাদত তাদের গোনাহের কাফফারা এবং ফরয নামায-সমূহের ত্রুটি পূরণের উপকারে লাগে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) গোনাহ্ থেকে এবং ফরয

নামাযের ত্রুটি থেকেও মুক্ত। কাজেই তাঁর পক্ষে নফল ইবাদত সম্পূর্ণ অতিরিক্ত বৈ নয়। তাঁর নফল ইবাদত কোন ত্রুটি পূরণের জন্য নয়; বরং তা শুধু অধিক নৈকট্য লাভের উপায়।—(কুরতুবী, মাযহারী)

তাহাজ্জুদ নফল, না সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্ঃ ফিকাহ্‌বিদদের মতে সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্‌র সাধারণ সংজ্ঞা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যে কাজ স্থায়ীভাবে করেছেন এবং বিনা ওযরে ত্যাগ করেননি, তাই সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্। তবে যদি কোন শরীয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা বোঝা যায় যে, কাজটি একান্তভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-রই বৈশিষ্ট্য—সাধারণ উম্মতের জন্য নয়, তবে তা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্ নয়। এই সংজ্ঞার বাহ্যিক তাগিদ এই যে, তাহাজ্জুদও সবার জন্য সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্ হওয়া চাই, শুধু নফল নয়। কেননা, তাহাজ্জুদের নামায স্থায়ীভাবে পড়া রসূলুল্লাহ (সা) থেকে মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য হওয়ারও কোন প্রমাণ নেই। তফসীরে মাযহারীতে একেই পছন্দনীয় ও অগ্রগণ্য উক্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এর পক্ষে হযরত ইবনে মাসউদের একটি হাদীসও প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, যে পূর্বে তাহাজ্জুদের নামায পড়ত এবং পরে ত্যাগ করে। তিনি উত্তরে বললেনঃ তার কর্ণকুহরে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে। এ ধরনের বিরূপ মন্তব্য ও হুঁশিয়ারি শুধু নফলের জন্য হতে পারে না। এতে বোঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামায সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্।

যারা তাহাজ্জুদকে শুধু নফল মনে করেন, তারা স্থায়ীভাবে তাহাজ্জুদ পড়াকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করেছেন। উপরোক্ত হাদীসে তাহাজ্জুদ তরক করার কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) যে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, এটা প্রকৃতপক্ষে নিছক তরক করার কারণে নয়; বরং প্রথমে অভ্যাস গড়ে তোলার পর তরক করার কারণে। কেননা, একবার কোন নফলের অভ্যাস করার পর তা নিয়মিতভাবে পালন করে যাওয়া সবার মতেই বাঞ্ছনীয়। অভ্যাস গড়ে তোলার পর ত্যাগ করা নিন্দনীয়। কেননা, অভ্যাসের পর বিনা ওযরে ত্যাগ করা এক প্রকার বিমুখতার লক্ষণ। যে ব্যক্তি প্রথম থেকেই অভ্যাস করে না, সে নিন্দার পাত্র নয়।

তাহাজ্জুদের রাকআত সংখ্যাঃ সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) রমযানে অথবা রমযানের বাইরে কোন সময় এগার রাকআতের বেশি পড়তেন না। তম্মধ্যে হানাফীদের মতে তিন রাকআত ছিল বিতরের নামায এবং অবশিষ্ট আট রাকআত তাহাজ্জুদের।

মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) রাত্রে তের রাকআত পড়তেন। বিতেরের তিন রাকআত এবং ফজরের দুই রাকআত সুন্নতও এর অন্তর্ভুক্ত (মাযহারী) রমযানের কারণে ফজরের সুন্নতকে রাত্রিকালীন নামাযের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। এসব রিওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, তাহাজ্জুদের নামায আট রাকআত পড়াই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাধারণ অভ্যাস ছিল।

কিন্তু হযরত আয়েশা (রা)-রই অপর এক রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, মাঝে মাঝে উপরোক্ত সংখ্যা থেকে কম চার অথবা ছয় রাকআতও পড়েছেন, যেমন সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েতে মস্রুক (রা) হযরত আয়েশাকে তাহাজ্জুদের নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ সাত, নয় ও এগার রাকআত হত ফজরের সুন্নত ছাড়া। (মাযহারী) হানাফী নিয়ম অনুযায়ী বেতেরের তিন রাকআত বাদ দিলে সাতের মধ্যে চার, নয়ের মধ্যে ছয় এবং এগারর মধ্যে আট তাহাজ্জুদের রাকআত থেকে যায়।

তাহাজ্জুদের নামায পড়ার নিয়ম ঃ বিভিন্ন হাদীস থেকে যা প্রমাণিত আছে, তা এই যে, প্রথমে দু'রাকআত হালকা ও সংক্ষিপ্ত কিরাআতে অতঃপর অবিশিষ্ট রাকআত-গুলোতে কিরাআতও দীর্ঘ এবং রুকূ-সিজদাও দীর্ঘ করা হত। মাঝে মাঝে খুব বেশি দীর্ঘ করা হত এবং মাঝে মাঝে কম। (এ হচ্ছে ঐসব হাদীসের সংক্ষিপ্ত সার, যেগুলো তফসীর মাযহারীতে উদ্ধৃত করা হয়েছে।)

'মকামে মাহমুদ' ঃ আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মকামে মাহমুদের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। এই মকাম রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট--- অন্য কোন পয়গম্বরের জন্য নয়। এর তফসীর প্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সহীহ্ হাদীসসমূহে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ হচ্ছে শাফাআতে কুবরার মকাম। হাশরের ময়দানে যখন সমগ্র মানব জাতি একত্রিত হবে এবং প্রত্যেক পয়গম্বরের সমীপে শাফাআতের দরখাস্ত করবে, তখন সব পয়গম্বরই ওযর পেশ করবেন। একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সা)-ই এই মহান সম্মান লাভ করবেন এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য শাফাআত করবেন। এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর ও তফসীর মাযহারীতে লিখিত রেওয়ায়েত সমূহের বিবরণ নাতিদীর্ঘ।

পয়গম্বর ও সৎলোকদের শাফাআত গ্রহণীয় হবে ঃ ইসলামী উপদল সমূহের মধ্যে খারেজী ও মুতাযিলা সম্প্রদায় পয়গম্বরদের শাফাআত স্বীকার করে না। তারা বলে ঃ কবিরা গোনাহ্ কারও শাফাআত দ্বারা মাফ হবে না। কিন্তু মুতাওয়াতির হাদীসসমূহ সাক্ষ্য দেয় যে, পয়গম্বরগণের এমন কি, সৎলোকদেরও শাফাআত গোনাহ্গারদের পক্ষে কবূল করা হবে। অনেক মানুষের গোনাহ্ শাফাআতের ফলে মাফ হয়ে যাবে।

ইবনে মাজা ও বায়হাকীতে হযরত উসমান (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম পয়গম্বরগণ গোনাহ্গারদের জন্য শাফায়াত করবেন, এরপর আলিমগণ, এরপর শহীদগণ শাফাআত করবেন। দায়লমী হযরত ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "আলিমকে বলা হবে, আপিনি স্বীয় শিষ্যদের জন্য শাফায়াত করতে পারেন, যদিও তাদের সংখ্যা আকাশের তারকাসমূহের সমান।"

আবূ দাউদ ও ইবনে হাইয়ান আবূদ্দারদার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, শহীদের শাফাআত তার পরিবারের সত্তুর জনের জন্য কবূল করা হবে।

হযরত আবূ উমামার রেওয়ায়েতে বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আমার উম্মতের এক ব্যক্তির শাফায়াতের ফলে রবিয়া ও মুযার গোত্রের সমগ্র জনগোষ্ঠীর চাইতে বেশী লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে।---(মসনদে আহমদ, তাবারানী, বায়হাকী)।

একটি প্রশ্ন ও উত্তর : এখানে প্রশ্ন হয় যে, যখন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) শাফাআত করবেন এবং তাঁর শাফাআতের ফলে কোন ঈমানদার দোযখে থাকবে না, তখন আলিম ও সৎলোকদের শাফাআত কেন এবং কিভাবে হবে? তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে, সম্ভবত আলিম ও সৎলোকদের মধ্যে যারা শাফাআত করতে চাইবেন, তারা নিজ নিজ শাফাআত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে পেশ করবেন। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র দরবারে শাফাআত করবেন।

ফায়দা : এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : شفاعتى لاهل الكبائر من امتى অর্থাৎ আমার শাফাআত তাদের জন্য হবে, আমার উম্মতের মধ্যে থেকে যারা কবীরা গোনাহ্ করেছিল। এ থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বিশেষভাবে কবিরা গোনাহ্গারদের জন্য শাফাআত করবেন। কোন ফেরেশতা অথবা উম্মতের কোন ব্যক্তি তাদের জন্য শাফাআত করতে পারবে না। বরং উম্মতের সৎকর্মশীলদের শাফাআত সগীরা গোনাহ্গারদের জন্য হবে।

শাফাআতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদের নামাযের বিশেষ প্রভাব আছে : হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র) বলেন : এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রথমে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; অতঃপর মকামে মাহমুদ অর্থাৎ শাফাআতে কুবরার ওয়াদা করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, শাফাআতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদের নামাযের বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান।

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ— পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথমে মক্কার কাফিরদের উৎপীড়ন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দেওয়ার অপকৌশলের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এর সাথে একথাও বলা হয়েছিল যে, তাদের এসব অপকৌশল সফল হবে না। তাদের মুকাবিলায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আসল তদবীরের পর্যায়ে শুধু পাঞ্জেগানা নামায কায়েম করা ও তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর পরকালে তাঁকে সব পয়গম্বরের তুলনায় উচ্চ মকাম অর্থাৎ 'মকামে মাহমুদ' দান করার ওয়াদা করা হয়েছে; এ ওয়াদা পরকালে পূর্ণ হবে। আলোচ্য وَقُلْ رَّبِّ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইহকালেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কাফিরদের দুরভিসন্ধি ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তি দেওয়ার কৌশল মদীনায় হিজরতের আকারে ব্যক্ত করেছেন, অতঃপর وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ— আয়াতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ দান করেছেন।

তিরমিযীর রিওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় ছিলেন, অতঃপর তাঁকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ —এখানে

مُدْخَلْ ও مُخْرَجْ -এর অর্থ, প্রকাশ করার স্থান ও বহির্গমনের স্থান। উভয়ের সাথে صِدْقٍ বিশেষণ যুক্ত হওয়ার অর্থ এই যে, এই প্রবেশ ও বহির্গমন সব আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী উত্তম পন্থায় হোক। কেননা, আরবী ভাষায় صِدْقٍ এমন কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা বাহ্যত ও অন্তরগত উভয় দিক দিয়ে সঠিক ও উত্তম হবে। কোরআন পাকে قَدَمَ صِدْقٍ لِسَانَ صِدْقٍ ও مَقْعَدَ صِدْقٍ শব্দগুলো এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

'প্রবেশ করার স্থান' বলে মদীনা এবং বহির্গমনের স্থান বলে মক্কা বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, হে আল্লাহ্ মদীনায় আমার প্রবেশ উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। সেখানে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে এবং মক্কা থেকে আমার বের হওয়া উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। মাতৃভূমি এবং বাড়ী-ঘরের মহব্বতে অন্তর যেন জড়িয়ে না পড়ে। এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে আরও বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু এই তফসীরটি হযরত হাসান বসরী ও কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত রয়েছে। ইবনে কাসীর একে সর্বাধিক বিশুদ্ধ তফসীর আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে জরীরও এ তফসীরই গ্রহণ করেছেন। তবে এখানে প্রথমে বহির্গমনের স্থান ও পরে প্রবেশ করার স্থান উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল। এই ক্রম উল্টিয়ে দেয়ার মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, মক্কা থেকে বের হওয়া স্বয়ং কোন লক্ষ্য ছিল না; বরং বায়তুল্লাহকে ত্যাগ করে যাওয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয় ছিল। অবশ্য ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য শান্তির আবাসস্থল খোঁজ করা ছিল এখানে লক্ষ্য। মদীনা প্রবেশের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার আশা ছিল। তাই লক্ষ্যবস্তুকেই অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের জন্য মকবুল দোয়া ঃ হিজরতের সময় আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ দোয়াটি শিক্ষা দেন যে, মক্কা থেকে বহির্গমন এবং মদীনায় পৌছা উভয়টি উত্তমভাবে ও নিরাপদে সম্পন্ন হোক। এ দোয়ার ফলেই হিজরতের সময় পশ্চাদ্ধাবনকারী কাফিরদের কবল থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে প্রতি পদক্ষেপে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং মদীনাকে বাহ্যত ও অন্তরগত উভয় দিক দিয়েই তাঁর জন্য ও মুসলমানদের জন্য উপযোগী করেছেন। এ কারণেই কোন আলিম বলেন ঃ এই দোয়াটি লক্ষ্য অর্জনের শুরুতে প্রত্যেক মুসলমানদের মনে রাখা উচিত। প্রত্যেক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে দোয়াটি উপকারী। পরবর্তী বাক্য وَاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا এ

দোয়ারই পরিশিষ্ট। হযরত কাতাদাহ্ বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সা) জানতেন যে, শত্রুদের চক্রান্ত-জালের মধ্যে অবস্থান করে রিসালতের কর্তব্য পালন সাধ্যাতীত ব্যাপার। তাই তিনি আল্লাহ্র দরবারে বিজয় ও সাহায্যের দোয়া করেন, যা কবুল হয় এবং এর শুভফল সবার দৃষ্টিগোচর হয়।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ —এ আয়াতটি হিজরতের পর মক্কা বিজয় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন বায়তুল্লাহ্র চতুষ্পার্শ্বে তিন শ' ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। এই বিশেষ সংখ্যার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কোন কোন আলিম বলেন : বছরের প্রত্যেক দিনের জন্য মুশরিকদের আলাদা আলাদা মূর্তি ছিল এবং তারা প্রত্যহ নির্ধারিত মূর্তিরই উপাসনা করত। (কুরতুবী) রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সেখানে পৌঁছেন, তখন তাঁর মুখে এ আয়াতটি উচ্চারিত হচ্ছিল : جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ এবং তিনি স্বীয় ছড়ি দ্বারা প্রত্যেক মূর্তির বক্ষে আঘাত করে যাচ্ছিলেন। (বুখারী, মুসলিম)

কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে, ঐ ছড়ির নিচ দিকে রাংতা অথবা লোহার রজত ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কোন মূর্তির বুকে আঘাত করতেন, তখন তা উল্টে পড়ে যেত। এভাবে সব মূর্তিই ভূমিসাৎ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সেগুলো ভেঙ্গে চুরমার করার আদেশ দেন।—(কুরতুবী)

শিরক ও কুফরের চিহ্ন মিটিয়ে দেওয়া ওয়াজিব : ইমাম কুরতুবী বলেন : এ আয়াতে প্রমাণ রয়েছে যে, মুশরিকদের মূর্তি ও অন্যান্য মুশরিকসুলভ চিহ্ন মিটিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। যেসব হাতিয়ার যন্ত্রপাতি গোনাহ্র কাজে ব্যবহৃত হয়, সেগুলো মিটিয়ে দেওয়াও এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে মুনযির বলেন : কাঠ, পিতল ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পও মূর্তির অন্তর্ভুক্ত। রসূলুল্লাহ্ (সা) রঙবেরঙের চিত্র অংকিত পর্দা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। এ থেকে সাধারণ চিত্রের বিধান জানা যায়। হযরত ঈসা (আ) যখন শেষ যমানায় আগমন করবেন, তখন সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী খৃস্টানদের ক্রুশ ভেঙ্গে দেবেন এবং শূকর হত্যা করবেন। শিরক, কুফর ও বাতিলের আসবাবপত্র ভেঙ্গে দেওয়া যে ওয়াজিব, এসব বিষয় তারই প্রমাণ।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ —কোরআন পাক যে অন্তরের ঔষধ এবং শিরক, কুফর, কুচরিত্র ও আত্মিক রোগসমূহ থেকে মনের মুক্তিদাতা, এটা সর্বজন স্বীকৃত সত্য। কোন কোন আলিমের মতে কোরআন যেমন আত্মিক রোগসমূহের ঔষধ,

তেমনি বাহ্যিক রোগসমূহের অমোঘ ব্যবস্থাপত্র। কোরআনের আয়াত পাঠ করে রোগীর গায়ে ফুঁ দেওয়া এবং তাবিজ লিখে গলায় ঝুলানো বাহ্যিক রোগ নিরাময়ের কারণ হয়ে থাকে। হাদীসের অনেক রেওয়ায়েত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আবূ সাঈদ খুদরীর এই হাদীস সব গ্রন্থেই বিদ্যমান দেখা যায় যে, সাহাবীদের একটি দল একবার সফররত ছিলেন। কোন এক গ্রামের জনৈক এক সরদারকে বিচ্ছু দংশন করলে লোকেরা সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করল : আপনারা এই রোগীর চিকিৎসা করতে পারেন কি? সাহাবীরা সাতবার সূরা ফাতিহা পাঠ করে রোগীর গায়ে ফুঁ দিলে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি এ কার্যক্রমকে জায়েয বলে মত প্রকাশ করেন।

এমনিভাবে আরও অনেক হাদীস থেকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র 'কুল আউযু' শীর্ষক সূরা সমূহ পাঠ করে ফুঁ দেওয়ার প্রমাণ পওয়া যায়। সাহাবী ও তাবেয়ীগণও কোরআনের আয়াত দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করেছেন বলে প্রমাণিত আছে। এ আয়াতের অধীনে কুরতুবী এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا —এ থেকে জানা যায় যে, বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে কোরআন পাঠ করলে যেমন কোরআন রোগের চিকিৎসা হয়ে থাকে তেমনি অবিশ্বাস এবং কোরআনের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন ক্ষতি ও বিপদাপদের কারণও হয়ে থাকে।

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ۝ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۝

(৮৩) আমি মানুষকে নিয়ামত দান করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অহংকারে দূরে সরে যায়; যখন তাকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। (৮৪) বলুন : প্রত্যেকেই নিজ রীতি অনুযায়ী কাজ করে। অতঃপর আপনার পালনকর্তা বিশেষরূপে জানেন, কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল পথে আছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (কতক) মানুষ (অর্থাৎ কাফির এমন যে, তাদের)-কে যখন আমি নিয়ামত দান করি, তখন (আমার দিক থেকে এবং আমার নির্দেশাবলীর দিক থেকে তারা) মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পাশ কেটে যায় এবং যখন তাদেরকে কোন কষ্ট স্পর্শ করে, তখন (রহমত থেকে সম্পূর্ণ) নিরাশ হয়ে যায়। (উভয় অবস্থা আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীনতার

প্রমাণ। এটাই কুফর ও পথভ্রষ্টতার ভিত্তি।) আপনি বলে দিন : (মু'মিন কাফির, সৎ লোক ও অসৎ লোকদের মধ্য থেকে) প্রত্যেকেই নিজ রীতি অনুযায়ী কাজ করছে (অর্থাৎ নিজ নিজ বিশুদ্ধ বিবেক-বুদ্ধি অবলম্বন করছে এবং জ্ঞান অথবা মূর্খতার ভিত্তিতে বিভিন্ন রকম কাজ করছে।) অতএব, আপনার পালনকর্তা বিশেষভাবে জানেন, কে অধিক সঠিক পথে আছে। (এমনিভাবে যে সঠিক পথে নয়, তাকেও জানেন। তিনি প্রত্যেককে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান অথবা শাস্তি দেবেন। এরূপ নয় যে, যার মনে চাইবে কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে নিজেকে সঠিক পথের অনুসারী মনে করে নেবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ—এখানে شَاكِلَتِهٖ শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে স্বভাব, অভ্যাস, প্রকৃতি, নিয়ত, রীতি ইত্যাদি বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। সবগুলোর সারমর্ম, পরিবেশ। অভ্যাস এবং প্রথা ও প্রচলনের দিক দিয়ে প্রত্যেক মানুষের একটি অভ্যাস ও মানসিকতা গড়ে উঠে। এই অভ্যাস ও মানসিকতা অনুযায়ী তার কাজকর্ম হয়ে থাকে। —(কুরতুবী) এতে মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, মন্দ পরিবেশ, মন্দ সংসর্গ ও মন্দ অভ্যাস থেকে বিরত থাকা দরকার এবং সৎ লোকদের সংসর্গ ও সৎ অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। (জাসসাস) কেননা, পরিবেশ সংসর্গ এবং প্রথা ও প্রচলিত রীতি দ্বারা মানুষের যে স্বভাব গড়ে উঠে, তার প্রত্যেক কাজ তদনুযায়ীই হয়ে থাকে। ইমাম জাসসাস এস্থলে شَاكِلَة-এর এক অর্থ, সমভাবাপন্নও উল্লেখ করেছেন। এদিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমভাবাপন্ন ব্যক্তির সাথে অন্তরঙ্গ হয়। সাধু সাধুর সাথে এবং দুষ্ট দুষ্টের সাথে অন্তরঙ্গ হয় এবং তারই কর্মপন্থা অনুসরণ করে, আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত উক্তি এর নজীর :

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ—অর্থাৎ ভ্রষ্টা নারী ভ্রষ্টা পুরুষদের জন্য এবং পবিত্রা নারী পবিত্র পুরুষদের জন্য। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ পুরুষ ও নারীর সাথে অন্তরঙ্গ হয়। এর সারমর্মও এই যে, খারাপ সংসর্গ ও খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত থাকার প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ۭ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ
الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ وَلَىِٕنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا
تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ۝ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۭ اِنَّ فَضْلَهٗ
كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ۝ قُلْ لَّىِٕنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ

يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
ظَهِيْرًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؗ
فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ۝

(৮৫) তারা আপনাকে 'রূহ্' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিনঃ রূহ্ আমার পালনকর্তার আদেশঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে আপনার কাছে ওহীর মাধ্যমে যা প্রেরণ করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারিতাম। অতঃপর আপনি নিজের জন্য তা আনয়নের ব্যাপারে আমার মুকাবিলায় কোন দায়িত্ব বহনকারী পাবেন না। (৮৭) এ প্রত্যাহার না করা আপনার পালনকর্তার মেহেরবানি। নিশ্চয় আপনার প্রতি তাঁর করুণা বিরাট। (৮৮) বলুনঃ যদি মানব ও জিন এই কোরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্য জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না। (৮৯) আমি এই কোরআনে মানুষকে বিভিন্ন উপকার দ্বারা সব রকম বিষয়বস্তু বুঝিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকার না করে থাকেনি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং তারা আপনাকে (পরীক্ষার্থে) রূহ্ সম্পর্কে (অর্থাৎ রূহের স্বরূপ সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করে। আপনি (উত্তরে) বলে দিনঃ রূহ্ (সম্পর্কে এতটুকু বুঝে নাও যে, সেটা এমন এক বস্তু, যা) আমার পালনকর্তার আদেশ দ্বারা গঠিত এবং (এর বিস্তারিত স্বরূপ সম্পর্কে) তোমাদেরকে খুব কম জ্ঞান (তোমাদের বোধশক্তি ও প্রয়োজন পরিমাণে) দান করা হয়েছে। (রূহের স্বরূপ জানা আবশ্যকীয় বিষয় নয় এবং এর স্বরূপ সাধারণভাবে হৃদয়ঙ্গমও হতে পারে না। তাই কোরআন এর স্বরূপ বর্ণনা করে না।) যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে আপনার কাছে যে পরিমাণ ওহী প্রেরণ করেছি (এবং এর মাধ্যমে আপনাকে জ্ঞান দান করেছি) সব উঠিয়ে নিতে পারি। অতঃপর আপনি তার (এই ওহী ফিরিয়ে আনার) জন্য আমার মুকাবিলায় কোন সমর্থকও পাবেন না; কিন্তু (এটা) আপনার পালনকর্তারই দয়া (যে, এরূপ করেননি)। নিশ্চয় আপনার প্রতি তাঁর বড় করুণা। (উদ্দেশ্য এই যে, রূহ্ ইত্যাদির প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান হওয়া দূরের কথা, মানুষকে ওহীর মাধ্যমে যে যৎ-সামান্য জ্ঞান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে, তাও তার কোন জায়গির নয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে দেয়ার পরও ছিনিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু তিনি রহমতবশত এরূপ করেন না। কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ্র বড় করুণা।) আপনি বলে দিনঃ যদি সমস্ত মানব ও জিন এই কোরআনের অনুরূপ কালাম রচনা করে আনার

জন্য জড়ো হয়, তবুও তারা তা করতে পারবে না, যদিও একে অপরের সাহায্যকারীও হয়ে যায়। (অর্থাৎ তাদের মধ্যে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা চেষ্টা করে সফল হওয়া দূরের কথা, সবাই একে অপরের সাহায্য করেও কোরআনের অনুরূপ রচনা করতে পারবে না।) আমি লোকদের (কে বোঝাবার) জন্য কোরআনে সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু নানাভাবে বর্ণনা করেছি। তবুও অধিকাংশ লোক অস্বীকার না করে থাকেনি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রথম আয়াতে রূহ্ সম্পর্কে কাফিরদের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এর জওয়াব উল্লিখিত হয়েছে। রূহ্ শব্দটি অভিধান, বাকপদ্ধতি এবং কোরআন পাকে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ তাই যা এ শব্দ থেকে সাধারণভাবে বোঝা যায়; অর্থাৎ প্রাণ, যার বদৌলতে জীবন কায়েম রয়েছে। কোরআন পাকে এ শব্দটি জিবরাঈলের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে; যেমন نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ —এবং হযরত ঈসা (আ)-এর জন্যও কয়েক আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। এমন কি, স্বয়ং কোরআন ও ওহীকেও রূহ্ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে; যেমন أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا

রূহ্ বলে কি বোঝানো হয়েছে: এ বিষয়ই এখানে প্রথম প্রণিধানযোগ্য যে, প্রশ্নকারীরা কোন্ অর্থের দিক দিয়ে রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল? কোন কোন তফসীরবিদ বর্ণনার পূর্বাপর ধারার প্রতি লক্ষ্য করে প্রশ্নটি ওহী, কোরআন অথবা ওহী বাহক ফেরেশতা জিবরাঈল সম্পর্কে সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, এর পূর্বেও نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ এ কোরআনের উল্লেখ ছিল এবং পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আবার কোরআনের উল্লেখ রয়েছে। এর সাথে মিল রেখে তারা বুঝেছেন যে, এ প্রশ্নেও রূহ্ বলে ওহী, কোরআন অথবা জিবরাঈলকেই বোঝানো হয়েছে। প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই যে, আপনার প্রতি ওহী কিভাবে আসে? কে আনে? কোরআন পাক এর উত্তরে শুধু এতটুকু বলেছে যে, আল্লাহ্র নির্দেশে ওহী আসে। ওহীর পূর্ণ বিবরণ ও অবস্থা বলা হয়নি।

কিন্তু যেসব সহীহ্ হাদীসে এ আয়াতের শানে-নুযূল বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোতে প্রায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে যে, প্রশ্নকারীরা জৈব রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল এবং রূহের স্বরূপ অবগত হওয়াই প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ রূহ্ কি? মানবদেহে রূহ্ কিভাবে আগমন করে? কিভাবে এর দ্বারা জীবজন্তু ও মানুষ জীবিত হয়ে যায়? সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন: আমি একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মদীনার জনবসতিহীন এলাকায় পথ অতিক্রম করেছিলাম। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে খর্জুর ডালের একটি ছড়ি ছিল। তিনি কয়েকজন

ইহুদীর কাছ দিয়ে গমন করছিলেন তারা পরস্পরে বলাবলি করছিল : মুহাম্মদ (সা) আগমন করছেন। তাঁকে রূহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। অপর কয়েকজনে নিষেধ করল। কিন্তু কয়েকজন ইহুদী প্রশ্ন করেই বসল। প্রশ্ন শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা) ছড়িতে ভর দিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি অনুমান করলাম যে, তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হবে। কিছুক্ষণ পর ওহী নাযিল হলে তিনি এ আয়াত পাঠ করে শোনালেন : وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ বলা বাহুল্য কোরআন অথবা ওহীকে রূহ্ বলা কোরআনের একটি বিশেষ পরিভাষা ছিল। এখানে তাদের প্রশ্নকে এ অর্থে নেওয়া খুবই অবান্তর। তবে জৈব ও মানবীয় রূহের ব্যাপারটি এমন যে, এর প্রশ্ন প্রত্যেকের মনেই সৃষ্ট হয়ে থাকে। এজন্যই ইবনে কাসীর, ইবনে জারীর, কুরতুবী, বাহ্‌রে মুহীত, রূহুল মাআনী প্রমুখ সাধারণ তফসীরবিদরাই সাব্যস্ত করেছেন যে, জৈব রূহের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। বর্ণনার পূর্বাপর ধারায় কোরআনের আলোচনা এবং মাঝখানে রূহের প্রশ্নোত্তর বেখাপ্পা বলে প্রশ্ন করা হলে এর উত্তর এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফির ও মুশরিকদের বিরোধিতা এবং হঠকারিতাপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনা এসেছে, যার উদ্দেশ্য ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালত পরীক্ষা করা। এ প্রশ্নটিও তারই একটি অংশ; কাজেই বেখাপ্পা নয়। বিশেষ করে শানে নুযূল সম্পর্কে অপর একটি সহীহ্ হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে যে, প্রশ্নকারীদের উদ্দেশ্য ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালত পরীক্ষা করা।

মসনদ আহমদের রিওয়ায়েত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন : কোরাইশরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সঙ্গত অসঙ্গত প্রশ্ন করতো। একবার তারা মনে করল যে, ইহুদীরা বিদ্বান লোক। তারা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেরও জ্ঞান রাখে। কাজেই তাদের কাছ থেকে কিছু প্রশ্ন করা দরকার, যেগুলো দ্বারা মুহাম্মদের পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। তদনুসারে কোরাইশরা কয়েকজন লোক ইহুদীদের কাছে প্রেরণ করল। তারা শিখিয়ে দিল যে, তোমরা তাঁকে রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন কর। (ইবনে কাসীর) হযরত ইবনে (আব্বাস) (রা) থেকেই এক আয়াতের তফসীরে বর্ণিত রয়েছে যে, ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যে প্রশ্ন করেছিল, তাতে এ কথাও ছিল যে রূহ্‌কে কিভাবে আযাব দেওয়া হয়। তখন পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোন আয়াত নাযিল হয়নি বিধায় রসূলুল্লাহ্ (সা) তাৎক্ষণিক উত্তরদানে বিরত থাকেন। এরপর ফেরেশতা জিবরাঈল قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ আয়াত নিয়ে অবতরণ করেন।—(ইবনে কাসীর)

প্রশ্ন মক্কায় করা হয়েছিল, না মদীনায় : শানে নুযূল সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাসের যে দু'টি হাদীস উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে ইবনে মাসউদের হাদীস অনুযায়ী প্রশ্নটি মদীনায় করা হয়েছিল। এ কারণেই কোন কোন তসীরবিদ আয়াতটিকে 'মদনী' সাব্যস্ত করেছেন যদিও সূরা বনী ইসরাঈলের অধিকাংশই মক্কী।

পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত অনুসারে প্রশ্নটি মক্কায় করা হয়েছিল। এদিক দিয়ে গোটা সূরার ন্যায় এ আয়াতটিও মক্কী। এ কারণেই ইবনে কাসীর এ সম্ভাবনা-কেই অগ্রাধিকার দিয়ে ইবনে মাসউদের হাদীসের উত্তরে বলেছেন যে, সম্ভবত এ আয়াতটি মদীনায় পুনর্বার নাযিল হয়েছে; যেমন কোরআনের অনেক আয়াতের পুনর্বার অবতরণ সবার কাছেই স্বীকৃত। তফসীর মাযহারী ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রশ্ন মদীনার এবং আয়াতকে মদনী সাব্যস্ত করেছে। তফসীর মাযহারী এর দু'টি কারণ উল্লেখ করেছে। এক, এ রেওয়ায়েতটি বুখারী ও মুসলিমে বর্তমান। এর সনদ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতের সনদের চাইতে শক্তিশালী। দুই, এতে বর্ণনাকারী ইবনে মাসউদ স্বয়ং নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত থেকে বাহ্যত এটাই বোঝা যায় যে, তিনি বিষয়টি কারও কাছে শুনেছেন।

উল্লিখিত প্রশ্নের জওয়াব ঃ প্রশ্নের উত্তরে কুরআন বলেছে ঃ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي এই জওয়াবের ব্যাখ্যায় তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। তন্মধ্যে কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথীর উক্তিটিই সর্বাধিক বোধগম্য ও স্পষ্ট। তা এই যে, এ জওয়াবে যতটুকু বিষয় বলা জরুরী ছিল এবং যতটুকু বিষয় সাধারণ লোকের বোধগম্য ছিল, ততটুকুই বলে দেওয়া হয়েছে। রূহের সম্পূর্ণ স্বরূপ সম্পর্কে যে প্রশ্ন ছিল জবাবে তা বলা হয়নি। কারণ, তা বোঝা সাধারণ লোকের সাধ্যাতীত ব্যাপার ছিল এবং তাদের কোন প্রয়োজন এটা বোঝার উপর নির্ভরশীলও ছিল না। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে উত্তরে বলে দিন ঃ রূহ্ আমার পালনকর্তার আদেশের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ রূহ্ সাধারণ সৃষ্টজীবের মতো উপাদানের সমন্বয়ে এবং জন্ম ও বংশ বিস্তারের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেনি; বরং তা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ كُنْ (হও) দ্বারা সৃজিত। এই জওয়াব একথা ফুটিয়ে তুলেছে যে, রূহ্কে সাধারণ বস্তুনিচয়ের মাপকাঠিতে পরখ করা যায় না। ফলে রূহ্কে সাধারণ বস্তুনিচয়ের মাপকাঠিতে পরখ করার ফলশ্রুতিতে যেসব সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সেগুলো দূর হয়ে গেল। রূহ্ সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান মানুষের জন্য যথেষ্ট। এর বেশি জ্ঞানের উপর তার কোন ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন আটকা নয়। তাই প্রশ্নের সেই অংশটিকে অনর্থক ও বাজে সাব্যস্ত করে জওয়াব দেওয়া হয়নি; বিশেষত যে ক্ষেত্রে এর স্বরূপ বোঝা সাধারণ লোকের তো কথাই নেই, বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতের পক্ষেও সহজ নয়।

প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া জরুরী নয়, প্রশ্নকারীর ধর্মীয় উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য ঃ ইমাম জাসসাস এই জওয়াব থেকে এ মাস'আলা বের করেছেন যে, প্রশ্নকারীর প্রত্যেক প্রশ্ন এবং তার দিকের জওয়াব দেওয়া মুফতী ও আলিমের দায়িত্বে জরুরী নয়, বরং তার ধর্মীয় উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে জওয়াব দেওয়া উচিত। যে জওয়াব প্রতিপক্ষের বোধশক্তির অতীত অথবা যে জওয়াবে প্রতিপক্ষের ভুল বোঝা-

বুঝিতে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে, সেই জওয়াব না দেওয়া উচিত। এমনিভাবে অনাবশ্যক ও বাজে প্রশ্নাদিরও জওয়াব দেওয়া উচিত নয়। তবে উপস্থিত ঘটনা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির যদি কোন আমল করা জরুরী হয়ে পড়ে এবং সে নিজে আলিম না হয়, তবে মুফতী ও আলিমের পক্ষে নিজ জ্ঞান অনুযায়ী এর জওয়াব দেওয়া জরুরী। (জাসসাস) ইমাম বুখারী 'ইল্‌ম' অধ্যায়ে এই মাস'আলার একটি স্বতন্ত্র শিরোনাম যুক্ত করে বলেছেন যে, যে প্রশ্নের জওয়াব দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে সেই প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া অনুচিত।

রূহের স্বরূপ সম্পর্ক কেউ জ্ঞান লাভ করতে পারে কি না? কোরআন পাক এ প্রশ্নের জওয়াব শ্রোতাদের প্রয়োজন ও বোধশক্তির অনুরূপ দান করেছে—রূহের স্বরূপ বর্ণনা করেনি। কিন্তু এতে জরুরী হয় না যে, রূহের স্বরূপ কোন মানুষ বুঝতেই পারে না স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) ও এরূপ জানতেন না। সত্য এই যে, আলোচ্য আয়াতটি এর পক্ষেও নয় এবং বিপক্ষেও নয়। যদি কোন রসূল ওহীর মাধ্যমে এবং কোন ওলী কাশফ ও ইল-হামের মাধ্যমে এর রূপ জেনে নেয়, তবে তা আয়াতের পরিপন্থী নয়। বরং যুক্তি দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিতেও এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তাকে অনর্থক ও বাজে বলা গেলেও অবৈধ বলা যায় না। এ জন্যই অনেক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিম রূহ্ সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। শেষ যুগে আমার উস্তাদ শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ) একখানি পুস্তিকায় এ প্রশ্নের উপর চমৎকার আলোকপাত করে-ছেন এবং রূহের স্বরূপ সাধারণ মানুষের পক্ষে যতটুকু বোঝা সম্ভব, ততটুকু বুঝিয়ে দিয়েছেন। একজন শিক্ষিত লোক এতে সন্তুষ্ট হতে পারে এবং সন্দেহ ও জটিলতা থেকে বাঁচতে পারে।

ফায়দা ঃ ইমাম বগভী এস্থলে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। রেওয়ায়েতটি এই ঃ এই আয়াত মক্কায় অব-তীর্ণ হয়। একবার মক্কায় কোরায়েশ সরদাররা একত্রিত হয়ে পরামর্শ করল যে, মুহাম্মদ (সা) আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততায় কেউ কোনদিন সন্দেহ করেনি। তিনি কোনদিন মিথ্যা বলেছেন বলেও কেউ অপবাদ আরোপ করেনি। এতদসত্ত্বেও তাঁর নবুয়তের দাবি আমাদের বোধগম্য নয়। তাই একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় ইহুদী আলিমদের কাছে প্রেরণ করে তার ব্যাপারে অনুসন্ধান করা দরকার। তদনুসারে তাদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনার ইহুদী আলিম-দের কাছে পৌঁছল। ইহুদী আলিমরা তাদেরকে পরামর্শ দিল যে, আমরা তোমাদেরকে তিনটি বিষয় বলে দিচ্ছি। তোমরা এগুলো সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করবে। যদি তিনি তিনটি প্রশ্নেরই উত্তর না দেন, তবে তিনি নবী নন। এমনিভাবে যদি একটি প্রশ্নেরও উত্তর না দেন, তবুও নবী নন। পক্ষান্তরে যদি দুটি প্রশ্নের উত্তর দেন এবং তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর না দেন, তবে বুঝে নেবে যে, তিনি নবী। প্রশ্ন তিনটি ছিল এই ঃ এক, তাঁকে ঐ লোকদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, যারা প্রাচীনকালে শিরক থেকে আত্মরক্ষার জন্য কোন গর্তে আত্মগোপন করেছিলেন। তাদের ঘটনা খুবই বিস্ময়কর। দুই ঐ ব্যক্তির অবস্থা

জিজ্ঞেস কর, যিনি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম সফর করেছিলেন। তার ঘটনা কি? তিন, রূহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর।

প্রতিনিধি দলটি ফিরে এসে তিনটি প্রশ্নই রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে পেশ করে দিল। তিনি বললেন: আগামীকাল এর উত্তর দেব। কিন্তু তিনি 'ইনশাল্লাহ্' না বলায় এর ফলশ্রুতিতে কয়েকদিন পর্যন্ত ওহীর আগমন বন্ধ রইল। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এই বিরতিকাল বার থেকে শুরু করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বর্ণিত রয়েছে। কোরাইশরা বিদ্রূপ ও দোষারোপের সুযোগ পেয়ে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও উদ্বিগ্ন হলেন। এরপর হযরত জিবরাঈল এই আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন:

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ —এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতে কোন কাজের ওয়াদা করা হলে 'ইনশাল্লাহ্' বলে করতে হবে। এরপর রূহ্ সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। গর্তে আত্মগোপনকারীদের সম্পর্কে আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা এবং পূর্ব পশ্চিমে সফরকারী যুলকারনাইনের ঘটনা সম্পর্কেও আয়াত নাযিল হয়। পরবর্তী সূরা কাহ্ফে তা বর্ণিত হবে। ঐ সূরায় আসহাবে কাহ্ফ ও যুলকারনাইনের ঘটনা উত্তরে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে রূহের স্বরূপ সম্পর্কে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার জওয়াব দেওয়া হয়নি। (ফলে নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে ইহুদীদের বর্ণিত আলামত সত্যে পরিণত হয়।) তিরমিযীও এ রেওয়ায়েতটি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছে। (মাযহারী)

সূরা হিজরের ২৯ আয়াত وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ এর অধীনে রূহ্ নফস ইত্যাদির স্বরূপ সম্পর্কে তফসীর মাযহারীর বরাত দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাতে রূহের প্রকারভেদ ও প্রত্যেক প্রকারের স্বরূপ যথেষ্ট পরিমাণে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ —পূর্ববর্তী আয়াতে রূহ্ সম্পর্কিত প্রশ্নের প্রয়োজন পরিমাণে উত্তর দিয়ে রূহের স্বরূপ আবিষ্কারের প্রয়াস থেকে একথা বলে নিবৃত্ত করা হয়েছিল যে, মানুষের জ্ঞান যত বেশিই হোক না কেন, বস্তুনিচয়ের সর্বব্যাপী স্বরূপের দিক দিয়ে তা অল্পই। তাই অনাবশ্যক আলোচনা ও খোঁজাখুঁজিতে লিপ্ত হওয়া মূল্যবান সময় নষ্ট করারই নামান্তর। وَلَئِنْ شِئْنَا আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে যতটুকুই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাও তার ব্যক্তিগত জায়গির নয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাও ছিনিয়ে নিতে পারেন। কাজেই বর্তমান জ্ঞানের জন্য তার কৃতজ্ঞ থাকা এবং অনর্থক ও বাজে গবেষণায় সময় নষ্ট না করা উচিত, বিশেষত যখন উদ্দেশ্য গবেষণা করা নয়, বরং অপরকে পরীক্ষা করা ও লজ্জিত করাই উদ্দেশ্য

হয়। মানুষ যদি এরূপ করে, তবে এই বক্রতার পরিণতিতে তার অর্জিত জ্ঞানটুকু বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। এ আয়াতে যদিও রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে উম্মতকে শোনানোই উদ্দেশ্য; অর্থাৎ রসূলের জ্ঞানও যখন তার ক্ষমতাধীন নয়, তখন অন্যের তো প্রশ্নই উঠে না।

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ — এ বিষয়বস্তুটি কোরআন পাকের কয়েকটি আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে। এতে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে সম্বোধন করে দাবি করা হয়েছে যে, যদি তোমরা কোরআনকে আল্লাহ্র কালাম স্বীকার না কর; বরং কোন মানব রচিত কালাম মনে কর, তবে তোমরা তো মানব, এর সমতুল্য কালাম রচনা করে তোমরা দেখিয়ে দাও। আয়াতে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, শুধু মানবই নয়, জিনদেরকেও সাথে মিলিয়ে নাও। অতঃপর সবাই মিলে কোরআনের একটি সূরা বরং একটি আয়াতের অনুরূপও রচনা করতে সক্ষম হবে না।

এ বিষয়বস্তুর এখানে পুনরাবৃত্তি সম্ভবত একারণে যে, তোমরা আমার রসূলকে নবুয়ত ও রিসালত পরীক্ষা করার জন্য রূহ্ ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন তাঁর প্রতি করে থাক। তোমরা কেন এসব অনর্থক কাজে ব্যাপৃত রয়েছ? স্বয়ং কোরআনকে দেখে নিলেই তাঁর নবুয়ত ও রিসালত সম্পর্কে কোন সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ থাকবে না। কেননা, সমগ্র বিশ্বের মানব ও জিন যখন তাঁর সামান্যতম দৃষ্টান্ত রচনা করতে সক্ষম নয়, তখন এটা যে আল্লাহ্র কালাম, তাতে কি সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে? কোরআনের আল্লাহ্র কালাম হওয়া যখন এভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত ও রিসালত সম্পর্কেও কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

সর্বশেষ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا —আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদিও কোরআনের মু'জিযা এতটুকু জাজ্বল্যমান যে, এরপর কোন প্রশ্ন ও সন্দেহের অবকাশ থাকে না; কিন্তু বাস্তব হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ লোক আল্লাহ্র নিয়ামতের শোকর করে না এবং কোরআনরূপী নিয়ামতকেও মূল্য দেয় না। তাই পথভ্রষ্টতায় উদভ্রান্ত হয়ে তারা ঘোরাফেরা করে।

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ۝٩٠ اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ۝٩١ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ۝٩٢ اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ؕ وَلَنْ

تُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ۭ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٣﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَاۗءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٤﴾ قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰۗىِٕكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَىِٕنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاۗءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ﴿٩٥﴾

(৯০) এবং তারা বলে : আমরা কখনও আপনাকে বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি ভূপৃষ্ঠ থেকে আমাদের জন্য একটি ঝরণা প্রবাহিত করে দিন, (৯১) অথবা আপনার জন্য খেজুরের ও আঙুরের একটি বাগান হবে, অতঃপর আপনি তার মধ্যে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত করে দেবেন, (৯২) অথবা আপনি যেমন বলে থাকেন, তেমনি-ভাবে আমাদের ওপর আসমানকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে দেবেন অথবা আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন, (৯৩) অথবা আপনার কোন সোনার তৈরী গৃহ হবে অথবা আপনি আরোহণ করবেন এবং আমরা আপনার আকাশে আরো-হণকে কখনও বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি অবতীর্ণ করেন আমাদের প্রতি এক গ্রন্থ, যা আমরা পাঠ করব। বলুন : পবিত্র মহান আমার পালন কর্তা, একজন মানব, একজন রসূল বৈ আমি কে? (৯৪) 'আল্লাহ্ কি মানুষকে পয়গম্বর করে পাঠিয়ে-ছেন'? তাদের এই উক্তিই মানুষকে ঈমান আনয়ন থেকে বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে হিদায়ত। (৯৫) বলুন : যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করত, তবে আমি আকাশ থেকে কোন ফেরেশতাকেই তাদের নিকট পয়গম্বর করে প্রেরণ করতাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের কয়েকটি হঠকারিতাপূর্ণ প্রশ্ন ও আগাগোড়াহীন ফরমা-য়েশ এবং সেগুলোর জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে। (ইবনে জারীর)] তারা (কোরআনের অলৌকিকতার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত ও রিসালতের যথেষ্ট প্রমাণাদি পাওয়া সত্ত্বেও ঈমান আনে না এবং বাহানা করে) বলে : আমরা আপনার প্রতি কখনও বিশ্বাস স্থাপন করবো না, যে পর্যন্ত না আপনি আমাদের জন্য (মক্কার) ভূপৃষ্ঠ থেকে কোন ঝরণা প্রবাহিত করে দেন অথবা (বিশেষভাবে) আপনার জন্য খেজুর ও আঙুরের কোন বাগান হয়ে যায়, অতঃপর বাগানের মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে অনেক-গুলো নির্ঝরিণী আপনি প্রবাহিত করে দেন অথবা আপনার কথামত আপনি আস-মানকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের ওপর ফেলে দেন [যেমন এ আয়াতে বলা হয়েছে :

إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ (অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ভূগর্ভে পুতে দিতে পারি অথবা তাদের ওপর আসমান খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে দিতে পারি)] অথবা আপনি আল্লাহ্‌কে ও ফেরেশতাদেরকে (আমাদের) সামনে এনে দিন (যাতে আমরা খোলাখুলি দেখে নেই) অথবা আপনার কাছে কোন স্বর্ণনির্মিত গৃহ হবে অথবা আপনি (আমাদের সামনে) আকাশে আরোহণ করবেন এবং আমরা আপনার (আকাশে) আরোহণকে কখনও বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি (সেখান থেকে) আমাদের কাছে একটি গ্রন্থ নিয়ে আসেন, যাকে আমরা পড়েও নেব (এবং তাতে যেন আপনার আকাশে আরোহণের সত্যতা স্বীকৃতিপত্ররূপে লেখা থাকে) (এসব প্রলাপোক্তির জওয়াবে) বলে দিন ঃ পবিত্র মহান আমার পালনকর্তা, একজন প্রেরিত মানব বৈ আমি কে (যে, এসব ফরমায়েশ পূর্ণ করার সাধ্য আমার থাকবে? এ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই। মানবত্ব নিজ সত্তায় অপারগতা ও অক্ষমতার পরিচায়ক। আল্লাহ্‌র রসূল হলেও তাঁর প্রত্যেক বিষয়ের পরিপূর্ণ ক্ষমতা থাকতে পারে না। বরং রিসালতের জন্য এমন কোন প্রমাণ থাকাই যথেষ্ট, যা বুদ্ধিজীবীদের কাছে আপত্তিকর না হয়। সে প্রমাণ কোরআনের অলৌকিকতা ও অন্যান্য মু'জিযার আকারে বহুবার উপস্থিত করা হয়েছে। তাই রিসালতের জন্য এসব ফরমায়েশ সম্পূর্ণ নিরর্থক। হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলার সবকিছু করার ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু তাঁর কাছে দাবি করার অধিকার কারও নেই। তিনি কোন বিষয়কে রহস্যের উপযুক্ত দেখলে তা প্রকাশও করে দেন, কিন্তু এতে তোমাদের সব ফরমায়েশ পূর্ণ করা জরুরী নয়।) যখন তাদের কাছে হিদায়ত (অর্থাৎ রিসালতের বিশুদ্ধ প্রমাণ, যেমন কোরআনের অলৌকিকতা) এসে গেছে, তখন তাদের বিশ্বাস স্থাপনে এছাড়া কোন (ভ্রুক্ষেপযোগ্য) বাধা নেই যে, তারা (মানবত্বকে রিসালতের পরিপন্থী মনে করে) বলেছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কি মানব-কে পয়গম্বর করে প্রেরণ করেছেন? (অর্থাৎ এরূপ হতে পারে না।) আপনি (জওয়াবে আমার পক্ষ থেকে) বলে দিন ঃ যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা নিশ্চিন্তে বিচরণ করত, তবে আমি অবশ্যই তাদের প্রতি আকাশ থেকে ফেরেশতাকে রসূল করে প্রেরণ করতাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অসামঞ্জস্য প্রশ্নের পয়গম্বরসুলভ জওয়াব ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে যে সব প্রশ্ন ও ফরমায়েশ বিশ্বাস স্থাপনের শর্ত হিসাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে করা হয়েছে প্রত্যেক মানুষ এগুলোকে এক প্রকার ঠাট্টা এবং বিশ্বাস স্থাপন না করার বেহুদা বাহানা ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারে না। এ ধরনের প্রশ্নের জওয়াবে স্বভাবতই রাগের বশবর্তী হয়ে জওয়াব দেয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরকে যে জওয়াব শিক্ষা দিয়েছেন, তা প্রণিধানযোগ্য, সংস্কারকদের জন্য চির স্মরণীয় এবং কর্মের আদর্শ করার বিষয়। সবগুলো প্রশ্নের জওয়াবে তাদের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ

করা হয়নি এবং হঠকারিতাপূর্ণ দুষ্টামিও ফুটিয়ে তোলা হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রূপাত্মক বাক্যও উচ্চারণ করা হয়নি; বরং সাধাসিধা ভাষায় আসল স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, সম্ভবত তোমাদের ধারণা এই যে, আল্লাহ্‌র রসূলও সমগ্র খোদায়ী ক্ষমতার মালিক এবং সবকিছু করতে সক্ষম হওয়া উচিত। এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। রসূলের কাজ শুধু আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌঁছানো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রিসালত সপ্রমাণ করার জন্য অনেক মু'জিযাও প্রেরণ করেন। কিন্তু সেগুলো নিছক আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত ও ক্ষমতা দ্বারা হয়। রসূল খোদায়ী ক্ষমতা লাভ করেন না। তিনি একজন মানব, কাজেই মানবিক শক্তিবহির্ভূত নন। তবে যদি আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁর সাহায্যার্থে স্বীয় শক্তি প্রকাশ করেন, তবে তা ভিন্ন কথা।

মানবের রসূল মানবই হতে পারেন---ফেরেশতা মানবের রসূল হতে পারে না : সাধারণ কাফির ও মুশরিকদের ধারণা ছিল, মানব আল্লাহ্‌র রসূল হতে পারে না। কেননা সে মানবীয় অভাব ও প্রয়োজনে অভ্যস্ত হয়। কাজেই সাধারণ মানুষের ওপর তার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই যে, তারা তাকে রসূল মনে করে অনুসরণ করবে। তাদের এ ধারণার জওয়াব কোরআন পাকে কয়েক জায়গায় বিভিন্ন শিরোনামে দেওয়া হয়েছে। এখানে مَا مَنَعَ النَّاسَ আয়াতে যে জওয়াব দেওয়া হয়েছে, তার সারমর্ম হলো যে, রসূলকে যাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়, তাকে তাদেরই শ্রেণীভুক্ত হতে হবে। তারা মানব হলে রসূলেরও মানব হওয়া উচিত। কেননা, ভিন্ন শ্রেণীর সাথে পারস্পরিক মিল ব্যতীত হিদায়ত ও পথপ্রদর্শনের উপকার অর্জিত হয় না। ফেরেশতা ক্ষুধা-পিপাসা জানে না, কাম-প্রবৃত্তিরও জ্ঞান রাখে না এবং শীত-গ্রীষ্মের অনুভূতি ও পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি থেকেও মুক্ত। এমতাবস্থায় মানুষের প্রতি কোন ফেরেশতাকে রসূল করে প্রেরণ করা হলে সে মানবের কাছেও উপরোক্তরূপ কর্ম আশা করতো এবং মানবের দুর্বলতা ও অক্ষমতা উপলব্ধি করতো না। এমনিভাবে মানব যখন বুঝত যে, সে ফেরেশতা, তার কাজকর্মের অনুকরণ করার যোগ্যতা মানুষের নেই, তখনই মানব তার অনুসরণ মোটেই করতো না। সংশোধন ও পথপ্রদর্শনের উপকার তখনই অর্জিত হতে পারে, যখন আল্লা-হ্‌র রসূল মানব জাতির মধ্যে থেকে হয়। তিনি একদিকে মানবীয় ভাবাবেগ ও স্বভাবগত কামনা-বাসনার বাহকও হবেন এবং সাথে সাথে এক প্রকার ফেরেশতাসুলভ শানেরও অধিকারী হবেন—যাতে সাধারণ মানব ও ফেরেশতাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার কাছ থেকে ওহী বুঝে নিয়ে স্বজাতীয় মানবের কাছে পৌঁছাতে পারে।

উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা এ সন্দেহও দূর হয়ে গেল যে, মানুষ ফেরেশতার কাছ থেকে উপকার লাভে সক্ষম না হলে রসূল মানব হওয়া সত্ত্বেও ফেরেশতার কাছ থেকে ওহী কিরূপে লাভ করতে পারবে?

প্রশ্ন হয় যে; রসূল ও উম্মতের সমজাতি হওয়া যখন শর্ত, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) জিন জাতির রসূল নিযুক্ত হলেন কিরূপে? জিন তো মানবের সমজাতি নয়।

উত্তর এই যে, রসূল শুধু মানবই নন; বরং তিনি ফেরেশতাসুলভ ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদারও অধিকারী। এ কারণে তাঁর সাথে জিনদেরও সম্পর্ক থাকতে পারে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ তোমরা মানব হওয়া সত্ত্বেও দাবি কর যে, তোমাদের রসূল ফেরেশতা হওয়া উচিত। এ দাবি অযৌক্তিক। যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা বসবাস করত এবং তাদের প্রতি রসূল প্রেরণ করার প্রয়োজন দেখা দিত, তবে ফেরেশতাকেই রসূল করা হত। এখানে পৃথিবীতে বসবাসকারী ফেরেশতাদের বিশেষণ يمشون مطمئنين উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে নিশ্চিন্তে বিচরণ করে। এ থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাদের প্রতি ফেরেশতাকে রসূল করে প্রেরণ করার প্রয়োজন তখনই হত, যখন পৃথিবীর ফেরেশতারা স্বয়ং আকাশে যেতে না পারত; বরং পৃথিবীতেই বিচরণ করতে হত। পক্ষান্তরে যদি তারা স্বয়ং আকাশে যাওয়ার শক্তি রাখত, তবে পৃথিবীতে রসূল প্রেরণ করার প্রয়োজনই দেখা দিত না।

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ۝ وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ۚ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ۚ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ۝ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ۝ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۚ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ۝ قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ۚ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ۝

(৯৬) বলুনঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠাকারী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি তো স্বীয় বান্দাদের বিষয়ে খবর রাখেন ও দেখেন। (৯৭) আল্লাহ্ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, সে'ই তো সঠিক পথপ্রাপ্ত এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাদের জন্য আপনি আল্লাহ্ ছাড়া কোন সাহায্যকারী পাবেন না। আমি কিয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মূক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখনই নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে

আমি তখন তাদের জন্য অগ্নি আরও বৃদ্ধি করে দিব। (৯৮) এটাই তাদের শাস্তি, কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে এবং বলেছেঃ আমরা যখন অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি আমরা নতুনভাবে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব? (৯৯) তারা কি দেখেনি যে, যে আল্লাহ্ আসমান ও জমিন সৃজিত করেছেন, তিনি তাদের মত মানুষও পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম? তিনি তাদের জন্য স্থির করেছেন একটি নির্দিষ্ট কাল এতে কোন সন্দেহ নেই; অতঃপর জালিমরা অস্বীকার ছাড়া কিছু করেনি। (১০০) বলুনঃ যদি আমার পালনকর্তার রহমতের ভাণ্ডার তোমাদের হাতে থাকত, তবে ব্যয়িত হয়ে যাওয়ার আশংকায় অবশ্যই তা ধরে রাখতে। মানুষ তো অতিশয় কৃপণ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যখন তারা রিসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার এবং যাবতীয় সন্দেহ দূর হয়ে যাওয়ার পরও বিশ্বাস স্থাপন করে না, তখন) আপনি (শেষ কথা) বলে দিনঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার ও তোমাদের মধ্যে (মতবিরোধের ব্যাপারে) যথেষ্ট সাক্ষী। (অর্থাৎ আল্লাহ্ জানেন যে, আমি বাস্তবিকই আল্লাহ্র রসূল; কেননা) তিনি স্বীয় বান্দাদের (অবস্থা)-কে ভালোভাবে জানেন, ভালোভাবে দেখেন (তোমাদের হঠকারীতাকেও দেখেন)। আল্লাহ্ যাকে পথে আনেন, সে-ই পথে আসে এবং যাকে পথভ্রষ্ট করে দেন, আপনি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন লোকদের সাহায্যকারী কাউকে পাবেন না। (কুফরের কারণে তারা আল্লাহ্র সাহায্য থেকে বঞ্চিত। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য না হলে হিদায়তও হতে পারে না এবং আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারে না।) আমি কিয়ামতের দিন তাদেরকে অন্ধ, বধির ও মূক করে মুখে ভর করে চালিত করব। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। (এর অবস্থা এই যে) তা (অর্থাৎ জাহান্নামের অগ্নি) যখনই নিষ্প্রভ হতে থাকবে, তখনই আমি তাদের জন্য আরও প্রজ্জ্বলিত করে দেব। এটা তাদের শাস্তি, একারণে যে, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল এবং বলেছিলঃ আমরা যখন অস্থি এবং (তাও) চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, তখনও কি আমরা নতুনভাবে সৃজিত হয়ে (কবর থেকে) উত্থিত হব? তাদের কি এতটুকু জানা নেই যে, যে আল্লাহ্ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, তিনি (আরও উত্তমরূপে) তাদের মত মানুষ পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম? এবং (অবিশ্বাসীরা সম্ভবত মনে করে যে, হাজারো লাখো মানুষ মরে গেছে; কিন্তু পুনরুজ্জীবনের ওয়াদা আজ পর্যন্ত পূর্ণ হয়নি। শোন, এর কারণ এই যে) তাদের। (পুনরুজ্জীবনের) জন্য তিনি একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, এতে (অর্থাৎ এ সময়ের আগমনে) বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। এতদসত্ত্বেও জালিমরা অস্বীকার না করে থাকে নি। আপনি বলে দিনঃ যদি আমার পালনকর্তার রহমতের (অর্থাৎ নবুয়তের) ভাণ্ডার (অর্থাৎ গুণাবলী) তোমাদের হাতে থাকত (অর্থাৎ যাকে ইচ্ছা দিতে, যাকে ইচ্ছা না দিতে) তবে তোমরা ব্যয়িত হয়ে যাওয়ার আশংকায় অবশ্যই তা বন্ধ করে রাখতে (কাখনো কাউকে দিতে না, অথচ এটা কাউকে দিলে হ্রাসও

পায় না।) মানুষ বড়ই ছোট মন। (ক্ষয় পায় না—এমন বস্তুও সে দান করতে দ্বিধাবোধ করে। এর কারণ পয়গম্বরদের সাথে শত্রুতা এবং কৃপণতা ছাড়া সম্ভবত এটাও যে, কাউকে নবী করলে তাঁর নির্দেশাবলী পালন করতে হবে, যেমন কোন জাতি পারস্পরিক ঐকমত্যে কাউকে বাদশাহ মনোনীত করলে যদিও তারাই মনোনীত করে থাকে, কিন্তু মনোনীত হয়ে যাওয়ার পর তার আদেশই সবাইকে পালন করতে হয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছেঃ যদি তোমরা আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডারের মালিক হয়ে যাও, তবে তাতেও কৃপণতা করবে। কাউকে দেবে না এ আশংকায় যে, এভাবে দিতে থাকলে ভাণ্ডারই নিঃশেষ হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হয় না। কিন্তু মানুষ স্বভাবগতভাবে ছোটমনা ও কম সাহসী। অকাতরে দান করার সাহস তার নেই।

এখানে সাধারণ তফসীরবিদগণ 'পালনকর্তার রহমতের ভাণ্ডার' শব্দের অর্থ নিয়েছেন ধনভাণ্ডার। পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, মক্কার কাফিররা ফরমায়েশ করেছিল, যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য নবী হন, তবে মক্কার শুষ্ক মরুভূমিতে নদী-নালা প্রবাহিত করে একে সিরিয়ার মত সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা করে দিন। এর জওয়াবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা যেন আমাকে খোদাই মনে করে নিয়েছ। ফলে আমার কাছ থেকে খোদায়ী ক্ষমতা দাবী করছ। আমি তো একজন রসূল মাত্র। খোদা নই যে, তোমরা যা চাইবে, তাই করব। আলোচ্য আয়াতকে যদি এর সাথেই সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, মক্কার মরুভূমিকে নদী-নালা বিধৌত শস্য শ্যামলা প্রান্তরে পরিণত করার ফরমায়েশ যদি আমার রিসালত পরীক্ষা করার জন্য হয়, তবে এর জন্য কোরআনের অলৌকিকতার মু'জিযাটি যথেষ্ট। অন্য ফরমায়েশের প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে যদি জাতীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্য হয়, তবে স্মরণ রেখ, যদি তোমাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী মক্কার ভূখণ্ডে তোমাদেরকে সবকিছু দেওয়াও হয় এবং ধন-ভাণ্ডারের মালিক তোমাদেরকে করে দেওয়া হয়, তবে এর পরিণামও জাতীয় ও জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হবে না; বরং মানবীয় অভ্যাস অনুযায়ী যার হাতে এই ধন-ভাণ্ডার থাকবে, সে সর্প হয়ে তার উপর বসে যাবে, জনগণের কল্যাণার্থে ব্যয় করতে চাইবে না দারিদ্র্যের আশংকা করবে। এমতাবস্থায় মক্কার গুটি-কতক বিত্তশালীর আরও বিত্তশালী ও সুখী হওয়া ছাড়া জনগণের কি উপকার হবে? অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের এ অর্থই সাব্যস্ত করেছেন।

কিন্তু হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র) বয়ানুল কোরআনকে এখানে রহমতের অর্থ নবুয়ত ও রিসালত এবং ভাণ্ডারের অর্থ নবুয়তের উৎকর্ষ নিয়েছেন। এ তফসীর অনুযায়ী পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক এই যে, তোমরা আমার নবুয়ত ও রিসা জন্য যেসব আগাগোড়াহীন অনর্থক দাবি করছ, সেগুলোর সারমর্ম এই যে, আমার নবুয়ত স্বীকার করতে চাও না। অতঃপর তোমরা কি চাও যে,

সূচী-পত্র

ব্যবস্থাপনা তোমাদের হাতে অর্পণ করা হোক, যাতে তোমরা যাকে ইচ্ছা নবী করে দাও। এরূপ করা হলে এর পরিণতি হবে এই যে, তোমরা কাউকে নবুয়ত দেবে না—কৃপণ হয়ে বসে থাকবে। হযরত থানভী (র) এই তফসীর লিপিবদ্ধ করে বলেছেন যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম দান। তফসীরটি খুবই স্থানোপযোগী। এ স্থলে নবুয়তকে রহমত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা এমন, যেমন أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ আয়াতে সর্বস্বীকৃত মতে রহমত শব্দের অর্থ নবুয়ত والله سبحانه و تعالى اعلم

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ

لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ۝١٠١ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ

هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَاِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ

مَثْبُوْرًا ۝١٠٢ فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ۝١٠٣

وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ

جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ۝١٠٤ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا

وَّنَذِيْرًا ۝١٠٥ وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ

تَنْزِيْلًا ۝١٠٦ قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ

اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۝١٠٧ وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ

اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۝١٠٨ وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَ

يَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۝١٠٩

---

(১০১) আপনি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করুন, আমি মূসাকে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন দান করেছি। যখন তিনি তাদের কাছে আগমন করেন, ফিরাউন তাকে বলল : হে মূসা, আমার ধারণায় তুমি তো যাদুগ্রস্ত। (১০২) তিনি বললেন : তুমি জান যে আসমান ও জমিনের পালনকর্তাই এ সব নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ নাযিল করেছেন। হে ফিরাউন, আমার ধারণায় তুমি ধ্বংস হতে চলেছ। (১০৩) অতঃপর সে

বনী ইসরাঈলকে দেশ থেকে উৎখাত করতে চাইল, তখন আমি তাকে ও তার সঙ্গীদের সবাইকে নিমজ্জিত করে দিলাম। (১০৪) তারপর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম ঃ এদেশে তোমরা বসবাস কর। অতঃপর যখন পরকালের ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে, তখন তোমাদেরকে জড়ো করে নিয়ে উপস্থিত হব। (১০৫) আমি সত্যসহ এ কোরআন নাযিল করেছি এবং সত্যসহ এটা নাযিল হয়েছে। আমি তো আপনাকে শুধু সুসংবাদ-দাতা ও ভয় প্রদর্শক করেই প্রেরণ করেছি। (১০৬) আমি কোরআনকে যতিচিহ্নসহ পৃথক পৃথকভাবে পাঠের উপযোগী করেছি, যাতে আপনি একে লোকদের কাছে ধীরে ধীরে পাঠ করেন এবং আমি একে যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। (১০৭) বলুন ঃ তোমরা কোরআনকে মান্য কর অথবা অমান্য কর; যারা এর পূর্ব থেকে ইলমপ্রাপ্ত হয়েছে, যখন তাদের কাছে এর তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা নত মস্তকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে (১০৮) এবং বলে ঃ আমাদের পালনকর্তা পবিত্র মহান। নিঃসন্দেহে আমাদের পালনকর্তার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। (১০৯) তারা ক্রন্দন করতে করতে নত মস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়ভাব আরো বৃদ্ধি পায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি মূসা (আ)-কে নয়টি প্রকাশ্য মু'জিযা দান করেছি (এগুলো নবম পারার ষষ্ঠ রুকুর প্রথম আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।) যখন তিনি বনী ইসরাঈলের কাছে এসেছিলেন। অতএব আপনি বনী ইসরাঈলকে (ও ইচ্ছা করলে) জিজ্ঞেস করে দেখুন। [যেহেতু মূসা (আ) ফিরাউনের প্রতিও প্রেরিত হয়েছিলেন এবং ফিরাউন ও ফিরাউন বংশীয়দের ঈমান না আনার কারণে মু'জিযাগুলো প্রকাশিত হয়েছিল, তাই মূসা (আ) ফিরাউনকে পুনরায় ঈমান আনার জন্য হুঁশিয়ার করেন এবং মু'জিযার মাধ্যমে ভয় প্রদর্শন করেন।] ফিরাউন বলল ঃ হে মূসা, আমার ধারণায় অবশ্যই তোমার উপর কেউ যাদু করেছে, (যদ্দরুন তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে এবং তুমি আবোল-তাবোল কথাবার্তা বলছ।) মূসা (আ) বললেন ঃ তুমি (মনে মনে) জান (যদিও লজ্জার কারণে মুখে স্বীকার কর না।) যে, এগুলো আসমান ও জমিনের পালনকর্তাই নাযিল করেছেন এমতাবস্থায় যে, এগুলো জ্ঞানের জন্য (যথেষ্ট) উপায়। আমার ধারণায় হে ফিরাউন, তোমার দুর্ভাগ্যের দিন ঘনিয়ে এসেছে। [এক সময় ফিরাউনের অবস্থা ছিল এই যে, মূসা (আ)-র অনুরোধ সত্ত্বেও সে বনী ইসরাঈলকে মিসর ত্যাগের অনুমতি দিত না এবং] অতঃপর (অবস্থা এই হয়েছে যে) সে [মূসা (আ)-র প্রভাবে বনী ইসরাঈলের শক্তিশালী হয়ে যাওয়ার আশংকায় নিজেই] বনী ইসরাঈলকে দেশ থেকে উৎখাত করতে চাইল (অর্থাৎ তাদেরকে দেশান্তরিত করতে চাইল।) অতঃপর আমি (তার সফল হওয়ার পূর্বেই স্বয়ং) তাকে ও তার সঙ্গী সবাইকে নিমজ্জিত করে দিলাম এবং তাঁর (অর্থাৎ তাকে নিমজ্জিত করার) পর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম ঃ (এখন) এদেশে (-র যে স্থান থেকে তোমাদেরকে উৎখাত করতে চেয়েছিল, সে স্থানের মালিক তোমরাই। কাজেই এতে) বসবাস কর (প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে; কিন্তু

এই মালিকানা পার্থিব জীবন পর্যন্ত)। অতঃপর যখন পরকালের ওয়াদা আসবে, তখন আমি সবাইকে জড়ো করে (কিয়ামতের ময়দানে গোলামের মতো) নিয়ে আসব। (প্রথমে এরূপ হবে। এরপর মু'মিন ও কাফির এবং সৎ ও অসৎকে আলাদা করে দেওয়া হবে। আমি মূসাকে যেমন মু'জিযা দিয়েছি, তেমনি আপনাকেও অনেক মু'জিযা দান করেছি। তন্মধ্যে একটি বিরাট মু'জিযা হচ্ছে কোরআন।) আমি এ কোরআনকে সত্যসহ নাযিল করেছি এবং তা সত্যসহই (আপনার প্রতি) নাযিল হয়েছে। (অর্থাৎ প্রেরকের কাছ থেকে যেমনটি রওয়ানা হয়েছিল, প্রাপকের কাছে তেমনটিই পৌঁছেছে। মাঝখানে কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও হস্তক্ষেপ হয়নি। অতএব আগাগোড়া সবই সত্য।) এবং [আমি যেমন মূসা (আ)-কে পয়গম্বর করেছিলাম এবং হিদায়ত তাঁর ক্ষমতাধীন ছিল না, তেমনি] আমি আপনাকে (ও) শুধু (ঈমানের সওয়াবের) সুসংবাদদাতা এবং (কুফরের আযাবের) ভয় প্রদর্শন করে প্রেরণ করেছি (কেউ ঈমান না আনলে কোন চিন্তা করবেন না)। এবং কোরআনে (সত্যের সাথে সাথে রহমতের তাগিদ অনুযায়ী আরও এমন গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যেগুলো দ্বারা হিদায়তে অধিক সহজ হয়। এক এই যে,) আমি (আয়াত ইত্যাদির) স্থানে স্থানে প্রভেদ রেখেছি, যাতে আপনি থেমে থেমে পাঠ করেন। (এভাবে তারা ভালরূপে বুঝতে পারবে। কেননা, উপর্যুপরি দীর্ঘ বক্তব্য মাঝে মাঝে আয়ত্ত করা যায় না।) এবং (দ্বিতীয় এই যে) আমি নাযিলও (ঘটনাবলী অনুযায়ী) ক্রমান্বয়ে করেছি (যাতে অর্থ চমৎকাররূপে ফুটে উঠে। এসব বিষয়ের তাগিদ অনুযায়ী তাদের বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত ছিল। কিন্তু এর পরও বিশ্বাস স্থাপন না করলে আপনি পরওয়া করবেন না; বরং) আপনি (পরিষ্কার) বলে দিনঃ তোমরা কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর অথবা করো না, (আমার কোন পরওয়া নেই দু'কারণে। এক এতে আমার কি ক্ষতি? দুই. তোমরা বিশ্বাস স্থাপন না করলে কি হবে, অন্য লোকেরা বিশ্বাস স্থাপন করবে। সেমতে) যাদেরকে কোরআনের (অর্থাৎ কোরআন নাযিল হওয়ার) পূর্বে (ধর্মের) ইল্‌ম দেওয়া হয়েছিল (অর্থাৎ গ্রন্থধারী সম্প্রদায়ের সত্যপন্থী আলিম), তাদের সামনে যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন নতমুতনি সিজদায় পড়ে যায় এবং বলেঃ আমাদের পালনকর্তা (ওয়াদার খেলাপ করা থেকে) পবিত্র। নিশ্চয় আমাদের পালনকর্তার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হয়। (সেমতে তিনি যে নবীর প্রতি যে কিতাব নাযিল করার ওয়াদা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে করেছিলেন, তা পূর্ণ করেছেন।) এবং নতমুতনি লুটিয়ে পড়ে ক্রন্দন করতে করতে। এই কোরআন (অর্থাৎ কোরআন পাঠ শোনা) তাদের (অন্তরের) বিনয়ভাব আরও বাড়িয়ে দেয়। (কেননা, বাহ্যিক অবস্থা ও আন্তরিক অবস্থার মিল বিনয়ভাবকে শক্তিশালী করে দেয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ —এতে মূসা (আ)-কে নয়টি প্রকাশ্য

নিদর্শন দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। آيَة শব্দটি মু'জিযা এবং কোরআনী আয়াতের অর্থাৎ আহ্কামে ইলাহীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলে উভয় অর্থের সম্ভাবনা আছে। একদল তফসীরবিদ এখানে آيَة এর অর্থ মু'জিযা নিয়েছেন। নয় সংখ্যা উল্লেখ করায় নয়ের বেশি না হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু এখানে বিশেষ গুরুত্বের কারণে নয় উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস নয়টি মু'জিযা এভাবে গণনা করেছেন : ১. মূসা (আ)-এর লাঠি, যা অজগর সাপ হয়ে যেত, ২. শুভ্র হাত, যা জামার নিচ থেকে বের করতেই চমকাতে থাকত, ৩. মুখের তোৎলামি—যা দূর করে দেওয়া হয়েছিল, ৪. বনী ইসরাঈলকে নদী পার করার জন্য নদীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে রাস্তা করে দেওয়া, ৫. অস্বাভাবিকভাবে পঙ্গপালের আযাব প্রেরণ করা, ৬. তুফান প্রেরণ করা, ৭. শরীরের কাপড়ে এত উকুন সৃষ্টি করা, যা থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় ছিল না, (৮) ব্যাঙের আযাব চাপিয়ে দেওয়া, ফলে প্রত্যেক পানাহারের বস্তুতে ব্যাঙ কিলবিল করত এবং ৯. রক্তের আযাব প্রেরণ করা। ফলে প্রত্যেক পাত্রে ও পানাহারের বস্তুতে রক্ত দেখা যেত।

অপর একটি সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায় যে, এখানে آيَات বলে আল্লাহর বিধি-বিধান বোঝানো হয়েছে। এই হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বিশুদ্ধ সনদ সহকারে সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন : জনৈক ইহুদী তার সঙ্গীকে বলল : আমাকে এই নবীর কাছে নিয়ে চল। সঙ্গী বলল : নবী বলো না। সে যদি জানতে পারে যে, আমরাও তাকে নবী বলি, তবে তার চার চক্ষু গজাবে। অর্থাৎ সে গর্বিত ও আনন্দিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে। অতঃপর তারা উভয়েই রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল : মূসা (আ) যে নয়টি প্রকাশ্য আয়াত প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেগুলো কি কি? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : ১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, ২. চুরি করো না, ৩. যিনা করো না, ৪. যে প্রাণকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন, তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না, ৫. কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে মিথ্যা দোষারোপ করে হত্যা ও শাস্তির জন্য পেশ করো না, ৬. যাদু করো না, ৭. সুদ খেয়ো না, ৮. সতীসাধ্বী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করো না, ৯. জিহাদের ময়দান থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে পলায়ন করো না। হে ইহুদী সম্প্রদায়, বিশেষ করে তোমাদের জন্য এ বিধানও আছে যে, শনিবার সম্পর্কে যেসব বিধান তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো ভঙ্গ করো না।

এসব কথা শুনে উভয় ইহুদী রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হস্তপদ চুম্বন করে বলল : আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল। তিনি বললেন : তাহলে আমাকে অনুসরণ করতে তোমাদের বাধা কি? তারা বলল : হযরত দাউদ (আ) স্বীয় পালনকর্তার কাছে দোয়া করেছিলেন যে, তাঁর বংশধরের মধ্যে যেন সব সময় নবী জন্মগ্রহণ

করে। আমাদের আশংকা, যদি আমরা আপনাকে অনুসরণ করি, তাহলে ইহুদীরা আমাদেরকে বধ করবে।

এই তফসীরটি সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই অনেক তফসীরবিদ একেই অগ্রগণ্যতা দান করেছেন।

يبكون ويزيدهم خشوعا---তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ কোরআন তিলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করা মুস্তাহাব। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করে, সে জাহান্নামে যাবে না, যে পর্যন্ত না দোহন করা দুধ পুনর্বার স্তনে ফিরে আসে। (অর্থাৎ দোহন করা দুধ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন সম্ভবপর নয়, তেমনিভাবে আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়াও অসম্ভব।) অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা দু'টি চক্ষুর উপর জাহান্নামের অগ্নি হারাম করেছেন। এক, যে আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করে। দুই, যে ইসলামী সীমান্তের হিফাযতে রাত্রিকালে জাগ্রত থাকে। (বায়হাকী, হাকিম) হযরত নযর ইবনে সা'দ বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে সম্প্রদায়ে আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারী রয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা সেই সম্প্রদায়কে তার কারণে অগ্নি থেকে মুক্তি দেবেন।---(রূহুল মা'আনী)

আজ মুসলমান জাতি যে মহাবিপদে পতিত আছে, এর কারণ এটাই যে, তাদের মধ্যে আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারীর সংখ্যা খুবই কম। রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার এস্থলে আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনের ফযীলত সম্পর্কিত অনেক হাদীস উদ্ধৃত করার পর বলেন ঃ وينبغي ان يكون ذالك حال العلماء অর্থাৎ আলিমদের এরূপ অবস্থাই হওয়া উচিত। কেননা, ইবনে জরীর, ইবনে মুন্যির প্রমুখ তফসীরবিদ আবদুল আ'লা তায়মী (রহ)-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, যে ব্যক্তি শুধু এমন ইল্‌ম প্রাপ্ত হয়েছে, যা তাকে ক্রন্দন করায় না ; বুঝে নাও যে, সে উপকারী ইল্‌ম প্রাপ্ত হয়নি।

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ
وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي
الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾

(১১০) বলুন ঃ আল্লাহ্ বলে আহ্বান কর কিংবা রহমান বলে, যে নামেই আহ্বান কর না কেন, সব সুন্দর নাম তাঁরই। আপনি নিজের নামায আদায়কালে স্বর

উচ্চগ্রামে নিয়ে যাবেন না এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না। এতদুভয়ের মধ্যম পন্থা অবলম্বন করুন। (১১১) বলুনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি না কোন সন্তান রাখেন, না তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন শরীক আছে এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং আপনি সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে থাকুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি বলে দিনঃ তোমরা 'আল্লাহ্' নামে আহবান কর অথবা 'রহমান' নামে আহবান কর, যে নামেই আহবান কর না কেন (তাই ভালো, কারণ) তাঁর জন্য রয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর নাম। (এবং এর সাথে অংশীবাদীতার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ একই সত্তার একাধিক নাম হওয়ার ফলে তাঁর একত্ববাদের মধ্যে কোন হেরফের হয় না।) এবং আপনি নিজ নামায আদায়কালে স্বর উচ্চগ্রামেও নিয়ে যাবেন না (যে, অংশীবাদিরা শুনবে এবং যথেচ্ছ বাজে কথা বলবে, ফলে নামায আদায়রত চিত্ত মনোযোগছিন্ন হয়ে পড়বে) এবং অতিশয় ক্ষীণভাবেও পড়বেন না (যে, মুক্তাদী নামাযীদেরও শ্রুতিগোচর হবে না। কারণ, তা'হলে তাদের শিক্ষাদীক্ষায় অপূর্ণাঙ্গতা এসে যাবে।) এবং এ দুইয়ের মধ্যবর্তী একটি (মধ্য) পন্থা অবলম্বন করুন (যাতে করে যথোপযোগিতা ব্যাহত না হয় এবং অবাঞ্ছিত পরিবেশ মুকাবিলা করতে না হয়)। আর (কাফিরদের বক্তব্য খণ্ডনের জন্য প্রকাশ্য ঘোষণায়) বলে দিনঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্যে (বিশেষভাবে নির্ধারিত), যিনি না কোন সন্তান গ্রহণ করেন, না তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশীদার আছে এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্তও হন না, যে কারণে তাঁর সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এগুলো সূরা বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ আয়াত। এ সূরার প্রারম্ভেও আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ও তওহীদের বর্ণনা ছিল এবং সর্বশেষ আয়াতগুলোতেও এ বিষয়বস্তুই বিধৃত হয়েছে। কয়েকটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এক, রসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন দোয়ায় 'ইয়া আল্লাহ্' ইয়া রহমান বলে আহ্বান করলে মুশরিকরা মনে করতে থাকে যে, তিনি দু' আল্লাহ্কে আহ্বান করেন। তারা বলাবলি করতে থাকে যে, আমাদেরকে তো একজন ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকতে নিষেধ করেন অথচ নিজেই দু' উপাস্যকে ডাকেন। আয়াতের প্রথম অংশে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার দু'টিই নয়, আরও অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে। যে নামেই ডাকা হবে, উদ্দেশ্য একই সত্তা। কাজেই তোমাদের জল্পনা-কল্পনা ভ্রান্ত।

দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, মক্কায় রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন নামাযে উচ্চ স্বরে তিলাওয়াত করতেন, তখন মুশরিকরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত এবং কোরআন, জিবরাঈল ও স্বয়ং আল্লাহ্

তা'আলাকে উদ্দেশ্য করে ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা বলত। এর জওয়াবে আয়াতের শেষাংশ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সশব্দ ও নিঃশব্দ উভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কেননা মধ্যবর্তী শব্দে পাঠ করলেই প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায় এবং সশব্দে পাঠ করলে মুশরিকরা নিপীড়নের যে সুযোগ পেত, তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

তৃতীয় ঘটনা এই যে, ইহুদী ও খৃস্টানরা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করত। আরবরা প্রতিমাদেরকে আল্লাহ্র শরীক বলত। সাবেয়ী ও অগ্নিপূজারিরা বলত যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নৈকট্যশীল কেউ না থাকলে তাঁর সম্মান ও মহত্ত্ব লাঘব হয়। এ দলত্রয়ের জওয়াবে সর্বশেষ আয়াত নাযিল হয়েছে। এতে তিনটি বিষয়েরই খণ্ডন করা হয়েছে।

দুনিয়াতে সৃষ্টজীব যা দ্বারা শক্তিলাভ করে সে কোন সময় নিজের চাইতে ছোট হয়—যেমন সন্তান, কোন সময় নিজের সমতুল্য হয়, যেমন অংশীদার এবং কোন সময় নিজের চাইতে বড় হয়; যেমন সমর্থক ও সাহায্যকারী। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্য যথাক্রমে তিনটিই নাকচ করে দিয়েছেন।

মাস'আলা ঃ উল্লিখিত আয়াতে নামাযে কোরআন তিলাওয়াতের আদব বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, খুবই উচ্চ স্বরে না হওয়া চাই এবং এমন নিঃশব্দেও না হওয়া চাই যে, মুক্তাদীরা শুনতে পায় না। বলা বাহুল্য এ বিধান বিশেষ করে 'জেহরী' (সশব্দে পঠিত) নামাযসমূহের জন্য। যোহর ও আসরের নামাযে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে পাঠ করা মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

'জেহরী' নামায বলতে ফজর, মাগরিব ও এশার নামায বুঝায়। তাহাজ্জুদের নামাযও এর অন্তর্ভুক্ত, যেমন এক হাদীসে রয়েছে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাজ্জুদের সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর ফারুক (রা)-এর কাছ দিয়ে গেলে হযরত আবূ বকরকে নিঃশব্দে এবং হযরত উমরকে উচ্চস্বরে তিলাওয়াতরত দেখতে পান। রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে বললেন ঃ আপনি এত নিঃশব্দ তিলাওয়াত করেন কেন? তিনি আরয করলেন ঃ যাকে শোনানো উদ্দেশ্য তাঁকে শুনিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা গোপনতম আওয়াজও শ্রবণ করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সামান্য শব্দ সহকারে পাঠ করুন। অতঃপর হযরত উমরকে বললেন ঃ আপনি এত উচ্চ স্বরে তিলাওয়াত করেন কেন? তিনি আরয করলেন ঃ আমি নিদ্রা ও শয়তানকে বিতাড়িত করে দেওয়ার জন্য উচ্চস্বরে পাঠ করি। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকেও আদেশ দিলেন যে, অনুচ্চ শব্দে পাঠ করুন।—(তিরমিযী)

নামাযের ভেতরে ও বাইরে সশব্দে ও নিঃশব্দে কোরআন তিলাওয়াত সম্পর্কিত মাস'আলা সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে। সর্বশেষ আয়াত قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ সম্পর্কে হাদীসে আছে যে, এটি ইযযতের আয়াত। (আহমদ তাবরানী) এ আয়াতে এরূপ

নির্দেশও আছে যে, মানুষ যতই আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও তসবীহ পাঠ করুক, নিজের আমলকে কম মনে করা এবং ত্রুটি স্বীকার করা তার জন্য অপরিহার্য। (মাযহারী)

হযরত আনাস (রা) বলেন : আবদুল মুত্তালিবের পরিবারে যখন কোন শিশু কথা বলার যোগ্য হয়ে যেত, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে এ আয়াত শিখিয়ে দিতেন :

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ۔

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন : একদিন আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বাইরে গেলাম। তখন আমার হাত তাঁর হাতে অবদ্ধ ছিল। তিনি জনৈক দুর্দশাগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন ব্যক্তির কাছে দিয়ে গমন করার সময় তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার এই দুর্দশা কেন? লোকটি আরয করল : রোগব্যাধি ও দারিদ্র্যের কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য বলে দিই। এগুলো পাঠ করলে তোমার রোগব্যাধি ও অভাব-অনটন দূর হয়ে যাবে। বাক্যগুলো এই : تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا الاية এর কিছু দিন পর রসূলুল্লাহ্ (সা) আবার সে দিকে গমন করলে লোকটিকে সুখী দেখতে পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন। সে আরয করল : যেদিন আপনি আমাকে বাক্যগুলো বলে দেন, সেদিন থেকে নিয়মিতই সেগুলো পাঠ করি।—(মাযহারী)

سورة الكهف

সূরা কাহ্ফ

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ১১০ আয়াত ঃ ১২ রুকু

সূরা কাহ্ফের বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত ঃ মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও মসনদে আহমদে হযরত আবুদ্দারদা থেকে একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে হযরত আবুদ্দারদা থেকেই অপর একটি রিওয়ায়েতে এই বিষয়বস্তু সূরা কাহ্ফের শেষ দশ আয়াত মুখস্থ করা সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে।

মসনদে আহমদে হযরত সাহল ইবনে মু'আযের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের প্রথম ও শেষ আয়াতগুলো পাঠ করে, তার জন্য তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটি নূর হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সূরা পাঠ করে, তার জন্য জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত নূর হয়ে যায়।

কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন সূরা কাহ্ফ তিলাওয়াত করে, তার পা থেকে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত নূর হয়ে যাবে, যা কিয়ামতের দিন আলো দেবে এবং বিগত জুম'আ থেকে এই জুম'আ পর্যন্ত তার সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।—(ইমাম ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েতটিকে মওকুফ বলেছেন।)

হাফেয জিয়া মুকাদ্দাসী 'মুখতারাহ্' গ্রন্থে হযরত আলী (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে, সে আট দিন পর্যন্ত সর্বপ্রকার ফিতনা থেকে মুক্ত থাকবে। যদি দাজ্জাল বের হয়, তবে সে তার ফিতনা থেকেও মুক্ত থাকবে।—(এসব রেওয়ায়েত ইবনে-কাসীর থেকে গৃহীত।)

রূহুল-মা'আনীতে হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণিত রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সূরা কাহ্ফ সম্পূর্ণটুকু এক সময়ে নাযিল হয়েছে এবং সত্তর হাজার ফিরিশতা এর সঙ্গে আগমন করেছেন। এতে এর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়।

শানে নুযূল ঃ ইমাম ইবনে জারীর তাবারী হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন ঃ যখন মক্কায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়তের চর্চা শুরু হয় এবং কোরায়শরা তাতে বিব্রত বোধ করতে থাকে, তখন তারা নযর ইবনে হারিস ও ওকবা ইবনে আবী মুয়ীতকে মদীনার ইহুদী আলিমদের কাছে প্রেরণ করে। তারা পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জীলের পণ্ডিত ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে তারা কি বলে, একথা জানার জন্য এই প্রতিনিধি দল প্রেরিত হয়েছিল। ইহুদী আলিমরা তাদেরকে বলে দেয় যে, তোমরা তাঁকে তিনটি প্রশ্ন কর। তিনি এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলে বুঝে নাও যে, তিনি

আল্লাহ্র রসূল। অন্যথায় বুঝতে হবে যে, তিনি একজন বাগাড়ম্বরকারী—রসূল নন। এক, তাঁকে ঐসব যুবকের অবস্থা জিজ্ঞেস কর, যারা প্রাচীনকালে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তাদের ঘটনা কি? কেননা, এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা। দুই, তাঁকে সে ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞেস কর, যে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম এবং সারা বিশ্ব সফর করেছিল। তার ঘটনা কি? তিন, তাঁকে রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন কর যে, এটা কি?

উভয় কোরায়শী মক্কায় ফিরে এসে ভ্রাতৃসমাজকে বলল: আমরা একটি চূড়ান্ত ফয়সালার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফিরে এসেছি। অতঃপর তারা তাদেরকে ইহুদী আলিমদের কাহিনী শুনিয়ে দিল। কোরায়শরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এ প্রশ্নগুলো নিয়ে হাজির হল। তিনি শুনে বললেন: আগামীকাল উত্তর দেব। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ্ বলতে ভুলে গেলেন। কোরায়শরা ফিরে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর আলোকে জওয়াব দেবার জন্য ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু ওয়াদা অনুযায়ী পরদিবস পর্যন্ত ওহী আগমন করল না। বরং পনের দিন এ অবস্থায়ই কেটে গেল। ইতিমধ্যে জিবরাঈলও এলেন না এবং কোন ওহীও নাযিল হল না। অবস্থাদৃষ্টে কোরায়শরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ আরম্ভ করে দিল। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা) খুবই দুঃখিত ও চিন্তিত হলেন।

পনের দিন পর জিবরাঈল সূরা কাহ্ফ নিয়ে অবতরণ করলেন। এতে ওহীর বিলম্বের কারণও বর্ণনা করে দেওয়া হল যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ করার ওয়াদা করা হলে ইনশাআল্লাহ্ বলা উচিত। এ ঘটনায় এরূপ না হওয়ার কারণে হুঁশিয়ার করার জন্য বিলম্বে ওহী নাযিল করা হয়েছে। এ সম্পর্কে এ সূরায় নিম্নোক্ত আয়াত আসবে:

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۝ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ —এ সূরায়

যুবকদের ঘটনাও পুরোপুরি বর্ণনা করা হয়েছে। তাদেরকে 'আসহাবে কাহ্ফ' বলা হয়। পূর্ব ও পশ্চিমে সফরকারী যুলকারনাইনের ঘটনাও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে এবং রূহ্ সম্পর্কিত প্রশ্নের জওয়াবও।—(কুরতুবী, মাযহারী) কিন্তু রূহ্ সম্পর্কিত প্রশ্নের জওয়াব সংক্ষেপে দেওয়াই সমীচীন ছিল। তাই সূরা বনী ইসরাঈলের শেষে আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এ কারণেরই সূরা কাহ্ফকে সূরা বনী ইসরাঈলের পরে স্থান দেওয়া হয়েছে।—(সুয়ূতী)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝١

قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ

يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝٢ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۝٣

وَّ يُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۝ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ۝ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۝ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ۝

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(১) সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি। (২) একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন যাতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি ভীষণ বিপদের ভয় প্রদর্শন করে এবং মু'মিনদেরকে—যারা সৎকর্ম সম্পাদন করে—তাদেরকে এই সুসংবাদ দান করে যে, তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে। (৩) তারা তাতে চিরকাল অবস্থান করবে। (৪) এবং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করার জন্য যারা বলে যে, আল্লাহ্ সন্তান রাখেন। (৫) এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও নেই। কত বড় তাদের মুখনিসৃত কথা। তারা যা বলে তা তো সবই মিথ্যা। (৬) যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পশ্চাতে সম্ভবত আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন। (৭) আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে। (৮) এবং তার উপর যা কিছু রয়েছে, অবশ্যই তা আমি উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকায় পরিণত করে দেব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি নিজের (বিশেষ) বান্দা [মুহাম্মদ (সা)]-এর প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং এতে (এ গ্রন্থে কোন প্রকার) সামান্যও বক্রতা রাখেননি (শাব্দিকও নয় যে, অলংকার শাস্ত্রের পরিপন্থী হবে এবং অর্থগতও নয় যে, এর কোন বিধান হিকমতের বিরুদ্ধে যাবে; বরং একে) সম্পূর্ণ সঠিক হওয়ার গুণে গুণান্বিত করেছেন। (নাযিল এ জন্য করেছেন) যাতে তা (অর্থাৎ এ গ্রন্থ কাফিরদেরকে সাধারণ-ভাবে) একটি ঘোর বিপদের—যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (তাদের উপর পরকালে) পতিত হবে—ভয় প্রদর্শন করে এবং বিশ্বাসীদেরকে—যারা সৎকর্ম সম্পাদন করে—সুসংবাদ

দান করে যে, তারা পরকালে উত্তম প্রতিদান পাবে। তাতে তারা চিরকাল থাকবে এবং যাতে (কাফিরদের মধ্য থেকে বিশেষভাবে) তাদেরকে (আযাবের) ভয় প্রদর্শন করে যারা বলেঃ (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান রাখেন। (সন্তানের বিশ্বাস পোষণকারী কাফিরদেরকে সাধারণ কাফির থেকে আলাদা করে বর্ণনা করার কারণ এই যে, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে আরবের সাধারণ লোক---মুশরিক, ইহুদী ও খৃস্টান সবাই লিপ্ত ছিল।) এর কোন প্রমাণ তাদের কাছে নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষের কাছেও নেই। খুব গুরুতর কথা তাদের মুখ থেকে বের হয়েছে। তারা যা বলে, তা তো সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে। (এটা যুক্তির দিক দিয়েও অসম্ভব। কোন স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও এর প্রবক্তা হতে পারে না। আপনি তাদের কুফর ও অস্বীকারের কারণে এতটুকু দুঃখিত যে) যদি তারা এই (কোরআনী) বিষয়বস্তুতে বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে সম্ভবত আপনি তাদের পশ্চাতে দুঃখ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন! (অর্থাৎ এতটুকু দুঃখ করবেন না যে, নিজেকে ধ্বংসের সম্মুখীন করে দেবেন। কারণ, এই বিশ্ব পরীক্ষা কেন্দ্র। এখানে ঈমান, কুফর এবং ভাল-মন্দের সমাবেশই থাকবে এরূপ হবে না যে, সবাই ঈমানদার হয়ে যাবে। এ পরীক্ষার জন্যেই) আমি পৃথিবীস্থ বস্তুসমূহকে তার (পৃথিবীর) জন্য শোভা করেছি, যাতে (এর মাধ্যমে) মানুষের পরীক্ষা নেই যে, কে তাদের মধ্যে ভাল কাজ করে। (অর্থাৎ এরূপ পরীক্ষা নেওয়া উদ্দেশ্য যে, কে দুনিয়ার সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে আল্লাহ্ ও পরকাল থেকে বিমুখ হয়ে যায় এবং কে হয় না। মোটকথা এই যে, এটা পরীক্ষা জগত। সৃষ্টিগতভাবে এখানে কেউ মু'মিন হবে এবং কেউ কাফির থাকবে। অতএব চিন্তা অনর্থক। আপনি নিজের কাজ করে যান এবং তাদের কুফরের ফল দুনিয়াতেই প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষা করবেন না। কেননা, এটা আমার কাজ। নির্দিষ্ট সময়ে হবে। সেমতে এমন একদিন আসবে যে,) আমি পৃথিবীস্থ সবকিছুকে একটি খোলা ময়দান করে দেব। (তখন এখানে কোন বসতকারী থাকবে না এবং কোন বৃক্ষ, পাহাড়, দালান-কোঠা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। মোট-কথা এই যে, আপনি প্রচার কাজ অব্যাহত রাখুন। অবিশ্বাসীদের কুপরিণামের জন্য এত দুঃখিত হবেন না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

عوج — وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا قَيِّمًا শব্দের অর্থ কোন প্রকার বক্রতা এবং এক দিকে ঝুঁকে পড়া। কোরআন পাক শাব্দিক ও আর্থিক উৎকর্ষে এ থেকে পবিত্র। অলংকার শাস্ত্রের দিক দিয়েও এর কোন জায়গায় এতটুকু ত্রুটি অথবা বক্রতা থাকতে পারে না এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিক দিয়েও নয়। وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا বাক্যে যে অর্থটি

ধনাত্মক আকারে ব্যক্ত হয়েছে, তাগিদের জন্য এ অর্থকেই قَيِّمًا শব্দের মধ্যে ধনাত্মক আকারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কেননা, قَيِّمًا -এর অর্থ হচ্ছে مُسْتَقِيْمًا (সঠিক)। مُسْتَقِيْم তাকেই বলা হবে, যার মধ্যে সামান্যতম বক্রতা এবং একদিকে ঝোঁক না থাকে। এখানে قَيِّم শব্দের আরও একটি অর্থ হতে পারে ; অর্থাৎ রক্ষক ও হিফাযতকারী। এ অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন পাক নিজে যেমন সম্পূর্ণ এবং সর্বপ্রকার বক্রতা, ত্রুটি ও বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত, তেমনিভাবে সে অপরকেও সঠিক পথে রাখে এবং বান্দাদের যাবতীয় উপকারিতার হিফাযত করে। এখন উভয় শব্দের সারসংক্ষেপ এই যে, কোরআন পাক নিজেও সম্পূর্ণ এবং মানুষকেও স্বয়ংসম্পূর্ণকারী।—(মাযহারী)

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا—অর্থাৎ পৃথিবীর জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ এবং ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন বস্তুর খনি—এগুলো সবই পৃথিবীর সাজসজ্জা ও চাকচিক্য। এখানে প্রশ্ন হয় যে, পৃথিবীর সৃষ্টজীবের মধ্যে সাপ, বিচ্ছু, হিংস্র জন্তু এবং অনেক ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক বস্তুও রয়েছে। এগুলোকে পৃথিবীর সাজসজ্জা ও চাকচিক্য কিরূপে বলা যায়? উত্তর এই যে, দুনিয়াতে যেসব বস্তু বাহ্যত ধ্বংসাত্মক ও খারাপ, সেগুলো একদিক দিয়ে খারাপ হলেও সমষ্টিগতভাবে কোন কিছুই খারাপ নয়। কেননা, প্রত্যেক মন্দ বস্তুর মধ্যে অন্যান্য নানা দিক দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা অনেক উপকারও নিহিত রেখেছেন। বিষাক্ত জন্তু ও হিংস্র প্রাণীদের দ্বারা মানুষের চিকিৎসা ইত্যাদি সংক্রান্ত হাজারো অভাব পূরণ করা হয়। তাই যেসব বস্তু একদিক দিয়ে মন্দ, বিশ্বচরাচরের গোটা কারখানার দিক দিয়ে সেগুলোও মন্দ নয়। কবি চমৎকার বলেছেন :

نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں
کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ۝
إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً

وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۝ فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۝ ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَىُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا اَمَدًا ۝

(৯) আপনি কি ধারণা করেন যে, গুহা ও গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনা-বলীর মধ্যে বিস্ময়কর ছিল? (১০) যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে তখন দোয়া করেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন। (১১) তখন আমি কয়েক বছরের জন্য গুহায় তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেই। (১২) অতঃপর আমি তাদেরকে পুনরুত্থিত করি, একথা জানার জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে অধিক নির্ণয় করতে পারে।

শব্দার্থঃ كهف-এর অর্থ বিস্তীর্ণ পার্বত্য গুহা। বিস্তীর্ণ না হলে তাকে غار বলা হয়। رقيم--এর শাব্দিক অর্থ مرقوم বা লিখিত বস্তু। এস্থলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বা-সের রেওয়ায়েত দৃষ্টে যাহহাক, সুদ্দী ও ইবনে যুবায়রের মতে এর অর্থ একটি লিখিত ফলক। সমসাময়িক বাদশাহ্ এই ফলকে আসহাবে কাহ্‌ফের নাম লিপিবদ্ধ করে গুহার প্রবেশ পথে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এ কারণেই আসহাবে-কাহ্‌ফকে রকীমও বলা হয়। কাতাদাহ, আতিয়্যা, আউফী ও মুজাহিদ বলেনঃ রকীম সে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত উপত্যকার নাম, যাতে আসহাবে-কাহ্‌ফের গুহা ছিল। কেউ কেউ স্বয়ং পাহাড়টিকেই রকীম বলেছেন। হযরত ইকরামা বলেনঃ আমি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি যে, রকীম কোন লিখিত ফলকের নাম না জনবসতির নাম, তা আমার জানা নেই। কা'ব আহ্‌বার, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রকীম রোমে অবস্থিত আয়লাহ্ অর্থাৎ, আকাবার নিকটবর্তী একটি শহরের নাম। فِتْيَةٌ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন فَتًى — অর্থ যুবক। فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ--এর শাব্দিক অর্থ কর্ণকুহর বন্ধ করে দেওয়া। অচেতন নিদ্রাকে এই ভাষায় ব্যক্ত করা হয়। কেননা, নিদ্রায় সর্বপ্রথম চক্ষু বন্ধ হয়, কিন্তু কান সক্রিয় থাকে। আওয়াজ শোনা যায়। অতঃপর যখন নিদ্রা পরিপূর্ণ ও প্রবল হয়ে যায়, তখন কানও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। জাগরণের সময় সর্বপ্রথম কান সক্রিয় হয়। আওয়াজের কারণে নিদ্রিত ব্যক্তি সচকিত হয়, অতঃপর জাগ্রত হয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি এ ধারণা করেন যে, আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রকীম (এদু'টি একই দলের উপাধি) আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর নিদর্শন ছিল? [যেমন ইহুদীরা বলেছিল যে, তাদের ঘটনা আশ্চর্যজনক অথবা স্বয়ং প্রশ্নকারী কোরায়েশরা একে আশ্চর্যজনক মনে করে প্রশ্ন করেছিল। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে অন্য লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এ ঘটনাটি যদিও আশ্চর্যজনক, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার অন্যান্য আশ্চর্য বস্তুর মুকাবিলায় এতটুকু আশ্চার্যজনক নয়, যতটুকু তারা মনে করেছে। কেননা, যমীন, আসমান, চন্দ্র ও সমগ্র সৃষ্টজগতকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করাটা আসল আশ্চর্যজনক ব্যাপার। কয়েকজন যুবকের দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রিত থাকা, অতঃপর জাগ্রত হওয়া তার মুকাবিলায় মোটেই আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। এই ভূমিকার পর আসহাবে কাহ্ফের কাহিনী এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ] ঐ সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন যুবকরা (তৎকালীন বে-দ্বীন বাদশাহের কবল থেকে পলায়ন করে) গুহায় (যার কাহিনী পরে বর্ণিত হবে) আশ্রয় গ্রহণ করে। অতঃপর (আল্লাহ্র কাছে এভাবে দোয়া করে যে,) তারা বলে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের (এ) কাজকে সঠিক করুন। (সম্ভবত রহমত বলে উদ্দেশ্য সাধন এবং সঠিক করা বলে উদ্দেশ্য সাধনে জরুরী উপকরণাদি বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দোয়া কবুল করেন এবং তাদের হিফাযত ও সকল প্রকার পেরেশানী থেকে মুক্তির উপায় এভাবে বর্ণনা করেন যে,) আমি গুহায় কয়েক বছরের জন্য তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেই। অতঃপর আমি তাদেরকে (নিদ্রা থেকে) পুনরুত্থিত করি (বাহ্যিকভাবেও) একথা জানার জন্য যে, (গর্তে অবস্থানকাল সম্পর্কে মতভেদকারীদের মধ্য থেকে) কোন দল তাদের অবস্থানের সময় সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিল। (নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তাদের একদলের বক্তব্য ছিল এই যে, আমরা পূর্ণ একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ ঘুমিয়েছি। অপর দল বলল ঃ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন যে, তোমরা কতদিন ঘুমিয়েছ। আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে যে দ্বিতীয় দলই অধিক জ্ঞাত ছিল। তারা সময় নির্ধারণের ব্যাপারটি আল্লাহ্র উপরই ছেড়ে দেয়। কারণ, এর কোন প্রমাণ তাদের কাছে ছিল না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আসহাবে কাহ্ফ ও রকীমের কাহিনী ঃ এ কাহিনীতে কয়েকটি আলোচ্য বিষয় আছে। এক, 'আসহাবে কাহ্ফ' ও 'আসহাবে রকীম' একই দলের দুই নাম, না তারা আলাদা দু'টি দল? যদিও কোন সহীহ্ হাদীসে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই, কিন্তু ইমাম বুখারী 'সহীহ্' নামক গ্রন্থে আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রকীমের দু'টি আলাদা আলাদা শিরোনাম রেখেছেন। অতঃপর আসহাবে রকীম শিরোনামের অধীনে তিন ব্যক্তির গুহায় আটকে পড়া, তৎপর দোয়ার মাধ্যমে রাস্তা খুলে যাওয়ার প্রসিদ্ধ কাহিনীটি উল্লেখ করেছেন, যা সব হাদীস গ্রন্থেই বিস্তারিতভাবে বিদ্যমান আছে। ইমাম

বোখারীর এ কাজ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর মতে আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রকীম পৃথক পৃথক দু'টি দল এবং আসহাবে রকীম ঐ তিন ব্যক্তিকে বলা হয়েছে, যারা কোন সময় পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করেছিল। এরপর পাহাড়ের একটি বিরাট পাথর গুহার মুখে পড়ে যাওয়ায় গুহা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের বের হওয়ার পথ থাকে না। আটক ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সৎকাজের ওসীলা দিয়ে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করে যে, যদি আমরা এ কাজটি খাঁটিভাবে আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাবে নিজ কৃপায় আমাদের পথ খুলে দিন। প্রথম ব্যক্তির দোয়ায় পাথর কিছুটা সরে যায়। ফলে ভিতরে আলো আসতে থাকে। দ্বিতীয় ব্যক্তির দোয়ায় আরও একটু সরে যায় এবং তৃতীয় ব্যক্তির দোয়ায় রাস্তা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু হাফেয ইবনে হাজার (রহ) বুখারীর টীকায় বলেছেন যে, উপরোক্ত তিন ব্যক্তির নাম আসহাবে রকীম, হাদীসদৃষ্টে এর কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। ব্যাপার এতটুকু যে, গুহার ঘটনার বর্ণনাকারী নো'মান ইবনে বশীরের রেওয়ায়েতে কোন কোন রাবী এই কথাগুলো সংযুক্ত করেছেনঃ নো'মান ইবনে বশীর বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রকীমের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। এই অতিরিক্ত কথাগুলো ফতহল বারীতে বাযযার ও তাবারানীর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু প্রথমত সিহাহ্ সিত্তা ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এই হাদীসের সাধারণ রাবীদের যেসব রেওয়ায়েত বিদ্যমান আছে, সেগুলোতে কেউ নো'মান ইবনে বশীরের উপরোক্ত বাক্য উদ্ধৃত করেননি। স্বয়ং বুখারীর রেওয়ায়েতও এই বাক্য থেকে মুক্ত। দ্বিতীয়ত এই বাক্যেও এ কথার উল্লেখ নেই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তিকে আসহাবে রকীম বলেছিলেন। বরং বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) রকীমের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। এবং এ প্রসঙ্গে তিন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছিলেন। রকীমের অর্থ সম্পর্কে সাহাবী, তাবেয়ী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদদের মধ্যে যে মতবিরোধ উপরে বর্ণিত হয়েছে এটাই তার প্রমাণ যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে রকীমের অর্থ নির্ধারণ সম্পর্কে কোন হাদীস ছিল না। নতুবা রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন অর্থ নির্দিষ্ট করে দিলে সাহাবী, তাবেয়ী ও অন্যান্য তফসীরবিদ এর বিপরীতে অন্য কোন অর্থ নেবেন—এটা কিরূপে সম্ভবপর ছিল? এ কারণেই বুখারীর টীকাকার হাফেয ইবনে হাজার আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রকীমের দু'টি আলাদা আলাদা দল হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে একই দলের দুই নাম হওয়াই ঠিক। রকীমের আলোচনার সাথে সাথে গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তির আলোচনা এসে গেছে। এ থেকে জরুরী হয় না যে, এই তিন ব্যক্তিই আসহাবে রকীম ছিল।

এস্থলে হাফেয ইবনে হাজার একথাও প্রকাশ করেছেন যে, আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনা স্বয়ং ব্যক্ত করছে যে, আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রকীম একই দল। এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, তাঁরা একই দল।

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে স্বয়ং এ কাহিনীর বিবরণ। এর দু'টি অংশ আছে। এক, এ কাহিনীর প্রাণ ও আসল উদ্দেশ্য, যদ্দ্বারা ইহুদীদের প্রশ্নের জওয়াব হয়ে যায়

এবং মুসলমানদের জন্য হিদায়েত ও উপদেশ। দ্বিতীয় অংশের সম্পর্ক শুধু এ কাহিনীর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পটভূমিকার সাথে। আসল উদ্দেশ্য বর্ণনায় এর বিশেষ কোন প্রভাব নেই। উদাহরণত ঘটনাটি কোন কালে এবং কোন শহরে ও জনপদে সংঘটিত হয় যে, কাফির বাদশাহ্র কাছ থেকে পলায়ন করে তাঁরা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, সে কে ছিল? তার ধর্ম বিশ্বাস ও চিন্তাধারা কি ছিল? সে তাঁদের সাথে কি ব্যবহার করেছিল, যদ্দারুন তাঁরা পলায়ন করতে ও গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন? তাঁদের সংখ্যা কত ছিল? তাঁরা কতকাল ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন? তাঁরা এখনও জীবিত আছেন, না মরে গেছেন?

কোরআন পাক স্বীয় বিজ্ঞজনোচিত মূলনীতি ও বিশেষ বর্ণনা পদ্ধতি অনুযায়ী সমগ্র কোরআনে একটি মাত্র কাহিনী তথা ইউসুফ-কাহিনী ব্যতীত কোন কাহিনী সাধারণ ঐতিহাসিক গ্রন্থাদির অনুরূপ পূর্ণ বিবরণ ও ক্রমসহকারে বর্ণনা করেনি; বরং প্রত্যেক কাহিনীর শুধু ঐ অংশ স্থানে স্থানে বর্ণনা করেছে, যা মানবীয় হিদায়েত ও শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত। (ইউসুফ-কাহিনীকে এ পদ্ধতির বাইরে রাখার কারণ সূরা ইউসুফের তফসীরে বর্ণিত হয়েছে।)

আসহাবে কাহ্ফের কাহিনীতেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কোরআন বর্ণিত অংশগুলোর এর আসল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অবশিষ্ট যেসব অংশ নিরেট ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক, সেগুলো উল্লেখ করা হয়নি। আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা ও ঘুমের সময়কাল সম্পর্কিত প্রশ্নও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং জওয়াবের প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে এ নির্দেশও প্রদত্ত হয়েছে যে, এ জাতীয় প্রসঙ্গে বেশি চিন্তা-ভাবনা ও তর্ক-বিতর্ক করা সমীচীন নয়। এগুলো আল্লাহ্র উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত।

কোরআনের শিক্ষা বর্ণনা করা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অভীষ্ট কর্তব্য ছিল। উপরোক্ত কারণে তিনিও কাহিনীর এসব অংশ বর্ণনা করেননি। প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ীগণ কোরআনী বর্ণনা-পদ্ধতি অনুযায়ীই এ ধরনের ব্যাপারে নিম্নোক্ত কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন: ابهموا ما ابهمه الله অর্থাৎ, যেসব বিষয়কে আল্লাহ্ তা'আলা অস্পষ্ট রেখেছেন, সেগুলোকে তোমরাও অস্পষ্ট থাকতে দাও। (কারণ এতে আলোচনা ও গবেষণা উপকারী নয়।)—(ইতকান, সুয়ূতী)

প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ীগণের এই কর্মপন্থার তাগিদ অনুযায়ী এই তফসীরেও কাহিনীর ঐসব অংশ বাদ দেওয়া উচিত ছিল, যেগুলো কোরআন ও হাদীস বাদ দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কারকেই সর্ববৃহৎ কৃতিত্ব মনে করা হয়। পরবর্তী যুগের তফসীরবিদগণ এ জন্যই তাঁদের গ্রন্থে কম-বেশি এসব অংশও বর্ণনা করেছেন। তাই আলোচ্য তফসীরে কাহিনীর যেসব অংশ স্বয়ং কোরআনে উল্লিখিত আছে, সেগুলো তো আয়াতের তফসীরের অধীনে বর্ণিত হবেই, এছাড়া অবশিষ্ট ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অংশও প্রয়োজন অনুসারে বর্ণনা করা হচ্ছে। বর্ণনা করার

পরও সর্বশেষ ফলাফল এটাই হবে যে, এ ধরনের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করা অসম্ভব। কেননা, ইসলাম ও খৃস্টীয় ঐতিহাসে এ সম্পর্কে যা কিছু লিখিত আছে, সেগুলো এত বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী যে, একজন গ্রন্থকার যদি স্বীয় গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ইঙ্গিতের সাহায্যে কোন একদিক নির্দিষ্ট করেন, তবে অন্য জন এমনিভাবে অন্য দিককে অগ্রাধিকার দান করেন।

দীনের হিফাযতের জন্য গুহায় আশ্রয় গ্রহণের ঘটনা বিভিন্ন শহর ও ভূখণ্ডে অনেক সংঘটিত হয়েছে ঃ ইতিহাসবিদদের মতভেদের একটি বড় কারণ এই যে, খৃস্টধর্মে বৈরাগ্যকে ধর্মের সর্বপ্রধান অঙ্গ মনে করে নেওয়া হয়েছিল। ফলে প্রত্যেক ভূখণ্ড ও প্রত্যেক দেশেই এ ধরনের ঘটনাবলী এত বেশি সংঘটিত হয়েছে যে, কিছু সংকখ্যক লোক আল্লাহর ইবাদতের জন্য গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে সারা জীবন সেখানেই কাটিয়ে দিয়েছেন। এখন যেখানে যেখানে এমন কোন ঘটনা ঘটেছে, সেখানেই আসহাবে কাহ্‌ফের ধারণা হওয়া ইতিহাসবিদদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

আসহাবে কাহ্‌ফের স্থান ও কাল ঃ তফসীরবিদ কুরতুবী আন্দালুসী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এস্থলে কিছু শ্রুত ও কতিপয় চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন শহরের সাথে ঘটনাগুলো সম্পর্কযুক্ত। কুরতুবী সর্বপ্রথম যাহহাকের রিওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, রকীম রোমের একটি শহরের নাম। এর একটি গুহায় একুশ জন লোক শায়িত আছে। মনে হয় তারা যেন ঘুমিয়ে আছে। এরপর তফসীরবিদ ইবনে আতিয়্যা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি অনেক লোকের মুখে শুনেছি, সিরিয়ার একটি গুহায় কিছুসংখ্যক মৃতদেহ আছে। সেখানকার পাণ্ডারা বলে যে, এরাই আসহাবে কাহ্‌ফ। গুহার নিকটে একটি মসজিদ ও একটি গৃহও নির্মিত আছে ঃ একে রকীম বলা হয়। মৃতদেহগুলোর সাথে একটি মৃত কুকুরের কংকালও বিদ্যমান।

দ্বিতীয় ঘটনা আন্দালুস গার্নাতার (স্পেনের গ্রানাডা)। ইবনে আতিয়্যা বলেন ঃ গার্নাতায় 'লাওশা' নামক গ্রামের অদূরে একটি গুহা আছে। একে রকীম বলা হয়। এই গুহায় কয়েকটি মৃতদেহ এবং তাদের সাথে একটি মৃত কুকুরের কংকালও বিদ্যামন আছে। অধিকাংশ মৃতদেহ মাংসবিহীন শুধু অস্থি কংকাল এবং কিছু সংখ্যক মৃতদেহে এখনও মাংস আছে। এভাবে বহু শতাব্দী অতিক্রম হয়েছে, কিন্তু বিশুদ্ধ উপায়ে তাদের কোন অবস্থা জানা যায় না। কিছুসংখ্যক লোক বলে যে, এরাই আসহাবে কাহ্‌ফ। ইবনে আতিয়্যা বলেন ঃ এই সংবাদ শুনে আমি ৫০৪ হিজরীতে সেখানে পৌঁছে দেখি, বাস্তবিকই মৃতদেহগুলো তেমনি অবস্থায়ই পড়ে রয়েছে। তাদের নিকটবর্তী স্থানে একটি মসজিদ ও রোমীয় যুগের একটি গৃহ আছে, যাকে রকীম বলা হয়। মনে হয়, প্রাচীনকালে এটা বিরাট রাজপ্রাসাদ ছিল। তখনও এর কোন কোন প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিল। এটা একটা জনশূন্য জঙ্গলে অবস্থিত ছিল। তিনি আরও বলেন ঃ গার্নাতার উপরিভাগে একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। শহরটি রোমীয় স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। শহরের নাম 'রাকিউস' বলা হয়। আমি এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক আশ্চর্য বস্তু এবং কবর দেখেছি। আন্দালুসের অধিবাসী হয়েও কুরতুবী

এসব ঘটনা বর্ণনা করার পরও এদের কোন একটিকেও আসহাবে কাহ্ফ বলতে অপ্রস্তুত। ইবনে আতিয়্যাও চাক্ষুষ দেখা সত্ত্বেও দৃঢ়তার সাথে একথা বলেন না যে, এরাই আসহাবে কাহ্ফ। তাঁরা সাধারণ জনশ্রুতি বর্ণনা করেছেন মাত্র। অপর একজন আন্দালুসী তফসীরবিদ আবূ হাইয়্যান সপ্তম শতাব্দীতে (৬৫৪ হিজরীতে) গার্নাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই বসবাস করেন। তিনিও তফসীর বাহ্‌রে-মুহীতে গার্নাতার এই গুহার প্রসঙ্গ কুরতুবীর ন্যায়ই উল্লেখ করেছেন। তিনিও ইবনে আতিয়্যার চাক্ষুষ দেখার কথা বর্ণনা করার পর লিখেছেন : আমি যখন আন্দালুসে (অর্থাৎ কায়রোতে পুনর্বাসিত হওয়ার পূর্বে) ছিলাম, তখন অনেক মানুষ এই গুহাটি দেখার জন্য গমন করত। তারা বলত যে, যদিও মৃতদেহগুলো এখন পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে এবং দর্শকরা এগুলো গণনাও করে, কিন্তু সর্বদাই তারা সংখ্যা বর্ণনায় ভুল করে। তিনি আরও লিখেছেন : ইবনে আতিয়্যা যে রাক্বিউস শহরের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি গার্নাতার কেবলার দিকে অবস্থিত। আমি নিজে এই শহরে বহুবার গিয়েছি এবং তাতে বিরাট বিরাট অসাধারণ পাথর দেখতে পেয়েছি। অতঃপর আবূ হাইয়্যান লিখেছেন :

ويترجح كون اهل الكهف با لاندلس لكثرة دين النصارى بها حتى هي بلاد مملكتهم العظمى .

অর্থাৎ যে কারণে আসহাবে কাহ্ফের আন্দালুসে অবস্থিত হওয়া সম্পর্কে প্রবল ধারণা জন্মে, তা এই যে, সেখানে খৃস্টধর্মের চর্চা প্রবল! এমনকি, এটাই তাদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় কেন্দ্র। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আবূ হাইয়্যানের মতে আসহাবে কাহ্ফের আন্দালুসে অবস্থিত হওয়াই অগ্রগণ্য।—(তফসীর কুরতুবী, নবম খণ্ড, ৩৫৬ পৃঃ)

তফসীরবিদ ইবনে জরীর ও ইবনে আবী হাতেম উভয়েই আউফীর রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রকীম একটি উপত্যকার নাম, যা ফিলিস্তীনের পাদদেশে আয়লার (আকাবা) অদূরে অবস্থিত। ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম এবং আরও কয়েকজন হাদীসবিদ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : রকীম কি, আমার জানা নেই, কিন্তু কা'ব আহবারকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন যে, রকীম ঐ জনপদকে বলা হয়, যাতে আসহাব কাহ্ফ গুহায় আশ্রয় গ্রহণের পূর্বে বসবাস করত।—(রূহুল-মা'আনী)

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাসের উক্তি বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে রোমীয়দের মুকাবেলায় একটি জিহাদে অংশগ্রহণ করি, যাকে 'গাযওয়াতুল মুযীক' বলা হয়। এ সময় আমরা কোরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফের গুহার নিকট উপস্থিত হই। হযরত মুয়াবিয়া গুহার ভিতরে প্রবেশ করে আসহাবে কাহ্ফের মৃতদেহগুলো প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস বাধা দিয়ে বললেন : এরূপ করা ঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কেও তাঁদের মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি তো আপনার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনে বলেছেন :

অর্থাৎ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

আপনি তাদেরকে দেখলে পলায়ন করবেন এবং ভয়-ভীতিতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আব্বাসের বাধা মানলেন না। সম্ভবত এ কারণে যে, কোরআনে তাঁদের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, সেটা তাঁদের জীবদ্দশায় ছিল। এখনও তাঁদের সে অবস্থা থাকা জরুরী নয়। হযরত মুয়াবিয়া কয়েকজন লোককে দেখার জন্য প্রেরণ করলেন। তারা গুহায় পেঁৗছে যখন ভিতরে প্রবেশ করতে চাইল, তখন একটি দমকা হাওয়া এসে তাদেরকে গুহা থেকে বের করে দিল।—(রূহুল-মা'আনী ৫ম খণ্ড, ২২৭)

তফসীরবিদদের উল্লিখিত রেওয়ায়েত ও উক্তি মোটামুটিভাবে আসহাবে কাহ্ফের তিনটি স্থান নির্দেশ করে। এক. পারস্য উপসাগরের উপকূলীয় শহর আকাবার (আয়লা) নিকটবর্তী স্থান। হযরত ইবনে আব্বাসের অধিকাংশ রেওয়ায়েত এরই সমর্থন করে।

দুই. ইবনে আতিয়্যার দেখা ও আবূ হাইয়্যানের সমর্থন দ্বারা এ ধারণা প্রবল হয় যে, এই গুহাটি গার্নাতা আন্দালুসে অবস্থিত। এ দু'টি স্থানের মধ্য থেকে আকাবার একটি শহর অথবা কোন বিশেষ দালান-কোঠার নাম রকীম হওয়াও বর্ণিত আছে। এমনিভাবে গার্নাতায় গুহা সংলগ্ন বিরাট ভগ্ন প্রাচীরের নাম রকীম বলা হয়েছে। উপরোক্ত উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে কেউই এরূপ অকাট্য ফয়সালা গ্রহণ করেননি যে, এটাই আসহাবে কাহ্ফের গুহা। বরং উভয় প্রকার রেওয়ায়েত স্থানীয় জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীর উপর ভিত্তিশীল।

তিন. কুরতুবী, আবূ হাইয়্যান, ইবনে জরীর ইত্যাদি প্রায় সকল তফসীর গ্রন্থের রেওয়ায়েতে আসহাবে কাহ্ফ যে শহরে বাস করতেন, তার প্রাচীন নাম 'আফসূস' এবং ইসলামী নাম 'তরসূস' বলা হয়েছে। এ শহরটি যে এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত, এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদদের মধ্যে দ্বিমত নেই। এতে বোঝা যায় যে, এ গুহাটিও এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। কাজেই এর কোন একটিকে অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ এবং বাকীগুলোকে ভ্রান্ত বলার কোন প্রমাণ নেই। তিনটি স্থানেরই সমান সম্ভাবনা রয়েছে। বরং এ সম্ভাবনাও কেউ নাকচ করতে পারে না যে, এসব গুহার ঘটনাবলী নির্ভুল হওয়া সত্ত্বেও এগুলো কোরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফের গুহা নাও হতে পারে এবং সে গুহাটি অন্য কোথাও অবস্থিত থাকতে পারে। আর এটাও জরুরী নয় যে, এখানে রকীম কোন শহর অথবা প্রাচীরেরই নাম হবে, বরং এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, রকীম ঐ ফলকের নাম, যার মধ্যে কোন বাদশাহ্ আসহাবে কাহ্ফের নাম খোদিত করে গুহার মুখে টাঙিয়ে রেখেছিল।

আধুনিক ইতিহাসবিদদের গবেষণা ঃ আধুনিক যুগের কোন কোন ইতিহাসবিদ ও আলিম খৃস্টান ইতিহাস এবং ইউরোপীয় ইতিহাসের সাহায্যে আসহাবে কাহ্ফের গুহার স্থান ও কাল নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট আলোচনা ও গবেষণা করেছেন।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ আয়লার (আকাবা) নিকটবর্তী বর্তমান শহর পাট্রাকে প্রাচীন শহর রকীম সাব্যস্ত করেছেন। আরব ইতিহাসবিদরা এর নাম লেখেন 'বাত্রা'। তিনি বর্তমান ইতিহাস থেকে এর নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে গুহার চিহ্নও বর্ণনা করেছেন, যার সাথে মসজিদ নির্মাণের লক্ষণাদিও দেখা যায়। এর সমর্থনে তিনি লিখেছেন ঃ বাইবেলের ইশীয় গ্রন্থের অধ্যায় ১৮, আয়াত ২৭-এ যে জায়গাকে 'রকম' অথবা 'রাকেম' বলা হয়েছে, একেই বর্তমানে পাট্রা বলা হয়। কিন্তু এ বর্ণনায় সন্দেহ করা হয়েছে যে, ইশীয় গ্রন্থে বনী ইবনে ইয়ামীনের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পর্কে যে 'রকম' অথবা 'রাকেমের' উল্লেখ আছে, সেটা জর্দান নদী ও লূত সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এখানে পাট্রা শহর অবস্থিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এজন্য বর্তমান যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা এ বর্ণনা মেনে নিতে ঘোর আপত্তি করেছেন যে, পাট্রা ও রাকেম একই শহর। (এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, মুদ্রণ ১৯৪৬, সপ্তদশ খণ্ড ৬৫৮ পৃঃ)

অধিকাংশ তফসীরবিদ 'আফসূস' নগরীকে আসহাবে কাহ্ফের স্থান সাব্যস্ত করেছেন। এটি এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত রোমকদের সর্ববৃহৎ নগরী ছিল। এর ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান তুরস্কের ইজমীর (স্মার্ণা) শহর থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল দক্ষিণে পাওয়া যায়।

হযরত মওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভীও 'আরদুল কোরআন' গ্রন্থে পাট্রা শহরের নাম উল্লেখ করে বন্ধনীর ভেতরে রকীম লিখেছেন। কিন্তু এর কোন প্রমাণ তিনি পেশ করেননি যে, পাট্রা শহরের পুরোনো নাম রকীম ছিল। মওলানা হিফযুর রহমান 'কাসাসুল কোরআনে' একেই গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রমাণস্বরূপ তাওরাত ও 'সহীফা ইয়ার' বরাত দিয়ে পাট্রা শহরের নাম রাকেমা বর্ণনা করেছেন।—(দায়েরাতুল মাআরিফ, আরব থেকে গৃহীত)

জর্দানে আম্মানের নিকটবর্তী এক শ্মাশানভূমিতে একটি গুহার সন্ধান পাওয়া গেলে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৬৩ ইং সনে সে স্থানটি খননের কাজ আরম্ভ করে। মাটি ও প্রস্তর সরানোর পর অস্থি ও প্রস্তরে পূর্ণ ছয়টি শবাধার ও দু'টি সমাধি আবিষ্কৃত হয়। গুহার দক্ষিণ দিকে পাথরে খোদিত বাইজেন্টিনীয় ভাষায় লিখিত কিছু নকশাও আবিষ্কৃত হয়। স্থানীয় লোকদের ধারণা এই যে, এ স্থানটিই রকীম এবং এর পাশে আসহাবে কাহ্ফের এই গুহা।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ) বয়ানুল-কোরআনে তফসীরে হক্কানীর বরাত দিয়ে আসহাবে কাহ্ফের স্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধৃত করে লেখেন ঃ যে অত্যাচারী বাদশাহ্র ভয়ে পালিয়ে গিয়ে আসহাবে কাহ্ফ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার সময়কাল ছিল ২৫০ খৃস্টাব্দ। এরপর তিন শ বছর পর্যন্ত তাঁরা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকেন। ফলে ৫৫০ খৃস্টাব্দে তাঁদের জাগ্রত হওয়ার ঘটনা ঘটে। রসূলুল্লাহ্ (সা) ৫৭০ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্মের ২০ বছর পূর্ব আসহাবে কাহ্ফ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হন। তফসীরে-হক্কানীতেও তাঁদের স্থান 'আফসূস' অথবা 'তরতূস'

শহর সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। বর্তমানেও এর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে। والله اعلم بحقيقة الحال

এসব ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য, প্রাচীন তফসীরবিদগণের রেওয়ায়েত ও আধুনিক ইতিহাসবিদদের বর্ণনা থেকে পেশ করা হল। আমি পূর্বেই আরয করেছিলাম যে, কোরআনের কোন আয়াত বোঝা এসব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয় এবং যে উদ্দেশ্যে কোরআন এ কাহিনী বর্ণনা করেছে, তার কোন জরুরী অংশ এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত নয়। রেওয়ায়েত ও বর্ণনা এবং এগুলোর ইঙ্গিতাদিও এত বিভিন্নমুখী যে, সমগ্র গবেষণা এবং অধ্যবসায়ের পরও কোনরূপ চূড়ান্ত ফয়সালা সম্ভবপর নয়, কিন্তু আজকাল শিক্ষিত মহলে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি যে অসাধারণ ঝোঁক পরিদৃষ্ট হয়, তার পরিতৃপ্তির জন্য এসব তথ্য উদ্ধৃত করা হল। এগুলো থেকে আনুমানিকভাবে এতটুকু জানা যায় যে, এ ঘটনাটি হযরত ঈসা (আ)-এর পর এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যমানার কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত হয়। অধিকাংশ রেওয়ায়েত এ বিষয়ে একমত। দেখা যায় যে, ঘটনাটি আফসূস অথবা তরতূস শহরের নিকটে ঘটেছে। والله اعلم সত্য এই যে, এসব গবেষণার পরও আমরা সেখানেই দণ্ডায়মান আছি, যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিলাম, অর্থাৎ স্থান নির্ধারণের না কোন প্রয়োজন আছে এবং না কোন নিশ্চিত উপায়ে এটা করা সম্ভব। তফসীরবিদ ইবনে-কাসীর এ কথাই বলেছেন ঃ

قد اخبرنا الله تعالى بذالك واراد منا فهمه وتدبره ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف فى اى البلاد من الارض اذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعى -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে আসহাবে কাহফের কোরআনে বর্ণিত অবস্থা-সমূহের সংবাদ দিয়েছেন, যাতে আমরা এগুলো বুঝি এবং চিন্তাভাবনা করি। তিনি এ বিষয়ের সংবাদ দেননি যে, গুহাটি কোন্ জায়গায় এবং কোন্ শহরে অবস্থিত। কারণ, এর মধ্যে আমাদের কোন উপকার নিহিত নেই এবং শরীয়তের কোন উদ্দেশ্যও এর সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়—(ইবনে-কাসীর, ৩য় খণ্ড ৭৫ পৃঃ)

আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা কখন ঘটে এবং গুহায় আশ্রয় নেয়ার কারণ কি ছিল? কাহিনীর এ অংশের উপরও কোরআনের কোন আয়াত বোঝা মওকুফ নয় এবং কাহিনীর উদ্দেশ্যের উপরও এর বিশেষ কোন প্রভাব নেই। তাই কোরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে কোন বর্ণনা নেই। এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বর্ণনাই একমাত্র সম্বল। এ কারণেই আবূ হাইয়্যান তফসীর বাহরে-মুহীতে বলেন ঃ

والرواة مختلفون فى قصصهم وكيف كان اجتماعهم وخروجهم ولم يات فى الحديث الصحيح كيفية ذالك ولا فى القران

তাদের কাহিনী সম্পর্কে বর্ণনাকারীদের মধ্যে বিস্তর মতবিরোধ রয়েছে। এ ব্যাপারেও মতানৈক্য আছে যে, তারা কিভাবে সর্বসম্মত কর্মপন্থা গ্রহণ করল এবং কিভাবে বের হল? কোন সহীহ্ হাদীসে এসব অবস্থা বর্ণিত হয়নি এবং কোরআনেও না।—(বাহ্‌রে-মুহীত ষষ্ঠ খণ্ড, ১০১ পৃঃ)

সবার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য উপরে যেমন আসহাবে কাহ্‌ফের স্থান সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে, তেমনি তাদের কাল এবং ঘটনার কারণ সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত তথ্য তফসীর ও ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত থেকে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে, কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহ) তফসীরে মাযহারীতে এ কাহিনীটি বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এখানে শুধু ঐ সংক্ষিপ্ত ঘটনাই লেখা হচ্ছে, যা ইবনে-কাসীর অনেক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তফসীরবিদদের বরাত দিয়ে পেশ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

আসহাবে কাহ্‌ফ রাজ বংশের সন্তান এবং কওমের সরদার ছিলেন। কওম মূর্তি-পূজারি ছিল। শহরের বাইরে তাদের একটি বার্ষিক মেলা বসত। সেখানে তারা প্রতিমা পূজা করত এবং জন্তু-জানোয়ার কোরবানি দিত। দাকিয়ানুস নামে তাদের একজন অত্যাচারী বাদশাহ্ ছিল। সে কওমকে মূর্তিপূজায় বাধ্য করত। একবার যখন সমগ্র জাতি মেলায় সমবেত হল, তখন আসহাবে কাহ্‌ফের যুবকরাও সেখানে উপস্থিত হল। তারা কওমকে নিজেদের গড়া মূর্তিকে খোদা মনে করতে, তাদের ইবাদত করতে এবং তাদের জন্য কোরবানী করতে দেখল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দান করলেন। ফলে কওমের নির্বোধসুলভ কাণ্ডকারখানার প্রতি তাদের ঘৃণা দেখা দিল। তারা বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে বুঝে ফেললেন যে, এই ইবাদত একমাত্র সে সত্তার জন্য হওয়া উচিত, যিনি আসমান, যমীন ও সমগ্র জগত সৃষ্টি করেছেন। এই ধারণা একই সময়ে যুবকদের মনে জাগ্রত হল এবং তাদের প্রত্যেকেই কওমের নির্বোধসুলভ ইবাদত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সেখান থেকে প্রস্থান করতে লাগলেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম একজন যুবক সমাবেশ থেকে দূরে একটি বৃক্ষের নিচে গিয়ে বসে পড়ল। এরপর দ্বিতীয় একজন এল এবং সেও সে বৃক্ষের নিচে বসে পড়ল। এমনিভাবে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ব্যক্তি আসতে লাগল এবং বৃক্ষের নিচে বসতে লাগল। কিন্তু তাদের একজন অপরজনকে চিনত না এবং এখানে আসার উদ্দেশ্যও জানত না। প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে এখানে সে শক্তি একত্রিত করেছিল, যা তাদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করেছিল।

জাতীয়তা সংঘবদ্ধতার আসল ভিত্তি ঃ এই বর্ণনার পর ইবনে-কাসীর বলেন ঃ মানুষ জাতীয়তাবাদকে পারস্পরিক সংঘবদ্ধতার কারণ মনে করে। কিন্তু প্রকৃত সত্য সহীহ্ বুখারীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ঐক্য ও অনৈক্য প্রথমে আত্মাসমূহের মধ্যে সৃষ্টি হয়। এর প্রতিক্রিয়া এ জগতের দেহে প্রতিফলিত হয়। আদিকালে যেসব আত্মার মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য পয়দা হয়েছে, তারা এ জগতেও পরস্পরে গ্রথিত ও এক দলে পরিণত হয় এবং যাদের মধ্যে এই সম্প্রীতি ও পারস্পরিক ঐক্য না থাকে, বরং সেখানে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, তাহলে তাদের মধ্যে এখানেও বিচ্ছিন্নতা থাকবে। আলোচ্য

ঘটনাই এর দৃষ্টান্ত। কিভাবে পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির মনে একই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে ! এ ধারণাই তাদের সবাইকে অজান্তে এক জায়গায় একত্র করে দিয়েছে।

মোটকথা, তারা এক জায়গায় একত্রিত হয়ে গেলেও প্রত্যেকেই নিজের বিশ্বাসকে অপরের কাছ থেকে গোপন করছিল। কারণ, সে যদি বাদশাহ্‌র কানে খবর পৌঁছে দেয়, তবে আর রক্ষা নেই —গ্রেফতার হতে হবে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর এক ব্যক্তি বলল ঃ ভাই, আমরা সবাই যে কওমের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে পৌঁছেছি এর কোন কারণ তো অবশ্যই আছে। কাজেই আমাদের একে অপরের ধারণা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যাওয়াই সমীচীন। এতে এক ব্যক্তি বলে উঠল ঃ সত্য বলতে কি, আমি আমার কওমকে যে ধর্ম ও যে ইবাদতে লিপ্ত পেয়েছি, আমার বিশ্বাস, তা সম্পূর্ণ বাতিল। ইবাদত তো একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলারই হওয়া উচিত, জগত সৃষ্টিতে যাঁর কোন অংশীদার নেই। একথা শুনে অন্যেরাও সুযোগ পেয়ে গেল। তাদের প্রত্যেকেই স্বীকার করল যে, এ বিশ্বাসই তাদেরকে কওমের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এখানে পৌঁছে দিয়েছে।

এখানে এই সমমনা দলটি একে অপরের সঙ্গী ও বন্ধু হয়ে গেল। তারা পৃথকভাবে নিজেদের একটি উপাসনালয় নির্মাণ করল এবং একত্রিত হয়ে তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদত করতে লাগল।

কিন্তু আস্তে আস্তে তাদের কথা শহরে ছড়িয়ে পড়ল এবং গুপ্তচররা তাদের সংবাদ বাদশাহ্‌র কানে পৌঁছে দিল। বাদশাহ্‌ তাদেরকে দরবারে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলে তারা দরবারে হাজির হল। বাদশাহ্‌ তাদেরকে তাদের বিশ্বাস ও তরীকা সম্পর্কে প্রশ্ন করল। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে সাহস দান করলেন। তারা নির্ভয়ে তওহীদের বিশ্বাস ব্যক্ত করে দিল এবং স্বয়ং বাদশাহ্‌কেও এর প্রতি দাওয়াত দিল। কোরআনের আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ـ

আমি তাদের চিত্তকে দৃঢ় করে দিলাম, তারা যখন উত্থিত হলো। অতঃপর তারা বলল ঃ আমাদের পালনকর্তা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। আমরা কখনও তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করব না। করলে তা অত্যন্ত গর্হিত হবে।

তারা যখন নির্ভয়ে বাদশাহ্‌কে ঈমানের দাওয়াত দিল, তখন বাদশাহ্‌ অস্বীকার করল এবং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করল। অতঃপর তাদের দেহ থেকে রাজপুত্রের আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক খুলে নিল। বাদশাহ্‌ তাদেরকে চিন্তা-ভাবনার জন্য কিছু দিনের সময় দিয়ে বলল ঃ তোমরা যুবক। আমি তোমাদেরকে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি হত্যা করতে চাই না। এখনও যদি তোমরা স্বজাতির ধর্মে ফিরে আস, তবে তোমাদের মর্যাদা পুনর্বহাল করে দেওয়া হবে, নতুবা তোমাদেরকে হত্যা করা হবে।

মু'মিন বান্দাদের উপর এটা ছিল আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানী ও কৃপা। এ অবকাশ তাদের জন্য পলায়নের পথ খুলে দিল। তারা সেখান থেকে পলায়ন করে গুহায় আত্মগোপন করল।

তফসীরবিদদের সাধারণ রেওয়ায়েত মতে তারা খৃস্টধর্মের অনুসারী ছিল। ইবনে-কাসীর ও অন্যান্য তফসীরবিদ একথা উল্লেখ করেছেন। তবে ইবনে-কাসীর এ যুক্তির ভিত্তিতে এর সাথে একমত হননি যে, তারা খৃস্টধর্মের অনুসারী হলে মদীনার ইহুদীরা তাদের প্রতি শত্রুতাবশত তাদের ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করত না এবং তাদের কোন গুরুত্ব দিত না। কিন্তু এটা এমন কোন ভিত্তিই নয় যার কারণে সবগুলো রেওয়ায়েত নাকচ করে দেওয়া যেতে পারে। মদীনার ইহুদীরা শুধু একটি আশ্চর্য ঘটনা হওয়ার কারণেই এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল ; যেমন যুলকারনাইন সম্পর্কিত প্রশ্নও এ কারণেই ছিল। এ ধরনের প্রশ্নে খৃস্টত্ব ও ইহুদীত্বের সাম্প্রদায়িকতা মাঝখানে না আসাই সুস্পষ্ট।

তফসীর মাযহারীতে ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত দৃষ্টে তাদেরকে একত্ববাদী গণ্য করা হয়েছে। খৃস্টধর্ম বিলুপ্ত হওয়ার পর গুনাগুনতি যে কয়েকজন সত্যপন্থী জীবিত ছিল, তারা তাদেরই অন্যতম ছিল। তারা বিশুদ্ধ খৃস্টধর্ম এবং একত্ববাদে বিশ্বাস করত। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতেও অত্যাচারী বাদশাহ্র নাম দাকিয়ানূস উল্লেখ করা হয়েছে এবং গুহায় আত্মগোপনের পূর্বে যুবকরা যে শহরে বাস করত, তার নাম আফসূস বলা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতেও ঘটনাটি এমনিভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বাদশাহ্র নাম দাকিয়ানূস বলা হয়েছে। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, আসহাবে কাহ্ফের জাগ্রত হওয়ার সময় দেশের উপর যেসব খৃস্টধর্মের অনুসারী লোকের আধিপত্য কায়েম ছিল, তাদের বাদশাহ্র নাম ছিল বায়দুসীস।

সব রেওয়ায়েতদৃষ্টে প্রবল ধারণার পর্যায়ে একথা প্রমাণিত হয় যে, আসহাবে কাহ্ফ খৃস্টধর্মের অনুসারী ছিল। তাদের সময়কাল খৃস্টজন্মের পর এবং যে মুশরিক বাদশাহ্র কাছ থেকে তারা পলায়ন করেছিল, তার নাম ছিল দাকিয়ানূস। তিন শত নয় বছর পর জাগ্রত হওয়ার সময় যে ঈমানদার ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্র রাজত্ব ছিল, ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে তার নাম 'বায়দুসীস' বলা হয়েছে। এর সাথে বর্তমান যুগের ইতিহাস মিলিয়ে দেখলে আনুমানিকভাবে তাদের সময়কাল নির্দিষ্ট হতে পারে। এর বেশি নির্ণয়ের প্রয়োজনও নেই এবং এর উপায়ও নেই।

আসহাবে কাহ্ফ এখনও জীবিত আছে কি? এ সম্পর্কে এটাই বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট যে, তাদের ওফাত হয়ে গেছে। তফসীর মাযহারীতে ইবনে ইসহাকের বিস্তারিত রেওয়ায়েত রয়েছে যে, আসহাবে কাহ্ফের জাগরণ, শহরে আশ্চর্য ঘটনার জানাজানি এবং বাদশাহ্ বায়দুসীসের কাছে পেঁৗছে সাক্ষাতের পর আসহাবে কাহ্ফ বাদশাহ্র কাছে বিদায় প্রার্থনা করে। বিদায়ী সালামের সাথে তারা বাদশাহ্র জন্য দোয়া করে। বাদশাহ্র উপস্থিতিতেই তারা নিজেদের শয়নস্থলে গিয়ে শয়ন করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তখনই তাদেরকে মৃত্যুদান করেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি ইবনে-জরীর ও ইবনে-কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদ উল্লেখ করেছেন ঃ

قال قتادة غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة فمروا بكهف في بلاد الروم فرأوا فيه عظاما فقال قائل هذه عظام اهل الكهف فقال ابن عباس لقد بليت عظامهم من اكثر من ثلاث مأة سنة ـ

কাতাদাহ্ বলেন ঃ হযরত ইবনে আব্বাস হাবীব ইবনে মাসলামার সাথে এক জিহাদ করেন। রোম দেশে একটি গুহার কাছ দিয়ে যাবার সময় তাঁরা সেখানে মৃতলোকদের হাড় দেখতে পান। এক ব্যক্তি বলল ঃ এগুলো আসহাবে কাহ্ফের হাড়। হযরত ইবনে আব্বাস বললেন ঃ তাদের হাড় তো তিন শ বছর পূর্বে মৃত্তিকায় পর্যবসিত হয়ে গেছে।

কাহিনীর এসব অংশ কোরআনে নেই এবং হাদীসেও বর্ণিত হয়নি। ঘটনার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য অথবা কোরআনের কোন আয়াত বোঝাও এগুলোর উপর নির্ভরশীল নয়। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতদৃষ্টে এসব বিষয়ের কোন অকাট্য ফয়সালা করা সম্ভবপর নয়। কাহিনীর যেসব অংশ কোরআন স্বয়ং উল্লেখ করেছে, সেগুলোর বিবরণ আয়াতের নিম্নে উল্লেখ করা হবে।

এ পর্যন্ত কোরআন পাক সংক্ষেপে কাহিনী উল্লেখ করেছে। অতঃপর বিস্তারিত বর্ণনা আসছে।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ﴿۱۳﴾ وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا۠ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا ﴿۱۴﴾ هٰۤؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ بَيِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴿۱۵﴾ وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗۤا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ﴿۱۶﴾

(১৩) আপনার কাছে তাদের ইতিবৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। (১৪) আমি তাদের মন দৃঢ় করে-ছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়িয়েছিল। অতঃপর তারা বলল ঃ আমাদের পালনকর্তা আসমান ও যমীনের পালনকর্তা; আমরা কখনও তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করব না। যদি করি, তবে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে। (১৫) এরা আমা-দেরই স্বজাতি, এরা তাঁর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। তারা এদের সম্পর্কে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তার চাইতে অধিক গোনাহ্গার আর কে? (১৬) তোমরা যখন তাদের থেকে পৃথক হলে এবং তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি আপনার কাছে তাদের ঘটনা সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। (এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এর বিপরীতে যা কিছু দুনিয়াতে প্রসিদ্ধ রয়েছে, তা সঠিক নয়।) তারা (আসহাবে কাহ্ফ) ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি (সে যুগের খৃস্টধর্ম অনুযায়ী) বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের হিদায়েতে আরও উন্নতি দান করেছিলাম (অর্থাৎ ঈমানের গুণাবলী, দৃঢ়তা, বিপদাপদে সবর, সংসার বিমুখতা, পরকালের চিন্তা ইত্যাদিও দান করেছিলাম। ঈমানের গুণাবলীর মধ্যে একটি ছিল এই যে,) আমি তাদের চিত্ত মজবুত করেছিলাম যখন তারা দৃঢ় হয়ে (পরস্পরে কিংবা বিরুদ্ধবাদী বাদশাহ্র সামনা সামনি) বলতে লাগল ঃ আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। আমরা তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত করব না। (কেননা, খোদা না করুন, যদি এরূপ করি) তাহলে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে। এরা আমাদেরই স্বজাতি, তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে। (কেননা তাদের কওম ও সমসাময়িক বাদশাহ্ সবাই মূর্তিপূজারি ছিল।) অতএব তারা স্বীয় (উপাস্য হওয়া) সম্পর্কে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? (যেমন একত্ববাদীরা একত্ববাদ সম্পর্কে প্রকাশ্য ও নিশ্চিত প্রমাণের অধিকারী।) তার চাইতে অধিক দুষ্কর্মী আর কে হবে, যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রচনা করে (যে তাঁর কিছুসংখ্যক সমতুল্য ও অংশীদারও রয়েছে)? এবং (তারা পরস্পরে বলল ঃ) তোমরা যখন তাদের থেকে (বিশ্বাসেই) পৃথক হয়েছ এবং তাদের উপাস্যদের (ইবাদত) থেকেও (পৃথক হয়ে গেছ) কিন্তু আল্লাহ্ থেকে (পৃথক হয়নি, বরং তাঁর কারণে সবকিছু ত্যাগ করেছ) তখন (সমীচীন এই যে,) তোমরা (অমুক) গুহায় (যা পরামর্শক্রমে স্থির হয়ে থাকবে) আশ্রয় গ্রহণ কর (যাতে নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে আল্লাহ্র ইবাদত করতে পারে)। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি স্বীয় রহমত বিস্তার করবেন এবং তোমাদের

কাজকর্মে সাফল্যের ব্যবস্থা করে দেবেন। (আল্লাহ্র কাছ থেকে এই আশা নিয়ে) গুহায় যাওয়ার সময় তারা সর্বপ্রথম এই দোয়া করে :

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ○

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ — فَتًى-এর বহুবচন فِتْيَةٌ অর্থ যুবক। তফসীরবিদগণ লিখেছেন, এ শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, কর্ম সংশোধন, চরিত্র গঠন এবং হিদায়েত লাভের উপযুক্ত সময় হচ্ছে যৌবনকাল। বৃদ্ধ বয়সে পূর্ববর্তী কর্ম ও চরিত্র এত শক্তভাবে শেকড় গেড়ে বসে যে, যতই এর বিপরীত সত্য পরিস্ফুট হোক না কেন, তা থেকে বের হয়ে আসা দুরূহ হয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারী সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন যুবক।—(ইবনে-কাসীর, আবু হাইয়্যান)

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ইবনে-কাসীরের বরাত দিয়ে উপরে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের চিত্ত সুদৃঢ় করার ঘটনা তখন হয়েছে, যখন মূর্তিপূজারি অত্যাচারী বাদশাহ্ যুবকদেরকে দরবারে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এই জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে হত্যার আশংকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে স্বীয় মহব্বত, ভীতি ও মাহাত্ম্য এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন যে, এর মুকাবিলায় হত্যা, মৃত্যু ও সর্বপ্রকার বিপদাপদ সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে পরিষ্কারভাবে স্বীয় ধর্মবিশ্বাস ঘোষণা করে দেয় যে, তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত করে না—ভবিষ্যতেও করবে না। যারা আল্লাহ্র জন্য কোন কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের এ ধরনের সাহায্য হয়ে থাকে।

فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ—ইবনে-কাসীর বলেন : আসহাবে কাহ্ফের অবলম্বিত কর্মপন্থা ছিল এই যে, যে শহরে থেকে আল্লাহ্র ইবাদত করা যায় না, সে শহর পরিত্যাগ করে গুহায় আশ্রয় নেওয়া উচিত। এটাই সব পয়গম্বরের সুন্নত। তাঁরা এরূপ স্থান থেকে হিজরত করে এমন জায়গায় আশ্রয় নেন, যেখানে আল্লাহ্র ইবাদত হতে পারে।

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا
غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ

مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ۗ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿١٧﴾ وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ ۖ وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٨﴾

(১৭) তুমি সূর্যকে দেখবে যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডানদিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বামদিকে চলে যায়, অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত। এটা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অন্যতম। আল্লাহ্ যাকে সৎপথে চালান সে-ই সৎপথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখনও তার জন্য পথপ্রদর্শনকারী সাহায্যকারী পাবেন না। (১৮) তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাই ডানদিকে ও বামদিকে। তাদের কুকুর ছিল সামনের পা দু'টি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে। যদি তুমি উঁকি দিয়ে তাদেরকে দেখতে, তবে পেছন ফিরে পলায়ন করতে এবং তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে সম্বোধিত ব্যক্তি, গুহাটি এমনভাবে অবস্থিত যে,) যখন সূর্য উদিত হয়, তখন তুমি তাকে দেখবে যে, গুহার ডানদিকে পাশ কেটে যায় (অর্থাৎ গুহায় প্রবেশ পথ থেকে ডানদিকে পৃথক থাকে) এবং যখন অস্ত যায়, তখন (গুহার) বামদিকে সরতে থাকে (অর্থাৎ তখনও গুহার অভ্যন্তরে রোদ প্রবেশ করে না, যাতে তারা রোদের খরতাপে কষ্ট না পায়) এবং তারা গুহার একটি প্রশস্ত চত্বরে ছিল (অর্থাৎ এ জাতীয় গুহা স্বভাবতই কোথাও অপ্রশস্ত এবং কোথাও প্রশস্ত হয়ে থাকে। তারা গুহার এমন চত্বরে ছিল, যা প্রশস্ত, যাতে বাতাস পৌঁছে এবং সংকীর্ণ পরিসরের কারণে মনে অস্থিরতা না আসে।) এটা আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম নিদর্শন (যে, বাহ্যিক কারণাদির বিপরীতে তাদের জন্য আরামের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং জানা গেল যে,) যাকে আল্লাহ্ সৎপথে চালান, সেই সৎপথ পায় এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন আপনি তার জন্য কোন পথপ্রদর্শনকারী সাহায্যকারী পাবেন না। (গুহার যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো এই যে, তাতে সকালে সূর্যোদয়ের সময়েও ভেতরে রোদ প্রবেশ করে না এবং বিকালে সূর্যাস্তের সময়ও প্রবেশ করে না। এটা তখন সম্ভব যখন গুহা উত্তরমুখী অথবা দক্ষিণমুখী হয়। কেননা, আয়াতে যে ডানদিক বামদিক বলা হয়েছে, তার অর্থ যদি গুহায় প্রবেশকারীর ডানদিক-বামদিক হয়, তবে গুহাটি উত্তরমুখী। পক্ষান্তরে যদি গুহা থেকে নির্গমনকারীর ডানদিক-বামদিক অর্থ হয়, তবে গুহাটি দক্ষিণমুখী হবে।) এবং

(হে সম্বোধিত ব্যক্তি, তারা যখন গুহায় গেল এবং আমি তাদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিলাম, তখন যদি তুমি তাদেরকে দেখতে, তবে) তুমি তাদেরকে জাগ্রত মনে করতে অথচ তারা ছিল নিদ্রিত। (কেননা, আল্লাহ্র শক্তি তাদেরকে নিদ্রার লক্ষণাদি থেকে মুক্ত রেখেছিল; যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসের পরিবর্তন, দেহ ঢিলে হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। চক্ষু বন্ধ হলেও তা নিদ্রার নিশ্চিত আলামত নয়) এবং (নিদ্রার এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে) আমি তাদেরকে (কোন সময়) ডানদিক এবং (কোন সময়) বামদিকে পার্শ্ব পরিবর্ত করাতাম (এবং এমতাবস্থায়) তাদের কুকুর (যেটি কোন কারণে তাদের সাথে এসে গিয়েছিল, গুহার) প্রবেশদ্বারে সামনের পা দু'টি প্রসারিত করে (বসা) ছিল। (তাদের আল্লাহ্ প্রদত্ত ভয়ভীতির অবস্থা ছিল এই যে,) যদি (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) তুমি তাদেরকে উঁকি দিয়ে দেখতে, তবে পেছন ফিরে পলায়ন করতে এবং তাদের ভয়ে তুমি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তে। [এ আয়াতে সাধারণ লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া জরুরী নয়। এসব ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হিফাযতের জন্য করেছিলেন। কেননা, জাগ্রত ব্যক্তিকে হামলা করা সহজ হয় না। দীর্ঘ সময়ের নিদ্রায় পার্শ্ব পরিবর্তন না করলে এক পার্শ্বকে মাটি খেয়ে ফেলত। গুহার প্রবেশপথে কুকুর বসে থাকা যে হিফাযতের ব্যবস্থা, তা বলাই বাহুল্য।]

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা আসহাবে কাহ্ফের তিনটি আশ্চর্যজনক অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এগুলো তাঁদের কারামত হিসাবে অলৌকিকভাবে প্রকাশ লাভ করেছে।

এক, দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রায় অভিভূত থাকা এবং তাতে খাদ্য ইত্যাদি ছাড়াই জীবিত থাকা সর্ববৃহৎ কারামত ও অলৌকিক কাণ্ড। পরবর্তী আয়াতে এর বিবরণ আসবে। এখানে বলা হয়েছে যে, এই দীর্ঘ নিদ্রাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে গুহার অভ্যন্তরে এমনভাবে নিরাপদ রেখেছিলেন যে, সূর্য তাদের কাছ দিয়ে সকাল-বিকাল অতিক্রম করত কিন্তু গুহার ভেতরে তাদের দেহে রোদ পড়ত না। কাছ দিয়ে অতিক্রম করার উপকারিতা জীবনের স্পন্দন প্রতিষ্ঠা, বাতাস, উত্তাপ ও শৈত্যের সমতা ইত্যাদি ছিল। দেহের উপর রোদ না পড়ায় তাদের দেহ ও পোশাকের হিফাযতও হচ্ছিল।

তাদের উপর রোদ না পড়া গুহার বিশেষ অবস্থানের কারণেও হতে পারে; যেমন গুহার প্রবেশপথ উত্তর কিংবা দক্ষিণে এমনভাবে ছিল যে, রোদ স্বভাবতই ভেতরে প্রবেশ করত না। ইবনে কুতায়বা-এর বিশেষ অবস্থানস্থল নির্ণয়ের জন্য এরূপ কষ্ট স্বীকার করেছেন যে, অংকশাস্ত্রের মূলনীতির নিরিখে সে স্থানের দ্রাঘিমা, অক্ষাংশ তথা দৈর্ঘ্য দেশান্তর রেখা (Longitude) ও প্রস্থ দেশান্তররেখা (Latitude) এবং গুহার সমক্ষ নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন।—(মাযহারী) এর বিপরীতে বাজজাজ বলেন: তাদের উপর থেকে রোদ দূরে থাকা কোন বিশেষ অবস্থানের কারণে নয়, বরং তাদের কারামতির কারণে

অলৌকিকভাবে এটাও ছিল। আয়াতের শেষে ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ বাক্য থেকেও বাহ্যত তাই বোঝা যায় যে, রোদ থেকে হিফাযতের এই ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির একটি নিদর্শন ছিল।—(মাযহারী)

পরিষ্কার কথা এই যে, তাদের দেহে যাতে রোদ না পড়ে আল্লাহ্ তা'আলা সেরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন। এ ব্যবস্থা গুহার বিশেষ অবস্থানের মাধ্যমে হোক কিংবা রোদের সময় মেঘখণ্ড ইত্যাদির আড়াল করে হোক কিংবা সূর্যের কিরণকে অলৌকিকভাবে তাদের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে হোক। আয়াতে সব সম্ভাবনাই রয়েছে। তন্মধ্যে কোন একটিকে নির্দিষ্ট করার জন্য জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

দীর্ঘ নিদ্রার সময় আসহাবে কাহ্ফ এমতাবস্থায় ছিল যে, দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করত ঃ দ্বিতীয় অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এই যে, আসহাবে কাহ্ফকে এত দীর্ঘকাল নিদ্রায় অভিভূত রাখা সত্ত্বেও তাদের দেহে নিদ্রার চিহ্নমাত্র ছিল না। বরং অবস্থা ছিল এরূপ যে, দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করত। অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন ঃ তাদের চক্ষু খোলা ছিল। নিদ্রার কারণে দেহে যে ঢিলাভাব আসে তাও তাদের মধ্যে ছিল না। বাহ্যত এ অবস্থাও অসাধারণ এবং একটি কারামতই ছিল। এর বাহ্যত কারণ ছিল তাদের হিফাযত করা—যাতে নিদ্রিত মনে করে কেউ তাদের উপর হামলা না করে অথবা তাদের আসবাবপত্র চুরি না করে। বিভিন্ন দিকে পার্শ্ব পরিবর্তন থেকেও দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করতে পারে। এর আরেক কারণ ছিল এই যে, যাতে এক পার্শ্বকে মাটি খেয়ে না ফেলে।

আসহাবে কাহ্ফের কুকুর ঃ সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে, যে গৃহে কুকুর কিংবা কোন প্রাণীর ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর অথবা জন্তুদের হিফাযতকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালন করে প্রত্যহ তার পুণ্য থেকে দু'কিরাত হ্রাস পায়—(কিরাত একটি ছোট ওজনের নাম।) হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে এক তৃতীয় প্রকার কুকুরের ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে; অর্থাৎ শস্যক্ষেত্রের হিফাযতের জন্য পালিত কুকুর।

এসব হাদীসের ভিত্তিতে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ্র ভক্ত আসহাবে কাহ্ফ কুকুর সঙ্গে নিলেন কেন? এর এক উত্তর এই যে, কুকুর পালনের নিষিদ্ধতা শরীয়তে মুহাম্মদীর বিধান। সম্ভবত খৃস্টধর্মে এটা নিষিদ্ধ ছিল না। দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, খুব সম্ভব তাঁরা সম্পদশালী ও পশুপালনকারী ছিলেন। এগুলোর হিফাযতের জন্য কুকুর পালন করতেন। কুকুরের প্রভুভক্তি সুবিদিত। তাঁরা যখন শহর থেকে রওয়ানা হন, তখন কুকুরও তাঁদের অনুসরণ করতে থাকে।

সৎসংসর্গের বরকত কুকুরেরও সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে ঃ ইবনে আতিয়্যা বলেন ঃ আমার শ্রদ্ধেয় পিতা বলেছেন যে তিনি ৪৬৯ হিজরীতে মিসরের জামে মসজিদে আবুল

কখন জওহরীর একটি ওয়াজ শুনেছেন। তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন : যে ব্যক্তি সৎলোকদেরকে ভালবাসে, তাদের নেকীর অংশ সে-ও পায়। দেখ, আসহাবে কাহ্ফের কুকুর তাদেরকে ভালবেসেছে এবং তাদের সঙ্গী হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনেও তার কথা উল্লেখ করেছেন।

কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে ইবনে আতিয়্যার বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন : একটি কুকুর যখন সৎলোক ও গুণীদের সংসর্গের কারণে এই মর্যাদা পেতে পারে, তখন আপনি অনুমান করুন, যেসব ঈমানদার তওহীদী লোক আল্লাহ্র ওলী ও সৎলোকদেরকে ভালবাসে, তাদের মর্যাদা কতটুকু হবে? এ ঘটনায় সেসব মুসলমানদের জন্য সান্ত্বনা ও সুসংবাদ রয়েছে, যারা আমলে কাঁচা, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মনেপ্রাণে ভালবাসে।

সহীহ্ বুখারীর হাদীসে হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন : একদিন আমি ও রসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। মসজিদের দরজায় এক ব্যক্তির সাথে দেখা হল। সে প্রশ্ন করল : ইয়া রসূলুল্লাহ্! কিয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন : তুমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ (যে, আসার জন্য তাড়াহুড়া করছ)? এ কথা শুনে লোকটি মনে মনে কিছুটা লজ্জিত হল। অতঃপর সে বলল : আমি কিয়ামতের জন্য অনেক নামায, রোযা ও দান-খয়রাত সঞ্চয় করিনি, কিন্তু আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : যদি তাই হয়, তবে (শুনে নাও) তুমি (কিয়ামতে) তার সাথেই থাকবে, যাকে তুমি ভালবাস। হযরত আনাস বললেন : রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে এ কথা শুনে আমরা এতই আনন্দিত হলাম যে, মুসলমান হওয়ার পর এর চাইতে বেশি আনন্দিত কোন সময় হইনি। এরপর হযরত আনাস আরও বলেন : (আলহামদুলিল্লাহ্) আমি আল্লাহ্কে, তাঁর রসূলকে, আবু বকর ও উমরকে ভালবাসি এবং আশা করি যে, তাঁদের সাথেই থাকব---(কুরতুবী)

আসহাবে কাহ্ফকে আল্লাহ্ তা'আলা এত ভয়ভীতি দান করেছিলেন যে, যে দেখত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করা ছাড়া উপায় ছিল না : لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ বাহ্যত এতে সাধারণ লোককে সম্বোধন করা হয়েছে। কাজেই জরুরী নয় যে, আসহাবে কাহ্ফের ভয়ভীতি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কেও আচ্ছন্ন করতে পারত। আয়াতে সাধারণ লোককে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি উঁকি মেরে দেখ, তবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করবে।

এই ভয়ভীতির কারণ সম্পর্কে আলোচনা অনর্থক। তাই কোরআন ও হাদীস তা বর্ণনা করেনি। সত্য এটাই যে, তাদের হিফাযতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এসব অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। তাদের গায়ে রোদ পড়ত না। দর্শক তাদেরকে জাগ্রত মনে করত। তাদের ভয়ভীতি দর্শককে আচ্ছন্ন করে দিত যাতে পূর্ণরূপে দেখতে না পারে। এসব অবস্থার উদ্ভব স্বাভাবিক কারণাদির পথে হওয়াও সম্ভবপর এবং কারামত হিসাবে অলৌকিক উপায়ে হওয়াও সম্ভবপর। কোরআন ও হাদীস যখন এর কোন বিশেষ কারণ নির্দিষ্ট করেনি, তখন নিছক অনুমানের ভিত্তিতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা নিরর্থক।

তফসীর মাযহারীতে এ বক্তব্যকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং এর সমর্থনে ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনযির ও ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাসের এই ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তিনি বলেন ঃ আমরা রোমকদের মুকাবিলায় হযরত মুআবিয়ার সাথে এক জিহাদে শরীক হয়েছিলাম, যা 'গযওয়াতুল মুযীক' নামে খ্যাত। এই সফরে আমরা আসহাবে কাহ্ফের গুহার নিকট দিয়ে গমন করি। হযরত মুআবিয়া আসহাবে কাহাফকে জানা ও দেখার জন্য গুহায় যেতে চাইলেন। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস নিষেধ করে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনার চাইতে বড় ও উত্তম ব্যক্তিত্বকে [অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে] তাঁদেরকে দেখতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি لَوِ اطَّلَعْتَ আয়াতটি পাঠ করলেন। এ থেকে জানা গেল যে, হযরত ইবনে আব্বাসের মতে আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু হযরত মুআবিয়া ইবনে আব্বাসের মত কবুল করলেন না। (সম্ভবত কারণ এই ছিল যে, তাঁর মতে আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবর্তে সাধারণ লোককে সম্বোধন করা হয়েছে অথবা কোরআন বর্ণিত এই অবস্থা তখনকার, যখন আসহাবে কাহ্ফ জীবিত অবস্থায় নিদ্রামগ্ন ছিলেন। এখন তাদের ওফাতের পর বহু দিন অতিবাহিত হয়েছে। কাজেই এখনও পূর্বের ভয়ভীতি বিদ্যমান থাকা জরুরী নয়। মোটকথা, হযরত মুআবিয়া ইবনে আব্বাসের কথা মানলেন না। তিনি কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দিলেন। তারা যখন গুহায় প্রবেশ করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ভীষণ উত্তপ্ত হাওয়া প্রেরণ করলেন। ফলে তারা কিছুই দেখতে পারেনি। —(মাযহারী)

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوٓا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِى مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا إِذًا أَبَدًا ۝

(১৯) আমি এমনিভাবে তাদেরকে জাগ্রত করলাম, যাতে তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বলল ঃ তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? তাদের কেউ বলল ঃ একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। কেউ কেউ বলল ঃ তোমাদের পালনকর্তাই ভাল জানেন তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ। এখন তোমাদের একজনকে

তোমাদের এই মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ কর; সে যেন দেখে কোন খাদ্য পবিত্র। অতঃপর তা থেকে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য; সে যেন নম্রতা সহকারে যায় ও কিছুতেই যেন তোমাদের খবর কাউকে না জানায়। (২০) তারা যদি তোমাদের খবর জানতে পারে, তবে পাথর মেরে তোমাদেরকে হত্যা করবে, অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। তাহলে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (আমি যেমন স্বীয় শক্তি বলে তাদেরকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রাভিভূত রেখেছি) এমনিভাবে (এই দীর্ঘ নিদ্রার পর) আমি তাদেরকে জাগ্রত করেছি, যাতে তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে। (যাতে পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের ফলে আল্লাহ্র কুদরত ও হিকমত তাদের কাছে খুলে যায়। (সেমতে) তাদের একজন বলল: (নিদ্রাবস্থায়) তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? (উত্তরে) কেউ কেউ বলল: (সম্ভবত) একদিন অথবা একদিনেরও কিছু কম সময় অবস্থান করেছি। অন্য কেউ কেউ বলল: (এ নিয়ে খোঁজাখুঁজির কি প্রয়োজন?) এ সম্পর্কে তো (সঠিকভাবে) তোমাদের পালনকর্তাই ভাল জানেন তোমরা কতকাল (নিদ্রায়) অবস্থান করেছ। এখন (এই অনর্থক আলোচনা ছেড়ে জরুরী কাজ করা দরকার। তা এই যে,) তোমাদের একজনকে তোমাদের এই টাকা (যা তোমাদের কাছে ছিল। কেননা, খরচাদির জন্য তারা কিছু টাকা-পয়সাও সাথে এনেছিল। মোটকথা, কাউকে এই টাকা) দিয়ে শহরে প্রেরণ কর। (সেখানে পৌঁছে) সে যেন দেখে কোন্ খাদ্য হালাল। (এখানে ইবনে-জরীরের রেওয়ায়েতে হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের থেকে ازكى শব্দের তফসীর হালাল খাদ্য বর্ণিত আছে। একথা বলা জরুরী ছিল। কারণ, তাদের কওম প্রতিমার নামে জন্তু যবেহ্ করত এবং বাজারে হারাম গোশত প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হত।) অতঃপর তা থেকে সে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে এবং বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে (অর্থাৎ এমন ভাবসাব নিয়ে যাবে যে, কেউ যেন তাকে চিনতে না পারে এবং খাদ্য যাচাই করার মধ্যেও যেন এ কথা জানতে না দেয় যে, সে মূর্তির নামে যবেহ্কৃত গোশত হারাম মনে করে।) এবং কাউকে যেন তোমাদের বিষয়ে জানতে না দেয়। (কেননা) তারা যদি (অর্থাৎ শহরবাসীরা। তারা তাদেরকে নিজেদের যমানার মুশরিক মনে করছিল।) তোমাদের খবর পেয়ে যায়, তবে তোমাদেরকে হয় পাথর মেরে হত্যা করবে, না হয় (জোরজবরদস্তিভাবে) তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। এরূপ হলে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كَذٰلِكَ—এ শব্দটি তুলনামূলক ও দৃষ্টান্তমূলক অর্থ দেয়। এখানে দু'টি ঘটনার পারস্পরিক তুলনা বোঝানো হয়েছে। প্রথম ঘটনা আসহাবে কাহ্ফের দীর্ঘকাল পর্যন্ত

নিদ্রাভিভূত থাকা, যা কাহিনীর শুরুতে فضربنا على اذانهم فى الكهف سنين عددا আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনা দীর্ঘকালীন নিদ্রার পর সুস্থ এবং খাদ্য না পাওয়া সত্ত্বেও সবল ও সুঠাম দেহে জাগ্রত হওয়া। উভয় ঘটনা আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর তুল্য। তাই এ আয়াতে তাদেরকে জাগ্রত করার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে كذلك শব্দে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের নিদ্রা যেমন সাধারণ মানুষের অভ্যস্ত নিদ্রার মত ছিল না, তেমনি তাদের জাগরণও সাধারণ জাগরণ থেকে স্বতন্ত্র ছিল। এরপর ليتساءلوا বলা হয়েছে, অর্থাৎ যাতে তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে যে, কতকাল ঘুমানো হয়েছে। এটা জাগ্রত করার আসল কারণ নয়, বরং একটি অভ্যস্ত ঘটনার বর্ণনা। এ কারণেই এর لام-কে তফসীরবিদগণ لام عاقبت অথবা لام ضرورت নাম দিয়েছেন।—(আবু হাইয়্যান, কুরতুবী)

মোটকথা তাদের দীর্ঘ নিদ্রা যেমন কুদরতের একটি নিদর্শন ছিল, এমনিভাবে শত শত বছর পর পানাহার ছাড়া সুস্থ-সবল অবস্থায় জাগ্রত হওয়াও ছিল আল্লাহর অপার শক্তির একটি নিদর্শন। আল্লাহর এটাও ইচ্ছা ছিল যে, শত শত বছর নিদ্রামগ্ন থাকার বিষয়টি স্বয়ং তারাও জানুক, তাই পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এর সূচনা হয় এবং সে ঘটনা দ্বারা চূড়ান্ত রূপ নেয়, যা পরবর্তী كذلك اعثرنا আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের গোপন রহস্য শহরবাসীরা জেনে ফেলে এবং সময়কাল নির্ণয়ে মতানৈক্য সত্ত্বেও দীর্ঘকাল গুহায় নিদ্রামগ্ন থাকার ব্যাপার সবার মনেই বিশ্বাস জন্মে।

قال قائل منهم—কাহিনীর শুরুতে সংক্ষেপে বলা হয়েছিল যে, গুহায় অবস্থানের সময়কাল সম্পর্কে তাদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য হয় এবং তাদের এক দলের উক্তি শুদ্ধ ছিল। এখানে সে কথারই বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আসহাবে কাহফের এক ব্যক্তি প্রশ্ন তুলল যে, তোমরা কতকাল নিদ্রামগ্ন রয়েছ? কেউ কেউ উত্তর দিল : একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ। কেননা তারা সকাল বেলায় গুহায় প্রবেশ করেছিল এবং জাগরণের সময়টি ছিল বিকাল। তাই মনে করল যে, এটা সেই দিন যেদিন আমরা গুহায় প্রবেশ করেছিলাম। কিন্তু তাদের মধ্য থেকেই অন্যেরা অনুভব করল, যে, এটা সম্ভবত সে দিন নয়। তাহলে কতদিন গেল জানা নেই। তাই তারা বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে বলল : ربكم اعلم بما لبثتم অতঃপর তারা এ আলো-

চনাকে অনাবশ্যক মনে করে জরুরী কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল যে, শহর থেকে কিছু খাদ্য আনার জন্য একজনকে প্রেরণ করা হোক।

اِلَى الْمَدِيْنَةِ —এ শব্দ থেকে জানা গেল যে, গুহার নিকটে একটি বড় শহর ছিল। সেখানে তারা পূর্বে বসবাস করত। এ শহরের নাম সম্পর্কে আবূ হাইয়্যান তফসীর বাহ্‌রে মুহীতে বলেন ঃ যে সময়ে আসহাবে কাহ্ফ এ শহর থেকে বের হয়েছিল তখন তার নাম ছিল 'আফসূস'। বর্তমানে এর নাম 'তরসূস'। কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেন ঃ এ শহরের উপর যখন মূর্তিপূজারীদের আধিপত্য ছিল, তখন এর নাম ছিল 'আফসূস'। অতঃপর যখন মুসলমান অর্থাৎ তৎকালীন খৃস্টানগণ শহরটি দখল করে নেয়, তখন এর নাম রেখে দেয় তরসূস।

بِوَرِقِكُمْ থেকে জানা যায় যে, তারা গুহায় আসার সময় কিছু টাকা-পয়সাও সাথে এনেছিল। অতএব বোঝা গেল যে, প্রয়োজনীয় ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা বৈরাগ্য ও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। —(বাহ্‌রে মুহীত)

اَزْكٰى — اَيُّهَا اَزْكٰى طَعَامًا শব্দের অর্থ পাক-সাফ। ইবনে জুবায়েরের তফসীর অনুযায়ী এখানে হালাল খাদ্য বোঝানো হয়েছে। এর প্রয়োজন এজন্য দেখা দেয় যে, যখন তারা শহর থেকে বের হয়েছিল, তখন সেখানে মূর্তিদের নামে যবেহ করা হত এবং বাজারে তা-ই বিক্রি করা হত। তাই প্রেরিত ব্যক্তিকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, খাদ্য হালাল কিনা, তা যেন যাচাই করে আনা হয়।

মাস'আলা ঃ এ থেকে জানা গেল যে, শহরে কিংবা যে বাজারে অথবা যে হোটেলে অধিকাংশ হারাম খাদ্য প্রচলিত, সেখানকার খাদ্য যাচাই না করে খাওয়া জায়েয নয়।

رَجْمٌ — اَوْ يَرْجُمُوْكُمْ শব্দের অর্থ পাথর মেরে মেরে হত্যা করা। গুহায় যাওয়ার পূর্বে বাদশাহ্ হুমকি দিয়েছিল যে, তোমাদের এ ধর্ম পরিত্যাগ না করলে তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, তাদের মতে ধর্ম-ত্যাগীদের শাস্তি ছিল প্রস্তর বর্ষণের মাধ্যমে হত্যা, যাতে সবাই এতে অংশগ্রহণ করে এবং সমগ্র জাতি যেন ক্রোধ প্রকাশ করে হত্যা করে।

ইসলামী শরীয়তে বিবাহিত নারী ও পুরুষের যিনার শাস্তিও প্রস্তর বর্ষণে হত্যা। সম্ভবত এরও কারণ এই যে, যে ব্যক্তি লজ্জাশরমের সব বাধা ছিন্ন করে এহেন জঘন্য কর্মে লিপ্ত হয়, তার হত্যা প্রকাশ্য স্থানে সব লোকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে হওয়া

উচিত। এভাবে তার লাঞ্ছনাও পুরোপুরি হবে এবং মুসলমান কার্যক্ষেত্রে স্বীয় ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে যাতে ভবিষ্যতে জাতির মধ্যে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।

فَابْعَثُوا اَحَدَكُمْ —আসহাবে কাহ্ফ নিজেদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে শহরে প্রেরণের জন্য মনোনীত করে এবং খাদ্য আনার জন্য তার কাছে টাকা অর্পণ করে। কুরতুবী বলেন ঃ এ থেকে কয়েকটি মাস'আলা জানা যায়। এক. অর্থ-সম্পদে অংশীদারিত্ব জায়েয। দুই. অর্থ সম্পদে উকিল নিযুক্ত করা জায়েয এবং শরীকানাধীন সম্পদ কোন এক ব্যক্তি অন্যদের অনুমতিক্রমে ব্যয় করতে পারে। তিন. খাদ্যদ্রব্যে কয়েকজন সঙ্গী শরীক হলে তা জায়েয, যদিও খাওয়ার পরিমাণ বিভিন্নরূপ হয়—কেউ কম খায় আর কেউ কেউ বেশী খায়।

وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ؕ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ۝

(২১) এমনিভাবে আমি তাদের খবর প্রকাশ করে দিলাম, যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজেদের কর্তব্য বিষয়ে পরস্পরে বিতর্ক করছিল, তখন তারা বলল ঃ তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর। তাদের পালনকর্তা তাদের বিষয়ে ভাল জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হলো, তারা বলল ঃ আমরা অবশ্যই তাদের স্থানে মসজিদ নির্মাণ করব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (আমি যেভাবে স্বীয় কুদরতবলে তাদেরকে নিদ্রামগ্ন করেছি এবং জাগ্রত করেছি) এমনিভাবে আমি স্বীয় কুদরত ও হিকমত দ্বারা তখনকার লোকদেরকে তাদের বিষয় জানিয়ে দিয়েছি, যাতে (অন্যান্য অনেক উপকারের মধ্য থেকে একটি উপকার এ-ও হয় যে,) তারা (এ ঘটনার সূত্র ধরে) এ বিষয়ে বিশ্বাস (অথবা অধিক বিশ্বাস) অর্জন করে যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই। (তারা যদি পূর্ব থেকে কিয়ামতে জীবিত হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাসী থেকে থাকে, তবে এ ঘটনা দ্বারা তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে। পক্ষান্তরে তারা যদি পূর্বে কিয়ামতে অবিশ্বাসী হয়, তবে এ ঘটনা দেখে তাদের বিশ্বাস জন্মাবে। আসহাবে কাহ্ফের জীবদ্দশায় এ ঘটনা ঘটে। এরপর তারা গুহার মধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করে। তখন তাদের সম্পর্কে

সমসাময়িক লোকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। পরবর্তী আয়াতে এই মতানৈক্য বর্ণিত হয়েছে)। ঐ সময়টিও স্মরণযোগ্য, যখন তখনকার লোকেরা তাদের নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে পারস্পরিক বিতর্ক করছিল। (এই বিতর্ক ছিল গুহার মুখ বন্ধ করার ব্যাপারে, যাতে তাদের মৃতদেহ নিরাপদ থাকে অথবা তাদের স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়)। তারা বলল ঃ তাদের (গুহার) নিকটে সৌধ নির্মাণ কর। (এরপর মতানৈক্য হলো যে, সৌধটি কি হবে? এই মতানৈক্যের সময়) তাদের পালনকর্তা তাদের (বিভিন্ন মতামতের) বিষয় ভাল জানতেন। (অবশেষে) যারা স্বীয় কর্তব্যে অটল ছিল (অর্থাৎ রাজপরিবারের লোক, যারা তখন সত্যধর্মের অনুসারী ছিল) তারা বলল, আমরা তাদের স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করব। (মসজিদটি এ বিষয়েরও চিহ্ন হবে যে, তারা স্বয়ং উপাসনাকারী ছিল—উপাস্য ছিল না। অন্য রকম কোন সৌধ নির্মাণ করলে ভবিষ্যত বংশধররা হয়তো তাদেরকেই উপাস্য সাব্যস্ত করে ফেলতে পারত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ—এ আয়াতে আসহাবে কাহ্‌ফের রহস্য শহরবাসীদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়া, এর রহস্য এবং পরকাল ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস অর্জিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তফসীরে কুরতুবীতে এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা এভাবে উল্লিখিত রয়েছে ঃ

আসহাবে কাহ্‌ফের বিষয় শহরবাসীদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়া ঃ আসহাবে কাহ্‌ফের প্রস্থানকালে অত্যাচারী ও মুশরিক বাদশাহ্ দাকিয়ানুসের রাজত্ব ছিল। তার মৃত্যুর পর কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হলে শহরের উপর সত্যপন্থী তওহীদবাদী লোকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের বাদশাহ্ ছিলেন একজন সৎ ও সাধু ব্যক্তি। তফসীর মাযহারীতে ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত দৃষ্টে তার নাম 'বাইদুসীস' লেখা রয়েছে। তার শাসনকালে ঘটনাক্রমে কিয়ামতে মৃতদের পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রশ্নে মতানৈক্য ছড়িয়ে পড়ে। একদল একে অস্বীকার করতে থাকে। তারা বলে যে, মানবদেহ পচে-গলে অণু-পরমাণুর আকারে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ার পর পুনর্বার জীবিত হওয়া অসম্ভব। বাদশাহ্ বায়দুসীস চিন্তিত হলেন যে, কিভাবে তাদের সন্দেহ নিরসন করা যায়। কোন উপায় না দেখে তিনি চটের পোশাক পরিধান করত ছাই-এর স্তূপে বসে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে দোয়া করতে লাগলেন ঃ হে আল্লাহ্, আপনিই তাদের বিশ্বাস সংশোধন ও সৎ পথে ফিরে আসার কোন উপায় করে দিন। একদিকে বাদশাহ্ কান্নাকাটি ও দোয়ায় মশগুল ছিলেন, অপরদিকে আল্লাহ্ তার দোয়া কবুল করার ব্যবস্থা করলেন যে, আসহাবে কাহ্‌ফের নিদ্রাভঙ্গ হলো। তারা তাদের 'তামলিখা' নামক এক ব্যক্তিকে খাদ্য আনার জন্য বাজারে প্রেরণ করল। সে দোকানে পৌঁছল এবং খাদ্যের মূল্য হিসাবে তিন শ বছর পূর্বেকার বাদশাহ দাকিয়ানুসের আমলে প্রচলিত মুদ্রা পেশ করল। দোকানদার অবাকবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। এ মুদ্রা কোথা থেকে এল? কোন্ আমলের? তা অন্যান্য

দোকানদারকে দেখানো হলো। সবাই বলল ঃ এ ব্যক্তি কোথাও প্রাচীন ধনভাণ্ডার লাভ করেছে। সেখান থেকেই এই মুদ্রা বের করে এনেছে। সে অস্বীকার করে বলল ঃ আমি কোন ধনভাণ্ডার পাইনি এবং কারও কাছ থেকে এ মুদ্রা আনিনি। এটা আমার নিজের।

বাজারীরা তাকে গ্রেফতার করে বাদশাহ্র সামনে উপস্থিত করল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বাদশাহ্ সাধু ও আল্লাহ্ভক্ত লোক ছিলেন। তিনি প্রাচীন রাজকীয় ধনভাণ্ডারে রক্ষিত সে ফলকটিও দেখেছিলেন, যাতে আসহাবে কাহ্ফের নাম ও তাদের পলায়নের ঘটনা লিপিবদ্ধ ছিল। কারও কারও মতে স্বয়ং অত্যাচারী বাদশাহ্ দাকিয়ানুস এই ফলকটি লিখিয়েছিল এবং তাতে বলা হয়েছিল যে, এরা দাগী অপরাধী। এদের নাম-ঠিকানা সংরক্ষিত থাকতে হবে। যখন যেখানে পাওয়া যায়, গ্রেফতার করতে হবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে শাহী দফতরে কিছুসংখ্যক ঈমানদারও ছিল। তারা মূর্তিপূজাকে ঘৃণা করত এবং আসহাবে কাহ্ফকে সত্যপন্থী মনে করত। তবে তা প্রকাশ করার সাহস তাদের ছিল না। তারা স্মৃতি হিসেবে এই ফলক লিপিবদ্ধ করেছিল। সে ফলকের নামই রকীম। সে কারণেই আসহাবে কাহ্ফকে আসহাবে রকীমও বলা হয়।

মোটকথা, বাদশাহ্ এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞাত ছিলেন। এ সময় তার আন্তরিক কামনা ছিল এই যে, কোন না কোন উপায়ে মানুষ জানুক যে, মৃতদেহকে পুনরুজ্জীবিত করা আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।

এজন্য তামলিখার অবস্থা শুনে বাদশাহ্র নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, সে আসহাবে কাহ্ফের একজন। বাদশাহ্ বললেন ঃ আমি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতাম যে, আমাকে তাদের সাথে মিলিয়ে দাও, যারা বাদশাহ্ দাকিয়ানুসের আমলে ঈমান রক্ষা করার জন্য পলায়ন করেছিলেন। সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা আমার দোয়া কবুল করেছেন। এতে মৃতদেহ জীবিত করে হাশরে একত্র করাকে বিশ্বাস করার মত কোন প্রমাণ নিহিত থাকতে পারে। এরপর বাদশাহ্ তামলিখাকে বললেন ঃ আমাকে সে গুহায় নিয়ে চল, যেখান থেকে তুমি এসেছ والله اعلم بحقيقة الحال

বাদশাহ্ নগরবাসীদের এক বিরাট দল সমভিব্যাহারে গুহায় পৌঁছাল। গুহার নিকটবর্তী হয়ে তামলিখা বলল ঃ আপনারা একটু থামুন। আমি সঙ্গীদেরকে প্রকৃত ব্যাপারটি জানিয়ে দেই যে, এখন বাদশাহ্ তওহীদবাদী মুসলমান। কওমও মুসলমান। তারা সাক্ষাতের জন্য আগমন করেছে। একথা জানানোর আগে আপনারা গেলে তারা মনে করবে যে, আমাদের শত্রু বাদশাহ্ চড়াও হয়েছে। সেমতে তামলিখা গুহায় পৌঁছে তাদেরকে আদ্যোপ্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করল। আসহাবে কাহ্ফ এতে খুব আনন্দিত হলো এবং সসম্মানে বাদশাহ্কে অভ্যর্থনা জানাল। অতঃপর তারা গুহায় ফিরে গেল। অধিকাংশ রেওয়ায়েতে রয়েছে, তামলিখা যখন সঙ্গীদেরকে সকল বৃত্তান্ত অবহিত করল, তখনই সবার মৃত্যু হয়ে গেল; বাদশাহ্র সাথে সাক্ষাত হতে পারেনি। বাহ্রে-মুহীতে আবূ হাইয়্যান এক্ষেত্রে এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, সাক্ষাতের পর গুহাবাসীরা

বাদশাহ্‌ ও নগরবাসীদেরকে বলল ঃ এখন আমরা বিদায় হতে চাই। এই বলে তারা গুহার অভ্যন্তরে চলে গেল এবং তখনই আল্লাহ্‌ তা'আলা সবাইকে মৃত্যুদান করলেন।

মোটকথা, আল্লাহ্‌র কুদরতের এই আশ্চর্য ঘটনাটি নগরবাসীদের সামনে জাজ্বল্যমান হয়ে ফুটে উঠল। তা'দের বিশ্বাস হলো যে, যে সত্তা জীবিত মানুষদেরকে তিন শ' বছর পর্যন্ত পানাহার ছাড়া জীবিত রাখতে পারেন এবং এত দীর্ঘকাল নিদ্রামগ্ন রাখার পর আবার সুস্থ ও সবল অবস্থায় জাগ্রত করতে পারেন, তাঁর পক্ষে মৃত্যুর পরও মৃতদেহগুলোকে জীবিত করা মোটেই কঠিন নয়। এই ঘটনার ফলে তাদের অবিশ্বাসের কারণ দূর হয়ে গেল। এখন জানা গেল যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার কুদরতকে মানবীয় ক্ষমতার আলোকে বোঝার চেষ্টা করা মূর্খতা বৈ নয়।

এ বক্তব্যের প্রতিই এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا — অর্থাৎ আমি আসহাবে কাহ্‌ফকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রামগ্ন রাখার পর জাগ্রত করে বসিয়ে দিয়েছি, যাতে লোকেরা বুঝে নেয় যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা অর্থাৎ কিয়ামতে মৃতদেরকে জীবিত করার ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতের আগমনে কোন সন্দেহ নেই।

আসহাবে কাহ্‌ফের ওফাতের পর লোকদের মধ্যে মতানৈক্য ঃ আসহাবে কাহ্‌ফের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা সম্পর্কে কারও দ্বিমত ছিল না। তাদের ওফাতের পর সবাই মনে করল যে, গুহার নিকটে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতে হবে। কিন্তু সৌধটি কি ধরনের হবে, এ সম্পর্কে মতানৈক্য দেখা দিল। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, নগরবাসীদের মধ্যে তখনও কিছু মূর্তিপূজারী ছিল। তারাও আসহাবে কাহ্‌ফের যিয়ারতের জন্য আগমন করত। তারা মত দিল যে, কোন জনহিতকর সৌধ নির্মাণ করা হোক। কিন্তু শাসকবর্গ ও বাদশাহ্‌ মুসলমান ছিলেন এবং তারাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা প্রস্তাব দিল যে, এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হোক যা স্মৃতিচিহ্নও হবে এবং ভবিষ্যতে মূর্তিপূজা থেকে বিরত রাখার কারণও হবে। এখানের মতানৈক্যের উল্লেখ করে মাঝখানে কোরআনের এই বাক্যটি রয়েছে ঃ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ —অর্থাৎ তাদের পালনকর্তা তাদের অবস্থা সম্পর্কে ভাল জানেন।

তফসীর বাহ্‌রে মুহীতে এ বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দু'টি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটি নগরবাসীদেরই উক্তি। কেননা, তাদের ওফাতের পর যখন স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করার প্রস্তাব গৃহীত হয় তখন মূর্তিসৌধে সাধারণত যাদের স্মৃতিসৌধ, তাদের নাম ও বিশেষ অবস্থাদির শিলালিপি সংযুক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আসহাবে কাহ্‌ফের বংশ ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্নরূপ কথাবার্তা হয়েছে। যখন তারা কোন সত্য উদ্‌ঘাটন

করতে পারেনি, তখন নিজেরাই পরিশেষে অক্ষম হয়ে বলেছে ঃ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ

এরপর তারা আসল কাজ অর্থাৎ স্মৃতিসৌধ নির্মাণে মনোনিবেশ করেছে। যারা প্রবল ছিল, তাদের মসজিদ নির্মাণসংক্রান্ত প্রস্তাবটিই গৃহীত হলো।

দুই. এ বাক্যটি আল্লাহ্ তা'আলার। এতে বর্তমানকালের বিতর্ককারী ও মতানৈক্য-কারীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা যখন আসল সত্য জান না এবং জানার উপায়ও তোমাদের কাছে নেই তখন এই আলোচনায় জড়িয়ে অনর্থক কেন সময় নষ্ট কর? রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যমানায় ইহুদীরা এ ঘটনা সম্পর্কে এ ধরনের ভিত্তিহীন কথা-বার্তা বলত। সম্ভবত তাদেরকে হুঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য।

মাস'আলা ঃ এ ঘটনা থেকে এতটুকু জানা গেল যে, ওলী-দরবেশদের কবরের কাছে নামাযের জন্য মসজিদ নির্মাণ করা গোনাহ্ নয়। এক হাদীসে পয়গম্বরদের কবরকে যারা মসজিদে পরিণত করে, তাদের প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে। এর অর্থ স্বয়ং কবরকে সিজদার জায়গায় পরিণত করা, যা সর্ববাদীসম্মত শিরক ও হারাম। —(মাযহারী)

سَيَقُولُونَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۖ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ﴿٢٢﴾

(২২) অজ্ঞাত বিষয়ে অনুমানের উপর ভিত্তি করে এখন তারা বলবে ঃ তারা ছিল তিন জন; তাদের চতুর্থটি তাদের কুকুর। একথাও বলবে ঃ তারা পাঁচ জন। তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। আরও বলবে ঃ তারা ছিল সাতজন। তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। বলুন ঃ আমার পালনকর্তা তাদের সংখ্যা ভাল জানেন। তাদের খবর অল্প লোকই জানে। সাধারণ আলোচনা ছাড়া আপনি তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করবেন না এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে তাদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন আসহাবে কাহ্ফের কাহিনী বর্ণনা করবে, তখন কেউ কেউ বলবে ঃ তারা ছিল তিন জন, চতুর্থটি তাদের কুকুর এবং কেউ কেউ বলবে ঃ তারা ছিল পাঁচ জন, ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। (আর) তারা অজ্ঞাত বিষয় অনুমান করে কথা বলছে এবং

কেউ কেউ বলবে : তারা সাতজন, অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। আপনি মতভেদ-কারীদেরকে বলে দিন : আমার পালনকর্তা তাদের সংখ্যা খুব বিশুদ্ধরূপে জানেন যে, (এসব বিভিন্ন উক্তির মধ্যে কোন উক্তি বিশুদ্ধ, না সবই ভ্রান্ত)। তাদের সংখ্যা বিশুদ্ধরূপে খুব কম লোকই জানে। সংখ্যা নির্ণয়ের মধ্যে বিশেষ কোন উপকার নিহিত নেই, তাই আয়াতে কোন সুস্পষ্ট ফয়সালা করা হয়নি। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, انا من القليل كانوا سبعة অর্থাৎ অল্প সংখ্যকের মধ্যে আমিও একজন। তাদের সংখ্যা ছিল সাত। (দুররে-মনসূর) আয়াতেও এ উক্তির সত্যতার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেননা, এ উক্তি উদ্ধৃত করে একে নাকচ করা হয়নি। কিন্তু প্রথমোক্ত দু'টি উক্তি উদ্ধৃত করার পর رجما بالغيب বলে নাকচ করা হয়েছে। والله اعلم অতএব (যদি তারা মতভেদ করা থেকে বিরত না হয় তবে) আপনি সাধারণ আলোচনা ছাড়া তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করবেন না। (অর্থাৎ قل ربى اعلم এবং رجما بالغيب বলে কোরআনে সংক্ষেপে তাদের ধারণা নাকচ করা হয়েছে। এটাই সাধারণ আলোচনা। তাদের আপত্তির জওয়াবে এর চাইতে বেশি মনোনিবেশ করা এবং স্বীয় দাবি প্রমাণের জন্য বেশি চেষ্টা করা সমীচীন নয়। কারণ, এই আলোচনাতে বিশেষ কোন উপকারিতা নেই।) এবং আপনি তাদের (আসহাবে কাহ্ফের) সম্পর্কে এদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। [রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যেমন এদের আপত্তির উত্তরদানে পরিশ্রম করতে বারণ করা হয়েছে, তেমনি এ সম্পর্কে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, যতটুকু জরুরী ছিল, ততটুকু কোরআনেই এসে গেছে। অনাবশ্যক জিজ্ঞাসাবাদ ও খোঁজাখুঁজি পয়গম্বরের মর্যাদার পরিপন্থী।]

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিরোধপূর্ণ আলোচনায় কথাবার্তার উত্তম পন্থা : سيقولون ---অর্থাৎ তারা বলবে।---'তারা' কারা---এ সম্পর্কে দু'রকম সম্ভাবনা আছে। এক. এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে, যারা আসহাবে কাহ্ফের আমলে তাদের নাম, বংশ ইত্যাদি সম্পর্কে মতভেদ করেছিল; তাদের মধ্যেই কেউ কেউ তাদের সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তি কেউ কেউ দ্বিতীয় উক্তি এবং কেউ কেউ তৃতীয় উক্তি করেছিল।---(বাহর)

দুই. سيقولون বাক্যে নাজরানের খৃস্টান সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল। নাজ-রানের খৃস্টান সম্প্রদায় তিন দলে বিভক্ত ছিল। এক দলের নাম ছিল 'মালকানিয়া'। এরা সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তি, অর্থাৎ তিন বলেছিল। দ্বিতীয় দলের নাম ছিল 'এয়াকুবিয়া'।

তারা দ্বিতীয় সংখ্যা অর্থাৎ পাঁচ বলেছিল। তৃতীয় দল ছিল 'নাস্তরীয়া'। তারা তৃতীয় সংখ্যা অর্থাৎ সাত বলেছিল। কেউ কেউ বলেন ঃ তৃতীয় উক্তিটি ছিল মুসলমানদের। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাদীস এবং কোরআনের ইঙ্গিত দ্বারা তৃতীয় উত্তরের বিশুদ্ধতাই প্রমাণিত হয়।—(বাহ্‌রে মুহীত)

وَثَامِنُهُم—এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, আসহাবে কাহ্‌ফের সংখ্যা সম্পর্কে আয়াতে তিনটি উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে ঃ তিন, পাঁচ ও সাত। প্রত্যেকটি সংখ্যার পর তাদের কুকুরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রথমোক্ত দুই উক্তিতে তাদের সংখ্যা ও কুকুরের গণনার মাঝখানে واو عاطفة (সংযোগকারী ওয়াও) ব্যবহার না করে বলা হয়েছে ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ এবং خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ

কিন্তু তৃতীয় উক্তিতে سبعة-এর واو عاطفة এনে وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ বলা হয়েছে।

তফসীরবিদগণ এর কারণ এই লিখেন যে, আরবদের কাছে সংখ্যার প্রথম ধাপ ছিল সাত। সাতের পর যে সংখ্যা আসত, তা অনেকটা পৃথক বলে গণ্য হত, যেমন আজকাল নয় সংখ্যাটি। নয় পর্যন্ত একক সংখ্যা ধরা হয়। দশ থেকে দ্বি-সংখ্যা আরম্ভ হয়। এ কারণেই আরবরা তিন থেকে সাত পর্যন্ত সংখ্যা গণনায় واو عاطفة ব্যবহার করত না। সাতের পর কোন সংখ্যা বর্ণনা করতে হলে واو عاطفة এনে পৃথক করে বর্ণনা করত। এ জন্যই এই واو কে واو ثمان নাম দেয়া হয়। —(মাযহারী)

আসহাবে কাহ্‌ফের নাম ঃ প্রকৃতপক্ষে কোন সহীহ্ হাদীস থেকে আসহাবে কাহ্‌ফের নাম সঠিকভাবে প্রমাণিত নেই। তফসীরী ও ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে বিভিন্ন নাম বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে তাবারানী 'মু'জামে আওসাত' গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদ সহযোগে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, সেটিই বিশুদ্ধতর। এতে তাদের নাম নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

মুকসালমিনা, তামলিখা, মরতুনুস, সনুনুস, সারিনুতুস, যুনওয়াস, কায়াস্তাতিয়ুনুস।

فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا ص وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِّنْهُمْ أَحَدًا

অর্থাৎ আপনি আসহাবে কাহ্‌ফের সংখ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের সাথে বৃথা বিতর্কে

প্রবৃত্ত হবেন না ; বরং সাধারণ আলোচনা করুন। আপনি নিজেও তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না।

বিরোধপূর্ণ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা থেকে বিরত থাকা উচিত : বর্ণিত উভয় বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে আলিম সম্প্রদায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশক নীতি। কোন প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দিলে জরুরী বিষয়গুলো বর্ণনা করা উচিত। এরপরও যদি কেউ অনাবশ্যক আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়ে, তবে তার সাথে সাধারণ আলোচনা করে বিতর্ক শেষ করে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। নিজের দাবি প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যাওয়া এবং প্রতিপক্ষের দাবি খণ্ডনে অধিক জোর দেয়া অনুচিত। কারণ, এতে বিশেষ কোন উপযোগিতা নেই। উপরন্তু অতিরিক্ত আলোচনা ও কথা কাটাকাটিতে মূল্যবান সময়ও নষ্ট হয় এবং পরস্পরের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টিরও সম্ভাবনা থাকে।

দ্বিতীয় বাক্যে দ্বিতীয় নির্দেশ এই ব্যক্ত হয়েছে যে, ওহীর মাধ্যমে আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে যে পরিমাণ তথ্য আপনাকে সরবরাহ করা হয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। কারণ এতটুকুই যথেষ্ট। আরও বেশি জানার জন্য খোঁজাখুঁজি ও মানুষের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার এক উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে যে, তার অজ্ঞতা ও মূর্খতা জনসমক্ষে ফুটে উঠুক—এটাও পয়গম্বরী চরিত্রের পরিপন্থী তাই ভাল ও মন্দ উভয় উদ্দেশ্যে অপরকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۝ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ
وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ
مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ۝ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا
تِسْعًا ۝ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ
أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ
فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝

---

(২৩) আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলবেনই না যে, সেটি আমি আগামী কাল করব (২৪) 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে' বলা ব্যতিরেকে। যখন ভুলে যান, তখন আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন এবং বলুন : আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে এর

চাইতেও নিকটতম সত্যের পথনির্দেশ করবেন। (২৫) তাদের উপর তাদের গুহায় তিন শ' বছর, অতিরিক্ত আরও নয় বছর অতিবাহিত হয়েছে। (২৬) বলুন : তারা কতকাল অবস্থান করেছে, তা আল্লাহ্ই তাল জানেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শুনেন। তিনি ব্যতীত তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যদি লোকেরা আপনার কাছে কোন উত্তরসাপেক্ষ বিষয় জিজ্ঞেস করে এবং আপনি উত্তর দানের ওয়াদা করেন, তবে এর সাথে 'ইনশাআল্লাহ্' কিংবা এর সামর্থ-বোধক কোন বাক্য অবশ্যই সংযুক্ত করবেন, বরং বিশেষ করে ওয়াদার ক্ষেত্রেই নয়, প্রত্যেক কাজে এর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন যে) আপনি কোন কাজের বিষয় এমন বলবেন না যে, আমি তা (উদাহরণত) আগামীকাল করব, কিন্তু আল্লাহ্র চাওয়াকে (এর সাথে) যুক্ত করে নিন। [অর্থাৎ 'ইনশাআল্লাহ্' ইত্যাদিও সাথে সাথে বলে দিন। ভবিষ্যতে এমন না হওয়া চাই, যেমন এ ঘটনায় হয়েছে যে, লোকেরা আপনাকে রূহ্, আসহাবে কাহফ ও যুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করায় আপনি 'ইনশাআল্লাহ্' না বলেই তাদের সাথে আগামীকাল জওয়াব দানের ওয়াদা করেছেন। এরপর পনর দিন পর্যন্ত ওহী আসেনি, যদ্দরুন আপনি খুব চিন্তিত হয়েছেন। এই নির্দেশের সাথে সাথে প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের জওয়াব নাযিল হয়। (লুবাব)] এবং যখন আপনি ঘটনাচক্রে 'ইনশাআল্লাহ্' বলা (ভুলে যান, এবং পরে কোন সময় স্মরণ হয়) তবে (তখনই 'ইনশাআল্লাহ্' বলে) আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন এবং (তাদেরকে একথাও) বলে দিন যে, আশাকরি আমার পালনকর্তা আমাকে (নবুয়তের প্রমাণ হওয়ার দিক দিয়ে) এর (অর্থাৎ গুহাবাসীর কাহিনীর) চাইতেও সত্যের নিকটতম পথনির্দেশ করবেন। [উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা আমার নবুয়তের পরীক্ষা নেয়ার জন্য আসহাবে কাহফ ইত্যাদির কাহিনী জিজ্ঞেস করেছ, যা আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়ে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করেছেন। কিন্তু আসল কথা এই যে, নবুয়ত সপ্রমাণের জন্য এসব কাহিনীর প্রশ্ন ও উত্তর খুব বড় প্রমাণ হতে পারে না। এ কাজ তো ইতিহাস জানরাপ জানা থাকলে সাধারণ লোকও করতে পারে। আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা নবুয়ত সপ্রমাণের জন্য এর চাইতেও বড় অকাট্য প্রমাণাদি এবং মু'জিযা দান করেছেন। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রমাণ হচ্ছে স্বয়ং কোরআন। সমগ্র বিশ্ব মিলেও এর একটি আয়াতের অনুকরণে কোন সূরা রচনা করতে পারেনি। এ ছাড়া হযরত আদম (আ) থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের এমন ঘটনাবলী ওহীর মাধ্যমে আমাকে বলে দিয়েছেন, যেগুলো কালের দিক দিয়েও আসহাবে কাহ্ফ ও যুলকারনাইনের ঘটনার তুলনায় অধিক দূরবর্তী এবং যেগুলো সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করাও ওহী ব্যতীত কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। মোটকথা তোমরা তো আসহাবে কাহ্ফ ও যুলকারনাইনের ঘটনাকে অধিক আশ্চর্যজনক বলে মনে করে এগুলোকেই নবুয়ত পরীক্ষার প্রশ্ন হিসেবে পেশ করেছ, কিন্তু আল্লাহ্ তা'

আমাকে এর চাইতেও অধিক আশ্চর্যজনক বিষয়সমূহের জ্ঞান দান করেছেন)] এবং আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যার ব্যাপারে তারা যেমন মতভেদ করে, তেমনি তাদের নিদ্রার সময়কাল সম্পর্কেও তারা বিস্তর মতভেদ করে। আমি এ সম্পর্কে সঠিক কথা বলে দিচ্ছি যে, তারা তাদের গুহায় (নিদ্রিতাবস্থায়) তিন শ' বছরের পর আরও নয় বছর অবস্থান করেছে। (যদি এই সঠিক কথা শুনেও তারা মতভেদ করতে থাকে, তবে) আপনি বলে দিন: আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (নিদ্রিত) থাকার সময়কাল (তোমাদের চাইতে) অধিক জানেন। (তাই তিনি যা বলেছেন, তাই সঠিক। আর বিশেষ করে এ ঘটনার ক্ষেত্রেই কেন, তার তো অবস্থা এই যে) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও কত চমৎকার শুনেন। তিনি ব্যতীত তাদের অন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি কাউকে স্বীয় কর্তৃত্বে শরীক করেন না। (সারকথা এই যে, তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই এবং শরীকও নেই। এমন মহান সত্তার বিরোধিতাকে খুব ভয় করা উচিত।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত চার আয়াতেই আসহাবে কাহ্ফের কাহিনী সমাপ্ত হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম দু'আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতকালে কোন কাজ করার ওয়াদা বা স্বীকারোক্তি করলে এর সাথে 'ইনশাআল্লাহ্' বাক্যটি যুক্ত করতে হবে। কেননা, ভবিষ্যতে জীবিত থাকবে কিনা, তা কারও জানা নেই। জীবিত থাকলেও কাজটি করতে পারবে কিনা, তারও নিশ্চয়তা নেই। কাজেই মু'মিনের উচিত মনে মনে এবং মুখে স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্র উপর ভরসা করা ভবিষ্যতে কোন কাজ করার কথা বললে এভাবে বলা দরকার যদি আল্লাহ্ চান, তবে আমি এ কাজটি আগামীকাল করব। ইনশাআল্লাহ্ বাক্যের অর্থ তাই।

তৃতীয় আয়াতে একটি বিরোধপূর্ণ আলোচনার ফয়সালা করা হয়েছে। এতে আসহাবে কাহ্ফের আমলের লোকদের মতামতও বিভিন্নরূপ ছিল এবং বর্তমান যুগের ইহুদী ও খৃস্টানদের মতামতও বিভিন্নরূপ। অর্থাৎ গুহায় নিদ্রামগ্ন থাকার সময়কাল এ আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, এই সময়কাল তিন শ' নয় বছর। কাহিনীর শুরুতে فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا বলে যে বিষয়টি সংক্ষেপে বলা হয়েছিল, এখানে যেন তাই বর্ণনা করে দেয়া হল।

এরপর চতুর্থ আয়াতে আবার মতভেদকারীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা আসল সত্য জান না। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব অদৃশ্য বিষয়ে পরিজ্ঞাত, শ্রোতা ও দ্রষ্টা। তিনি তিন শ' নয় বছরের সময়কাল বর্ণনা করেছেন। এতেই সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত।

ভবিষ্যত কাজের জন্য ইনশাআল্লাহ্ বলা: 'লুবাব' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে প্রথম দু'আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, মক্কার কাফিররা

যখন ইহুদীদের শিক্ষা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি ইনশাআল্লাহ্ না বলেই তাদের সাথে আগামীকাল জওয়াব দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন। নৈকট্যশীলদেরকে সামান্য ত্রুটির জন্যও হুঁশিয়ার করা হয়। তাই পনের দিন পর্যন্ত কোন ওহী আগমন করেনি। রসূলুল্লাহ্ (সা) খুবই চিন্তিত হলেন। মুশরিকরা বিদ্রূপ ও উপহাসের সুযোগ পেল। পনের দিন বিরতির পর যখন এ সূরায় প্রশ্নের জওয়াব নাযিল হল, তখন এর সাথে হিদায়েতের জন্য এ দু'টি আয়াতও অবতীর্ণ হয় যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ করার কথা বলা হলে ইনশাআল্লাহ্ বলে এ কথার স্বীকারোক্তি করা উচিত যে, প্রত্যেক কাজ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আয়াতদ্বয়কে আসহাবে কাহ্ফের কাহিনীর শেষাংশে সংযুক্ত করা হয়েছে :

মাস'আলা : এ আয়াত থেকে প্রথমত জানা গেল যে, এরূপ ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ্ বলা মুস্তাহাব। দ্বিতীয়ত যদি ভুলক্রমে বাক্যটি না বলা হয়, তবে যখনই স্মরণ হয়, তখনই তা বলা দরকার। আয়াতে বর্ণিত বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য এ বিধান। অর্থাৎ শুধু বরকতলাভ ও দাসত্বের স্বীকারোক্তির জন্য এ বাক্য বলা উদ্দেশ্য—কোন শর্ত লাগানো উদ্দেশ্য নয়। কাজেই এ থেকে জরুরী হয় না যে, কেনাবেচা ও পারস্পরিক চুক্তির মধ্যেও অনুরূপ বিধান হবে। কেনাবেচার মধ্যে শর্ত লাগানো হয়, এবং উভয় পক্ষের জন্য শর্ত লাগানোর উপর পারস্পরিক চুক্তি নির্ভরশীল থাকে। এসব ক্ষেত্রেও যদি চুক্তির সময় শর্ত লাগানো ভুলে যায় এবং পরে কোন সময় স্মরণে আসে, তবে যা ইচ্ছা তা শর্ত লাগাতে পারবে না। এ মাস'আলায় কোন কোন ফিকাহ্বিদ ভিন্ন মতও পোষণ করেন। বিস্তারিত বিবরণ না ফিকাহ্ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় আয়াতে গুহায় নিদ্রার সময়কাল তিন শত বছর বলা হয়েছে। কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে বাহ্যত এ কথাই বোঝা যায় যে, এই সময়কাল আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাসীরের মতে এটাই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিক-সংখ্যক তফসীরবিদদের উক্তি। আবু হাইয়ান, কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদও তাই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হযরত কাতাদাহ প্রমুখ থেকে এ সম্পর্কে আরও একটি উক্তি বর্ণিত আছে। তা এই যে, তিন শত বছরের সময়কালের উক্তিটিও উপরোক্ত মতভেদ-কারীদের কারও কারও পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার উক্তি হচ্ছে শুধু اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا বাক্যটি। কেননা, তিন শত নয় বছর নির্দিষ্ট করার কথাটি যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়, তবে পরে اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا বলার কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদরা বলেন যে, উভয় বাক্যই আল্লাহ্ তা'আলার কালাম। প্রথম বাক্যে বাস্তব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্যে এর সাথে বিরোধ পোষণকারীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সময়কাল বর্ণিত হয়ে গেছে তখন একে মেনে নেয়া অপরিহার্য। তিনিই জানেন। নিছক অনুমান ও মতামতের ভিত্তিতে এর বিরোধিতা করা নির্বুদ্ধিতা।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, কোরআন পাক সময়কাল বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথমে তিন শত বছর বর্ণনা করেছে। এরপর বলেছে যে, এই তিন শতের উপর আরও নয় বেশি। প্রথমেই তিন শত নয় বলেনি কেন? তফসীরবিদগণ এর কারণ লিখেছেন যে, ইহুদী ও খৃস্টানদের মধ্যে সৌর বর্ষের প্রচলন ছিল। এই হিসাবে মোট তিন শত বছরই হয়। ইসলামে চান্দ্র-বর্ষ প্রচলিত। চান্দ্র বর্ষের হিসাবে প্রতি একশত বছরে তিন বছর বেড়ে যায়। তাই তিন শত সৌর বছরে চান্দ্র বছর হিসাবে তিন শত নয় বছর হয়। এই দুই প্রকার বর্ষপঞ্জীর পার্থক্য বোঝাবার জন্য উপরোক্ত ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখানে আরও একটি প্রশ্ন হয় যে, আসহাবে কাহ্‌ফের ব্যাপারে স্বয়ং তাদের আমলে, অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যুগে ইহুদী ও খৃস্টানদের মধ্যে দু'টি বিষয়ে মতভেদ ছিল। এক. আসহাবে কাহ্‌ফের সংখ্যা এবং দুই. গুহায় তাদের নিদ্রার সময়কাল। কোরআন পাক উভয় বিষয় একটু পার্থক্য সহকারে বর্ণনা করেছে। সংখ্যায় বর্ণনা পরিষ্কার ভাষায় করেনি—ইঙ্গিতে করেছে। অর্থাৎ যে উক্তিটি নির্ভুল ছিল, তার খণ্ডন করেনি। কিন্তু সময়কাল পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে বলেছে:

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا—কারণ এই যে, এই বর্ণনা পদ্ধতির মাধ্যমে কোরআন একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। তা এই যে, সংখ্যায় আলোচনা একেবারেই অনর্থক। এর সাথে কোন পার্থিব ও ধর্মীয় মাস'আলার সম্পর্ক নেই। তবে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানবীয় অভ্যাসের বিরুদ্ধে নিদ্রামগ্ন থাকা এবং পানাহার ছাড়া সুস্থ ও সবল থাকা এরপর দীর্ঘ দিন পর সুস্থ অবস্থায় উঠে বসা—এগুলোর হাশর ও নশরের দৃষ্টান্ত এবং কিয়ামত ও পরকালের প্রমাণ হতে পারে তাই বিষয়টিকে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

যেসব লোক মু'জিযা ও অভ্যাস বিরোধী ঘটনাবলী অস্বীকার করে, না হয় প্রাচ্য-শিক্ষা বিশারদ পাশ্চাত্যের ইহুদী ও খৃস্টান লেখক কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তিতে ভীত হয়ে এগুলোতে নানা ধরনের সদর্থ বর্ণনা করার প্রয়াস পায়, তারা আলোচ্য আয়াতেও হযরত কাতাদাহর তফসীর অবলম্বন করে তিন শত নয় বছরের সময়কাল তৎকালীন লোকদের উক্তি সাব্যস্ত করে খণ্ডন করার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু তারা এ বিষয়ে চিন্তা করেনি যে, কাহিনীর শুরুতে سِنِينَ عَدَدًا বলা হয়েছে, তা আল্লাহ্ তা'আলার উক্তি ছাড়া কারও উক্তি হতে পারে না। অভ্যাসবিরুদ্ধ ঘটনা ও কারামত প্রমাণ করার জন্য কয়েক বছর নিদ্রামগ্ন থেকে সুস্থ ও সবল অবস্থায় উঠে বসা যথেষ্ট। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ

وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ

يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿٢٨﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۗ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۙ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ ۗ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۗ نِعْمَ الثَّوَابُ ۗ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

(২৭) আপনার প্রতি আপনার পালনকর্তার যে কিতাব প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে, তা পাঠ করুন। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। তাঁকে ব্যতীত আপনি কখনই কোন আশ্রয়স্থান পাবেন না। (২৮) আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। (২৯) বলুনঃ 'সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক।' আমি জালিমদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেওয়া হবে যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়। (৩০) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার

নষ্ট করি না। (৩১) তাদেরই জন্য আছে বসবাসের জান্নাত। তাদের পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। তাদের তথায় স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করবে এমতাবস্থায় যে, তারা সিংহাসনে সমাসীন হবে। চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (আপনার কাজ এতটুকু যে) আপনার প্রতি আপনার পালনকর্তার যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তা (লোকদের সামনে) পাঠ করুন। (এর বেশি চিন্তা করবেন না যে, বড় লোকেরা যদি ইসলামের বিরোধিতা করতে থাকে, তবে ইসলামের উন্নতি কিভাবে হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং এর ওয়াদা করেছেন। এবং), তাঁর বাক্যকে (অর্থাৎ ওয়াদাসমূহকে) কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। (অর্থাৎ সারা বিশ্বের বিরোধীরা মিলেও আল্লাহ্‌কে ওয়াদা পূর্ণ করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না। আল্লাহ্ নিজে যদিও পরিবর্তন করতে সক্ষম, কিন্তু তিনি পরিবর্তন করবেন না।) এবং (যদি আপনি আল্লাহ্‌র বিধান বর্জন করে বড়লোকদের মনোরঞ্জন করেন, তবে) আপনি আল্লাহ্ ব্যতীত কখনই কোন আশ্রয়ের স্থান পাবেন না। (শরীয়তের প্রমাণাদির ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র বিধান বর্জন করা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু এখানে তাকীদের জন্য অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে একথা বলা হয়েছে)। এবং (আপনাকে যেমন কাফিরদের ধনী ও বড়লোকদের দিক থেকে বেপরওয়া থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনি মুসলমান নিঃস্বদের অবস্থার প্রতি আরও মনোযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে আদেশ করা হচ্ছে। সুতরাং) আপনি নিজেকে তাদের সাথে (উঠাবসায়) আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সব সময়) তাদের পালনকর্তার ইবাদত শুধু তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে (কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে নয়) এবং পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে আপনি তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি (অর্থাৎ মনোযোগ) ফিরিয়ে নেবেন না। (পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে—অর্থ বড়লোকেরা মুসলমান হয়ে গেলে ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে ধন-সম্পদ দ্বারা ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় না, বরং আন্তরিকতা ও আনুগত্যের দ্বারা বৃদ্ধি পায়। দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যেও আন্তরিকতা ও আনুগত্য থাকলে তাতে ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। (গরীব মুসলমানদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দেওয়া সম্পর্কে) এরূপ ব্যক্তির আবদার মানবেন না, যার মনকে আমি (তার হঠকারিতার শাস্তিস্বরূপ) আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে রেখেছি। সে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং তার এ অবস্থা (অর্থাৎ প্রবৃত্তির অনুসরণ) সীমা অতিক্রম করছে। আপনি (সে কাফির সরদারদেরকে বলে দিন ঃ (এ) সত্য (ধর্ম) তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক আর যার ইচ্ছা, কাফির থাকুক। (আমার কোন লাভ ক্ষতি নেই। লাভ ক্ষতি স্বয়ং তারই। তা এই যে) নিশ্চয় আমি জালিমদের জন্য (দোযখের) আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বলয় তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে। (অর্থাৎ বলয়গুলোও আগুনের তৈরি। হাদীসে রয়েছে,

তারা এই বলয় অতিক্রম করতে পারবে না।) যদি তারা (পিপাসায় কাতর হয়ে) পানীয় প্রার্থনা করে, তবে এমন পানীয় দ্বারা তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করা হবে, যা (কুশ্রী হওয়ার দিক দিয়ে) তেলের গাদের মত হবে (এবং এত উত্তপ্ত হবে যে, কাছে আনতেই) মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। (ফলে মুখমণ্ডলের চামড়া উঠে যাবে। হাদীসে তাই বলা হয়েছে।) কতই না নিকৃষ্ট হবে সে পানীয় এবং কতই না মন্দ জায়গা হবে সে দোযখ। (এ হচ্ছে বিশ্বাস স্থাপন না করার ক্ষতি। এখন বিশ্বাস স্থাপন করার লাভ বর্ণিত হচ্ছে —) নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, আমি সৎ কর্মীদের প্রতিদান নষ্ট করি না। এমন লোকদের জন্য সর্বদা বসবাসের বাগান রয়েছে। তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহর। তাদেরকে সেখানে স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ পরিধেয় পরিধান করবে (এবং) সেখানে সিংহাসনে হেলান দিয়ে উপবেশন করবে। কি চমৎকার প্রতিদান এবং (জান্নাত) কতই না উত্তম আশ্রয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দাওয়াত ও তাবলীগের বিশেষ রীতি : وَاصْبِرْ نَفْسَكَ এ আয়াতের শানে-নুযূল প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সবগুলোই আয়াত অবতরণের কারণ হতে পারে। বগভী বর্ণনা করেন, মক্কার সরদার ওয়ায়না ইবনে হিস্ন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দরবারে উপস্থিত হয়। তখন তাঁর কাছে হযরত সালমান ফারেসী (রা) উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র সাহাবীদের অন্যতম। তাঁর পোশাক ছিন্ন এবং আকার-আকৃতি ফকীরের মত ছিল। তাঁর মত আরও কিছুসংখ্যক দরিদ্র ও নিঃস্ব সাহাবী মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। ওয়ায়না বলল : এই লোকদের কারণেই আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না এবং আপনার কথা শুনতে পারি না। এমন ছিন্নমূল মানুষের কাছে আমরা বসতে পারি না। আপনি হয় তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে রাখুন, না হয় আমাদের জন্য আলাদা এবং তাদের জন্য আলাদা মজলিস অনুষ্ঠান করুন।

ইবনে মরদুয়াইহ্, আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, উমাইয়া ইবনে খলফ জমহী রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পরামর্শ দেন যে, দরিদ্র, নিঃস্ব ও ছিন্নমূল মুসলমানদেরকে আপনি নিজের কাছে রাখবেন না, বরং কুরায়শ সরদারদেরকে সাথে রাখুন। এরা আপনার ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেলে ধর্মের খুব উন্নতি হবে।

এ ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়—এতে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। শুধু নিষেধই নয়—আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ—অর্থাৎ আপনি নিজেকে তাদের সাথে বেঁধে রাখুন। এর অর্থ এরূপ নয় যে, কোন সময় পৃথক হবেন না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, সম্পর্ক ও মনোযোগ তাদের প্রতি নিবদ্ধ রাখুন। কাজে-কর্মে তাদের কাছ থেকেই পরামর্শ নিন।

এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, তারা সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র ইবাদত ও যিকির করে। তাদের কার্যকলাপ একান্তভাবেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিবেদিত। এসব অবস্থা আল্লাহ্র সাহায্য ডেকে আনে। আল্লাহ্র সাহায্য তাদের জন্যই আগমন করে। ক্ষণস্থায়ী দুরবস্থা দেখে অস্থির হবেন না। পরিণামে সাহায্য ও বিজয় তারাই লাভ করবে।

কুরায়শ সরদারদের পরামর্শ কবুল না করার কারণও আয়াতের শেষে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের মন আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফিল এবং তাদের সমস্ত কার্যকলাপ তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসারী। এ সব অবস্থা মানুষকে আল্লাহ্র রহমত ও সাহায্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তাদের জন্য আলাদা মজলিস করার পরামর্শটি তো গ্রহণযোগ্য ছিল। এর ফলে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো এবং তাদের পক্ষে তা কবুল করা সহজ হত। কিন্তু এ ধরনের মজলিস বন্টনের মধ্যে অবাধ্য ধনীদের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখানো হত। ফলে দরিদ্র মুসলমানদের মন ভেঙে যেত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তা পছন্দ করেন নি এবং এ ব্যাপারে পার্থক্য না করাকেই দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি স্থির করেছেন।

জান্নাতীদের অলংকার ঃ يُحَلَّوْنَ فِيهَا—এ আয়াতে জান্নাতী পুরুষদেরকেও স্বর্ণের কংকন পরিধান করানোর কথা বলা হয়েছে। এতে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অলংকার পরিধান করা পুরুষদের জন্য যেমন শোভনীয় নয়, তেমনি সৌন্দর্য ও সাজসজ্জাও নয়। তাদেরকে কংকন পরানো হলে তারা বিশ্রী হয়ে যাবে।

উত্তর এই যে, শোভা ও সৌন্দর্য প্রথা ও প্রচলনের অনুসারী। এক দেশে যাকে শোভা ও সৌন্দর্য মনে করা হয়, অন্য দেশে প্রায়ই তাকে ঘৃণার বস্তু বলে বিবেচনা করা হয়। এর বিপরীতও হয়ে থাকে। এমনিভাবে এক সময় কোন বিশেষ বস্তু সৌন্দর্য বলে বিবেচিত হয়, অন্য সময়ে তাকেই দোষ মনে করা হয়। জান্নাতে পুরুষদের জন্যও অলংকার এবং রেশমী বস্ত্র শোভা ও সৌন্দর্য সাব্যস্ত করা হলে তা কারও কাছে অপরিচিত ঠেকবে না। এটা শুধু দুনিয়ার আইন যে, এখানে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের কোন অলংকার এমনকি স্বর্ণের আংটি, ঘড়ির চেইন ইত্যাদিও ব্যবহার করা জায়েয নয়। এমনিভাবে রেশমী বস্ত্রও পুরুষদের জন্য জায়েয নয়। কিন্তু জান্নাত পৃথক এক জগত। সেখানে এ আইন থাকবে না।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۝ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ

أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾ وَّكَانَ لَهٗ

ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ

نَفَرًا ﴿٣٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ

تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ

اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ

وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ

نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ

بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ

لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٣٩﴾

فَعَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا

حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾ اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا

غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ﴿٤١﴾ وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ

كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ

يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ﴿٤٢﴾ وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿٤٣﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ

الْحَقِّ ۭ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾

(৩২) তুমি উহাদের নিকট পেশ কর দুই ব্যক্তির উপমা : উহাদের একজনকে আমি দিয়েছিলাম দুইটি দ্রাক্ষা-উদ্যান এবং এই দুইটিকে আমি খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছিলাম ও এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করিয়াছিলাম শশ্যক্ষেত্র। (৩৩) উভয় উদ্যানই ফলদান করিত

এবং তা থেকে কিছুই হ্রাস করত না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে আমি নহর প্রবাহিত করেছি। (৩৪) সে ফল পেল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সঙ্গীকে বলল ঃ আমার ধন-সম্পদ তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী। (৩৫) নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল ঃ আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। (৩৬) এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। যদি কখনও আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে দেওয়া হয়, তবে সেখানে এর চাইতে উৎকৃষ্ট পাব। (৩৭) তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসংগে বলল ঃ তুমি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, অতঃপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে ? (৩৮) কিন্তু আমি তো একথাই বলি, আল্লাহ্‌ই আমার পালনকর্তা এবং আমি কাউকে আমার পালনকর্তার শরীক মানি না। (৩৯) যদি তুমি আমাকে ধনে ও সন্তানে তোমার চাইতে কম দেখ, তবে যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন একথা কেন বললে না, আল্লাহ্ যা চান, তাই হয়। আল্লাহ্‌র দেওয়া ব্যতীত কোন শক্তি নেই। (৪০) আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তার (তোমার বাগানের) উপর আসমান থেকে আগুন প্রেরণ করবেন। অতঃপর সকাল বেলায় তা পরিষ্কার ময়দান হয়ে যাবে। (৪১) অথবা সকালে তার পানি শুকিয়ে যাবে। অতঃপর তুমি তা তালাশ করে আনতে পারবে না। (৪২) অতঃপর তার সব ফল ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল, তার জন্য সকালে হাত কচলিয়ে আক্ষেপ করতে লাগল। বাগানটি কাঠসহ পুড়ে গিয়েছিল। সে বলতে লাগল ঃ হায়, আমি যদি কাউকে আমার পালনকর্তার সাথে শরীক না করতাম। (৪৩) আল্লাহ্ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোক হল না এবং সে নিজেও প্রতিকার করতে পারল না। (৪৪) এরূপ ক্ষেত্রে সব অধিকার সত্য আল্লাহ্‌র। তাঁরই পুরস্কার উত্তম এবং তাঁরই প্রদত্ত প্রতিদান শ্রেষ্ঠ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আপনি (দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা ও পরকালের স্থায়িত্ব প্রকাশ করার জন্য) দু'ব্যক্তির উদাহরণ (যাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল) বর্ণনা করুন (যাতে কাফিরদের ধারণা বাতিল হয়ে যায় এবং মুসলমানরা সান্ত্বনা লাভ করে)। তাদের একজনকে (যে ধর্মবিমুখ ছিল) আমি আঙ্গুরের দু'টি বাগান দিয়েছিলাম এবং এ দু'টিকে খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম এবং উভয় (বাগান) এর মাঝখানে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র। উভয় বাগান পুরোপুরি ফলদান করত এবং কোনটির ফলেই সামান্যও ত্রুটি হত না (সাধারণ বৃক্ষ এর বিপরীত। কোন সময় কোন বৃক্ষে এবং কোন বছর সব বৃক্ষে ফল কম আসে।) এবং উভয় বাগানের ফাঁকে ফাঁকে নহর প্রবাহিত করেছিলাম। তার কাছে আরও ধনসম্পদ ছিল। অতঃপর (একদিন) সে সঙ্গীকে কথা প্রসঙ্গে বলল ঃ আমার ধনসম্পদ তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলেও আমি অধিক শক্তিশালী। (উদ্দেশ্য এই যে, তুমি আমার পথকে বাতিল এবং আল্লাহ্‌র কাছে অপছন্দনীয় বলে থাক। এখন তুমি নিজেই

দেখে নাও যে, কে ভাল? তোমার দাবী সঠিক হলে ব্যাপার উল্টো হত। কেননা, শত্রুকে কেউ ঐশ্বর্য দান করে না এবং বন্ধুকে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত করে না।) এবং সে (সঙ্গীকে সাথে নিয়ে) নিজের উপর অপরাধ (কুফর) প্রতিষ্ঠিত করতে করতে বাগানে প্রবেশ করল (এবং) বলল ঃ আমি তো মনে করি না যে, এই বাগান (আমার জীবদ্দশায়) কখনও বরবাদ হয়ে যাবে। (এ থেকে বোঝা গেল যে, সে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর কুদরতে বিশ্বাসী ছিল না। শুধু বাহ্যিক হিফাযতের ব্যবস্থা দেখে সে একথা বলেছে)। এবং (এমনিভাবে) আমার মনে হয় না যে, কিয়ামত হবে এবং যদি (অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে) কিয়ামত হয়েই যায় এবং আমি আমার পালনকর্তার কাছে পৌঁছানো হই (যেমন, তুমি মনে কর) তবে অবশ্যই এ বাগানের চাইতে অনেক উত্তম জায়গা আমি পাব। কেননা, জান্নাতের জায়গা যে দুনিয়া থেকে উত্তম, তা তো তুমিও স্বীকার কর। একথাও তুমি স্বীকার কর যে, জান্নাত আল্লাহর প্রিয় বান্দারা পাবে। আমি যে প্রিয় এর লক্ষণাদি তো দুনিয়াতেই দেখতে পাচ্ছ। আমি আল্লাহর প্রিয় না হলে এমন বাগান কিরূপে পেতাম। তাই তোমার স্বীকারোক্তি অনুযায়ীও আমি সেখানে দুনিয়ার চাইতে উত্তম বাগান পাব। (তার এসব কথা শুনে) তার (দীনদার দরিদ্র) সঙ্গী বলল ঃ তুমি কি (তওহীদ ও কিয়ামত অস্বীকারের মাধ্যমে) তাকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে (প্রথমে) মাটি থেকে [হযরত আদম (আ)-এর মধ্যস্থতায়] সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর (তোমাকে) বীর্য থেকে (মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেছেন এবং) অতঃপর তোমাকে সুস্থ-সবল মানুষ বানিয়েছেন? (এতদসত্ত্বেও তুমি যদি তওহীদ ও কিয়ামত অস্বীকার করতে চাও কর) কিন্তু আমি বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ্ আমার পালনকর্তা এবং আমি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। (আল্লাহর একত্ব ও কুদরত যখন প্রত্যেক বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত তখন বাগানের উন্নতি ও হিফাযতের সব ব্যবস্থা যে কোন সময় অকেজো হয়ে বাগান ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই মহা ব্যবস্থাপক আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি রাখাই তোমার উচিত ছিল।) তুমি যখন তোমার বাগানে পৌঁছেছিলে, তখন একথা কেন বললে না যে, আল্লাহ্ যা চান, তাই হয় (এবং) আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত (কারও) কোন শক্তি নেই। (যত দিন আল্লাহ্ চাইবেন, এ বাগান থাকবে এবং যখন চাইবেন ধ্বংস হয়ে যাবে)। যদি তুমি আমাকে ধনসম্পদ ও সন্তানে কম দেখ (যে কারণে তুমি নিজেকে প্রিয় মনে করছ), তবে আমি সে সময়টি নিকটবর্তী দেখছি, যখন আমার পালনকর্তা আমাকে তোমার বাগানের চাইতে উত্তম বাগান দেবেন (দুনিয়াতেই কিংবা পরকালে) এবং তার (অর্থাৎ তোমার বাগানের) উপর আসমান থেকে কোন নির্ধারিত বিপদ (অর্থাৎ সাধারণ কারণাদির মধ্যস্থতা ছাড়াই) প্রেরণ করবেন। ফলে বাগানটি হঠাৎ একটি পরিষ্কার ময়দান হয়ে যাবে অথবা তার পানি (যা নহরে প্রবাহিত রয়েছে) সম্পূর্ণ নিচে (ভূগর্ভে) নেমে (শুকিয়ে) যাবে। অতঃপর তুমি (তা পুনর্বার আনার ও বের করার) চেষ্টাও করতে পারবে না। (এখানে ধার্মিক সঙ্গী অধার্মিকের বাগানের জওয়াব দিয়েছে), কিন্তু সন্তান সম্পর্কে কোন জওয়াব দেয়নি। এর কারণ সম্ভবত এই যে, সন্তানের প্রাচুর্য তখনই সুখকর হয় যখন তাদের লালন-পালনের জন্য প্রচুর অর্থ-সম্পদও থাকে। অন্যথায় তা বিপদ বৈ নয়। এ বাক্যের সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে আল্লাহ্ তোমাকে

ধনৈশ্বর্য দান করেছেন, এটাই তোমার কুবিভ্রান্তি হওয়ার কারণ। ধন-সম্পদকে তুমি আল্লাহ্‌র প্রিয় হওয়ার লক্ষণ মনে করে নিয়েছ এবং আমার ধন-সম্পদ নেই বলে তুমি আমাকে আল্লাহ্‌র অপ্রিয় মনে করছ। দুনিয়ার ধনদৌলতকে আল্লাহ্‌র প্রিয় হওয়ার ভিত্তি মনে করাটাই বড় ধোঁকা ও বিভ্রান্তি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার নিয়ামত সাপ, বিচ্ছু, ব্যাঘ্র ও দুষ্কর্মী সবাইকে দান করেন। পরকালের নিয়ামতই আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয় হওয়ার আসল মাপকাঠি। পরকালের নিয়ামত অক্ষয় এবং দুনিয়ার নিয়ামত ধ্বংসশীল) এবং (এই কথাবার্তার পর ঘটনা এই ঘটল যে) তার সব ধনসম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য হাত কচলিয়ে আক্ষেপ করতে লাগল। বাগানটি কাঠামোসহ ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। সে বলতে লাগল : হায় আমি যদি কাউকে আমার পালনকর্তার সাথে শরীক না করতাম। (এ থেকে জানা গেল যে, বাগান ধ্বংস হওয়ার পর তার বুঝতে বাকী রইল না যে, কুফর ও শিরকের কারণেই এ বিপদ এসেছে। কুফর না করলে প্রথমত বোধ হয় এ বিপদই আসত না, আর এলেও তার প্রতিদান পরকালে পাওয়া যেত। এখন ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে শুধু ক্ষতিই ক্ষতি। কিন্তু এতটুকু আফসোস ও পরিতাপ দ্বারা তার ঈমান প্রমাণিত হয় না। কেননা এই পরিতাপ দুনিয়ার ক্ষতির কারণে হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্‌র তওহীদ ও কিয়ামতের স্বীকৃতি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে মু'মিন বলা যায় না।) এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোকজন হল না (সে নিজের জনবল ও সন্তানাদির উপর গর্ব করত, তাও শেষ হল।) এবং সে নিজে (আমার কাছ থেকে) প্রতিশোধ নিতে পারল না। এরূপ ক্ষেত্রে সাহায্য করা একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌রই কাজ। (পরকালেও) তাঁরই সওয়াব সর্বোত্তম এবং (দুনিয়াতেও) তাঁরই পুরস্কার সর্বশ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ প্রিয় বান্দাদের কোন ক্ষতি হয়ে গেলে উভয় জাহানে তার শুভ ফল পাওয়া যায়, কিন্তু কাফির পুরোপুরিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ – ثَمَر শব্দের অর্থ বৃক্ষের ফল এবং সাধারণ ধনসম্পদ। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাহ থেকে দ্বিতীয় অর্থ বর্ণিত হয়েছে। (ইবনে কাসীর) কামুস গ্রন্থে আছে, ثَمَر শব্দটি বৃক্ষের ফল এবং নানা রকমের ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ থেকে জানা যায় যে, লোকটির কাছে শুধু ফলের বাগান ও শস্যক্ষেত্রই ছিল না, বরং স্বর্ণ-রৌপ্য ও বিলাস-ব্যসনের যাবতীয় সাজসরঞ্জামও বিদ্যমান ছিল। স্বয়ং তার বাক্য, যা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا ও এ অর্থই বোঝায়।

مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ — শো'আবুল ঈমানে হযরত আনাসের রেওয়ায়েত ক্রমে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : কোন পছন্দনীয় বস্তু দেখার পর যদি مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ বলে দেওয়া হয়, তবে কোন বস্তু তার ক্ষতি করতে

পারবে না। (অর্থাৎ পছন্দনীয় বস্তুটি নিরাপদ থাকবে) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তু দেখে এই কলেমা পাঠ করলে তা 'চোখ লাগা' বা বদ নজর থেকে নিরাপদ থাকবে।

حُسْبَانًا—হযরত কাতাদাহর মতে এর তফসীর আযাব। ইবনে আব্বাস এর অর্থ নিয়েছেন অগ্নি এবং কেউ কেউ অর্থ নিয়েছেন প্রস্তর বর্ষণ। أُحِيطَ بِثَمَرِهِ এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, তার বাগান ও ধনসম্পদের উপর কোন নৈসর্গিক বিপদ পতিত হল। ফলে সব ধ্বংস হয়ে গেল। কোরআন পরিষ্কার ভাবে কোন বিশেষ বিপদের নামোল্লেখ করেনি। বাহ্যত বোঝা যায় যে, কোন নৈসর্গিক আগুন এসে সবগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস থেকেও حسبان শব্দের তফসীরে আগুনই বর্ণিত আছে। والله اعلم

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۝ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ۝ وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۢ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ۝ وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰىهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۝

(৪৫) তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির ন্যায় যা আমি আকাশ থেকে নাযিল করি। অতঃপর এর সংমিশ্রণে শ্যামল-সবুজ ভূমিজ লতা-পাতা নির্গত হয়, অতঃপর তা এমন শুষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ্ এ সবকিছুর উপর শক্তিমান। (৪৬) ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্য উত্তম। (৪৭) যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালনা করব এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর এবং আমি মানুষকে একত্র করব অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না। (৪৮) তারা আপনার পালনকর্তার সামনে পেশ হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবেঃ তোমরা আমার কাছে এসে গেছ, যেমন তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলাম। না, তোমরা তো বলতে যে, আমি তোমাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না। (৪৯) আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে ; তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবেঃ হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা। এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি — সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ইতিপূর্বে পার্থিব জীবন ও তার ক্ষণভঙ্গুরতা একটি ব্যক্তিগত উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছিল। এখন এ বিষয়টিই একটি সামগ্রিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে।) আপনি তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উদাহরণ বর্ণনা করুন, তা পানির ন্যায় যা আমি আকাশ থেকে নাযিল করি। অতঃপর এর (পানি) দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ খুব ঘন হয়ে উঠে। অতঃপর তা (সে সবুজ-শ্যামল ও তরতাজা হওয়ার পর শুকিয়ে) এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। (দুনিয়ার অবস্থাও তাই। আজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর দেখা গেলে কাল তার নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকবে না।) আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুর উপর শক্তিমান। (যখন ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন—উন্নতি দান করেন এবং যখন ইচ্ছা, ধ্বংস করে দেন। পার্থিব জীবনের যখন এই অবস্থা এবং) ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি (যখন) পার্থিব জীবনের শোভা (এবং তারাই আনুষঙ্গিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, তখন স্বয়ং ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি তো আরও বেশী দ্রুত ধ্বংসশীল হবে।) এবং স্থায়ী সৎ-কর্মসমূহ আপনার পরওয়ারদিগারের কাছে (অর্থাৎ পরকালে এ দুনিয়ার চাইতে) প্রতি-দানের দিক দিয়েও (হাজার গুণ) উত্তম এবং আশার দিক দিয়েও (হাজার গুণ) উত্তম। (অর্থাৎ সৎ কর্ম দ্বারা যেসব আশা করা হয়, সেগুলো পরকালে অবশ্যই পূর্ণ হবে এবং আশার চাইতেও বেশী সওয়াব পাওয়া যাবে। দুনিয়ার আসবাবপত্র এর বিপরীত। এর দ্বারা দুনিয়াতেও মানুষের আশা পূর্ণ হয় না এবং পরকালে তো আশা পূরণের কোন সম্ভাবনাই নেই।) সেদিনের কথা স্মরণ করা উচিত, যেদিন আমি পাহাড়গুলো (তাদের অবস্থান থেকে) সরিয়ে দেব (প্রথমে এরূপ হবে। তারপর পাহাড়গুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে

যাবে।) এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর (কেননা পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষলতা, ঘরবাড়ী ইত্যাদি কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না) এবং আমি সবাইকে (কবর থেকে উত্থিত করে হাশরের ময়দানে) সমবেত করব এবং (সেখানে না এনে) তাদের কাউকে ছাড়বে না। তারা সবাই আপনার পালনকর্তার সামনে (অর্থাৎ হিসাবের কাঠ-গড়ায়) সারিবদ্ধভাবে পেশ হবে (কেউ কারও আড়ালে আত্মগোপন করার সুযোগ পাবে না। তাদের মধ্যে যারা কিয়ামত অস্বীকার করত, তাদেরকে বলা হবেঃ) দেখ শেষ পর্যন্ত তোমরা আমার কাছে (পুনর্জন্ম লাভ করে) এসে গেছ, যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথমবার (অর্থাৎ দুনিয়াতে) সৃষ্টি করেছিলাম (কিন্তু তোমরা প্রথম জন্ম দেখা সত্ত্বেও এ পুনর্জন্মে বিশ্বাসী হওনি) বরং তোমরা মনে করতে যে, আমি তোমাদের (পুনরায় সৃষ্টির জন্য) কোন প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না। আর আমলনামা (ডান হাতে অথবা বাম হাতে দিয়ে তার সামনে) রেখে দেওয়া হবে, (যেমন, অন্য এক আয়াতে আছে وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا) তখন আপনি অপ-রাধীদেরকে দেখবেন যে, তাতে যা কিছু (লিখিত) আছে, (তা দেখে) তার কারণে (অর্থাৎ তার শাস্তির কারণে) ভীত-সন্ত্রস্ত হচ্ছে। তারা বলবেঃ হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা! এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি! তারা যা কিছু (দুনিয়াতে) করেছিল, সব (লিখিত আকারে) উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না। (যে করা হয়নি, এমন গোনাহ্ লিপিবদ্ধ করবেন অথবা শর্তাদিসহ যে সৎ কাজ করা হয়, তা লিপিবদ্ধ করবেন না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ—মসনদে আহ্মদ, ইবনে হাইয়্যান ও হাকিম হযরত আবু সায়ীদ খুদরীর বাচনিক বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যত বেশী সম্ভব بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ অর্জন কর। নিবেদন করা হল, بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ কি? তিনি বললেনঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পাঠ করা। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

ওকায়লী নো'মান ইবনে বশীরের বাচনিক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এ উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ—এগুলোই হচ্ছে بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ— এ বিষয়বস্তুই তাবারানী হযরত সা'দ ইবনে ওবাদার বাচনিক

বর্ণনা করেছেন। সহীহ্ মুসলিমও তিরমিযী হযরত আবু হুরায়রার বাচনিক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এ উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَر কলেমাটি আমার কাছে সেসব বস্তুর চাইতে অধিক প্রিয়, যেগুলোর উপর সূর্যকিরণ পতিত হয় অর্থাৎ সারা বিশ্বের চাইতে।

হযরত জাবের বলেন : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ কলেমাটি অধিক পরিমাণে পাঠ কর। কেননা, এটি রোগ ও কষ্টের নিরানব্বইটি অধ্যায় দূর করে দেয়। তন্মধ্যে সবচাইতে নিম্নস্তরের কষ্ট হচ্ছে চিন্তাভাবনা।

এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে بَاقِيَاتُ صَالِحَاتُ শব্দটির তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরামা ও মুজাহিদ তাই করেছেন যে, এর দ্বারা উপরোক্ত কলেমাসমূহ পাঠ করা বোঝানো হয়েছে। সায়ীদ ইবনে জুবায়র, মসরুক ও ইবরাহীম বলেন যে, بَاقِيَاتُ صَالِحَاتُ -এর অর্থ পাঞ্জেগানা নামায।

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, بَاقِيَاتُ صَالِحَاتُ বলে উপরোক্ত কলেমাসহ সাধারণ সৎ কর্ম বোঝানো হয়েছে—তা পাঞ্জেগানা নামাযই হোক অথবা অন্যান্য সৎ কর্ম হোক—সবই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত কাতাদাহ্ থেকে এ তফসীরই বর্ণিত হয়েছে—(মাযহারী)

এ তফসীর কোরআনের শব্দাবলীরও অনুকূল বটে। কেননা, بَاقِيَاتُ صَالِحَاتُ -এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে স্থায়ী সৎ কর্মসমূহ। বলাবাহুল্য সব সৎ কর্মই আল্লাহ্‌র কাছে স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত। ইবনে জরীর, তাবারী ও কুরতুবী এ তফসীরই পছন্দ করেছেন।

হযরত আলী (রা) বলেন : শস্যক্ষেত্র দু'রকম : দুনিয়ার ও পরকালের। দুনিয়ার শস্যক্ষেত্র হচ্ছে অর্থসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আর পরকালের শস্যক্ষেত্র হচ্ছে স্থায়ী সৎকর্মসমূহ। হযরত হাসান বসরী বলেন : بَاقِيَاتُ صَالِحَاتُ হচ্ছে মানুষের নিয়ত ও ইচ্ছা। এর উপরই সৎ কর্মসমূহের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভরশীল।

ওবায়দ ইবনে উমর বলেন : بَاقِيَاتُ صَالِحَاتُ হচ্ছে নেক কন্যা সন্তান। তারা পিতামাতার জন্য সর্ববৃহৎ সওয়াবের ভাণ্ডার। রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত হযরত আয়েশার এক রেওয়ায়েত এর সমর্থন করে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি উম্মতের এক ব্যক্তিকে দেখেছি, তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ হয়েছে। তখন তার নেক কন্যারা তাকে জড়িয়ে ধরল এবং কান্নাকাটি ও শোরগোল করতে লাগল।

তারা আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করল : ইয়া আল্লাহ্, তিনি দুনিয়াতে আমাদের প্রতি খুবই অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের লালন-পালনে শ্রম স্বীকার করেছেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করে তাকে ক্ষমা করে দিলেন।—(কুরতুবী)

لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ—কিয়ামতের দিন সবাইকে বলা হবে : আজ তোমরা এমনিভাবে খালি হাতে কোন আসবাবপত্র না নিয়ে আমার সামনে এসেছ, যেমন আমি প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। বোখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের বাচনিক বর্ণিত রয়েছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) এক ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন : লোকসকল, তোমরা কিয়ামতে তোমাদের পালনকর্তার সামনে খালি পায়ে, খালি শরীরে পায়ে হেঁটে উপস্থিত হবে। সেদিন সর্বপ্রথম যাকে পোশাক পরানো হবে, তিনি হবেন হযরত ইব্রাহীম (আ)। একথা শুনে হযরত আয়েশা প্রশ্ন করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ্, সব নারী-পুরুষই কি উলঙ্গ হবে এবং একে অপরকে দেখবে? তিনি বললেন : সেদিন প্রত্যেককেই এমন ব্যস্ততা ও চিন্তা ঘিরে রাখবে যে, কেউ কারও প্রতি দেখার সুযোগই পাবে না। সবারই দৃষ্টি থাকবে উপরের দিকে।

কুরতুবী বলেন : এক হাদীসে বলা হয়েছে, মৃতরা বরযখে একে অপরের সাথে নিজ নিজ কাফন পরিহিত অবস্থায় মোলাকাত করবে। এই হাদীসটি উপরোক্ত হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা এ হাদীসে কবর ও বরযখের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আর উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হাশরের ময়দানের অবস্থা। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, মৃত ব্যক্তি সে পোশাকেই হাশরের ময়দানে উত্থিত হবে, যাতে তাকে দাফন করা হয়েছিল। হযরত ওমর (রা) বলেন : মৃতদেরকে ভাল কাফন দিয়ো। কেননা তারা কিয়ামতের দিন এ কাফন পরিহিত হয়েই উত্থিত হবে। কেউ কেউ এ হাদীসটিকে শহীদদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন। কেউ কেউ বলেন : এটা সম্ভব যে, হাশরের ময়দানে কিছু লোক পোশাক পরিহিত অবস্থায় এবং কিছু লোক উলঙ্গ অবস্থায় উত্থিত হবে। এভাবে উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়। —(মাযহারী)

কর্মানুযায়ী প্রতিদান : وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا——অর্থাৎ হাশরবাসীরা তাদের কৃতকর্মকে উপস্থিত পাবে। তফসীরবিদগণ এর অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করেন যে, নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদানকে উপস্থিত পাবে। শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র) বলতেন : এরূপ অর্থ বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। বহু হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, এ সব কৃতকর্মই ইহকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির রূপ পরিগ্রহ করবে। তাদের আকার-আকৃতি সেখানে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সৎ কর্মসমূহ জান্নাতের নিয়ামতের আকার ধারণ করবে আর মন্দ কর্মসমূহ জাহান্নামের আগুন ও সাপ বিচ্ছু হয়ে যাবে।

হাদীসে আছে, যারা যাকাত দেয় না, তাদের মাল কবরে একটি বড় সাপের আকার ধারণ করে তাদেরকে দংশন করবে এবং বলবে انا مالك আমি তোমার মাল। সৎ কর্ম সুশ্রী মানুষের আকারে কবরের নিঃসঙ্গ অবস্থায় আতংক দূর করার জন্য আগমন করবে। কোরবানীর জন্তু পুলসিরাতের সওয়ারী হবে। মানুষের গোনাহ্ বোঝার আকারে প্রত্যেকের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে।

কোরআনে ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীদের সম্পর্কে انما يأكلون في بطونهم نارا বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা উদরে আগুন ভর্তি করছে। এসব আয়াত ও রেওয়ায়েতকে সাধারণত রূপক অর্থে ধরা হয়। উপরোক্ত বক্তব্য মেনে নিলে এগুলোতে রূপক অর্থের আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন নেই। সবগুলো আসল অর্থেই থাকে।

কোরআনে ইয়াতীমের অবৈধ অর্থসম্পদকে আগুন বলা হয়েছে। সত্য এই যে, তা এখনও আগুনই বটে, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া অনুভব করার জন্য এ জগত থেকে চলে যাওয়া শর্ত। উদাহরণত কেউ দিয়াশলাইর বাক্সকে আগুন বললে তা নির্ভুল হবে, কিন্তু এর দাহিকাশক্তি অনুভব করতে হলে ঘর্ষণ শর্ত। এমনিভাবে কেউ পেট্রোলকে আগুন মনে করলে তা শুদ্ধ হবে, তবে এর জন্য আগুনের সামান্যতম সংস্পর্শ শর্ত।

এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, মানুষ দুনিয়াতে সদাসৎ যেসব কর্ম করে; সেগুলোই পরকালে প্রতিদান ও শাস্তির রূপ ধারণ করবে। তখন এগুলোর প্রতিক্রিয়া ও আলামত এ দুনিয়া থেকে ভিন্নরূপ হবে।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾ مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥١﴾ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَآءِىَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾ وَرَءَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوٓا

أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا
فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ
أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ
الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ
أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا
بِهِ الْحَقَّ ۖ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ﴿٥٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ
يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ
وَقْرًا ۖ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾ وَرَبُّكَ
الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ
الْعَذَابَ ۚ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾
وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم
مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾

(৫০) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম ঃ আদমকে সিজদা কর, তখন সবাই সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা জালিমদের জন্য খুবই নিকৃষ্ট বদল। (৫১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজনকালে আমি তাদেরকে সাক্ষ্য রাখিনি এবং তাদের নিজেদের সৃজনকালেও না। এবং আমি এমনও নই যে, বিভ্রান্তকারীদেরকে সাহায্য-কারীরূপে গ্রহণ করব। (৫২) যে দিন তিনি বলবেন ঃ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক

মনে করতে তাদেরকে ডাক। তারা তখন তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা এ আহবানে সাড়া দেবে না। আমি তাদের মধ্যস্থলে রেখে দেব একটি মৃত্যু গহবর। (৫৩) অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝে নেবে যে, তাদেরকে তাতে পতিত হতে হবে এবং তারা তা থেকে রাস্তা পরিবর্তন করতে পারবে না। (৫৪) নিশ্চয় আমি এ কোরআনে মানুষকে নানাভাবে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বুঝিয়েছি। মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক তর্কপ্রিয়। (৫৫) হিদায়ত আসার পর এ প্রতীক্ষাই শুধু মানুষকে বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বিরত রাখে যে, কখন আসবে তাদের কাছে পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অথবা কখন আসবে তাদের কাছে আযাব সামনা-সামনি। (৫৬) আমি রসূলগণকে সুসংবাদ-দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপেই প্রেরণ করি এবং কাফিররাই মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক করে, তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং তারা আমার নিদর্শনাবলীও যদ্দ্বারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়, সেগুলোকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছে। (৫৭) তার চাইতে অধিক জালিম কে, যাকে তার পালনকর্তার কালাম দারা বোঝানো হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার পূর্ববর্তী কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়? আমি তাদের অন্তরের উপর পর্দা রেখে দিয়েছি, যেন তা না বুঝে এবং তাদের কানে রয়েছে বধিরতার বোঝা। যদি আপনি তাদেরকে সৎ পথের প্রতি দাওয়াত দেন, তবে কখনই তারা সৎ পথে আসবে না। (৫৮) আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু; যদি তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করেন, তবে তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন, কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে একটি প্রতিশ্রুত সময়, যা থেকে তারা সরে যাওয়ার জায়গা পাবে না। (৫৯) এসব জনপদও তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা জালিম হয়ে গিয়েছিল এবং আমি তাদের ধ্বংসের জন্য একটি প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করেছিলাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (সে সময়টিও স্মরণযোগ্য) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিলাম ঃ আদম (আ)-কে সিজদা কর, তখন সবাই সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। (কেননা জিন সৃষ্টির প্রধান উপাদান হচ্ছে আগুন। অগ্নোপাদানের তাগিদ হল অনুগত না থাকা। কিন্তু এ উপাদানজনিত তাগিদের কারণে ইবলীসকে ক্ষমার্হ মনে করা হবে না। কারণ এ উপাদানজনিত তাগিদকে আল্লাহর ভয় দ্বারা পরাভূত করা সম্ভবপর ছিল।) অতএব এরপরও কি তোমরা তাকে এবং তার বংশধরকে (সন্তান-সন্ততি ও অনুসারীদেরকে) আমার পরিবর্তে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? (অর্থাৎ আমার আনুগত্য ত্যাগ করে তার কথামত চলছ)? অথচ সে (ইবলীস ও তার দলবল) তোমাদের শত্রু। (সর্বদাই তোমাদের ক্ষতি করার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে)। এটা অর্থাৎ ইবলীস ও (তার বংশধরের বন্ধুত্ব) জালিমদের জন্য খুবই মন্দ বদল। ('বদল' বলার কারণ এই যে, বন্ধু তো আমাকেই বানানো উচিত ছিল, কিন্তু তারা আমার বদলে শয়তানকে বন্ধু বানিয়েছে। বরং শুধু

বন্ধুই নয়, তাকে আল্লাহ্র শরীকও মেনে নিয়েছে। অথচ) আমি তাদেরকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির সময় (সাহায্য অথবা পরামর্শের জন্য) ডাকিনি এবং স্বয়ং তাদের সৃষ্টির সময়ও (ডাকিনি অর্থাৎ একজনকে পয়দা করার সময় অন্যজনকে ডাকিনি) এবং আমি এমন (অক্ষম) নই যে, (কাউকে বিশেষ করে) বিভ্রান্তকারীদেরকে (অর্থাৎ শয়তানদের) নিজ বাহুবল বানাব। (অর্থাৎ সাহায্যের প্রত্যাশী সে-ই হয়, যে নিজে শক্তিশালী ও সক্ষম নয়)। আর (তোমরা এখানে তাদেরকে আল্লাহ্র শরীক মনে কর; কিয়ামতে আসল স্বরূপ জানা যাবে)। স্মরণ কর, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা (মুশরিকদেরকে) বলবেন ঃ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে, তাদেরকে (সাহায্যের জন্য) আহবান কর। তারা তাদেরকে আহবান করবে, কিন্তু তারা জবাবই দেবে না। আমি তাদের মধ্যস্থলে একটি আড়াল করে দেব। (যাতে তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যায় নতুবা আড়াল ব্যতীতও তাদের সাহায্য করা সম্ভবপর ছিল না)। অপরাধীরা দোযখকে দেখবে, অতঃপর বিশ্বাস করবে যে, তাদেরকে তথায় পতিত হতে হবে এবং তারা তা থেকে পরিত্রাণের কোন পথ পাবে না। আমি এই কোরআনে মানুষের (হিদায়তের) জন্য সব রকম উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু নানাভাবে বর্ণনা করেছি। (এ সত্ত্বেও অবিশ্বাসী) মানুষ তর্কে সবার উপরে। (জিন ও জীবজন্তুর মধ্যে যদিও চেতনা ও অনুভূতি আছে, কিন্তু তারা এত তর্ক-বিতর্ক করে না)। হিদায়ত আসার পর (যার তাগিদ ছিল বিশ্বাস স্থাপন করা) মানুষকে বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাদের পালনকর্তার কাছে (কুফর ও গোনাহ্র জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা করতে কোন কিছু বিরত রাখে না, কিন্তু এই প্রতীক্ষা যে, পূর্ববর্তী লোকদের (ধ্বংস ও আযাবের) রীতিনীতি তাদের কাছে আসুক অথবা তাদের কাছে আযাব সামনাসামনি আসুক। (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অবস্থা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তারা আযাবেরই অপেক্ষা করছে। নতুবা অন্য সব প্রমাণাদি তো পূর্ণ হয়ে গেছে।) আমি রসূলগণকে শুধু সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করি। (যার জন্য মু'জিযা ইত্যাদির মাধ্যমে যথেষ্ট প্রমাণাদি তাদের সাথে দেওয়া হয়। এর অতিরিক্ত কোন কিছু তাদের কাছে ফরমায়েশ করা মূর্খতা)। এবং কাফিররা মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক করে যাতে তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়। তারা আমার নিদর্শনাবলী এবং যদ্দ্বারা (অর্থাৎ যে আযাব দ্বারা) তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল, সেগুলোকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছে। তার চাইতে অধিক জালিম কে, যাকে তার পালনকর্তার কালাম দ্বারা বোঝানো হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নিজ হস্তদ্বয় দ্বারা যা কিছু (গোনাহ্) সঞ্চয় করেছে, তাকে (অর্থাৎ তার পরিণামকে) ভুলে যায়? আমি তাদের অন্তরের উপর পর্দা রেখে দিয়েছি, যেন তা (অর্থাৎ সত্য বিষয় তারা) না বোঝে এবং (তা শোনা থেকে) তাদের কানে ছিপি এঁটে রেখেছি। (ফলে তাদের অবস্থা এই যে) আপনি যদি তাদেরকে সৎ পথের দিকে দা'ওয়াত দেন, তবে কখনই তারা সৎ পথে আসবে না। (কেননা তারা কানদিয়ে সত্যের দা'ওয়াত শোনে না, অন্তর দ্বারা বোঝে না। কাজেই আপনি চিন্তা করবেন না।) এবং (আযাবের বিলম্ব দেখে) তারা যে মনে করছে, আযাব আসবেই না, এর কারণ এই যে, আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু (তাই সময় দিয়ে রেখেছেন, যাতে তাদের চৈতন্যোদয় হয় ও বিশ্বাস স্থাপন করে, ফলে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া

যায়। নতুবা তাদের কার্যকলাপ এমন যে) যদি তিনি তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করতেন, তবে তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন। (কিন্তু তিনি এরূপ করেন না)। তাদের (শাস্তির) জন্য একটি প্রতিশ্রুত সময় আছে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) যার এদিকে (অর্থাৎ পূর্বে) কোন আশ্রয়ের জায়গা পাবে না (অর্থাৎ সে সময়টি আসার আগে কোন আশ্রয়-স্থলে আত্মগোপন করে তা থেকে পরিত্রাণ পাবে না)। এবং (পূর্ববর্তী কাফিরদের ক্ষেত্রে এ রীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। সেমতে) এসব জনপদ (যাদের কাহিনী প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত), যখন তারা (অর্থাৎ এদের অধিবাসীরা) জালিম হয়ে গিয়েছিল, আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের ধ্বংসের জন্য আমি প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করে-ছিলাম। (এমনিভাবে বর্তমান লোকদের জন্যও সময় নির্দিষ্ট রয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইবলীসের সন্তান-সন্ততি ও বংশধরও আছে: وَذُرِّيَّتَهُ—এ শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, শয়তানের সন্তান-সন্ততি ও বংশধর আছে। কেউ কেউ বলেন: এখানে ذُرِّيَّة অর্থাৎ বংশধর বলে সাহায্যকারী দল বোঝানো হয়েছে। কাজেই শয়তানের ঔরসজাত সন্তানাদি হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু হুমায়দী রচিত 'কিতাবুল জমা বাইনাস সহীহাইন' গ্রন্থে হযরত সালমান ফারসীর রেওয়ায়েতে উল্লিখিত একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেন: তুমি তাদের মধ্য থেকে হয়ো না যারা সবার আগে বাজারে প্রবেশ করে অথবা যারা সবার শেষে বাজার থেকে বের হয়। কেননা বাজার এমন জায়গা, যেখানে শয়তান ডিমবাচ্চা প্রসব করে রেখেছে। এ থেকে জানা যায় যে, ডিম থেকে শয়তানের বংশধর বৃদ্ধি পায়। এই হাদীসটি উদ্ধৃতি করে কুরতুবী বলেন: শয়তানের যে সাহায্যকারী বাহিনী আছে, এ কথা তো অকাট্যরূপেই প্রমাণিত আছে, ঔরসজাত সন্তান হওয়া সম্পর্কেও এ হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল।

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا—সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষ সর্বাধিক তর্কপ্রিয়। এর সমর্থনে হযরত আনাস (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: কিয়ামতের দিন কাফিরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে পেশ করা হবে। তাকে প্রশ্ন করা হবে: আমার প্রেরিত রসূল সম্পর্কে তোমার কর্মপন্থা কেমন ছিল? সে বলবে: পরওয়ারদিগার, আমি তো আপনার প্রতি, আপনার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম এবং তাঁদের আনুগত্য করেছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন: তোমার আমলনামা সামনে রাখা রয়েছে। এতে তো এমন কিছু নেই। লোকটি বলবে: আমি এই আমলনামা মানি না। আল্লাহ্ বলবেন: আমার ফেরেশ-তারা তোমার দেখাশোনা করত। তারা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। লোকটি বলবে:

আমি তাদের সাক্ষ্য মানি না। আমি তাদেরকে চিনি না এবং আমল করার সময় তাদেরকে দেখিনি। আল্লাহ্ বলবেন, সামনে লওহে-মাহফূয রয়েছে। এতেও তোমার অবস্থা এরূপই লিখিত রয়েছে। সে বলবে ঃ পরওয়ারদিগার, আপনি আমাকে যুলুম থেকে আশ্রয় দিয়েছেন কি না? আল্লাহ্ বলবেন ঃ নিশ্চয় যুলুম থেকে তুমি আমার আশ্রয়ে রয়েছ। সে বলবে ঃ পরওয়ারদিগার, যেসব সাক্ষ্য আমি দেখিনি সেগুলো কিরূপে আমি মানতে পারি? আমার নিজের পক্ষ থেকে যে সাক্ষ্য হবে, আমি তাই মানতে পারি! তখন তার মুখ সীল করে দেওয়া হবে এবং তার হাত-পা তার কুফর ও শিরক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। এরপর তাকে মুক্ত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এই হাদীসের বিষয়বস্তু সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ
أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ
سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا
لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى
الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ
أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٣﴾ قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا
نَبْغِ ۚ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا
آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ قَالَ
لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ
رُشْدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ
تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٦٩﴾ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا
تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾

(৬০) যখন মূসা তাঁর যুবক (সঙ্গী)-কে বললেনঃ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি আসব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। (৬১) অতঃপর যখন তাঁরা দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছালেন, তখন তাঁরা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলেন। অতঃপর মাছটি সমুদ্রে সুড়ঙ্গপথ সৃষ্টি করে নেমে গেল। (৬২) যখন তাঁরা সেস্থানটি অতিক্রম করে গেলেন, মূসা সঙ্গীকে বললেনঃ আমাদের নাশ্‌তা আন। আমরা এই সফরে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। (৬৩) সে বললঃ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন প্রস্তরখণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই আমাকে একথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে নিয়েছে। (৬৪) মূসা বললেনঃ আমরা তো এ স্থানটিই খুঁজছিলাম। অতঃপর তারা নিজেদের চিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। (৬৫) অতঃপর তাঁরা আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একজনের সাক্ষাৎ পেলেন, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে রহমত দান করেছিলাম ও আমার পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। (৬৬) মূসা তাঁকে বললেনঃ আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন? (৬৭) তিনি বললেনঃ আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। (৬৮) যে বিষয় বোঝা আপনার আয়ত্তাধীন নয়, তা দেখে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কেমন করে? (৬৯) মূসা বললেনঃ আল্লাহ্‌ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না। (৭০) তিনি বললেনঃ যদি আপনি আমার অনুসরণ করেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং সে সময়টি স্মরণ কর, যখন মূসা (আ) নিজের খাদেমকে [তার নাম ছিল 'ইউশা' (বোখারী)] বললেনঃ আমি (এই সফরে) অনবরত চলতে থাকব, যে পর্যন্ত না সে স্থানে পৌঁছে যাই, যেখানে দুই সমুদ্র পরস্পর মিলিত হয়েছে, অথবা এমনিই যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। এই সফরের কারণ ছিল এই যে, একবার মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের সভায় ওয়ায করলে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলঃ বর্তমানে মানুষের মধ্যে সবচাইতে জ্ঞানী কে? তিনি বললেনঃ আমি। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আল্লাহ্‌র নৈকট্য-লাভে যেসব জ্ঞান সহায়ক, সেগুলোতে আমার সমান কেউ নেই। এটা বলা নির্ভুল ছিল। কেননা তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার একজন মহানুভব পয়গম্বর ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর সমান কেউ জ্ঞানী ছিল না। কিন্তু বাহ্যত তাঁর এ ভাষার অর্থ দাঁড়ায় ব্যাপক। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে কথাবার্তায় সতর্কতা শিক্ষা দিতে চাইলেন। তাই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলা হলঃ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানের অধিকারী। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কতক বিষয়ে সে আপনার চাইতে

অধিক জ্ঞান রাখে, যদিও আল্লাহ্র নৈকট্যলাভে সেগুলো সহায়ক নয়। কিন্তু এর ভিত্তিতে জওয়াবে নিজকে 'অধিক জ্ঞানী' বলা উচিত হয়নি। একথা শুনে মূসা (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং তাঁর কাছে পৌঁছার উপায় জিজ্ঞেস করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ একটি নিষ্প্রাণ মাছ সাথে নিয়ে সফর করুন। যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানেই আমার সে বান্দার সাক্ষাত পাবেন।

তখন মূসা (আ) 'ইউশা'-কে সাথে নেন এবং উপরোক্ত কথা বলেন। অতঃপর যখন (চলতে চলতে) তাঁরা দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছালেন, [তখন সেখানে একটি প্রস্তরখণ্ডে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। মাছটি আল্লাহ্র আদেশে জীবিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হল। 'ইউশ' জাগ্রত হয়ে মাছটি পেলেন না। ইচ্ছা ছিল, মূসা (আ) জাগ্রত হলে তাঁকে জানাবেন। কিন্তু একথা তাঁর মোটেই স্মরণ ছিল না। সম্ভবত পরিবার-পরিজন ও দেশের চিন্তা তাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। নতুবা এমন আশ্চর্যজনক বিষয় ভুলে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি সদাসর্বদা মু'জিযা প্রত্যক্ষ করে, তার মন থেকে কোন চিন্তার কারণে নিম্নপর্যায়ের আশ্চর্যজনক বিষয় উধাও হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। মূসা (আ)-র জিজ্ঞেস করার সুযোগ হল না। এভাবে] তাঁরা তাঁদের মাছের কথা ভুলে গেলেন এবং মাছটি (ইতিপূর্বে জীবিত হয়ে) সমুদ্রে পথ করে চলে গেল। অতঃপর যখন তাঁরা (সেখান থেকে) সম্মুখে এগিয়ে গেলেন (এবং অনেক দূরে পৌঁছে গেলেন) তখন মূসা (আ) খাদেমকে বললেনঃ আমাদের নাশ্তা আন। আমরা এই সফরে (অর্থাৎ আজকের মনযিলে) অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। পূর্বেকার মনযিলসমূহে এত ক্লান্ত হইনি। এর কারণ বাহ্যত গন্তব্যস্থল অতিক্রম করে যাওয়া ছিল। খাদেম বললঃ আপনি লক্ষ্য করেছেন কি (যে, এক আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে গেছে), যখন আমরা প্রস্তরখণ্ডের নিকটে অবস্থান করছিলাম, (এবং ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তখন মাছটির একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। আমার ইচ্ছা ছিল আপনাকে জানাব, কিন্তু আমি অন্য চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম বলে) তখন মাছের (আলোচনার) কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই আমাকে এ কথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল। (ঘটনা এই যে) মাছটি জীবিত হওয়ার পর আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে নিয়েছে। (এক আশ্চর্যজনক বিষয় তো ছিল মাছটির জীবিত হওয়া। দ্বিতীয় আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল এই যে, মাছটি সমুদ্রে যে পথ দিয়ে চলেছিল, সেই পথের পানি অলৌকিকভাবে সুড়ঙ্গের মত হয়ে গিয়েছিল। পরে সম্ভবত সুড়ঙ্গ বন্ধ হয়ে গেছে।) মূসা [(আ) এ কাহিনী শুনে বললেন] আমরা তো এ স্থানটিই খুঁজছিলাম (সেখানেই ফিরে যাওয়া উচিত)। অতঃপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন দেখে দেখে ফিরে চললেন (সম্ভবত রাস্তাটি সড়ক ছিল না, তাই পায়ের চিহ্ন দেখতে হয়েছে)। অতঃপর (সেখানে পৌঁছে) তাঁরা আমার বান্দাদের মধ্যে একজনের (অর্থাৎ খিযিরের) সাক্ষাত পেলেন, যাকে আমি বিশেষ রহমত (অর্থাৎ আমার সন্তুষ্টি) দান করেছিলাম (রহমতের অর্থ বেলায়েত ও নবুয়ত উভয়টি হওয়া সম্ভবপর) এবং আমার কাছ থেকে (অর্থাৎ উপার্জনের মাধ্যম ছাড়াই) শিখিয়েছিলাম বিশেষ জ্ঞান। [অর্থাৎ সৃষ্টিরহস্যের জ্ঞান। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে তা জানা যাবে। আল্লাহ্র নৈকট্য-

লাভে এই জ্ঞানের কোন প্রভাব নেই। যে জ্ঞান নৈকট্যলাভে সহায়ক, তা হচ্ছে আল্লাহ্র রহস্যের জ্ঞান। এতে মূসা (আ) অগ্রণী ছিলেন। মোটকথা] মূসা [(আ) তাঁকে সালাম করলেন এবং তাঁকে] বললেন ঃ আমি কি আপনার সাথে থাকতে পারি (অর্থাৎ আমাকে আপনার সাথে থাকার অনুমতি দিন) এই শর্তে যে, যে উপকারী জ্ঞান আপনাকে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন ? তিনি বললেন ঃ আপনি আমার সাথে থেকে (আমার ক্রিয়াকর্মে) ধৈর্য ধরতে পারবেন না (অর্থাৎ আপনি আমার কার্যকলাপের ব্যাপারে অনধিকার চর্চা করবেন। শিক্ষা সম্পর্কিত ব্যাপারে শিক্ষার্থী শিক্ষককে অনভিপ্রেত ও অসময়োচিতভাবে প্রশ্ন করলে তা অনধিকার চর্চা হয়ে পড়ে এবং ফলে সহঅবস্থান কঠিন হয়ে পড়ে)। এমন বিষয় সম্পর্কে (এরকম ব্যাপারে) আপনি কি করে ধৈর্য ধরবেন, যা আপনার জ্ঞানের আওতার বাইরে (অর্থাৎ কারণ জানা না থাকার কারণে বিষয়টি বাহ্যত শরীয়তবিরোধী মনে হবে। আপনি শরীয়তবিরোধী কাজে চুপ থাকতে পারবেন না।) মূসা (আ) বললেন ঃ (না) ইনশাআল্লাহ্ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল (অর্থাৎ সংযমী) পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না। (উদাহরণত বাধা দিতে নিষেধ করলে বাধা দেব না। এমনিভাবে অন্য কোন বিষয়েও বিরুদ্ধাচরণ করব না)। তিনি বললেন ঃ (আচ্ছা) যদি আপনি আমার সাথে থাকতে চান, তবে (লক্ষ্য রাখবেন যে) আমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰهُ —এ ঘটনায় 'মূসা' বলে প্রসিদ্ধ পয়গম্বর হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। নওফল বাক্কালী অন্য এক মূসার সাথে এ ঘটনাকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। সহীহ্ বোখারীতে হযরত ইবনে আব্বাসের পক্ষ থেকে তার তীব্র খণ্ডন বর্ণিত রয়েছে।

فَتٰى —এর শাব্দিক অর্থ যুবক। শব্দটিকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধ করা হলে অর্থ হয় খাদেম। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তিশালী যুবক দেখে খাদেম রাখা হয়, যে সবরকম কাজ সম্পন্ন করতে পারে। ভৃত্য ও খাদেমকে যুবক বলে ডাকা একটি ইসলামী শিষ্টাচার। ইসলামের শিক্ষা এই যে, চাকরদেরকেও গোলাম অথবা চাকর বলে সম্বোধন করো না, বরং ভাল খেতাব দ্বারা ডাক। এখানে فَتٰى শব্দটিকে মূসা (আ)-র দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তাই অর্থ হবে মূসা (আ)-র খাদেম। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, এই খাদেম ছিল ইউশা ইবনে নূন ইবনে ইফরায়ীম ইবনে ইউসুফ (আ)। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সে মূসা (আ)-র ভাগ্নেয় ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত ফয়সালা করা যায় না। সহীহ্ রেওয়ায়েতে প্রমাণিত রয়েছে যে, তার নাম ছিল ইউশা ইবনে নূন। অবশিষ্ট অবস্থার প্রমাণ নেই।—(কুরতুবী)

مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ —এর শাব্দিক অর্থ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থল। বলা বাহুল্য, এ ধরনের স্থান দুনিয়াতে অসংখ্য আছে। এখানে কোন্ জায়গা বোঝানো হয়েছে, কোরআন ও হাদীসে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তাই ইঙ্গিত ও লক্ষণাদিদৃষ্টে তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কাতাদাহ্ বলেন ঃ পারস্য উপসাগর ও রোম সাগরের সঙ্গমস্থল বোঝানো হয়েছে। ইবনে আতিয়্যার মতে আজারবাইজানের নিকটে একটি স্থান, কেউ কেউ জর্দান নদী ও ভূমধ্যসাগরের মিলনস্থলের কথা বলেছেন। কেউ বলেন ঃ এ স্থানটি তুঞ্জায় অবস্থিত। ইবনে আবী কা'বের মতে এটি আফ্রিকায় অবস্থিত। সুদ্দীর মতে এটি আর্মেনিয়ায় অবস্থিত (অনেকের মতে বাহরে-আন্দালুসা ও বাহরে মুহীতের সঙ্গমস্থলই হচ্ছে এই স্থান। মোট-কথা, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে সে স্থানটি নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন।—(কুরতুবী)

হযরত মূসা (আ) ও খিযিরের কাহিনী ঃ সহীহ্ বোখারী ও মুসলিমে হযরত উবাই ইবনে কা'বের রেওয়ায়েতে ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ একদিন হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল ঃ সব মানুষের মধ্যে অধিক জ্ঞানী কে? হযরত মূসা (আ)-র জানামতে তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞানী আর কেউ ছিল না। তাই বলেন ঃ আমি সবার চাইতে অধিক জ্ঞানী। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদেরকে বিশেষভাবে গড়ে তোলেন। তাই এ জওয়াব তিনি পছন্দ করলেন না। এখানে বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দেয়াই ছিল আদব। অর্থাৎ একথা বলে দেয়া উচিত ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন, কে অধিক জ্ঞানী। এ জওয়াবের কারণে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মূসা (আ)-কে তিরস্কার করে ওহী নাযিল হল যে, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী। [একথা শুনে মূসা (আ) প্রার্থনা জানালেন যে, তিনি অধিক জ্ঞানী হলে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান লাভের জন্য আমার সফর করা উচিত]। তাই বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্ আমাকে তাঁর ঠিকানা বলে দিন। আল্লাহ্ বললেন ঃ থলিয়ার মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নিন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের দিকে সফর করুন। যেখানে পৌঁছার পর মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এই বান্দার সাক্ষাত পাবেন। মূসা (আ) নির্দেশমত থলিয়ায় একটি মাছ নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁর সাথে তাঁর খাদেম ইউশা ইবনে নূনও ছিল। পথিমধ্যে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর মাথা রেখে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং থলিয়া থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। (মাছের জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার সাথে সাথে আরও একটি মু'জিযা এই প্রকাশ পেল যে) মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল, আল্লাহ্ তা'আলা সেই পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মত হয়ে গেল। ইউশা ইবনে নূন এই আশ্চর্যজনক ঘটনা নিরীক্ষণ করেছিল। মূসা (আ) নিদ্রিত ছিলেন। যখন জাগ্রত হলেন, তখন ইউশা ইবনে নূন মাছের এই আশ্চর্যজনক ঘটনা তাঁর কাছে বলতে ভুলে গেলেন। এবং সেখান

থেকে সামনে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকাল বেলায় মূসা (আ) খাদেমকে বললেন ঃ আমাদের নাশতা আন। এই সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ গন্তব্যস্থল অতিক্রম করার পূর্বে মূসা (আ) মোটেই ক্লান্ত হননি। নাশতা চাওয়ার পর ইউশা ইবনে নূনের মাছের ঘটনা মনে পড়ল। সে ভুলে যাওয়ার ওযর পেশ করে বলল ঃ শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর বলল ঃ মৃত মাছটি জীবিত হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেছে। তখন মূসা (আ) বললেন ঃ সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল। (অর্থাৎ মাছের জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার স্থানটিই ছিল গন্তব্যস্থল)।

সেমতে তৎক্ষণাৎ তাঁরা ফিরে চললেন এবং স্থানটি পাওয়ার জন্যে পূর্বের পথ ধরেই চললেন। প্রস্তরখণ্ডের নিকট পৌঁছে দেখলেন, এক ব্যক্তি আপাদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছে। মূসা (আ) তদবস্থায়ই সালাম করলে খিযির (আ) বললেন ঃ এই (জনমানবহীন) প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এল? মূসা (আ) বললেন ঃ আমি মূসা। হযরত খিযির প্রশ্ন করলেন ঃ বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ হ্যাঁ, আমি বনী ইসরাঈলের মূসা। আমি আপনার কাছ থেকে ঐ বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত খিযির বললেন ঃ আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। হে মূসা, আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক জ্ঞান দান করেছেন, যা আপনার কাছে নেই ; পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা আমি জানি না। মূসা (আ) বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ্, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি কোন কাজে আপনার বিরোধিতা করব না।

হযরত খিযির বললেন ঃ যদি আপনি আমার সাথে থাকতেই চান, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে তার স্বরূপ বলে দেই।

একথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের পাড় ধরে চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একটি নৌকা এসে গেলে তাঁরা নৌকায় আরোহণের ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। মাঝিরা হযরত খিযিরকে চিনে ফেলল এবং কোন রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাঁদেরকে নৌকায় তুলে নিল। নৌকায় চড়েই খিযির কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। এতে হযরত মূসা (আ) (স্থির থাকতে পারলেন না—) বললেন ঃ তারা কোন প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কি এরই প্রতিদানে তাদের নৌকা ভেঙ্গে দিলেন, যাতে সবাই ডুবে যায়? এতে আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। খিযির বললেন ঃ আমি পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। তখন মূসা (আ) ওযর পেশ করে বললেন ঃ আমি আমার ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না।

রসূলুল্লাহ্ (সা) এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন ঃ হযরত মূসা (আ)-র প্রথম আপত্তি ভুলক্রমে, দ্বিতীয় আপত্তি শর্ত হিসেবে এবং তৃতীয় আপত্তি ইচ্ছাক্রমে হয়েছিল (ইতিমধ্যে) একটি পাখী এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু

পানি তুলে নিল। খিযির মূসা (আ)-কে বললেন ঃ আমার জ্ঞান এবং আপনার জ্ঞান উভয়ে মিলে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের মুকাবিলায় এমন তুলনাও হয়না যেমনটি এ পাখীর চঞ্চুর পানির সাথে রয়েছে সমুদ্রের পানি।

অতঃপর তাঁরা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের কূল ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ খিযির একটি বালককে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করতে দেখলেন। খিযির স্বহস্তে বালকটির মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। বালকটি মরে গেল। মূসা (আ) বললেন ঃ আপনি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। এ যে বিরাট গোনাহ্র কাজ করলেন! খিযির বললেন ঃ আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। মূসা (আ) দেখলেন, এ ব্যাপারটি পূর্বাপেক্ষা গুরুতর। তাই বললেন ঃ এরপর যদি কোন প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দেবেন। আমার ওযর-আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

অতঃপর আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। তারা সোজা অস্বীকার করে দিল। হযরত খিযির এই গ্রামে একটি প্রাচীরকে পতনোন্মুখ দেখতে পেলেন। তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটি সোজা করে দিলেন। মূসা (আ) বিস্মিত হয়ে বললেন ঃ আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করল অথচ আপনি তাদের এত বড় কাজ করে দিলেন; ইচ্ছা করলে এর পারিশ্রমিক তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। খিযির বললেন ঃ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ — অর্থাৎ এখন শর্ত পূর্ণ হয়ে গেছে। এটাই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়।

এরপর খিযির উপরোক্ত ঘটনাত্রয়ের স্বরূপ মূসা (আ)-র কাছে বর্ণনা করে বললেন ঃ ذٰلِكَ تَاوِيْلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا — অর্থাৎ এ হচ্ছে সে সব ঘটনার স্বরূপ; যেগুলো দেখে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেন নি। রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পূর্ণ ঘটনার বর্ণনা করে বললেন ঃ মূসা (আ) যদি আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতেন, তবে তাদের আরও কিছু জানা যেত।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এই দীর্ঘ হাদীসে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে যে, মূসা বলতে বনী ইসরাঈলের পয়গম্বর মূসা (আ) এবং তাঁর যুবক সঙ্গীর নাম ইউশা ইবনে নূন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে যে বান্দার কাছে মূসা (আ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন খিযির (আ)। অতঃপর আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন।

সফরের কতিপয় আদব এবং পয়গম্বরসুলভ সংকল্পের একটি নমুনা ঃ

لَا اَبْرَحُ حَتّٰى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا — এ বাক্যটি হযরত মূসা (আ) তাঁর সফরসঙ্গী ইউশা ইবনে নূনকে বলেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সফরের দিক ও

গন্তব্যস্থল সম্পর্কে তাঁর সঙ্গীকে অবহিত করা। সফরের জরুরী বিষয়াদি সম্পর্কে সঙ্গীকে অবহিত করাও একটি আদব। অহংকারীরা তাদের খাদেম ও পরিচারকদেরকে সম্বোধনেরই যোগ্য মনে করে না এবং নিজের সফর সম্পর্কে কোন কিছুই বলে না।

حُقُبًا শব্দটি حُقْبَةٌ এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থে আশি বছরে এক হুকবা। কারও কারও মতে আরও বেশী সময়ে এক হুকবা হয়। এর কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। মূসা (আ) সঙ্গীকে বলে দিলেন যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছাতে হবে। আমার সংকল্প এই যে, যতদিনই লাগুক, গন্তব্যস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত সফর অব্যাহত রাখব। আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পালনে পয়গম্বরদের সংকল্প এমনি দৃঢ় হয়ে থাকে।

খিযিরের চাইতে মূসা (আ)-র শ্রেষ্ঠত্ব, তার বিশেষ প্রশিক্ষণ ও মু'জিযা :

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا

কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত মূসা (আ) পয়গম্বরকুলের মধ্যেও বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথোপকথনের বিশেষ মর্যাদা তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। হযরত খিযিরের নবুয়ত সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। যদি নবী মেনেও নেয়া যায়, তবে তিনি রসূল ছিলেন না। তাঁর কোন গ্রন্থ নেই এবং কোন বিশেষ উম্মতও নেই। তাই মূসা (আ) হযরত খিযিরের চাইতে সর্বাবস্থায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা নৈকট্যশীলদের সামান্যতম ত্রুটিও সংশোধন করেন। তাঁদের প্রশিক্ষণের খাতিরে সামান্যতম ত্রুটির জন্যেও তিরস্কার করা হয় এবং সে মাপকাঠিতেই তাঁদের দ্বারা ত্রুটি পূরণ করিয়ে নেয়া হয়। আগাগোড়া কাহিনীটি এই বিশেষ প্রশিক্ষণেরই বহিঃপ্রকাশ। 'আমি সর্বাধিক জ্ঞানী' মূসা (আ)-র মুখ থেকে অসতর্ক মুহূর্তে একথাটি বের হয়ে গেলে আল্লাহ্ তা'আলা তা অপছন্দ করলেন। তাঁকে হুঁশিয়ার করার জন্য এমন এক বান্দার ঠিকানা তাঁকে দিলেন, যার কাছে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান ছিল। সেই জ্ঞান মূসা (আ)-র কাছে ছিল না। যদিও মূসা (আ)-র জ্ঞান মর্তবার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল, কিন্তু তিনি সেই বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে জ্ঞানার্জনের অসীম প্রেরণা দান করেছিলেন। ফলে নতুন জ্ঞানের কথা শুনেই তিনি তা অর্জন করার জন্য শিক্ষার্থীর বেশে সফর করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই খিযিরের ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে এখানেই খিযিরের সাথে মূসা (আ)-র সাক্ষাত অনায়াসে ঘটাতে পারতেন অথবা মূসা (আ)-কেই পরিষ্কার ঠিকানা বলে দিতে পারতেন। ফলে সেখানে পৌঁছা কষ্টকর হত না। কিন্তু ঠিকানা অস্পষ্ট রেখে বলা হয়েছে যে, যেখানে মৃত মাছ জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই খিযিরকে পাওয়া যাবে।

বোখারীর হাদীস থেকে মাছ সম্পর্কে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই থলিয়ায় মাছ রেখে দেয়ার নির্দেশ হয়েছিল। তবে তা খাবার হিসেবে রাখার আদেশ হয়েছিল, না অন্য কোন উদ্দেশ্যে—তা জানা যায় না। তবে উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, এই ভাজা করা মাছটি খাওয়ার জন্য রাখা হয়েছিল এবং তারা তা থেকে সফরকালে আহারও করেছেন। মাছটির অর্ধেক জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যায়।

ইবনে আতিয়্যা ও অন্য কয়েকজন একথাও বর্ণনা করেছেন যে, মাছটি মু'জিযা হিসেবে পরবর্তীকালে জীবিত ছিল এবং অনেকে তা দেখেছে বলেও দাবি করেছে। মাছটির এক পার্শ্ব অক্ষত এবং অপর পার্শ্ব ভক্ষিত ছিল। ইবনে আতিয়্যা নিজেও দেখেছেন বলে বর্ণনা করেছেন।—(কুরতুবী)

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, নাশতার থলে ছাড়া পৃথক একটি থলেতে মাছ রাখার নির্দেশ হয়েছিল। এ তফসীর থেকেও বোঝা যায় যে, মাছটি মৃত ছিল। কাজেই জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়া একটি মু'জিযাই ছিল।

হযরত খিযিরের অস্পষ্ট ঠিকানা দেয়ার বিষয়টিও হযরত মূসা (আ)-র জন্য এক পরীক্ষা বৈ কিছুই ছিল না। এ পরীক্ষার উপর আরও পরীক্ষা ছিল এই যে, ঠিক গন্তব্যস্থলে পৌঁছে তিনি মাছের কথা ভুলে গেলেন। আয়াতে نَسِيَا حُوتَهُمَا বলে তাদের উভয়ের ভুলে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু বোখারীর হাদীসে বর্ণিত কাহিনী থেকে জানা যায় যে, মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার সময় মূসা (আ) নিদ্রিত ছিলেন। শুধু ইউশা ইবনে নূন এ আশ্চর্য ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিল এবং জাগ্রত হওয়ার পর মূসা (আ)-কে জানাবার ইচ্ছা করছিল। কিন্তু পরে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভুলে ফেলে রাখেন। সুতরাং আয়াতে 'উভয়ে ভুলে গেলেন' কথাটা এমন হবে, যেমন অন্য এক আয়াতে يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ বলে মিঠা সমুদ্র ও লবণাক্ত সমুদ্র উভয়টি থেকে মোতি আহরিত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ মোতি শুধু লবণাক্ত সমুদ্র থেকেই আহরিত হয়। কিন্তু تَغْلِيب- এর কায়দা অনুযায়ী এরূপ লেখার পদ্ধতি সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে। এটাও সম্ভব যে, সেখান থেকে সামনের দিকে চলার সময় তারা উভয়েই মাছটি সঙ্গে নেয়ার কথা বিস্মৃত ছিলেন। তাই আয়াতে ভুলে যাওয়াকে উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

মোটকথা, মাছের বিষয়টি ভুলে না গেলে ব্যাপার সেখানেই শেষ হয়ে যেত। অথচ মূসা (আ)-র দ্বিতীয় পরীক্ষা নেয়া উদ্দেশ্য ছিল। তাই উভয়েই মাছের কথা ভুলে গেলেন এবং পূর্ণ একদিন ও একরাত্রির পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করলেন। এটা ছিল তৃতীয় পরীক্ষা। কেননা, এর আগেও ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করা উচিত ছিল। ফলে সেখানেই মাছের কথা স্মরণ হয়ে যেত এবং এত দূরবর্তী সফরের

প্রয়োজন হত না। কিন্তু মূসা (আ) আরও একটু কষ্ট করুক, এটাই ছিল আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা। তাই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভূত হয় এবং মাছের কথা মনে পড়ে। অতঃপর সেখান থেকেই তাঁরা পদচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে চলেন।

মাছের সমুদ্রে চলে যাওয়ার কথাটি প্রথমবার سَرَبًا শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ সুড়ঙ্গ। পাহাড়ে রাস্তা তৈরি করার জন্য অথবা শহরে ভূগর্ভস্থ পথ তৈরি করার উদ্দেশ্যে সুড়ঙ্গ খনন করা হয়। এ থেকে জানা গেল যে, মাছটি সমুদ্রে যেদিকে যেত, সেদিকে একটি সুড়ঙ্গের মত পথ তৈরি হয়ে যেত। বুখারীর হাদীস থেকে তাই জানা যায়। দ্বিতীয়বার যখন ইউশা ইবনে নূন দীর্ঘ সফরের পর এ ঘটনাটি উল্লেখ করে, তখন وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা পানিতে সুড়ঙ্গ তৈরি হওয়া স্বয়ং একটি অভ্যাসবিরুদ্ধ আশ্চর্য ঘটনা।

হযরত খিযিরের সাথে সাক্ষাত এবং তাঁর নবুয়তের প্রশ্ন : কোরআন পাকে ঘটনার এই মূল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি, বরং عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا (আমার বান্দাদের একজন।) বলা হয়েছে। বুখারীর হাদীসে তাঁর নাম খিযির উল্লেখ করা হয়েছে। খিযির অর্থ সবুজ-শ্যামল। সাধারণ তফসীরবিদগণ তাঁর এই নামকরণের কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি যেখানে বসতেন, সেখানেই ঘাস উৎপন্ন হয়ে যেত, মাটি যেরূপই হোক না কেন। কোরআন পাক একথাও বর্ণনা করে যে, খিযির পয়গম্বর ছিলেন না একজন ওলী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ আলিমদের মতে তিনি যে নবী ছিলেন, একথা কোরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেননা, এই সফরে যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে তন্মধ্যে কয়েকটি নিশ্চিতরূপেই শরীয়তবিরোধী। আল্লাহর ওহী ব্যতীত শরীয়তের নির্দেশ কোনরূপ ব্যতিক্রম হতে পারে না। নবী ও পয়গম্বর ছাড়া আল্লাহর ওহী কেউ পেতে পারে না। ওলী ব্যক্তিও কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে কোন কোন বিষয় জানতে পারেন, কিন্তু তা এমন প্রমাণ নয়, যার ভিত্তিতে শরীয়তের কোন নির্দেশ পরিবর্তন করা যায়। অতএব প্রমাণিত হল যে, খিযির আল্লাহর নবী ছিলেন। তাঁকে ওহীর মাধ্যমে কিছু সংখ্যক শরীয়তবিরোধী বিশেষ বিধান দান করা হয়েছিল। তিনি যা কিছু করেছেন, তা এই ব্যতিক্রমী বিধানের অনুসরণে করেছেন। কোরআনের নিম্নোক্ত বাক্যে তাঁর পক্ষ থেকেও এ বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে : وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي অর্থাৎ আমি নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু করিনি, বরং আল্লাহর নির্দেশে করেছি।

মোটকথা, সাধারণ আলিমদের মতে হযরত খিযির (আ) ও একজন নবী। তবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁকে কিছু অপার্থিব দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞানও দান করা হয়েছিল। মূসা (আ) এগুলো জানতেন না। তাই তিনি আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। তফসীর কুরতুবী, বাহ্রে মুহীত, আবূ হাইয়্যান প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে।

কোন ওলীর পক্ষে শরীয়তের বাহ্যিক নির্দেশ অমান্য করা জায়েয নয়ঃ অনেক মূর্খ, পথভ্রষ্ট, সূফীবাদের কলংকস্বরূপ লোক একথা বলে বেড়ায় যে, শরীয়ত ভিন্ন জিনিস আর তরীকত ভিন্ন জিনিস। অনেক বিষয় শরীয়তে হারাম, কিন্তু তরীকতে হালাল। কাজেই কোন ওলীকে প্রকাশ্য কবীরা গোনাহে লিপ্ত দেখেও আপত্তি করা ঠিক নয়। উপরোক্ত আলোচনা থেকেই জানা গেল যে, তাদের এসব কথা পরিষ্কার ধর্মদ্রোহিতা ও বাতিল। হযরত খিযির (আ)-কে দুনিয়ার কোন ওলীর মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না। এবং শরীয়তের বিরুদ্ধে তাঁর কোন কাজকে বৈধ বলা যায় না।

শিষ্যের জন্য গুরুর অনুসরণ অপরিহার্যঃ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا এখানে হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র নবী ও শীর্ষস্থানীয় রসূল হওয়া সত্ত্বেও হযরত খিযিরের কাছে সবিনয় প্রার্থনা করেছেন যে, আমি আপনার জ্ঞান শিক্ষা করার জন্য আপনার সাহচর্য কামনা করি। এ থেকে বোঝা গেল যে, শিষ্য শ্রেষ্ঠ হলেও গুরুর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তাঁর অনুসরণ করা ওয়াজিব। এটাই জ্ঞানার্জনের আদব।—(কুরতুবী, মাযহারী)

শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজে নির্বিকার থাকা আলিমের পক্ষে জায়েয নয়ঃ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا

হযরত খিযির (আ) মূসা (আ)-কে বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। আসল তথ্য যখন আপনার জানা নেই, তখন ধৈর্য ধরবেনই বা কেমন করে? উদ্দেশ্য এই যে, আমি যে জ্ঞানলাভ করেছি, তা আপনার জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের। তাই আমার কাজকর্ম আপনার কাছে আপত্তিকর ঠেকবে। আসল তথ্য আপনাকে না বলা পর্যন্ত আপনি নিজ কর্তব্যের খাতিরে আপত্তি করবেন।

মূসা (আ) স্বয়ং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর কাছে গমনের এবং তাঁর কাছ থেকে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ পেয়েছিলেন। তাই তাঁর কোন কাজ প্রকৃতপক্ষে শরীয়তবিরোধী হবে না, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তাই তিনি ধৈর্যধারণের ওয়াদা করে নিলেন। নতুবা এরূপ ওয়াদা করাও কোন আলিমের জন্য জায়েয নয়। কিন্তু পরে শরীয়ত সম্পর্কে ধর্মীয় মর্যাদাবোধের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে কৃত ওয়াদা ভুলে গেলেন।

প্রথম ঘটনাটি তেমন গুরুতরও ছিল না। শুধু নৌকাওয়ালাদের আর্থিক ক্ষতি অথবা পানিতে ডুবে যাওয়ার নিছক সম্ভাবনাই ছিল, যা পরে বাস্তবে পরিণত হয়নি। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলীতে মূসা (আ) আপত্তি না করার ওয়াদাও করেননি। বালক হত্যার ঘটনা দেখে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং এ প্রতিবাদের জন্য কোন ওযরও পেশ করেননি। শুধু এতটুকু বললেন যে, ভবিষ্যতে প্রতিবাদ করলে আমাকে সাহচর্য দান না করার অধিকার আপনার থাকবে। কেননা, শরীয়তবিরুদ্ধ কাজ বরদাশত করা কোন নবী ও রসূলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবে প্রকৃতপক্ষেও যেহেতু পয়গম্বর ছিলেন, তাই অবশেষে এই রহস্য উদ্ঘাটিত হয় যে, এসব ঘটনা খিযির (আ)-এর জন্য শরীয়তের সাধারণ নিয়মবহির্ভূত করে দেয়া হয়েছিল এবং তিনি ওহীর প্রত্যাদেশ অনুযায়ীই এগুলো সম্পাদন করেছিলেন।—(মাযহারী)

মূসা (আ)-এর জ্ঞান ও খিযির (আ)-এর জ্ঞানের একটি মৌলিক পার্থক্য এবং উভয়ের বাহ্যিক বৈপরীত্যে সমাধান : এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন হয় যে, খিযির (আ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর জ্ঞান মূসা (আ)-র জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের ছিল। কিন্তু উভয় জ্ঞানই যখন আল্লাহ্ প্রদত্ত তখন উভয়ের বিধি-বিধানে বৈপরীত্য ও বিরোধ কেন? এ সম্পর্কে তফসীর মাযহারীতে হযরত কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথীর বক্তব্য সত্যের অধিক নিকটবর্তী এবং আকর্ষণীয়। আমি তাঁর বক্তব্যের যে মর্ম বুঝতে পেরেছি, তার সার-সংক্ষেপ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে ওহী ও নবুয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেন, সাধারণত তাঁদেরকে জন-সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাঁদের প্রতি গ্রন্থ ও শরীয়ত নাযিল করা হয়। এগুলোতে জনগণের হিদায়েত ও সংশোধনের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ থাকে। কোরআন পাকে যত নবী রসূলের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের সবার উপরই শরীয়তের আইন প্রয়োগ ও সংশোধনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। তাঁদের কাছে আগত ওহীও ছিল এই দায়িত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু অপরদিকে কিছু সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত দায়িত্বও তাঁদের উপর রয়েছে। সে সবের জন্য সাধারণভাবে ফেরেশতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন। কিন্তু কোন কোন পয়গম্বরকেও আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত করেছেন। হযরত খিযির (আ) তাঁদেরই একজন। সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত দায়িত্ব আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর সাথে সম্পৃক্ত; যেমন অমুক ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হোক অথবা অমুককে নিপাত করা হোক অথবা অমুককে উন্নতি দান করা হোক। এগুলোর বিধি-বিধানও জনগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এসব আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্যে কিছুসংখ্যক এমনও থাকে যে, এক ব্যক্তিকে নিপাত করা শরীয়তের আইনবিরুদ্ধ, কিন্তু অপার্থিব আইনে এই বিশেষ ব্যাপারটিকে শরীয়তের সাধারণ আইনের আওতার বাইরে রেখে ঐ পয়গম্বরের জন্য বৈধ করে দেয়া হয়, যার যিম্মায় সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত এই বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় শরীয়তের আওতাবহির্ভূত বিশেষ পরিস্থিতিজনিত এই নির্দেশটি শরীয়তের আইন-বিশেষজ্ঞদের জানা থাকে না। ফলে তারা একে হারাম বলতে বাধ্য হন এবং যাকে এই আইন থেকে পৃথক রাখা হয়, তিনি স্বস্থানে সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

মোটকথা যেখানে বৈপরীত্য দেখা যায়, সেখানে প্রকৃত প্রস্তাবে বিপরীত নয় বরং আনুসঙ্গিক ঘটনা শরীয়তের সাধারণ আইন থেকে ব্যতিক্রম থাকে মাত্র। আবূ হাইয়্যান বাহরে-মুহীতে বলেন ঃ

الجمهور على ان الخضر نبي وكان علمه معرفة بواطن قد اوحيت اليه وعلم موسى الاحكام والفتيا بالظاهر -

তাই এই ব্যতিক্রমটি নবুয়ত সম্পর্কিত ওহীর মাধ্যমে হওয়া জরুরী। কোন কাশফ ও ইলহাম এই ব্যতিক্রমের জন্য যথেষ্ট নয়। হযরত খিযির কর্তৃক বালক হত্যা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ছিল, কিন্তু তাঁকে সৃষ্টিগতভাবে শরীয়তের এই আইনের ঊর্ধ্বে রেখে এ কাজের জন্য আদেশ করা হয়েছিল। নবী নয়---এমন কোন ব্যক্তিকে তাঁর মাপকাঠিতে বিচার করে কোন হারামকে হালাল মনে করা---যেমন ভণ্ড সূফীদের মধ্যে প্রচলিত আছে---সম্পূর্ণ ধর্মদ্রোহিতা ও ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার নামান্তর।

ইবনে আবী শায়বা হযরত ইবনে আব্বাসের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার নাজ্‌দাহ্ হারুরী (খারেজী) ইবনে আব্বাসের কাছে পত্র লিখল যে, হযরত খিযির (আ) নাবালেগ বালককে কিরূপে হত্যা করলেন, অথচ রসূলুল্লাহ্ (সা) নাবালেগ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন? ইবনে আব্বাস জওয়াবে লিখলেন ঃ কোন বালক সম্পর্কে যদি তোমার ঐ জ্ঞান অর্জিত হয়ে যায়, যা খিযির (আ)-এর অর্জিত হয়েছিল, তবে তোমার জন্যও নাবালেগ হত্যা করা জায়েয হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য এই যে, খিযির (আ) নবুয়তের ওহীর মাধ্যমে এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পর নবুয়ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে এখন এই জ্ঞান কেউ লাভ করতে পারবে না।---(মাযহারী)

এ ঘটনা থেকে এ কথা জানা গেল যে, কোন ব্যক্তিকে শরীয়তের আইনের ঊর্ধ্বে সাব্যস্ত করার অধিকার একমাত্র ওহীর অধিকারী পয়গম্বরেরই রয়েছে।

فَانْطَلَقَا حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ۗ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَانْطَلَقَا ۫ حَتّٰٓى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ۗ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾

قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٦﴾ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

(৭১) অতঃপর তারা চলতে লাগল; অবশেষে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল, তখন তিনি তাতে ছিদ্র করে দিলেন। মূসা বললেনঃ আপনি কি এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য এতে ছিদ্র করে দিলেন? নিশ্চয়ই আপনি একটি গুরুতর মন্দ কাজ করলেন। (৭২) তিনি বললেনঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধরতে পারবেন না। (৭৩) মূসা বললেনঃ আমাকে আমার ভুলের জন্য অপরাধী করবেন না এবং আমার কাজে আমার উপর কঠোরতা আরোপ করবেন না। (৭৪) অতঃপর তারা চলতে লাগল; অবশেষে যখন একটি বালকের সাক্ষাত পেল, তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন। মূসা বললেনঃ আপনি কি একটি নিষ্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই? নিশ্চয়ই আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। (৭৫) তিনি বললেনঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না। (৭৬) মূসা বললেনঃ এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না। আপনি আমার পক্ষ থেকে অভিযোগমুক্ত হয়ে গেছেন। (৭৭) অতঃপর তারা চলতে লাগল; অবশেষে যখন একটি জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের কাছে খাবার চাইল, তখন তারা তাদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তারা সেখানে একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল, সেটি তিনি সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। মূসা বললেনঃ আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে এর পারিশ্রমিক আদায় করতে পারতেন। (৭৮) তিনি বললেনঃ এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল। এখন যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেন নি, আমি তার তাৎপর্য বলে দিচ্ছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মোটকথা পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা সাব্যস্ত হয়ে গেল।) অতঃপর উভয়েই (কোন একদিকে) চলতে লাগলেন। (সম্ভবত তাঁদের সাথে ইউশা'ও ছিল। কিন্তু সে মূসা (আ)-এর অধীনে ছিল। তাই দু'জনেরই উল্লেখ করা হয়েছে।) অবশেষে

(তাঁরা চলতে চলতে যখন এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছলেন, যেখানে নৌকায় আরোহণ করার প্রয়োজন দেখা দিল, তখন) উভয়েই নৌকায় আরোহণ করলেন, এ সময়ে তিনি (নৌকার একটি তক্তা উঠিয়ে) তাতে ছিদ্র করে দিলেন। মূসা (আ) বললেনঃ আপনি কি এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এতে ছিদ্র করে দিলেন? আপনি একটি গুরুতর (আশংকার) কাজ করলেন। তিনি বললেনঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না? (অবশেষে তাই হয়েছে। আপনি অঙ্গীকার ঠিক রাখতে পারলেন না।) মূসা (আ) বললেন : (আমি ভুলে গিয়েছিলাম।) আপনি আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না এবং আমার এই (অনুসরণের) কাজে আমার উপর (এমন) কঠোরতা আরোপ করবেন না। (যাতে ভুলত্রুটিও মার্জনা করা যায় না। ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়ে গেল।) অতঃপর উভয়েই (নৌকা থেকে নেমে সামনে) চলতে লাগলেন, অবশেষে যখন একটি (নাবালেগ) বালকের সাক্ষাত পেলেন, তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন। মূসা (আ) (অস্থির হয়ে) বললেন : আপনি কি একটি নিষ্পাপ জীবনকে শেষ করে দিলেন (তাও) কোন প্রাণের বদলা ছাড়াই? নিশ্চয় আপনি এক বিরাট অন্যায় কাজ করলেন। (প্রথমত এটা নাবালেগের হত্যা, যাকে খুনের বদলেও হত্যা করা যায় না। তদুপরি সে তো কাউকে হত্যাও করেনি। এ কাজটি প্রথম কাজের চাইতেও গুরুতর। কেননা, প্রথম কাজে ছিল শুধু আর্থিক ক্ষতি। আরোহীদের নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা, কিন্তু তা রোধ করা হয়েছিল। এ ছাড়া নাবালেগ বালক সর্বপ্রকার গোনাহ্ থেকে মুক্ত।) তিনি বললেনঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না? মূসা (আ) বললেন : (আচ্ছা, এবারও ক্ষমা করুন, কিন্তু) এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না। নিশ্চয় আপনি আমার পক্ষ থেকে (চূড়ান্তভাবে) নির্দোষ হয়ে গেছেন। [এবার মূসা (আ)-ভুলের জন্য কোন ওযর পেশ করেননি। এতে বোঝা যায় যে, এ প্রশ্নটি তিনি পয়গম্বরসুলভ মর্যাদার ভিত্তিতে ইচ্ছাকৃতভাবেই করেছিলেন।] অতঃপর উভয়েই সামনে চলতে লাগলেন, অবশেষে যখন একটি জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাঁদের কাছে খাবার চাইলেন (যে, আমরা অতিথি,) তখন তারা তাঁদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। ইতিমধ্যে তাঁরা সেখানে একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাকে (হাতের ইশারায় মু'জিযাস্বরূপ) সোজা করে দিলেন। মূসা (আ) বললেনঃ আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে এর পারিশ্রমিক আদায় করতে পারতেন। (ফলে আমাদের অভাবও দূর হত এবং তাদেরও অভদ্রতার সংশোধন হয়ে যেত।) তিনি বললেন : এ হচ্ছে আমার ও আপনার বিচ্ছেদের সময়। (যেমন আপনি নিজেই বলেছিলেন।) এবার আমি সে বিষয়ের স্বরূপ বলে দিচ্ছি, যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি? —পরবর্তী আয়াতে তা বর্ণিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا —বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, খিযির (আ)

কুড়াল দ্বারা নৌকার একটি তক্তা বের করে দেন। ফলে নৌকায় পানি ঢুকে নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এ কারণেই মূসা (আ) প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেন। কিন্তু ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, পানি নৌকায় প্রবেশ করেনি—মু'জিযার কারণে হোক কিংবা খিযির (আ) কর্তৃক এর কিছুটা মেরামত করার কারণে হোক। বগভীর রেওয়ায়েতে আছে যে, এই তক্তার জায়গায় খিযির (আ) একটি কাঁচ লাগিয়ে দেন। কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নৌকা ডুবিয়ে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। এর দ্বারা উপরোক্ত রেওয়ায়েতগুলো সমর্থিত হয়।

حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا—আরবী ভাষায় غلام শব্দের অর্থ নাবালেগ বালক। যে বালককে খিযির (আ) হত্যা করেন, তার সম্পর্কে অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন যে, সে নাবালক ছিল। পরবর্তী বাক্যে نَفْسًا زَكِيَّةً শব্দ থেকেও তাঁর নাবালকত্বের সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা, زَكِيَّة শব্দের অর্থ গোনাহ থেকে পবিত্র। এ গুণটি হয় পয়গম্বরদের মধ্যে পাওয়া যায়, না হয় নাবালেগ বাচ্চাদের মধ্যে পাওয়া যায়। নাবালেগদের আমলনামায় কোন গোনাহ লিপিবদ্ধ করা হয় না।

أَهْلَ قَرْيَةٍ—হযরত খিযির (আ) যে জনপদে পৌঁছেন এবং যার অধিবাসীরা তাঁর আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করে, হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে সেটিকে এন্তাকিয়া ও ইবনে সীরীনের রেওয়ায়েতে 'আইকা' বলা হয়েছে। হযরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত আছে যে, সেটি ছিল আন্দালুসের একটি জনপদ। —(মাযহারী)

والله أعلم

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾ وَأَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ أَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيٰنًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صٰلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا

كَنْزَهُمَا ۚ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِىْ ۗ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ۝

(৭৯) নৌকাটির ব্যাপার—সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দেই। তাদের অপরদিকে ছিল এক বাদশাহ্। সে বলপ্রয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনিয়ে নিত। (৮০) বালকটির ব্যাপার—তার পিতামাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশংকা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে। (৮১) অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যে, তাদের পালনকর্তা তাদেরকে মহত্তর তার চাইতে পবিত্রতায় ও ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান দান করুক। (৮২) প্রাচীরের ব্যাপার—সেটি ছিল নগরের দু'জন পিতৃহীন বালকের। এর নিচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার পালনকর্তা দয়াবশত ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। আমি নিজ মতে এটা করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এটাই তার ব্যাখ্যা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং সে নৌকার ব্যাপার—সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা (এরই মাধ্যমে) সমুদ্রে মেহনত-মজুরি করত। (এর দ্বারাই তারা জীবিকা নির্বাহ করত।) আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দেই। (কারণ,) তাদের সামনের দিকে একজন (অত্যাচারী) বাদশাহ ছিল। সে প্রতিটি (উৎকৃষ্ট) নৌকা জোর-জবরদস্তি করে ছিনিয়ে নিত। (আমি নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করে বাহ্যত অকেজো করে না দিলে এটিও ছিনিয়ে নেয়া হত। ফলে দরিদ্র মজুরদের জীবিকার অবলম্বন শেষ হয়ে যেত। এটিই ছিল ছিদ্র করার উপকারিতা।) বালকটির ব্যাপার—তার পিতামাতা ছিল ঈমানদার। (বালকটি বড় হলে কাফির ও জালিম হত। পিতামাতা তাকে খুব ভালবাসত।) অতএব আমি আশংকা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফরের মাধ্যমে তাদেরকেও না আবার প্রভাবিত করে দেয়। (অর্থাৎ পুত্রের ভালবাসায় তারাও না ধর্মদ্রোহী হয়ে যায়।) সুতরাং আমি ইচ্ছা করলাম যে, (তাকে তো শেষ করে দেয়া দরকার। অতঃপর) তার পরিবর্তে তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পবিত্রতায় ও ভালবাসার ঘনিষ্ঠতায় তার চাইতে শ্রেষ্ঠ সন্তান (ছেলে কিংবা মেয়ে) দান করুক। প্রাচীরের ব্যাপার—সেটি ছিল নগরের দু'জন এতীম বালকের। এর নিচে ছিল তাদের কিছু গুপ্তধন (যা তাদের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তারা পেয়েছিল) এবং তাদের (মৃত) পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি। তার সৎপরায়ণতার বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা তার ধন সংরক্ষিত রাখতে চাইলেন। প্রাচীর এই মুহূর্তে পড়ে গেলে সবাই গুপ্তধন লুটে-পুটে নিয়ে নিত।

এতীম বালকদের অভিভাবক সম্ভবত দেশে ছিল না যে, এর ব্যবস্থা করবে) তাই আপনার পালনকর্তা দয়াবশত চাইলেন যে, তারা উভয়েই যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। (আমি আল্লাহ্র আদেশে এসব কাজ করেছি এবং এর মধ্যে) কোন কাজ আমি নিজ মতে করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এটা হল তার স্বরূপ। [ওয়াদানুযায়ী আমি তা বর্ণনা করে দিলাম। অতঃপর খিযির (আ) বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।]

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ—কা'ব আহ্বার থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এই নৌকাটি যে দরিদ্রদের ছিল, তারা ছিল দশ ভাই। তন্মধ্যে পাঁচ জন ছিল বিকলাঙ্গ। অবশিষ্ট পাঁচ ভাই মেহনত-মজুরি করে সবার জীবিকার ব্যবস্থা করত। সমুদ্রে নৌকা চালিয়ে ভাড়া উপার্জন করাই ছিল তাদের মজুরি।

মিসকীনের সংজ্ঞা: কারও কারও মতে মিসকীন এমন ব্যক্তি, যার কাছে কিছুই নেই। কিন্তু আলোচ্য আয়াত থেকে মিসকীনের সঠিক সংজ্ঞা এই জানা যায় যে, অত্যাবশ্যকীয় অভাব পূরণ করার পর যার কাছে নিসাব পরিমাণ মালও অবশিষ্ট থাকে না, সে-ও মিসকীনের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আয়াতে যাদেরকে মিসকীন বলা হয়েছে, তাদের কাছে কমপক্ষে একটি নৌকা তো ছিল, যার মূল্য নিসাবের চাইতে কম নয়। কিন্তু নৌকাটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনাদি পূরণে নিয়োজিত ছিল। তাই তাদেরকে মিসকীন বলা হয়েছে।—(মাযহারী)

مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا—বগভী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, নৌকাটি যেদিকে যাচ্ছিল, সেখানে একজন জালিম বাদশাহ এই পথে চলাচলকারী সব নৌকা ছিনিয়ে নিত। হযরত খিযির এ কারণে নৌকার একটি তক্তা উপড়িয়ে দেন, যাতে জালিম বাদশাহ নৌকাটি ভাঙ্গা দেখে ছেড়ে দেয় এবং দরিদ্ররা বিপদের হাত থেকে বেঁচে যায়। মওলানা রুমী চমৎকার বলেছেন:

گر خضر در بحر کشتی را شکست
صد درستی در شکست خضر هست

وَأَمَّا الْغُلَامُ—হযরত খিযির (আ) যে বালকটি হত্যা করেন, তার স্বরূপ এই বর্ণনা করেছেন যে, তার স্বভাবে কুফর ও পিতামাতার অবাধ্যতা নিহিত ছিল। তার পিতামাতা ছিল সৎ কর্মপরায়ণ লোক। হযরত খিযির (আ) বলেন: আমার আশংকা ছিল

যে, ছেলেটি বড় হয়ে সৎ কর্মপরায়ণ পিতামাতাকে বিব্রত করবে এবং কষ্ট দেবে। সে কুফরে লিপ্ত হয়ে পিতামাতার জন্য ফিতনা হয়ে দাঁড়াবে এবং তার ভালবাসায় পিতামাতার ঈমানও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا —অর্থাৎ এজন্য আমি ইচ্ছা করলাম, যে আল্লাহ্ তা'আলা এই সৎ কর্মপরায়ণ পিতামাতাকে এ ছেলের পরিবর্তে তার চাইতে উত্তম সন্তান দান করুক, যার কাজকর্ম ও চরিত্র পবিত্র হবে এবং সে পিতামাতার হকও পূর্ণ করবে।

আয়াতে أَرَدْنَا ও خَشِينَا ক্রিয়াপদে উত্তম পুরুষের বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এর একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, খিযির (আ) এ দু'টি ক্রিয়াপদকে নিজের এবং আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্বন্ধ করেছেন। আর এটাও সম্ভব যে, নিজের দিকেই সম্বন্ধ করেছেন। এমতাবস্থায় أَرَدْنَا—এর অর্থ এই যে, আমি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করলাম। কেননা এক ছেলের পরিবর্তে অন্য উত্তম ছেলে দান করা একান্তভাবেই আল্লাহ্ তা'আলার কাজ। এতে খিযির অথবা অন্য কেউ শরীক হতে পারেন না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, ছেলেটি কাফির হবে এবং পিতামাতাকে পথভ্রষ্ট করবে—এ বিষয়টি যদি আল্লাহ্র জ্ঞানে ছিল তবে তাই বাস্তবায়িত হওয়া জরুরী ছিল। কেননা আল্লাহ্র জ্ঞানের বিরুদ্ধে কোন কিছু হতে পারে না।

উত্তর এই যে, আল্লাহ্র জ্ঞান এই শর্তসহ ছিল যে, সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে কাফির হবে এবং পিতামাতার জন্য বিপদ হবে। এরপর যখন সে পূর্বেই নিহত হয়েছে, তখন এই ঘটনা আল্লাহ্র জ্ঞানের বিপক্ষে নয়।—(মাযহারী)

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম আতিয়্যার বাচনিক বর্ণনা করেন যে, নিহত ছেলের পিতামাতাকে আল্লাহ্ তা'আলা তার পরিবর্তে একটি কন্যা দান করেন, যার গর্ভে দু'জন নবী জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী (নবীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা একটি বিরাট উম্মতকে হিদায়েত দান করেন।

وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا —হযরত আবুদ্দারদা রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রাচীরের নিচে রক্ষিত ইয়াতীম বালকদের গুপ্তধন ছিল স্বর্ণ-রৌপ্যের ভাণ্ডার—(তিরমিযী, হাকিম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : সেটি ছিল স্বর্ণের একটি ফলক। তাতে নিম্নলিখিত উপদেশ বাক্যসমূহ লিখিত ছিল। হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা)-ও এই রেওয়ায়েতটি রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। (কুরতুবী)

সূচী-পত্র

১. বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

২. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে তকদীরে বিশ্বাস করে অথচ চিন্তা-যুক্ত হয়।

৩. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে আল্লাহ্ তা'আলাকে রিযিকদাতারূপে বিশ্বাস করে, এরপর প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিশ্রম ও অনর্থক চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে।

৪. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে মৃত্যুতে বিশ্বাস রাখে, অথচ আনন্দিত ও প্রফুল্ল থাকে।

৫. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে পরকালের হিসাবনিকাশে বিশ্বাস রাখে, অথচ সৎ কাজে গাফিল হয়।

৬. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক যে দুনিয়ার নিত্যনৈমিত্তিক পরিবর্তন জেনেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে।

৭. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

পিতামাতার সৎকর্মের উপকার সন্তান-সন্ততিরাও পায় ঃ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا —এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত খিযির (আ)-এর মাধ্যমে ইয়াতীম বালকদের জন্য রক্ষিত গুপ্তধনের হিফাযত এজন্য করানো হয় যে, তাদের পিতা একজন সৎ কর্মপরায়ণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা ছিলেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তার সন্তান-সন্ততির উপকারার্থে এ ব্যবস্থা করেন। মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এক বান্দার সৎ কর্মপরায়ণতার কারণে তার পরবর্তী সন্তান-সন্ততি বংশধর ও প্রতিবেশীদের হিফাযত করেন। —(মাযহারী)

হযরত শিবলী (র) বলতেন ঃ আমি এই শহর এবং সমগ্র এলাকার জন্য শান্তির কারণ। তাঁর ওফাতের পর তাঁর দাফন সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে দায়লামের কাফিররা দাজলা নদী অতিক্রম করে বাগদাদ নগরী অধিকার করে। তখন সবাই বলাবলি করতে থাকে যে, আমাদের উপর দ্বিগুণ বিপদ চেপেছে অর্থাৎ শিবলীর ওফাত ও দায়লামের পতন।—(কুরতুবী, ১১ খণ্ড, ২৯ পৃঃ)

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলিম ও সৎ কর্মপরায়ণদের সন্তান-সন্ততিদের খাতির করা এবং তাদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হওয়া উচিত, যে পর্যন্ত না তারা পুরোপুরি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا — أشد শব্দটি شد -এর বহুবচন। এর অর্থ শক্তি এবং সে বয়স, যাতে মানুষ পূর্ণ শক্তি অর্জন এবং আত্মশক্তির সার্থক করতে সক্ষম হয়। ইমাম আবূ হানীফার মতে পঁচিশ বছর বয়ঃক্রম এবং কারও মতে চল্লিশ বছর বয়ঃক্রম।

কেননা, কোরআন পাকে রয়েছে حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً —(মাযহারী)

পয়গম্বরসুলভ অলংকার ও আদরের একটি দৃষ্টান্তঃ এ দৃষ্টান্তটি বোঝার আগে একটি জরুরী বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার। তা এই যে, দুনিয়াতে কোন ভাল অথবা মন্দ কাজ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে সম্পন্ন হতে পারে না। ভালমন্দ সবই আল্লাহ্‌র সৃজিত এবং তাঁর ইচ্ছার অধীন। যে সব বিষয়কে মন্দ বলা হয়, সেগুলো বিশেষ ব্যক্তি অথবা বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই মন্দ কথিত হওয়ার যোগ্য, কিন্তু সামগ্রিক বিশ্বের প্রকৃতির জন্য সবই জরুরী এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টি হিসাবে সবই উত্তম ও রহস্যের উপর নির্ভরশীল।

کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

মোটকথা দুনিয়াতে যেসব বিপদ ও দুর্ঘটনা ঘটে সেগুলো আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত ঘটতে পারে না। এদিক দিয়ে প্রত্যেক ভাল ও মন্দের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলাকে বলা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির দৃষ্টিকোণে কোন মন্দই মন্দ নয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলাকে মন্দের স্রষ্টা না বলা আদব। কোরআনে উল্লিখিত হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর বাক্য এ আদবই শিক্ষা দেয়। তিনি বলেনঃ

الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

তিনি পানাহার করানোকে আল্লাহ্‌র প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন এবং অসুস্থ হওয়ার সময় আরোগ্য দান করাকেও আল্লাহ্‌র প্রতিই সম্পৃক্ত করেছেন, কিন্তু মাঝখানে অসুস্থ হওয়াকে নিজের প্রতি সম্পৃক্ত করে إِذَا مَرِضْتُ বলেছেন অর্থাৎ যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আরোগ্য দান করেন। এরূপ বলেননি যে, যখন আল্লাহ্ আমাকে অসুস্থ করে দেন তখন আরোগ্যও দান করেন।

এবার হযরত খিযির (আ)-এর বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করুন। নৌকা ভাঙার ইচ্ছা বাহ্যত একটি দূষণীয় ও মন্দ ইচ্ছা। তাই এ ইচ্ছাকে নিজের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করে أَرَدْتُ বলেছেন। অতঃপর বালক হত্যা ও তার পরিবর্তে উত্তম সন্তান দান করার মধ্যে হত্যা ছিল মন্দ কাজ এবং উত্তম সন্তান দান করা ছিল ভাল কাজ। তাই এতদুভয়ের ইচ্ছার ক্ষেত্রে বহুবচন প্রয়োগ করে أَرَدْنَا অর্থাৎ 'আমরা ইচ্ছা করলাম' বলেছেন, যাতে বাহ্যিক মন্দ কাজটি নিজের সাথে এবং ভাল কাজটি আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। তৃতীয় ঘটনায় প্রাচীর সোজা করে ইয়াতিমদের গুপ্তধনের হেফাযত করা একটি সম্পূর্ণত ভাল কাজ।

তাই একে পুরোপুরি আল্লাহ্‌র দিকে সম্পৃক্ত করে فَأَرَادَ رَبُّكَ অর্থাৎ 'আপনার পালনকর্তা ইচ্ছা করলেন' বলেছেন।

হযরত খিযির (আ) জীবিত আছেন, না ওফাত হয়ে গেছে ঃ হযরত খিযির (আ) জীবিত আছেন, না তাঁর ওফাত হয়ে গেছে, এ বিষয়ের সাথে কোরআনে বর্ণিত ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। তাই কোরআন ও হাদীসে স্পষ্টত এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। কোন কোন রেওয়ায়েত ও উক্তি থেকে তাঁর অদ্যাবধি জীবিত থাকার কথা জানা যায়। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে এর বিপরীত বিষয় জানা যায়। ফলে এ ব্যাপারে সর্বকালেই আলিমদের বিভিন্নরূপ মতামত পরিদৃষ্ট হয়েছে। যাদের মতে তিনি জীবিত আছেন, তাদের প্রমাণ হচ্ছে মুস্তাদরাক হাকিম কর্তৃক হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত। তাতে বলা হয়েছে ঃ যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাত হয়ে যায়, তখন সাদাকালো দাড়িওয়ালা জনৈক ব্যক্তি আগমন করে এবং ভিড় ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে কান্নাকাটি করতে থাকে। এই আগন্তুক সাহাবায়ে কিরামের দিকে মুখ করে বলতে থাকে ঃ

ان فى الله عزاء من كل مصيبة وعوضا من كل فائت وخلفا من كل هالك فالى الله فانيبوا واليه فارغبوا فانما المحروم من حرم الثواب -

আল্লাহ্‌র দরবারেই প্রত্যেক বিপদ থেকে সবর আছে, প্রত্যেক বিলুপ্ত বিষয়ের প্রতিদান আছে এবং তিনিই প্রত্যেক ধ্বংসশীল বস্তুর স্থলাভিষিক্ত। তাই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন কর এবং তাঁর কাছেই আগ্রহ প্রকাশ কর। কেননা যে ব্যক্তি বিপদের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়, সে-ই প্রকৃত বঞ্চিত।

আগন্তুক উপরোক্ত বাক্য বলে বিদায় হয়ে গেলে হযরত আবু বকর (রা) ও আলী (রা) বললেন ঃ ইনি হযরত খিযির (আ)। এ রেওয়ায়েতে বর্ণনা করাই এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য।

মুসলিমের হাদীসে আছে যে, দাজ্জাল মদীনার নিকটবর্তী এক জায়গায় পৌঁছলে মদীনা থেকে এক ব্যক্তি তার মুকাবিলার জন্য বের হবেন। তিনি তৎকালীন লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হবেন কিংবা শ্রেষ্ঠতম লোকদের অন্যতম হবেন। আবু ইসহাক বলেন ঃ এ ব্যক্তি হবেন হযরত খিযির (আ)।

ইবনে আবিদ দুনিয়া 'কিতাবুল হাওয়াতিফে' বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) হযরত খিযির (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তাঁকে একটি দোয়া বলে দেন। যে ব্যক্তি এই দোয়া প্রত্যেক নামাযের পর পাঠ করবে, সে বিরাট সওয়াব, মাগফিরাত ও রহমত পাবে। দোয়াটি এই ঃ

يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ وَيَا مَنْ لَا تَغْلِطُهُ الْمَسَائِلُ وَيَا مَنْ
لَا يَبْرَمُ مِنْ اِلْحَاحِ الْمُلِحِّيْنَ اَذِقْنِيْ بَرْدَ عَفْوِكَ وَحَلَاوَةَ مَغْفِرَتِكَ -

"হে ঐ সত্তা, যার এক কথা শোনা অন্য কথা শোনায় প্রতিবন্ধক হয় না, হে ঐ সত্তা, যাকে একই সময়ে করা লাখো কোটি প্রশ্ন বিভ্রান্ত করে না এবং হে ঐ সত্তা যিনি দোয়ায় পীড়াপীড়ি করলে এবং বারবার বললে বিরক্ত হন না, আমাকে তোমার ক্ষমার স্বাদ আস্বাদন করাও এবং তোমার মাগফিরাতের স্বাদ দান কর।"

অতঃপর এ গ্রন্থেই হুবহু এই ঘটনা, এই দোয়া এবং হযরত খিযির (আ)-এর সাথে সাক্ষাতের ঘটনা হযরত উমর (রা)-এর থেকেও বর্ণিত আছে।

পক্ষান্তরে যারা হযরত খিযির (আ)-এর জীবদ্দশা অস্বীকার করে, তাদের বড় প্রমাণ—হচ্ছে সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। হযরত ইবনে উমর বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সা) জীবনের শেষ দিকে এক রাত্রে আমাদেরকে নিয়ে ইশার নামায পড়েন। নামায শেষে তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেন :

اَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهٖ فَاِنَّ عَلٰى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقٰى مِمَّنْ هُوَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَحَدٌ -

'তোমরা কি আজকের রাতটি লক্ষ্য করছ? এই রাত থেকে একশ' বছর অতীত হলে আজ যারা পৃথিবীতে আছে, তাদের কেউ জীবিত থাকবে না।'

হযরত ইবনে উমর অতঃপর বলেন : এই রেওয়ায়েত সম্পর্কে অনেকেই অনেক রকম কথাবার্তা বলে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এক শ' বছর অতীত হলে এ শতাব্দী শেষ হয়ে যাবে।

মুসলিমে এ রেওয়ায়েতটি হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকেও প্রায় এমনি বর্ণিত আছে। কিন্তু রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করার পর আল্লামা কুরতুবী বলেন এর ভাষায় তাদের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই, যারা খিযির (আ)-এর জীবদ্দশাকে অস্বীকার করে। কেননা, এতে যদিও সমগ্র মানবজাতির জন্য ব্যাপক ভাষা তাগিদ সহকারে প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক আদম সন্তানই এই ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, আদম সন্তানদের মধ্যে হযরত ঈসা (আ)-ও একজন। তিনি ওফাত পান নি। এবং নিহতও হননি। কাজেই হাদীসে ব্যবহৃত عَلَى الْاَرْضِ শব্দের মধ্যে যে আলিফলাম রয়েছে, বাহ্যত তা عهد -এর অর্থ দেয়। এবং এর অর্থ আরব ভূমি ইয়াজুজ-মাজুজের দেশ, প্রাচ্যদেশ ও দ্বীপপুঞ্জ—যেগুলোর নামও আরবরা কোনদিন শোনেনি। এ গুলোসহ সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ হাদীসে বোঝানো হয়নি। এ হচ্ছে আল্লামা কুরতুবীর বক্তব্য।

কেউ কেউ খিযির (আ)-এর জীবদ্দশা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে জীবিত থাকলে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করা তাঁর জন্য অপরিহার্য ছিল। কেননা হাদীসে বলা হয়েছে لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعى —অর্থাৎ মূসা (আ) জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁরও গত্যন্তর ছিল না। (কারণ আমার আগমনের ফলে তাঁর ধর্ম রহিত হয়ে গেছে)। কিন্তু এটা অসম্ভব নয় যে, খিযির (আ)-এর জীবন ও নবুয়ত সাধারণ পয়গম্বরদের থেকে ভিন্নরূপ হবে। তাঁকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তাই তিনি সাধারণ মানুষ থেকে আলাদাভাবে নিজের কাজে নিয়োজিত আছেন। শরীয়তে মুহাম্মদীর অনুসরণের ব্যাপারে এটা সম্ভব যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়তের পর এ শরীয়তেরই অনুসরণ করে চলেছেন। والله اعلم

আবু হাইয়্যান বাহ্‌রে মুহীত গ্রন্থে খিযির (আ)-র সাথে কয়েকজন বুযুর্গের সাক্ষাতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সাথে সাথে একথাও বলেছেন যে, والجمهور على انه مات —অর্থাৎ সাধারণ আলিমদের মতে তাঁর ওফাত হয়ে গেছে।—(ষষ্ঠ খণ্ড ১৪৭ পৃঃ)

তফসীর মাযহারীতে কাযী সানাউল্লাহ্ বলেন ঃ হযরত সাইয়্যেদ আহমদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী তাঁর কাশ্‌ফের মাধ্যমে যে কথা বলেছেন, তার মধ্যেই সব বিতর্কের সমাধান নিহিত আছে। তিনি বলেন ঃ আমি নিজে কাশ্‌ফ জগতে হযরত খিযির (আ)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন ঃ আমি ও ইলয়াস (আ) উভয়েই জীবিত নই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এরূপ ক্ষমতা দান করেছেন যে, আমরা জীবিত মানুষের বেশ ধারণা করে বিভিন্নভাবে মানুষের সাহায্য করি।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, হযরত খিযির (আ)-এর মৃত্যু ও জীবদ্দশার সাথে আমাদের কোন বিশ্বাসগত অথবা কর্মগত আস্‌আলা জড়িত নয়। এ কারণেই কোরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কোন কিছু বলা হয়নি। তাই এ ব্যাপারে অতিরিক্ত আলোচনা ও খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন নেই। কোন একদিকের উপর বিশ্বাস রাখাও আমাদের জন্য জরুরী নয়। কিন্তু প্রশ্নটি জনগণের মধ্যে বহুল প্রচলিত, তাই উল্লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ۗ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ۞ اِنَّا

مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ۞ فَاَتْبَعَ

سَبَبًا ۞ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ

وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّآ
اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾ قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ
يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾ وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَلَهٗ جَزَآءَ ِۨ الْحُسْنٰى ۚ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾

(৮৩) তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুনঃ আমি তোমাদের কাছে তার কিছু অবস্থা বর্ণনা করব। (৮৪) আমি তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের কার্যোপকরণ দান করেছিলাম। (৮৫) অতঃপর তিনি এক কার্যোপকরণ অবলম্বন করলেন। (৮৬) অবশেষে তিনি যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছলেন; তখন তিনি সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম হে যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন। (৮৭) তিনি বললেনঃ যে কেউ সীমালংঘনকারী হবে, আমি তাকে শাস্তি দেব। অতঃপর তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবেন। তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। (৮৮) এবং যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে কল্যাণ এবং আমার কাজে তাকে সহজ নির্দেশ দেবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যুলকারনাইনের প্রথম সফরঃ তারা আপনাকে যুলকারনাইনের অবস্থা জিজ্ঞেস করে। [এক কারণ লিখিত রয়েছে এই যে, তাঁর ইতিহাস প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছিল। এ কারণেই এই কাহিনীর অতিরিক্ত বিষয়াদি, যা কোরআনে উল্লিখিত হয়নি, সে সম্পর্কে আজ পর্যন্ত ইতিহাসে তীব্র মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হয়। এ কারণেই কোরাইশরা মদীনার ইহুদীদের পরামর্শে এ কাহিনীটি প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত রেখেছিল। তাই কোরআনে বর্ণিত এ ঘটনার বিবরণ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়তের সুস্পষ্ট প্রমাণ।] আপনি বলে দিনঃ আমি এখনই তোমাদের কাছে তার অবস্থা বর্ণনা করব। (অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কাহিনীর বর্ণনা শুরু হয়েছে যে, যুলকারনাইন একজন প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশাহ ছিলেন)। আমি তাকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করেছিলাম এবং আমি তাকে সব রকম সাজসরঞ্জাম দিয়েছিলাম, (যদ্দ্বারা তিনি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়িত করতে পারতেন)। অতঃপর তিনি (পাশ্চাত্য দেশসমূহ জয় করার মানসে) এক পথ অবলম্বন করলেন (এবং সফর করতে লাগলেন)। অবশেষে তিনি যখন (চলতে চলতে মধ্যবর্তী শহরগুলো পদানত করে) সূর্যের অস্তাচলে (অর্থাৎ পশ্চিম প্রান্তের সর্বশেষ জনবসতি

পর্যন্ত) পৌঁছলেন, তখন সূর্যকে তিনি এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন। (সম্ভবত এর অর্থ সমুদ্র। সমুদ্রের পানি অধিকাংশ কাল দৃষ্টিগোচর হয়। সূর্য প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রে অস্ত যায় না। কিন্তু সমুদ্র দিগন্ত হলে মনে হয় যেন, সমুদ্রেই অস্ত যাচ্ছে।) এবং তথায় তিনি এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। (পরবর্তী আয়াত أَمَّا مَنْ ظَلَمَ থেকে বোঝা যায় যে, তারা কাফির ছিল।) আমি (ইলহামের মাধ্যমে অথবা তৎকালীন পয়গম্বরের মধ্যস্থতায় তাকে) বললাম : হে যুলকারনাইন, (এই সম্প্রদায় সম্পর্কে তোমাকে দু'রকম ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে) হয় (তাদেরকে প্রথমেই হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে) শাস্তি দেবে, না হয় তাদের ব্যাপারে সদয় ব্যবহার করতে হবে (অর্থাৎ তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেবে। যদি না মানে তবে হত্যা করবে। তবলীগ ও দাওয়াত ছাড়াই প্রথমে হত্যা করার ক্ষমতা সম্ভবত একারণে দেওয়া হয়েছিল যে, পূর্বে কোন উপায়ে তাদের কাছে ঈমানের দাওয়াত পৌঁছেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পথ, আগে দাওয়াত পরে হত্যা —এটা যে উত্তম, তা ইঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে এবং أَنْ تَتَّخِذَ حُسْنًا শব্দ দ্বারা তা ব্যক্ত করা হয়েছে।) যুলকারনাইন বললেন : (আমি দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করে প্রথমে তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেব।) কিন্তু (দাওয়াতের পর) যে জালিম হবে, তাকে আমি (হত্যা ইত্যাদির) শাস্তি দেব (এ শাস্তি হবে পার্থিব) অতঃপর সে (মৃত্যুর পর) তার পালন-কর্তার কাছে ফিরে যাবে। তিনি তাকে (দোযখের) কঠোর শাস্তি দেবেন এবং যে (দাওয়াতের পর) বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম করবে, তার জন্য (পরকালেও) প্রতিদানে কল্যাণ রয়েছে এবং আমিও (দুনিয়াতে) আমার ব্যবহারে তাকে সহজ (ও নম্র) কথা বলব। (অর্থাৎ কার্যক্ষেত্রে কঠোরতা করার প্রশ্নই উঠে না, কথায়ও কঠোরতা করা হবে না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَيَسْئَلُونَكَ—অর্থাৎ তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। কারা প্রশ্ন করেছিল, এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তারা ছিল মক্কার কোরাইশ সম্প্রদায়। মদীনার ইহুদীরা তাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত ও সততা যাচাই করার জন্য তিনটি প্রশ্ন বলে দিয়েছিল : রূহ্, আসহাবে কাহ্ফ ও যুলকারনাইন সম্পর্কে। তন্মধ্যে দু'টি প্রশ্নের জওয়াব পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় প্রশ্নের জওয়াব বর্ণিত হয়েছে যে, যুলকারনাইন কে ছিল এবং তার কি অবস্থা ছিল? —(বাহ্‌রে মুহীত)

যুলকারনাইন কে ছিলেন, কোন যুগে ও কোন দেশে ছিলেন এবং তাঁর নাম যুলকারনাইন হল কেন? যুলকারনাইন নামকরণের হেতু সম্পর্কে বহু উক্তি ও তীব্র মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কেউ বলেন : তাঁর মাথার চুলের দু'টি গুচ্ছ ছিল। তাই যুলকারনাইন, (দুই গুচ্ছওয়ালা) আখ্যায়িত হয়েছেন। কেউ বলেন : পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশসমূহ জয়

কয়েকের কারণে যুলকারনাইন খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। কেউ এমনও বলেছেন যে, তাঁর মাথায় শিং এর অনুরূপ দু'টি চিহ্ন ছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তাঁর মাথার দুই দিকে দু'টি ক্ষত চিহ্ন ছিল। والله اعلم কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, কোরআন স্বয়ং তাঁর নাম যুলকারনাইন রাখেনি, বরং ইহুদীরা এ নাম বলেছিল। বোধ হয় তিনি তাদের কাছে এ নামেই খ্যাত ছিলেন। যুলকারনাইনের ঘটনা সম্পর্কে কোরআন পাক যা বর্ণনা করেছে, তা এই ঃ

তিনি একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশ-সমূহ জয় করেছিলেন। এসব দেশে তিনি সুবিচার ও ইনসাফের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বপ্রকার সাজসরঞ্জাম দান করা হয়েছিল। তিনি দিগ্বিজয়ে বের হয়ে পৃথিবীর তিন প্রান্তে পৌঁছেছিলেন—পাশ্চাত্যের শেষ প্রান্তে, প্রাচ্যের শেষ প্রান্তে এবং উত্তরে পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত। এখানেই তিনি দুই পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথকে একটি সুবিশাল লৌহ প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে ইয়াজুজ-মাজুজের লুটতরাজ থেকে এলাকার জনগণ নিরাপদ হয়ে যায়।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত ও সত্যতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন উত্থাপনকারী ইহুদীরা এই জওয়াব শুনে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। তারা আর অতিরিক্ত কোন প্রশ্ন করেনি যে, তার নাম কেন যুলকারনাইন ছিল এবং তিনি কোন্ দেশে কোন যুগে বিদ্যমান ছিলেন ? এতে বোঝা যায় যে, এসব প্রশ্নকে স্বয়ং ইহুদীরাও অনাবশ্যক ও অনর্থক মনে করেছে। বলা বাহুল্য, কোরআন পাক ইতিহাস ও কাহিনীর ততটুকু অংশই উল্লেখ করে, যতটুকুর সাথে কোন ধর্মীয় বা পার্থিব উপকার জড়িত থাকে অথবা যার উপর কোন জরুরী বিষয় জানা নির্ভরশীল থাকে। তাই এসব বিষয় কোরআন পাক বর্ণনা করেনি এবং কোন সহীহ্ হাদীসেও এসব প্রশ্নের উত্তর নেই। যেহেতু কোরআন পাকের কোন আয়াত বোঝা এ গুলোর উপর নির্ভরশীল নয়, তাই পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবেয়ীগণও এসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেননি।

এখন এসব প্রশ্ন সমাধানের একমাত্র সম্বল হচ্ছে ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত অথবা বর্তমান তওরাত ও ইঞ্জীল। বলা বাহুল্য, উপর্যুপরি পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে বর্তমান তওরাত এবং ইঞ্জীলও তাদের ঐশী গ্রন্থের মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। এগুলো এখন বলতে গেলে ইতিহাস গ্রন্থের পর্যায়ভুক্ত। এগুলো বর্তমানে প্রাচীন ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত এবং ইসরাঈলী কিস্সা-কাহিনীতে পরিপূর্ণ। এসব কাহিনীর কোন সনদ নেই এবং কোন যমানার সুধীবৃন্দের কাছেও এগুলো নির্ভরযোগ্য পরিগণিত হয়নি। তফসীরবিদগণও এ ব্যাপারে যা কিছু লিখেছেন, তাও এক ধরনের ঐতিহাসিক রেওয়া-য়েতের সমষ্টি মাত্র। ফলে তাদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। বর্তমানকালে ইউরো-পীয়রা ইতিহাসকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করেছে। তারা এ বিষয়ের গবেষণায় অপরি-সীম অধ্যবসায় ও পরিশ্রম নিয়োজিত করেছে। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করে সেখান থেকে বিভিন্ন শিলালিপি উদ্ধার করেছে এবং সেগুলোর সাহায্যে পুরাতত্ত্বের স্বরূপ আবিষ্কারে অভূত-

পূর্ব কৃতিত্ব অর্জন করেছে। কিন্তু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করে প্রাপ্ত শিলালিপির মাধ্যমে কোন ঘটনার সমর্থনে সাহায্য পাওয়া গেলেও সেগুলো দ্বারা ঘটনার পাঠোদ্ধার সম্ভবপর নয়। এর জন্য ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত সমূহই ভিত্তি হতে পারে। এসব ব্যাপারে প্রাচীন-কালের ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত সমূহের অবস্থা একটু আগেই জানা গেছে যে, এ গুলোর মর্যাদা কিস্‌সা-কাহিনীর চাইতে অধিক নয়। প্রাচীন ও আধুনিক তফসীরবিদগণও স্ব-স্ব গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই উদ্ধৃত করেছেন। এখানেও এ দৃষ্টি-ভঙ্গিতেই যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু লেখা হচ্ছে। মাওলানা হিফযুর রহমান সাহেব 'কিসাসুল-কোরআন' গ্রন্থে এ ঘটনার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতিহাসের কৌতুহলী পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বে শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকারী চারজন সম্রাট অতিক্রান্ত হয়েছেন। তন্মধ্যে দু'জন ছিলেন মু'মিন এবং দু'জন কাফির। মু'মিন দু'জন হলেন হযরত সোলায়মান (আ) ও যুলকারনাইন এবং কাফির দু'জন নমরূদ ও বখতে নসর।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যুলকারনাইন নামে পৃথিবীতে একাধিক ব্যক্তি খ্যাতি লাভ করেছেন এবং এটাও আশ্চর্যের ব্যাপার যে, প্রতি যুগের যুলকারনাইনের সাথে সিকান্দর (আলেকজাণ্ডার) উপাধিটিও যুক্ত রয়েছে।

খৃস্টের প্রায় তিনশ' বছর পূর্বে সিকান্দার নামে একজন সম্রাট প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিলেন। তাকে সিকান্দার গ্রীক, মকদুনী, রূমী, ইত্যাদি উপাধিতেও স্মরণ করা হত। তার মন্ত্রী ছিলেন এরিস্টটল এবং তিনি দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করে তার রাজ্য জয় করেন। সিকান্দার নামে খ্যাতিলাভকারী সর্বশেষ ব্যক্তি তিনিই ছিলেন। তার কাহিনী জগতে অধিক প্রসিদ্ধ। কেউ কেউ তাকেও কোরআনে উল্লিখিত যুলকার-নাইন বলে অভিমত দিয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা তিনি অগ্নিপূজারি মুশরিক ছিলেন। কোরআন পাকে যে যুলকারনাইনের উল্লেখ রয়েছে, তার নবী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, কিন্তু ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। কোরআনের আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

হাফেজ ইবনে কাসীর 'আল বেদায়াহ ওয়ান্নেহায়াহ্' গ্রন্থে ইবনে আসাকিরের বরাত দিয়ে তার পূর্ণ বংশতালিকা লিপিবদ্ধ করেছেন, যা উপরে পৌঁছে হযরত ইব্রাহীম (আ) এর সাথে মিলে যায়। তিনি বলেছেন ঃ এই সিকান্দারই গ্রীক, মিসরী, মকদুনী নামে পরিচিত। তিনি নিজের নামে আলেকজান্দ্রিয়া শহর পত্তন করেন। রোমের ইতিহাস তার আমল থেকেই আরম্ভ হয়। তার আমল প্রথম সিকান্দার যুলকারনাইন থেকে দু'হাজার বছরেরও অধিককাল পর। তিনিই দারাকে হত্যা করেন এবং পারস্য সম্রাটদেরকে পরাভূত করে তাদের দেশ জয় করেন। কিন্তু এই ব্যক্তি ছিল মুশরিক। তাকে কোরআনে উল্লিখিত যুলকারনাইন বলা নিতান্তই ভুল। ইবনে কাসীরের ভাষা এরূপ ঃ

فاما ذو القرنين الثانى فهو اسكندر بن فيلبس بن مصريم بن هرمس بن ميطون بن رومى بن لنطى بن يونان بن يافث بن يونة بن شرخون بن رومة بن شرفط بن توفيل بن رومى بن الاصفر بن يقز بن العيص بن اسحاق بن ابراهيم الخليل عليه الصلوة والسلام كذا نسبه الحافظ ابن عساكر فى تاريخه المقدونى اليونانى المصرى بانى اسكندرية الذى يؤرخ بايامه الروم وكان متاخرا عن الاول بدهر طويل وكان هذا قبل المسيح بنحو من ثلثمائة سنة وكان ارطاطاليس الفيلسوف وزيره وهو الذى قتل دارا بن دارا واذل ملوك الفرس واوطا ارضهم وانما نبهنا عليه لان كثيرا من الناس يعتقد انهما واحد وان المذكور فى القران هو الذى كان ارطاطاليس وزيره فيقع بسبب ذلك خطاء كبير وفساد عريض طويل فان الاول كان عبدا مؤمنا صالحا وملكا عادلا وكان وزيره الخضر وقد كان نبيا على ما قررناه قبل هذا واما الثانى فكان مشركا كان وزيره فيلسوفا وقد كان بين زمانيهما ازيد من الفى سنة فاين هذا من هذا لا يستويان ولا يشتبهان الا على غبى لا يعرف حقائق الامور-

হাদীস ও ইতিহাসবিদ ইবনে কাসীরের এই বক্তব্যে প্রথমত জানা গেল যে, সিকান্দার বাদশাহ্ যিনি ঈসা (আ)-র তিন শত বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন, দারা ও পারস্য সম্রাটদের সাথে যাঁর যুদ্ধ হয়েছে এবং যিনি আলেকজান্দ্রিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি কোরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন নন। কতিপয় বড় বড় তফসীরবিদও এই বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন। আবু হাইয়্যান বাহ্রে-মুহীতে এবং আল্লামা আলুসী রূহুল মা'আনীতে তাকে কোরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন বলে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত وانه كان نبيا বাক্য থেকে জানা গেল যে, ইবনে কাসীরের মতে তার নবী হওয়ার ধারণাটি প্রবল। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের উক্তি স্বয়ং ইবনে কাসীর আবু তোফায়েলের রেওয়ায়েতক্রমে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যুলকারনাইন নবী বা ফেরেশতা ছিলেন না, বরং একজন সৎ কর্মপরায়ণ মুসলমান ছিলেন। তাই কোন কোন আলিম বলেছেন যে, انه এর সর্বনাম দ্বারা যুলকারনাইনকে নয়—খিযির (আ) কে বোঝানো হয়েছে।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, তবে কোরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন কে এবং কোন্ যুগে ছিলেন? এ সম্পর্কেও আলিমদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইবনে কাসীরের মতে তার আমল ছিল সিকান্দার গ্রীক মকদুনী থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে হযরত ইব্রাহীম (আ)-

এর আমল। তার উজির ছিলেন হযরত খিযির (আ)। ইবনে কাসীর 'আল-বেদায়াহ্ ওয়ান্নেহায়াহ্' গ্রন্থে এ রেওয়ায়েতও বর্ণনা করেছেন যে, যুলকারনাইন বাদব্রাজ হজ্বের উদ্দেশে আগমণ করলে হযরত ইব্রাহীম (আ) মক্কা থেকে বের হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানান, তার জন্য দোয়া করেন এবং কিছু উপদেশও প্রদান করেন। তফসীর ইবনে কাসীরে আয-রকীর বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে, যুলকারনাইন ইব্রাহীম (আ)-এর সাথে তওয়াফ করেন এবং কুরবানি করেন।

আবূ রায়হান আল-বেরুনী 'কিতাবুল আসারিল বাকীয়া আনিল কুরূনিল খালীয়া' গ্রন্থে বলেন: কোরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন হচ্ছে আবূ বকর ইবনে সুমাই ইবনে উমর ইবনে আফরীকায়স হিমইয়ারী। তিনি দিগ্বিজয়ী ছিলেন। তুব্বা হিমইয়ারী ইয়ামেনী তার কবিতায় তার জন্য গর্ববোধ করে বলেছেন: আমার দাদা যুলকারনাইন মুসলমান ছিলেন। কবিতা এই:

قد كان ذو القرنين جدي مسلما
ملكا علا في الأرض غير مبعد
بلغ المشارق والمغارب يبتغي
أسباب ملك من كريم سيد

আবূ হাইয়্যান বাহ্‌রেমুহীতে এ রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীরও 'আল-বেদায়াহ্ ওয়ান্নেহায়াহ্' গ্রন্থে এর উল্লেখ করার পর বলেন: এই যুলকারনাইন তিন জন ইয়ামনী সম্রাটের মধ্যে প্রথম সম্রাট ছিলেন। সে-ই সাবা' কূপের মোকদ্দমায় হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর পক্ষে ন্যায় ফয়সালা দিয়েছিলেন। এ সমুদয় রেওয়ায়েতে যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্ব, নাম ও বংশ পরম্পরা সংক্রান্ত মতভেদ সত্ত্বেও তার আমল হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর আমল বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

মওলানা হিফযুর রহমান কিসাসুল কোরআনে যুলকারনাইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার সারমর্ম এই যে, কোরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন হচ্ছেন পারস্যের সে সম্রাট, যাকে ইহুদীরা খোরাস, গ্রীকরা সায়রাস, পারসিকরা গোরশ এবং আরবরা কায়খসরু নামে অভিহিত করে। তার আমল ইব্রাহীম (আ)-এর অনেক পরে বনী ইসরাঈলের অন্যতম পয়গম্বর দানিয়াল (আ)-এর আমল বর্ণনা করা হয়। এ আমল দারার হত্যাকারী সিকান্দার মকদুনীর আমলের কাছাকাছি হয়ে যায়। কিন্তু মওলানা সাহেবও ইবনে কাসীর প্রমুখের ন্যায় কঠোর ভাষায় বিরোধিতা করে বলেছেন যে, যুলকারনাইন সে সিকান্দার মকদুনী হতে পারে না, যার উজির ছিলেন দার্শনিক এরিস্টটল। কারণ, তিনি ছিলেন মুশরিক এবং যুলকারনাইন ছিলেন মু'মিন, সৎকর্মপরায়ণ।

মওলানা সাহেবের বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ এই যে, সূরা বনী ইসরাঈলে বনী ইসরাঈলের দু'বার দুষ্কর্ম ও হাঙ্গামায় লিপ্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করে দুই বারের শাস্তি বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। হাঙ্গামা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ

(অর্থাৎ তোমাদের হাঙ্গামার শাস্তিস্বরূপ আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কিছু সংখ্যক কঠোর যোদ্ধা বান্দাকে প্রেরণ করব। তারা তোমাদের ঘরে ঘরে অনুপ্রবেশ করবে।) এখানে কঠোর যোদ্ধা বলে বখতে নসর ও তার দলবলকে বোঝানো হয়েছে। তারা বায়তুল মোকাদ্দাসে চল্লিশ হাজার এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে সত্তর হাজার ইহুদীকে হত্যা করে এবং লক্ষাধিক বনী ইসরাঈলকে বন্দী করে গরু-ছাগলের মত হাঁকিয়ে বাবেলে নিয়ে যায়। এরপর কোরআন পাক বলেন : ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ (অর্থাৎ আমি পুনরায় তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে জয়ী করলাম।) বিজয়ের এই ঘটনাটি সম্রাট কায়খসরু তথা খোরাসের হাতে সংঘটিত হয়। সে ছিল ঈমানদার, সৎকর্ম-পরায়ণ। সে বখতে নসরের মুকাবিলা করে বন্দী বনী ইসরাঈলকে তার অধিকার থেকে মুক্ত করে পুনরায় ফিলিস্তীনে পুনর্বাসিত করে এবং ধ্বংসস্তূপে পরিণত বায়তুল-মোকাদ্দাসকেও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। বায়তুল-মোকাদ্দাসের যেসব গুপ্তধন ও গুরুত্ব-পূর্ণ সাজসরঞ্জাম বখতে নসর এখান থেকে বাবেলে স্থানান্তরিত করেছিল, সে সেগুলোও উদ্ধার করে বনী ইসরাঈলের অধিকারে সমর্পণ করে। এভাবে সে বনী ইসরায়ীদের কথা ইহুদীদের ত্রাণকর্তারূপে পরিগণিত হয়।

নবুয়ত পরীক্ষা করার জন্য মদীনায় ইহুদীরা কোরায়শদের জন্য যে প্রশ্নপত্র বাছাই করে, তাতে যুলকারনাইন সম্পর্কিত প্রশ্নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইহুদীরা তাকে তাদের ত্রাণকর্তারূপে সম্মান ও ভক্তিশ্রদ্ধা করত।

মওলানা হিফযুর রহমান সাহেব তাঁর এ বক্তব্যের স্বপক্ষে বর্তমান তওরাত থেকে, বনী ইসরাঈলের পয়গম্বরগণের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে এবং ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত থেকে প্রচুর দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন। কেউ আরও বেশি জানতে চাইলে মওলানা সাহেবের পুস্তকটি পাঠ করতে পারেন। এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করার মাধ্যমে যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্ব ও তার যুগ সম্পর্কে ইতিহাস ও তফসীরবিদদের সবগুলো উক্তি বর্ণনা করে দেওয়াই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। তন্মধ্যে কার উক্তি প্রবল, এ সিদ্ধান্ত নেওয়া আমার উদ্দে-শ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা কোরআন যেসব বিষয়ের দাবি করেনি এবং হাদীসও যেসব বিষয় বর্ণনা করেনি, সেগুলো নির্ণয় ও নির্দিষ্ট করার দায়িত্বও আমার উপর বর্তায় না। তন্মধ্যে যে উক্তিই প্রবল ও নির্ভুল প্রমাণিত হবে, তাতেই কোরআনের লক্ষ্য অর্জিত হবে। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ এখন আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন :

قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا —এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, কোর-আন পাক ذِكْرُهُ সংক্ষিপ্ত শব্দ ছেড়ে مِنْهُ ذِكْرًا এ দু'টি শব্দ কেন ব্যবহার করল?

চিন্তা করলে দেখতে পাবেন, এ দু'টি শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোরআন পাক যুল-কারনাইনের আদ্যপ্রান্ত কাহিনী বর্ণনা করার ওয়াদা করেনি; বরং তার আলোচনার একাংশ উল্লেখ করার কথা বলেছে। উপরে যুলকারনাইনের নাম ও বংশ পরম্পরা সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কোরআন পাক একে অনাবশ্যক মনে করে বাদ দেওয়ার কথা প্রথমেই ঘোষণা করে দিয়েছে।

وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا—আরবী অভিধানে سبب শব্দের অর্থ এমন বস্তু যদ্দ্বারা লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতি, বৈষয়িক উপায়াদি, জ্ঞানবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।—(বাহ্‌রে মুহীত)

রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য একজন সম্রাট ও রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে যেসব বিষয় অত্যাবশ্যকীয়, مِنْ كُلِّ شَيْءٍ বলে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যুলকারনাইনকে ন্যায়বিচার, শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও দেশ বিজয়ের জন্য সে যুগে যেসব বিষয় প্রয়োজনীয় ছিল, সবই দান করেছিলেন।

فَأَتْبَعَ سَبَبًا—অর্থাৎ সব রকম ও দুনিয়ার সর্বত্র পৌছার উপকরণাদি তাকে দান করা হয়েছিল, কিন্তু সে সর্বপ্রথম পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে পৌছার উপকরণাদি কাজে লাগায়।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ—অর্থাৎ তিনি পশ্চিম প্রান্তে সে সীমা পর্যন্ত পৌছে গেলেন, যার পরে কোন জনবসতি ছিল না।

فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ—حَمِئَةٍ-এর শাব্দিক অর্থ কালো জলাভূমি অথবা কাদা। এখানে সে জলাশয়কে বোঝানো হয়েছে, যার নিচে কালো রঙের কাদা থাকে। ফলে পানির রঙও কালো দেখায়। সূর্যকে এরূপ জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখার অর্থ এই যে, দর্শক মাত্রই অনুভব করে যে, সূর্য এই জলাশয়ে অস্ত যাচ্ছে। কেননা এরপর কোন বসতি অথবা স্থলভাগ ছিল না। আপনি যদি সূর্যাস্তের সময় এমন কোন ময়দানে উপস্থিত থাকেন যার পশ্চিম দিকে দূরদূরান্ত পর্যন্ত কোন পাহাড়, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদি না থাকে, তবে আপনার মনে হবে যেন সূর্যটি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে।

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا—অর্থাৎ ঐ কালো জলাশয়ের কাছে যুলকারনাইন এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আয়াতের পরবর্তী অংশ থেকে জানা যায় যে, সম্প্রদায়টি ছিল কাফির। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যুলকারনাইনকে ক্ষমতা দান করলেন যে,

তুমি ইচ্ছা করলে প্রথমেই সবাইকে তাদের কুফরের শাস্তি প্রদান কর এবং ইচ্ছা করলে তাদের সাথে সদয় ব্যবহার কর, অর্থাৎ প্রথমে দাওয়াত, তবলীগ ও উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম ও ঈমান কবুল করতে সম্মত কর। এরপর যারা মানে, তাদেরকে প্রতিদান এবং যারা না মানে তাদেরকে শাস্তি দাও। প্রত্যুত্তরে যুলকারনাইন দ্বিতীয় পথই অবলম্বন করে বললেন : আমি প্রথমে তাদেরকে উপদেশের মাধ্যমে সরল-পথে আনার চেষ্টা করব। এরপরও যারা কুফরে দৃঢ়পদ থাকবে, তাদেরকে শাস্তি দেব। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম করবে, তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব।

قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ—এ থেকে জানা যায় যে, যুলকারনাইনকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই সম্বোধন করে এ কথা বলেছেন। যুলকারনাইনকে নবী সাব্যস্ত করা হলে এতে কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না যে, ওহীর মাধ্যমেই তাঁকে বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে নবী না মানলে কোন পয়গম্বরের মধ্যস্থতায়ই তাঁকে এই সম্বোধন করা হয়ে থাকবে। যেমন, রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত খিযির (আ) তাঁর সাথে ছিলেন। এছাড়া এটা নবুয়তের ওহী না হয়ে আভিধানিক ওহী হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে; যেমন হযরত মূসা (আ)-র জননীর জন্য কোরআনে وَأَوْحَيْنَا বলা হয়েছে। অথচ তিনি যে নবী ও রসূল ছিলেন না, সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আবূ হাইয়্যান বাহ্রে মুহীতে বলেন : এখানে যুলকারনাইনকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে হত্যা ও শাস্তির আদেশ। এ ধরনের আদেশ নবুয়তের ওহী ব্যতীত দেওয়া যায় না —কাশ্ফ, ইলহাম অথবা অন্য কোন উপায়ে তা হতে পারে না। তাই, হয় যুলকারনাইনকে নবী মানতে হবে, না হয় তাঁর আমলে একজন নবীর উপস্থিতি স্বীকার করতে হবে, যাঁর মাধ্যমে তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনাই বিশুদ্ধ নয়।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾ كَذٰلِكَ ۚ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾

---

(৮৯) অতঃপর তিনি এক উপায় অবলম্বন করলেন। (৯০) অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌঁছলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্য সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি। (৯১) প্রকৃত ঘটনা এমনিই। তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর (পশ্চিমের দেশসমূহ জয় করার পর প্রাচ্যদেশসমূহ জয় করার ইচ্ছায় প্রাচ্যের দিকে) তিনি এক পথ ধরলেন। অবশেষে যখন সূর্যের উদয়াচলে (অর্থাৎ পূর্বদিকে জনবসতির শেষ প্রান্তে) পৌঁছলেন, তখন সূর্যকে এমন জাতির উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্য আমি সূর্যের তাপ থেকে আত্মরক্ষার কোন আড়াল রাখিনি। (অর্থাৎ সেখানে এমন এক জাতি বাস করত, যারা রৌদ্র-কিরণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কোন গৃহ অথবা তাঁবু নির্মাণে অভ্যস্ত ছিল না, বরং তারা সম্ভবত পোশাক-পরিচ্ছদও পরিধান করত না। জন্তু-জানোয়ারের মত উন্মুক্ত মাঠে বসবাস করত।) এ ব্যাপারটি এমনিই। যুলকারনাইনের কাছে যা কিছু (আসবাবপত্র) ছিল, আমি তার বৃত্তান্ত সম্যক অবগত আছি। [এতে নবুয়ত পরীক্ষার্থে যুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্নকারীদেরকে এ বিষয়ে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আমি যা কিছু বলছি তা সঠিক জ্ঞান ও অবগতির ভিত্তিতেই বলছি, সাধারণ ঐতিহাসিক গল্প নয়। এতে মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়তের সত্যতা ফুটে উঠে।]

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যুলকারনাইন পূর্বপ্রান্তে যে জাতিকে বসবাস করতে দেখেছেন, কোরআন পাক তাদের সম্পর্কে বলেছে যে, তারা গৃহ, তাঁবু, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির দ্বারা রোদ থেকে আত্মরক্ষা করত না, কিন্তু তাদের ধর্ম ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে কিছুই বলেনি এবং যুলকারনাইন তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন, তাও ব্যক্ত করেনি। বলাবাহুল্য, তারাও কাফিরই ছিল এবং যুলকারনাইন তাদের সাথেও এমন ব্যবহারই করেছেন, যা পশ্চিমা জাতির সাথে করেছেন বলে উপরে বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে তা বর্ণনা করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। কারণ, পূর্ববর্তী ঘটনার আলোকেই তা বোঝা যায়। (বাহ্রে মুহীত)

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ
لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ
مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰۤى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ
اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى
بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِىْۤ

أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ
نَقْبًا ﴿٩٧﴾ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ
وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿٩٨﴾

(৯২) আবার তিনি এক পথ ধরলেন। (৯৩) অবশেষে যখন তিনি দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছলেন, তখন তিনি সেখানে এক জাতিকে পেলেন, যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। (৯৪) তারা বলল: হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্য কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। (৯৫) তিনি বললেন: আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। (৯৬) তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন: তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন তিনি বললেন: তোমরা গলিত তামা নিয়ে এস, আমি তা এর উপরে ঢেলে দিই। (৯৭) অতঃপর ইয়াজুজ ও মাজুজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হল না। (৯৮) যুলকারনাইন বললেন: এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর (পশ্চিম ও পূর্বদেশ জয় করে) তিনি আরেক দিকে পথ ধরলেন। (কোরআন এ দিকের নাম উল্লেখ করেনি, কিন্তু জনবসতি অধিকতর উত্তরদিকে। তাই তফসীরবিদগণ একে উত্তর দেশসমূহের সফর স্থির করেছেন। ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণও এরই সমর্থন করে।) অবশেষে তিনি যখন দুই পর্বতের মধ্যস্থলে পৌঁছলেন, তখন সেখানে এক জাতিকে দেখতে পেলেন, যারা (ভাষা ও অভিধান সম্পর্কে অজ্ঞ মানবেতর জীবন-যাপনের কারণে) তাঁর কথা একেবারেই বুঝত না। (এ থেকে জানা যায় যে, তারা শুধু ভাষা সম্পর্কেই অজ্ঞ ছিল না, কেননা বুদ্ধি-জ্ঞান থাকলে ভিন্নভাষীদের কথাবার্তাও ইশারা-ইঙ্গিতে বুঝে নেয়া যায়। বরং পাশব ও মানবেতর জীবন-যাপন পদ্ধতি তাদেরকে বুদ্ধিজ্ঞান থেকেও বঞ্চিত করে রেখেছিল। কিন্তু এরপর বোধ হয় কোন দোভাষীর সাহায্যে) তারা বলল: হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ (যারা পর্বতশ্রেণীর অপরপার্শ্বে বাস করে, আমাদের এই) দেশে (মাঝে মাঝে এসে প্রচুর) অশান্তি সৃষ্টি করছে। (অর্থাৎ হত্যা ও লুণ্ঠন করছে। তাদের মুকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই। অতএব আমরা কি

আপনার জন্য চাঁদা করে কিছু অর্থ সঞ্চয় করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন (যাতে তারা এদিকে আসতে না পারে) যুলকারনাইন বললেন ঃ আমার পালনকর্তা আমাকে যে আর্থিক সামর্থ্য দান করেছেন, তাই যথেষ্ট (কাজেই চাঁদা করে অর্থ যোগান দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই ;) তবে তোমরা আমাকে হাত-পায়ের শক্তি (অর্থাৎ শ্রম ও মজুরি) দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও, (মূল্য আমি দেব। বলা বাহুল্য, এ লৌহ প্রাচীর নির্মাণ করার জন্য হয়তো অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু এই মানবেতর জনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু এই মানবেতর জনের দেশে লৌহ-পাতই ছিল সবচাইতে দুর্লভ বস্তু। তাই শুধু এর কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। সাজ-সরঞ্জাম সংগৃহীত হওয়ার পর উভয় পাহাড়ের মধ্যস্থলে লৌহ প্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেল।) অবশেষে যখন (প্রাচীরের স্তর সংযুক্ত করতে করতে দুই পাহাড়ের) দুই চূড়ার মধ্যবর্তী (ফাঁকা) স্থান (পাহাড়ের) সমান করে দেওয়া হল, তখন তিনি আদেশ করলেন ঃ তোমরা একে দগ্ধ করতে থাক। (দগ্ধ করা শুরু হল) অবশেষে যখন (দগ্ধ করতে করতে) তাকে আগুনের মত লাল অঙ্গার করে দিল, তখন তিনি আদেশ করলেন ঃ এখন আমার কাছে গলিত তামা (যা হয়তো পূর্বেই প্রস্তুত রাখা হয়েছিল) নিয়ে এসো, যাতে আমি তা এর উপরে ঢেলে দেই। (সেমতে গলিত তামা এনে যন্ত্রের সাহায্যে উপর থেকে ঢেলে দেওয়া হল, যাতে প্রাচীরের সব ফাঁকে প্রবেশ করে গোটা প্রাচীর একাকার হয়ে যায়। এই প্রাচীরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।) অতঃপর (উচ্চতা ও মসৃণতার কারণে) ইয়াজুজ-মাজুজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং (চূড়ান্ত শক্ত হওয়ার কারণে) তাতে কোন ছিদ্র করতে সক্ষম হল না। যুলকারনাইন (যখন প্রাচীরটিকে প্রস্তুত দেখলেন এবং এর নির্মাণ সম্পন্ন হওয়া যেহেতু কোন সহজ কাজ ছিল না, তখন কৃতজ্ঞতা স্বরূপ) বললেন ঃ এটা আমার পালনকর্তার একটি অনুগ্রহ (আমার প্রতিও, কারণ আমার হাতে এটা সম্পন্ন হয়েছে এবং এই জাতির প্রতিও, যাদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ বিব্রত করত) অতঃপর যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে, (অর্থাৎ এর ধ্বংসের সময় আসবে) তখন একে বিধ্বস্ত করে মাটির সমান করে দেবেন। আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য।—(সময় আসলে তা অবশ্যই পূর্ণ হয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শব্দার্থ ঃ بَيْنَ السَّدَّيْنِ - যে বস্তু কোন কিছুর জন্য বাধা হয়ে যায়, তাকে سد বলা হয় ; তা প্রাচীর হোক কিংবা পাহাড় হোক, কৃত্রিম হোক কিংবা প্রাকৃতিক হোক। এখানে سدين বলে দুই পাহাড় বোঝানো হয়েছে। এগুলো ইয়াজুজ-মাজুজের

পথে বাধা ছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ দিয়ে এসে তারা আক্রমণ চালাত। যুলকারনাইন এই গিরিপথটি বন্ধ করে দেন।

زُبَرَ الْحَدِيْدِ—زُبَر - শব্দটি زُبْرَة - এর বহুবচন। এর অর্থ পাত। এখানে লৌহখণ্ড বোঝানো হয়েছে। গিরিপথ বন্ধ করার জন্য নির্মিতব্য প্রাচীর ইট-পাথরের পরিবর্তে লোহার পাত ব্যবহার করা হয়েছিল।

الصَّدَفَيْنِ—দুই পাহাড়ের বিপরীতমুখী দুই দিক :

قِطْرًا—অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এর অর্থ গলিত তামা। কারও কারও মতে গলিত লোহা অথবা রাঙতা।—(কুরতুবী)

دَكَّاءَ—অর্থাৎ যে বস্তু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সমতল হয়ে যায়।

ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং কোথায়? যুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত : ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত ও ঐতিহাসিক কিসসা-কাহিনীতে অনেক ভিত্তিহীন অলীক কথাবার্তা প্রচলিত রয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদও এগুলো ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু স্বয়ং তাঁদের কাছেও এগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। কোরআন পাক তাদের সংক্ষিপ্ত অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে উম্মতকে অবহিত করেছেন। ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় ততটুকুই, যতটুকু কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তফসীর, হাদীস ও ইতিহাসবিদগণ এর অতিরিক্ত যেসব ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন, সেগুলো বিশুদ্ধও হতে পারে এবং অশুদ্ধও হতে পারে। ইতিহাসবিদগণের বিভিন্নমুখী উক্তিগুলো নিছক ইঙ্গিত ও অনুমানের উপর ভিত্তিশীল। এগুলো শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ হলেও তার কোন প্রভাব কোরআনের বক্তব্যের উপর পড়ে না।

আমি এখানে সর্বপ্রথম এ সম্পর্কিত সহীহ্ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো উল্লেখ করছি। এরপর প্রয়োজন অনুসারে ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতও বর্ণনা করা হবে।

ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা : কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে এতটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজুজ-মাজুজ মানব সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যান্য মানবের মত তারাও নূহ (আ)-এর সন্তান-সন্ততি। কোরআন পাক স্পষ্টতই বলেছে :

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ—অর্থাৎ নূহের মহাপ্লাবনের পর দুনিয়াতে যত মানুষ আছে এবং থাকবে, তারা সবাই নূহ (আ)-এর সন্তান-সন্ততি হবে। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত এ ব্যাপারে একমত যে, তারা ইয়াফেসের বংশধর। একটি দুর্বল হাদীস

থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাদের অবশিষ্ট অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক বিস্তারিত ও সহীহ্ হাদীস হচ্ছে হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা)-এর হাদীসটি। এটি সহীহ্ মুসলিম ও অন্য সব নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। হাদীসবিদগণ একে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। এতে দাজ্জালের আবির্ভাব, ঈসা (আ)-র অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজের অভ্যুত্থান ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ উল্লিখিত আছে। হাদীসটির অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ

হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন ভোর বেলা দাজ্জালের আলোচনা করলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তার সম্পর্কে এমন কিছু কথা বললেন, যদ্দ্বারা মনে হচ্ছিল যে, সে নেহাতই তুচ্ছ ও নগণ্য। (উদাহরণত সে কানা হবে।) পক্ষান্তরে কিছু কথা এমন বললেন, যদ্দ্বারা মনে হচ্ছিল যে, তার ফিতনা অত্যন্ত ভয়াবহ ও কঠোর হবে। (উদাহরণত জান্নাত ও দোযখ তার সাথে থাকবে এবং অন্যান্য আরও অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটবে।) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বর্ণনার ফলে (আমরা এমন ভীত হয়ে পড়লাম) যেন দাজ্জাল খর্জুর বৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যেই রয়েছে। (অর্থাৎ অদূরেই বিরাজমান রয়েছে।) বিকালে যখন আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দরবারে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি আমাদের মনের অবস্থা আঁচ করে নিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি বুঝেছ? আমরা আরয করলাম ঃ আপনি দাজ্জালের আলোচনা প্রসঙ্গে এমন কিছু কথা বলেছেন, যাতে বোঝা যায় যে, তার ব্যাপারটি নেহাতই তুচ্ছ এবং আরও কিছু কথা বলেছেন, যাতে মনে হয়, সে খুব শক্তিসম্পন্ন হবে এবং তার ফিতনা হবে খুব গুরুতর। এখন আমাদের মনে হয়েছে, যেন সে আমাদের নিকটেই খর্জুর বৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমাদের সম্পর্কে আমি যেসব ফিতনার আশংকা করি, তন্মধ্যে দাজ্জালের তুলনায় অন্যান্য ফেতনা অধিক ভয়ের যোগ্য। (অর্থাৎ দাজ্জালের ফিতনা এতটুকু গুরুতর নয়, যতটুকু তোমরা মনে করছ।) যদি আমার জীবদ্দশায় সে আবির্ভূত হয়, তবে আমি নিজে তার মুকাবিলা করব। (কাজেই তোমাদের চিন্তান্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই।) পক্ষান্তরে সে যদি আমার পরে আসে, তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে পরাভূত করার চেষ্টা করবে। আমার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানের সাহায্যকারী। (তার লক্ষণ এই যে) সে যুবক, ঘন কোঁকড়ানো চুলওয়ালা হবে। তার একটি চক্ষু উপরের দিকে উত্থিত হবে (এবং অপর চক্ষুটি হবে কানা।) যদি আমি (কুৎসিত চেহারার) কোন ব্যক্তিকে তার সাথে তুলনা করি, তবে সে হচ্ছে আবদুল ওযযা ইবনে-কুত্না। (জাহেলিয়াত আমলে কুৎসিত চেহারায় 'বনু-খোযাআ' গোত্রের এ লোকটির তুলনা ছিল না।) যদি কোন মুসলমান দাজ্জালের সম্মুখীন হয়ে যায়, তবে সূরা কাহ্ফের প্রথম আয়াতগুলো পড়ে নেওয়া উচিত। (এতে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।) দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে বের হয়ে চতুর্দিকে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহ্র বান্দারা, তোমরা তার মুকাবিলায় সুদৃঢ় থাক।

আমরা আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, সে কতদিন থাকবে? তিনি বললেন ঃ সে চল্লিশ দিন থাকবে, কিন্তু প্রথম দিন এক বছরের সমান হবে। দ্বিতীয় দিন এক মাসের

এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো সাধারণ দিনের মতই হবে। আমরা আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্, যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, আমরা কি তাতে শুধু এক দিনের (পাঁচ ওয়াক্ত) নামাযই পড়ব? তিনি বললেনঃ না; বরং সময়ের অনুমান করে পূর্ণ এক বছরের নামায পড়তে হবে। আমরা আবার আরয করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, সে কেমন দ্রুতগতিতে সফর করবে? তিনি বললেনঃ সে মেঘখণ্ডের মত দ্রুত চলবে, যার পেছনে অনুকূল বাতাস থাকে। দাজ্জাল কোন সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে তাকে মিথ্যা ধর্মবিশ্বাসের প্রতি দাওয়াত দেবে। তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে সে মেঘমালাকে বর্ষণের আদেশ দেবে। ফলে বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং মাটিকে আদেশ দেবে, ফলে সে শস্যশ্যামলা হয়ে যাবে। (তাদের চতুষ্পদ জন্তু তাতে চরবে।) সন্ধ্যায় যখন জন্তুগুলো ফিরে আসবে, তখন তাদের কুঁজ পূর্বের তুলনায় উঁচু হবে এবং স্তন দুধে পরিপূর্ণ থাকবে। এরপর দাজ্জাল অন্য সম্প্রদায়ের কাছে যাবে এবং তাদেরকেও কুফরের দাওয়াত দেবে। কিন্তু তারা তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে। সে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলে সেখানকার মুসলমানরা দুর্ভিক্ষে পতিত হবে। তাদের কাছে কোন অর্থকড়ি থাকবে না। সে শস্যবিহীন অনুর্বর ভূমিকে সম্বোধন করে বলবেঃ তোর গুপ্তধন বাইরে নিয়ে আয়। সেমতে ভূমির গুপ্তধন তার পেছনে পেছনে চলবে, যেমন মৌমাছিরা তাদের সরদারের পেছনে পেছনে চলে। অতঃপর দাজ্জাল একজন ভরপুর যুবক ব্যক্তিকে ডাকবে এবং তাকে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে দেবে। তার উভয় খণ্ড এতটুকু দূরত্বে রাখা হবে, যেমন তীর নিক্ষেপকারী ও তার লক্ষ্যবস্তুর মাঝখানে থাকে। অতঃপর সে তাকে ডাক দেবে। সে (জীবিত হয়ে) দাজ্জালের কাছে প্রফুল্ল চিত্তে চলে আসবে। ইতিমধ্যে আল্লাহ্ তা'আলাই হযরত ঈসা (আ)-কে নামিয়ে দিবেন। তিনি দু'টি রঙিন চাদর পরে দামেস্ক মসজিদের পূর্ব দিককার সাদা মিনারে ফেরেশতাদের পাখার উপর পা রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মস্তক অবনত করবেন, তখন তা থেকে পানির ফোঁটা পড়বে। (মনে হবে যেন এখনই গোসল করে এসেছেন।) তিনি যখন মস্তক উঁচু করবেন, তখনও মোমবাতির মত স্বচ্ছ পানির ফোঁটা পড়বে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস যে কাফিরের গায়ে লাগবে, সে সেখানেই মরে যাবে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস তাঁর দৃষ্টির সমান দূরত্বে পৌঁছাবে। হযরত ঈসা (আ) দাজ্জালকে খুঁজতে খুঁজতে বাবুলুদ্দে গিয়ে তাকে ধরে ফেলবেন। (এই জনপদটি এখনও বায়তুল মোকাদ্দাসের অদূরে এ নামেই বিদ্যমান।) সেখানে তাকে হত্যা করবেন। এরপর তিনি জনসমক্ষে আসবেন, স্নেহভরে মানুষের চেহারায় হাত বুলাবেন এবং তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদার সুসংবাদ শোনাবেন।

এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করবেনঃ আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এমন লোক বের করব যাদের মুকাবিলা করার শক্তি কারও নেই। কাজেই আপনি মুসলমানদেরকে সমবেত করে তূর পর্বতে চলে যান। (সেমতে তিনিই তাই করবেন।) অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াজুজ-মাজুজের রাস্তা খুলে দেবেন। তাদের দ্রুত চলার কারণে মনে হবে যেন উপর থেকে পিছলে নিচে এসে পড়ছে। তাদের

প্রথম দলটি তবরিয়া উপসাগরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তার পানি পান করে এমন অবস্থা করে দেবে যে, দ্বিতীয় দলটি এসে সেখানে কোন দিন পানি ছিল, একথা বিশ্বাস করতে পারবে না।

ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীরা তূর পর্বতে আশ্রয় নেবেন। অন্য মুসলমানরা নিজ নিজ দুর্গে ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে। পানাহারের বস্তুসামগ্রী সাথে থাকবে, কিন্তু তাতে ঘাটতি দেখা দেবে। ফলে একটি গরুর মস্তককে একশ দীনারের চাইতে উত্তম মনে করা হবে। হযরত ঈসা (আ) ও অন্য মুসলমানরা কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবেন। (আল্লাহ্ দোয়া কবুল করবেন।) তিনি মহামারী আকারে রোগ-ব্যাধি পাঠাবেন। ফলে অল্পসময়ের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের গোষ্ঠী সবাই মরে যাবে। অতঃপর ঈসা (আ) সঙ্গীদেরকে নিয়ে তূর পর্বত থেকে নিচে নেমে এসে দেখবেন পৃথিবীতে তাদের মৃতদেহ থেকে অর্ধ হাত পরিমিত স্থানও খালি নেই এবং (মৃতদেহ পচে) অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। (এ অবস্থা দেখে পুনরায়) হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীরা আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করবেন (যেন এই বিপদও দূর করে দেয়া হয়।) আল্লাহ্ তা'আলা এ দোয়াও কবুল করবেন এবং বিরাটাকার পাখী প্রেরণ করবেন, যাদের ঘাড় হবে উটের ঘাড়ের মত। (মৃতদেহগুলো উঠিয়ে যেখানে আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন, সেখানে ফেলে দেবে।) কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে মৃতদেহগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। এরপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। কোন নগর ও বন্দর এ বৃষ্টি থেকে বাদ থাকবে না। ফলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ ধৌত হয়ে কাঁচের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে আদেশ করবেনঃ তোমার পেটের সমুদয় ফল-ফুল উদ্‌গিরণ করে দাও এবং নতুনভাবে তোমার বরকতসমূহ প্রকাশ কর। (ফলে তাই হবে এবং এমন বরকত প্রকাশিত হবে যে,) একটি ডালিম একদল লোকের আহারের জন্য যথেষ্ট হবে এবং মানুষ তার ছাল দ্বারা ছাতা তৈরি করে ছায়া লাভ করবে। দুধে এত বরকত হবে যে, একটি উষ্ট্রীর দুধ একদল লোকের জন্য, একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের জন্য এবং একটি ছাগলের দুধ একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে। (চল্লিশ বছর যাবত এই অসাধারণ বরকত ও শান্তিশৃংখলা অব্যাহত থাকার পর যখন কিয়ামতের সময় সমাগত হবে, তখন) আল্লাহ্ তা'আলা একটি মনোরম বায়ু প্রবাহিত করবেন। এর পরশে সব মুসলমানের বগলের নিচে বিশেষ এক প্রকার রোগ দেখা দেবে এবং সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হবে; শুধু কাফির ও দুষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থেকে যাবে। তারা ভূপৃষ্ঠে জন্তু-জানোয়ারের মত খোলাখুলি অপকর্ম করবে। তাদের উপরই কিয়ামত আসবে।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদের রেওয়ায়েতে ইয়াজুজ-মাজুজের কাহিনীর আরও অধিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে রয়েছেঃ তবরিয়া উপসাগর অতিক্রম করার পর ইয়াজুজ-মাজুজ বায়তুল মোকাদ্দাস সংলগ্ন পাহাড় জাবালুল-খমরে আরোহণ করে ঘোষণা করবেঃ আমরা পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করেছি। এখন আকাশের অধিবাসীদেরকে খতম করার পালা। সেমতে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে।

আল্লাহর আদেশে সে তীর রক্তরঞ্জিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে (যাতে বোকারা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে, আকাশের অধিবাসীরাও শেষ হয়ে গেছে।)

দাজ্জালের কাহিনী প্রসঙ্গে হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর রেওয়ায়েতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, দাজ্জাল মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দূরে থাকবে। মদীনার পথসমূহে আসাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সে মদীনার নিকটবর্তী একটি লবণাক্ত ভূমিতে আগমন করবে। তখন সমসাময়িক এক মহান ব্যক্তি তার কাছে এসে বলবেন : আমি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে বলছি যে, তুই সে দাজ্জাল যার সংবাদ রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে দিয়েছিলেন। (একথা শুনে) দাজ্জাল বলবে : লোক সকল! যদি আমি এ ব্যক্তিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দেই, তবে আমি যে খোদা এ ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ করবে কি? সবাই উত্তর দেবে : না। অতঃপর সে লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দিবে। লোকটি জীবিত হয়ে দাজ্জালকে বলবেন : এবার আমার বিশ্বাস আরও বেড়ে গেছে যে, তুই-ই সে দাজ্জাল। দাজ্জাল তাকে পুনরায় হত্যা করতে চাইবে কিন্তু সমর্থ হবে না।—(মুসলিম)

সহীহ্ বোখারী ও মুসলিমে আবূ সাঈদ খুদরীর বাচনিক বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে বলবেন, আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে তুলে আনুন। তিনি আরয করবেন, হে পরওয়ারদিগার তারা কারা? আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী এবং মাত্র একজন জান্নাতী। একথা শুনে সাহাবায়ে কিরাম শিউরে উঠলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমাদের মধ্যে সে একজন জান্নাতী কে হবে? তিনি উত্তরে বললেন : চিন্তা করো না। এই নয় শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী তোমাদের মধ্য থেকে এক এবং ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এক হাজারের হিসেবে হবে। মুস্তাদরাক হাকিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানবজাতিকে দশ ভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে নয় ভাগে রয়েছে ইয়াজুজ-মাজুজের লোক আর অবশিষ্ট এক ভাগে সারা বিশ্বের মানুষ।—(রাহুল মা'আনী)

ইবনে-কাসীর 'আল বেদায়া ওয়ান্নেহায়াহ্' গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করে বলেন : এতে বোঝা যায় যে, ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যা সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার চাইতে অনেক বেশি হবে।

মসনদ আহ্মদ ও আবু দাউদে হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : ঈসা (আ) অবতরণের পর চল্লিশ বছর দুনিয়াতে অবস্থান করবেন। মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে সাতবছরের কথা বলা হয়েছে। 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে হাফেয ইবনে হাজার একে অশুদ্ধ সাব্যস্ত করে চল্লিশ বছর মেয়াদকেই শুদ্ধ বলেছেন। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এই দীর্ঘ সময় সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত হবে এবং অসংখ্য বরকত প্রকাশ পাবে। পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতার লেশমাত্র থাকবে না। দু'ব্যক্তির মধ্যে কোন সময় ঝগড়া-বিবাদ হবে না।—(মুসলিম ও আহমদ)

বোখারী হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাবের পরও বায়তুল্লাহ্র হজ্জ ও ওমরা অব্যাহত থাকবে।—(মাযহারী)

বোখারী ও মুসলিম হযরত যয়নব বিনতে জাহশের রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন ঘুম থেকে এমন অবস্থায় জেগে উঠলেন যে, তাঁর মুখমণ্ডল ছিল রক্তিমাভ এবং মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হচ্ছিল :

لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق تسعين

"আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আরবদের ধ্বংস নিকটবর্তী। আজ ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী মিলিয়ে বৃত্ত তৈরি করে দেখান।

হযরত যয়নব (রা) বলেন : একথা শুনে আরয করলাম : ইয়া রসূলুল্লাহ্, আমাদের মধ্যে সৎকর্মপরায়ন লোক জীবিত থাকতেও কি ধ্বংস হয়ে যাবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, ধ্বংস হতে পারে, যদি অনাচারের আধিক্য হয়।—(আল বেদায়া ওয়ান্নেহায়াহ্) ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে বৃত্ত পরিমাণ ছিদ্র হয়ে যাওয়া আসল অর্থেও হতে পারে এবং রূপক হিসেবে প্রাচীরটি দুর্বল হয়ে যাওয়ার অর্থেও হতে পারে। —(ইবনে কাসীর, আবূ হাইয়্যান)

মসনদ আহ্মদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা হযরত আবূ হোরায়রার রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : ইয়াজুজ-মাজুজ প্রত্যহ যুলকারনাইনের দেয়ালটি খুঁড়তে থাকে। খুঁড়তে খুঁড়তে তারা এ লৌহ প্রাচীরের প্রান্ত সীমার এত কাছাকাছি পৌঁছে যায় যে, অপরপার্শ্বের আলো দেখা যেতে থাকে। কিন্তু তারা এ কথা বলে ফিরে যায় যে, বাকী অংশটুকু আগামীকাল খুঁড়ব। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা প্রাচীরটিকে পূর্ববৎ মজবুত অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। পরের দিন ইয়াজুজ-মাজুজ প্রাচীর খননে নতুনভাবে আত্মনিয়োগ করে। খননকার্যে আত্মনিয়োগ ও আল্লাহ্ পাক থেকে তা মেরামতের এ ধারা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন ইয়াজুজ-মাজুজকে বন্ধ রাখা আল্লাহ্র ইচ্ছা রয়েছে। যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা ওদেরকে মুক্ত করার ইচ্ছা করবেন, সেদিন ওরা মেহনত শেষে বলবে : আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমরা আগামীকাল অবশিষ্ট অংশটুকু খুঁড়ে উপারে চলে যাব। (আল্লাহ্র নাম ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করার কারণে সেদিন ওদের তওফীক হয়ে যাবে।) অতএব পরের দিন তারা প্রাচীরের অবশিষ্ট অংশকে তেমনি অবস্থায় পাবে এবং তারা সেটুকু খুঁড়েই প্রাচীর ভেদ করে ফেলবে। তিরমিযী এই রেওয়ায়েতটি ابو عوانة عن قتادة عن ابى رافع عن ابى هريرة সূত্রে বর্ণনা করে বলেন :

غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه —ইবনে কাসীর তাঁর তফসীরে রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করে বলেন إسناده جيد قوي ولكن متنه في رفعه نكارة — এর সনদ উত্তম ও শক্তিশালী, কিন্তু মূল বক্তব্যটি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কিনা, তা সুবিদিত নয়।

ইবনে-কাসীর 'আল-বেদায়া-ওয়ান্নেহায়াহ্' গ্রন্থে এ হাদীস সম্পর্কে বলেন : যদি মেনে নেয়া হয় যে, হাদীসের মূল বক্তব্যটি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নয়, বরং কা'ব আহবারের বর্ণনা তবে এটা যে ধর্তব্য ও নির্ভরযোগ্য নয়, তা স্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি একে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্তব্য সাব্যস্ত করা হয়, তবে হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর খনন করার কাজটি তখন শুরু হবে, যখন তাদের আবির্ভাবের সময় নিকটবর্তী হবে। কোরআনে বলা হয়েছে যে, এই প্রাচীর ছিদ্র করা যাবে না এটা তখনকার অবস্থা, যখন যুলকারনাইন প্রাচীরটি নির্মাণ করেছিলেন। কাজেই এতে কোন বৈপরীত্য নেই। তাছাড়া আরোও বলা যায় যে, কোরআনে ছিদ্র বলে এপার-ওপার ছিদ্র বোঝানো হয়েছে। হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, তাদের এ ছিদ্র এপার-ওপার হবে। (বেদায়া, ২য় খণ্ড, ১১২ পৃঃ)

হাফেয ইবনে হাজার 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে এই হাদীসটি আবদ ইবনে-হুমায়দ ও ইবনে-হাব্বানের বরাত দিয়েও উদ্ধৃত করে বলেছেন : তারা সবাই হযরত কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং কোন কোন হাদীসে সনদের ব্যক্তিবর্গ সহীহ্ বোখারীর ব্যক্তিবর্গ। তিনি হাদীসটি যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেননি। তিনি ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, এ হাদীসে তিনটি মু'জিযা রয়েছে। এক. আল্লাহ্ তা'আলা তাদের চিন্তাধারা এদিকে নিবিষ্ট হতে দেননি যে, প্রাচীর খননের কাজ অবিরাম দিবারাত্র অব্যাহত রাখবে। নতুবা দিন ও রাত্রির কর্মসূচী আলাদা আলাদা নির্ধারণ করে কাজ সমাপ্ত করা এত বড় জাতির পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। দুই. আল্লাহ্ তা'আলা প্রাচীরের উপরে উঠার পরিকল্পনা থেকেও তাদের চিন্তাধারাকে সরিয়ে রেখেছেন। অথচ ওয়াহ্‌ব ইবনে-মুনাব্বেহ্‌র রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তারা কৃষিশিল্পে পারদর্শী ছিল। সব রকম যন্ত্রপাতি তাদের কাছে ছিল। তাদের ভূখণ্ডে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষও ছিল। কাজেই প্রাচীরের উপরে আরোহণ করার উপায় সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। তিন. প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের মনে 'ইনশাআল্লাহ্' বলার কথা জাগ্রত হল না। তাদের বের হওয়ার নির্ধারিত সময় আসলেই কেবল তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত হবে।

ইবনে-আরাবী বলেন : এ হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাস রাখে। এটাও সম্ভব যে, বিশ্বাস ছাড়াই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত করিয়ে দিবেন এবং এর বরকতে তারা তাদের উদ্দেশ্যে সিদ্ধিলাভ করবে। —(আসারাতুস সায়া, সৈয়দ মুহাম্মদ, ১৫৪ পৃঃ) কিন্তু বাহ্যত বোঝা যায় যে, তাদের কাছেও পয়গম্বরদের দাওয়াত পৌঁছেছে। নতুবা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের জাহান্নামের শাস্তি

না হওয়াই উচিত। কোরআন বলে : وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

—এতে বোঝা যায় যে, তারাও ঈমানের দাওয়াত লাভ করেছে। কিন্তু তারা কুফরকে আঁকড়ে রেখেছে। তাদের কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাসী হবে। তবে রিসালত ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুধু এতটুকু বিশ্বাসই ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়। মোটকথা ইনশাআল্লাহ্ কলেমা বলার পরও কুফরের অস্তিত্ব থাকতে পারে।

হাদীসসমূহের বর্ণনা থেকে অর্জিত ফলাফল : উল্লিখিত হাদীসসমূহে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে নিম্নলিখিত বিষয়াদি প্রমাণিত হয়েছে।

১. ইয়াজুজ-মাজুজ সাধারণ মানুষের মতই মানুষ এবং নূহ (আ)-র সন্তান-সন্ততি। অধিকাংশ হাদীসবিদ ও ইতিহাসবিদগণ তাদেরকে ইয়াফেস ইবনে নূহের বংশধর সাব্যস্ত করেছেন। একথাও বলা বাহুল্য যে, ইয়াফেসের বংশধর নূহ (আ)-র আমল থেকে যুলকারনাইনের আমল পর্যন্ত দূরদূরান্তের বিভিন্ন গোত্রে ও বিভিন্ন জনপদে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেসব সম্প্রদায়ের নাম ইয়াজুজ-মাজুজ, জরুরী নয় যে, তারা সবাই যুলকারনাইনের প্রাচীরের ওপারে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের কিছু গোত্র ও সম্প্রদায় প্রাচীরের এপারেও থাকতে পারে। কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজ শুধু তাদেরই নাম, যারা বর্বর অসভ্য ও রক্তপিপাসু, জালিম। মোগল তুর্কী অথবা মঙ্গোলীয় জাতি যারা সভ্যতা লাভ করেছে, ওরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত হলেও তারা নামের বাইরে।

২. ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যা বিশ্বের সমগ্র জনসংখ্যার চাইতে অনেক গুণ বেশী, ন্যূনপক্ষে এক ও দশের ব্যবধান।—(২ নং হাদীস)

৩. ইয়াজুজ-মাজুজের যেসব সম্প্রদায় ও গোত্র যুলকারনাইনের প্রাচীরের কারণে ওপারে আবদ্ধ হয়ে গেছে, তারা কিয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত এভাবেই আবদ্ধ থাকবে। তাদের বের হওয়ার সময় মেহদী (আ)-র আবির্ভাব, অতঃপর দাজ্জালের আগমনের পরে হবে, যখন ঈসা (আ) অবতরণ করে দাজ্জালের নিধন কার্য সমাপ্ত করবেন।—(১নং হাদীস)

৪. ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্ত হওয়ার সময় যুলকারনাইনের প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে সমতলভূমির সমান হয়ে যাবে।—(কোরআন) তখন ইয়াজুজ-মাজুজের অগণিত লোক একযোগে পর্বতের উপর থেকে অবতরণের সময় দ্রুতগতির কারণে মনে হবে যেন তারা পিছলে পিছলে নিচে গড়িয়ে পড়ছে। এই অপরিসীম বর্বর মানবগোষ্ঠীর সাধারণ জন-বসতি ও সমগ্র পৃথিবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজের মুকাবিলা করার সাধ্য কারও থাকবে না। আল্লাহ্‌র রসূল হযরত ঈসা (আ) ও আল্লাহ্‌র আদেশে মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে তূর পর্বতে আশ্রয় নেবেন এবং যেখানে যেখানে কেল্লা ও সংরক্ষিত স্থান থাকবে, সেখানেই আত্মগোপন করে প্রাণ রক্ষা করবেন। খানাহারের রসদ-সামগ্রী নিঃশেষ হওয়ার পর জীবনধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের

মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে যাবে। এই বর্বর জাতি অবশিষ্ট জনবসতিকে খতম করে দেবে এবং নদ-নদীর পানি নিঃশেষে পান করে ফেলবে।—(৯ নং হাদীস)

৫. হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীদেরই দোয়ায় এই পঙ্গপালসদৃশ অগণিত লোক নিপাত হয়ে যাবে। তাদের মৃতদেহ সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং দুর্গন্ধের কারণে পৃথিবীতে বাস করা দুরূহ হয়ে পড়বে।—(৯নং হাদীস)

৬. অতঃপর ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীদেরই দোয়ায় তাদের মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত অথবা অদৃশ্য করে দেয়া হবে এবং বিশ্বব্যাপী বৃষ্টির মাধ্যমে সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে ধুয়ে পাক-সাফ করা হবে।—(৯নং হাদীস)

৭. এরপর প্রায় চল্লিশ বছর পৃথিবীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ভূপৃষ্ঠ তার বরকতসমূহ উদ্‌গিরণ করে দিবে। কেউ দরিদ্র থাকবে না এবং কেউ কাউকে বিব্রত করবে না। সর্বত্রই শান্তি ও সুখ বিরাজ করবে।—(৩নং হাদীস)

৮. শান্তি ও শৃঙ্খলার সময় কা'বা গৃহের হজ্জ ও ওমরাহ্ অব্যাহত থাকবে।—(৪ নং হাদীস)

হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ)-র ওফাত হবে এবং তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রওযা মোবারকে সমাহিত হবেন। অর্থাৎ তিনি হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্যেই হেজায সফর করার সময় ওফাত পাবেন।—(মুসলিম)

৯. রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জীবনের শেষভাগে স্বপ্ন-ওহীর মাধ্যমে তাঁকে দেখানো হয় যে, যুলকারনাইনের প্রাচীরে একটি ছিদ্র হয়ে গেছে। তিনি একে আরবদের ধ্বংস ও অবনতির লক্ষণ বলে সাব্যস্ত করেন। প্রাচীরে ছিদ্র হয়ে যাওয়াকে কেউ কেউ প্রকৃত অর্থেও নিয়েছেন এবং কেউ কেউ রূপক অর্থে বুঝেছেন যে, প্রাচীরটি এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে, ইয়াজুজ-মাজুজের বের হওয়ার সময় নিকটে এসে গেছে এবং এর আলামত আরব জাতির অধঃপতনরূপে প্রকাশিত হবে। والله اعلم

১০. হযরত ঈসা (আ) অবতরণের পর পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন—(৩ নং হাদীস) তাঁর পূর্বে হযরত মাহ্‌দী (আ)-এর অবস্থানকাল চল্লিশ বছর হবে। তন্মধ্যে কিছুকাল হবে উভয়ের সহযোগিতায়। সৈয়দ শরীফ বরযঞ্জী "আশরাতুসসায়াহ্ গ্রন্থের ১৪৫ পৃষ্ঠায় লেখেন: দাজ্জালের হত্যা ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঈসা (আ) চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন এবং তাঁর মোট অবস্থানকাল হবে পঁয়তাল্লিশ বছর। ১১২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে: হযরত মাহ্‌দী (আ) হযরত ঈসা (আ)-র ত্রিশের উপর কয়েক বছর আগে আবির্ভূত হবেন এবং তাঁর মোট অবস্থানকাল হবে চল্লিশ বছর। এভাবে পাঁচ অথবা সাত বছর পর্যন্ত উভয়ে একত্রে বসবাস করবেন। এই উভয় কালের বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, সমগ্র ভূপৃষ্ঠে ন্যায় ও সুবিচারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ভূপৃষ্ঠ তার সব বরকত ও গুপ্তধন উদ্‌গিরণ করে দেবে। কেউ ফকির-মিসকীন থাকবে না। পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও প্রতিহিংসার লেশমাত্র থাকবে না। অবশ্য মেহদী (আ)-র

শেষ আমলে দাজ্জাল এসে মক্কা-মদীনা বায়তুল-মোকাদ্দাস ও তূর পর্বত ব্যতীত সর্বত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ফিতনা ছড়িয়ে দেবে। এই ফিতনাটি হবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ফিতনা। দাজ্জালের অবস্থান ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা মাত্র চল্লিশ দিন স্থায়ী হবে। তন্মধ্যে প্রথম দিন এক বছরের দ্বিতীয় দিন এক মাসের এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। আর অবশিষ্ট দিনগুলো হবে সাধারণ দিনেরই মতো। এখানে প্রকৃতপক্ষে দিনগুলো এমন দীর্ঘ করে দেয়া যেতে পারে। কেননা শেষ যুগে প্রায় সব ঘটনাই অভ্যাসবিরুদ্ধ ঘটবে। এমনও সম্ভব যে, দিন তো প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিকই থাকবে কিন্তু হাদীস থেকে জানা যায় যে, দাজ্জাল হবে অসাধারণ যাদুকর। কাজেই তার যাদুর প্রভাবে দিবারাত্রির পরিবর্তন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ধরা না-ও পড়তে পারে! তারা একে একই দিন দেখবে ও মনে করবে। হাদীসে সে দিনে সাধারণ দিন অনুযায়ী অনুমানে করে নামায পড়ার আদেশ বর্ণিত রয়েছে। এ থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যে, প্রকৃতপক্ষে দিবারাত্র পরিবর্তিত হতে থাকবে, কিন্তু মানুষ তা অনুভব করবে না। তাই এই এক বছরের দিনে তিন শ' ষাট দিনের নামায আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নতুবা দিনটি প্রকৃতপক্ষে একদিন হলে শরীয়তের নীতি অনুযায়ী তাতে একদিনের নামাযই ফরয হত। মোটকথা দাজ্জালের মোট অবস্থানকাল এমনি ধরনের চল্লিশ দিন হবে।

এরপর হযরত ঈসা (আ) অবতরণ করে দাজ্জালকে হত্যা করার মাধ্যমে তার ফিতনারও অবসান ঘটাবেন। কিন্তু এর সাথে সাথেই ইয়াজুজ-মাজুজ বের হবে। তারা ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র হত্যা ও লুটতরাজ করবে। তাদের অবস্থানকালও কয়েকদিন মাত্র হবে। এরপর হযরত ঈসা (আ)-র দোয়ায় তারা সবাই একযোগে মারা যাবে। মোটকথা, হযরত মেহদীর আমলের শেষ ভাগে এবং ঈসা (আ)-র আমলের শুরুভাগে দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের দু'টি ফিতনা সংঘটিত হবে। এগুলো সারা বিশ্বের মানুষকে তছনছ করে দেবে। এই কয়েক দিনের পূর্বে এবং পরে সমগ্র বিশ্বে ন্যায় ও সুবিচার, শান্তি ও বরকত এবং ফল ও শস্যের অভূতপূর্ব আধিক্য হবে। হযরত ঈসা (আ)-র আমলে ইসলাম ব্যতীত কোন কালেমা ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না, কোন দীন-দুঃখী থাকবে না। হিংস্র এবং বিষাক্ত জীবজন্তুও একে অপরকে কষ্ট দিবে না।

ইয়াজুজ-মাজুজ ও যুলকারনাইনের প্রাচীর সম্পর্কিত এ সব তথ্য কোরআন ও হাদীস উম্মতকে অবহিত করেছে। এগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখা জরুরী এবং বিরোধিতা করা না-জায়েয। যুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত? ইয়াজুজ-মাজুজ কোন জাতি? তারা কোথায় বসবাস করে? এ সব ভৌগোলিক আলোচনার উপর ইসলামের কোন আকীদা-বিশ্বাস এবং কোরআনের কোন আয়াতের মর্ম ও ব্যাখ্যা নির্ভরশীল নয়। এতদসত্ত্বেও বিরোধী পক্ষের আবোল-তাবোল বকাবকির জওয়াব এবং অতিরিক্ত জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে আলিমরা এগুলো সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। এ আলোচনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ

কুরতুবী স্বয়ং তফসীর গ্রন্থে সুদ্দীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজের বাইশটি গোত্রের মধ্য থেকে একুশটি গোত্রকে যুলকারনাইনের প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ

করে দেয়া হয়েছে। একটি গোত্র প্রাচীরের এপারে রয়ে গেছে। আর সে গোত্রটি হল তুর্ক। এরপর কুরতুবী বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) তুর্কদের সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, সেগুলো ইয়াজুজ-মাজুজের সাথে খাপ খায়। শেষ যমানায় তাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধের কথা সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে। অতঃপর কুরতুবী বলেন ঃ বর্তমান সময় তুর্ক জাতির বিপুলসংখ্যক লোক মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্য অগ্রসরমান। তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তিনিই মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচাতে পারেন। মনে হয় যেন তারাই ইয়াজুজ-মাজুজের অথবা কমপক্ষে তাদের অগ্রসেনাদল।—(কুরতুবী, একাদশ খণ্ড, ৫৮ পৃঃ কুরতুবী সময়কাল ষষ্ঠ হিজরী। তখন তাতারীদের ফিতনা প্রকাশ পায় এবং তারা ইসলামী খিলাফতকে তছনছ করে দেয়। ইসলামী ইতিহাসে তাদের এই ফিতনা সুবিদিত। তাতারীরা যে মোগল তুর্কদের বংশধর, তাও প্রসিদ্ধ।) কিন্তু কুরতুবী তাদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজের সমতুল্য এবং অগ্রসেনাদল সাব্যস্ত করেছেন। তাদের ফিতনাকে ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব বলেননি, যা কিয়ামতের অন্যতম আলামত। কেননা, মুসলিমের হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ঈসা (আ)-র অবতরণের পর তাঁর আমলে ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হবে।

এ কারণেই আল্লামা আলুসী তফসীর রূহুল মা'আনীতে যারা তাতারীদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ সাব্যস্ত করে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ এরূপ ধারণা করা প্রকাশ্য রকমের পথভ্রষ্টতা এবং হাদীসের বর্ণনার সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ। তবে তিনিও বলেছেন যে, নিঃসন্দেহে তাতারীদের ফিতনা ইয়াজুজ-মাজুজের ফিতনার সমতুল্য।—(১৬শ খণ্ড, ৪৪ পৃঃ) বর্তমান যুগে কিছু সংখ্যক ইতিহাসবিদ বর্তমান রাশিয়া অথবা চীন অথবা উভয়কেই ইয়াজুজ-মাজুজ সাব্যস্ত করেন। তাদের উদ্দেশ্য যদি কুরতুবী ও আলুসীর মতই হয় যে, তাদের ফিতনা ইয়াজুজ-মাজুজের ফিতনার সমতুল্য, তবে তা ভ্রান্ত হবে না। কিন্তু তাঁরা যদি তাদেরকেই কিয়ামতের আলামতরূপে কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হিসেবে সাব্যস্ত করেন, যার সময় ঈসা (আ)-র অবতরণের পরে বলা হয়েছে, তবে তা নিশ্চিতই ভ্রান্তি, পথভ্রষ্টতা ও হাদীসের বর্ণনার বিরুদ্ধাচরণ হবে।

খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় সপ্ত ভূখণ্ডের মধ্য থেকে ষষ্ঠ ভূখণ্ডের আলোচনায় ইয়াজুজ-মাজুজ, যুলকারনাইনের প্রাচীর এবং তাদের অবস্থানস্থল সম্পর্কে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণজনিত নিম্নরূপ বক্তব্য রেখেছেন ঃ

> সপ্তম ভূখণ্ডের নবম অংশে পশ্চিমদিকে তুর্কীদের কাজাক ও চর্কস নামে অভিহিত গোত্রসমূহ বসবাস করে এবং পূর্বদিকে ইয়াজুজ-মাজুজের বসতি অবস্থিত তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে ককেশাস পর্বতমালা অবস্থিত। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই পর্বতমালা চতুর্থ ভূখণ্ডের পূর্বদিকে অবস্থিত ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু হয়ে এই ভূখণ্ডেরই শেষ উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর ভূমধ্যসাগর থেকে পৃথক হয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হয়ে পঞ্চম ভূখণ্ডের নবম অংশে প্রবেশ লাভ করেছে। এখান থেকে তা আবার প্রথম দিকে মোড় নিয়েছে এবং সপ্তম ভূখণ্ডের

নবম অংশে প্রবেশ করেছে। এখানে পৌঁছে তা দক্ষিণ থেকে উত্তর-পশ্চিম হয়ে চলে গেছে। এই পর্বতমালার মাঝখানে সিকান্দরী প্রাচীর অবস্থিত, আমরা এইমাত্র যার উল্লেখ করেছি এবং কোরআনও যার সংবাদ দিয়েছে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে খরদাযবাহ্ স্বীয় ভূগোল গ্রন্থে আব্বাসী খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহ্র একটি স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, প্রাচীর খুলে গেছে। এতে তিনি অস্থির হয়ে উঠে বসেন এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁর মুখপাত্র সাল্লামকে প্রেরণ করেন। সে ফিরে এসে এই প্রাচীরের অবস্থা বর্ণনা করে।—(ইবনে খলদুনের 'মুকাদ্দামা' ৭৯ পৃঃ)

আব্বাসী খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহ্ কর্তৃক যুলকারনাইনের প্রাচীর পর্যবেক্ষণের জন্যে একটি দল প্রেরণ করা এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করে ফিরে আসার কথা ইবনে কাসীরও 'আল বেদায়া ওয়ান্নেহায়াহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাতে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, এই প্রাচীর লৌহনির্মিত। এতে বড় বড় তালাবদ্ধ দরজাও আছে এবং এটি উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। তফসীর কবীর ও তাবারী এই ঘটনা বর্ণনা করে লিখেছেনঃ যে ব্যক্তি এই প্রাচীর পরিদর্শন করে ফিরে আসতে চায়, গাইড তাকে এমন লতাপাতাবিহীন প্রান্তরে পৌঁছে দেয়, যা সমরখন্দের বিপরীত দিকে অবস্থিত। —(তফসীর কবীর, ৫ম খণ্ড ৫১ পৃঃ)

শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রহ) 'আকীদাতুল ইসলাম ফী হায়াতে ঈসা (আ) গ্রন্থে ইয়াজুজ-মাজুজ ও যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থা প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু যতটুকু বর্ণনা করেছেন তা অনুসন্ধান ও রেওয়ায়েতের মাপকাঠিতে উৎকৃষ্ট পর্যায়ের। তিনি বলেনঃ দুষ্কৃতকারী ও বর্বর মানুষদের লুণ্ঠন থেকে আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবীতে এক নয়—বহু জায়গায় প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলো বিভিন্ন বাদশাহ্গণ বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করেছেন। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সর্ব-প্রসিদ্ধ হচ্ছে চীনের প্রাচীর। এর দৈর্ঘ্য আবু হাইয়্যান আন্দালুসী (ইরানের শাহী দরবা-রের ঐতিহাসিক) বার শত মাইল বর্ণনা করেছেন। এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন চীন সম্রাট 'ফগফুর'। এর নির্মাণের তারিখ আদম (আ)-এর অবতরণের তিন হাজার চার শত ষাট বছর পর বর্ণনা করা হয়। এই চীন প্রাচীরকে মোগলরা 'আনকুদাহ্' এবং তুর্কীরা 'বুরকুরকা' বলে থাকে। তিনি আরও বলেনঃ এমনি ধরনের আরও কয়েকটি প্রাচীর বিভিন্নস্থানে পরিদৃষ্ট হয়।

মওলানা হিফজুর রহমান সিহওয়ারী (রহ) কাসাসুল কোরআনে বিস্তারিতভাবে শাহ সাহেবের উপরোক্ত বর্ণনার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছে। এর সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

ইয়াজুজ-মাজুজের লুণ্ঠন ও ধ্বংসকাণ্ড সাধনের পরিধি বিশাল এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। একদিকে ককেশিয়ার পাদদেশে বসবাসকারীরা তাদের জুলুম ও নির্যা-তনের শিকার ছিল এবং অপরদিকে তিব্বত ও চীনের অধিবাসীরাও ছিল সর্বক্ষণ তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। এই ইয়াজুজ-মাজুজের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন

সময় বিভিন্ন স্থানে একাধিক প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও প্রসিদ্ধ প্রাচীর হচ্ছে চীনের প্রাচীর। উপরে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রাচীর মধ্য এশিয়ার বুখারা ও তিরমিযের নিকটে অবস্থিত। এর অবস্থানস্থলের নাম দরবন্দ। এই প্রাচীরটি খ্যাতনামা মোগল সম্রাট তৈমুরের আমলে বিদ্যমান ছিল। রোম সম্রাটের বিশেষ সভাসদ সীলা বর্জর জর্মেনীও তার গ্রন্থে এর কথা উল্লেখ করেছেন। আন্দালুসের সম্রাট ক্যাস্টাইলের দূত ক্ল্যাফজুও তার ভ্রমণ কাহিনীতে এর উল্লেখ করেছেন। ১৪০৩ খৃস্টাব্দে যখন তিনি সম্রাটের দূত হিসেবে তৈমুরের দরবারে পৌছেন, তখন এ স্থান অতিক্রম করেন। তিনি লিখেন ঃ বাবুল হাদীদের প্রাচীর মুসেলের ঐ পথে অবস্থিত, যা সমরখন্দ ও ভারতের মধ্যস্থলে বিদ্যমান।—(তফসীরে জওয়াহেরুল-কোরআন, তানতাভী, ৯ম খণ্ড, ১৯৮ পৃঃ)

তৃতীয় প্রাচীর রাশিয়ান এলাকা দাগিস্তানে অবস্থিত। এটিও দরবন্দ ও বাবুল আবওয়াব নামে খ্যাত। ইয়াকুত হমভী 'মুজামুল বুলদানে,' ইদরীসী 'জুগরাফিয়া'য় এবং বুস্তানী 'দায়েরাতুল মা'আরিফে' এর অবস্থা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন। এর সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

> দাগিস্তানে দরবন্দ একটি রাশিয়ান শহর। শহরটি কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এটি ৩° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৪৩° উত্তর অক্ষাংশ এবং ১৫° পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৪৮° পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। একে দরবন্দে নওশেরওয়াঁ নামেও অভিহিত করা হয়। তবে বাবুল-আবওয়াব নামে তা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

চতুর্থ প্রাচীর বাবুল আবওয়াব থেকে পশ্চিম দিকে ককেশিয়ার সুউচ্চ মালভূমিতে অবস্থিত। সেখানে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলে দারিয়াল নামে একটি প্রসিদ্ধ গিরিপথ রয়েছে। এই চতুর্থ প্রাচীরটি এখানে কাফকায অথবা জাবালে-কোফা অথবা কাফ পর্বতমালার প্রাচীর নামে খ্যাত। বুস্তানী এ সম্পর্কে লেখেন ঃ

> এবং এরই (অর্থাৎ বাবুল-আবওয়াব প্রাচীরের) নিকটে আরও একটি প্রাচীর রয়েছে, যা পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে। সম্ভবত পারস্যবাসীরা উত্তরাঞ্চলীয় বর্বরদের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এটি নির্মাণ করেছে। এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে সঠিক ও বিশুদ্ধ কোন বর্ণনা জানা যায়নি। প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কেউ কেউ একে সিকান্দরের প্রতি, কেউ কেউ পারস্য সম্রাট নওশেরওয়াঁর প্রতি এর সম্বন্ধ নির্দেশ করেছে। ইয়াকুত বলেন ঃ গলিত তামা দ্বারা এটি নির্মিত হয়েছে। —(দায়েরাতুল-মা'আরিফ ৭ম খণ্ড, ৬৫ পৃঃ)

এসব প্রাচীর সবগুলোই উত্তরদিকে অবস্থিত এবং প্রায় একই উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে। তাই এগুলোর মধ্যে যুলকারনাইনের প্রাচীর কোনটি, তা নির্ণয় করা কঠিন। শেষোক্ত দু'টি প্রাচীরের ব্যাপারেই অধিক মতভিন্নতা দেখা দিয়েছে। কেননা, উভয়স্থানের নাম দরবন্দ এবং উভয়স্থলে প্রাচীরও বিদ্যমান রয়েছে। উল্লিখিত চারটি প্রাচীরের মধ্যে সবচাইতে বড় ও সবচাইতে প্রাচীন চীনের প্রাচীর যুলকারনাইনের প্রাচীর নয়, এ

বিষয়ে সবাই একমত। এটি উত্তরদিকে নয়—দূরপ্রাচ্যে অবস্থিত। কোরআন পাকের ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা যায় যে, যুলকারনাইনের প্রাচীরটি উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত।

এখন উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত তিনটি প্রাচীর সম্পর্কিত পর্যালোচনা বাকী রয়ে গেল। তন্মধ্যে মাসউদী, ইসতাখরী, হমভী প্রমুখ ইতিহাসবিদ সাধারণভাবে সে প্রাচীরকে যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেন, যা দাগিস্তান অথবা ককেশিয়ার এলাকা বাবুল-আবওয়াবের দরবন্দ নামক স্থানে কাস্পিয়ানের তীরে অবস্থিত। বুখারা ও তিরমিযির দরবন্দে অবস্থিত প্রাচীরকে যারা যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেছেন, তারা সম্ভবত দরবন্দ নাম দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। এখন যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানকাল প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ দু'টি প্রাচীরের মধ্যে ব্যাপার সীমিত হয়ে গেছে। এক. দাগিস্তান ককেশিয়ার এলাকা বাবুল-আবওয়াবের দরবন্দের প্রাচীর এবং দুই. আরও উচ্চে কাফকায অথবা কাফ অথবা ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীর ঃ উভয় স্থানে প্রাচীরের অস্তিত্ব ইতিহাসবিদদের কাছে প্রমাণিত রয়েছে।

হযরত মওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রহ) 'আকীদাতুল ইসলাম' গ্রন্থে উত্তর প্রাচীরের মধ্য থেকে ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এটিই যুলকারনাইন নির্মিত প্রাচীর।

যুলকারনাইনের প্রাচীর এখনও বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, না ভেঙ্গে গেছে ঃ ইউরোপীয় ইতিহাস ও ভূগোল বিশেষজ্ঞরা আজকাল উপরোক্ত প্রাচীর-সমূহের কোনটির অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তারা এ কথাও স্বীকার করেন না যে, ইয়াজুজ-মাজুজের পথ অদ্যাবধি বন্ধ রয়েছে। এরই ভিত্তিতে কোন কোন মুসলমান ইতিহাসবিদও এ কথা বলতে লিখতে শুরু করেছেন যে, কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজ বহু পূর্বেই বের হয়ে গেছে। কেউ কেউ হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঝটিকার বেগে উত্থিত তাতারীদেরকেই এর নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ বর্তমান যুগের পরাশক্তি রাশিয়া চীন, ও ইউরোপীয়দেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ বলে দিয়ে ব্যাপারটি সাঙ্গ করে দিয়েছেন। কিন্তু উপরে রূহুল মা'আনীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সহীহ্ হাদীসসমূহ অস্বীকার করা ছাড়া কেউ একথা বলতে পারে না। কোরআন পাক ইয়াজুজ-মাজুজের অভ্যুত্থানকে কিয়ামতের আলামত হিসেবে বর্ণনা করেছে। নাওয়াস ইবনে সামআন প্রমুখ বর্ণিত সহীহ মুসলিমের হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনাটি ঘটবে দাজ্জালের আবির্ভাব এবং ঈসা (আ)-র অবতরণ ও দাজ্জাল হত্যার পরে। দাজ্জালের আবির্ভাব এবং ঈসা (আ)-র অবতরণ যে আজও পর্যন্ত হয়নি, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

তবে যুলকারনাইনের প্রাচীর বর্তমানে ভেঙ্গে গেছে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের কোন কোন গোত্র এপারে চলে এসেছে—একথা বলাও কোরআন ও হাদীসের কোন সুস্পষ্ট বর্ণনার পরিপন্থী নয়—যদি মেনে নেয়া হয় যে, তাদের সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত-

কারী সর্বশেষ ও সর্বধ্বংসী হামলা এখনও হয়নি; বরং তা উপরে বর্ণিত দাজ্জালের আবির্ভাব এবং ঈসা (আ)-র অবতরণের পরে হবে।

এ ব্যাপারে হযরত উস্তাদ আল্লামা কাশ্মীরী (রহ)-এর সুচিন্তিত বক্তব্য এই : ইউরোপীয়দের এ বক্তব্যের কোন গুরুত্ব নেই যে, তারা সমগ্র ভূপৃষ্ঠ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে যে, কোথাও এই প্রচীরের অস্তিত্ব নেই। কেননা, স্বয়ং তাদেরই এ ধরনের বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে যে, পর্যটন ও অন্বেষণের উচ্চতম শিখরে পৌঁছা সত্ত্বেও অনেক অরণ্য, সমুদ্র ও দ্বীপ সম্পর্কে তারা অদ্যাবধি জ্ঞানলাভ করতে পারেনি। এ ছাড়া এরূপ সম্ভাবনাও দূরবর্তী নয় যে, কথিত প্রাচীরটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পাহাড়সমূহের পতন ও পারস্পরিক সংযুক্তির কারণে তা একটি পাহাড়ের আকার ধারণ করে ফেলেছে। কিয়ামতের পূর্বে প্রাচীরটি ভেঙে যাবে অথবা দূরবর্তী পথ ধরে ইয়াজুজ-মাজুজের কিছু গোত্র এপারে এসে যাবে—কোরআন ও হাদীসের কোন অকাট্য প্রমাণ এ বিষয়েরও পরিপন্থী নয়। যুলকারনাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে—এর পক্ষে বড় প্রমাণ হচ্ছে কোরআনে পাকের আয়াত فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ — অর্থাৎ যুলকারনাইনের এই উক্তি যে, যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি এসে যাবে (অর্থাৎ ইয়াজুজ-মাজুজের বেরিয়ে আসার সময় হবে,) তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই লৌহ প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণ করে ভূমিসাৎ করে দেবেন। এই আয়াতে وَعْدُ رَبِّي (আমার পালনকর্তার ওয়াদা)-এর অর্থ কিয়ামত নেয়া হয়েছে। অথচ কোরআনের ভাষ্য-এই অর্থ অকাট্য নয়; বরং এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, যুলকারনাইন ইয়াজুজ-মাজুজের পথ রুদ্ধ করার যে ব্যবস্থা করেছে, তা সদাসর্বদা যথাযথ থাকা জরুরী নয়। যখন আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াজুজ-মাজুজের পথ খুলে দেওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন এই প্রাচীর বিধ্বস্ত ও ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। এটা কিয়ামতের একান্ত নিকটবর্তী সময়ে হওয়াই জরুরী নয়। সে মতে সব তফসীরবিদই وَعْدُ رَبِّي-এর অর্থে উভয় সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। তফসীর বাহরে-মুহীতে বলা হয়েছে :

والوعد يحتمل ان يراد به يوم القيامة وان يراد به وقت خروج ياجوج وماجوج -

এটা এভাবেও হতে পারে যে, প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে রাস্তা এখনই খুলে গেছে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের আক্রমণের সূচনা হয়ে গেছে। ষষ্ঠ হিজরীর তাতারী ফিতনাকে এর সূচনা সাব্যস্ত করা হোক কিংবা ইউরোপ, রাশিয়া ও চীনের আধিপত্যকে সাব্যস্ত করা হোক। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এসব সভ্য জাতির আবির্ভাব ও এদের সৃষ্ট ফিতনাকে কোরআন হাদীসে বর্ণিত ফিতনা আখ্যা দেয়া যায় না। কারণ, তাদের আবির্ভাব আইন

ও কানুনের পন্থায় হচ্ছে। কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত সেই ফিতনা এমন অকৃত্রিম হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ রক্তপাতের মাধ্যমে হবে, যা পৃথিবীর গোটা জনমণ্ডলীকেই ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবে। বরং এর সারমর্ম আবার এই দাঁড়ায় যে, দুষ্কৃতকারী ইয়াজুজ-মাজুজেরই কিছু গোত্র এপারে এসে সভ্য হয়ে গেছে। তারাই ইসলামী দেশসমূহের জন্য নিঃসন্দেহে বিরাট ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজের সেসব বর্বর গোত্র হত্যা ও রক্তপাত ছাড়া কিছুই জানে না, তারা এখন পর্যন্ত আল্লাহ্র বাণীর তফসীর অনুযায়ী এপারে আসেনি। সংখ্যার দিক দিয়ে তারাই হবে বেশি। তাদের আবির্ভাব কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে হবে।

দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে তিরমিযী ও মসনদ আহমদের একটি হাদীস। তাতে উল্লিখিত রয়েছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রত্যহই প্রাচীরটি খনন করে। প্রথমত এই হাদীসটি ইবনে কাসীরের মতে معلول —দ্বিতীয়ত এতেও এ বিষয়ের বর্ণনা নেই যে, ইয়াজুজ-মাজুজ যে দিন 'ইনশাআল্লাহ্' বলার বরকতে প্রাচীরটি অতিক্রম করবে, সেদিনটি কিয়ামতের কাছা-কাছিই হবে। এই হাদীসে এ বিষয়েরও কোন প্রমাণ নেই যে, ইয়াজুজ-মাজুজের গোটা জাতি এই প্রাচীরের পাশ্চাত্যে আবদ্ধ থাকবে। কাজেই তাদের কিছু দল অথবা গোত্র হয়তো দূরদূরান্তের পথ অতিক্রম করে এপারে এসে গেছে। আজকালকার শক্তিশালী সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কোন কোন ইতিহাসবিদ এ কথাও লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজ দীর্ঘ সামুদ্রিক সফরের মাধ্যমে এপারে আসার পথ পেয়ে গেছে। উপরোক্ত হাদীস এর পরিপন্থী নয়।

মোট কথা, কোরআন ও হাদীসে এরূপ কোন প্রকাশ্য ও অকাট্য প্রমাণ নেই যে, যুলকারনাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে অথবা কিয়ামতের পূর্বে এপারের মানুষের উপর তাদের প্রারম্ভিক ও মামুলী আক্রমণ হতে পারবে না। তবে তাদের চূড়ান্ত, ভয়াবহ ও সর্বনাশা আক্রমণ কিয়ামতের পূর্বে সেই সময়েই হবে, যে সময়ের কথা ইতিপূর্বে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সারকথা এই যে, কোরআন ও হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর ভেঙ্গে রাস্তা খুলে গেছে বলে যেমন অকাট্য ফয়সালা করা যায় না, তেমনি এ কথাও বলা যায় না যে, প্রাচীরটি কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকা জরুরী। উভয়দিকেরই সম্ভাবনা রয়েছে। والله اعلم بحقيقة الحال

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾ وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾ الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

(৯৯) আমি সেদিন তাদেরকে দলে দলে তরঙ্গের আকারে ছেড়ে দেব এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তদের সবাইকে একত্রিত করে আনব। (১০০) সেদিন আমি কাফিরদের কাছে জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব। (১০১) যাদের চক্ষুসমূহের উপর পর্দা ছিল আমার স্মরণ থেকে এবং যারা শুনতেও সক্ষম ছিল না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি সেদিন (অর্থাৎ যখন প্রাচীর বিধ্বস্ত হওয়ার প্রতিশ্রুতির দিন আসবে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হবে, তখন আমি) তাদের এমন অবস্থা করে ছাড়ব যে, একদল অন্য দলের ভেতর ঢুকে পড়বে। (কেননা তারা অগণিত সংখ্যায় একযোগে বের হয়ে পড়বে এবং সবাই একে অপরকে ডিঙিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।) এবং (এটা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হবে। এর কিছুদিন পর কিয়ামতের প্রস্তুতি শুরু হবে। প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। ফলে সমগ্র বিশ্ব নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয়বার) শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। (ফলে সবাই জীবিত হয়ে যাবে)। অতঃপর আমি সবাইকে একজন একজন করে (হাশরের মাঠে) একত্র করব এবং জাহান্নামকে সেদিন কাফিরদের কাছে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব, যাদের চোখের উপর (দুনিয়াতে) আমার স্মরণ থেকে (অর্থাৎ সত্যধর্মকে দেখার ব্যাপারে) পর্দা পতিত ছিল এবং (তারা যেমন সত্যকে দেখত না, তেমনিভাবে তাকে) শুনতেও পারত না। (অর্থাৎ সত্যকে জানার উপায় দেখা ও শোনা উভয় পথই তারা বন্ধ করে রেখেছিল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ—এর সর্বনাম দ্বারা বাহ্যত ইয়াজুজ-মাজুজকেই বোঝানো হয়েছে। তাদের একদল অপরদলের মধ্যে ঢুকে পড়বে—বাহ্যত এই অবস্থা তখন হবে, যখন তাদের পথ খুলে যাবে এবং তারা পাহাড়ের উচ্চতা থেকে দ্রুতবেগে নিচে অবতরণ করবে। তফসীরবিদগণ অন্যান্য সম্ভাবনাও লিখেছেন।

وَجَمَعْنٰهُمْ—এর সর্বনাম দ্বারা সাধারণ জিন ও মানবজাতিকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের মাঠে জিন ও মানবজাতিকে একত্র করা হবে।

أَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا أَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ أَوْلِيَآءَ ۚ إِنَّآ

أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ

أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ

يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ
فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾ ذَٰلِكَ
جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿١٠٦﴾ إِنَّ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾
خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾

(১০২) কাফিররা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? আমি কাফেরদের অভ্যর্থনার জন্য জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছি। (১০৩) বলুন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত? (১০৪) তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিবজীবনে বিভ্রান্ত হয়; অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। (১০৫) তারাই সে লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তার সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি কোন গুরুত্ব স্থির করব না। (১০৬) জাহান্নাম—এটাই তাদের প্রতিফল; কারণ, তারা কাফের হয়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রসূলগণকে বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে। (১০৭) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্যে আছে জান্নাতুল ফিরদাউস। (১০৮) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এরপরও কি কাফিররা মনে করে যে, আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে (অর্থাৎ যারা আমার মালিকানাধীন এবং আমারই আদেশের গোলাম, ইচ্ছাকৃতভাবেই অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদেরকে) অভিভাবক (অর্থাৎ উপাস্য ও অভাব পূরণকারী) রূপে গ্রহণ করবে? (এটা শিরক ও পরিষ্কার কুফর)। আমি কাফিরদের অভ্যর্থনার জন্য জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছি। (ব্যঙ্গচ্ছলে অভ্যর্থনা বলা হয়েছে। তারা যদি তাদের স্বকল্পিত সৎ কর্মের জন্য গর্ববোধ করে এবং এ কারণে নিজেদেরকে মুক্তিপ্রাপ্ত, আযাব থেকে মুক্তি মনে করে, তবে) আপনি (তাদেরকে) বলুন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত? তারা সেসব লোক, পার্থিবজীবনে যাদের কৃত পরিশ্রম (সৎ কর্ম সম্পাদন যা করেছিল) সবই বিফলে গেছে এবং তারা (মূর্খতাবশত) মনে করেছে যে, তারা ভাল কাজই করছে। (অতঃপর

তাদের উদাহরণ এমনভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে তাদের পরিশ্রম বিফল হওয়ার কারণও জানা যায় এবং প্রসঙ্গক্রমে কর্ম বিফল হওয়ার বিষয়াদিরও বিশ্লেষণ হয়ে যায়। অর্থাৎ) তারা সেসব লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ (অর্থাৎ কিয়ামত) অস্বীকার করে। (তাই) তাদের সব (সৎ) কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে। অতএব, কিয়ামতের দিন আমি তাদের (সৎকর্মের) জন্য সামান্য ওজনও স্থির করব না। (বরং) তাদের প্রতিফল তাই হবে (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ) জাহান্নাম। কারণ, তারা কুফর করেছিল এবং (এই কুফরের একটি শাখা এমনও ছিল যে) আমার নিদর্শনাবলী ও রসূলগণকে উপহাসের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছিল। (অতঃপর তাদের বিপরীতে ঈমানদারদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য রয়েছে ফিরদাউসের উদ্যান। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে (তাদেরকে কেউ বের করবে না) এবং সেখান থেকে অন্যত্র যেতে চাইবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ —

তফসীর বাহরে মুহীতে বর্ণিত আছে যে, এ ক্ষেত্রে কিছু বাক্য উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ ينفعونهم ذلك الاتخاذ — উদ্দেশ্য এই যে, এসব কাফির আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছে, তারা কি মনে করে যে, ঐ কাজ তাদেরকে উপকৃত করবে এবং ঐ দ্বারা তাদের কিছুটা কল্যাণ হবে? এই জিজ্ঞাসা অস্বীকারবোধক। অর্থাৎ এরূপ মনে করা ভ্রান্তি ও মূর্খতা।

عِبَادِي (আমার দাস) বলে এখানে ফেরেশতা এবং সেসব পয়গম্বরগণকে বোঝানো হয়েছে দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য ও আল্লাহ্‌র শরীকরূপে স্থির করা হয়েছে, যেমন হযরত ওযায়ের ও ঈসা (আ)। কিছু সংখ্যক আরব ফেরেশতাদেরও উপাসনা করত, পক্ষান্তরে ইহুদীরা ওযায়ের (আ)-কে এবং খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র শরীকরূপে গ্রহণ করেছে। তাই আয়াতে الَّذِينَ كَفَرُوا বলে কাফেরদের এসব দলকেই বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ এখানে 'আমার বান্দা' অর্থ নিয়েছেন শয়তান। সুতরাং الَّذِينَ كَفَرُوا -এর অর্থ হবে যারা শয়তান ও জিনের উপাসনা করে। কেউ কেউ 'আমার বান্দা' অর্থ ও সৃজিত এবং মালিকানাধীন বস্তু গ্রহণ করে একে ব্যাপকাকার করে দিয়েছেন। ফলে আগুন, মূর্তি, তারকা ইত্যাদি মিথ্যা উপাস্যও

এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাহ্রে মুহীত প্রভৃতি গ্রন্থে প্রথম তফসীরকেই প্রবল সাব্যস্ত করা হয়েছে।

اَوْلِيَاءَ—এটি وَلِىٌّ-এর বহুবচন। আরবী ভাষায় এ শব্দ অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে এর অর্থ কার্যনির্বাহী, অভাব পূরণকারী, যা সত্তা উপাস্যের বিশেষ গুণ। উদ্দেশ্য, তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করা।

بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا—এখানে প্রথম দুই আয়াত এমন ব্যক্তি ও দলকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যারা কোন কোন বিষয়কে সৎ মনে করে তাতে পরিশ্রম করে। কিন্তু আল্লাহ্র কাছে তাদের সে পরিশ্রম বৃথা এবং সে কর্মও নিষ্ফল। কুরতুবী বলেন, এ অবস্থা দু'টি কারণে সৃষ্টি হয়। এক. ভ্রান্তবিশ্বাস এবং দুই. লোক দেখানো মনোবৃত্তি। অর্থাৎ সব বিশ্বাস ও ঈমান ঠিক নয়, সে যত ভাল কাজই করুক, যত পরিশ্রমই করুক, পরকালে সবই বৃথা ও নিষ্ফল প্রতিপন্ন হবে।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য লোকদেখানো মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করে সে-ও তার সে কাজের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। এই ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে কোন কোন সাহাবী খারেজী সম্প্রদায়কে এবং কোন কোন তফসীরবিদ মু'তাযিলা, রাওয়াফেয ইত্যাদি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়কে আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু পরবর্তী আয়াতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এখানে সেসব কাফিরকে বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী এবং কিয়ামত ও পরকাল অস্বীকার করে।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهٖ—তাই কুরতুবী, আবূ হাইয়্যান, মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এখানে প্রকৃত উদ্দেশ্য হল সেসব কাফির সম্প্রদায়, যারা আল্লাহ্, কিয়ামত ও হিসাব-কিতাব অস্বীকার করে। কিন্তু বাহ্যত তারাও এর ব্যাপক অর্থের সাথে সম্পর্কহীন হতে পারে না, যাদের অপবিশ্বাস তাদের কর্মকে বরবাদ ও পরিশ্রম নিষ্ফল করে দেয়। হযরত আলী ও সা'দ (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে এ ধরনের উক্তি বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী)

فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا—অর্থাৎ তাদের আমল বাহ্যত বিরাট বলে দেখা যাবে, কিন্তু হিসাবের দাঁড়ি-পাল্লায় তার কোন ওজন হবে না। কেননা কুফর ও শিরকের কারণে তাদের আমল নিষ্ফল ও গুরুত্বহীন হয়ে যাবে।

বোখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত মতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন: কিয়ামতের দিন জনৈক দীর্ঘদেহী স্থূলকায় ব্যক্তি আসবে, আল্লাহ্র কাছে মাছির

জানার সমপরিমাণও তার ওজন হবে না। অতঃপর তিনি বলেন, যদি এর সমর্থন চাও, তবে কোরআনের এই আয়াত পাঠ কর : فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : কিয়ামতের দিন এমন এমন কাজকর্ম করা হবে, যেগুলো স্থূলতার দিক দিয়ে মদীনার পাহাড়সমূহের সমান হবে, কিন্তু ন্যায়-বিচারের দাঁড়ি-পাল্লায় এগুলোর কোন ওজনই থাকবে না।

جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ—فِرْدَوْس-এর অর্থ সবুজে ঘেরা উদ্যান। এটি আরবী শব্দ, না অনারব এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যারা অনারব বলেন, তারাও ফারসী রোমী, না সুরইয়ানী ইত্যাদি সম্পর্কে নানা মত পোষণ করেন।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : তোমরা যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর, তখন জান্নাতুল-ফিরদাউসের প্রার্থনা কর। কেননা, এটা জান্নাতের সর্বোৎকৃষ্ট স্তর। এর উপরেই আল্লাহর আরশ এবং এখান থেকেই জান্নাতের সব নহর প্রবাহিত হয়েছে।—(কুরতুবী)

لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا—উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতের এ স্থানটি তাদের জন্য অক্ষয় ও চিরস্থায়ী নিয়ামত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এ আদেশ জারি করে দেবেন, যে জান্নাতে প্রবেশ করেছে, তাকে সেখান থেকে কখনও বের করা হবে না। কিন্তু এখানে একটি আশংকা ছিল এই যে, এক জায়গায় থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে যাওয়া মানুষের একটি স্বভাব। সে স্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা করে। যদি জান্নাতের বাইরে কোথাও যাওয়ার অনুমতি না থাকে, তবে জান্নাতও একটি কয়েদখানার মত মনে হতে থাকবে। আলোচ্য আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, জান্নাতকে অন্যান্য গৃহের আলোকে দেখা মূর্খতা বৈ নয়। যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, জান্নাতের নিয়ামত ও চিত্তাকর্ষক পরিবেশের সামনে দুনিয়াতে দেখা ও ব্যবহার করা বস্তুসমূহ তার কাছে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে হবে। জান্নাত থেকে বাইরে যাওয়ার কল্পনাও কোন সময় কারও মনে জাগবে না।

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ۝١٠٩ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ۝١١٠

(১০৯) বলুন ঃ আমার পালনকর্তার কথা, লেখার জন্যে যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার পালনকর্তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে। সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও। (১১০) বলুন ঃ আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ই এক-মাত্র ইলাহ্। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি লোকদেরকে বলে দিন ঃ যদি আমার পালনকর্তার বাণী (অর্থাৎ যেসব বাক্য আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী ও উৎকর্ষ বোঝায় এবং এসব বাক্য দ্বারা কেউ আল্লাহ্র গুণাবলী ও উৎকর্ষ বর্ণনা করে, তবে এসব বাণী) লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র (অর্থাৎ সমুদ্রের পানি) কালি হয় (এবং তদ্দ্বারা লেখা শুরু করে) তবে আমার পালনকর্তার বাণী শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে (এবং সব কথা আয়ত্তে আসবে না); যদিও সমুদ্রের অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র (এর) সাহায্যার্থে আমি এনে দেই (তবুও সে বাণী শেষ হবে না, অথচ দ্বিতীয় সমুদ্রও শেষ হয়ে যাবে। এতে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্র বাণী অসীম। তাঁর পরিবর্তে কাফিররা যাদেরকে আল্লাহ্র শরীকরূপে গ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে কেউ এমন নয়। তাই বিশেষ করে তিনিই একমাত্র উপাস্য ও পালনকর্তা। কাজেই তাদেরকে) আপনি (একথাও) বলে দিন ঃ আমি তো তোমাদের সবার মতই একজন মানুষ (খোদায়ীর দাবীদার নই এবং ফেরেশতা হওয়ার দাবী করি না। তবে হ্যাঁ) আমার কাছে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) ওহী আসে (এবং) তোমাদের সত্য মা'বুদই একমাত্র মাবুদ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে (এবং তার প্রিয়পাত্র হতে চায়), সে যেন আমাকে রসূল স্বীকার করে, আমার শরীয়ত অনুযায়ী সৎ কর্ম সম্পাদন করতে থাকে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হাদীসে বর্ণিত শানে-নুযূল থেকে সূরা কাহ্ফের শেষ আয়াতে উল্লিখিত বাক্য। وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا সম্বন্ধে জানা যায় যে, এখানে উল্লিখিত শিরক দ্বারা 'গোপন শিরক' অর্থাৎ রিয়া তথা লোক দেখানো মনোবৃত্তি বোঝানো হয়েছে।

ইমাম হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক মুসলমান আল্লাহ্র পথে জিহাদ করত এবং মনে মনে কামনা করত যে, জনসমাজে শৌর্যবীর্য প্রচারিত হোক। তারই সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি

অবতীর্ণ হয়। (এ থেকে জানা গেল যে. জিহাদে এরূপ নিয়ত করলে জিহাদের সওয়াব পাওয়া যায় না।)

'ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্দুনিয়া' 'কিতাবুল ইখলাসে' তাউস থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার জনৈক সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে বললেন ঃ আমি মাঝে মাঝে যখন কোন সৎকর্ম সম্পাদনের অথবা ইবাদতের উদ্যোগ গ্রহণ করি, তখন আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টিই থাকে আমার উদ্দেশ্য; কিন্তু সাথে সাথে এ কামনাও মনে জাগে যে, লোকেরা আমার কাজটি দেখুক। রসূলুল্লাহ্ (সা) একথা শুনে চুপ করে রইলেন। অবশেষে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আবূ নঈম 'তারীখে আসাকির' গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে লিখেছেন ঃ জুনদুব ইবনে সুহায়েব যখন নামায পড়তেন, রোযা রাখতেন অথবা দান-খয়রাত করতেন এবং এসব আমলের কারণে লোকদেরকে তার প্রশংসা করতে দেখতেন, তখন মনে মনে খুব আনন্দিত হতেন। ফলে আমল আরও বাড়িয়ে দিতেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়।

এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, আয়াতে রিয়াকারীর গোপন শিরক থেকে বারণ করা হয়েছে। আমল আল্লাহ্র উদ্দেশে হলেও যদি তার সাথে কোনরূপ সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বাসনা থাকে, তবে তাও একপ্রকার গোপন শিরক। এর ফলে মানুষের আমল বরবাদ বরং ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু অন্য কতিপয় সহীহ্ হাদীস থেকে এর বিপরীতও জানা যায়। উদাহরণত তিরমিযী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ একবার তিনি রসূলুল্লাহ্র কাছে আরয করলেন, আমি মাঝে মাঝে আমার ঘরের ভিতরে জায়নামাযে (নামাযরত) থাকি। হঠাৎ কোন ব্যক্তি এসে গেলে আমার কাছে ভাল লাগে যে, সে আমাকে নামাযরত অবস্থায় দেখেছে। এটা কি রিয়া হবে? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আবূ হুরায়রা, আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুন। এমতাবস্থায় তুমি দু'টি সওয়াব পাবে। একটি তোমার সে গোপন আমলের জন্য যা তুমি পূর্ব থেকে করছিলে এবং দ্বিতীয়টি তোমার প্রকাশ্য আমলের জন্য যা লোকটি আসার পর হয়েছে। (এটা রিয়া নয়)।

সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, একবার হযরত আবূযর গিফারী (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন, যে কোন সৎ কর্ম করার পর মানুষের মুখে তার প্রশংসা শোনে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ تلك عاجل بشرى المؤمن। অর্থাৎ এটা তো মু'মিনের নগদ সুসংবাদ (যে তার আমল আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করেছেন এবং বান্দাদের মুখে তার প্রশংসা করিয়েছেন)।

তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে, প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতের তাৎপর্য এই যে, নিজের আমল দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির সাথে সৃষ্টজীবের সন্তুষ্টি অথবা নিজের

সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির নিয়তকে শরীক করে নেওয়া এমনকি, লোকমুখে প্রশংসা শুনে আমল আরও বাড়িয়ে দেওয়া। এটা নিঃসন্দেহে রিয়া ও গোপন শিরক।

তিরমিযী ও মুসলিমে বর্ণিত শেষোক্ত রওয়ায়েতগুলোর সম্পর্ক হল সে অবস্থার সাথে যে, আমল খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র জন্যই হয়ে থাকে, লোকমুখে সুখ্যাতি ও প্রশংসার প্রতি ভ্রূক্ষেপ থাকে না। অতঃপর যদি আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করে লোকের মাঝে তার প্রসিদ্ধি সম্পন্ন করে দেন এবং মানুষের মুখ দিয়ে প্রশংসা করিয়ে দেন, তবে রিয়ার সাথে এ আমলের কোন সম্পর্ক নেই। এটা মু'মিনের জন্য (আমল কবুল হওয়ার) অগ্রিম সুসংবাদ। এভাবে বাহ্যত পরস্পর বিরোধী উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়।

রিয়ার অশুভ পরিণতি এবং তজ্জন্যে হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী ঃ হযরত মাহমুদ ইবনে লবীদ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমি তোমাদের সম্পর্কে যে বিষয়ে সর্বাধিক আশংকা করি, তা হচ্ছে ছোট শিরক। সাহাবায়ে কিরাম নিবেদন করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, ছোট শিরক কি? তিনি বললেন ঃ রিয়া। —(আহমদ)

বায়হাকী শোয়াবুল-ঈমান গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃত করে তাতে অতিরিক্ত আরও বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা যখন বান্দাদের কাজকর্মের প্রতিদান দেবেন, তখন রিয়াকার লোকদেরকে বলবেন ঃ 'তোমরা তোমাদের কাজের প্রতিদান নেয়ার জন্য তাদের কাছে যাও, যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে তোমরা কাজ করেছিলে। এরপর দেখ, তাদের কাছে তোমাদের জন্য কোন প্রতিদান আছে কি না।'

হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমি শরীকদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ঊর্ধ্বে। যে ব্যক্তি কোন সৎ কর্ম করে এবং তাতে আমার সাথে অন্যকেও শরীক করে, আমি সেই আমল শরীকের জন্য ছেড়ে দেই। অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, আমি সেই আমল থেকে মুক্ত ; সে আমলকে খাঁটিভাবে আমি তার জন্যই করে দেই, যাকে সে আমার সাথে শরীক করেছিল।—(মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি সুখ্যাতি লাভের জন্য সৎ কর্ম করে আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে এমনি ব্যবহার করেন ; যার ফলে সে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হয়ে যায়।—(আহমদ, বায়হাকী, মাযহারী)

তফসীর কুরতুবীতে আছে, হযরত হাসান বসরী (র)-কে ইখলাস ও রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ ইখলাসের দ্বারা হচ্ছে সৎ ও ভাল কর্মের গোপনীয়তা পসন্দ করা এবং মন্দ কর্মের গোপনীয়তা পসন্দ না করা। এরপর যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমার আমল মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেন, তবে তুমি একথা বল ঃ হে আল্লাহ্, এটা আপনার অনুগ্রহ ও কৃপা ; আমার কর্ম ও প্রচেষ্টার ফল নয়।

হাকীম, তিরমিযী হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) শিরকের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন ঃ هو فيكم اخفى من دبيب

النمل । অর্থাৎ পিঁপড়ার নিঃশব্দ গতির মতই শিরক তোমাদের মধ্যে গোপনে অনুপ্রবেশ করে। তিনি আরও বললেন : আমি তোমাদেরকে একটি উপায় বলে দিচ্ছি যা করলে তোমরা বড় শিরক ও ছোট শিরক (অর্থাৎ রিয়া) থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। তোমরা দৈনিক তিনবার এই দোয়া পাঠ করো : اللهم انى اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلمه

সূরা কাহ্ফের কতিপয় ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য : হযরত আবুদ্দারদা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ রাখবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।—(মুসলিম, আহমদ, আবু দাঊদ, নাসায়ী)

ইমাম আহমদ, মুসলিম ও নাসায়ী আবুদ্দারদার এই রেওয়ায়েতে একথাও বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের শেষ দশ আয়াত মুখস্থ রাখবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।

হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের প্রথম ও শেষ আয়াতগুলো পাঠ করবে, তার জন্য আপাদমস্তক এক নূর হবে এবং যে ব্যক্তি পূর্ণ সূরা পাঠ করবে তার জন্য মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত নূর হবে।—(ইবনুস-সুন্নী, আহমদ)

হযরত আবু সায়ীদের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি জুমআর দিন পূর্ণ সূরা কাহ্ফ পাঠ করে, পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত তার জন্য নূর হয়ে যায়।—(হাকিম, মাযহারী)

জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের কাছে বলল : আমি মনে মনে ঘুম থেকে জেগে নামায পড়তে ইচ্ছা করি, কিন্তু ঘুম প্রবল হয়ে যায়। তিনি বললেন : তুমি যখন ঘুমাতে যাও তখন সূরা কাহ্ফের শেষ আয়াতগুলো قل لو كان البحر مدادا থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঠ কর। এর ফলে তুমি যখন জাগার উদ্দেশ্য করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তখনই তোমাকে জাগিয়ে দেবেন।—(ছা'লবী)

মসনদে-দারেমীতে আছে, যির ইবনে হুবায়শ হযরত আবদাহকে বললেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের এই শেষ আয়াতগুলো পাঠ করে ঘুমাবে, সে যে সময় জাগার নিয়ত করবে, সে সময়ই জেগে যাবে। আবদাহ্ বললেন : আমি বারবার আমলটি পরীক্ষা করে দেখেছি, ঠিক তাই হয়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ : ইবনে আরাবী বলেন : আমাদের শায়খ তুরতুসী বলতেন : তোমার মূল্যবান জীবনের সময়গুলো যেন সমসাময়িকদের সাথে প্রতিযোগিতা

ও বন্ধু-বান্ধবের মেলামেশার মধ্যেই অতিবাহিত হয়ে না যায়। দেখ, আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা তাঁর বর্ণনা সমাপ্ত করেছেন :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎ কর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে যেন কাউকে শরীক না করে। —(কুরতুবী)

শেষ নিবেদন

আজ ১৩৯০ হিজরী সনের যিলকদ মাসের ৮ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার দুপুর বেলা সূরা কাহ্‌ফের এই তফসীর সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়। আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ ফযল ও রহমযে, এমন এক সময়-সন্ধিক্ষণে কোরআন করীমের প্রথমার্ধের কিছু বেশী অংশের তরজমা সম্পূর্ণ হল, যখন আমার বয়সসীমা ৭৬তম বর্ষপরিক্রমায় যাত্রা শুরু করেছে। যে সময়ে আমি শারীরিক দুর্বলতার সাথে সাথে দীর্ঘ দু'বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের রোগেও আক্রান্ত এবং মানসিক চিন্তার ভীড়ও অপরিসীম। এতদসত্ত্বেও আমি হতাশ নই, বরং অত্যন্ত আশাবাদী যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার ফযল ও কৃপায় কোরআনে করীমের অবশিষ্ট তফসীরও সম্পূর্ণ করার তওফীক দান করবেন।

ইফা –২০১২-২০১৩–প্র/০৬ (রা)—৫২৫০

সূচী-পত্র

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন

পঞ্চম খণ্ড

ইসলামিক ফাউন্ডেশন